"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com
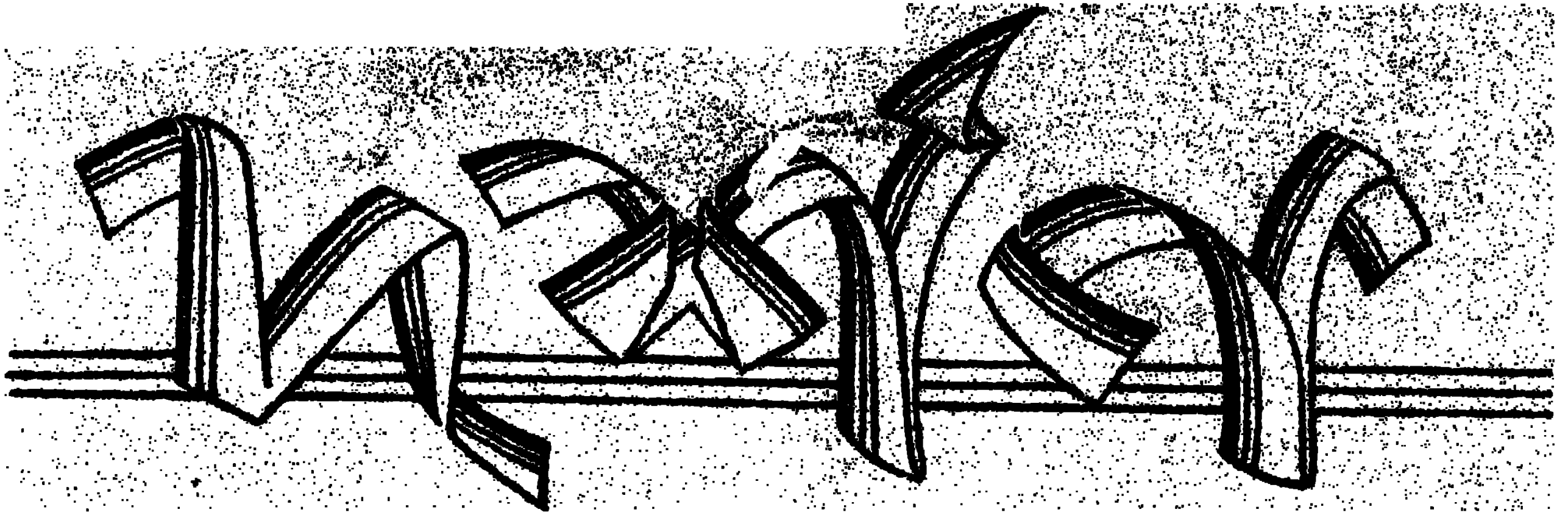
দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা] **বৈশাখ** [বৈশাখ ১৩৬২ সাল

বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৪৲

দর্শন কার্য্যালয়—২৩।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা] বৈশাখ [বৈশাখ ১৩৬২ সাল

সূচীপত্র

সাম্প্রতিক দর্শনচর্চার একটি দিক : পরাবিজ্ঞান

শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাম্প্রতিক দর্শন চর্চার একটি দিক—এই আমার আজকের আলোচ্য বিষয়। একটি দিক বলতে আমি বুঝছি ঠিক সেই দিকটি, যেটি নিয়ে আমি আলোচনা করব। দর্শন চর্চা বলতে আমি বলব আমারই মত সাধারণ দর্শনের ছাত্ররা যে চর্চা করে থাকেন সেই চর্চা। আর সাম্প্রতিক বলতে বুঝব, আজকের দিনের, সুতরাং সাম্প্রতিক দর্শন বলতে বুঝব, আজকের দিনের আমার মত সাধারণ দর্শনের ছাত্ররা দার্শনিক সমস্যা, (অর্থাৎ দর্শনের ইতিহাসগত সমস্যা নয়, বা সাধারণ সাংস্কৃতিক সমস্যা নয়) আলোচনার জন্য যে যে যুগের দর্শনের সাহায্য নিয়ে থাকেন সেই সেই যুগের দর্শন। তাই সাম্প্রতিক দর্শন বলতে উপনিষদ্‌কেও বোঝা যায়, যদি আজকের দিনের দর্শনের ছাত্ররা তাঁদের সমস্যার আলোচনার জন্য উপনিষদ্ ব্যবহার করেন। তেমনি আবার আমরা মার্কস্‌বাদও বুঝতে পারি, আবার টমাস এ্যাকুইনাসের দর্শনও বুঝতে পারি। যাই হোক, এই আমার আজকের আলোচ্য। এই আলোচনা, যা বলেছি তা থেকেই বোঝা যাবে, সুরু হবে, আজকের দর্শনের সাধারণ ছাত্র হতে, এবং তাই করা হচ্ছে।

আজকের দিনের দর্শনের ছাত্ররা দর্শন চর্চা করতে বসেই যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য ব্যাকুল হন, সে প্রশ্নটি হ'ল দর্শন কি? এই প্রশ্নটি, বলার কোন প্রয়োজন নেই, একটি মামুলী প্রশ্ন। এতই মামুলী প্রশ্ন যে পরীক্ষার্থীরাও এই প্রশ্নের উত্তর তৈরী করে, মানে মুখস্থ করে পরীক্ষা কক্ষে যায়। তবু এই প্রশ্নটিকে আজকের দর্শনের প্রশ্ন বলছি; এরূপ বলার অর্থ এ নয় যে আমি প্রশ্নটিকে নিত্য প্রশ্ন বলে মনে করি। কোন প্রশ্ন নিত্য প্রশ্ন কি না, বা যে প্রশ্ন নিত্য প্রশ্ন তা

* আচার্য গিরিশচন্দ্র ছাত্রাবাসে সারস্বত সম্মেলনে পঠিত।

সত্যই প্রশ্ন কি না, এ নিয়ে আমি আলোচনা করব না, বা, এ বিষয়ে আমার মত যদি কোন মত থেকে থাকে, তা প্রকাশ করব না। এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয়, যে অনেক সময় একই প্রশ্নবাক্য বিভিন্ন যুগে উপস্থাপিত হয়, আর তা থেকে আমাদের মনে এই ভ্রান্ত ধারণা জন্ম গ্রহণ করে যে একই প্রশ্ন সকল যুগেই উপস্থাপিত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রশ্নবাক্যটি প্রশ্ন নয়। এই বাক্যটিকে অবলম্বন করে যা উপস্থিত হচ্ছে তাই প্রশ্ন, আর এমনও হতে পারে যে একই প্রশ্নবাক্যকে অবলম্বন করে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রশ্ন সুধী সমাজের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। দর্শন কি প্রশ্নটির ক্ষেত্রে অন্ততঃ একথা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। দর্শনের স্বরূপ নিয়ে আমরা যুগে যুগে মাথা ঘামিয়েছি—কিন্তু একই প্রশ্ন নিয়ে যে আমরা মাথা ঘামিয়েছি তা নয়। এযুগে দর্শন নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা যখন প্রশ্ন তোলেন দর্শন কি, তখন তাঁরা কোন মামুলী প্রশ্ন তোলেন না। তাঁরা যে প্রশ্ন তোলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েই, তাঁদের দর্শন চর্চার একটি দিকের কথা বলব।

বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কথা প্রায় স্বতঃ সিদ্ধ। কিন্তু এই বিজ্ঞানের বয়স কত? গ্যালিলিওর তিরোভাব হয়েছে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে, আর বেকনের নোভাম বার হয়েছে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে। আজ হ'ল ১৯৫৮। এ বিজ্ঞানের বয়স চারশ বছরের বেশী নয়। কিন্তু দর্শন? তার বয়সের গাছ পাথর নেই। তবু বিজ্ঞান যে ফল প্রসব করেছে, তার সঙ্গে দর্শনের তুলনা করার প্রশ্নই ওঠে না। দর্শন প্রবীণ, প্রাচীন, বনেদী—কিন্তু কোন সর্ববাদিসিদ্ধ বাক্য প্রদানে অক্ষম। বিজ্ঞানের সব বাক্যই যে সর্ববাদিসিদ্ধ তা নয়। মতানৈক্য বিজ্ঞানেও আছে। কিন্তু কি ভাবে এই অনৈক দূর করা যেতে পারবে, কিরূপ তথ্য সংগ্রহ করতে পারলে, কোন বিবাদাস্পদ বাক্য নির্বিবাদ হতে পারবে এ নিয়ে কোন অনৈক্য নেই। দর্শনে শুধু অনৈক্যই নেই, অনৈক্য দূর কেমন ভাবে করব, তা নিয়েও কোন ঐক্য নেই। তাই এ যুগে যাঁরা দর্শন চর্চা করে থাকেন, তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, দর্শন কেমন জিনিষ? একি স্বভাবতঃ, স্বরূপতঃ নিবৃত্তিশূন্য সপিল তর্ক-কূট-প্রবাহ মাত্র?

এ প্রশ্নটি অর্থাৎ এই আকারের প্রশ্নটি এ যুগের দর্শনের ছাত্ররাই তুলছেন না। আগেও তোলা হয়েছিল। বিজ্ঞান চর্চার প্রথম যুগে দেকার্তে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। লক, হিউম, কাণ্ট এঁরাও তুলেছিলেন। তবু তাঁদের প্রশ্ন হতে এ যুগের প্রশ্নের পার্থক্য আছে। পার্থক্যের নির্দিষ্ট রূপটি পরে বলব। এখন কেবল এটুকুই বলি যে সাংকেতিক ন্যায় Symbolic Logic, প্রচলিত হবার পর থেকে, বিজ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বাক্য সম্পর্কে আমরা বর্তমানে

অনেক কথা নৈয়ায়িক রীতিতে বলতে পারি, আর সেজন্য বিজ্ঞান হতে দর্শনের পার্থক্যও আমরা নৈয়ায়িক রীতিতে দেখাতে পারি। এটা আগের দিনে সম্ভব হত না। তাই দর্শনে আমরা যে সর্ববাদিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পারছি না, বা কোন সিদ্ধান্তকেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে না পারছি প্রতিষ্ঠা করতে, না পারছি খণ্ডন করতে, অথবা যে কোন দার্শনিক বাক্য ও তার পরিপূর্ণ বিরোধী বাক্যকে যে প্রমাণ করতে পারা যায়, দার্শনিক সিদ্ধান্তই মাত্রই যে সৎপ্রতিপক্ষিত, এই সব অভিযোগই আমরা পূর্বে আনতাম। কিন্তু দার্শনিক বাক্যগুলির নৈয়ায়িক মর্যাদা কেমন, তা বলতে পারতাম না। তাই বিজ্ঞান চর্চার প্রথম যুগে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির পাশে দর্শনের গতিহীনতাকে স্থাপন করে, এ প্রশ্ন আমরা করেছি, দর্শন কি সম্ভব বা দর্শন কেমন জিনিষ? আজকেও আমরা এ প্রশ্ন করছি। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপিত করছি ভিন্নভাবে—তাই প্রশ্নটি ঠিক এক নয়। আগে আমরা এ প্রশ্নের যে উত্তর দিতাম, এখন আর সে উত্তর দেওয়া যাবে না। প্রশ্নের প্রশ্নসত্তা উত্তরসত্তা নিরূপিত, উত্তরসত্তা পৃথক হচ্ছে—অতএব প্রশ্নসত্তাও পৃথক; আমার বক্তব্যকে এভাবে যদি কেউ সাজিয়ে নেন, তাহলে আমি কোন আপত্তি করব বলে মনে হয় না।

যাই হোক, আজকের দিনে যখন আমরা দর্শন চর্চা করতে যাই তখনই বিজ্ঞানের সঙ্গে তার তুলনা না করে পারি না। এর কারণ এই নয় যে আজকে বিজ্ঞান পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। তাই যদি কেবল এই তুলনার হেতু হত, তাহলে কাব্য চর্চা করবার সময়ও আমরা এ তুলনা করতাম, এবং কাব্যের উক্তিকে বৈজ্ঞানিক মাপ কাঠিতে মাপবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু তা আমরা করি না। কবি মানসে বিজ্ঞানের প্রভাব থাকে—সে প্রভাব কাব্যে ধরা পড়ে, ছাপ রাখে। তবু কাব্য কাব্যই থাকে। কবিকর্ম বিজ্ঞানী কর্মগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় না। আমরা কাব্য চর্চাকে বিজ্ঞান চর্চার পাশে রেখে তার স্বরূপ ও প্রয়োজন নির্ণয় করতে বসি না। তাই বিজ্ঞানের সাধারণ মর্যাদা থাকার জন্যই বা ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্রেই তার উচ্চ আসন থাকার জন্যই যে আমরা দর্শন চর্চাকে বিজ্ঞান চর্চার সঙ্গে তুলনা করি, তা নয়। এ তুলনার হেতু বিজ্ঞা নর ঔজ্জ্বল্য ও দর্শনের প্রভাহীনত্বই নয়। অন্য হেতু রয়েছে।

সেই হেতুটি খুঁজতে হলে দর্শন বা Philosophyর উৎস সন্ধান করতে হবে। আমাদের ভারতবর্ষে দর্শনের উদ্ভব হয়েছিল তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে মোক্ষ লাভের জন্য। অর্থাৎ দর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষ। এ শাস্ত্রের প্রকৃতি অধিকারী ছিলেন মুমুক্ষুরা। যদি দেখা যেত যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করলেও মোক্ষ লাভ হয়,

বা তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষ লাভের সহায়ক নয়, বরং পরিপন্থী, বা, তত্ত্বজ্ঞান লাভ অপেক্ষা সহজ কোন পথ মোক্ষ লাভের আছে, তাহলে ভারতে আমরা দর্শন চর্চা করতাম কি না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। 'সন্দেহ আছে, ইচ্ছা করেই বলছি। অর্থাৎ আমার বিশ্বাস আছে যে আমাদের অর্থাৎ মননশীল ব্যক্তি মাত্রেরই একটি দার্শনিক সত্তা আছে, আর তাই দর্শন যদি কোন প্রয়োজন নির্বাহ নাও করে তাহলেও আমরা দর্শন চর্চা করব। দার্শনিক সত্তায় সত্তাবান্ ব্যক্তি যে প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিলেন না তা নয়। এমন কি ভারতে যত দর্শনের গ্রন্থকার ছিলেন, তাঁরা সকলেই যে মুমুক্ষু ছিলেন, অথবা মোক্ষের উদ্দেশ্যে দর্শন চর্চা করতেন, এবং বিশুদ্ধ দর্শন চর্চায় রস পেতেন না, তা মনে হয় না। বৈশেষিক দর্শনের সূত্রকার যে অভ্যুদয় সিদ্ধির কথা বলেছেন, তার গভীর তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়। তাই 'সন্দেহ আছে' কথাটি বলেছি। যাই হোক, আমরা এদেশে দর্শন বলতে যা বুঝেছি, তার সঙ্গে মোক্ষের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ সেইরূপ সম্বন্ধ যে আছে, যেরূপ সম্বন্ধ Philosophyর নাই -একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। Philosophyর মূলে রয়েছে বিচারভিত্তিক. ন্যায়ানুগ, তর্কিত বিশ্বব্যাখ্যা লাভের প্রয়াস। আমাদের সত্তার যে অংশ আমাদের বিজ্ঞানী করে, সেই অংশই আমাদের দার্শনিক করেছে। বিজ্ঞানের জ্ঞাতি দর্শন। তাদের হাঁড়ি এক। তাই দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের তুলনা না করে আমরা পারি না। ইংরাজী ভাষা আমাদের রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা করবার প্রস্তাবে আমরা তত বিচলিত হই না, যত বিচলিত হই, আমাদের বাংলা ভাষারই মত একটি প্রাদেশিক ভাষাকে করবার প্রস্তাব করলে। এক জ্ঞাতির উন্নতি হলে অপর জ্ঞাতির উন্নতির অভাব চোখে পড়বেই। বিজ্ঞানের প্রসার তাই দর্শনের সঙ্গে তার তুলনার হেতু। বিজ্ঞানকে এগিয়ে যেতে দেখে তাই দর্শনের ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করতে হয়, দর্শন আগেও যেখানে ছিল এখনও সেখানে আছে, বিজ্ঞান কিন্তু এগুচ্ছে, এর হেতু কি? বিজ্ঞান কি যেরূপ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, সেরূপ প্রশ্নের উত্তর দেয় বলেই এত সাফল্য লাভ করেছে? অথবা যেরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে, সেরূপ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে বলেই, এত সাফল্য পেয়েছে? সংক্ষেপে বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে আছে কি তার বিষয়বস্তু, অথবা পদ্ধতি, অথবা উভয়ই নিরূপ্য নিরূপকরূপে, এবং দর্শনের গতি-হীনতার মূলে আছে কি এদের অন্যতমের অভাব?

আগেই বলেছি এ প্রশ্ন এই প্রথম তোলা হচ্ছে না, যদিও নবরীতিতে হচ্ছে। এখন আমার কর্তব্য এই নবরীতিটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া। নবরীতিতে

বিজ্ঞান বলতে এক রকম ভাষা ব্যবহার বোঝা হয়। অর্থাৎ কোন বৈজ্ঞানিক বাক্যের বৈজ্ঞানিকত্ব নির্ভর করে, বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকৃত বাক্য গোষ্ঠীর মধ্যে স্থান লাভের উপর, সত্য বা মিথ্যা হওয়ার উপর, this is বা this is not the case হওয়ার উপর, তদ্‌বতি তৎপ্রকারক বা অতদ্‌বতি তৎপ্রকারক জ্ঞানের বাণীরূপ হওয়ার উপর নয়। অবশ্য আমরা মনে করি যে বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকৃত বাক্যগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পেলে বাক্যটি সত্য হতে পারে—কিন্তু হতে পারে এই মাত্র; হবেই বা হয়েছে নয়। এমনও অনেক বাক্য আছে যা নিউটনের সময়ে পদার্থ বিজ্ঞানের যে বাক্য-গোষ্ঠী ছিল তাতে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে স্থান পেত; কিন্তু পরবর্তী যুগের পদার্থ বিজ্ঞানে পায় নেই। আর বর্তমানে নিউটনের সময় যেমন একটি নির্দিষ্ট বাক্যগোষ্ঠী পদার্থ বিজ্ঞানের ছিল, তেমন নেই; এবং জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানে পদার্থ বিজ্ঞানে যাও বা আছে তাও নেই। সুতরাং কোন একটি বাক্য যদি বৈজ্ঞানিক বলে গৃহীত বাক্যগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান না পায়, আমরা সে বাক্যকে সন্দেহের চোখে দেখব, বৈজ্ঞানিক আখ্যা দেব না; কিন্তু তাকে মিথ্যা বলতে, অন্ততঃ এই হেতুতে, মিথ্যা বলতে পারব না। কারণ বৈজ্ঞানিক বলে যে বাক্য-গোষ্ঠীকে স্বীকরে করেছি, তা বৈজ্ঞানিক বটে, কিন্তু সত্য কি? এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কোন বাক্য সত্য আর কোন বাক্য মিথ্যা তা নির্ণয় করবার কোন মাপকাঠি নেই। যে মাপকাঠি আছে তার দ্বারা বাক্যটি বৈজ্ঞানিক কি না এই বলা যায়। কথাটিকে একটা স্থূল দৃষ্টান্তের সাহায্যে বলতে বলতে পারি। এ দৃষ্টান্ত দেওয়ার উদ্দেশ্য এই নয় যে উপরে সামান্যমুখী শব্দের দ্বারা যে কথা বলা হয়েছে তা অস্পষ্ট বলে বিশেষমুখী শব্দের দ্বারা তাকে মূর্ত করে তোলা। এ উদ্দেশ্য আমার নয়। কারণ ওপরে যা বলেছি, তা অস্পষ্ট নয়—আর ছবির সাহায্যে একে স্পষ্ট করতে গিয়ে অস্পষ্টই করে ফেলতে পারি। তবু দৃষ্টান্তটি দিচ্ছি—উপভোগ্য হবে বলে, আর অস্পষ্টকে স্পষ্ট না করলেও, স্পষ্টকে অস্পষ্ট না করে অধিক স্পষ্ট করবে বলে। যাই হোক, আমার দৃষ্টান্তটি এই : আমরা প্রায়ই অসুখে ভুগি। অনেক ডিগ্রিধারী, মোটা মোটা ফি অক্লেশে গ্রহণকারী, মিষ্টভাষী ডাক্তারের কাছে যাই। (তাঁদের নিন্দে করছিনা—বা তাঁদের বিরুদ্ধে কোন প্রোপাগ্যাণ্ডা করছি না) কিন্তু অনেক সময় আমাদের অসুখ বেড়ে যায়, ব্যাধির চেয়ে আধি হয়ে যায় বড়। সেই সময়ে হয়ত, যদি বরাতে মৃত্যু না লেখা থাকে, গৃহিনীর বাল্যসখীর আপন পিস্‌শাশুড়ীর ছোট জায়ের বকুলফুলের দেওয়া কোন মুষ্টিযোগ, বা জলপড়া, বা ঝাড়ফুঁক, বা ঐ রকম কিছু একটা মিলে যেতে

পারে, আর বরাতে মৃত্যু নেই, বা এই বিচিত্র ব্যবস্থাতেই সারবার কথা বিধাতা-পুরুষ সূতিকা গৃহে কপালে লিখে গিয়েছিলেন বলে, একেবারে সেরে যেতে পারি। তবু যে চিকিৎসা সারাল তা চিকিৎসা নয়, আর যে চিকিৎসা মারতে বসেছিল তাই চিকিৎসা। তেমনই বৈজ্ঞানিক বাক্যগোষ্ঠীতে স্থান পায় না যে বাক্য তা সত্য হলেও গ্রাহ্য নয়—বৈজ্ঞানিক নয়, এবং বৈজ্ঞানিক বাক্যগোষ্ঠীতে স্থান পায় যে বাক্য তা মিথ্যা হলেও গ্রাহ্য। বৈজ্ঞানিকতা সত্যতা নয়, ভাষাতান্ত্রিকতা ভাষা, প্রাস্থানিকতা। বিজ্ঞান এক রকম ভাষা ব্যবহার।

এই ভাষা ব্যবহার দু রকমের হতে পারে। কারণ যে সংকেত সমূহের বিন্যাস ভাষা সেই সংকেতগুলি অনুভূত তথ্যকে, জাগতিক ঘটনাকে সংকেতিত করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। যে ভাষার সংকেতগুলি জাগতিক ঘটনাকে সংকেতিত করে না, সে ভাষাতন্ত্রটি নিছক formal আকারগত, তার আছে কেবল syntax, বিশ্লেষণপূর্বক প্রাপ্ত বাক্যের প্রাপ্তি প্রণালী। কিন্তু যে ভাষার সংকেতগুলি জাগতিক ঘটনাকে, অনুভূত তথ্যকে সংকেতিত করে সেই ভাষায় নৈয়ায়িক রীতিতে, formal calculus-এর সাহায্যে বাক্য উৎপাদন প্রণালীর অতিরিক্ত কিছু থাকে, থাকে অনুভবের সাহায্যে সংকেতসমূহকে বোঝবার নিয়ম, semantic rules। গণিতের ভাষা প্রথম প্রকারের, পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষা দ্বিতীয় প্রকারের। প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান formal system। এখানে কোন বাক্য বৈজ্ঞানিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত বাক্যগোষ্ঠীতে স্থান পাবে কি না তা নির্ণীত হবে বিরোধ বাধক নীতির সাহায্যে। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞানে এর অতিরিক্ত কিছুর প্রয়োজন। এখানেও নৈয়ায়িক পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়, কিন্তু অনুভবও প্রয়োজন। অনুভবের সাহায্যে আমরা সরলবাক্যগুলির মূল্য নির্ণয় করে নিই, তারপর নৈয়ায়িক পদ্ধতি প্রয়োগ করে নির্ণয় করি মিশ্র বা যৌগিক বাক্যগুলির মূল্য। যেমন, মনে করা যাক, হরির মাথায় টাক আছে, এবং তার মুখে দাড়ি থাকে, বাক্য দুটি সরল বাক্য। তারপর নৈয়ায়িক পদ্ধতি, প্রয়োগ করে আমরা অনেক যৌগিক বাক্য অথবা এদের উপর নির্ভর করে এমন বাক্য রচনা করে নিতে পারব। যেমন, হরির মাথায় টাক নাই, তার মুখে দাড়ি নাই, হরির মাথায় টাক এবং মুখে দাড়ি আছে, যদি হরির মাথায় টাক থাকে তাহলে তার মুখে দাড়ি আছে, হয় হরির মাথায় টাক আছে অথবা তার মুখে দাড়ি আছে, হরির মাথায় টাক আছে কিন্তু মুখে দাড়ি নাই ইত্যাদি। এর পর অনুভবের সাহায্যে আমরা সরল বাক্য দুটির যাথার্থ্য নির্ণয় করে দেখতে পারি, এবং তারপর আর অনুভবের

সাহায্য না নিয়েই অন্য বাক্যগুলির মূল্য কেবল ন্যায় প্রয়োগ করেই স্থির করে ফেলতে পারি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে বৈজ্ঞানিক বাক্য দু রকমের, এক রকম আকার সর্বস্ব, এবং অন্য রকম অনুভব সাপেক্ষ, অনুভবের সাহায্যে পরীক্ষণ যোগ্য। অনুভবের সাহায্যে পরীক্ষণ যোগ্যতার একটি বিবৃতি আমরা দিয়েছি। এই বিবৃতিটি ভিৎগেনষ্টাইনের ট্র্যাক্‌টেটাস্ গ্রন্থ অনুযায়ী। এই বিবরণের মধ্যে অনেক রকম ত্রুটি বর্তমানে অনেকে লক্ষ্য করেছেন, তাই এর অনেকাংশে পরিবর্তন করা হয়েছে। যেমন যে সরল বাক্যের কথা এই বিবরণে বলা হয়েছে সে রকম সরল বাক্য অঙ্গীকার করতে অনেকেই চান না। তাই তাঁরা যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যের সাহায্যে অনুভবে রূপান্তরিত করে, তার আনুভাবিক মূল্য নির্ণয় করার কথা বলেন না; বা অনুভবের সাহায্যে পরীক্ষণ যোগ্য, এই কথাটিকে এভাবে বোঝেন না। তাঁরা যা বোঝেন তা সংক্ষেপে বলতে চাইলে বলতে হয় যে বৈজ্ঞানিকদের একটি সমাজ আছে, আর এই সমাজে এক একটি ভাষাতন্ত্র এক এক যুগে অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মর্যাদা পায়। সুতরাং অনুভবের সাহায্যে পরীক্ষণ যোগ্য হওয়ার অর্থ হল এই ভাষাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা। যাই হ'ক বৈজ্ঞানিক বাক্য দু রকমের—আকার সর্বস্ব, যেমন নৈয়ায়িক, গাণিতিক এবং অনুভবের সাহায্যে পরীক্ষণ যোগ্য যেমন পদার্থ-বৈজ্ঞানিক। এখন, এই দু রকমের বাক্যের মধ্যে প্রথম রকমের বাক্যে জগৎ সম্পর্কে কোন কথাই বলা হয় না। এরা factual নয়, তথ্য সম্পর্কিত নয়। তথ্য সম্পর্কিত বাক্য, দ্বিতীয় রকমের বাক্য। সুতরাং আমরা এই নিয়ম করতে পারি যে তথ্য সম্পর্কিত বাক্য অনুভবের সাহায্যে পরীক্ষণযোগ্য বাক্য। অথবা এমন কোন বাক্য যদি থাকে যা তথ্য সম্পর্কিত, কিন্তু অনুভবের সাহায্যে পরীক্ষণযোগ্য নয়, তাহলে সে বাক্যকে প্রকৃত পক্ষে তথ্য সম্পর্কিত বলা যাবে না, এমন কি অর্থহীন বলতে হবে।

এই ভাবে তথ্য সম্পর্কিত বাক্যের নিয়ম স্থাপন করে, আমরা দর্শনের বাক্যগুলির স্বরূপ এ যুগে নির্ণয় করতে যাই, আর সেইজন্যই প্রশ্ন করি দর্শন কি? এ যুগে যাঁরা দর্শন চর্চা করেন, তাঁরা যখন প্রশ্ন তোলেন দর্শন কি, তখন তাঁরা এই প্রশ্নই করেন, দর্শনের বাক্যগুলি কেমন? এরা কি আকার সর্বস্ব? অথবা এরা তথ্য সম্পর্কিত? আগে আমরা তথ্য সম্পর্কিত বাক্য সম্পর্কে যা বলেছি তা থেকে বিনা আয়াসেই বুঝতে পারা যাবে যে দর্শনের বাক্যগুলি তথ্য সম্পর্কিত নয়। অর্থাৎ তথ্য সম্পর্কিত হওয়ার অর্থ, অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, অনুভবের সাহায্যে নিরাকৃত হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া, সমাজসিদ্ধ আনুভবিক বাক্য-

গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মত হওয়া। আবার অনুভবের সাহায্যে নিরাকৃত হওয়ার যোগ্যতা সেখানেই আছে আমরা বলতে পারি, যেখানে কোন বাক্য খণ্ডন করবার জন্য, অপর পক্ষ দলনের জন্য, পরীক্ষাগারে, প্রয়োগশালায়, নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে তথ্য সংগ্রহ আছে। দর্শনে এই জিনিষটি নেই। আমরা এমন কোন দার্শনিকের কথা জানি না যিনি তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করবার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অনুভবের সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক থাকার জন্য আমরা পদার্থ বিজ্ঞানের বাক্যগুলিকে তথ্য সম্পর্কিত বলতে পারি, দর্শনের বাক্যগুলির অনুভবের সঙ্গে সে রকম সম্পর্ক না থাকায় এদের আমরা তথ্য সম্পর্কিত বলতে পারি না। তেমনি সমাজসিদ্ধ বাক্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা তখনই ওঠে, যখন সমাজ বলে একটা কিছু আছে। বৈজ্ঞানিকের সমাজ আছে, সুতরাং সামাজিক বাক্যগোষ্ঠীও আছে। কিন্তু দার্শনিকের কোন সমাজ নাই। দর্শন চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরা সাধারণতঃ বিশেষ নিরীহ, মোলায়েম, ও মোটামুটি রসিক হন; কিছু কিছু সামাজিক গুণও তাঁদের থাকে। একেবারে বেসামাজিক তাঁরা নাও হতে পারেন। কিন্তু তবুও দার্শনিক সমাজ বলে কোন সমাজ নেই। দার্শনিকরা নিজে নিজে কথা বলেন। একথা সত্য যে, তাঁরা বই পত্র লেখেন, সভা সমিতিও করেন, এমন কি তেমন কোন পেশাদারী রাজনৈতিক নেতার পাল্লায় পড়ে আমাদের দাবী মানতে হবে বলে রাস্তায় শোভাযাত্রাও করতে পারেন, তবু তাঁদের কোন সমাজ নেই। সমাজ থাকতে হলে প্রথমেই এমন একটি ভাষা থাকা চাই যা সার্বজনীন। আর দর্শনে এই সার্বজনীন ভাষাই নেই। দার্শনিকে দার্শনিকে ততক্ষণই কথা চলে, যতক্ষণ অদার্শনিক, লৌকিক ভাষা তাঁরা ব্যবহার করেন এবং যখনই তাঁরা লৌকিক ভাষা ত্যাগ করে নিজ নিজ ভাষা ব্যবহার করেন, তখনই যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ। তাই দার্শনিক বাক্যগুলিকে তথ্য সম্পর্কিত বলতে আমরা পারি না। এজন্য যে এদের আকার সর্বস্ব বলব তাও হবে না। কারণ তথ্য সম্পর্কিত হওয়া এদের অভিপ্রেত। আর আকার সর্বস্ব ভাষাতন্ত্র, যেমন ন্যায় বা গণিত, যে কাজ করে, যেমন বিভিন্ন বাক্যের প্রসক্তির সম্পর্ক নির্ণয়, যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তরণ ইত্যাদি, এ কাজও দর্শনের বাক্যের দ্বারা হতে পারে না। অতএব, দর্শনের বাক্যগুলি ঘরেও নহে, পারও নহে, আকার সর্বস্বও নহে, তথ্য সম্পর্কিতও নহে, এবং এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রশ্ন কে ডেকে নেয় তারে ?

এই প্রশ্নটিই এযুগে যাঁরা দর্শনের চর্চা করেছেন, তাঁদের মনে প্রথমে আসে। এর উত্তর কি দেন তাঁরা? এক উত্তর দেন না, অনেক উত্তর দেন, অর্থাৎ

বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন উত্তর দিয়ে থাকেন। এই উত্তরগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি। তার আগে, meta physics বলে যে কথাটি পাশ্চাত্য দর্শনে প্রচলিত আছে, তার সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। এ কথাটি আমরা পেয়েছি এরিষ্টটলের গ্রন্থাবলীর এক সম্পাদকের কাছ থেকে। তিনি এই কথাটি শাস্ত্রীয় বিষয় বাচক কথারূপে ব্যবহার করেন নাই, ব্যবহার করেছিলেন, এক খণ্ড গ্রন্থের পরিচায়ক নামরূপে। কিন্তু কালক্রমে নামটি শাস্ত্রীয় বিষয়বাচক নাম হয়ে গেছে, আর এই রূপান্তরের হেতু হল, ওই গ্রন্থখণ্ডে এমন কয়েকটি বিষয় নিয়ে এরিষ্টটল আলোচনা করেছিলেন যা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন তাঁর পরে আরও অনেকে অনুভব করেছিলেন, এবং সেই আলোচ্য বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিষয়বাচী রূপে একটি নামও তাঁরা চেয়েছিলেন। মেটা ফিজিক্স্ তাই চলে গেছে। যাই হোক, এই শাস্ত্রের বিষয় হল : শুদ্ধ সত্তা, ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানের পূর্বস্বীকৃতি। শুদ্ধ সত্তা, বলতে বোঝা হল, কোন বিশেষ সত্তা, যেমন জড়সত্তা বা প্রাণসত্তা, বা আত্মিক সত্তা নয়, সর্ববিশেষণ বর্জিত শুদ্ধ সত্তা। ঈশ্বর বলতে কি বোঝা হল, তা আর বলবার প্রয়োজন নেই, তবে এটুকু বলতে হবে যে অনেকে ঈশ্বর ও বিশুদ্ধ সত্তাকে এক বলে মনে করলেন। আর বিজ্ঞানের পূর্বস্বীকৃতি বলতে এই শুদ্ধ সত্তাও বোঝা হল, আরও বোঝা হল বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানগুলি তাদের আলোচনা করবার জন্য যে সব মূল কথা, তত্ত্ব ও নীতি, category ও principle মেনে নেয় তাদের আলোচনা। এই শাস্ত্রের আরও নাম এই জন্য হয়ে গেল, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান : অর্থাৎ বিজ্ঞানের পূর্বস্বীকৃতির বিশ্লেষণ এ শাস্ত্র করবে এবং শুদ্ধ সত্তার স্বরূপ নির্ণয় করে বিজ্ঞান সত্তার যে খণ্ড খণ্ড চিত্র অঙ্কন করে থাকে, তাকে একত্রিত করে এক মহাচিত্র রচনা করবে। আবার ধর্মচেতনায় ঈশ্বরকে সর্বব্যাপক বলা হয় বলে, এই মহাচিত্র ঈশ্বরচিত্রই হবে, এবং আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন, নীতিচেতনা, শিল্পচেতনা, এদের স্বরূপ বিশ্লেষণও এই শাস্ত্র করবে।

মেটাফিজিক্স্ বলতে সাধারণতঃ কি বোঝা হয়, তা দেখা গেল। এখন এ প্রবন্ধের এতক্ষণ পর্যন্ত দর্শন কথাটি এই মেটাফিজিক্স্ অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। মেটাফিজিক্স্ কথাটিকে অনেকেই তত্ত্ববিদ্যা বলে অনুবাদ করেছেন, পরাবিজ্ঞানও বলা যায়। সুতরাং এখন প্রশ্ন হল পরাবিজ্ঞানের স্বরূপ কি, অথবা পরাবিজ্ঞান সম্ভব কি ?

পূর্বেই তথ্য সম্পর্কিত বাক্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা হতে বোঝা গেছে যে বিজ্ঞানের বাক্যের মত পরাবিজ্ঞানের বাক্য তথ্য সম্পর্কিত নয়। আবার এর

বাক্যগুলি আকার সর্বস্বও নয়। তবে এগুলি কোন জাতের বাক্য? এ যুগের এক সম্প্রদায়ের দার্শনিকের মতে পরাবিজ্ঞানের বাক্যগুলি বাক্যই নয়, অথবা অর্থহীন বাক্য, অথবা বিজ্ঞানের বাক্যের মত তথ্য সম্পর্কিত নয়, কাব্যের বাক্যের মত বাক্যকার প্রকাশক। অর্থাৎ বাক্য—বৈজ্ঞানিক বাক্য, অর্থপূর্ণ বাক্য দু প্রকারের। পরাবৈজ্ঞানিক বাক্যগুলি কোন প্রকারেরই নয়, সুতরাং বাক্য বা অর্থপূর্ণ বাক্যই নয়। এগুলিকে দেখতে বিজ্ঞানের বাক্যের মত কিন্তু আসলে এরা কাব্যের উক্তির মত। কবি যখন বলেন কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি, কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক তখন কৃষ্ণকলির সম্পর্কে কোন সংবাদ তিনি দান করেন না। যে সংবাদ তিনি দান করেন, তা হল নিজের সম্পর্কে—একদিন তিনি যে ময়না ডাঙার মাঠে দেখে একটি বালিকাকে মুগ্ধ হয়েছিলেন, এই সংবাদ। তেমনই পরাবৈজ্ঞানিক বাক্যগুলি তথ্যবিষয়ক কোন সংবাদ দেয় না। অন্ততঃ পক্ষে ঐ বাক্যগুলি যে তথ্য-বিষয়ক সেই তথ্যসম্পর্কে কোন সংবাদ দেয় না। এরা যে সংবাদ দেয় তা হল, পরা-বিজ্ঞানীর মানস সম্পর্কে। কাব্যোক্তি সত্য কি মিথ্যা, তদ্‌বর্তি তৎপ্রকারক, কি অতদ্‌বর্তি তৎপ্রকারক এ প্রশ্ন অবান্তর। পরাবিজ্ঞানের বাক্যগুলিও তাই। যথার্থ দর্শনে বিজ্ঞানের পূর্বস্বীকৃতিগুলি আলোচিত, বিশ্লেষিত হয়; এবং বিভিন্ন বিজ্ঞানের বাক্য-গুলিকে তন্ত্রবদ্ধ করে, পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করা হয়। পরাবিজ্ঞান দর্শন নয়।

তাহলে পরাবিজ্ঞানকে নিয়ে আমরা কি করব? এদের মধ্যে কেউ বলেন, যে এর বাক্যগুলি যে অর্থহীন, এই আমরা অর্থপূর্ণ বাক্যের সামান্য নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে দেব। কেউ বলেন তা সম্ভব নয়, কারণ এই সামান্য নিয়ম যে সব বাক্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হবে সে বাক্যগুলিও এই জাতীয় বাক্যই হবে। সুতরাং যখন বিশেষ বিশেষ পরাবৈজ্ঞানিক সমস্যা উত্থাপন করা হবে, তখন আমরা সেই সমস্যা বাক্যকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দেব যে ভাষার অপব্যবহারের জন্যই এই এই সমস্যা উঠছে,—সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে সমস্যা নয়। এইভাবে dissolve করে solve করব। আবার কেউ কেউ বলেন আমাদের অবচেতন মন এখানে কাজ করছে। আমরা যে ভাষা ব্যবহারের অধীন হয়ে যাই, তার কারণ অবচেতন মনের ক্রিয়া। তাই মনোবিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতিতে উদ্বায়ুদের মনোবিশ্লেষণ করে তাদের বাতিক দূর করে থাকেন, আমরাও সেই রকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরাবিজ্ঞান নামক বাতিক দূর করে থাকেন, আমরাও সেইরকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে পরাবিজ্ঞান নামক বাতিক দূর করব। আবার অনেকে বলেন যে পরাবিজ্ঞানের জীবনের সঙ্গে এমন নিবিড়

সম্পর্ক আছে যে একে বিশ্লেষণ পূর্বক বাতিল করে দেওয়া উচিত হবে না। আমাদের এর যুক্তিরীতির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। দেখতে হবে যে এক এক দর্শনে যে এক একটি মূল উপমা থাকে তা কেন থাকে, এবং তার নৈয়ায়িক আচরণই বা কেমন। আরও অনেকে বলেন, যে পূর্বে আমরা যেভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যগুলিকে ভাগ করেছি, সে ভাগ অসম্পূর্ণ। আসলে, ঐ বিভাগের ক্ষেত্রে determinate, অবচ্ছিন্ন দিত বাক্যের কথাই মনে রাখা হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন অদিত বাক্যের কথা, চেতনার গোধূলি ক্ষণে যে বাক্য জন্মগ্রহণ করে সে বাক্যের কথা ভাবা হয় নাই। পরাবিজ্ঞানের রূপ বোঝবার জন্য এই রকমের বাক্যের ন্যায় রচনা করতে হবে। কিন্তু আরও অনেকে আছেন যাঁরা ভাবেন, এত বাদ-বিবাদ কেবল শুদ্ধসত্তা কথাটি ঠিকমত বুঝতে না পারার ফল। অর্থাৎ শুদ্ধসত্তা বলতে যদি এক বিমূর্ত মহাসামান্যকে abstract universal-কে বোঝা হয়, তাহলে পরাবিজ্ঞান, অর্থাৎ শুদ্ধসত্তা বিষয়ক বিজ্ঞান সম্ভব হতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে শুদ্ধসত্তা কোন মহাসামান্যের নাম নয়, এ হল সর্বপ্রকার বিশেষণ ত্যাগ করার পরও যে চৈতন্য-সত্তার অপরোক্ষ অনুভব আমাদের হয় সেই চৈতন্যসত্তার নাম। এই চৈতন্যসত্তা একান্ত অবিষয়। বিষয়রূপে এর কোন জ্ঞান হতে পারে না। তাই বিজ্ঞান একে তার আলোচ্য বিষয় করতে পারে না। মনোবিজ্ঞান নামক বিজ্ঞান এর বিজ্ঞান নয়। এই বিজ্ঞানেও অচেতন সূক্ষ্ম জড়ই বিষয়রূপে আলোচিত হয়ে থাকে। পরাবিজ্ঞানেই এই চৈতন্যসত্তা আলোচিত হয়—তবে বিষয়রূপে নয়। পরাবিজ্ঞানে স্বভাবতঃ বিষয়মুখী চিত্তকে অন্তর্মুখী করা হয়, যাতে এই নিত্যসিদ্ধ স্বয়ং প্রকাশ চৈতন্যসত্তা আবরণ-মুক্ত হতে পারে। আরও অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন পরাবিজ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবন হতে দূরে রাখার ফলে, এবং এর সিদ্ধান্তগুলিকে ইতিহাসের পরীক্ষাশালায় পরীক্ষা করতে না চাওয়ার ফলেই পরাবিজ্ঞানে আজ এই অনুপাদেয় অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হল পরাবিজ্ঞানকে আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ঐতিহাসিক চেতনার সঙ্গে তথা প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ করা। আবার আরও অনেকে আছেন, যাঁরা বলেন, বিজ্ঞানে যে জাতীয় অনুভবকে অবলম্বন করা হয়, সেই জাতীয় অনুভবই কেবল যথার্থ অনুভব নয়। অন্য প্রকার অনুভবও আছে। কৃতিচেতনা, সৃষ্টি অর্থাৎ শিল্পচেতনাও মূল্যবান। এদের আলোকে পরাবিজ্ঞানের বাক্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে, এবং নৈয়ায়িকরা যে অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলতেন সেই অনুমানের রহস্য অনুধাবন করলে দেখতে পাওয়া যাবে, এরা নিরর্থক নয়।

এই আমার সাম্প্রতিক দর্শন চর্চার একটি দিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরা-বিজ্ঞানকে কত ভাবে বর্তমানে দেখা হচ্ছে, তা বলেছি। এদের মধ্যে কোন দেখা ঠিক দেখা, বা মর্মগ্রাহী দেখা, তা বলতে চাইলে একটি বিশ্বকোষ রচনা করতে হয়, যার পাঠক হয়ত কোন কালেই পাওয়া যাবে না। তাই, এবং সময়ের জন্যও বটে, এইখানেই সমাপ্তি রেখা টানছি।

আত্মা ও চৈতন্যের সম্বন্ধ

শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য

স্বভাবতঃই মনে হয় যে, আমার 'জ্ঞান' ও 'আমি' এই দুইএর সম্বন্ধটি হইতেছে ধর্ম ও ধর্মীর সম্বন্ধ—জ্ঞান আমার ধর্ম, আমি জ্ঞানের ধর্মী। যদি বলা হয় যে, এই সম্বন্ধটি আসলে তাদাত্ম্য বা অভেদ, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে, আমি মানেই জ্ঞান, সুতরাং জ্ঞান না থাকিলে আমিও থাকিতে পারি না। কিন্তু ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে আমি অজ্ঞান হই, এবং মাঝে মাঝে আমার স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রাও হয়। তখন কি আমি নাই হইয়া যাই? ক্লোরোফর্মের প্রভাব অথবা সুষুপ্তি চলিয়া যাওয়ার পর, একটি নূতন আমি জন্মগ্রহণ করে কি? যদি আমার অজ্ঞান-অবস্থা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান ও আমি এক নই। অবশ্য, জ্ঞান ও আমি অভিন্ন না হইলেও, জ্ঞানের সহিত আমার সম্বন্ধ খুবই ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান ছাড়া আমার জীবনযাত্রাই চলিতে পারে না। সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি আমার অন্যান্য আত্মিক গুণের সহিত জ্ঞানও অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্তমান থাকে। বস্তুতঃ, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি জড় পদার্থের সহিত আমার যে অত্যন্ত মূলগামী পার্থক্য আছে, তাহা এই জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে—আমি চেতন, টেবিল চেয়ার প্রভৃতি অচেতন। তথাপি যেহেতু জ্ঞানের অভাবেও আমি বিদ্যমান থাকি, সেই কারণে জ্ঞানের সহিত আমার সম্বন্ধ অভেদ হইতে পারে না। আমি যদি আমার মধ্যে শুধু জ্ঞানই অনুভব করিতাম এবং জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই উপলব্ধি না করিতাম, তাহা হইলে হয়ত বলা যাইতে পারিত যে, জ্ঞান আমার ধর্ম নহে, উহা আমার স্বরূপই। কিন্তু আমিত আমাতে সুখ, দুঃখ প্রভৃতিও অনুভব করি। তাহা ছাড়া ইহারা সকলেই উৎপত্তি-বিনাশশীল, অথচ ইহাদের উৎপত্তি ও বিনাশের সহিত আমি উৎপন্ন ও বিনষ্ট হই, এইরূপ বলা চলে না। উহাদের তুলনায় আমি নিশ্চয়ই স্থায়ী পদার্থ। অতএব আমি উহাদের ধর্মী এবং উহারা আমার ধর্ম। জ্ঞানও এই ব্যাপারে সুখ দুঃখাদিরই মত। সুতরাং সুখ, দুঃখ প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানও আমার ধর্ম মাত্র, আমার স্বরূপ নহে। অবশ্য, আমার অন্যান্য ধর্ম অপেক্ষা জ্ঞানের গুরুত্ব অনেক বেশী।

উপরের মতটি আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অনুযায়ী হইলেও, বিচার করিয়া

দেখিলে উহাতে একটি দোষ লক্ষিত হইবে। সুখ, দুঃখ, জ্ঞান প্রভৃতি আমার ধর্মমাত্র হইলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার স্বরূপটি সুখ, দুঃখ, জ্ঞান প্রভৃতি হইতে ভিন্ন; এবং তখন প্রশ্ন উঠে, এই স্বরূপটি কি? বলা যাইতে পারে যে, আত্মত্ব বা আমিত্বই আমার স্বরূপ। কিন্তু এই উত্তর সন্তোষজনক নহে। কারণ, জ্ঞান, সুখ ইত্যাদি পদার্থ আমি যে রকম স্পষ্টভাবে নিজ অনুভূতিতে পাই, আত্মত্ব বা বা আমিত্বকে সুখ দুঃখাদি হইতে পৃথকরূপে সেই রকম স্পষ্টভাবে কখনও উপলব্ধি করিতে পারি না। অবশ্য, অনুরূপ প্রশ্ন ঘটপটাদি বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধেও উঠিতে পারে। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, ঘট পদার্থটি তৎসংশ্লিষ্ট রূপ, স্পর্শ ইত্যাদি হইতে ভিন্ন। কিন্তু রূপ স্পর্শাদি হইতে ভিন্ন ঘটের কোন স্বরূপ থাকিলে, তাহা কি? কিঞ্চিৎ বিচারান্তে লক্ষিত হইবে যে, রূপস্পর্শাদি হইতে পৃথক ঘট বলিয়া কোন পদার্থ বস্তুজগতে থাকিলেও, ঐ সব ধর্ম ব্যতীত উহার কোন ধারণা করাই সম্ভবপর নয়। প্রকৃত পক্ষে, ধর্মগুলিই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। ধর্মী ঘটটি আমাদের অভি-কল্পনার বিষয় মাত্র। অবশ্য এই অভিকল্পনা খামখেয়াল নহে। উহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান না হইলেও প্রত্যক্ষ জ্ঞানই উহার ভিত্তি। ঘটের বহু ধর্ম; তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি পরিবর্তনশীল, এবং কতকগুলি অত্যন্ত অল্পকাল-স্থায়ী; তথাপি এইসব ধর্ম এমন একটি কিয়ৎপরিমাণে স্থায়ী ঐক্যসূত্রে পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ, যাহার অভাব হইলে ঘটও বিনষ্ট হয়। ঘটীয় ধর্মগুলির এই ঐক্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরই প্রতিষ্ঠিত। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই স্থায়ী ঐক্যটিই ঘটের ঘটত্ব বা স্বরূপ, এবং এই ঐক্যদ্বারা সম্বদ্ধ রূপ, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি পদার্থ সমূহের সমষ্টি বিশেষই ঘট। বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হইবে যে, সচরাচর আমরা যে সব পদার্থকে কোন দ্রব্যের ধর্ম বা গুণ বলিয়া মনে করি, প্রকৃতপক্ষে সেইগুলি উক্ত দ্রব্যের উপাদান বা অংশ এবং দ্রব্যটি হইতেছে উহাদের দ্বারাই সংগঠিত একটি ঐক্যযুক্ত অংশী। 'আমি'-বস্তুর স্বরূপও একইভাবে নির্দ্ধারণ করার যোগ্য। আমার আমিত্ব বা আত্মত্ব হইতেছে, মৎ-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, সুখ, ইচ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যন্ত অল্পকাল স্থায়ী পদার্থের একটি বিশিষ্ট ঐক্য। আমি হইতেছি এইরূপ ঐক্যবদ্ধ বহু সুখ-দুঃখ-জ্ঞানাদির একটি সমষ্টি মাত্র।

ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি হইতে পারে যে, ঘটপটাদি দ্রব্যের বেলায় যাহাই হউক, আত্মার বেলায় এই উপপত্তি বা ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন। ঘটপটাদি বস্তুর এমন কতকগুলি ধর্ম থাকে, যাহা কিয়ৎপরিমাণে স্থায়ী হওয়ায় এইসব স্থায়ী ধর্মের একতাযুক্ত সমষ্টিটিকেও স্থায়ী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে; সুতরাং ঘটপটাদি

বস্তুকে তাহাদের ধর্মগুলির ঐক্যবদ্ধ সমষ্টি বলিয়া গ্রহণ করিলে, স্থায়ী ঘট এবং তাহার বিবিধ ও বহু স্থায়ী ও অস্থায়ী ধর্মের একটি সুন্দর উপপত্তি দেওয়া চলে। কিন্তু জ্ঞান, সুখ, প্রভৃতি আত্মধর্ম গুলির মধ্যে কোনটিই স্থায়ী নয় বলিয়া উহাদের সবগুলির সমষ্টি বা মিলিত রূপটি কোন কালেই সম্পূর্ণভাবে অস্তিত্ব লাভে সমর্থ হয় না। এই রকম কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী পদার্থের সমষ্টিকে স্থায়ী আত্মার স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করা কি করিয়া যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে?

এই আপত্তির উত্তরে হয়ত বলা হইবে যে, কতকগুলি অস্থায়ী বস্তুর ক্রম বা ধারার মধ্যেও একপ্রকার স্থায়ী একতা থাকা সম্ভবপর, এবং উহার দৃষ্টান্ত আমাদের অনুভবের মধ্যেই পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ, যে কোন গীতের উপাদান হইতেছে শুধু কয়েকটি ধ্বনি, গীত মানে এই সব ধ্বনির সুর ও তাল সমন্বিত এবং বিশিষ্ট পৌর্বাপর্য যুক্ত সংগ্রহ মাত্র; ধ্বনিগুলি একটির পর একটি উৎপন্ন হইয়া বিলীন হইয়া যায়; তথাপি সমগ্র সঙ্গীতের বিশিষ্ট ঐক্য অক্ষুণ্ণই থাকে। সেইরূপ, আত্ম-বস্তুর উপাদানগুলি উৎপত্তি বিনাশশীল ও ক্ষণিক হইলেও, আত্মার ঐক্য ও স্থায়িত্ব থাকা সম্ভবপর। আপত্তি হইবে যে, সঙ্গীতস্থ ধ্বনিসমুদায়ের মধ্যে একটি সুর-সঙ্গতি বা সুরসামঞ্জস্য থাকিলেও, সমগ্র সংগীতটি উহার সর্ব ধ্বনিসমুদায় লইয়া কখনও অস্তিত্বলাভে সমর্থ হয় না; তাই সঙ্গীত পদার্থটিকে স্থায়ী বলা সঙ্গত নহে। তাহা ছাড়া, অন্ততঃ এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, একটি গীতের উপাদানীভূত ধ্বনিগুলির প্রত্যেকটিই যখন নাই হইয়া যায়, তখন ঐ গীতের পরিসমাপ্তি ঘটে। এখন লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মাঝে মাঝে আত্মার উপাদানীভূত জ্ঞানসুখাদি অবস্থাগুলির সম্পূর্ণ বিরাম ঘটে; এই কারণে প্রশ্ন উঠে, তখন কি আত্মারও নাশ হয়? সুষুপ্তিতে কি আমার মৃত্যু ঘটে, এবং সুষুপ্তির পরে যে আমি উত্থিত হই, সেই আমি কি সদ্যোজাত নূতন আত্মা? জার্মাণ দার্শনিক লট্‌ৎসে সুষুপ্তি প্রভৃতি আত্মার অচেতন অবস্থাগুলিকে একটি গোটা সংগীতের অন্তর্গত নীরব ফাঁকা জায়গাগুলির সহিত তুলনা দিয়া, সুষুপ্তি ও উহার পূর্বাপর জাগ্রৎ অবস্থাতে একই আত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও সমগ্র আত্মার একই সময়ে অস্তিত্বের ব্যবস্থা হয় না। এই মত মানিলে বলিতে হইবে যে আমার আত্মার বহু উপাদান বিনষ্ট এবং বহু উপাদান অনুৎপন্ন—শুধু অতি ক্ষুদ্র বর্তমান অংশটিই প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ববান্। কিন্তু আমার আত্মার ঐক্য ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে এইরূপ বলা স্বানুভূতির বিরুদ্ধে যায় না কি? এই আপত্তির নিরসনে হয়ত বলা হইবে যে, আমার যে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশটি বর্তমান মুহূর্তে অস্তিত্ববান, তাহারই গর্ভে আমার অতীত জ্ঞানসুখাদি

অংশগুলির সংস্কার বা অজ্ঞাত প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ অংশগুলির বীজ বা প্রবণতা নিহিত আছে ; সুতরাং ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, আমি কতকগুলি স্বল্প-কালস্থায়ী ক্রমিক বৃত্তির সমষ্টিরূপ হওয়া সত্বেও, এইসব বৃত্তির প্রত্যেকটির মধ্যে আমি একটি বিশিষ্ট অর্থে সমগ্রভাবে অস্তিত্ববান্।

আমাদের বিবেচ্য মূল প্রশ্নটি হইতেছে, জ্ঞান ও আত্মার সম্বন্ধ কি ? প্রথম মতে, জ্ঞান আত্মার গুণ বা ধর্ম ; দ্বিতীয় মতে, জ্ঞান আত্মার একটি উপাদান বা অংশ। প্রথম মতের ত্রুটি দ্বিতীয়টিতে দূর হইয়াছে বটে ; কিন্তু প্রথমটির তুলনায়, দ্বিতীয়টি সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে কৃত্রিম বলিয়া মনে হইবে। যে সব উপাদানে আত্মা গঠিত, সুষুপ্তিতে তাহাদের অবর্তমানেও আত্মা বিদ্যমান থাকে, ইহা কিছু খাপছাড়া কথা নয় কি ? সঙ্গীতের অন্তর্গত ফাঁকা জায়গাগুলি হয় ত উহার ঐক্যসুষমার বিঘাতক না হইয়া বরং পরিপূরকই হইতে পারে ; তথাপি আমার আত্মার ঐক্য যে ঐরূপ সঙ্গীতের ঐক্যের ন্যায়, তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথম মতটি যে রকম বলে যে, বহু পরিবর্তমান অবস্থা ও ধর্ম-সত্বেও আমার আত্মা এমন একটি স্থায়ী দ্রব্য, যাহা আমার জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে, এমন কি সুষুপ্ত্যাদি অজ্ঞান অবস্থাতেও উহার সমগ্র স্বরূপ সহ বিদ্যমান থাকে, তাহাই আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে স্বাভাবিক ও সত্য বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আত্মার স্থায়িত্ব ও ঐক্যের যদি এমন একটি উপপত্তি দেওয়া যায়, যাহা আমাদের এই সাধারণ বিশ্বাসের দ্বারা সমর্থিত হয়, আবার যাহাতে প্রথম মতটির তাত্ত্বিক ত্রুটিও থাকে না, তাহা হইলে সেই উপপত্তিটি প্রথম ও দ্বিতীয় মতের পরিবর্তে গ্রহণ করা সযুক্তিক হইবে।

প্রথম মতের তরফে বলা যাইতে পারে যে, আত্মার একটা কিছু উপাদান দেখাইতে হইবে, এমন কি কথা ? পৃথিবীর সর্ব বস্তুই যে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত বিমিশ্র পদার্থ, এমন কোন অলঙ্ঘ্য নিয়ম নাই। বহু দার্শনিকের মত এই যে, পরমাণু, দেশ, আত্মা প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য অখণ্ড, নিরংশ অথবা অমিশ্র পদার্থ। এই মতের সপক্ষে যুক্তিরও অভাব নাই। এই মত গ্রহণ করিলে, সুষুপ্তিতে অর্থাৎ জ্ঞানাদি সর্ব চেতন ধর্মের অভাব ঘটিলে, আত্মা কোন্ উপাদানে গঠিত, এই প্রশ্ন অবান্তর বলিয়া প্রতিভাত হইবে। আমি যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আমার নির্বচনের জন্য 'আত্মা' বা 'আমি' শব্দই পর্যাপ্ত। আত্মত্ব একটি জাতি ; অন্ততঃ, উহা এমন একটি বিশিষ্ট ধর্ম, যাহা শুধু আত্মাতেই থাকে ; এবং জাতি অথবা এইরূপ বিশিষ্ট ধর্ম দ্বারা কোন বস্তুর নির্দেশ করিলে তাহার যথাযোগ্য নির্দেশই করা হয়।

কিন্তু এই মতটি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা

যাইবে যে, আত্মা শব্দ দ্বারা কোন পদার্থকেই অন্যকোন পদার্থ হইতে পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করা অসম্ভব। আত্মা শব্দের অর্থ যদি 'স্ব' বা 'নিজ' হয়, তাহা হইলে যে কোন পদার্থের বেলাতেই উহা প্রযোজ্য। এমন কি অচেতন বস্তু সম্বন্ধেও 'স্ব' বা 'নিজ' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। ঘটের কিংবা টেবিলের প্রকৃত 'স্ব'-রূপ কি, দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ প্রশ্ন তুলা হয়। ইংরাজী ভাষায় 'self' শব্দটি সর্বলিঙ্গ ও পুরুষ নির্বিশেষে সর্ব পদার্থ সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়। The book itself, she herself, I myself, you yourself প্রভৃতি প্রয়োগ সুপরিচিত। এই অর্থে, কোন কিছুকে 'স্ব', 'নিজ' অথবা 'আত্মা' বলিলে, তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কোন খবরই দেওয়া হয় না। সংস্কৃত ভাষায় যখন বলা হয়, "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি সুতৈরপি", তখনও আত্মা শব্দের ইহাই অর্থ। অবশ্য, বাংলা ভাষায়, এই অর্থে আত্মা শব্দের প্রয়োগ খুব কম। কিন্তু একেবারে নাই তাহা নহে। আমরা "আত্মপ্রশংসা", 'আত্মপরভেদ' প্রভৃতি কথা বলিয়া থাকি, তথাপি আমরা বাংলায় আত্মা বলিতে সাধারণতঃ উহাকেই বুঝাই, যাহাকে বক্তা নিজে অন্যের নিকট 'আমি' শব্দে নির্দেশ করে। কিন্তু এই আমি শব্দটিও 'স্ব' বা 'নিজ' শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। যে পদার্থই 'নিজের' সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে পারে, তাহাই এই নির্দেশের জন্য 'আমি' শব্দের প্রয়োগ করে। সুতরাং আমি শব্দ দ্বারা কোন পদার্থের স্বরূপই অন্য পদার্থের স্বরূপ হইতে পৃথক করিয়া দেখান সম্ভবপর নহে। টেবিলও যদি কথা বলিতে পারিত, তাহা হইলে নিজের সম্বন্ধে নির্দেশ দিতে 'আমি' শব্দেরই প্রয়োগ করিত। অর্থাৎ আত্মা শব্দ দ্বারা 'স্ব'—কেই বুঝান হয়; আমি শব্দ দ্বারাও তাহাই। অবশ্য আমি শব্দের প্রয়োগ শুধু বক্তা বা চিন্তক নিজে নিজের সম্বন্ধেই ব্যবহার করে। মোট কথা এই যে, 'সুষুপ্তিতে আত্মা থাকে', এইরূপ কথনের পরেও 'তখন আত্মার বা আমার স্বরূপটি কি?' এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকে। সুষুপ্তিতে আমি বিদ্যমান থাকিলে, আমার একটা কিছু স্বরূপ থাকে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি বলা হয় যে, এই স্বরূপটি হইতেছে আত্মত্ব, তাহা হইলে কোন নূতন কথাই বলা হয় না; শুধু ইহাই বলা হয় যে এই স্বরূপটি হইতেছে স্বরূপ।

অবশ্য, আত্মশব্দটি একটি বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে, আত্মা হইতেছে সেই পদার্থ, যাহাতে জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি ধর্ম উৎপন্ন হয়, যাহা এই সব ধর্মের ধর্মী। এই অর্থে, বলা যাইতে পারে যে, সুষুপ্তিতে এই ধর্মী পদার্থটি তাহার উক্ত ধর্মগুলি ছাড়াই বিদ্যমান থাকে। নৈয়ায়িকের ভাষায় বলা যায়, সুষুপ্তিতে জ্ঞানাদি পদার্থের অভাব থাকিলেও, উহাদের সমবায়ী

কারণ রূপ দ্রব্যটি বর্তমান থাকে, এবং এই সমবায়ী কারণ রূপ দ্রব্যই আত্মা। কিন্তু এখানেও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, উক্ত সমবায়ী কারণের কারণতাবচ্ছেদক ধর্মটি কি? কারণতা কোন বস্তুরই স্বরূপ হইতে পারে না; উহা শুধু তাহার পরিচায়ক বা লক্ষণ হইতে পারে। হয়ত বলা হইবে যে, আত্মত্বই উক্ত কারণতার অবচ্ছেদক। কিন্তু এইরূপ নির্দেশ দ্বারা তেমন কিছু সার্থক কথা বলা হয় না। যে কোন কার্য পদার্থ দেখিয়াই, আমরা অনুমান করিতে পারি যে, উহার একটি সমবায়ী কারণ আছে। জ্ঞান ও কার্যপদার্থ; সুতরাং তাহারও একটি সমবায়ী কারণ আছে। কিন্তু এই সমবায়ী কারণটিকে যদি আমরা উক্ত সমবায়িকারণতা ছাড়া অন্য কোন ধর্ম দ্বারা বিশিষ্ট বলিয়া না জানি, তাহা হইলে উহাকে আত্মা নাম দেওয়া, আর জ্ঞানের সমবায়ী কারণ বলা সমার্থক কথা। অর্থাৎ যদি কেহ আত্মত্বকে উক্ত সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক বলে, তাহা হইলে সে সমবায়িকারণতাকেই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক বলে। মৃত্তিকা ঘটের উপাদান। কিন্তু ঘটের উপাদান হওয়া, ইহাই কিছু মৃত্তিকার স্বরূপ নহে। মৃত্তিকাত্বই মৃত্তিকার স্বরূপ। অনুরূপভাবে যে নিজত্ব অর্থে আত্মত্বকে আত্মার স্বরূপ বলা চলে না, তাহা ইতঃপূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি।

সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই যে, সুষুপ্তিতে জ্ঞানাদি ধর্মের অবর্তমানে ও আত্মা বিদ্যমান থাকিলে, জ্ঞানাদি হইতে ভিন্ন অন্য কোন ধর্মকে তাহার স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ করা আবশ্যক। কিন্তু প্রথম মতটির পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।

উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই আত্মার স্বরূপ হইতেছে জ্ঞান। আমাদের মনে হয় যে, এই মতই গ্রহণ করা যোগ্য। কিন্তু আত্মার এই স্বরূপ-জ্ঞান ঘটের জ্ঞান, পটের জ্ঞান প্রভৃতি হইতে পৃথক। উহা ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায় স্বল্পকাল স্থায়ী পদার্থ নয়। ইহাদের তুলনায় উহা একটি স্থায়ী পদার্থ। অবশ্য, সর্বসাধারণ লোকের ধারণা এই যে, সুষুপ্তিতে কোন প্রকার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু এই ধারণার প্রকৃত অর্থ এই যে, সুষুপ্তিতে ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, প্রভৃতি আগমাপায়ী অত্যল্পকাল স্থায়ী জ্ঞানগুলি থাকে না। অর্থাৎ সুষুপ্তিতে আমরা ঘটাদিবস্তু জানি না। সুতরাং এই ধারণার সহিত বেদান্তোক্ত স্থায়ী জ্ঞানের অস্তিত্ব বিসংবাদী নহে।

প্রশ্ন হইবে যে, আমাতে এইরূপ একটি স্থায়ী জ্ঞান আছে, ইহা স্বানুভূতির ভিত্তিতে প্রমাণ করা যায় কি? আমাতে ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি, একের পর এক এইভাবে, উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা আমি নিজ অনুভূতিতে সাক্ষাৎ ভাবে অন্তর্নিরীক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারি। কিন্তু আমাতে যে একটি স্থায়ী জ্ঞান আছে, ইহা

কি আমি কখনও সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিতে পারি? তাহা ছাড়া, সুষুপ্তিতে আমি ঘটপটাদি বস্তু কিছুই জানি না অথচ আমাতে একটি স্থায়ীজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, ইহা নিতান্তই অসম্ভবনীয় কথা নয় কি? আবার, সুষুপ্তিতে জ্ঞান থাকে, অথচ সুষুপ্তি ভঙ্গ হয় না, ইহাই বা কেমন কথা? তাহা ছাড়া, সুষুপ্তিতে জ্ঞান আছে, এই কথা মানিয়া লইলেও, স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে এই জ্ঞানের বিষয় কী, এই জ্ঞান দ্বারা আমি কী জানি? আমরা নিশ্চয়ই নির্বিষয়ক জ্ঞানের সহিত পরিচিত নহি। বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত এইরূপ অপরিচিত পদার্থ স্বীকার করা সঙ্গত নহে।

উপরের প্রত্যেকটি আপত্তিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথাযোগ্যভাবে ইহাদিগকে নিরসন করিতে না পারিলে, আমাতে যে একটি স্থায়ী জ্ঞান আছে, উহা আর আমি যে মূলতঃ এক এবং উহা যে সুষুপ্তিতেও অক্ষুন্ন থকে, এই মত গ্রহণ করা কঠিন। আপত্তিগুলির নিরসন বিস্তৃত আলোচনা-সাপেক্ষ; কিন্তু আমাদিগকে এখানে এই কাজটি সংক্ষেপেই সারিতে হইবে।

প্রথম আপত্তিটি হইল, আমাতে যে একটি স্থায়ীজ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ এই যে, আমাতে যদি একটি স্থায়ীজ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে আমি আমাতে যে ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি করিয়া ঘটপটাদি বিষয়ক অনেক জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি উৎপন্ন হইয়া বিলীন হইয়া যায়, তাহা স্বানুভূতির প্রকাশে ধরিতে পারিতাম না। ধরা যাউক যে, এইমাত্র আমার ঘটজ্ঞানের পর পটজ্ঞান হইয়াছে। স্বানুভূতির আলোকে এই কথা বুঝিতে হইলে, স্পষ্ট হউক অথবা অস্পষ্ট হউক কোন না কোন প্রকারে আমাকে জানিতে হইবে যে, আমাতে প্রথমে ঘটজ্ঞান ছিল এবং এই ঘটজ্ঞান চলিয়া যাওয়ার পর পটজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ আমাকে অন্ততঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে হইবে: i আগে ঘটজ্ঞান, ii তৎকালে পটজ্ঞানের অভাব, iii তাহার পর ঘটজ্ঞানের ধ্বংস ও পটজ্ঞানের উৎপত্তি এবং iv ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের ভেদ ও উহাদের পৌর্বাপর্যের একটি বিশিষ্ট ক্রম। তাহা ছাড়া, এই বিষয়গুলির প্রত্যকটি একই জ্ঞানের বিষয় হওয়া দরকার। এতসব কথা স্বল্পকাল স্থায়ী ঘটাদি-জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। খুব বেশী হয়ত, ঘটজ্ঞান ঘটের সহিত নিজকেও জানে; কিন্তু উহা নিশ্চয়ই নিজের ধ্বংস, পটজ্ঞানের উৎপত্তি এবং নিজের অস্তিত্বকালে পটজ্ঞানের অভাবকে জানিতে পারে না। অথচ এইসব কথা আমি কোন না কোন রকমে জানিতে পারি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহারা প্রত্যেকে একই অভিন্ন স্থায়ী জ্ঞানের বিষয়। আমাতে এই স্থায়ী ও অভিন্নজ্ঞান কখন থাকে! এই জ্ঞানকে ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের পরবর্তী

বলিলে, ইহাই বলা হয় যে, উহা স্মরণাত্মক। কিন্তু স্মরণের জন্য পূর্বকালীন সাক্ষাৎ অনুভব চাই; ও এই সাক্ষাৎ অনুভবটি তাহার বিষয়ের সমকালীন হওয়া আবশ্যক; অর্থাৎ স্বীকার করিতে হইবে যে, যে কাল-খণ্ডে ক্রমান্বয়ে ঘটজ্ঞান, তাহার ধ্বংস ও পটজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটিয়াছিল, তাহার সবটুকু অধিকার করিয়াই এই অনুভবটি বিদ্যমান ছিল। উহাদেব তুলনায় উহা স্থায়ী। ইহার আলোকেই ঘটজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল থাকিয়া বিলীন হইয়াছিল এবং তাহার পর পটজ্ঞান অস্তিত্বলাভ করিয়াছিল। এই স্থায়ী জ্ঞানের অবিলুপ্ত দৃষ্টি এই সব ঘটনার প্রত্যেকটিকে দেখিয়াছিল। এই স্থায়ী জ্ঞানের প্রসাদেই আমার অন্তর্জীবনের ঘটনাবলী উহাদের বিশিষ্ট ক্রম-সহ আমাদ্বারা সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধ হয়। যেহেতু আমার জাগ্রৎ মনোজীবনের সর্বচেতন অবস্থারই উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস এবং তাহাদের নির্দিষ্ট ক্রম অল্পাধিক স্পষ্টতার সহিত আমার পক্ষে স্মরণ করা সম্ভবপর, অতএব উহাদের সমগ্র ধারাটি যে কালখণ্ড অধিকার করিয়া থাকে, উক্ত স্থায়ী জ্ঞানও সেই কালখণ্ডের প্রত্যেক মুহূর্তে স্বীয় অপরিবর্তমান রূপে বিদ্যমান থাকে।

শুধু জাগ্রৎ অবস্থাতেই নহে, উপরন্তু সুষুপ্তিতেও উহার অস্তিত্ব অবশ্য-স্বীকার্য্য। সুষুপ্তি হইতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া আমি স্বকীয় অনুভবের সাহায্যেই বলিতে পারি যে, ইতঃপূর্বে আমি গভীর ঘুমে অচেতন অবস্থায় ছিলাম, তখন আমার কোন বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল না, এমন কি আমি কোন স্বপ্নও দেখিতেছিলাম না। যেহেতু এইরূপ বাক্য দ্বারা যে-জ্ঞান ব্যক্ত হয়, তাহার বিষয় অতীতকালীন, অতএব এই জ্ঞানকে স্মরণাত্মক বলিতে হইবে। ইহা নিশ্চয়ই অনুমিতি নহে। কারণ, কোন রকম অনুমান ব্যতীতই আমি সহজভাবে ঐরূপ কথা বলি। তাহা ছাড়া, এইরূপ অনুমানের হেতুই বা কি হইতে পারে? পর্বতে অগ্নির অনুমানে পর্বতস্থ ধূমের ন্যায় সুষুপ্তিস্থ কোন হেতুর সাক্ষাৎ জ্ঞান দ্বারা যে তৎকালীন অবস্থার অনুমিতি করিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। কারণ, এখন সুষুপ্তি অবস্থা আর নাই। খুব বেশী হয়ত বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া আমি তৎকালীন অবস্থার সম্বন্ধে কিছুই স্মরণ করিতে পারি না, অতএব অনুমান করি যে, আমার তৎকালে কোন বিষয় সম্বন্ধেই জ্ঞান ছিল না, অর্থাৎ আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু কোন অতীত কাল-খণ্ডের ঘটনা বা পদার্থ সমূহ স্মরণ না করিতে পারিলে, আমি সেই কাল-খণ্ডে অজ্ঞানাবস্থায় ছিলাম, আমি এরকম অনুমান বস্তুতঃ করি না! শুধু তাহাই নহে। যদিই বা ঐরূপ অনুমিতি করা হয়, তাহা হইলে উহা সমিচীন হইবে না। কারণ স্মরণাভাব পূর্বকালীন জ্ঞানাভাবের সম্যক হেতু নয়। যে সব কালে

আমার জ্ঞান ছিল না, সেই সব কালের ঘটনা বা পদার্থ আমি স্মরণ করিতে পারি না বটে ; তথাপি এমনও ত হয় যে, জাগ্রৎ অবস্থাতেও কিছু কাল পূর্বে কোন্ কোন্ বস্তু আমি জানিতেছিলাম, তাহার কিছুই মনে পড়ে না। কিন্তু সেই জন্য আমি যদি বলি যে, তখন আমি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম, তাহা হইলে উহা ঠিক হইবে কি ? বস্তুতঃ, কোন কোন সময় জাগ্রৎ অবস্থাতেও আমি অন্যমনস্কভাবে এত সব অসংলগ্ন বাজে কথা ভাবি যে, পরে তাহার কিছুই আমার মনে পড়ে না ; তথাপি আমি এমন বলি না যে, তৎকালে আমার সুষুপ্তি অথবা অজ্ঞানাবস্থা ছিল। খুব সম্ভবতঃ, ঐরূপ না বলার হেতু এই যে, যদিও আমাদ্বারা জ্ঞাত তৎকালীন কোন ঘটনা বা পদার্থ আমি এখন স্মরণ করিতে পারি না, তথাপি আমার স্মৃতিতে এইরূপ প্রতিভাত হয় যে, তৎকালে আমি জাগ্রৎ অবস্থাতেই ছিলাম, নিদ্রা অবস্থায় নহে। এই কথা ঠিক হইলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন অতীত কাল খণ্ডের কোনও পদার্থের স্মরণ ব্যতীতই আমি বর্তমানে ঐ অতীত কালের জাগ্রদবস্থা স্মরণ করিতে পারি। এবং তাহা হইলে, অনুরূপভাবে ইহাও সম্ভবপর যে, সুষুপ্তি বা অজ্ঞানাবস্থা চলিয়া যাওয়ার পরে, আমি বর্তমান জাগ্রদবস্থায় ঐ অজ্ঞানাবস্থা স্মরণ করি। সুষুপ্তি হইতে সদ্যোত্থিত ব্যক্তি যখন বলে যে সে ইতঃপূর্বে কিছুই জানিতেছিল না, তখন এই বাক্যে তাহার যে-জ্ঞান ব্যক্ত হয়, উহা-যে প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি নয়, তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। সুতরাং এই জ্ঞান যদি শুধু অন্যের কথায় বিশ্বাস দ্বারা উৎপন্ন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, উহা স্মরণ।

এইক্ষণে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কোন কিছুর স্মরণ হইতে হইলে, তদ্বিষয়ক পূর্বানুভূতি আবশ্যক। যেহেতু সুষুপ্তি হইতে সদ্যোত্থিত ব্যক্তির সুষুপ্তি বিষয়ক স্মরণ হয়, অতএব সুষুপ্তিকালে তাহার সুষুপ্তি বিষয়ক একটি অনুভব নিশ্চয়ই ছিল। আর এই অনুভব-যে শুধু সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞান অবস্থাই প্রকাশ করে, তাহা নহে, উপরন্তু সুষুপ্তির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জাগ্রৎ অবস্থা দুইটিও প্রকাশ করে। কারণ, আমি ঐ অবস্থাগুলির প্রত্যেকটিকে অদন্তর্গত জ্ঞানাদি বৃত্তি ও উহাদের বিশিষ্ট আনুপূর্ব্য-সহ স্মরণ করিতে পারি। সুতরাং সুষুপ্তির প্রকাশক জ্ঞানটি আমাদের পূর্ব কথিত স্থায়ী জ্ঞানের সহিত অভিন্ন।

জিজ্ঞাসা করা হইবে, সুষুপ্তিতে যে স্থায়ী জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল, তাহার বিষয় কী ? উত্তর এই যে, সর্বমানসিক চেতন অবস্থার লয় বা অভাবই এই বিষয়। অবশ্য শুধু 'অভাব' কোন অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে অথবা জ্ঞানের বিষয় হইতে অসমর্থ। এই অবলম্বনটি কী ? সর্বমানসিক চেতন বৃত্তি বা ক্রিয়ার অভাবের

এই অবলম্বনটি হইতেছে মনেরই নিষ্ক্রিয় বা শান্ত অবস্থা। ইহাই সুষুপ্তিতে মদন্তর্গত স্থায়ী জ্ঞানের বিষয়। মনে রাখিতে হইবে যে, এই স্থায়ী জ্ঞানের আকার সাধারণ ঘটপটাদি জ্ঞানের ন্যায় সবিকল্পক ও পরিস্ফুট নহে। উহা অস্পষ্ট ও নির্বিকল্পক। যদি অজ্ঞান অবস্থাতে অজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান 'ইহা আমার মনের নিষ্ক্রিয় অবস্থা', এইরূপ সবিকল্পক আকার ধারণ করিত, তাহা হইলে সুষুপ্তিই ভাঙ্গিয়া যাইত। কারণ, সবিকল্পক জ্ঞান মাত্রই সাদি, অস্থায়ী ও ক্রিয়াত্মক বা ক্রিয়াজনিত; উহা অন্তঃকরণের ক্রিয়াবিশেষ বা ক্রিয়াজনিত অবস্থা; অন্তঃকরণে কোন পরিস্ফুট ক্রিয়া উৎপন্ন না হইলে, ঐরূপ জ্ঞান হয় না; এবং অন্তঃকরণের ক্রিয়া উহার নিষ্ক্রিয় অথবা শান্ত অর্থাৎ সুষুপ্ত অবস্থার বিঘাতক। তাহা ছাড়া, আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, যে-চৈতন্য ঘটাদি বস্তুর সবিকল্পক জ্ঞানের প্রকাশক, তাহা স্থায়ী ও অবিপরিণামী। সুতরাং উহা কখনও 'এই আমার সুষুপ্তি অবস্থা', 'ইহা আমার ঘটজ্ঞান', 'ইহা আমার জাগ্রদবস্থা' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে না। উহা কূটস্থ-নিত্য ও কেবল প্রকাশাত্মক। উহার সদোন্মীলিত চক্ষুর সমদৃষ্টি বিনাচেষ্টায় যেরূপে যে-পদার্থ উহার সম্মুখে আসে, তাহাকে সেইরূপে স্বীয় নৈসর্গিক ও সদাবিদ্যমান প্রকাশে প্রকাশ করে। এইরূপ অযত্নসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রকাশ নির্বিকল্পক না হইয়া পারে না। এই জন্যই আমার এই নিত্যচৈতন্য বিষয়ে কখনও স্মরণ অথবা অনুব্যবসায় হয় না।

মোট কথা এই যে, আমাতে যে শুধু ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি কতকগুলি স্বল্পকালস্থায়ী মানসিক অবস্থা বা বৃত্তি আছে, তাহা নহে; তদুপরি এমন একটি স্থায়ী জ্ঞানও আছে, যাহা এইসব মানসিক অবস্থা ও তাহাদের পারস্পরিক ভেদ, উৎপত্তি, স্থিতি, লয় এবং মাঝে মাঝে যে উহাদের সম্পূর্ণ বিলয় ঘটে সেই বিলয় অবস্থাকেও প্রকাশ করে। এই ভাবে সুষুপ্তি বা অজ্ঞান অবস্থাতে আমার স্বরূপ কী, এই প্রশ্নের একটি স্বানুভূতিগম্য সন্তোষজনক উওর পাওয়া গেল। সংক্ষেপে উত্তরটি এই যে, তৎকালে আমার স্বরূপ হইতেছে এমন একটি জ্ঞান, যাহা আমার ঘটপটাদি মানসিক অবস্থার তুলনায় স্থায়ী, এবং যাহা উহাদের প্রত্যেকের প্রকাশক। যেহেতু এই চৈতন্য আমার মনোজীবনের সর্ব অবস্থাতেই বর্তমান, সেই কারণে উহার সহিত আমার সম্বন্ধ ধর্ম ও ধর্মীর সম্বন্ধ নহে। বরং উহা আর আমি একই। আমি জ্ঞান স্বরূপ, জ্ঞানই আমার স্বরূপ। অর্থাৎ আমার সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধটি হইতেছে অভেদ।

এই জ্ঞানই যে আমার প্রকৃত স্বরূপ, উহার অপর একটি প্রমাণ এই যে, সুখ

দুঃখাদি মনের পরিচ্ছিন্ন বৃত্তিগুলি এই স্থায়ী জ্ঞান দ্বারা প্রকাশিত অর্থাৎ ইহারা তাহার বিষয়; কিন্তু আমার সর্বঅন্তঃকরণ-বৃত্তির অবভাসক এই স্থায়ী চৈতন্য কখনও কোন জ্ঞানের বিষয় হয় না—উহাই চরম জ্ঞাতা; উহার আর অন্য জ্ঞাতা নাই; আর আমি অন্য যাহা কিছুই হই না কেন, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায় যে, আমি জ্ঞাতা। অন্তঃকরণ আমার; অন্তঃকরণের বৃত্তিগুলিও আমার; কিন্তু আমি অন্তঃকরণ নহি; উহার বৃত্তিও নহি, কারণ উহারা আমাদ্বারা জ্ঞাত হয়। আমার একমাত্র ধাতু বা উপাদান হইতেছে উহাদের অবভাসক এই স্থায়ী চৈতন্য। সুতরাং উহাই আমি।

অবশ্য আমি সচরাচর নিজকে এই সব বৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন বলিয়া ভাবি অর্থাৎ সুখ, দুঃখ, ঘটাদি বস্তুর জ্ঞান, প্রভৃতি অবস্থাগুলিকে আমি আমা হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করি না। আমার এই বিশ্বাস কতদূর গ্রহণযোগ্য, এখানে সেই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। এই বিশ্বাস যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলেও, আমরা বলিতে পারি যে, পূর্বোক্ত স্থায়ী চৈতন্য এবং আমার মনের এইসব স্বল্পকাল স্থায়ী অবস্থা বা ক্রিয়া—এই সবগুলিই—আমার স্বরূপ, অর্থাৎ আমার সহিত অভিন্ন অথবা আমিই। সুতরাং আমরা যে-মতটি এখানে প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিলাম, তাহার সহিত উক্ত সাধারণ বিশ্বাসের কোনও বিরোধ নাই। বরং আমাদের পূর্বপ্রমাণিত নিত্য চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, সর্বসাধারণ লোকের এই সম্বন্ধে অপর যে একটি বিশ্বাস আছে যে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি সর্ব অবস্থাতেই মানুষ অভিন্ন, তাহারও একটি নির্দোষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

দার্শনিক ব্যাখ্যা

ডক্টর শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

'ব্যাখ্যা' শব্দটী 'খ্যা' ধাতু হইতে উদ্ভূত। 'খ্যা' ধাতুর অর্থ হইল 'বলা', অতএব 'ব্যাখ্যা' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশেষরূপ বা সম্যক্‌রূপ বলা। এই বিশেষ ভঙ্গিমায় বলার উদ্দেশ্য হইল যাহা জটিল তাহাকে সরল করা, যাহা দুরূহ বা দুর্ব্বোধ্য তাহাকে সহজবোধ্য করা। ব্যাখ্যার এই উদ্দেশ্য ইহার ইংরাজি ও জার্ম্মাণ প্রতিশব্দে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যাখ্যা করার ইংরাজী হইল 'explain' অর্থাৎ যাহা অসমতল বা অসরল তাহাকে সরল করা। জার্ম্মাণ প্রতিশব্দ 'erklären' অর্থাৎ অপরিষ্কার বা অস্পষ্টকে klar বা পরিষ্কার বা স্পষ্ট করা।

এখন প্রশ্ন হইল, এইরূপ সরলীকরণের প্রয়োজন হয় কেন? মানুষের মন অনুসন্ধিৎসু এবং তাহার জিজ্ঞাসু প্রবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করে যখন সে দেখে যে, যে ঘটনাকে সে যত দুর্ব্বোধ্য ভাবিয়াছিল তাহা তত দুর্ব্বোধ্য নহে, বরং এই আপাতদুর্ব্বোধ্যভাবের অন্তরালে আছে কতকগুলি বোধগম্য সরল প্রক্রিয়া।[১] মানুষ যখন ধরণীর বক্ষে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, তখন সে উপরে দেখিয়াছিল অন্তহীন আকাশ আর তাহাতে দেদীপ্যমান সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা ইত্যাদি, সম্মুখে দেখিয়াছিল নদনদী, বৃক্ষ পর্ব্বত ইত্যাদি, মধ্যে মধ্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিত ভূকম্পন, ঝড়ঝঞ্ঝা, জলপ্লাবন ইত্যাদি সম্বন্ধে। সব কিছুই তাহার মনে বিস্ময় জাগাইয়া তুলিত এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে প্রশ্ন করিত, "এগুলি কি? কেন এগুলি হইতেছে?" এই "কেন?"-র উত্তর দিবার জন্য সে নানারূপ কল্পনা করিতে লাগিল। বৈচিত্র্যময় বিশ্বকে বুঝিবার প্রচেষ্টা হইতেই ধীরে ধীরে জন্মলাভ করিল আদি মানবের দর্শন ও বিজ্ঞান। জ্ঞানের ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের চিন্তাধারা বাহিরের স্থূল জগৎ সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ রহিল না—উহা ক্রমশঃ অন্তর্মুখী হইল। মানুষ নিজের

১। তুলনীয়: "A phenomenon will be explained only when it is shown that what is new, what is surprising in it, should not have surprised us, since it was already present in a disguised form." (*Encyclopaedia Britannica*—'Explanation' পদের উপর লিখিত সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য)।

সম্বন্ধেও চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। সে তখন প্রশ্ন করিতে লাগিল: 'আমি কে? কোথা হইতে আমি আসিয়াছি? আমার জীবনের পরিণতি কি?' এই সব প্রশ্নের সমাধানের জন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইল। কালক্রমে দর্শন ও বিজ্ঞান পৃথক্ হইয়া গেল, এবং তখন বিভিন্ন ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, কতকগুলি দার্শনিক ব্যাখ্যা, আর বাকী কতকগুলি কেবলমাত্র লৌকিক ব্যাখ্যা বলিয়া পরিগণিত হইল।

ব্যাখ্যাকরণকে যদি মনোবিদ্যাসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে এই মানসিক ক্রিয়ার মূলে আছে একটা কৌতূহল, বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা; এই ক্রিয়াকে যথাযথ পরিচালিত করিতেছে আমাদের যুক্তিশক্তি, এবং ইহার পরিণতিতে আসিতেছে মানসিক তৃপ্তি। জটিল বিষয় সরল ও বোধগম্য হইল বলিয়া এই তৃপ্তি বা আনন্দ আসে। ব্যাখ্যান্তে এই যে তৃপ্তি আসে, ইহা অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হয় না; ইহা অনেক ক্ষেত্রে তিরোহিত হইয়া যায় কারণ একটি ব্যাখ্যাকে বিশেষ অনুধাবন করিয়া মনে হইতে পারে যে, প্রথম ব্যাখ্যা দ্বারা অনেক বিষয় অব্যাখ্যাত রহিয়া গিয়াছে এবং আরও বিস্তৃততর বা পর্য্যাপ্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এই ভাবে ব্যাখ্যার পশ্চাতে ব্যাখ্যা আসিয়া পড়ে এবং অবশেষে একটি স্থানে আসিয়া আমাদের ক্লান্ত সসীম মন থাকিয়া যায়।[২]

উপরে আমরা কৌতূহল ও বিস্ময়কে ব্যাখ্যাকরণের মানসিক উদ্দীপক বলিয়াছি, কিন্তু এই কৌতূহল সকল মনের পক্ষে সমান নহে। কোন বিষয় হয়ত সাধারণ মানুষের কৌতূহল জাগাইবে না, অথচ বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল আসিবে; আবার কোন বিষয়ে বৈজ্ঞানিক বিস্মিত না হইলেও সাধারণ মানুষের বিস্ময় থাকিবে। সেইরূপ যে ব্যাখ্যাকে সাধারণ মানুষ পর্য্যাপ্ত মনে করিবে, হয়ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তাহাকে পর্য্যাপ্ত বলিবেন না। সুতরাং ব্যাখ্যার প্রকারভেদ আছে।

২। অধ্যাপক Sinclair ব্যাখ্যাকরণের বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, "He (man) will be aware of something unsatisfying which can be described as an inadequacy in the theories he holds, or as something wrong with the ways of selecting and grouping in attention that he follows, or as some incoherence or confusion or unmanageability in the situation he experiences....He adopts somewhat different theories or ways of selecting and grouping, with the result that the situation he experiences is simpler or more coherent or more manageable..." (*The Conditions of Knowing*, পৃ: ২০০)

দার্শনিক ব্যাখ্যার স্বরূপ বুঝিবার জন্য উহার সহিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার তুলনা করা প্রয়োজন এবং তাহার পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও অবৈজ্ঞানিক সাধারণ ব্যাখ্যার প্রভেদ লক্ষ্য করা উচিত।

সাধারণ, অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারে অনেক সময় কোন একটি বিশেষ বস্তু যাহার বৈশিষ্ট্য আমাদের বিস্ময় জাগায়, কেবলমাত্র তাহাকেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দ্বারা একটি শ্রেণীর অন্তর্গত সমজাতীয় সকল বস্তুর সাধারণ ব্যবহারের কারণ নির্দ্দেশের চেষ্টা হয় এবং এই জন্য একটি সাধারণ নিয়ম (general law) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে। যেমন, নিউটন যখন আপেল ফল পড়িয়া যাওয়ার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি ঐ বিশেষ আপেলটী কেন পড়িয়া গেল তাহাই চিন্তা করেন নাই, বরং সমস্ত জড়বস্তুই তাহাদের ধরিয়া রাখিবার কিছু না থাকিলে কেন পড়িয়া যায়, তাহাই তিনি বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং জড়-বস্তুর পতন বুঝাইবার জন্য মাধ্যাকর্ষণের সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন।

অনেক সময় কতকগুলি বস্তুর মধ্যে বাহিরের সাদৃশ্য দেখিয়া সাধারণ মন সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য আবিষ্কার করিতে পারিলে বৈজ্ঞানিকের মন সন্তুষ্ট হয়।

এমন অনেক ঘটনা আছে যেগুলি সচরাচর ঘটিতেছে বলিয়া ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই বলিয়া সাধারণ লোক মনে করে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঐ সব সাধারণ ঘটনার মধ্যে জটিল তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ঐগুলিকে ব্যাখ্যার চেষ্টা করে। যেমন, নিউটনের পূর্বেও অনেকে আপেল ফলকে মাটিতে পড়িতে দেখিয়াছিল এবং তাহারা মনে করিত, "এর আর ব্যাখ্যা কি করতে হবে? পেকে ছিল, তাই পড়ে গেল; ফল পাকলে কি আর গাছে থাকে, না সেটা আকাশে উড়ে যায়?"

সাধারণ ব্যাখ্যায় অনেক সময় আমরা অতিপ্রাকৃত বা অপ্রাকৃত সত্তার সাহায্যে কোন প্রাকৃতিক ঘটনাকে বর্ণনা করিয়া থাকি; কিন্তু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় অপ্রাকৃত সত্তার সাহায্যে কিছু বর্ণনা করা হয় না—যে নিয়ম পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কেবলমাত্র সেই নিয়ম দ্বারাই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে; যেমন, বৈজ্ঞানিক রাহুগ্রাসকে গ্রহণের কারণ বলিবেন না।

আবার অনেক সময় সাধারণ ব্যাখ্যা 'কেন'-এর উত্তর না দিয়া ব্যাখ্যেয় বিষয়টীকে ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করে। যেমন, মানুষ কেন হাসে? কারণ সে হাস্যপ্রিয় জীব; কাঁচ কেন স্বচ্ছ? কারণ উহার ভিতর দিয়া আলোক দেখা যায়;

অহিফেন সেবনে কেন তন্দ্রালুভাব আসে ? কারণ উহার 'ঘুমপাড়ানি' গুণ আছে।[৩] বিজ্ঞানে এরূপ ব্যাখ্যা চলে না, কারণ বিজ্ঞান হেতু নির্ণয় করিয়া ব্যাখ্যাদানের চেষ্টা করে।

অবৈজ্ঞানিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পার্থক্য আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে কোন ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য উহার হেতু নির্ণয় প্রয়োজন এবং এই হেতুবর্ণণের জন্য একটি সাধারণ নিয়মের সাহায্য গ্রহণ করা হয়।[৪] যদি এই সাধারণ নিয়ম জানা না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে ; অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপকতর নিয়ম হইতে সঙ্কীর্ণতর নিয়মে অবতরণ করিতে হইবে ; অথবা নিম্নতর বা সঙ্কীর্ণতর নিয়মকে ব্যাপকতর নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।[৫] এইরূপে বিভিন্ন ঘটনাকে বিভিন্ন কার্য্যকারণঘটিত নিয়মের অধীনে আনিয়া এবং সম্ভব হইলে ঐ নিয়মগুলিকে ব্যাপকতর নিয়মের অধীনে আনিয়া বিজ্ঞান পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ জ্ঞান দান করে।

এখন দেখা যাউক দার্শনিক ব্যাখ্যা স্বরূপতঃ কি এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সহিত উহার সাদৃশ্য এবং পার্থক্য কোথায়।

দার্শনিক ব্যাখ্যার স্বরূপ আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে, দর্শন কি ? দুঃখের বিষয় দর্শনের প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিকদের নিজেদের মধ্যেই মতভেদ রহিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ দর্শনকে সাধারণ বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে টানিয়া আনিয়াছেন এবং দর্শন বলিতে বিভিন্ন বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সঙ্কলন ও সমন্বয়

৩। এখানে বোধ হয় এই গল্পটী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। একবার এক ভক্তশিষ্য তাঁহার গুরুদেবকে প্রশ্ন করেন, "প্রভো ! বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা একই, তবে এ পারের মাটি এঁটেল মাটি, আর ও পারের মাটি বেলে মাটি কেন ?" গুরুদেব শিষ্যের এই অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া উত্তর দিলেন, "এ পার যে এ পার, আর ওপার যে ও পার।"

৪। সেইজন্য Mill বলিয়াছেন, "An individual fact is said to be explained by pointing out its cause, that is, by stating the law or laws of causation of which its production is an instance." (*A Sytem of Logic*, Bk. III, Ch. XII, S. I). সেইরূপ R. E. Peierls নামক এক আধুনিক লেখক বলিয়াছেন, "All explanations of natural phenomena consist in reducing them to some basic laws. To ask for an explanation of these laws would merely mean reducing them to some other laws." (*Laws of Nature*)

৫। যুক্তিবিজ্ঞানী Carveth Read এর ভাষায়, "Scientific explanation consists in discovering, deducing and assimilating the laws of phenomena."

বুঝিয়াছেন ; কেহ কেহ বলিয়াছেন দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিপরীতগামী—দুইটীর আলোচ্য বিষয়বস্তু এবং আলোচনার প্রক্রিয়া ও ধারা বিভিন্ন। কেহ কেহ মনে করেন দর্শনের আলোচনাক্ষেত্র হইতে তত্ত্ববিদ্যাকে (Metaphysics) বহিষ্কার করা প্রয়োজন ; আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন তত্ত্ববিদ্যাই প্রকৃত দর্শন। কাহারও কাহারও দর্শন জ্ঞানবিদ্যায় (Epistemology) পরিসমাপ্ত হইয়াছে, আবার কেহ বা ইহা লইয়া বিশেষ আলোচনা করেন নাই। কেহ কেহ দর্শনের আলোচনাক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী মনে করেন এবং জ্ঞানবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা ব্যতীতও মনোবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি সমস্ত কিছুই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আবার দর্শনের উদ্দেশ্য লইয়াও মতভেদ আছে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের নিকট দর্শন কেবলমাত্র বুদ্ধির তৃপ্তিদানই করে না, ইহা সত্যের স্বরূপ বুঝিবার অন্তর্দৃষ্টি দান করে এবং মোক্ষলাভে সহায়তা করে—এই জন্য দর্শন মোক্ষশাস্ত্রও বটে।

সুতরাং দর্শনের সর্ব্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞাদান করার চেষ্টা বৃথা এবং সেই জন্য দার্শনিক ব্যাখ্যার সর্ব্বজনগ্রাহ্য একটি সাধারণ মান বা আদর্শ নির্ণয় করাও নিতান্ত দুরূহ। দর্শনের কোন একটী বিশেষ সংজ্ঞাকে গ্রহণ করিয়া এবং অন্য সংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া দার্শনিক ব্যাখ্যা আলোচনা করিলে বোধ হয় তাহা একদেশদর্শী হইয়া যাইবে। দর্শনের এই বিভিন্ন সংজ্ঞা বা বর্ণনা যদি আংশিকভাবে সত্য ধরা যায়, তাহা হইলে, বিভিন্ন দার্শনিক ব্যাখ্যার সহিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাদৃশ্য কোথায় তাহাই প্রথমতঃ দেখা যাউক্।

(১) বিস্ময়, কৌতূহল, জিগীষা, অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি অনুভূতি ও প্রবৃত্তি হইতে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা উভয়েরই উদ্ভব। আদি-বিজ্ঞান ও আদি-দর্শন উভয়েরই বোধ হয় ব্যাখ্যেয় বিষয় একই ছিল, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে কি ছিল, 'গহনম্ গভীরম্' অথবা 'অপ্রকেতং সলিলম্ ?' কোথা হইতে, কাহার দ্বারা এই বিশ্বের উদ্ভব হইল ?

(২) বিজ্ঞান ও দর্শনই উভয়ই উহাদের অগ্রগতির সহিত বিভিন্ন তথ্য বা মতবাদ গ্রহণ করিয়াছে ; এখন যদি কোন ঘটনা ঐ তথ্যের বিরোধী বলিয়া মনে হয়, তখন তাহাদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। যেমন, বিজ্ঞান যদি প্রকৃতির একরূপতা নীতি মানিয়া লয়, তখন ঐ নীতির বিরোধী কোন ঘটনা আছে মনে হইলে ঐ ঘটনার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে। সেইরূপ দর্শন যদি জগতের রচয়িতাভাবে এক সর্ব্বশক্তিমান্ কল্যাণময় চিন্ময় পুরুষের কল্পনা করে, তাহা হইলে জাগতিক দুঃখের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। অতএব দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ই অনেক সময় পূর্ব্বগৃহীত

মতবাদের সহিত কোন অভিজ্ঞাত ঘটনার বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ের জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন বোধ করে।

(৩) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উভয়েরই আদর্শ হইল ব্যাখ্যাদান কালে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ যুক্তির পথ অনুধাবন করা।

(৪) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় প্রকার ব্যাখ্যাতেই বাহ্য বৈচিত্র্যের অন্তরালে কি লুক্কায়িত আছে, তাহাই উদঘাটিত করার চেষ্টা হইয়া থাকে।

(৫) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় প্রকার ব্যাখ্যাই ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্লেষাত্মক অথবা সংশ্লেষাত্মক হইতে পারে।

(৬) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় প্রকার ব্যাখ্যাতেই অনেক সময় দেখা যায় যে ব্যাখ্যাদানের ফলে একটী সাধারণ মতবাদ গড়িয়া উঠে। আবার এই মতবাদের সকল ফলাফল অনুধাবন করা হয়—অর্থাৎ এই মতবাদের সহিত অন্যান্য প্রচলিত মতবাদগুলির সম্বন্ধ নিরূপণ করা হয় এবং সম্ভব হইলে বিভিন্ন মতবাদ গুলির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হয়। উভয় প্রকার ব্যাখ্যাতেই শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে একটি সুসংবদ্ধ জ্ঞান দানের চেষ্টা হয়।[৬]

এইবার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পার্থক্য আলোচনা করা যাউক্। এই পার্থক্য কতকাংশে বিষয়গত এবং কতকাংশে পদ্ধতিগত।

(১) বিজ্ঞানে প্রাকৃত ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয় সত্তার সাহায্যে ব্যাখ্যার রীতি প্রচলিত নাই; কিন্তু দর্শনে ইহা প্রচলিত আছে। সকল দার্শনিক আত্মা, ঈশ্বর এই সমস্ত অতীন্দ্রিয় সত্তার বিশ্বাসী না হইতে পারেন, কিন্তু দার্শনিক মহলে এই ভাবে ব্যাখ্যার পদ্ধতি অন্যতম পদ্ধতি বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

৬। Runes সম্পাদিত The *Dictionary of Philosophy* গ্রন্থে Explanation (ব্যাখ্যা) পদটীর যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক উভয় প্রকার ব্যাখ্যারই সাদৃশ্য বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। উহা এইরূপ:

"Explanation is a step towards generalization or the establishment of a theory. It is the process of linking a statement of fact to its logical implications and consequences; or the process of fitting a statement of fact into a coherent system of statements extending beyond the given fact; or the construction of a logically related body of statements including the statement of fact to be justified."

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে : যদি অবৈজ্ঞানিক বা লৌকিক ব্যাখ্যায় প্রাকৃত ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা হইলে লৌকিক ব্যাখ্যা ও দার্শনিক ব্যাখ্যার পার্থক্য কোথায় ?[৭] ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, লৌকিক ব্যাখ্যায় যে সমস্ত অতিপ্রাকৃত সত্তার কথা বলা হয়, সেগুলি অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার সামাজিক প্রথা ইত্যাদির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেগুলি বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিরোধী। দার্শনিক যখন অতিপ্রাকৃত বা অতীন্দ্রিয় সত্তার কথা বলেন, তখন তিনি যুক্তিতর্ক দ্বারা উহাদের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন ; এমন কি যাঁহারা বলেন, ঐ সমস্ত সত্তা অপরোক্ষানুভূতিগ্রাহ্য এবং যুক্তিকর্কদ্বারা লভ্য নহে, তাঁহারাও অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হ'ন না এবং যুক্তিদ্বারাই যুক্তির অসারতা প্রমাণে প্রয়াসী হন।

(২) বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য বিভিন্ন নিয়ম বা রীতির সাহায্য গ্রহণ করা হয়। দর্শন অনেক সময় চেষ্টা করে এক চরম সূত্র দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করার—দর্শন বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (synoptic world-view) গ্রহণের চেষ্টা করে। যেমন, অনেক ভাববাদী দার্শনিক চৈতন্যময় পরম সত্তার সাহায্যে বিশ্বসংসারকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন ; সেইরূপ জড়বাদী দার্শনিক জড় অনুপরমাণুর সাহায্যে জগতের সব কিছু ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিবেন। বিজ্ঞান সাধারণতঃ বিভিন্ন নিয়মকে একটিমাত্র মূল সূত্রে পরিণত করিবার চেষ্টা করে না।

(৩) বিজ্ঞানের আলোচ্যক্ষেত্র দর্শন অপেক্ষা সঙ্কীর্ণতর—ইহাই অধিকাংশ দার্শনিকের মত। সুতরাং দর্শনের ব্যাখ্যেয় বিষয় বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী। বিজ্ঞানের ব্যাখ্যেয় বিষয়সমূহ স্থূল—সেগুলি পরিদৃশ্যমান জগতের বা প্রকৃতির অন্তর্গত ; কিন্তু দর্শনের বিষয়সমূহ ইহাতেই সীমাবদ্ধ নহে। যেমন, দর্শনে 'আমি কি ?' 'আমার স্বরূপ কি ?' 'আমার চরম পরিণতি কি ?' ইত্যাদি প্রশ্ন উঠে এবং এইগুলি ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা হয় ; কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয়-বহির্ভূত এবং এই জন্য ইহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই। মনোবিজ্ঞানে মন সম্বন্ধে যে আলোচনা হয় তাহা আত্মার স্বরূপর ব্যাখ্যা করে না—উহা আত্মাকে জ্ঞাতা হিসাবে না দেখিয়া জ্ঞেয়-পদার্থ হিসাবেই আলোচনা করে। আবার বিজ্ঞানে

৭। *Science for the Citizen* গ্রন্থের রচয়িতা Lancelot Hogben বোধ হয় এই পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া এই গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন (পৃঃ ২৫২) :

"The distinction between a real or scientific explanation and and philosophical one is easier to see nowadays because few people believe that prayer can control meteorological events."

এমন অনেক প্রত্যয়, ধারণা বা কল্পিত বিষয় আছে যেগুলি বিজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করে এবং সেগুলিকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা উহা করে না; কিন্তু দর্শন ঐগুলিকেও ব্যাখ্যা করিবার প্রচেষ্টা করে।

(৪) যদিও বিজ্ঞান ও দর্শন উভয়ই যে ব্যাখ্যা দান করে, তাহা লৌকিক ব্যাখ্যা অপেক্ষা গভীর ও ব্যাপক, তাহা হইলেও দার্শনিক ব্যাখ্যা অনেক সময় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অপেক্ষাও গভীরতর, সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর হইয়া পড়ে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যেখানে আসিয়া থামিয়া যায়, দার্শনিক ব্যাখ্যা সেইখান হইতে যাত্রা সুরু করে। দর্শন দাবী করে যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অসমাপ্ত এবং তাহাকে সমাপ্তির পথে লইয়া যায় দার্শনিক ব্যাখ্যা। বিভিন্ন বিজ্ঞান তাহাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে, দর্শন ঐ সমস্ত নিয়ম অনুধাবন করিয়া সমগ্র বিশ্বের এক সাধারণ ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করে।

(৫) বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় 'কেন'-এর উত্তরদানের চেষ্টা হয় এবং এই ব্যাখ্যা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধীয় নীতির সাহায্যে দেওয়া হইয়া থাকে। দর্শনের ব্যাখ্যায় 'কেন' অপেক্ষা 'কি' এই প্রশ্নেরই প্রাধান্য—দর্শন অনেক সময়ই ব্যাখ্যেয় বিষয়সমূহ স্বরূপতঃ কি তাহাই আলোচনা করিয়া থাকে।

(৬) দর্শনের ব্যাখ্যেয় বিষয় অনেক সময় কতকগুলি বিমূর্ত্ত ধারণা (abstract concepts), কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাখ্যেয় বিষয় বাস্তব ঘটনা (concrete events)।

(৭) দার্শনিক ব্যাখ্যায় চরম মূল্যের বা পরমপুরুষার্থের আলোচনা হয়, কিন্তু বিজ্ঞানে ঐ প্রশ্ন উঠে না।

(৮) দর্শন ও বিজ্ঞান তাহাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন সংজ্ঞা সম্বন্ধে যথাযথ ও সুনির্দ্দিষ্ট হইবার চেষ্টা করে; কিন্তু দর্শন যেন এই ব্যাপারে বিজ্ঞানকে ছাড়াইয়া যায়। আমাদের ব্যবহৃত অনেক পদ ও সংজ্ঞার ঠিক কি অর্থ তাহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করে। বর্ত্তমানে একদল দার্শনিক এইজন্য ভাষাকে বিশ্লেষণের কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন এবং তাঁহাদের পক্ষে দর্শনের ব্যাখ্যেয় বিষয় হইতেছে আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ এবং এই সমস্ত পদের বিশ্লেষণই তাঁহাদের মতে প্রকৃত ব্যাখ্যাপদ্ধতি।

এইবার কতকগুলি উদাহরণের সাহায্যে দার্শনিক ব্যাখ্যার স্বরূপ এবং উহার সহিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার প্রভেদ বুঝা যাউক।

মহামতি ক্যাণ্ট বলিয়াছিলেন, "ছুইটি বস্তু আমার অন্তরকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়াছে—উপরের নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল এবং অন্তরের বিবেকজ্ঞান।"

আকাশের তারকারাজি দেখিয়া অজ্ঞ বা অশিক্ষিত লোক হয়ত বলিবে, "স্বর্গে দেবতারা প্রদীপ সাজাইয়াছেন।" বৈজ্ঞানিক ঐ সব নক্ষত্রের অবস্থিতি, আলোকরশ্মি ইত্যাদি লইয়া আলোচনা করিবেন। দার্শনিক বহির্বিশ্বের অসীমত্তা আলোচনা করিবেন এবং চিন্তা করিবেন এই সুশৃঙ্খল বিশ্ব কি কোন চিন্ময় বিরাট্ পুরুষদ্বারা চালিত হইতেছে অথবা জড় অনুপরমাণুর আকস্মিক সংঘাতে উৎপন্ন হইয়াছে।

নৈতিকজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ বিশেষ কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দিতে পারে না—সকলেই যে সমস্ত কাজকে ভাল বলিতেছে সেই সমস্ত তাহার করণীয়, ইহাই তাহার বিশ্বাস। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করিবেন নীতিবোধ সামাজিক প্রথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অথবা মনের অবচেতনস্তরের প্রদমিত ইচ্ছাগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে উহা আসিয়াছে ইত্যাদি। দার্শনিক ব্যাখ্যা করিবেন, নীতিবোধ যদি যথার্থ বা বাস্তব হয়, তাহা হইলে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্বন্ধ কিরূপ হইবে, নৈতিকবোধের অধিষ্ঠান মন বা আত্মার স্বরূপ কি, মানুষের অকৃতকার্য্য, অসমাপ্ত কর্ত্তব্যের পরিণতি কি ; দার্শনিক যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী হন, তাহা হইলে আরও চিন্তা করিবেন, ঈশ্বর বা ব্রহ্মের নিকট মানুষের নৈতিকবোধের মূল্য কি ?

আর একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে যখন এ্যাটম্ বোমা পড়িল, তখন সাধারণ অজ্ঞলোকে ব্যাখ্যা করিল : "আমেরিকা জাপানকে জব্দ করবার জন্য এই বোমা ফেলেছে এবং ঐ বোমার ভিতর পুড়িয়ে দেবার, ঝলসিয়ে দেবার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর জিনিষ পোরা ছিল, তাই তু'টী সহর নষ্ট হয়ে গেল।" বৈজ্ঞানক ব্যাখ্যা করিবেন, তথাকথিত জড় অণুর ভিতর কি শক্তি নিহিত আছে এবং হঠাৎ অণু বিদীরণের ফলে কিরূপ ধ্বংসকারী শক্তির সৃষ্টি হয়। দার্শনিক ব্যাখ্যা করিবেন, একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর ভিতর যদি এত শক্তি নিহিত থাকে, তাহা হইলে বিশ্বের স্বরূপ কি হইবে ; আবার তিনি একথাও চিন্তা করিবেন, নিত্য নূতন মারণাস্ত্রের উদ্ভব হইলে মনুষ্যসমাজের পরিণতি কি হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দার্শনিক অনেক সচরাচর ব্যবহৃত পদ ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করেন। ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় ইংরাজ দার্শনিক G. E. Moore[৮]

৮। ইঁহার সম্বন্ধে গল্প আছে যে কোন বিষয় লইয়া দার্শনিক আলোচনা করিতে হইলে ইনি ঐ বিষয় সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন করিবেন, "What do you *exactly* mean by it ?"

রচিত *Principia Ethica* গ্রন্থে—ইহাতে তিনি সচরাচর ব্যবহৃত ইংরাজী 'good' পদটার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া ঐ পদটাকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এইরূপ আমরা প্রচলিত 'স্বত্ব বা স্বামিত্ব' পদটার উদাহরণ লইতে পারি। সমাজবিজ্ঞানী এই ধারণাটার উদ্ভব কি প্রকারে হইল তাহা আলোচনা করিবেন। ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্ স্বত্ব-সম্বন্ধীয় প্রচলিত রাষ্ট্রীয় নিয়মের ব্যাখ্যা করিবেন। দার্শনিক যখন এই বিষয় ব্যাখ্যা করিবেন, তখন তিনি নিম্নলিখিত প্রশ্ননিচয়ের[৯] সমাধান অনুসন্ধান করিবেন; "স্বত্ব পদার্থটা কি? ইহা দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতি ছয়টী ভাব পদার্থের অন্তর্গত কি না? ইহা লৌকিক কি অলৌকিক? ...চৌর্য্যাদির দ্বারা আহৃত দ্রব্যে চোরের স্বত্ব উৎপন্ন হয় কিনা, এরূপ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে স্বত্ব উৎপন্ন হয় কি না? বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে যদি স্বত্ব উৎপন্ন না হয়, তবে জয়ের দ্বারাও স্বত্ব উৎপন্ন হইতে পারে কি না? ...অস্বামিক বস্তু সম্ভাবিত কি না? কোন দ্রব্য উৎপন্ন হইতেই কি কাহারও স্বত্ববৎ হইয়া উৎপন্ন হইবে; অস্বামিক বস্তু উৎপন্নই হইতে পারে না ইহাই কি সঙ্গত? স্বামীর মৃত্যুতে স্বামীর দ্রব্যে স্বামীর স্বত্বের উচ্ছেদ হয় কি না?"

প্রসঙ্গতঃ আমরা দার্শনিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কয়েকটী অভিযোগের যৌক্তিকতা আলোচনা করিতে পারি। দার্শনিক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইল যে ইহা কিছুই ব্যাখ্যা করিতে পারে না। দর্শন প্রতি পদের অনর্থক অর্থ-নিরূপণের চেষ্টা করে,[১০] অনেক অবাস্তব জিনিষের কল্পনা করে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন

৯। বঙ্গীয় দর্শন-পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক-বেদান্ততীর্থের ভাষণ হইতে উদ্ধৃত। (দর্শন, ১৩৫৬ সন, ১ম সংখ্যায় পৃঃ ১ দ্রষ্টব্য)।

১০। কয়েকজন দার্শনিকের প্রচলিত পদের অর্থ নিরূপণের প্রচেষ্টাকে কৌতুক করিয়া দার্শনিক Bertrand Russell একটি গল্প বলিয়াছিলেন, তাহা Alan Wood রচিত *Bertrand Russell : the Passionate Sceptic* নামক গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে: (পৃঃ ২৩৪)।

রাসেল একবার এক দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করেন: Winchester যাবার সবচেয়ে সোজা রাস্তা (shortest way) বলে দিতে পারেন?

দোকানী প্রশ্ন করিল: Winchester যাবেন?

রাসেল: আজ্ঞে হাঁ।

দোকানী: Winchesterএ যাবার রাস্তা জানতে চান?

রাসেল: আজ্ঞে হাঁ।

দোকানী: সোজা রাস্তা জিজ্ঞাসা করছেন?

রাসেল: হাঁ।

দোকানী: তা'ত বলতে পারি না।

রাসেল মন্তব্য করেছেন যে একদল দার্শনিকেরও এই দোকানীর মত দুরবস্থা।

সিদ্ধান্তেই আসিতে সমর্থ হয় না। দার্শনিক মতবাদেরও কোন স্থিরতা নাই, নিত্য নূতন মতের, নিত্য নূতন পদ্ধতির উদ্ভব হইতেছে।

এই সমস্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে দর্শন সকল বিষয়ের সুষ্ঠু এবং সর্ব্বজনগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা নহে। ইহার জন্য দার্শনিকই যে দায়ী তাহা নহে, ইহা আমাদের সসীম মনের সসীমত্বেরই ফল।[১১] আমরা যে সব কিছুই পূর্ণভাবে জানিতে পারিব তাহা নহে—দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কেহই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন না। দর্শনেও যেমন মতের পরিবর্ত্তন হইতেছে, বিজ্ঞানেও সেইরূপ হইতেছে; দর্শনেও যেরূপ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়, বিজ্ঞানেও সেইরূপ করিতে হয়। তবে দার্শনিকের অসুবিধা এই যে বিজ্ঞান অপেক্ষাও তাঁহার ব্যাখ্যেয় বিষয়বস্তু গভীরতর এবং সূক্ষ্মতর; এবং বিষয় যত গভীর ও সূক্ষ্ম হইবে, ব্যাখ্যাও তত দুরূহ হইবে। দার্শনিকের ব্যাখ্যার কৃতিত্ব ব্যাখ্যার সাফল্যের মাপকাঠিতে সব সময় করা চলিবে না—ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা, ব্যাখ্যেয় প্রশ্নাবলী উত্থাপন এবং ব্যাখ্যা পদ্ধতির সুশৃঙ্খলা ও গভীরতার সাহায্যে দার্শনিক ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের মন্তব্য হইল দার্শনিক ব্যাখ্যা গভীর, সূক্ষ্ম, সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক হইতে পারে; ইহা 'কি?' এবং 'কেন?' এই উভয় প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করে—মনোজগৎ ও বহির্জগতের সব কিছুই দর্শনের ব্যাখ্যেয় বিষয়বস্তু হইতে পারে। এইরূপ ব্যাখ্যায় আমাদের বুদ্ধিশক্তি উৎকর্ষ লাভ করে, জ্ঞানের গভীরতা বাড়ে এবং জ্ঞানরস পান করিয়া আমাদের মন বিমল আনন্দ লাভ করে।

১১। আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু নচিকেতাকে যমরাজ বলিয়াছিলেন, "ন হি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ" (কঠোপনিষৎ, ১।১।২১); দার্শনিক গূঢ়তত্ত্বমাত্রই অল্পবিস্তর এই কথা বলা চলে। সুতরাং কোন একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা দ্বারা বিশ্বের সকল রহস্য সম্যকরূপে উদ্‌ঘাটিত হইবে ইহা আশা করা যায় না।

অস্তিবাদ[1]

শ্রীদেবব্রত সিংহ

তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে যুক্তিগত বিচার (intellectualism) এর সার্বভৌমত্ব বিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতে যখন একরকম স্বীকৃত, তখন দেখতে পাই সম্পূর্ণ এক বিপরীতমুখী চিন্তাধারা। এক নূতন ধরণের জিজ্ঞাসার উদ্ভব হল—এক কথায় একে বলা যায় সত্তাজিজ্ঞাসা। এ জিজ্ঞাসার রকম যেমন ভিন্ন, তার বিষয় ও তেমনি ভিন্ন। কয়েক শতাব্দী ধরে বুদ্ধির যে প্রভুত্ব চলে আসছে দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, তারই মধ্যে যেন এক অন্য সুর ধ্বনিত হচ্ছে। প্রচলিত চিন্তাধারার মধ্যে এক মহৎ অভাব লক্ষিত হল—মূর্ত সৎ (concrete reality) এর অভাব। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দার্শনিক চিন্তার ধারা যুক্তিগত বিচারের পথ ধরেই চলেছে—সে পথ প্রধানতঃ বিমূর্তন (abstraction) এর পথ। চিন্তনের দাবী মেটানর ঝোঁকে দার্শনিকরা মূর্ত সংবস্তু থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। অথচ সে মূর্ত সৎকে পাবার দাবী ও আগ্রহ আমাদের সত্তার গভীরে রয়েছে। সে দাবীকে নিছক তত্ত্ববিদ্যা অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু তত্ত্বান্বেষী মানুষ কেমন করে তাকে অগ্রাহ্য করবে?

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই তাই দেখতে পাই একশ্রেণীর পাশ্চাত্য চিন্তানায়কের মধ্যে আমাদের স্বভাবে মূর্ত সৎ-এর প্রতি যে এক মূলগত তাত্ত্বিক আগ্রহ[2] রয়েছে তার পূর্ণ স্বীকৃতি। প্রচলিত দার্শনিক চিন্তাতেও 'সৎ'এরই অনুসন্ধান চলে এসেছে। কিন্তু সে অনুসন্ধান নিছক যুক্তি বিচারে পথে, যার মধ্যে সমগ্র মানুষের খোঁজা ধরা পড়েনি। ফলে সংবস্তু একটি তত্ত্ব (concept) মাত্রে পরিণত হয়েছে। তার প্রতিষ্ঠা বুদ্ধির ওপর, বিশুদ্ধ চিন্তনের ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে তাকে ধরা যায়। কিন্তু

---

১ ইউরোপ মহাদেশের সাম্প্রতিক যে দার্শনিক আন্দোলন সাধারণভাবে "Existentialism" নামে অভিহিত হয়, তাতেই অস্তিবাদ আখ্যা প্রয়োগ করা হয়েছে। এই অন্দোলনের ব্যাপক সাধারণ ধর্ম লক্ষ্য করলে 'অস্তিবাদ' অপেক্ষা 'অস্মিবাদ' আখ্যাটিই আরও সঙ্গত মনে হতে পারে। তবু অস্তিত্বসূত্রের সাধারণ উল্লেখে অস্তিবাদ আখ্যাটিই এই প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। বৌদ্ধ 'সর্বাস্তিবাদ' জাতীয় যে স্বতন্ত্রবস্তুবাদী (realistic) মত রয়েছে, তা' থেকে এর মূলগত সে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য এই মতের আলোচনাতেই স্পষ্ট হবে।

২ Kierkegaard এর রচনায় 'metaphysical demand' এর উল্লেখ দ্রষ্টব্য।

চিন্তনমাত্রগ্রাহ্য এই সৎএ কি সেই মূর্ত সৎবস্তুর উপলব্ধি হতে পারে, যার সংস্পর্শে আমাদেব তত্ত্বক্ষুধা মিটতে পারে ? নিছক চিন্তনগ্রাহ্য সৎ থেকে একে পৃথক করবার জন্য একে বলা হল শুদ্ধঅস্তিতা বা শুদ্ধসত্তা (Existenz)। এ অস্তিতা আবার সৎবস্তুর অন্যতম একটি গুণমাত্র নয়। এ নিজে একটি স্বতন্ত্র বস্তু। কিন্তু অন্য দশটি বস্তুর মত মোটেই নয়। কারণ এর প্রতিষ্ঠা জ্ঞাতা বা বিষয়ী নিরপেক্ষ বিষয়জগতে নয়, বরং ব্যক্তিসত্তার একান্ত আন্তরস্বরূপেই এর পরিচয়।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ আর যুক্তি-এ দুয়ের যোগে সাধারণতঃ আমরা স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম বস্তুর স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারি। প্রচলিত দর্শনে তত্ত্বের উদ্ঘাটন ও এমনি যুক্তির কাছে। বিচারাশ্রয়ী তত্ত্বনির্বচনের মধ্য দিয়েই দার্শনিকের তথা বৈজ্ঞানিকের মন জগতের ও মানুষের রহস্য চিন্তা করতে অভ্যস্ত। যৌক্তিক বিশ্লেষণের ধাপে ধাপে বিশুদ্ধ চিন্তনের যে কাঠামো গড়ে ওঠে, তাতে আমাদের বুদ্ধিগত দাবী অনেকাংশে মিটতে পারে বটে, কিন্তু মানুষের সামগ্রিক মনের গভীরতর দাবী তৃপ্ত হয় কি ? প্রত্যক্ষ সৎএর দৃঢ় ভিত্তি ছাড়া যুক্তির স্বতন্ত্র জালবোনা যে নিস্ফল মনন-কল্পনায় পরিণত হবে। এ যে অর্ল্যাণ্ডোর ('As you like It'এ বর্ণিত) সেই ঘোড়ার মত হবে যার সমস্ত রকম গুণ রয়েছে, অভাব কেবল প্রাণের ! অবিমিশ্র যুক্তি আমাদের অমূর্ত তত্ত্ব দিতে পারে, চিন্তনে পরিচ্ছন্ন ছবি দিতে পারে—কিন্তু তাতে প্রকৃত অস্তিত্বেরই ঠাঁই নেই।

এই অস্তিত্ব কি ভাবে পাওয়া যাবে ? তার স্বরূপই বা কি ? প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই দ্বিতীয়টির হদিশ মিলবে। অস্তিতার প্রাপ্তি যুক্তির নিস্ফল পথে নয়। যুক্তির অস্বীকৃতি ও অতিযৌক্তিকের (irrational) স্বীকৃতিতেই অস্তিতাপ্রাপ্তির সাধন। আমাদের স্বভাবে বুদ্ধি ব্যতীত আরেকটি শক্তি রয়েছে, তা হচ্ছে কৃতি বা প্রযত্ন (will)—যাকে সচরাচর 'ইচ্ছা' বলা হয়। মানুষ জ্ঞানসর্বস্ব জীব নয়; সে ক্রিয়াস্বভাবও বটে। এ ক্রিয়া বাহ্যিক, জৈবিক ক্রিয়ামাত্র নয় ; এ ক্রিয়া মূলতঃ কৃতিস্বরূপ। কাণ্ট অবিমিশ্র চিন্তন (pure reason) এর অতীত কৃতিশক্তির (practical reason) অবতারণা করেছিলেন। নীতির (morality) রাজ্য এই দ্বিতীয় শক্তি থেকেই উদ্ভূত। আর অস্তিতাকে যাঁরা মূলতত্ত্ব বলে স্বীকার করলেন, তাঁরা এই কৃতিশক্তির পথটিই গ্রহণ করলেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী হল মূলতঃ নৈতিক (ethical), বুদ্ধিমূলক (intellectual) নয়।

বুদ্ধিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কৃতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মূল পার্থক্য এস্থলে উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধিমূলক বিচার অগ্রসর হয় বিবিক্ত তত্ত্বের পথে ; তত্ত্ব-বিবেক

(distinguishment) বুদ্ধিবাদী দর্শনের লক্ষ্য। কিন্তু কৃতিতে যে বস্তুসিদ্ধি তা বিবেকলভ্য নয়, বরং অভেদীকরণে (indentification) লভ্য। কৃতিসাধ্য বস্তু বিবেকে পরিস্ফুট হয় না, অভেদীকরণেই তার উপলব্ধি হয়। অস্তিবাদীর মতে সংবস্তুর স্বরূপের উপলব্ধি বিবেকজ্ঞানের মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়, অবিবিক্তভাবেই সংএর সিদ্ধি হয়।

এই অভেদীকরণ থেকেই অস্তিবাদী দর্শনের সাধারণভাবে যে বিষয়ী-ধর্মী (subjective) সুর, তা' ধরা পড়বে। পাশ্চাত্য দর্শনে বিষয়ী-ধর্মীতার পরিচয় নানাভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু অস্তিবাদে যে বিষয়িতা, তার সূত্র রয়েছে কৃতিশক্তির মধ্যে। কারণ ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টামাত্র বা জ্ঞাতামাত্র নয়, সক্রিয় 'হওয়া'তেও তার অসীম আগ্রহ।* এবং ব্যক্তির আন্তরসত্তাতেই এই 'হওয়া'র একমাত্র চাবিকাঠী। আপনার প্রতি ব্যক্তির যে অন্তর্মুখীনতা, তাই অস্তিতাকে সিদ্ধ করছে। অস্তিতার অনুসন্ধানে তাই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর একটি মহৎ পরিবর্তন সাধিত হল। সমস্ত তত্ত্বানুসন্ধান হল বিষয়ীগত (subjective)। যে অস্তিতার সাধনে যুক্তিবিদ্রোহী তৎপর, তার সন্ধান বিষয়-জগতে মিলবে না। কারণ, তা' বহির্জগতের নানা বস্তুর অন্যতম একটি নয়। বিষয়াভিমুখী দৃষ্টিতে বস্তুর যে ধর্ম ধরা পড়ে, তা' দিয়ে খাঁটী অস্তিতার বিচার চলে না। আমাদের সমগ্র আন্তর সত্তাই এই অস্তিতা। অস্তিতা-দর্শনে বিষয়ী (subject) কোনও অনুমেয় সূত্রস্বরূপ নয়, বিমূর্তনে গ্রাহ্যও নয়। বরং বুদ্ধির অতিরিক্ত অন্য কোনও পথে মূর্ত আন্তরসত্তায় অস্তিত্বলোকের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা'ই বিষয়ী।

এইভাবে অস্তিতার যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হল, যুক্তিবাদী দর্শনে অস্তিত্বতত্ত্বের সাধারণ ব্যাখ্যা থেকে তার মূলগত পার্থক্য। বিচারতত্ত্ববাদী দর্শনে অস্তিত্ব অমূর্তীকরণলভ্য সৎ (Being) এর একটি সম্ভাব্য (possible) পর্যায়। সেখানে বৌদ্ধিক সম্ভাবনার আলোয় সৎকে বিচার করা হয়। আর, যে দর্শনে সৎই মুখ্য, সেখানে নিছক সম্ভাবনার (possibility) কোনও স্থান নেই—সৎএর পরিপ্রেক্ষিতেই একমাত্র কোনও তত্ত্বের বিচার সম্ভব। এই চিন্তাধারার অনুসরণেই পরবর্তী অস্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে অস্তিতাদর্শনের মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে এইভাবে—

*। দ্রঃ Kierkegaard এর মন্তব্য : "The ethical proposes to do away with *the disinterestedness of the possible* by making existence the infinite interest,"

৪। দ্রঃ সার্ত্র (Sartre)র সূত্র : "Existence precedes essence"।

অস্তিতা তত্ত্বধর্মের (essence) পুরোবর্তী।[৪] অর্থাৎ বুদ্ধিলভ্য বিবিক্ত তত্ত্বের অনুসরণে অস্তিতার স্বভাব নির্ধারিত হয় না, অস্তিতার তত্ত্বধর্ম-নিরপেক্ষ একটি আদিম স্বরূপ রয়েছে।

*　　*　　*　　*　　*　　*

ইউরোপ মহাদেশে শতাব্দীব্যাপী যে মানসিক আবহাওয়া জমেছিল, তা থেকেই উনবিংশ শতাব্দীতে উদ্ভব হল এই নূতন ধরণের চিন্তাধারার। পাশ্চাত্য মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অলক্ষ্যে যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তার পুরো স্বীকৃতির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ইউরোপীয় সংস্কৃতির সনাতন (ক্লাশিক্যাল) কাঠামো যেন অনেক পিছনে পড়ে যাচ্ছিল সমসাময়িক জীবন থেকে, অথচ তার রেশ চলছিল গতানুগতিক চিন্তার মধ্যে। একদিকে মানুষের বুদ্ধির নিরন্তর অভিযান, অপরদিকে জীবনে বিশ্বাসের ভিত্তিমূলের অভাব—এ দুয়ের বিরোধ পাশ্চাত্য মানসকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। এই পরিস্থিতিতে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে এমন দুই মনিষীর আবির্ভাব হল যাঁদের চেতনায় যুগের এই আধ্যাত্মিক অসঙ্গতি তীব্রভাবে ধরা পড়ল। ডেনদেশীয় কীর্কেগার্ড (Sooren Kierkegaard) ও জার্মাণীর নীট্‌শে (Nietzsche) উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বভূমি থেকে ছিন্নমূল ইউরোপীয় মানসের অন্তর্নিহিত অভাব উপলব্ধি করলেন। পুরোবর্তী কীর্কেগার্ড বুদ্ধির একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন; স্থাপন করলেন অতিযৌক্তিকের দাবী, ক্রিয়াত্মক মানুষের প্রাধান্য। আর নীট্‌শে মানুষের একান্ত গুরুত্ব ও মহিমার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। উভয়েই খুঁজলেন সৎএর ভিত্তিমূল; কিন্তু উভয়েই শুদ্ধবুদ্ধির উপর অবিশ্বাসী। কীর্কেগার্ড ও নীট্‌শে কেউই রীতিবদ্ধ কোনও দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন নি—উভয়েই বরং সে ধরণের দার্শনিকতার বিরোধী ছিলেন। তবু দু'জনকেই পরবর্তী-কালে প্রচলিত সত্তাদর্শনের প্রধান দুই পথিকৃৎ বলে অভিহিত করা যায়। অবশ্য এই দর্শনের স্পষ্টতর নির্দেশ কীর্কেগার্ডের নিজস্ব ভঙ্গীতে লেখা দার্শনিক-সাহিত্যিক রচনার মধ্যেই পাওয়া যায়।[৫]

কীর্কেগার্ড ছিলেন হেগেলীয় দর্শনের তীব্র সমালোচক। হেগেলের যুক্তিবদ্ধ বুদ্ধিতন্ত্রে অস্তিত্বের স্থান নেই। বিষয় এবং বিষয়ী, চিন্তা এবং সত্তার যে সমন্বয় বুদ্ধিতন্ত্রে সিদ্ধ হয়েছে, কীর্কেগার্ড সেটাকে নিছক বুদ্ধির গোঁজামিল বলে মনে করতেন। কারণ, তাঁর মতে উভয়ের চূড়ান্ত বিচ্ছেদেই প্রকৃত সত্তার উপলব্ধি হয়।

৫। দ্রঃ Either Or ; Philosophical Fragments ; Postscript ইত্যাদি রচনা।

তাই কীর্কেগার্ড তাঁর চরম বিকল্প স্থির করলেন – হয় কিংবা নয় (Ether or)। এ দুয়ের মধ্যে কোনও রফা সম্ভব নয়।

বুদ্ধিতন্ত্রের সর্ব্বগ্রাসী বন্ধন থেকে মুক্তির পথ আমাদের নৈতিক চেতনার ক্রিয়াত্মক ধর্মকে আশ্রয় করা। আমাদের চিন্তনশীল সত্তা প্রকৃত অস্তিত্ব থেকে বিচ্যুত। কিন্তু সত্তাবিরহিত চিন্তনমাত্রগ্রাহ্য সম্ভাব্য তত্ত্বের প্রতি নৈতিক চেতনার কোনও আগ্রহ থাকতে পারে না। অস্তিতাতেই তার একমাত্র আগ্রহ। কীর্কেগার্ড তাই নৈতিকতার দাবী ঘোষণা করলেন; সে দাবী যুক্তি-নির্দিষ্ট নয়।

অস্তিতার এই দ্বিধাহীন স্বীকৃতির সূত্র অবলম্বন করে পরবর্তী একাধিক ইউরোপীয় দার্শনিক তাঁদের স্বকীয় দর্শনতন্ত্র গড়বার প্রয়াস করলেন। তাঁদের সাধারণ মূলসূত্র হল অন্তরসত্তামূলক অস্তিত্ব (Exixtenz)। কীর্কেগার্ডকে অনুসরণ করে এঁরাও স্বীকার করলেন, অস্তিত্বের গভীরতা অসীম – সে গভীরতা নির্দিষ্ট জ্ঞানে সীমা অস্বীকার করে চলে। ব্যক্তিমানবের খাঁটী স্বরূপ তার একান্ত আন্তরসত্তায়। সে সত্তা অপার্থিব কিংবা অলৌকিক নয়, আবার নিতান্ত ব্যবহারিক বা জাগতিক নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিষয়াভিমুখী দৃষ্টিতে এ অস্তিতা ধরা পড়বে না।[৬] অন্তর্মুখী আত্মচেতনার মধ্য দিয়েই এর উপলব্ধি। সে আত্মচেতনার রূপ পরিস্ফুট হয় নিবীড় চিত্ত-সংক্ষোভের মধ্য দিয়ে। ব্যক্তির আন্তরজীবনে নানাভাবে সে সঙ্কটময় (critical) পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তারই মধ্য দিয়ে সত্তাশ্রয়ী অন্তর্মুখীনতা জাগ্রত হয়।

বস্তুতঃ সত্তাবাদী দার্শনিকের কাছে অস্তিত্ব-তত্ত্বের সংজ্ঞানির্দেশের চেয়ে বড় আলোচ্য—অস্তিত্বের বোধের প্রকার কি। কারণ আন্তরসত্তারূপ যে অস্তিত্ব, তার বিশ্লেষণ চলে না, এবং কোনও নির্দিষ্ট সূত্র দ্বারা তার স্বরূপ নির্ধারণ করতে যাওয়াও ব্যর্থ-প্রয়াস। তাই হাইডেগার (Heidegger), য়্যাসপার্স (Jaspers), সার্ত্র (Satre), মার্সেল (Marcel) প্রমুখ সমস্ত আধুনিক সত্তাবাদী দার্শনিকদের চিন্তার ঝোঁক রয়েছে আন্তরজীবনের বিভিন্ন মানসিক মেজাজের (mood) ওপর—যেমন, ক্ষোভ (anguish), উৎকণ্ঠা (care, anxiety), শংকা (dread) ইত্যাদি। এ সমস্তের মূলে রয়েছে মনের গভীরতর অস্বস্তি—যুক্তিতে পাইনা, অথচ 'আছি' এই বোধ। যুক্তির অতলে তলিয়ে যেতে যেতেই 'নেতি' (Nothing)র মধ্য দিয়ে সৎএর প্রকাশ হয়। আর তাতেই যুক্তির অবসান।

৬। তুলনীয়: Jaspersএর মন্তব্য: "Existenz is the object of no science"।

অস্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সিদ্ধ সংবস্তুর স্বীকৃতি নেই। প্রাক্-সোক্রেতীয় দার্শনিকদের অথবা হেগেলের নিত্যসিদ্ধ সংবস্তু (Being) মাত্র অমূর্তীকরণেই সম্ভব। মূর্ত সং সাধ্যবস্তু, আমাদের কৃতিশক্তির নিরন্তর গতিতে তার সৃষ্টি।[৭] এ সং ভূতবস্তু নয়, এ ভূয়মান (Becoming)। সত্তাবাদী দার্শনিক যখন তাত্ত্বিক অতি-ক্রমণের (transcendence) অথবা সংএর কথা বলেন[৮], তখনও স্বীকার করেন যে অতিক্রমণ-ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই সংএর সিদ্ধ।

বিভিন্ন সত্তাবাদী চিন্তাবিদ্ স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন পথে তাঁদের দর্শনতন্ত্রে সত্তার স্বরূপ লক্ষণের বিস্তর ব্যাখ্যা করেছেন। সে সবের বিবৃতি এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। মোট কথা ব্যক্তির একান্ত অন্তর্মুখী উপলব্ধিই তাঁদের কাছে পরমার্থ সত্তা। বাইরের কোনও কিছু দিয়ে এর পরিমাপ নেই। সাধারণ বিষয়গত ধর্ম এর নেই। বাইরের জিনিষের মত কাজেও লাগান চলবে না। অথচ জগৎ থেকে এ সত্তা একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির মধ্যে তা বিধৃত। জগৎ-যুক্ত হয়েও সত্তার আপন ধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্তরমুখীনতার মধ্য দিয়ে নিজের যে সত্তা নিজের কাছে ধরা পড়ে, তার একটি স্ববর্তী কালক্রমিতা (temporality) রয়েছে, প্রতি সত্তা তার একান্ত স্বভাবে ঐতিহাসিক।[৯]

* * * * *

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে অস্তিবাদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার ও জীবন-দর্শনের অতিবৌদ্ধিকতা ও অতিবৈজ্ঞানিকতারই প্রতিক্রিয়া পরিস্ফুট হয়েছে। একদিকে দর্শনচিন্তায় বুদ্ধিসাধনজন্য অমূর্তীকরণ, অপরদিকে আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান সামান্যীকরণ—এ দুয়ের পেষণে সংএর ভিত্তিমূল বিধ্বস্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কারও আর মূর্ত সংএর প্রতি সত্যিকারের আগ্রহ নেই। অনুভূতির মূর্ত ভিত্তিমূল থেকে বর্জিত নিছক সম্ভাব্যতার শূন্যলোকে ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব,[১০] নিয়ে বুদ্ধির এই দৌড়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছে অস্তিবাদী দর্শন। সামান্যীকরণের সমুদ্রে ব্যক্তির বিশেষ সত্তার যে বিলয় প্রকৃতিবিজ্ঞান-প্রধান সভ্যতার প্রতি পদে প্রতি স্তরে সাধিত হচ্ছে,

---

৭। তুলনীয় : "Reality is in action", Sartre।

৮। যথা Heideggerএর Being (Sein), কিম্বা Jaspersএর 'Encompassing'।

৯। Heidegger, Jaspers প্রভৃতির চিন্তায় প্রকাশমান সংএর একান্ত ধর্মরূপে ঐতিহাসিকতা (historicity)র উল্লেখ।

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "শ্যামলী" ("আমি")।

তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই অস্তিবাদেই মূর্ত হয়েছে। তাছাড়া বিধিচেতনা (values) ও নীতিবোধের যে ঐতিহ্য বিংশ শতাব্দীর আমূল পরিবর্তিত মানুষের জীবনে প্রভুত্ব করে চলেছিল, তার নূতন মূল্যায়নের সুযোগ এনে দিল এই অস্তিবাদ। অস্তিবাদ ব্যক্তিমানবের মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার পথে একটা মহৎ প্রয়াস।

অস্তিবাদের এ সমস্ত গুণ সত্বেও প্রশ্ন ওঠে ; বুদ্ধির দাবী অস্বীকার করে বুদ্ধি-বিমুখ কৃতির ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে সার্থক দর্শন সম্ভব কি ? এখানে দার্শনিক চিন্তা কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রি হয়ে পড়ে তাই নয়, নিতান্ত একটা মনোবিশ্লেষণে পরিণত হবারও সম্ভাবনা থাকে। জ্ঞানের ধর্মকে অর্থাৎ তত্ত্ব-বিবেকের পথে বিচারকে অস্বীকার করে গোড়া থেকেই অতিযৌক্তিকের কাছে আত্মসমর্পণে সত্তাজিজ্ঞাসার প্রকৃত সমাধান হয় কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে।[১১]

তবুও একথা সাধারণভাবে বলা চলে, সত্তামূল থেকে উচ্ছিন্ন নিস্ফল বহির্মুখীনতায় যখন বর্তমান চিন্তাজগৎ লিপ্ত, তখন সত্তাবাদীর আহ্বানে সার্থক তত্ত্বজিজ্ঞাসুর সাড়া দেওয়া উচিত। য়্যাস্‌পার্স দার্শনিকতার যে নির্দেশ দিয়েছেন, এক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে দার্শনিক চিন্তন মানুষের আন্তর চেতনা থেকেই নিরন্তর উদ্ভূত হবে—এই চিন্তনক্রিয়া ব্যক্তিচেতনার ভিত্তিমূলে বিধৃত। নীট্‌শে তাঁর সময়ের যুগমানস বিচার করে বলেছিনে, ভগবানের মৃত্যু ঘটেছে (Gott ist tot)। বিংশ শতাব্দীর চিন্তায় সেই মৃত দেবতারই সন্ধান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার আবাহন চলেছে। প্রতিষ্ঠা এখনও হয়েছে কি ?

১১। অবশ্য দার্শনিক য়্যাস্‌পার্স একদিকে বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য ও অপর দিকে অস্তিতার আশ্রয়মূল—এ উভয়ের স্বাভাবিক সহযোগের গুরুত্ব স্পষ্টই স্বীকার করেন। কেবল আবেগমূলক যে শক্তি-বিহীন অস্তিতা, তার পরিণতি অন্ধ তত্ত্ববিমুখতায়। দ্রঃ K. Jaspers, *Reason and Existenz.*

Statement about ownership and other particulars about newspaper* Darsan *to be published in the first issue every year after the last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	Calcutta
2.	Periodicity of its Publication	Quarterly
3.	Printer's Name	Sri Ramranjan Dass
	Nationality	Indian
	Address	1, Haritaki Bagan Lane, Cal.-6
4,	Publisher's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nanionality	Indian
	Address	20/2, Halderbagan Lane, Cal.-4.
5.	Editor's Name	The same as 4
	Nationality	
	Address	
6.	Names and addresses of the owner of the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent. of the total capital.	Bangiya Darsan Parishad 20/2, Halderbagan Lane, Calcutta-4. Nil

I, Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 5th June, 1958

Signature of Publisher

K. C. Gupta

লক্ষণবাক্যের লক্ষণনির্ণয়

শ্রীরমাপ্রসাদ দাস

এ প্রবন্ধের আলোচ্য লক্ষণবাক্যের লক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক দু'একটি সমস্যা। লক্ষণবাক্যের দুদিক্ : লক্ষ্য ও লক্ষণ। যার লক্ষণ নির্ণয় করা হয় সে লক্ষ্য। আর যার সাহায্যে লক্ষ্য লক্ষিত হয় সে লক্ষণ। লক্ষ্য ও লক্ষণের সম্বন্ধ হল সমতার, আর কারও কারও মতে, তাদাত্ম্যের সম্বন্ধ। পরে দেখতে পাব যে সমতার সম্বন্ধকে সমব্যাপ্তির সম্বন্ধ আখ্যায়ও অভিহিত করা যায়।

আবার অনেকের মতে লক্ষ্য ও লক্ষণের সম্বন্ধ হল সমার্থতার সম্বন্ধ। কাজেই লক্ষণবাক্যের লক্ষণ আলোচনায় সমতা, সমব্যাপ্তি, তাদাত্ম্য ও সমার্থতার সম্বন্ধও অবশ্য আলোচ্য। এদের মধ্যে প্রথমেই সমতার সম্বন্ধের স্বরূপ বুঝে নেওয়া দরকার। কারণ লক্ষ্য ও লক্ষণের সম্বন্ধ তাদাত্ম্যের সম্বন্ধ কি অন্যবিধ সম্বন্ধ সেটা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু এবিষয়ে বোধ হয় কোন মতভেদ নেই যে লক্ষ্য ও লক্ষণের সম্বন্ধ অন্ততঃপক্ষে সমতার সম্বন্ধ। অর্থাৎ যাঁদের মতে লক্ষ্য ও লক্ষণের সম্বন্ধ সমতাভিন্ন অন্য কোনো সম্বন্ধ তাঁরাও স্বীকার করবেন যে সমতা-সম্বন্ধ না থাকলে তাঁদের গৃহীত সম্বন্ধও, যেমন তাদাত্ম্য, সমার্থতা ইত্যাদিও, থাকতে পারে না। আর সমতার সম্বন্ধ বুঝতে পারলে সমতার সাহায্যে তাদাত্ম্য, সমার্থতা প্রভৃতি সম্বন্ধের স্বরূপও বোঝা যাবে। কিন্তু সমতা ব্যাখ্যা করব কেমন করে, সমতার লক্ষণ উল্লেখ করব কি দিয়ে?

নানাভাবে সমতা ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা নিয়ামক ধর্মের সাহায্যে সমতা ব্যাখ্যা করতে, সমতার লক্ষণ নির্ণয় করতে, চেষ্টা করব। কাজেই প্রথমে নিয়ামক কথাটির মানে বুঝে নেওয়া যাক্। কোন কিছু, খ, যদি অন্যকিছুর, ক এর, দ্বারা অন্ততঃ অংশতঃ নিয়মিতঃ মানে নিয়ন্ত্রিত হয়—অর্থাৎ কোনকিছুর, খ-এর, থাকা না থাকা, বিশেষভাবে থাকা না থাকা, যদি অন্যকিছুর, ক-এর থাকা না থাকার উপর অন্ততঃ অংশতঃ নির্ভর করে, তা হলে ক খ এর নিয়ামক, এবং খ ক-এর নিয়মিত।

বলা হল যে কোনো কিছু অন্যকিছুর নিয়ামক। এখানে "কিছু" বলতে বুঝছি দ্রব্য, গুণ, কর্ম ইত্যাদি। এখন, দ্রব্যগুণাদি জানার, এদের চিনে নেবার, নিয়ামক হল কোন ধর্ম বা ধর্মসমষ্টি। সেজন্য নিয়ামক প্রসঙ্গে আমরা সাক্ষাৎভাবে ধর্মীর কথা না বলে ধর্মের কথাই বলব। মানে নিয়ামক ও নিয়মিত বলতে আমরা নিয়ামক ধর্ম ও নিয়মিত ধর্মই বুঝব। অর্থাৎ ক খ-এর নিয়ামক বলতে বুঝব ক ও খ উভয়ই সাক্ষাৎভাবে ধর্মবাচক।

নিয়ামক বহু প্রকারের। নিয়ামকের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকারগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ সুবিন্যস্ত করে নিয়ামকের গণিত রচনা করা যায়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের আলোচ্য সমতা-সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ ব্যাখ্যার জন্য প্রধানতঃ দু রকম নিয়ামকের উল্লেখ প্রয়োজন। পর্যাপ্ত নিয়ামক ও অপরিহার্য নিয়ামক তাছাড়া, নিয়ামকের প্রকারের বহুত্বের মূলে আছে এ দু'ধরণের নিয়ামক। কাজেই নিয়ামকের এ মৌল প্রকারগুলির স্বরূপ বুঝতে চেষ্টা করা যাক। লক্ষণীয় যে নিয়ামকের লক্ষণ উল্লেখ করতে আমরা উপপত্তির সাহায্য নিচ্ছি। উপপত্তি বাক্যের আকার হল : কোনো কিছুতে ক থাকলে, খ থাকে অথবা (ক ও খ যদি আণবিক বাক্য হয় তাহলে) যদি ক সত্য হয়, তাহলে খ সত্য। উপপত্তি-সম্বন্ধের দুদিক : উপপাদক ও উপপাদ্য। উক্ত আকারীয় দৃষ্টান্তে ক উপপাদক আর খ উপপাদ্য। মানে উপপাদক উপপাদ্যের সম্বন্ধ ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ সদৃশ। এবার দুটি সূত্রে পর্যাপ্ত ও অপরিহার্য নিয়ামক এর লক্ষণ উল্লেখ করা যায়।

১ম সূত্র : ক খ-এর পর্যাপ্ত নিয়ামক বলতে বুঝি : ক থাকলে খ থাকবেই, ক-এর উপস্থিতি স্বীকার করে খ-এর উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না। অথবা খ না থাকলে ক-ও থাকবে না। এ রকম ক্ষেত্রে ক উপপাদক আর খ উপপাদ্য। মানে ক-ধর্মী ব্যাপ্য আর খ-ধর্মী ব্যাপক। অর্থাৎ ক- ও খ-ধর্মীর মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক, ক- ও খ-ধর্মের মধ্যে উপপাদক উপপাদ্য সম্বন্ধ থাকলে ক-কে খ-এর পর্য্যাপ্ত নিয়ামক বলা হয়।

২য় সূত্র : ক খ-এর অপরিহার্য নিয়ামক বলতে বুঝি : খ থাকলে ক থাকবেই, খ-এর উপস্থিতি স্বীকার করে ক-এর উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না, অথবা ক না থাকলে খ-ও থাকবে না। এ রকম ক্ষেত্রে খ উপপাদক আর ক উপপাদ্য। মানে খ-ধর্মী ব্যাপ্য আর ক-ধর্মী ব্যাপক। অর্থাৎ খ- ও ক-ধর্মীর মধ্যে ব্যাপ্য-ব্যাপক, খ- ও ক-ধর্মের মধ্যে উপপাদক-উপপাদ্য, সম্বন্ধ থাকলে ক-কে খ-এর অপরিহার্য নিয়ামক বলা হয়।

লক্ষণীয় যে উক্ত সূত্র দুটির যে কোনো একটিতে ক ও খ-কে অদল-বদল করে, আর "পর্যাপ্ত"-এর পরিবর্তে "অপরিহার্য" আর "অপরিহার্য"-এর পরিবর্তে "পর্যাপ্ত" ব্যবহার করলে অন্য সূত্রটিও পাওয়া যাবে। এবং দ্বিতীয় সূত্রে ক-এর পরিবর্তে খ এবং খ-এর পরিবর্তে ক ব্যবহার করে বলতে পারি যে খ ক-এর অপরিহার্য নিয়ামক। দেখা যাবে যে খ ক-এর অপরিহার্য নিয়ামক বলতে যা বোঝায় ক খ-এর পর্যাপ্ত নিয়ামক বলতে ও তাই বোঝায়। মানে ক যদি খ-এর পর্যাপ্ত নিয়ামক হয়, তাহলে খ ক-এর অপরিহার্য নিয়ামক। আরও লক্ষণীয় উক্ত সূত্র দু'টি যুক্ত করে আরও একটি সূত্র পাওয়া যায়।

৩য় সূত্র ঃ ক ও খ-এর মধ্যে যদি এমন সম্বন্ধ থাকে যে ক থাকলে খ থাকবে এবং খ থাকলে ক থাকবে অর্থাৎ এমন হতে পারে না যে এদের একটি আছে কিন্তু অন্যটি নেই, তাহলে ক খ-এর অথবা খ ক-এর পর্যাপ্ত-অপরিহার্য নিয়ামক। অর্থাৎ ক ও খ-ধর্মী মধ্যে যদি এমন সম্বন্ধ থাকে যে ক অথবা খ যুগপৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপক, ক- ও খ-ধর্ম যুগপৎ উপপাদক ও উপপাদ্য, তাহলে এরা পরস্পরের পর্যাপ্ত-অপরিহার্য নিয়ামক।

এ সম্বন্ধেরই নাম সমতা-সম্বন্ধ। দুটি ধর্মের ক ও খ-এর, মধ্যে যে কোনোটি যদি অন্যটির পর্যাপ্ত-অপরিহার্য নিয়ামক হয় তাহলে বুঝব এদের মধ্যে সমতা আছে। পর্যাপ্ত-অপরিহার্য নিয়ামকের সম্বন্ধ, মানে সমতার সম্বন্ধ, অভিন্নসম্বন্ধীবৃত্তি†, সম্বন্ধীক্রমনিরপেক্ষ* ও মধ্যপদলোপ্য**। মানে ক ও খ এর মধ্যে সমতার সম্বন্ধ থাকলে : ক ও ক-এর এবং খ ও খ-এর মধ্যে সমতা থাকবে, ক খ-সম হলে খ ক-সম হবে, ক খ-সম এবং খ গ-সম হলে ক গ-সম।

এবার সমতার সম্বন্ধের সঙ্গে উল্লিখিত অন্য সম্বন্ধগুলির সম্পর্ক নির্ণয় করা যাক। সমতার সম্বন্ধ সমব্যাপ্তি সম্বন্ধের পর্যাপ্ত-অপরিহার্য নিয়ামক। আর সমতা তাদাত্ম্যের বা সমার্থতার অপরিহার্য নিয়ামক, অর্থাৎ তাদাত্ম্য ও সমার্থতা এ উভয়ই পৃথকভাবে সমতার পর্যাপ্ত নিয়ামক। তার মানে সমতা না থাকলে তাদাত্ম্য ও সমার্থকতা থাকতে পারে না, কিন্তু কেবল সমতা থাকলেই কোন সম্বন্ধকে তাদাত্ম্য বা সমার্থতা সম্বন্ধ আখ্যায় অভিহিত করা যায় না। ক ও খ-এর মধ্যে সমার্থতার সম্বন্ধ থাকতে হলে : প্রথমতঃ ক ও খ-কে দুটি ভিন্ন প্রতীক হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, ক-নির্দেশিত পদার্থ ও খ-নির্দেশিত পদার্থের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ থাকবে। অর্থ দু প্রকার : ধর্মনির্দেশক ও ধর্মীনির্দেশক, প্রকারবাচক ও বিশেষ্যবাচক। তাদাত্ম্যের সম্বন্ধের সম্বন্ধীদের মধ্যে ধর্মীনির্দেশক অর্থের অভিন্নতা আছে।

† idempotent * symmetrical ** transitive

কিন্তু ধর্মনির্দেশক অর্থের অভিন্নতা নাও থাকতে পারে। আর তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আবদ্ধ সম্বন্ধীদের ধর্মনির্দেশী অর্থের অভিন্নতা থাকলে এ নামের সমার্থতার সম্বন্ধ বলা যায়।

আমরা বলতে চেয়েছি যে সমার্থতা বলতে বুঝব প্রতীকের ধর্মনির্দেশী অর্থের তাদাত্ম্য, আর তাদাত্ম্য বলতে বুঝব ধর্মীনির্দেশী অর্থের অভিন্নতা। মানে তাদাত্ম্য হল পদার্থের সম্বন্ধ আর সমার্থতা হল পদের সম্বন্ধ। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে প্রতীকের ভিন্নতা তাদাত্ম্যের অপরিহার্য নিয়ামক। অর্থাৎ "ক হল ক"—এ বাক্যের অন্তর্ভুক্ত "ক" দুটিকে ভিন্ন হতে হবে, এ ক্ষেত্রে ক যদি অভিন্ন হয় তাহলে এদের মধ্যে তাদাত্ম্যের সম্বন্ধ অনির্বচনীয় হয়ে পড়ে।

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর এবার লক্ষণবাক্যের লক্ষণ আলোচনায় ফিরে আসা যাক। উপরে যা বলা হল তা থেকে বোঝা যায় যে সমতা লক্ষণবাক্যের অপরিহার্য নিয়ামক। কিন্তু সমতা লক্ষণবাক্যের পর্যাপ্ত নিয়ামকও কি না এটাই সমস্যা। অর্থাৎ ক ও খ-এর মধ্যে সমতা থাকলেই একটিকে অন্যটির লক্ষণ বলা যাবে কি? লক্ষণবাক্য সম্পর্কে আরও একটি গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যা হল এই: লক্ষণবাক্য কি কেবল বৈশ্লেষিক, অভিজ্ঞতা-অনপেক্ষ, ভাষাবিষয়ক, সংকল্পজ্ঞাপক বাক্য—না কি সাংশ্লেষিক, অভিজ্ঞতানির্ভর, পদার্থবিষয়ক নিয়মবোধক বাক্য? আমাদের বক্তব্য হল এই যে লক্ষণবাক্য অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্য; লক্ষণ আবিষ্কার করতে হয়। লক্ষণ লক্ষ্যের নামের বিশ্লেষণ মাত্র নয়; লক্ষণবাক্য পদার্থবিষয়ক বাক্য, প্রাকৃত নিয়মের বিবৃতি। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের একটা বিষয় হল সুনির্দিষ্ট প্রত্যয়-গঠন—মানে লক্ষণ নির্ণয়, এবং এ রকম প্রত্যয় ব্যতীত আরোহ অনুমান অগ্রসর হতে পারে না। আমরা দেখতে চেষ্টা করব যে সমতা লক্ষণবাক্যের পর্য্যাপ্ত অপরিহার্য নিয়ামক।

এবার আমাদের পূর্বপক্ষ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। পূর্বপক্ষের মতে লক্ষণবাক্যের অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য একটি নাম, এবং এর লক্ষণও সমার্থক একটি নাম। লক্ষণবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক হল দুটি নামের সমার্থতার সম্বন্ধ। তাছাড়া লক্ষণবাক্য বিবৃতিবোধক বাক্য নয়, প্রস্তাবজ্ঞাপক বাক্য। যেমন, যখন বলি ত্রিভুজ হচ্ছে তিন বাহুবিশিষ্ট সমতলক্ষেত্র তখন আমরা এ প্রস্তাব করি যে এ বাক্যের উদ্দেশ্য-পদের পরিবর্তে বিধেয়-পদ এবং বিধেয়-পদের পরিবর্তে উদ্দেশ্য-পদ ব্যবহার করব। এরূপ প্রস্তাবের তাৎপর্য হল এই যে প্রয়োজন বোধ করলে আমরা একটি জটিল বাক্যাংশের পরিবর্তে একটি অপেক্ষাকৃত সরল প্রতীক ব্যবহার

করতে পারি। এজন্য কোয়াইন বলেছেন যে "to define a sign is to show how to avoid it।" আলোচ্য মতানুসারে লক্ষণবাক্য সত্য বা অসত্য হতে পারে না। আর লক্ষণবাক্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এদের যৌক্তিক আকার হচ্ছে "ক হল ক"। অর্থাৎ লক্ষ্য ও লক্ষণের সম্বন্ধ সমার্থতার সম্বন্ধ, আর লক্ষ্য-নির্দেশিত পদার্থ ও লক্ষণ-নির্দেশিত পদার্থের সম্বন্ধ তাদাত্ম্যের সম্বন্ধ। রাসেল্ ও হোয়াইটহেড্ তাঁদের Principia Mathematica-তে বলেছেন : a definition is declaration that a certain newly introduced symbol or combination of symbols is to mean the same as a certain other combination of symbols of which the meaning is already known......A definition is concerned wholly with symbols, not with what they symbolise. Moreover, it is not true or false, being the expression of volition not of a proposition. Definitions are merely typographical convenience.

এ লক্ষণবাক্যের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ এই যে এ বাক্যের অন্তর্গত meaning কথাটির অর্থ অনির্দিষ্ট। ধরা যাক অর্থ বলতে এখানে ধর্মনির্দেশী অর্থের কথা বলা হয়েছে। তাহলে এ বাক্য অনুসারে লক্ষ্য ও লক্ষণের সম্বন্ধ হল সমার্থতার সম্বন্ধ। লক্ষ্য ও লক্ষণের সম্বন্ধকে সমার্থতা সম্বন্ধ বলার মানে লক্ষ্য ও লক্ষণ উভয়ই নামমাত্র এ কথাও ঘোষণা করা। কারণ মনে করা হয় যে সমার্থতা সম্বন্ধের সম্বন্ধী হল নাম। এজন্য যারা বলেন যে লক্ষণবাক্য ভাষাবিষয়ক এটা দেখান তাদের কর্তব্য যে লক্ষ্য- ও লক্ষণ-প্রতীক সমার্থক। তাছাড়া আরও একদিক থেকে সমার্থতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যাঁরা বলেন যে লক্ষণবাক্য বৈশ্লেষিক তাঁরা এও বলেন যে অধিকাংশ বৈশ্লেষিক বাক্যের প্রকৃত আকার হচ্ছে "ক হল ক"। এজন্য বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে সমার্থতা দেখিয়ে দেখান যায় যে, কোনো প্রদত্ত বাক্য বৈশ্লেষিক। কাজেই আমরা সমার্থতা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হব, সমার্থতা নির্ণয়ের কোনো ব্যবহারিক নিয়ম আছে কি না তা আলোচনা করব। দেখাতে চেষ্টা করব যে লক্ষণ-প্রতীককে লক্ষ্যপদের সমার্থক হবার প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, সমার্থতা নির্ণয়ের নির্ভরযোগ্য কোন ব্যবহারিক নিয়ম নেই।

কিন্তু তার আগে উক্ত লক্ষণবাক্যটি সম্বন্ধে এবং এ বাক্যটিকে উপলক্ষ করে এ বাক্য যে মতের প্রকাশ সে মত সম্বন্ধে দু একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন মনে করি। উক্ত উদ্ধৃতি অনুসারে লক্ষণ রচনার উদ্দেশ্য ব্যবহারিক সুবিধা, শ্রম-সংক্ষেপ ; মানে লক্ষণ জানা থাকলে কোনো দীর্ঘ বাক্যাংশের পরিবর্তে সংক্ষেপে

একটি অপেক্ষাকৃত সরল প্রতীক ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত সরল প্রতীকার্থকেই লক্ষ্য করে তার লক্ষণ নির্ণয় করতে চাই; ব্যবহারিক সুবিধার কথা মনে থাকলে আমরা লক্ষণ-প্রতীক নির্ধারণে প্রবৃত্ত হতাম না। অথবা যাকে সাধারণতঃ লক্ষণ-প্রতীক বলা হয় তার অর্থকেই লক্ষ্য করে অপেক্ষাকৃত সরল অর্থকে, যাকে লক্ষ্যার্থ বলা হয় তাকে, লক্ষণ বলে গণ্য করতাম।

লেখন, মুদ্রণ ও উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোন দীর্ঘ প্রতীক-সমষ্টির পরিবর্তে অন্য অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব প্রতীক-সমষ্টি বা প্রতীক ব্যবহার অবশ্যই একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব। কিন্তু এরকম ব্যবহারের প্রস্তাবকে লক্ষণ-রচনা বলব কেন? এতো নিছক সংক্ষেপকরণের প্রস্তাব। আর সংক্ষেপকরণ ও লক্ষণকরণ ভিন্ন প্রক্রিয়া। যাঁরা বলেন যে লক্ষণবাক্য ভাষা বিষয়ক, প্রথাগত ও সংকল্পজ্ঞাপক, সুতরাং এক ধরণের স্বেচ্ছাচার, তাঁরা আসলে নামকরণকে লক্ষণকরণ বলে ভুল করেন। প্রাথমিক নামকরণ ব্যাপারে ইচ্ছার অবাধ স্বাধীনতা থাকতে পারে, অন্ততঃ কোন্ পদার্থকে কোন্ নাম চিহ্নিত করব তার কোন নিয়ম নেই। নামকরণ অনিয়মিত প্রক্রিয়া— আমাদের সংকল্পের অভিব্যক্তি। কিন্তু একবার কোন নাম প্রয়োগ করলে, সে নাম ভাষায় গৃহীত হলে, তারপর সে নামের প্রকৃত অর্থ কি, নামনির্দেশিত ধর্মীতে কি কি ধর্ম বর্তমান—এ অন্বেষণ পদার্থ বা ধর্মী বিষয়ক, ভাষাবিষয়ক নয়। যে কোনো নামে কোনো পদার্থকে চিহ্নিত করার আমাদের যে অবাধ স্বাধীনতা আছে সে স্বাধীনতা হল নব আবিষ্কৃত কোন দ্রব্য, ধর্ম, ব্যাপার ইত্যাদির নামকরণের স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দার্শনিক আলোচনায় কোনো পারিভাষিক শব্দ-প্রয়োগের স্বাধীনতা। কিন্তু ভাষায় প্রচলিত মৌল শব্দগুলির অর্থ পরিবর্তন করার স্বাধীনতা আমাদের নেই। অভিন্ন নাম ব্যবহার করে ভিন্নতা দূর করা যায় না। যেমন আমি যদি বলি, "জোচ্চোর" আর "মহাপুরুষ" কে আমি সমার্থবোধক পদ হিসাবে ব্যবহার করব, "এই কুকুরটা" বললে বুঝতে হবে যে আমি বলছি "হে বন্ধু", তাহলে কি কেউ আমার কথা মেনে নেবে? বলা বাহুল্য যে, অন্ততঃ বিচারালয়ে আমার এ প্রস্তাব গৃহীত হবে না; বন্ধুরা আমার প্রস্তাব মেনে নেবেন না। গল্পে আছে যে এব্রাহাম লিন্‌কন্ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি যদি ঘোড়াটার লেজকেও পা বলে অভিহিত করি তাহলে ঘোড়াটার কটা পা হ'ল। শ্রোতারা সমস্বরে বলেছিল "পাঁচটা"। বক্তা বলেছিলেন: No, calling a horse's tail a leg does not make it one.

একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে উক্ত উক্তিতে একটি সত্য নিহিত আছে।

বলা হয়েছে যে নব-উদ্ভাবিত প্রতীক (newly introduced symbol)-এর লক্ষণ হল সমার্থবোধক অন্য একটি প্রতীক। মানে এ ভাবে প্রচলিত প্রতীকের লক্ষণ-রচনা অসঙ্গত। উক্তরূপ সমার্থক শব্দ উদ্ভাবনও নামকরণ। এবং রাসেল্ ও হোয়াইটহেড্ যে সংক্ষিপ্ত নামকরণ প্রস্তাব করেছেন তাকে বলব সংক্ষেপকরণ, সংক্ষিপ্ত প্রতীক উদ্ভাবন। যেমন উপপাদন কথাটির মানে আমাদের জানা আছে। ব্যবহারিক সুবিধার জন্য রাসেল্ ও হোয়াইটহেড্ "উপপাদন করে" এই বাক্যাংশের পরিবর্তে ঘোড়াখুরের চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। এ রকম ব্যবহারকে কি লক্ষণ-করণ বলব? আগেই বলেছি যে এ হল সংক্ষেপকরণ। আর আমরা যাকে সাধারণতঃ লক্ষণ বলি তা হল লক্ষ্যের বিস্তারকরণ, ব্যাখ্যাকরণ। উক্তরূপ সমার্থক প্রতীক সন্ধান ত অভিধান রচয়িতার কাজ; রাসেল্ ও হোয়াইটহেড্-এর Princi-pia-তে যে প্রতীকপঞ্জী আছে তা একটি ক্ষুদ্র অভিধান ছাড়া আর কিছুই নয়। সমার্থক প্রতীকসন্ধানই যদি লক্ষণ রচনার উদ্দেশ্য হত তাহলে বলা যেত যে অভিধানই লক্ষণের সব চেয়ে বড় প্রামাণ্য গ্রন্থ। বলা যেত যে "বাঘ হল ব্যাঘ্র" লক্ষণবাক্যের আদর্শ। কিন্তু একে আমরা সাধারণতঃ লক্ষণবাক্য বলে গ্রহণ করি না। অথচ "বাঘ এমন একটি প্রাণী যা এই গুণবিশিষ্ট" এ জাতীয় বাক্যকে আমরা লক্ষণবাক্য বলে গ্রহণ করি। লক্ষণবাক্য যে নিছক ভাষাগত, সংকল্পজ্ঞাপক ও তাদাত্ম্যবাচ্য নয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল এই যে এখনও লক্ষণবাক্যের লক্ষণ নিয়ে বিচার বিতর্ক হয়। নেহাৎ সমার্থতার ব্যাপার হলে, নাম ব্যবহারের ব্যাপার হলে, এমন হত না। যক্ষা বলব, না ক্ষয়, না টি-বি, বলব তা নিয়ে ত বিতর্ক হয় না। কিন্তু যক্ষার লক্ষণ নিয়ে বিতর্ক হতে পারে।

এবার দেখা যাক লক্ষ্য ও লক্ষণের মধ্যে সমার্থতা থাকে কি না, অথবা সমার্থতা থাকার কোনো প্রয়োজন আছে কি না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, দুটি ভিন্ন প্রতীকের নির্দেশিত ধর্মীর মধ্যে যদি তাদাত্ম্য না থাকে তাহলে প্রতীক দুটির মধ্যে সমার্থতা থাকতে পারে না। কিন্তু তাদাত্ম্য সমার্থতার পর্য্যাপ্ত নিয়ামক নয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে: তাদাত্ম্যের সঙ্গে অন্য কোন্ নিয়ামক যুক্ত হলে সমার্থতার পর্যাপ্ত-অপরিহার্য্য নিয়ামক পাওয়া যাবে? দেখা যাবে যে, দুটি প্রতীকের নির্দেশিত পদার্থের মধ্যে যদি সর্ববিষয়ে তাদাত্ম্য থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে প্রতীক দুটি সমার্থক। কিন্তু দুটি পদার্থের মধ্যে যদি সর্ববিষয়েই অভিন্নতা থাকে তাহলে আবার সে অভিন্নতা প্রকাশ করা যায় না। অন্ততঃ নামের দিক থেকে তাদের ভিন্ন হতে হবে। সেজন্য "সর্ববিষয়ে" বলতে বুঝতে হবে নাম-ভিন্ন অন্য

সব বিষয়ে। কারণ ক-এর নাম ক, আর খ-এর নাম খ—এ বিভিন্নতা যদি ক ও খ-এর ধর্মগত বিভিন্নতা বলে গণ্য হয়, তাহলে সমার্থক পদের দ্বারা তাদাত্ম্য ব্যক্ত করা যাবে না, ক ও খ ভিন্ন হয়ে পড়ে। অন্ততঃ নামগত ভিন্নতা না থাকলে সমার্থতার প্রশ্ন ওঠে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে পদের অর্থ দু প্রকার: ধর্ম-নির্দেশী ও ধর্মীনির্দেশী। দুটি পদকে সমার্থক হতে হলে এদের উভয়-অর্থগত অভিন্নতা থাকার দরকার। শুধু ধর্মীনির্দেশী অর্থ অভিন্ন হলেই ঐ অর্থজ্ঞাপক পদগুলিকে সমার্থক বলা যায় না। যেমন "গজানন" ও "লম্বোদর"-এর ধর্মীনির্দেশী অর্থ অভিন্ন, কিন্তু এরা ভিন্ন ধর্ম-নির্দেশক প্রতীক। ক-ধর্ম ও খ-ধর্ম এক অধিকরণেই থাকলেই অভিন্ন হয়ে যায় না। যাঁরা বলেন যে লক্ষ্য ও লক্ষণের সম্বন্ধ সমার্থতার সম্বন্ধ, লক্ষণবাক্য "ক-হল-ক"-আকারের বৈশ্লেষিক বাক্য, তাদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, লক্ষ্য ও লক্ষণের মধ্যে ধর্মীনির্দেশী অর্থের অভিন্নতা থাকলেই চলবে না; ধর্মনির্দেশী অর্থেরও অভিন্নতা থাকা দরকার। নইলে লম্বোদরকে গজাননের এবং গজাননকে লম্বোদরের এবং এদের যে কোন একটিকে গণেশের লক্ষণ বলে গ্রহণ করা যেত।

কিন্তু ধর্মনির্দেশী অর্থের অভিন্নতা বলতে কি বুঝব? উত্তরে বলা যায় যে, যে-ধর্মের দ্বারা কোন পদের, ক-এর, প্রয়োগ নিয়মিত হয় সে ধর্মের দ্বারাই যদি অন্য কোন পদের, খ-এর প্রয়োগ নিয়মিত হয় তাহলে এবং কেবল তাহলেই ঐ পদ দুটির, ক-ও খ-এর, ধর্মনির্দেশী অর্থ অভিন্ন। কিন্তু নামের প্রয়োগ দেখেই বোঝা যায় না যে এ নামটি ঐ ধর্মনির্দেশী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, বোঝা যায় না নামের ব্যবহারকর্তা ধর্মীর কোন্ ধর্মের কথা ভেবে এ নামটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ আমরা পদার্থ সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করে এর নাম ব্যবহার করছি, কোন্ ধর্মে বিশেষিত হয়ে ধর্মী ব্যক্তি-বিশেষের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তা নির্ণয় করার কোনো ব্যবহারিক নিয়ম নেই। যেমন: মানুষ কথাটি আমরা যখন ব্যবহার করি তখন সবাই বা সব সময় একই ধর্ম নির্দেশ করি কিনা তা নির্ণয় করার কোনো উপায় নেই। এমন হতে পারে যে শিশুটি এ বস্তুটিকে মানুষ নামে চিহ্নিত করেছে বস্তুটি তার পিতামাতার মত বলে বা সোজা হয়ে চলে বলে, আমি এ নাম ব্যবহার করছি কারণ বস্তুটির দুই পা আছে এবং গায়ে পালক নেই, আপনি এ নাম প্রয়োগ করেছেন কারণ লক্ষিত বস্তুটিকে আপনি চিন্তাশীল বলে মনে করেন। কিন্তু আমরা যে কোন্ ধর্ম নির্দেশ ক'রে নামটি ব্যবহার করেছি তা বোঝার উপায় নেই। হায়াকাওয়া তাঁর Language in Action গ্রন্থে বলেছেন:

No word has exactly the same meaning twice..... when John says "kettle" its intensional meaning to him are the common characteristics of all the kettles John remembers ; when Peter says "kettle", however, its intensional meaning to him are the common characteristics of all the kettle he remembers.

এ উক্তি অবশ্য অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। কারণ একথা বলা যায় না যে, কোনো প্রতীকই একার্থবাচক হতে পারে না। তবে একার্থতা নির্ণয় করার নির্ভরযোগ্য কোন নিয়ম নেই। তা যদি হয় তাহলে দুটি প্রতীক সমার্থক কি না তা নির্ণয় করার নিয়ম ও যে নেই এ সিদ্ধান্ত অনস্বীকার্য।

অনেকে বলেন যে দুটি প্রতীক যদি এমন হয় যে একটির পরিবর্তে সব সময় অন্যটি ব্যবহার করা যায় তাহলে বুঝতে হবে এরা সমার্থক। কিন্তু এটাও সমার্থতার নির্ভরযোগ্য লক্ষণ নয়। কারণ কোন পদ যে প্রসঙ্গে ব্যবহার করা যায় তার তথাকথিত সমার্থক পদ সে প্রসঙ্গে সবসময় ব্যবহার করা যায় না। যেমন " 'মানুষ মরণশীল'—এ বাক্যে দুটি শব্দ আছে," "রাম 'মানুষ' পদটির অর্থ বোঝে," "শ্যাম বলল 'মানুষ স্বার্থপর'" প্রভৃতি বাক্যের সত্যতা-মূল্য পরিবর্তন না করে "মানুষ"-এর পরিবর্তে "চিন্তাশীল জীব" ব্যবহার করা যায় না। তারপর ক খ-এর সমার্থক, খ গ-এর সমার্থক, সুতরাং ক গ-এর সমার্থক, এ অনুমানে যদি খ ও গ-এর পরিবর্তে ক ব্যবহার করা যায় তাহলে এটা আর অনুমান থাকে না, বলতে হয় ক ক-এর সমার্থক, ক ক-এর সমর্থক সুতরাং ক ক-এর সমার্থক। আবার কোনো পদের পরিবর্তে তার অসমার্থক পদও ব্যবহার করা যায়। যেমন অনেক ক্ষেত্রে "লম্বোদর"এর পরিবর্তে "গজানন"ব্যবহার করা যায়। উপরের আলোচনা থেকে এ অনিবার্য সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় যে সমার্থতা নির্ণয়ের কোনো নিয়ম নেই। আর, লক্ষণবাক্য যেহেতু সম্ভব সেহেতু এও স্বীকার করতে হয় যে লক্ষ্য ও লক্ষণের মধ্যে সমার্থতা থাকার প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, লক্ষ্য ও লক্ষণের মধ্যে কোন বিভেদ স্বীকার করে না নিলে লক্ষণবাক্য রচনাই সম্ভব নয়। তাহলে ক-এর লক্ষণ উল্লেখ করতে হলে বলতে হবে : ক হল ক। এ রকম বাক্যকে কিন্তু আমরা সাধারণতঃ লক্ষণবাক্য বলি না।

সমার্থতা বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে লক্ষ্য ও লক্ষণের সম্বন্ধ সমার্থতার সম্বন্ধ নয়। তাহলে এদের সম্পর্ক কি ? আমরা বলব যে-কোন দুটি ধর্মের মধ্যে সমতা থাকলে এদের যে-কোন ধর্মবিশেষিত ধর্মী অন্য ধর্মের দ্বারা লক্ষিত হতে পারে। লক্ষ্যের যে-কোন পর্য্যাপ্ত-অপরিহার্য নিয়ামক ধর্মই লক্ষণ

বলে বিবেচিত হতে পারে। মানে দুটি ধর্মীর মধ্যে সমব্যাপ্তির সম্বন্ধ থাকলে একটির অর্থ অন্যটির লক্ষণ। যেহেতু সমতা সম্বন্ধ সম্বন্ধীক্রমনিরপেক্ষ ও মধ্যপদ-লোপ্য সেজন্য লক্ষ্যের ধর্মের সঙ্গে সমতাসম্বন্ধে আবদ্ধ যে কোন ধর্মকে লক্ষ্যের লক্ষণ করা যায় এবং এদের যে-কোন ধর্মকে পরস্পরের লক্ষ্য বা লক্ষণ বলে গ্রহণ করা যায়।

আমাদের প্রস্তাবিত লক্ষণ-রচনা লক্ষণ-প্রণয়নের ব্যাপকতম অর্থ। এরিষ্টটলীয় লক্ষণ-পদ্ধতির মত এতে বিশেষ বিধি-নিষেধ নেই। এতে essence নির্ণয়ের সমস্যা নেই, কোনো ধর্মকে essence আখ্যা দিয়ে আত্যন্তিক গুরুত্ব দেবার, essence বলে কোন ধর্ম মেনে নেবার, প্রয়োজন নেই। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে এতক্ষণ আমি একটা কথাই বলতে চেয়েছি। অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব*—এ দোষত্রয় রহিত যে কোন ধর্মই লক্ষণ। যে কোন অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ—নৈয়ায়িকদের একথা অস্বীকার করা যায় না। আর একথা যদি স্বীকার করি তাহলে, একথাও মেনে নিতে হয় যে লক্ষণবাক্য কেবল ভাষাবিষয়ক বাক্য নয়, পদার্থ সংক্রান্ত বাক্য। লক্ষণবাক্য কেবল বৈশ্লেষিক বাক্য নয়, লক্ষণ-বাক্যের দ্বারা আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতি সাধিত হয়। যাঁরা বলেন যে লক্ষণ-মাত্রই নামের লক্ষণ তাঁরা ইংরেজি definition কথাটির প্রয়োগ দেখে বিভ্রান্ত হন। ইংরেজিতে বলি how to define this word? I define the word thus ইত্যাদি, কিন্তু মূল ল্যাটিন শব্দটির মানে কোন কিছুর সীমারেখা টেনে দেওয়া। বলা বাহুল্য আমরা পদের সীমারেখা টানি না। উত্তরে বলা হবে যে: কিন্তু আমরা শব্দের অর্থকে সীমায়িত, সুনির্দিষ্ট করি। কিন্তু শব্দের লক্ষণ চাইলেও আমরা জিজ্ঞাসা করি: এটা কি? মানুষ কাকে বলে? দর্শন কি? আমরা ব্যবহার করি শব্দ কিন্তু উল্লেখ করি শব্দার্থ। অবশ্য এ পদের অর্থ কি, এ পদের definition কি, এ প্রশ্নও করা যায়। ধরা যাক এ রকম একটি জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা হল: "মানুষ পদের অর্থ হল পক্ষহীন দ্বিপদ প্রাণী"। এ বাক্য "মানুষ" কথা সংক্রান্ত, নাকি মানুষ পদের অর্থ সংক্রান্ত? বলা বাহুল্য যে, এ বাক্য মানুষ পদের অর্থবিষয়ক। আর অর্থ ও অর্থের নাম এক নয়। লক্ষণ-করণের উদ্দেশ্য যদি সমার্থক নাম উদ্ভবও হয়, তাহলেও লক্ষণবাক্যকে ভাষাবিষয়ক উক্তি বলা যাবে না। বলতে হবে পদের অর্থ. পদার্থ, সংক্রান্ত বাক্য। তাছাড়া, একথাও

---

* ধরা যাক ক লক্ষ্য আর খ লক্ষণ। নিয়ামক ব্যবহার করে বলা যায়: (১) খ যদি ক-এর পর্যাপ্ত নিয়ামক হয় তাহলে অব্যাপ্তি, (২) খ যদি ক-এর অপরিহার্য নিয়ামক হয় তাহলে অতিব্যাপ্তি, আর (৩) খ যদি ক-এর অভাবের পর্যাপ্ত নিয়ামক হয় তাহলে অসম্ভব দোষ হয়।

না মেনে উপায় নেই যে পদের সমার্থতা নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থের সমতা দিয়ে। অর্থাৎ সমার্থতা সম্বন্ধের প্রকৃত সম্বন্ধী নাম নয়, নামার্থ। যাঁরা বলেন লক্ষণবাক্যের লক্ষ্য নাম তাঁরা ভুলে যান যে: নাম ব্যবহার না করে কোন অর্থ ব্যক্ত করা যায় না, কোন ভাষা ব্যবহার না করে অর্থের সমতা প্রকাশ করা যায় না—একথা সত্য; কিন্তু তাই বলে অর্থ ও নাম এক নয়। নামবাদীদের উক্তরূপ ভ্রান্তি egocentric predicament সংক্রান্ত ভ্রান্তির মত। প্রাসঙ্গিক দোষটির হেতুর নাম দেওয়া যায় ভাষার অপরিহার্যতা সংক্রান্ত সঙ্কট (nominalistic predicament)। Definition কথাটির ব্যবহার থেকে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় সংস্কৃত বা বাংলা "লক্ষণ" সে বিভ্রান্তি-সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। যেমন বাংলায় এ প্রশ্ন করা যায় না: "এ শব্দটির লক্ষণ কি?" একথা বলা যায় না যে "এ পদের এই এই লক্ষণ"; বলতে হয়: "এ পদার্থের লক্ষণ এ রকম।" কিন্তু কোন অর্থ জানতে চাইলে, উক্ত ভাষা-সংক্রান্ত সংকটহেতু, এ প্রশ্ন করতে হবে "এ পদটির অর্থ কি?"

লক্ষণ-নির্ণয়ের উদ্দেশ্য তাহলে কেবল লেখন-মুদ্রণের সুবিধাই নয়; এর উদ্দেশ্য পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়, প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার। বলা যায় যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানে মুখ্যতঃ লক্ষণের আবিষ্কার, লক্ষণের পরিবর্তন ও পরিশোধন। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ণের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে যে উল্লেখ্য পর্যায়গুলি দেখা যায় সে পর্যায়গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষণপদ্ধতির বিভিন্নতা। যেমন প্রথম পর্য্যায়ে দেখা যায় বাহ্যধর্ম—রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি গুণকে লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে আরও নির্ভরযোগ্য, বিষয়গত, ও মৌল ধর্ম—পরিমাণগত ধর্ম: গলনাঙ্ক, আপেক্ষিক গুরুত্ব ইত্যাদি। আর সর্বাধুনিক পর্য্যায়ে আরও মৌল ও আন্তরিক ধর্ম—বিভিন্ন আণবিক-বিন্যাস লক্ষণ বলে গৃহীত হয়েছে। যাদের আরোহপদ্ধতি বলা হয় সে পদ্ধতিগুলি প্রধানতঃ লক্ষণনির্ণয়ের—প্রত্যয়গঠন ও নিয়মরচনার পদ্ধতি। অন্ততঃ বেকন্ এ উদ্দেশ্যেই পদ্ধতিগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

বেকন্ বর্ণিত আরোহ পদ্ধতিগুলি ধর্মের সমতা নির্ণয়ের পদ্ধতি, বেকনের ভাষায় "আকার" নির্ণয়ের পদ্ধতি, এবং বেকন্ যাকে আকার বলেছেন তা হল আমাদের লক্ষণ। মিল্ কারণতার উপর আত্যন্তিক গুরুত্ব দিয়ে এ পদ্ধতিগুলিকে প্রধাণতঃ কারণ নির্ণয়ের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পদ্ধতিগুলিকে এভাবে ব্যাখ্যা করলে বলা যায় যে আরোহপদ্ধতি প্রয়োগ করে দু রকমের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়; কতকগুলি সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য-ধর্ম বিধেয়-ধর্মের পর্য্যাপ্ত নিয়ামক, আর কতকগুলি

সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য-ধর্ম ও বিধেয়-ধর্ম পরস্পরের পর্যাপ্ত-অপরিহার্য-নিয়ামক। প্রথম প্রকারের সিদ্ধান্ত ভিন্ন অন্য সব সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে লক্ষণবাক্য এবং লক্ষণবাক্য মাত্রই প্রাকৃতিক নিয়ম; শুধু তাই নয়, আলোচ্য বিষয়ের লক্ষণ, অন্ততঃ সাময়িক-ভাবে, নির্ণয় করে না নিলে আরোহপদ্ধতিগুলির প্রয়োগই সম্ভব নয়। পূর্বেই লক্ষণ নির্ণিত না হলে, আরোহ-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না, এবং লক্ষণবাক্য প্রকৃতপক্ষে আরোহ-পদ্ধতি-লব্ধ সিদ্ধান্ত —এ উক্তি কিন্তু পরস্পরাশ্রয় দোষাক্রান্ত নয়। কারণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে কোন লক্ষণকেই চরম বলে গ্রহণ করা যায় না। আরোহ পদ্ধতি প্রয়োগের প্রারম্ভে গৃহীত লক্ষণ সিদ্ধান্তে অন্য লক্ষণে পরিবর্তিত হয়, অথবা সিদ্ধান্তে অন্য একটি উন্নততর, অধিকতর মৌল লক্ষণ ব্যক্ত হয়। Von Wright তাঁর A Treatise on Probability and induction-এ একটি উপমা ব্যবহার করে বলেছেন:

The successive movement of definition and induction is not to be described as a circle, but as a spiral, each branch of which is an inductive conclusion when viewed from below and a definition when viewed from above.

সত্য-মিথ্যা

শিবপদ চক্রবর্ত্তী

"সত্য" আর "মিথ্যা"। কথা দুইটির সঙ্গে সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। "নিবিদ্", মাধ্বীক" প্রভৃতি শব্দের মত এ দুটি শব্দের অর্থ বুঝতে আমাদের শব্দকোষ হাতড়াতে হয় না। কথ্য বা লিখিত ভাষায় এই পদ দুটির প্রয়োগ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে সাধারণতঃ আমরা এ দুটিকে দুরকম জিনিষের বিশেষণরূপে ব্যবহার করে থাকি; (১) কোনও বাক্য, বিবৃতি, মত বা প্রকল্পের বিশেষণরূপে, অথবা (২) কোনও বস্তু বা পদার্থের বিশেষণরূপে। সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবোধক বিবৃতি সত্য বা মিথ্যা হতে পারে: যেমন, "তাপসংযোগে মাখন গলে যায়", "দুইয়ে দুইয়ে চার হয়" ইত্যাদি বাক্য সত্য; আর "সাতে পাঁচে তের", "পৃথিবী ত্রিকোণাকার" ইত্যাদি বাক্য মিথ্যা। অবশ্য অনুজ্ঞা, ইচ্ছা বা প্রশ্নজ্ঞাপক বাক্য কোন অর্থেই সত্য বা মিথ্যা হয় না—বিবৃতি বা জ্ঞানবোধক বাক্যই এ সব বিশেষণ গ্রহণ করতে পারে। এরূপ প্রয়োগ উপরোক্ত প্রথম (১) প্রকারের প্রয়োগ। আবার "মিথ্যা মামলা", "মিথ্যা ভয়", "মিথ্যা গর্ব্ব", "মিথ্যা সান্ত্বনা", "সত্যধর্ম", "সত্যদৃষ্টি", "সত্যরূপ", 'সত্যিকারের মানুষ" প্রভৃতি বস্তু বা পদার্থবাচক বিশেষ্যের বিশেষণরূপে "সত্য", "মিথ্যা" শব্দ দুটির প্রয়োগ দ্বিতীয় প্রকারের (২) ব্যবহার। এইরূপ ইংরাজীতে "True friend", "True democracy", "False friend" প্রভৃতি বাক্যাংশ এই দ্বিতীয় প্রকার প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

শব্দ দুটি তাই মোটামুটি পরিচিত আর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমরা সদাসর্ব্বদা এ দুটি ব্যবহার ক'রে থাকি। কিন্তু চিন্তা ক'রে দেখলে এ দুটির অর্থ একটু গোলমেলে ঠেকে; আর এই গোলমালের ভিত্তিতে "সত্যতা" সম্বন্ধে বহু দার্শনিক মতবাদ খাড়া হ'য়েছে। মক্ষিকার ব্রণেচ্ছার মতো দার্শনিকেরা যেখানেই ভাষাগত গোলমাল সেখানেই নাক ঢোকাবেন—অন্ততঃ "নিবিদ" বা "মাধ্বীক" নিয়ে কোন দার্শনিক বিরোধ হ'য়েছে ব'লে আমার জানা নেই। "সত্য" আর "মিথ্যা" শব্দ দুটির গোলমেলে সমস্যাটি এই: এ বিশেষণ দুটি কী "লাল", 'গোল", "ঋজু", "লম্বা", "নরম", "গরম" প্রভৃতি বিশেষণের সমপর্য্যায়ভুক্ত? "লাল ফুল",

"নরম বিছানা" ইত্যাদি বাক্যাংশ বর্ণনামূলক; অথবা "ফুলটি লাল", "বিছানাটি নরম" ইত্যাদি বাক্য বর্ণনামূলক বিবৃতি। এরা বিশেষ্যনির্দেশিত বস্তুর কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের বর্ণনা করে। লাল রঙ চোখে দেখি, নরমভাব স্পর্শে পাই। কিন্তু যদি বলি "ক বাক্য সত্য", "খ বাক্য মিথ্যা", "মিথ্যা তোমায় ভয়", "পুলিশে মিথ্যা মামলা সাজায়', তখন কি বাক্য বা বস্তুগুলির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের কথা বলি ? একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে যে "সত্য" "মিথ্যা" শব্দ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ প্রকাশ করে না, যদিও "লাল ফুল" ও "সত্য ধর্মের" মধ্যে ব্যাকরণগত সাদৃশ্য রয়েছে।

অবশ্য কোনও বাক্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বা গুণাবলীর কথাও ভাবতে পারি; যেমন. "পৃথিবীর আকার গোল", একটি বাক্য, তিন পদ সমন্বিত ও বাংলা ভাষার বাক্য। বাক্যটি দেখেই বা শুনেই বলতে পারি যে বাক্যটির একত্ব, বঙ্গভাষায় প্রকাশিত ইত্যাদি গুণ রয়েছে। কিন্তু '(পৃথিবীর আকার গোল) বাক্যটি সত্য" বললে, "পৃথিবীর আকার গোল"ই বলা হয়; তার বেশী কিছু বলা হয় না। সেইরূপ "(পৃথিবী চতুর্ভুজ) বাক্যটি মিথ্যা" বললে, "পৃথিবী চতুর্ভুজ নয়" এটুকুই বলা হয়। তাই "সত্য" বা "মিথ্যা" বাক্যগত কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বর্ণনা করে না। "সত্যতা" বা "মিথ্যাত্ব", ধর্ম বা ভয়রূপ বস্তুর গায়ে লেগে থাকা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ নয়; অথচ "পুরাণো ধর্ম", বা "তীব্র ভয়" প্রভৃতি বাক্যাংশে বিশেষণগুলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণেরই বর্ণনামূলক। তাই "সত্য", "মিথ্যা" বিশেষণগুলো বাক্যের বা বস্তুর কোন ঐন্দ্রিয়িক গুণ প্রকাশ বা বর্ণনা করে না। এগুলি যেন বর্ণনামূলকই নয়।

কিন্তু তবু এই বিশেষণগুলি একেবারে নিরর্থকও নয়। "সত্যা" বা "মিথ্যা" শব্দ কোনও বস্তু বা বাক্যের (অবধারণের) বাস্তব গুণ বা গুণাবলীর বর্ণনা না করলেও, ও শব্দগুলির অন্যরূপ শক্তি আছে। যখন কোন বাক্য বা বিবৃতিকে সত্য বলি তখন কতগুলি নিরিখ বা মানের কথা মনে রেখেই তাদের সত্য বলি। যেমন, যখন বলি "এ ফুলটি লাল' এ বাক্য সত্য, তখন বলি "এ ফুলটি (সত্যই) লাল", অর্থাৎ এ বাক্য, বাস্তব প্রাকৃত জগতে বস্তুটি যা, তাই বলছে। তার মানে যে নির্দিষ্ট ফুলকে আমি "লাল" বলেছি, সে যদি বাস্তবিকই লালরঙএর হয় তবেই আমার বলা বাক্য সত্য। এমতাবস্থায় পারিভাষিক অর্থে বাক্যটি আর বাক্য-নির্দেশিত বস্তুটির বা ঘটনাটির মধ্যে সমতা বা মিল (correspondence) রয়েছে। তাই যখন কোন বাক্য বা বিবৃতি বাস্তব গুণধর্মসমন্বিত বস্তু বা ঘটনার দ্বারা সমর্থিত

হয় তখন ঐ বাক্যকে সত্য বলা হয়। বাস্তব ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হওয়া বা প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে মিলে যাওয়া কোন কোন বাক্যের ধর্ম; আর বাস্তব অবস্থার দ্বারা সমর্থিত না হওয়াও অন্য কোন বাক্যের ধর্ম। "এ ঘরে পাঁচজন লোক আছে" বাক্যটি কখনও বা ঘরটির বাস্তব অবস্থার দ্বারা সমর্থিত হয়, আর কখনও বা অসমর্থিত হয়। উক্ত জ্ঞানটি ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা প্রসূত বলে ওইরূপ অভিজ্ঞতা দিয়েই, অর্থাৎ দেখে শুনেই, এই সমর্থন বা অসমর্থন বুঝতে পারি। এখন বাস্তবসমর্থিত বাক্যকে আমরা "সত্য" আর বাস্তব অসমর্থিত বাক্যকে আমরা "মিথ্যা" বলি। এইরূপ সমর্থিত হওয়া বা অসমর্থিত হওয়া বাক্য বা বিবৃতিগুলিরই ধর্ম আর তদ্ধর্মজন্যই তাদেরকে সত্য বা মিথ্যা বিশেষণে বিভূষিত করা যায়। তাই বাস্তবসমর্থন (correspondence) বা সমর্থনের অভাব (non-correspondence) কোন বাক্যকে "সত্য" বা "মিথ্যা" বলার নিরিখ (criteria)। কোনও বাক্যকে "সত্য" বলার অর্থই হলো বাক্যটি যে বাস্তব সমর্থিত, তা বলা; তেমনি কোন বিবৃতিকে "মিথ্যা" বলার মানে, ঐ বিবৃতিটি বাস্তবের সমর্থন পায়নি। তা হলে দেখা যায় যে "সত্য", "মিথ্যা" বিশেষণগুলি বিবৃতিবোধক বাক্যের কোন ধর্মের প্রকাশক বা বর্ণনামূলক। এদিক থেকে তাদের বর্ণনামূলক শক্তি রয়েছে। যে নিরিখ বা মান মনে রেখে বাক্যগুলিকে সত্য বা মিথ্যা বলি, সে নিরিখ বাক্যান্তর্গত কোন ধর্মেরই পরিচায়ক, আর "সত্য", "মিথ্যা" সেই বাক্যগত ধর্মেরই বর্ণনা। তেমনি কোনও "ভয়" বা "গর্ব"কে মিথ্যা বলার বা কোনও দৃষ্টিকে "সত্য" বলারও নিরিখ রয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরিখগুলো বিভিন্ন; "মিথ্যে মামলা" কোনও বিশেষ মাপকাঠিতে মিথ্যে আর "মিথ্যে বন্ধু" অন্য বিশেষ মানদণ্ডে মিথ্যে। একটু চিন্তা করলেই এই নিরিখগুলো প্রকট হয়ে আসবে। "সত্যিকারের বন্ধুর" নিরিখ দেখি চাণক্যশ্লোকে:

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রবিপ্লবে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যঃ তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ ॥

এই কঠোর নিরিখে কারুর "সত্যিকারের বন্ধু" আছে কী না সন্দেহ। "মামলা" রাজদ্বারে হয় বটে, কিন্তু উৎসবে, ব্যসনে বা শ্মশানে "মামলা" পরখ করে নেবার নিরিখ নেই। তাই "মিথ্যে মামলার" নিরিখ, "মিথ্যে বন্ধুর" নিরিখের থেকে আলাদা হতে বাধ্য। বস্তু ভেদে নিরিখ ভিন্ন।

তেমনি সব বাক্য বা বিবৃতি এক ধরণের নয়; তাই বিভিন্ন ধরণের বাক্যে সত্যমিথ্যার নিরিখও বিভিন্ন। প্রাকৃত জগতের বস্তু বা ঘটনাবলীর বর্ণনামূলক

বাক্যের এই নিরিখ বাস্তব সমর্থন বা অসমর্থন। এ সব বাক্য ঐন্দ্রিয়িকজ্ঞান বোধক। কিন্তু এমন বিবৃতিও সত্যমিথ্যা হয় যা কোন বাস্তব অবস্থার বর্ণনা নয়। যেমন, "যদি আমার পাঁচ যুক্ত চার বৌ থাকত, তবে আমার নয় বৌ থাকত।" উক্ত বাক্য সত্য, অথচ বাক্যটির পূর্বগ বা অনুগ কেউই বাস্তব নয় বা হয়ও না। এরূপ বাস্তবসম্পর্কবিহীন সর্তাধীন বাক্যের (counterfactual hypothetical) বাস্তব সমর্থন বা অসমর্থনের প্রশ্নই ওঠে না। উল্লিখিত সর্তাধীন বাক্যটি একটি গাণিতিক সত্য ; "বৌ" কথাটি ওখানে প্রক্ষিপ্ত। তর্কশাস্ত্র বা গণিতের বাক্যগুলি বাস্তবতথ্যের বর্ণনামূলক নয় বলে এদের সত্যমিথ্যার নিরিখ বাস্তবসমর্থন বা অসমর্থন নয়। এদের নিরিখ পরস্পরের মধ্যে সুসম্বদ্ধতা বা অসম্বদ্ধতা (Coherence or Incoherence)। "দু'য়ে দু'য়ে চার", "৫+৪=৯" প্রভৃতি বাক্য অন্যান্য গাণিতিক সত্যের সঙ্গে খাপ খায়, সম্বাদী হয় বলে তাদের সত্য বলি। "সাতে পাঁচে তিন" বাক্যটি গণিতশাস্ত্রে বাধ সৃষ্টি করে বা বিসম্বাদী হয় বলে তাকে বলি মিথ্যা। জ্যামিতির বাক্যগুলিও এই নিরিখে সত্য বা মিথ্যা। আবার কোন শ্বেতচূর্ণ দেখে যদি বলি "এটা চিনি" তাহলে বাক্যটি সত্য কি না জানতে হলে বস্তুটি মুখে ফেলা দরকার। যদি মিষ্টি লাগে বা বস্তুটির দ্বারা চিনির কাজ হয়, তবেই বাক্যটিকে "সত্য" বলব—অন্যথায় নয়। অর্থাৎ, এখানে নিরিখটা—সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব বা অসফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব। তাই বিভিন্ন বাক্যের সত্যতার নিরিখ বিভিন্ন—কোথাও বাস্তবসমর্থন, কোথাও সুসম্বদ্ধতা, কোথাও বা প্রবৃত্তিসামর্থ্য। আরও অন্য রকমের নিরিখও থাকতে পারে।

"সত্য', "মিথ্যা' বিশেষণগুলি একদিক থেকে, বিবৃতি বা বস্তুর এই নিরিখ নির্দিষ্ট ধর্মের বর্ণনামূলক। যেমন, "পৃথিবী গোলাকার" বাক্যটি সত্য বলার মানে বাক্যটি বাস্তবের সমর্থন পেয়েছে বলা ; আর "মিথ্যে হয়রাণি" বলা মানে কিছু নিরিখে পরিশ্রমটা ব্যর্থ বলা। এদিক থেকে দেখলে সত্যমিথ্যা বিশেষণগুলি বিবৃতি-বোধক বাক্যের বা বস্তুর কোন ধর্মের বর্ণনামূলক। কিন্তু আগেই দেখেছি যে এ বর্ণনা বাক্যের বা বস্তুর কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের বর্ণনা নয়। "তীব্র ভয়" আর "মিথ্যা ভয়" বাক্যাংশ দুটির মধ্যে ব্যাকরণগত সাদৃশ্য থাকলেও তাদের পদশক্তিগত (semantic) বৈসাদৃশ্য প্রকট। "তীব্র" বিশেষণটি ভয়ের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণের নির্দেশ দেয়। "মিথ্যা" বিশেষণটি, যে নিরিখে আমি ভয়টাকে মিথ্যা বলছি সেই নিরিখাশ্রয়ী কোন ধর্মের নির্দেশ করে ; কিন্তু ভয়টার কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের নির্দেশ করে না। তেমনি বাস্তবসমর্থন, বাধের অভাব বা প্রবৃত্তিসামর্থ্য

প্রভৃতি সত্যমিথ্যার নিরিখনির্দ্দিষ্ট ধর্মগুলো বাক্য বা বিবৃতির অন্তর্গত হলেও, ও ধর্মগুলো বাক্যের "একত্ব' প্রভৃতির মতো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তাই "সত্য" বা "মিথ্যা", নিরিখের দিক থেকে কিছু ধর্মের বর্ণনামূলক হলেও এ বিশেষণগুলি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণের বর্ণনা করে না।

কিন্তু এহ বাহ্য। নিরিখের দিক থেকে "সত্য", "মিথ্যা" বিশেষণগুলি বাক্য বা বস্তুর কোন ধর্মের বর্ণনামূলক হ'লেও ওটাতেই তাদের অর্থ পুরোপুরি নিহিত নয়। নিরিখগুলো বাক্য বা বস্তুকে "সত্য" বা "মিথ্যা" বিশেষণে বিশেষিত করবার কারণ মাত্র। কিন্তু ওগুলিই সত্যতা বা মিথ্যাত্ব নয়। অগ্নি ধূমের কারণ হলেও ধূম নয়। বৃষ্টিতে মাটি ভিজলেও, বৃষ্টি হওয়া এক ঘটনা, মাটি ভেজা আর এক ঘটনা। মাপকাঠিগুলো বস্তু বা বাক্যকে "সত্য-মিথ্যা" বলার কারণ হলেও, এরূপ বিশেষণপ্রয়োগে আমরা আরও কিছু করে থাকি। গজকাঠি দিয়ে টেবিলের দৈর্ঘ্য মাপ্‌তে পারি; তবু গজকাঠিটাই টেবিলের দৈর্ঘ্য নয়। তাই বাস্তবসমর্থন, সুসম্বদ্ধতা বা প্রবৃত্তিসামর্থ্যকে বাক্য বা বিবৃতিগত সত্যের স্বরূপ ব'লে মতপ্রচার করে বহু দার্শনিক ভ্রান্ত পথে গিয়েছেন। এরা সত্য চিনে নেবার নিরিখ, সত্যতা নয়। পরন্তু "সত্য-মিথ্যা" বিশেষণগুলির প্রয়োগে, অন্য দিক দিয়ে, অন্য গুরুতর অর্থও আছে, আর সেটাই বিশেষনীভূত "সত্য" "মিথ্যা" শব্দের আরও অন্তরঙ্গ, আরও ঘনিষ্ঠ অর্থের দ্বিতীয় দিক। এটা বাক্য বা বস্তুর মূল্য বোধের (Value consciousness) দিক। "সত্য" বা "মিথ্যা" বিশেষণ প্রয়োগে এরূপ বিশেষিত বাক্য বা পদার্থের মূল্য নির্দ্ধারণ প্রকট।

"সত্য" "মিথ্যা" বিশেষণ প্রয়োগে, এই অন্তরঙ্গ মূল্য নির্দ্ধারণের দিকটির একটু বিস্তার প্রয়োজন। যখন কোন বাক্য বা পদার্থকে "সত্য" বলি তখন তাকে যেন উচ্চ পর্য্যায়ে রাখি, তাকে সম্মানিত করি। আর যখন কোন বাক্য বা বস্তুকে বলি "মিথ্যা' তখন তাকে হেয় করি, নীচু করি। এই সম্মান করা বা অসম্মান করা একপ্রকার মানসিক আবেগ, আর "সত্য"-"মিথ্যা" বিশেষণে আমাদের এই আবেগই প্রকটিত হয়। এ বিশেষণগুলি প্রয়োগের নিরিখগুলো বিভিন্নক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও, এই উচ্চপর্য্যায়ে রাখা, সম্মান বা অসম্মান দেখানো, সর্বক্ষেত্রে একরূপই থাকে। "মিথ্যে মামলা" আর "মিথ্যে দন্তের" মিথ্যাত্বের নিরিখ ভিন্ন হলেও, "মিথ্যে" বিশেষণে দুটো বস্তুকেই হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। তাই নিরিখের দিক আর মূল্য নির্দ্ধারণের দিক বেশ তফাৎ। প্রথমটি জ্ঞানের দিক, দ্বিতীয়টি আবেগের দিক। এই দ্বিতীয় দিকটিই

"সত্য", "মিথ্যা" বিশেষণের ঘনিষ্ঠতর দিক বলে মনে হয়। কোন বাক্যকে স্বীকার করতে হলে বলি "বাক্যটি সত্য' আর অস্বীকার করতে হলে বলি "বাক্যটি মিথ্যা"। তাই একথা বোধ হয় ঠিকানয় যে, কোন বিবৃতির সঙ্গে "সত্য" কথাটি জুড়ে আমরা কিছুই করি না। 'ফুলটি লাল' বাক্যটি কোন বিষয়ের বর্ণনা। "(ফুলটি লাল) বাক্যটি সত্য", এই সব বাক্যটিতে অতিরিক্ত কোনও বাস্তব অবস্থার বর্ণনা হয় না ঠিকই ; শুধু বলা হয় 'ফুলটি লাল'। কিন্তু তবু এই দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের স্বীকৃতিমূলক। প্রথম বাক্যে ফুলটির সম্বন্ধে কিছু বলছি ; দ্বিতীয় বাক্যে "ফুলটি লাল" এই বাক্যটিকে স্বীকার করছি। এই স্বীকার করা বা অস্বীকার করার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে আমাদের আবেগ। কোন কিছুকে "সত্য" বলা মানে যেন তাকে মাথায় তুলে রাখা, তাকে শিরোধার্য্য করা। অপর পক্ষে কোন কিছুকে "মিথ্যা' বলা মানে তাকে নিন্দিত করা, হেয় করা, ঘৃণিত করা। এই মাথায় তুলে নেওয়ার কতকগুলি নিরিখ রয়েছে আর ওই নিরিখগুলো যে বাক্য বা বস্তুকে শিরোধার্য্য করছি সে বাক্য বা বস্তুরই অন্তর্গত কোন ধর্মকে নির্দ্দেশ করে। নিরিখগুলো প্রয়োগ করাতে উক্ত ধর্মের জ্ঞান হয়। কিন্তু মাথায় রাখা বা মহামূল্য মনে করা আমাদের আবেগ, ওটা বাক্য বা বস্তুর অন্তর্গত কোন ধর্ম নয়। যখন কোন ব্যক্তিকে সম্মান করি তখন তাঁর প্রতি আমার কোন আবেগেরই প্রকাশ করি ; যদিও এই সম্মান করার কোন নিরিখ আছে আর ঐ ব্যক্তিকে এই নিরিখের দাবী পূর্ণ করতে হবে। দেশপ্রেমিক যখন বলেন :

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীনদুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই",

তখন তিনি স্বদেশের উৎপন্ন মোটা কাপড়ের প্রতি আমাদের আবেগ জাগাতে চান। মোটা কাপড়ের "স্থূলত্ব" তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ। "দেশমাতৃকার দান" তাকে সম্মান করার নিরিখ, আর "মাথায় তুলে নেওয়া" তাকে সম্মান করা। তেমনি "সত্য" বিশেষণের এই নিরিখের দিক আর সম্মান করার দিক, দুই দিকই বর্ত্তমান। শেষোক্ত দিকই "সত্য" শব্দের প্রকৃত দিক, কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরিখ বিভিন্ন হলেও, "সত্য" বিশেষণ প্রয়োগে আবেগের দিকটি সর্বত্র একই থাকে। এটা মূল্যবোধক শব্দ। সত্য মূল্যবান, মিথ্যা মূল্যহীন। সত্য বড়, মিথ্যে ছোট। সত্যের জয়, মিথ্যার পরাজয়। "সত্যিকারের বন্ধু" সকলেরই মাথার মণি ; "মিথ্যা বন্ধুত্ব" সকলের কাছেই হেয়। "সত্য" বাক্য আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারে সম্মানিত অতিথি। "মিথ্যা" বাক্য রিক্ত, ভিখারী ; তাকে দ্বারপ্রান্ত থেকে দূর করাই বাঞ্ছনীয়।

"সত্য" "মিথ্যা" বিশেষণগুলির মূল্যনির্দ্ধারণের দিকই এদের মুখ্য বা প্রকৃত দিক বলা হয়েছে। ঐরূপ মূল্যনির্দ্ধারণের নিরিখগুলো ঐ বিশেষণগুলির গৌনার্থ। একই বাক্যকে বা বস্তুকে যখন দুজন মানুষ "সত্য" বলে তখন হয়তো দুজনে বিভিন্ন নিরিখ মনে রেখে তাদের সত্য বলে; কিন্তু আবেগজনিত মূল্যবোধ দুজনেরই এক – দুজনেই বাক্য বা বস্তুটিকে সম্মান করছে। যখন আমরা দুজনেই বলি "অমুক ব্যক্তি সমাজের একজন সত্যিকারের বন্ধু", তখন দুজনেই ঐ ব্যক্তিকে সম্মান করছি। তবু "সত্যিকারের বন্ধুর" নিরিখ হয়তো আমার কাছে ভদ্রলোকের সহৃদয়তা আর তোমার কাছে তাঁর পরোপকারেচ্ছা। তাই "সত্য" বিশেষণ প্রয়োগে সর্বদাই একই ধরণের আবেগের বা উচ্ছ্বাসের প্রকাশ হয়ে থাকে, আর "মিথ্যা" বিশেষণ প্রয়োগে অন্য ধরণের আবেগ প্রকাশ হয়। মূল্যবোধে আবেগই মুখ্য।

এখন "সত্য" পদটি যে আবেগের প্রকাশ, সেই আবেগ "খাঁটি" বিশেষণ প্রয়োগেও প্রকাশিত হতে পারে। "খাঁটি কথা", "খাঁটি খবর", "হক্ কথা", "খাঁটি ঘি", "খাঁটি ঔষধ" ইত্যাদি ভাষায় বাক্য বা বস্তুগুলিকে সম্মান করা হয়, প্রশংসা করা হয়। অবশ্য বক্রোক্তিদ্বারা কখন কখন "সত্য", "খাঁটি" বিশেষণগুলি কোন কিছুকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যও ব্যবহৃত হ'তে পারে; যেমন "তোমার বাক্যটি কিছু বেশী সত্য মনে হচ্ছে", "ভদ্রলোক একেবারে নিখুঁত, খাঁটি দেশপ্রেমিক" ইত্যাদি। তবে সোজা অর্থে "সত্য" বা "খাঁটি" বিশেষণ কোন কিছুকে সম্মানিত করার উপায়, তাকে উচ্চ পর্য্যায়ে উন্নীত করার উপায়। সেইরূপ 'নিখুঁত', "বাঃ বেশ !', "বেশ, বেশ !", "ঠিক !" প্রভৃতি বাক্যাংশও কখন কখন "সত্য" বিশেষণের সমার্থক বা সমতুল্য ব'লে ব্যবহৃত হতে পারবে। প্রশ্নের উত্তর ছাত্র ঠিকমতো দিতে পারলে অধ্যাপক বলেন "বাঃ বেশ ব'লেছ", "চমৎকার ব'লেছ"। তেমনি "মিথ্যা" বিশেষণ যে আবেগের দ্যোতক তার অনুরূপ প্রকাশ হয়, "ধ্যাৎ !", "ছি ছি !", "দূর, দূর!" "বাজে !" ইত্যাদি আবেগসঞ্চারী শব্দ বা ধ্বনি সমূহ দ্বারা। এ সব বাক্যাংশ কোন কিছুকে হেয় প্রতিপন্ন করতে সমধিক শক্তিশালী। "মিথ্যা" বিশেষণের সঙ্গে এগুলোর সমতুল্যতা চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে ঐ বিশেষণটি প্রধানতঃ একটি আবেগের প্রকাশ। সত্য আর মিথ্যা বিশেষণকে আমরা অন্যান্য বর্ণনামূলক বিশেষণের মতো মনে করি; কারণ ওগুলির মধ্যে ব্যাকরণগত মিল আছে। কিন্তু ভাষায় ওদের ব্যবহার বা প্রয়োগ লক্ষ্য করলে ওদের আবেগসঞ্চারী দিকটা প্রকট হ'য়ে ওঠে।

উপরে "সত্য" ও "মিথ্যা" শব্দের প্রয়োগগত অর্থ সম্বন্ধে যে মত ব্যাখ্যা করলাম, বলা বাহুল্য, তা আমার নিজের উদ্ভাবিত নয়। আধুনিক কালে ইউরোপে অনেকেই এমন স' কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন। অবশ্য আমি এক বিশেষ রীতিতে এ মত ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি; আর আমার সব কথাই হয়তো বিশেষজ্ঞেরা মেনে নেবেন না। তবে "সত্য-মিথ্যা" মূলতঃ আবেগপ্রকাশক, এমন কি অনুজ্ঞাজ্ঞাপক, এমন কথা আজ অনেকেই বলে থাকেন; যেমন, যখন বলি "অমুক বাক্য সত্য", তখন যেন বলি "অমুক বাক্যটি আমি স্বীকার করি, শ্রদ্ধা করি; তুমিও কর।" অধ্যাপক এ, জে, এয়ার বলেছিলেন যে "ভাল-মন্দ", "শুভ-অশুভ" প্রভৃতি নীতিশাস্ত্র সম্মত বিশেষণগুলি আবেগসঞ্চারী শব্দ; বাস্তব কোন গুণধর্মের পরিচায়ক হিসেবে তারা অর্থহীন; কোন জ্ঞান দিতে এরা অক্ষম। ষ্টিভেন্‌শন্‌, কার্‌নাপ্‌ প্রভৃতি বিশ্লেষকদের হাতে ও বিশেষণগুলো অনুজ্ঞাজ্ঞাপক রূপ পেয়েছে। কিন্তু অধ্যাপক এয়ার "সত্য মিথ্যা" বিশেষণের কোন আবেগসঞ্চারী অর্থ নির্দেশ করেন নি; শুধু বলেছেন যে কোন গুণধর্মের জ্ঞান প্রকাশ করতে এরা অক্ষম। অন্যান্য বিশ্লেষক "সত্য-মিথ্যার" আবেগসঞ্চারী দিকটি প্রকাশ করতে সচেষ্ট হ'য়েছেন। অবশ্য অধ্যাপক এয়ার, অধ্যাপক কারনাপ্‌এর কাছে "সত্য-মিথ্যা"র ঐরূপ আবেগসঞ্চারী অর্থ ইষ্টই মনে হবে। সত্য, কল্যাণ ও সুন্দর, এরা প্রত্যেকেই মানুষের চরমমূল্য ব'লে, এদের প্রত্যেকেরই বিশ্লেষণ একই রকম হ'তে পারবে। তাই, নৈতিক ভালমন্দ বিশেষণগুলো যদি আবেগআক্রান্ত হয়, তবে সত্য-মিথ্যাও আবেগসঞ্চারী হবে, এ আর বেশী কথা কি? সুন্দর, কুৎসিত যে আবেগ আক্রান্ত বিশেষণ এ সম্বন্ধে বোধ হয় দ্বিমত নেই।

যাই হোক, যে মত অনুসারে "সত্য মিথ্যার" প্রকৃত অর্থ আবেগ সঞ্চার (Emotive theory of Truth), সে মত সম্বন্ধে, এখন, দু একটি প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে আমার প্রবন্ধের উপসংহার ক'রব। প্রশ্নগুলোর সমাধান আমি এখনও পাইনি, তবে, প্রশ্নগুলো বোধ হয় অর্থহীন নয়। "সত্য-মিথ্যার" প্রয়োগ সম্বন্ধে উপরোক্ত মতবাদ অনেকাংশে যুক্তিসহ হ'লেও, কতকগুলো সমস্যা থেকে যায়। প্রথম সমস্যাটি এই। সত্য, শুভ ও সুন্দর এরা তিনটিই তো মানুষের চরমমূল্য; প্রথমটি জ্ঞান জীবনের, দ্বিতীয়টি নৈতিক জীবনের আর তৃতীয়টি আমাদের রসবোধের। এ বিশেষণগুলি যদি প্রত্যেকেই আবেগসঞ্চারী হয় তবে প্রশ্ন হবে যে তারা প্রত্যেকেই একই ধরণের আবেগ সঞ্চার করে, না বিভিন্ন ধরণের। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় যে তারা একই ধরণের আবেগ জাগায়। কোনও স্বেচ্ছাকৃত কর্মকে

"ভাল" বা "কল্যাণকর" বললে সেই কাজকে সম্মান করি, তাকে উচ্চ পর্য্যায়ে রাখি। তেমনি কোন কাজকে "মন্দ" বললে তাকে নিন্দিত করি, হেয় করি। একটু আগেই দেখেছি যে সত্য-মিথ্যা বিশেষণগুলিও এই একইধারায় আবেগ জাগায়। কোনও চিত্র বা ভাস্কর্য্যকে "সুন্দর" বলা, আর অন্যকিছুকে "কুৎসিত" বলাও তো ওই একই আবেগের প্রকাশ। এখন এই আবেগসঞ্চারই যদি সত্য-মিথ্যা, ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিৎ প্রভৃতি মূল্যনির্দ্ধারক বিশেষণের মুখ্য অর্থ হয়, তবে তো এরা মুখ্যতঃ, সকলেই সমার্থক বা সমতুল্য হ'য়ে পড়বে। তা হলে এক বিশেষণের স্থলে অন্য বিশেষণ ব্যবহার করতে (Substitute) পারব। অর্থাৎ সত্যই সুন্দর হবে, আর সুন্দরই হবে কল্যাণময়। কেউ কেউ এরূপ মতবাদ ইষ্ট মনে করলেও, ওই বিশেষণগুলি একটার বদলে আরেকটা প্রয়োগ করার অসুবিধা আছে। মনে করুন কোন লোক ব্যাঙ্ক ভেঙ্গে টাকা নিয়ে পালিয়েছে। কাজটা "মন্দ" না বলে, আমি বল্‌লাম "মিথ্যা।" এমন ক'রে নৈতিক জীবনের ও জ্ঞান জীবনের মূল্যের অদল বদল করা যায় কী? "মিথ্যে" কাজের মানে হ'তে পারে যে কাজটা আদৌ করা হয় নি; আর তা হ'লে ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর পুলিশের অনুসন্ধান তো নিরর্থক। তেমনি যদি বলি যে তাজমহলটি "সত্য", নিউটনের মধ্যাকর্ষণ নিয়মটি "শুভ" আর 'দুইয়ে তিনে ছয়' বাক্যটি অকল্যাণজনক, তবে কী আমরা খুব সারগর্ভ কথা বলি? কেউ কেউ হয়তো বলতে পারেন যে সত্য, শুভ ও সুন্দর বিশেষণগুলির আবেগসঞ্চারী অর্থ এক হ'লেও, তাদের নিরিখগুলো বিভিন্ন; তাই ওই মূল্যবোধক বিশেষণগুলির ব্যবহারও বিভিন্ন হবে। কিন্তু যদি সত্যের নিরিখ সৌন্দর্য্যের বেলায় খাটে না ব'লে তারা সমার্থক না হয়, তবে তো সত্য-মিথ্যার নিরিখের দিকটিই মুখ্য হ'য়ে দাঁড়াবে, আর তাদের আবেগের দিকটি হবে গৌন। এদের আবেগসঞ্চারী দিকটিকে মুখ্য বল্‌তে হ'লে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবেগের মধ্যেও পার্থক্য দেখাতে হবে। কিন্তু কী যে সেই পার্থক্য তা তো বুঝি না।

বিচিত্র মানব চরিত্রের আবেগের দিকটি রক্ষণশীল (conservative) ও জ্ঞানের দিকটি প্রগতিশীল (radical)। অর্থাৎ জ্ঞানজীবনে পরিবর্ত্তন ঘটলেও কখনো কখনো আবেগধারার অনুরূপ পরিবর্ত্তন নাও হ'তে পারে। যে বাক্যকে পূর্ব্বে সত্য জেনে সম্মান করেছি তাকে পরে মিথ্যে ব'লে জানলেও তার প্রতি সম্মানসূচক আবেগটি ত্যাগ করতে পারি না। তাই জ্ঞানে আর আবেগে বিরোধ উপস্থিত হ'তে পারে। যেমন, কোন নেতাকে হয়তো শ্রদ্ধা ক'রেছি, সম্মান করেছি। পরে হয়তো বুঝলাম যে তিনি আর দেশের হিতসাধন ক'রছেন না। তবুও যেহেতু

একবার ভালবাসা, প্রীতি আর শ্রদ্ধা তাঁর পায়ে দিয়েছি. পরে দেখি যে তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করা কঠিন হ'য়ে পড়ে। জ্ঞান তাই বামপন্থী, আবেগ দক্ষিণপন্থী। সত্যমিথ্যা বিশেষণগুলির দুটো দিক স্বীকার করা হ'য়েছে—(ক) কোন নিরিখের কথা মনে করে কোন বাক্য বা বস্তুকে সত্য বা মিথ্যা বলি; আর (খ) ঐ বিশেষণ দিয়ে কিছুকে শ্রদ্ধা বা হেয় করি। এ দুদিকের মধ্যে যে কখনও বিরোধ উপস্থিত হবে না এমন কথা হলপ. ক'রে বল্‌তে পারি না। হয়তো এক সময় কোন বাক্যকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করেছি, কিন্তু তখন কোন্ নিরিখে তাকে সত্য বল্‌ছি তা জানতাম না। পরে হয়তো নিরিখ বিচার করতে গিয়ে দেখলাম যে বাক্যটি মিথ্যা। কিন্তু তবুও বাক্যটির প্রতি যে শ্রদ্ধা একবার দিয়ে ফেলেছি তার আর প্রত্যাহার করতে পারি নে; তাই মিথ্যে জেনেও মতবাদটিকে যেন আরও নিবিড় ভাবে আঁকড়ে ধরতে চাই; এমন কি মতটিকে কেউ মিথ্যে বল্‌লে চ'টে উঠতে পারি। এরূপ বিরোধ উপস্থিত হ'লে "সত্য" বিশেষণের উপরোক্ত দুই অর্থের কোন্‌দিক স্বীকার করব? এটাই আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। বাট্রাণ্ড রাসেল প্রমুখ মনিষীরা বলেন যে আবেগ আমাদের বিভ্রান্ত করে, সত্য চিনে নিতে করে অপারগ। তাই বিজ্ঞানীর পক্ষে সমস্ত আবেগ ও পক্ষপাত বর্জ্জন ক'রে কেবল যুক্তির নিরিখেই জাগতিক জ্ঞানকে পরখ ক'রে নেওয়া উচিত। তা হ'লে, কোন বাক্যকে "সত্য" বললে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখান হয় বটে, কিন্তু এই আবেগের দিকটি গৌন হ'য়ে পড়বে। বিজ্ঞানে কোন শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধার যেন বিশেষ স্থান নেই—নিছক যুক্তির আলোক উদ্ভাসিত প্রামান্য জ্ঞানের স্থানেই সেখানে হ'তে পারে।

উপরন্তু কোনও বাক্যকে সত্য বলে স্বীকার করলেও. সে যে সর্বদাই সম্মানিত, আনন্দদায়ক হ'বে এমন কোন মানে নেই। "অপ্রিয় সত্য" ভাবণে কী হয়? "সত্যম্ বদ, প্রিয়ম্ বদ, মা বদ সত্যমপ্রিয়ম্" উক্তিই ব'লে দেয় যে "সত্য", প্রিয়তা বা চারুতা ছাড়াও থাকে, চারুতা সত্যতা ছাড়াও থাকে আর সত্যতা ও চারুতা একত্রও থাকতে পারে। কোন বাক্য শুনলে, তাকে সত্য ব'লে জানলেও তা আমার কাছে অপ্রিয় হ'তে পারে ও তাকে আমি শ্রদ্ধা করি না। কিন্তু ব্যক্তিগত এই আবেগের দিকটি অর্থাৎ সম্মানের দিকটি নেই ব'লেই কী আমি বাক্যটি "মিথ্যে" বলতে পারি? "অপ্রিয় সত্য" মানেই তো কিছুকে "সত্য" বলে স্বীকার করার পরও সে আমার মধ্যে বিদ্বেষ আর অসন্তোষ জাগায়। তাই আবেগের দিকটি গৌণ হ'য়ে. সত্যমিথ্যার নিরিখের দিকটিই এক্ষেত্রেও মুখ্য হ'য়ে উঠবে।

বিশুদ্ধ আবেগচালিত মন তো অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানী কী কখনও সকলের শ্রদ্ধামাখা মত বা প্রকল্পকে, বাস্তবের নিরিখে বিচার ক'রে, সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন নি? টলেমীর মতবাদ কী কোপর্নিকাস্ আক্রমন করেন নি? বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় তাই শ্রদ্ধা, সম্মান প্রভৃতি আবেগ অত্যন্ত গৌন মনে হয়। তবু একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, যখন যে বাক্যকেই সত্য বলি না কেন সে বাক্যকে সম্মান করি; তা সে পূর্ব্বের শ্রদ্ধাসমন্বিত মতবাদের বিরোধী হ'লেও। তা হ'লে "সত্য" বিশেষণের এই আবেগ সঞ্চারী দিকটি একেবারে ফেলে দেওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়। তবু ওপরের সমস্যাগুলোর সমাধান ক'রে আরও ব্যাপক মতবাদের দিকে যাবার চেষ্টা ক'রতেই হ'বে।

দর্শনের আধুনিক ভূমিকা

শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্ত্তী, এম,এ, ডি, ফিল্

একদিন ছিল যখন বিজ্ঞানও দর্শনেরই অন্তর্গত ছিল। তখন বিজ্ঞানের নাম ছিল 'নৈসর্গিক দর্শন'। কিন্তু, সেদিন আর নেই। বিলেতে যেমন সাবালক হ'লে ছেলে পিতার আশ্রয় ছেড়ে দেয়, তেমনই বিজ্ঞান সাবালক হ'য়ে দর্শনের আশ্রয় ছেড়ে দিয়েছে। আধুনিক কালে প্রতিষ্ঠা ত বিজ্ঞানেরই। এই যুগের নাম বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগ। 'গৌরবান্বিতের গৌরবচ্ছটা নিজের গাত্রে লাগে দুর্বল মাত্রেরই এই ইচ্ছা।' তাই আজকের যুগে বিজ্ঞানেতর জ্ঞানচর্চা বিজ্ঞানের সঙ্গে কাঁধ ঘষাঘষি করে তার কৌলিন্য বজায় রাখতে চায়। কিন্তু এ প্রচেষ্টা সত্যিই হাস্যাস্পদ। নিজের গৌরব না থাকলে অন্যের গৌরব-রাগে কি রঞ্জিত হওয়া যায়? শেয়ালের রাজা সাজার সখের বিড়ম্বনার কথা ভুলবে কে? সুতরাং সে চেষ্টা না করাই ভাল।

আজকের দিনে অনেকেই বিভিন্ন দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতি দেখানর জন্য কোমড় বেঁধেছেন। এ প্রচেষ্টা অবশ্য দার্শনিক ও দর্শনের ছাত্রদের মধ্যেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। বৈজ্ঞানিকদের এ বালাই নেই। আর তাঁদের থাকবেই বা কেন? বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের গৌরব ত সর্বজন স্বীকৃত। প্রশ্ন উঠেছে দার্শনিক সিদ্ধান্তের গৌরব নিয়ে। তথাকথিত বিষয়ী লোকে বল্ছেন —দর্শনের সিদ্ধান্তগুলো প্রায়ই আজগুবি। শুষ্ক তর্কের সোনালী আকাশে এদের জন্ম। আসলে এ সবই আকাশ-কুসুম। এ কথায় দার্শনিকের চিত্ত যেন দুরু দুরু করে উঠেছে। তাঁদের কথা যে হেঁয়ালি নয়, তা দেখাবার জন্য তাই তাঁদের এত আগ্রহ। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গতি প্রদর্শনে তাই তাঁদের এত উৎসাহ। কিন্তু, আমাদের ধারণা, এ সব ছেলেমানুষী মাত্র। সত্যিই যদি দর্শনের নিজস্ব কোন মূল্য না থাকে, তবে বিজ্ঞানের প্রসাদে তার জীবিকা চল্বে না। দর্শনকে মরতে হবে। বিজ্ঞান তাকে মারবে। কিন্তু, দর্শনের সেই শমন দিন কি এসেছে? তাই আজ আলোচনা করবো।

জড়, প্রাণ, মন, দেশ, কাল, কার্য কারণ, অভিব্যক্তি এ সব নিয়ে আধুনিক দর্শন আর নূতন আলোচনা করবে কি? যদি একান্তই করতে হয় তবে এসব বিষয়ে

বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ধার করা ছাড়া আর উপায় কি ? ধার করা গয়নার ঐশ্বর্য বাড়ে না, দীনতা প্রকাশ পায়। সুতরাং এপথে সোনা মিলবে না। কেউ হয়তো বল্‌বেন —এসব বিষয়ে বিজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের যুক্তিযুক্ততা নিরূপণ করাই হবে দর্শনের কাজ। কিন্তু আমরা বলি—এ সম্পূর্ণ অসম্ভব কাজ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে জড়, প্রাণ, মন, দেশ-কাল প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত করেছেন, তার যুক্তিযুক্ততা নিরূপণের হাতিয়ার দার্শনিকের নাই। দার্শনিক আর যাই করুন পরীক্ষা (Experiment) করেন না। আপেক্ষিক তত্ত্ব বা কোয়েণ্টাম বাদের যুক্তিযুক্ততা নিরূপণ করতে পারেন বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক নন। দার্শনিক এসব বিষয়ে কথা বল্‌লে অনধিকার চর্চা হবে। আর তার কথা মান্‌বেই বা কে ? অযথা মোড়লি করতে গেলে বিড়ম্বনা হবে। কেউ আবার বল্‌বেন— এদের আত্যন্তিক তাৎপর্য্য নিরূপণই হবে দর্শনের কাজ। কিন্তু, এখানে প্রশ্ন ওঠে—এদের আত্যন্তিক তাৎপর্য্য নিরূপণ আদৌ সম্ভব কি ? এ প্রশ্নের উত্তর পাবো কি করে ? আমাদের জ্ঞানের স্বরূপ, উপকরণ ও প্রকৃতি জান্‌লেই এ কথা জানা যাবে। সুতরাং আসলে জ্ঞানালোচনাই দর্শনের কাজ। তথাকথিত কোন বিজ্ঞান একাজ করে না। সুতরাং দর্শনের স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করা দায়।

কিন্তু এখানে মুশকিল আছে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বড় সুবিধে এই যে একটা বিশেষ সময়ে একটা বিশেষ বিষয়ে সমস্ত বৈজ্ঞানিকই একটি বিশেষ মতবাদই প্রচার করেন। যদি এই মতবাদ দোষ-দুষ্ট বলে প্রমাণিত হয় তবে সবাই একই সঙ্গে আবার তা বর্জনও করেন। কিন্তু দর্শনের বেলায় কি তা হবে ? জ্ঞানের স্বরূপ, উপকরণ প্রকৃতি সম্বন্ধে সমস্ত দার্শনিক একই সঙ্গে একটি মত গ্রহণ করবেন বা বর্জন করবেন, এ আশা করা যায় না। এই বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন রকমেরই হবে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সার্ব্বজনীনতার জন্য বিজ্ঞানকে বলা হয় জ্ঞানের উৎস। জ্ঞান সার্ব্বজনীন। সূর্য পূর্বদিকে ওঠে—এটা জ্ঞানের বিষয়। কারণ, এ বিষয়ে মতানৈক্য নেই। জ্ঞানে কখনই মতানৈক্য থাকৃতে পারে না। আগেই বলেছি, দার্শনিক সিদ্ধান্তের বৈশিষ্ট্যই এই যে, এখানে মতানৈক্য আছে। তাই কেউ কেউ বলেন, দর্শন জ্ঞান দেয় না। এখানে প্রশ্ন ওঠে—দর্শন কি তবে ব্যক্তিগত ব্যাপার ? নেহাৎ অনুভূতির জিনিষ ? কথাটা তলিয়ে দেখা যাক্।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সামগ্রী আর জ্ঞানের সামগ্রীর মধ্যে তফাৎ করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞানের সামগ্রী সকলের কাছেই একরূপ। কিন্তু, সাহিত্যের সামগ্রী বিভিন্ন চিত্তের আধারে বিভিন্ন রূপ। উদাহরণ দিচ্ছি। সূর্য পূর্বদিকে

ওঠে—এটা জ্ঞানের সামগ্রী। ভিন্নজনের কাছে এর কোন ভিন্ন রূপ হতে পারে না। কিন্তু, কেমন করে সূর্য ওঠে—এটা ভাববার বিষয়। ভিন্ন হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন রঙে এর নানান্ রঙ; কত প্রাচীন কাল থেকে সুরু করে আজ পর্য্যন্ত কত কবি কেমন করে সূর্য ওঠে তা বিস্তারিত করে বল্‌লেন। কিন্তু কথাটা পুরাণ হ'ল কি? সুতরাং দেখা যাচ্ছে কাব্য বা সাহিত্যের বিষয় নিয়ে মতানৈক্য হয়। ভিন্ন লোকের কাছে একই বিষয়ের বিভিন্ন কাব্যরূপ। আগেই বলেছি, দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিভিন্ন দার্শনিকের কাছে বিভিন্ন রূপ। তবে কি দর্শন অনেকাংশে কাব্যের মতই ব্যাপার। দর্শন আর কাব্য কি মূলতঃ এক?

কেউ কেউ বলেন, কাব্য যেমন বিভিন্ন হৃদয়ের ছোঁয়া লেগে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, দার্শনিক সিদ্ধান্তও তেমনিই বিভিন্ন মনের রঙে বিভিন্ন রূপ। দর্শন মূলতঃ কাব্যের মতই ব্যপার। আমাদের ধারণা, কথাটা ঠিক নয়। বাইরের মিল দেখে অন্তরের মিল সব সময়েই ঠিক ঠিক অনুমান করা যায় না। কাব্য মূলতঃ অনুভূতির ব্যাপার। দর্শন কিন্তু যুক্তি তর্ক ও বিচার বিশ্লেষণেরই জিনিষ। কাব্যের সামগ্রী যে ভিন্নজনের কাছে ভিন্ন রূপ তার কারণ ভিন্নজনের অনুভূতি ভিন্ন প্রকার। আর কাব্য ত' অনুভূতির জিনিষ। একই বিষয় সম্বন্ধে যেমন ভিন্ন লোকের ভিন্ন অনুভূতি হয়, তেমনি একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন মতও থাকৃতে পারে। নানা মুনির নানা মত। এটা শুধু কথার কথা নয়, একান্ত ভাবেই সত্য কথা। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব। এই বুদ্ধির জন্যই তো মানুষ মনুষ্যতের জীব ও বস্তু থেকে বিবিক্ত। আর মানুষের গৌরব তো এই বুদ্ধি নিয়েই। সব মানুষই যদি সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে একই মত পোষণ করতো, তবে তাদের বুদ্ধির দৈন্য প্রকাশ পেত। মানুষ যে তার বুদ্ধির অনুশীলন করে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ একই বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন লোকের ভিন্ন মত। দর্শন বুদ্ধিজীবীর বিষয়। তাই দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিভিন্নতা দার্শনিকদের বুদ্ধি প্রাখর্যই প্রমাণ করে। বোকারই নিজস্ব কোন মত থাকে না। বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির নিজস্ব একটা মত তো থাকবেই। দর্শন বুদ্ধিমান ও ব্যক্তিসম্পন্ন লোকের উপজীব্য। তাই দর্শনে মতানৈক্যই স্বাভাবিক। আর এই মতানৈক্য অগৌরবের নয়, গৌরবের। দর্শনে যদি মতানৈক্য না থাক্‌তো তবে দর্শনের দীনতাই প্রকাশ পেত। দর্শনে মতানৈক্যই তার ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে। যতই দিন যাচ্ছে দার্শনিক মতও ততই সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে। এইতো দর্শনের প্রগতি। দর্শনের প্রকৃতিই এমন যে বিজ্ঞানের মত মতৈক্য এখানে বাঞ্ছনীয় নয়। বিজ্ঞানে মতৈক্য ও নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার তার প্রগতি সূচনা করে। দর্শনের

অগ্রগতি এই মাপ কাঠিতে বিচার করলে ভুল হবে। দর্শনের অগ্রগতি দার্শনিক মতের বিভিন্নতার অগ্রগতি সূচনা করে। আসলে দর্শন বিজ্ঞান নয়। একথা মনে রাখ্‌তে হবে। দর্শনের নিজস্ব একটা প্রকৃতি আছে, যেমন আছে তার নিজস্ব একটা আলোচ্য বিষয়। আর যেহেতু দর্শন বিজ্ঞান নয়, সে জন্যই দর্শন অশ্রদ্ধেয় একথার পেছনে কোন অকাট্য যুক্তি নেই। বিজ্ঞান ছাড়া শ্রদ্ধেয় অন্য কোন জ্ঞান চর্চা থাক্‌তে পারে না, একথা বলা এক প্রকার অন্ধ গোঁড়ামি। বিজ্ঞান অন্ধ গোঁড়ামির শত্রু। সুতরাং কোন বিজ্ঞানী একথা বল্‌তে পারেন না। সুতরাং দেখা গেল, দর্শনে যে মতৈক্য নেই, এটা দোষের নয়, বরং গুণের। দর্শনের প্রকৃতিই এমন যে এখানে মতানৈক্যই গৌরবের। সুতরাং দর্শনে মতৈক্য নেই বলে বিলাপ করে লাভ নেই।

এতক্ষণ যা বলা হ'ল, তার নির্গলিতার্থ এই যে, দর্শনের নিজস্ব একটি আলোচ্য বিষয় আছে। এই বিষয় হচ্ছে, জ্ঞানের প্রকৃতি, উপকরণ ও স্বরূপ বিশ্লেষণ। আর দর্শনের প্রকৃতি এমন যে এখানে মতানৈক্য থাকবেই। আসলে মতানৈক্যই দর্শনের ঐশ্বর্য।

আধুনিক কালের দর্শন যেন নিজস্ব প্রকৃতি উপলব্ধি করেছে। আজকের দর্শন মূলতঃ জ্ঞান বিশ্লেষণেরই ব্যাপার। নিউ রিয়েলিজম, ক্রিটিকেল রিয়ালিজম্, প্রেগ-মিটিজম, লজিকেল পসিটিভিজম্ সবই তো জ্ঞান ব্যাপারের বিশ্লেষণ করেছে। প্রথমোক্ত তিনটি ইজম্-এ তত্ত্ব নিয়ে বিশেষ আলোচনা নেই। এদের আলোচনা একান্ত-ভাবেই জ্ঞান নিয়ে। সবশেষের ইজমটি তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি বিশেষ মতবাদ প্রচার করেছে বটে। কিন্তু এই মতবাদ একান্ত-ভাবেই পসিটিভিষ্টদের বিশেষ প্রকার জ্ঞান-বিশ্লেষণের উপরেই নির্ভর করে। তাঁদের জ্ঞান-বিশ্লেষণ যাঁরা মান্‌বেন, তারা তাঁদের তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট মতবাদও মান্‌বেন। উইট্‌গেনষ্টাইন তাঁর ট্রেকটেটাস লজিকো-ফিলসফিকাস গ্রন্থে যে বিশিষ্ট জ্ঞান-বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, লজিকেল পসিটিভিজমের তাই তো ভিত্তি। ফেনমেনলজি যা করেছে তা জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ ছাড়া আর কি?

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করলে অনেক সময় তার তাৎপর্য বোঝা যায়। আমাদের ধারণা, 'দর্শন' শব্দটির ব্যুৎপত্তি বিচার করলে দর্শনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যই সমর্থিত হবে। তাই এবার 'দর্শনের' ব্যুৎপত্তি আলোচনা করি।

দর্শন শব্দটি দৃশ ধাতু থেকে উৎপন্ন। দৃশ ধাতুর মানে দেখা। সাধারণ অর্থে একে জ্ঞানও বলা যায়। দৃশ ধাতুর পর করণে বা ভাবে অনট্ করে 'দর্শন' শব্দটি পাওয়া

যায়, আমরা এখানে ভাবে অনট্ না ধরে করণে অনট্ই ধরবো। এখানে প্রশ্ন উঠবে—করণ মানে কি? বলা হয়েছে—সাধকতম কারণম ইতি করণম্। একটি কার্যের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। যে কারণ কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তী এবং যে কারণের উৎপত্তি মাত্রই কার্য উৎপন্ন হয় তার নাম করণ। উদাহরন দিচ্ছি। কাষ্ঠচ্ছেদন একটি কার্য। কুঠার, কাঠুরিয়া, কাষ্ঠ, কুঠার সংযোগ এ সবই এই কার্যের কারণ। কিন্তু এর সব গুলিই করণ নয়। শুধু কুঠার থাকলেই কাষ্ঠচ্ছেদন হয় না। শুধু কাঠুরিয়া থাকলেও হয় না। কিন্তু কাষ্ঠ-কুঠার সংযোগ মাত্র কাষ্ঠচ্ছেদন রূপ কর্ম সম্পন্ন হয়। সুতরাং কাষ্ঠচ্ছেদন রূপ কর্মে কাষ্ঠ-কুঠার-সংযোগই করণ। জ্ঞানের করণ কি? অর্থাৎ এমন কি আছে যা হওয়া মাত্র জ্ঞান হ'তে বাধ্য? উত্তর সহজ। প্রমাণই জ্ঞানের করণ। প্রমাণ যথাযথ রূপে পাওয়া গেলে জ্ঞান না হ'য়ে পারে না। বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হোল অথচ বস্তুর জ্ঞান হোল না এমন কি হয়? সুতরাং দেখা যাচ্ছে—দর্শন মানে প্রমাণ বিদ্যা। সাধারণ ভাবে বলতে পারি জ্ঞানের বিচার বিশ্লেষণই দর্শনের কাজ।

বিচার বিশ্লেষণ এক প্রকার আত্মিক অনুশীলন। সেইজন্যই বলা হয় দর্শন মানেই দর্শন করা (Philosophy is philosophising)। এই অনুশীলন আত্মিক উন্নতি সূচনা করে। দেহের অনুশীলন দৈহিক পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। আত্মিক অনুশীলনও আত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়। মানুষ শুধু দেহ নয়। মানুষ দেহবিশিষ্ট আত্মা। আত্মার জন্যই তার মনুষ্যত্ব। নয়ত মানুষে পশুতে তফাৎ কি? সুতরাং আত্মিক অনুশীলনের ক্রমোন্নতি মনুষ্যত্বেরই ক্রমোন্নতি সূচনা করে। মনুষ্যত্ব এমন জিনিষ যা জন্মের সঙ্গেই লাভ করা যায় না। পশুপক্ষী সহজেই পশুপক্ষী, তরুলতা সহজেই তরুলতা। কিন্তু, মানুষ শত চেষ্টায়, শত সাধনায় তবে মানুষ। দর্শন করা মনুষ্যত্বের সাধনা। কারণ, দর্শন করা আত্মিক সাধনা। এই দিক থেকে দর্শনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেই দর্শন সম্বন্ধে হীনমন্যতা ঘুচবে। সংস্কৃতি আত্মিক জিনিষ। সংস্কৃতিতে পয়সা নেই। একজন লোক সংস্কৃতিবান্ হ'লেই বিত্তবান হন না। কিন্তু, সেজন্য তার সংস্কৃতি নিরর্থক, এমন মোটা কথা মোটা বুদ্ধির লোক ছাড়া বলবে কে? দর্শনও এক প্রকার সংস্কৃতি। এতে মনুষ্যত্বের গৌরব, মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা। হয়ত সংসারী হিসাবে এতে তেমন সার্থকতা নেই। কিন্তু, সংসারীর চেয়ে মানুষ বড় একথা ভুল্লে যে ভরাডুবি। অর্থ তাতে জমবে, কিন্তু মানুষ তাতে মরবে। আর মানুষের মরণ হ'লে পশুর চরণ যে দুনিয়া কাঁপাবে। তাতে যুদ্ধ হবে, রক্তপাত হবে, অশান্তি হবে। নিশ্চয়ই কেউ

তেমন অবস্থা চায় না। যুদ্ধের দাওয়াই সংস্কৃতি। মানুষ সংস্কৃত না হ'লে যুদ্ধ থাম্‌বে না। দর্শন সংস্কৃতির অঙ্গ। সুতরাং আধুনিক যুদ্ধ-না-চাওয়া জগতে দর্শন এর প্রয়োজনীতা আছে।

অবশ্য এমন অনেকেই আছেন যারা এততেও খুসী হবেন না। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁদের বড় পক্ষপাত। বিজ্ঞান না পেলে তাদের মন ওঠেনা। তাঁরা বল্‌বেন —দর্শন তো বিজ্ঞান নয়। তবে আর কি? ওসব বুজরুকি এখন অচল। আমরা তাঁদের বল্‌বো—সাধারণ অর্থে না হ'লেও একটা বিশেষ অর্থে দর্শনকে বিজ্ঞানও বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রনীতিকে এতকাল বলা হ'ত দর্শন, আজকাল বলা হয় বিজ্ঞান। কিন্তু, রাষ্ট্রনীতি কি অর্থে বিজ্ঞান? সাধারণ অর্থে কি? কথাটা তলিয়ে দেখা যাক।

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন ছুটি মতবাদই একই সঙ্গে বিজ্ঞানে কখনই সত্য হয় না। বিজ্ঞানের একটি মতই একটা বিশেষ সময়ে সত্য। অবশ্য পরবর্তী কালে আবার তা মিথ্যা বলেও প্রতিপন্ন হ'তে পারে। আর বিজ্ঞানের সব চেয়ে মজা এই যে, যখন যে মত সত্য বলে গৃহীত হয় তখন সাধারণ ভাবে সকলেই তা সত্য বলে গ্রহণ করে। কিন্তু, রাষ্ট্রনীতির বেলায় তা কি হয়? ডেমক্রেসি ও কমিউনিজম—এ ছুটির মধ্যে কোনটি চরম সত্য তা কি হলপ করে বলা যায়? বহু-লোক ডেমক্রেসীর জয়গান করেন। আবার এমন লোকও বহু আছেন যারা শ্রেণীহীন কমিউনিষ্টিক সমাজের স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। একদলের লোক অন্য দলের কথায় কানে হাত দেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতিকে বিজ্ঞান বলা হয় কেন? আমাদের ধারণা, একটি বিশেষ বিষয়ের বিশেষ ও বিশদ আলোচনা হ'লেই তাকে বিজ্ঞান বলা যায়। এই অর্থেই বোধ হয় রাষ্ট্রনীতির নাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের রূপ কী হবে, তা নিয়েই তো বিশেষ ও বিশদ ভাবে আলোচনা করা হ'য়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে আলোচনার বিশেষ বিষয় হ'চ্ছে রাষ্ট্র। আর আলোচনাও যে বিশেষ ও বিশদ ভাবেই হ'চ্ছে তাতেও আর সন্দেহ কি?

বিজ্ঞানকে যদি এই ব্যাপকতর অর্থে গ্রহণ করা যায় তবে আমরা দর্শনের যে ভূমিকা নির্দেশ করেছি তাতে তাকেও বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। দর্শনের আলোচনার বিশেষ বিষয় হ'চ্ছে জ্ঞান। দার্শনিক এই বিষয়ের বিশেষ ও বিশদ আলোচনাই করে থাকেন। তবে দর্শনকে একটা বিশেষ অর্থে বিজ্ঞান বল্‌তেই বা আপত্তি কি? কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে একথাও কবুল করা ভাল যে, সাধারণ অর্থে দর্শন কখনই বিজ্ঞান হ'তে পারে না। বিজ্ঞানের পরীক্ষা করে সত্য নিরূপণের পদ্ধতি দর্শন কখনই গ্রহণ

করবে না। আর দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের এমনই বৈশিষ্ট্য যে এখানে পরীক্ষা চলে না। সুতরাং এর জন্য আপশোষে করে আর লাভ কি ?

রাসেল তাঁর 'History of Philosophy' তে রসিকতা করে বলেছেন— দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝামাঝি বেওয়ারিশ রাজ্যের রাজা। কথাটা যেন এই যে, বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোচনার একটা বিশেষ বিষয় আছে। কিন্তু, দর্শনের তেমন কোন নির্দিষ্ট বিষয় নাই। আমরা একথা স্বীকার করি না। আমাদের ধারণা, দর্শনেরও একটা নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় আছে। ফাঁকা মাঠে গুলি ছোড়া দার্শনিকের কাজ নয়। দার্শনিক হাওয়ায় বীজ বপন করে না। সুতরাং আকাশ কুসুম চয়ন করার বিড়ম্বনা তাঁর ভাগ্যে ঘট্‌বে কেন ? দার্শনিকের আলোচ্য বিষয় জ্ঞান। সুতরাং জ্ঞানের বিচার বিশ্লেষণই দার্শনিকের কাজ। অবশ্য এখানে একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে যে, দর্শন চিরকালই একাজ করেছে তা সত্যি নয়। প্রবন্ধের সুরুতেই বলেছি, এককালে বিজ্ঞানও দর্শনেরই অন্তর্গত ছিল। তখন ধর্মও ছিল দর্শনেরই একটি বিষয়। সুতরাং তখন বিজ্ঞান ও ধর্মাতিরিক্ত দর্শনের নিজস্ব সত্তা বা আলোচ্য বিষয়ের সুনির্দিষ্টতার তেমন প্রয়োজন ছিল না। আজ যখন বিজ্ঞান দর্শনের গাঁটছড়া খুলে ফেলেছে, ধর্মকে দর্শন থেকে আলাদা বলে তখনই দর্শনের নিজস্ব আলোচ্য বিষয়ের প্রশ্ন উঠেছে। কথাটা হ'ল এই, বিজ্ঞান ও ধর্মাতিরিক্ত দর্শনের যদি কোন আলোচ্য বিষয় না থাকে, তবে দর্শনের আর প্রয়োজন কি ? এই পরিপ্রেক্ষিতেই দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের প্রশ্ন উঠেছে। আমরা এই প্রশ্নের উত্তরেই বলছি—দর্শনের আধুনিক ভূমিকা হ'চ্ছে—জ্ঞানের বিচার বিশ্লেষণ।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—ধর্মকে দর্শন থেকে আলাদা বলে মনে করার কারণ কি ? আমরা আগেই বলেছি, দর্শন যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণের ব্যাপার। ধর্ম কিন্তু আদৌ তা নয়। ধর্মের ভিত্তি যুক্তি নয় বিশ্বাস। ধার্মিক বলেন, বিশ্বাসে মিলয়ে হরি, তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস অন্তরের এমন একটা দৃঢ়তা প্রকাশ করে যাতে বিশ্বাসীর কাছে বিশ্বাস্য বস্তুর সত্যতা সন্দেহাতীত রূপে প্রকট হয়। এই বিশ্বাসের জগৎ একটা নূতন জগৎ। এই জগতের ভাল-মন্দ বিচার এই প্রবন্ধের আওতায় পড়ে না এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, দর্শনের জগৎ বিশ্বাসের জগৎ নয়; দর্শনের জগৎ যুক্তি-তর্ক-বিচারের জগৎ। সুতরাং দর্শনকে ধর্ম থেকে আলাদা না করে আর উপায় কি ?

আমরা যখন বলছি—দর্শনের আধুনিক ভূমিকা হচ্ছে জ্ঞান-বিশ্লেষণ, তখন একথা মনে রাখতে হবে যে এই দর্শন সাধারণ স্বীকৃত বিজ্ঞান ও ধর্ম থেকে বিবিক্ত।

যদি আমরা দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করি তবে দেখবো প্রথম থেকেই দর্শন এই ভূমিকা গ্রহণ করেনি। দার্শনিক জন লকই (১৬৩২—১৭০৪ খ্রীঃ) সর্বপ্রথম জ্ঞান নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন। অবশ্য এ আলোচনা একান্তভাবেই মনোবিজ্ঞান সম্মত আলোচনা (Psychological discusssion) জ্ঞানোৎপত্তির বর্ণনাই ছিল তাঁর একমাত্র উপজীব্য। জ্ঞানের উপকরণ, স্বরূপ প্রভৃতি নিয়ে সত্যিকারের দার্শনিক আলোচনা সর্বপ্রথম করেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪—১৮০৪)। তাঁর 'Critique of Pure reason' জ্ঞান বিশ্লেষণের আদর্শ স্থাপন করেছে। পরবর্তী কালের অনেক দার্শনিকই জ্ঞান-বিশ্লেষণ করে তাঁর পন্থানুসরণ করেছেন। অবশ্য তাঁরা কান্টের সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন, এমত কথা আমরা বলছিনা।

এখানে অকপটে কবুল করা ভাল যে, কান্টই জ্ঞান-বিশ্লেষণ যে দর্শনের কাজ তা প্রথম প্রচার করেন। তিনি দর্শনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছিলেন—'Philosophy is the criticism of cognition'। দর্শন জ্ঞানের বিচার বিশ্লেষণ মাত্র। আমরা এই নিবন্ধে তাঁর কথাই প্রচার করছি।

ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান এর বিশেষ প্রতিষ্ঠা। ভারতীয় দার্শনিকেরা মুক্তি-সন্ধানী। মোক্ষ লাভের জন্যই তাঁরা দর্শন আলোচনা করেন। চার্বাক সম্প্রদায় অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম। তারা মোক্ষ মানে না। সুতরাং মোক্ষ লাভের চেষ্টাও তাদের নাই। চার্বাক ও মীমাংসা ছাড়া ভারতীয় দর্শনের সমস্ত সম্প্রদায়ই জ্ঞানে মুক্তির কথা বলেছেন। অবশ্য এই জ্ঞানের সঠিক প্রকৃতি কী হবে এ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ আছে। সুতরাং মোক্ষাভিলাষী ভারতীয় দার্শনিকেরা জ্ঞানের বিশদ আলোচনা করবেন এই ত স্বাভাবিক। শঙ্কর-পন্থীরা জ্ঞানকেই মোক্ষ বলেছেন। তাঁদের মতে জ্ঞানই মুক্তি। অবশ্য এই জ্ঞান সাধারণ জ্ঞান নয়। সাধারণ জ্ঞানের উদ্দেশ্য বিধেয়ের দ্বন্দ্ব এখানে নেই। এই জ্ঞান এক অখণ্ড তত্ত্ব। এই জ্ঞান এর বিস্তৃত আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলতে চাই না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই - ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হ'য়েছে। প্রমাণ নিয়ে আলোচনার ত আর অন্ত নেই। অন্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের কথা বাদ দিলেও নব্য ন্যায় প্রমাণ নিয়ে যে আলোচনা করেছে, বিশ্বের দর্শনের ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া দায়।

পাশ্চাত্য দর্শনে জন লকের আগেও অনেকেই প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে সক্রেটিশ, প্লেটো, অরিষ্টটল, বেকন, ডেকার্তে

প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। জ্ঞানের প্রকৃতি নিয়েও তাঁদের অনেকে আলোচনা করেছেন। তবে জ্ঞানের প্রাগুপকরণ নিয়ে কান্টের আগে কেউ আলোচনা করেন নি। জ্ঞানের এই প্রাগুপকরণের আলোচনাই দর্শনের বিশিষ্ট আলোচনা।

এবার উপসংহার করি। আমাদের বক্তব্য বিজ্ঞান ও ধর্মের মত আধুনিক দর্শন এরও নির্দিষ্ট একটি আলোচ্য বিষয় আছে। দর্শন এর আলোচ্য বিষয় জ্ঞান। বিজ্ঞান আলোচনা করে বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান নিয়ে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দর্শন এর আলোচ্য বিষয় সাধারণ জ্ঞান। অর্থাৎ সাধারণভাবে জ্ঞানের স্বরূপ, প্রকৃতি ও প্রাগুপকরণ দর্শনের আলোচ্য। কিন্তু, বিজ্ঞানের আলোচনা বিশেষ বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান নিয়ে। বিজ্ঞানের আলোচনায় পরীক্ষা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। কিন্তু দর্শনের আলোচনায় পরীক্ষা সম্ভব নয়। এখানে যুক্তিই আলোচনার একমাত্র হাতিয়ার। যুক্তির বলিষ্ঠতা দিয়েই আলোচনার বলিষ্ঠতা প্রমাণিত হয়। ধর্মের বেলায় সাক্ষাৎ বা বিশ্বাসের বনিয়াদ লক্ষ্যণীয়। অতিন্দ্রীয় সত্তায় বিশ্বাস অধিকাংশ ধর্মের প্রাণ। অবশ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মত কোন কোন ধর্মে নৈতিক জীবনের উপরই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে প্রত্যেক ধর্মেই পবিত্র জীবন যাপন আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে। দর্শন যেমন উপপত্তিক আলোচনা, ধর্ম কিন্তু তা নয়। চর্চার চেয়ে চর্যারই এখানে প্রাধান্য বেশী। জানার চেয়ে হওয়ারই এখানে বেশী গুরুত্ব। দর্শনে যেমন যুক্তিরই মুখ্যস্থান, ধর্মে তেমনি মুখ্য-স্থান ভক্তি ও শ্রদ্ধার। সুতরাং বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম এক নয়। এরা সবাই আলাদা। বিজ্ঞান ও ধর্মেরই নির্দিষ্ট বিষয় আছে, দর্শনের নেই, একথা ঠিক নয়। আগের দর্শনের মত আধুনিক দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্মের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, মাথা ঘামাবে দর্শনের বিশেষ সমস্যা জ্ঞান নিয়ে। আমাদের এইটুকুই বক্তব্য।

দর্শনের অধিকাংশ পাঠকের কাছে রচনাটি প্রাথমিক বলে মনে হতে পারে, তবে যাদের কাছে রচনাটি প্রাথমিক বলে মনে হবে না সেরূপ পাঠকও দর্শনের আছেন, এই বিশ্বাসেই রচনাটি প্রকাশ করা হল। —দর্শন সম্পাদক।

কাব্য ও দর্শন

শ্রী কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাব্যে ধী কোমল, কিন্তু তর্কে কর্কশ; কাব্য ললিত, কিন্তু দর্শন কঠোর, কাব্যের উৎস হৃদয়, কিন্তু দর্শনের মস্তিষ্কের ধূসর স্নায়ুপদার্থ; কাব্যের আত্মা রস, কিন্তু দর্শনের বিচার; কাব্যের উদ্দেশ্য রসোন্মেষ, কিন্তু দর্শনের পরপক্ষ দলন পূর্বক বাক্য প্রতিষ্ঠা; কাব্যের তুলনা সুচিরনবীনা প্রিয়া, কিন্তু দর্শনের তারুণ্যের চিরবৈরী নীরস গুরুমশায়; এই সব উক্তিকে কাব্য ও দর্শনের ভেদ বোধক, ভেদক ধর্ম জ্ঞাপক উক্তি বলে প্রায়ই মনে করা হয়। লৌকিক জীবনে কাব্য গ্রন্থকে কি মধুর, কি ললিত, এবং দর্শনের গ্রন্থকে কি সূক্ষ্ম, কি দুরূহ বলে যখন প্রশংসা করা হয়, তখন এই ভেদক ধর্মেরই ইঙ্গিত করা হয়। কাব্য ভাল লাগলে তা আমরা কণ্ঠস্থ করবার চেষ্টা করি, বার বার তার আবৃত্তি করি, মনে করি যে কথা বলবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম, কাব্যে সেই কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু দর্শনের গ্রন্থ ভাল লাগলে আমরা চেষ্টা করি কি ভাবে এর খণ্ডন করা যায়—এতদিন যে কথা ভাবি নাই সেই কথাই বলা হয়েছে বলে ভাল লেগেছে; তাই প্রতিপাদনে নিশ্চয়ই কোথাও ত্রুটি আছে; আর এ ত্রুটি গ্রন্থের ভাষার চিন্তা করলে খুঁজে পাওয়া যাবে না; সুতরাং গ্রন্থের আবৃত্তি বন্ধ করে অন্য ভাষায় চিন্তা করি, চেষ্টা করি গ্রন্থ প্রতিপাদ্য দর্শন যাতে আমাদের না হয়ে যায়। কাব্য ও দর্শনের গ্রহণের পার্থক্যেও এই ভেদের ইঙ্গিতই বর্তমান। অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে আমরা অনেকেই মনে করি যে কাব্য ও দর্শন ভিন্ন, এবং এদের ভেদক ধর্ম পরস্পর বিরোধী হওয়ায় বিরোধী। এই মত কতদূর বিচারসহ তা দেখাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কাব্য ও দর্শনের সম্বন্ধই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সম্বন্ধীকে না বুঝে সম্বন্ধ বোঝা যায় না। সম্বন্ধ সত্তা-সাক্ষাৎকার সম্বন্ধী-সত্তা-সাক্ষাৎকারের অধীন। সুতরাং কাব্য ও দর্শনের সম্বন্ধ বুদ্ধিও উভয়ের স্বরূপ-বুদ্ধির অধীন। আমাদের উচিত কাব্য ও দর্শনের স্বরূপ নিরূপণ পূর্বক, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের আলোচনা করা। কিন্তু তা করা হবে না। (জীবনে কোন্ উচিত কাজটাই বা করা হয়।) বস্তুতঃ কাব্য ও দর্শনের সম্বন্ধ-তত্ত্ব তাদের স্বরূপ-তত্ত্ব সাপেক্ষ। কিন্তু এই স্বরূপ-তত্ত্ব-সাপেক্ষতাকে দুভাবে বুঝতে পারি। আমরা মনে

করতে পারি যে কাব্য ও দর্শনের স্মায়সিদ্ধ লক্ষণ নির্ণীত না হওয়া পর্যন্ত, তাদের সম্বন্ধ বিষয়ক কোন আলোচনা সম্ভব নয়। অথবা আমরা মনে করতে পারি যে স্মায়সিদ্ধ লক্ষণ নির্ণীত না হলেও চলে, যদি আমরা আলোচনা পরিচালনা করবার মত এদের স্বরূপ তত্ব বুদ্ধিস্থ করতে পারি—কিন্তু এইরূপ বুদ্ধিস্থ বিষয়েরও অভাবে কোন আলোচনা হতে পারে না। প্রথম ভাবে চিন্তা করলে অবশ্যই কাব্য ও দর্শনের সম্বন্ধ বিষয়ক কোন আলোচনা করার আগে তাদের স্বরূপ বিষয়ক পুরাদস্তুর আলোচনা করে নিতে হয়। কিন্তু এভাবে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নাই। শুধু তাই নয়। এরূপ চিন্তা করলে দুস্তর বিপদ সাগরে পতিত হবার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ কাব্য ও দর্শনের স্মায়সিদ্ধ লক্ষণ আলোচনা পূর্বক তাদের স্বরূপ আলোচনা করার চেষ্টা এক প্রকার অসাধ্য সাধনের চেষ্টা। কারণ, লক্ষণ আলোচনা প্রায়ই বিশ্রাম বিহীন হয়ে থাকে। কাব্যের স্বরূপ কি, দর্শনের স্বরূপ কি—প্রশ্নের কোন সর্ববাদিসিদ্ধ উত্তর লাভের আশা প্রায় শূন্যে সৌধ নির্মাণের আশার মতই দুরাশা। উপরন্তু লক্ষণ আলোচনার সময়ও পারস্পরিক সম্বন্ধ আলোচনা করতে হয়। কাব্যের যে লক্ষণই আমরা দিই না কেন, আমাদের লক্ষণটি যে দর্শনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় না, লক্ষণটি যে অতিব্যাপ্তি দোষদুষ্ট নয়, এ আমাদের দেখাতে হয়। দর্শনের লক্ষণ সম্পর্কেও এই কথা খাটে। তাই প্রথম ভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। কাব্য ও দর্শন শব্দ দুটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। এদের ব্যবহারও আমরা করতে পারি—সব সময় সঠিক ভাবে না পারলেও অধিকাংশ সময় পারি। কাব্য অথবা দর্শন দেখলে আমরা চিনতেও পারি। লক্ষণ নির্ণয় না করেও কাব্যত্ব এবং দর্শনত্বকে আমরা বুদ্ধিস্থ করতে পারি। তাই স্মায়সিদ্ধ লক্ষণ প্রতিজ্ঞাত আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নয়। কাব্য ও দর্শনের লক্ষণ নির্ণয় পূর্বক তাদের সম্বন্ধ বিষয়ক কোন আলোচনা এ প্রবন্ধে করা হবে না।

যাই হক কাব্য ও দর্শন যে পরস্পর বিরুদ্ধ এমন কথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু পারস্পরিক বিরোধ কাদের মধ্যে থাকে? বলা নিষ্প্রয়োজন যে দুটি বাক্য, অথবা দুটি বুদ্ধি অথবা দুটি বস্তুর মধ্যেই পারস্পরিক বিরোধ থাকতে পারে। সুতরাং কাব্য ও দর্শন পরস্পর বিরোধী একথার অর্থ হয়;

(১) কাব্যবাক্য ও দর্শনবাক্য পরস্পর বিরোধী;

(২) কাব্যবুদ্ধি ও দর্শনবুদ্ধি পরস্পর বিরোধী;

(৩) কাব্যবস্তু ও দর্শনবস্তু পরস্পর বিরোধী;

এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়ও হয়, এই তিনটি পক্ষ।

কাব্যবাক্য ও দর্শনবাক্য পরস্পর বিরোধী, এই প্রথম পক্ষটিরই আলোচনা প্রথমে করা যাক। এই পক্ষটি আলোচনার যোগ্য হতে পারে যদি কাব্য ও দর্শন উভয়েই বাক্য প্রসব করে। কিন্তু কাব্যে বাক্য আছে কি? যেরূপ ভাষা ব্যবহারে বাক্য পাওয়া যায় কাব্যিক ভাষা ব্যবহার কি সেরূপ?

বাক্যকে পদ সমূহ বলা হয়, যদিও সমূহ বলতে একাধিক বোঝা যেতে পারে না। অনেক সময় একটি পদও বাক্যের মর্যাদা পেতে পারে, একপদাত্মক বাক্যও হতে পারে। সমূহ বলতে ঠিক কি বোঝা হবে, এই নৈয়ায়িক আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। বাক্যে এক বা একাধিক পদ থাকে, এই কথাই আমাদের আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পদ কি? এই প্রশ্নেরও নৈয়ায়িক উত্তর খোঁজায় আমাদের প্রয়োজন নাই। পদ সার্থক শব্দ এই বল্লেই আমাদের কাজ মিটে যায়। কিন্তু সার্থক শব্দের অর্থ কি? অথবা শব্দকে সার্থক বিশেষণে বিশেষিত করার সার্থকতা কোথায়? অবশ্যই যদি এমন কোন শব্দ থাকে যার কোন অর্থ নাই, বা যা সার্থক নয়, তবেই শব্দকে সার্থক বিশেষণে বিশেষিত করা সার্থক হয়। তেমনি আবার কোন শব্দ যদি অর্থবাচক না হয়, তাহলেও শব্দের পূর্বে সার্থক বিশেষণটিকে স্থাপন করার কোন অর্থ হয় না। সংক্ষেপে, সার্থক ও নিরর্থক উভয় প্রকার শব্দই যদি থাকে, তবেই সার্থক বিশেষণটি সার্থক হতে পারে। সুতরাং আরও বলা যায় যে শব্দ ও অর্থ যদি ভিন্ন না হয়, অর্থাৎ শব্দই যদি অর্থ হয়, অথবা অর্থই যদি শব্দ হয়, তাহলেও সার্থক বিশেষণটি ব্যবহার করার কোন অর্থ থাকে না। আমরা যখনই সার্থক শব্দ কথাটি ব্যবহার করছি, তখনই মেনে নিচ্ছি যে শব্দ ও অর্থ ভিন্ন, এবং অনেক শব্দ অর্থ-যুক্ত, অর্থ সংকেতিত করতে সক্ষম। শব্দখণ্ডের অনেক দার্শনিক একথা স্বীকার করেন না। অনেকে শব্দকেই অর্থ বলে মনে করেন, আবার অনেকে শব্দের যে অর্থ সংকেতিত করার শক্তি নেই, এমন কথা বলে থাকেন। এই সব দার্শনিকদের কথার আলোচনার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ শব্দ ও অর্থ যে ভিন্ন, একথা সহজ অনুভব সিদ্ধ, বিশেষ বিশেষ পরাবৈজ্ঞানিক (metaphysical) সিদ্ধান্ত অঙ্গীকার না করলে, এই সহজ অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্তকে বর্জন করবার প্রয়োজন হয় না। যাই হক বাক্য থাকলেই পদ থাকবে, আর পদ থাকলেই অর্থ-বাচক শব্দ সাংকেতিক শব্দ থাকবে। সুতরাং সাংকেতিক শব্দ যেখানে নাই, সেখানে বাক্যও নাই; অথবা যে ভাষা ব্যবহার সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার নয়, সেই ভাষা ব্যবহারে বাক্য রচিত হইতে পারে না।

আমরা দেখলাম যে সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগ যেখানে নাই, সেখানে বাক্যও নাই। অতএব কাব্যে বাক্য আছে কি, এই প্রশ্নটিকে কাব্যে সাংকেতিক শব্দ

প্রয়োগ (Symbolic use of language) আছে কি এই প্রশ্ন রূপে নিতে পারি। কাব্যে যে সাংকেতিক শব্দ প্রয়োগ নাই, এই মতটি একটি প্রসিদ্ধ মত, এবং এই মতের বিরুদ্ধ কোন মতও নাই। সুতরাং সবিস্তারে আলোচনা না করে সরাসরি এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে কাব্যে কোন বাক্য নাই। তবু আমরা তা করছি না। কারণ কাব্য ও দর্শনের সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য, এই প্রশ্নের কিছু আলোচনা প্রয়োজন। উপরন্তু এই সিদ্ধান্ত যে আমরা ধ্বনিবাদকেই অঙ্গীকার করে করছি না, তাও দেখান প্রয়োজন।

কাব্য কি, কাব্যের আত্মা কোথায় ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে অনেক মত অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রচলিত আছে। এই মতগুলির কোন আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। এদের সংক্ষেপে উল্লেখই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে। সংক্ষেপে উল্লেখেরও কোন প্রয়োজন ছিল না – তবে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছানর উদ্দেশ্যে যে কোন প্রধান মতকেই অবহেলা করছি না, তাই দেখবার জন্যই উল্লেখ করছি, এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'কাব্যের আত্মা' নামক প্রবন্ধটি অবলম্বন করেই উল্লেখ করছি। মানুষের আত্মা নিয়েও যেমন বহু দার্শনিক মত আছে, কাব্যের আত্মা নিয়েও ঠিক তেমনই বহু মত রয়েছে। মানুষের আত্মা প্রসঙ্গে স্থূল চার্বাক মত হতে সুরু করে সূক্ষ্ম অদ্বৈত মত পর্যন্ত দেখা যায়, কাব্যের আত্মা প্রসঙ্গেও চার্বাক মতের মত স্থূল মত হতে আরম্ভ করে অদ্বৈত মতের মত সূক্ষ্ম মতও দেখা যায়। মানুষের আত্মা প্রসঙ্গে চার্বাক মত হল, দেহ অতিরিক্ত কোন আত্মা নাই। ঠিক তেমনি কাব্যের আত্মা প্রসঙ্গে স্থূলতম মত হল, শব্দ, অর্থ ও অলঙ্কার, এই দৈহিক উপাদানত্রয় অতিরিক্ত আত্মা কাব্যের নাই। এই মত হতে কিছু সূক্ষ্ম মত হল, সৌন্দর্য কাব্যের আত্মা, এবং সৌন্দর্যের উপাদান হল যমকাদি শত শত ভণিতি বৈচিত্র্য রূপ অলঙ্কার। এর হতে সূক্ষ্ম মত হল অলঙ্কার যদিও কাব্যের শোভা হেতু, তবু শোভার অন্তরঙ্গ উপাদান হল প্রসাদ প্রভৃতি গুণ। আরও সূক্ষ্ম মত হল রীতিই কাব্যের আত্মা, এবং সূক্ষ্মতম মতে ধ্বনি, রসই কাব্যের আত্মা। লক্ষণীয় যে আমরা যখন স্থূল হতে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম প্রভৃতি মতে যাই, তখন পূর্ব পূর্ব মতগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করি না। সর্বাপেক্ষা স্থূলমতে কাব্যের আত্মাই অস্বীকার করা হয়েছে, কাব্যকে পর্যবসিত করা হয়েছে শব্দ, অর্থ ও অলঙ্কারের সমষ্টিতে। পরবর্তী মতে এই মতকে সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করা হয় নাই। সৌন্দর্যকে কাব্যের আত্মা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু সৌন্দর্যের উপাদান যে অলঙ্কার তা অস্বীকার করা হয় নাই। তেমনি রীতিকে যখন কাব্যের আত্মা বলা হয়েছে, তখন রীতি প্রভাবেই যে প্রসাদ

প্রভৃতি গুণ ফুটে ওঠে তা-ও বলা হয়েছে। আর ধ্বনিবাদে যে সকল মতের সমন্বয় স্থাপন করবার আকাঙ্খা আছে, তা বলাই বাহুল্য।

এই মত গুলির মধ্যে কোন্ মত বিচারসহ, কোন্ মত কাব্যের আত্মার প্রকৃত পরিচয় দান করে এই আলোচনায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। আমাদের প্রয়োজন কোন গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক আছে কিনা দেখা। অবশ্য গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক-রূপে যে ধর্মটি পাওয়া যাবে, যদি কোন ধর্ম পাওয়া যায়, তার সাহায্যে কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা করলে অযৌক্তিক মনোভাবেরই পরিচয় দেওয়া হবে। গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক আমাদের নির্ণেয় কারণ আমাদের উদ্দেশ্য কাব্যের স্বরূপ নির্ণয় করা নয়, কি ধর্ম কাব্য মাত্রেরই আছে, অথবা কোন ধর্মের অভাব কাব্যে নাই, তাই দেখা। যদিও প্রত্যেকটি মতেই যে ধর্মের সাহায্যে মতটিতে কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়, সেই ধর্মটিকেই এই ধর্ম বলে মনে করা হয়, তবু সকল মতের মিলন কোন ধর্ম স্বীকার করে হতে পারে, তাই নির্ণয় করাই আমাদের আকাঙ্খা। যাই হক, অলঙ্কার যে সকল মতেই কাব্যের জন্য প্রয়োজন, এ কথা বলা যায়। অলঙ্কারই আমাদের আকাঙ্খিত গরিষ্ট সাধারণ গুণনীয়ক। অবশ্য সর্বাপেক্ষা স্থূলতম মতে অলঙ্কারকে যে মর্যাদা দেওয়া হয় অন্য মতগুলিতে সে মর্যাদা দেওয়া হয় না। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। কাব্য নিরলঙ্কার হতে পারে না। কাব্যের আত্মা অলঙ্কার না হতে পারে, কিন্তু অলঙ্কার বিহীন কাব্য হতে পারে না। যেমন হিন্দু রমণীর সীমন্তের সিন্দুর পাতিব্রত্যের উৎকৃষ্ট চিহ্ন না হতে পারে, কিন্তু পতিব্রতা হিন্দু রমণীর সীমন্ত স্বামীর জীবদ্দশায় সিন্দুরবিহীন হতে পারে না। কাব্যের বাক্য নিরলঙ্কার নয়।

কিন্তু অলংকার জিনিষটি কি? অবশ্যই স্বভাবোক্তি নয়। সাধারণ লোকে যে ভাবে যে কথা বলেন কবি সে ভাবে সে কথা বলেন না। তিনি অলংকার দিয়ে কথা বলেন। আমরা পাঁচজনে যে শব্দের সাহায্যে যে অর্থ সংকেতিত করি, তিনি তা করেন না। অলংকরণ করেন। কবি কর্মে বাক্যটি অলম্ পায়, প্রকৃষ্ট সামর্থ্য পায়। বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দ বাচ্যার্থ মাত্রই বুঝায় না। বাচ্যার্থ প্রাকৃতজন-সংবেদ্য, কোষ-জ্ঞান-মাত্রই তাতে অপেক্ষিত, সহৃদয়তা নয়। কাব্য সহৃদয় পাঠক চায়। কাব্যের বাক্য প্রাকৃতজন-সংবেদ্য বাচ্যার্থটুকুই প্রকাশ করে না। একটি গূঢ়, অধিক চমৎকার অর্থের ইঙ্গিত করে। বাচ্যার্থ এই গূঢ় অর্থের ব্যঞ্জক এবং এই গূঢ় অর্থই বাচ্যার্থের ব্যঙ্গ্য। বাচ্যার্থ কাব্যের অর্থ না হওয়াতেই কাব্যের শোভা। সারভূত অর্থ স্বশব্দের দ্বারা অভিহিত না হয়েই কাব্যের শোভা নিরতিশয় বর্ধন

করে। সংক্ষেপে অলংকার কাব্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, এবং সেই জন্য কাব্যের অর্থ বাচ্যার্থ হতে পারে না। একথা কেবল প্রাচ্য অলংকারশাস্ত্র সম্মত কথাই নয়। প্রতীচ্য অলংকার-শাস্ত্রও এই কথাই বলে। ইংরাজী figure of speech, যাকে আমরা বাংলায় অলংকার বলি, একটি গ্রীক কথার ইংরাজী রূপ। ঐ গ্রীক কথাটি schema এবং এর দ্বারা বোঝা হয় এমন বাক্য ব্যবহার যা স্বাভাবিক নয়, অথবা বাচ্যার্থ মাত্রই প্রকাশ করে না। বাচ্যার্থকে কাব্যের ক্ষেত্রে যে পাশ্চাত্য আলংকারিকরা গণ্যই করেন না, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মেটাফর সম্পর্কে তাঁদের ঔদার্য। মেটাফর যখন কল্পনাকে পরিচ্ছিন্ন চিত্র রচনায় সাহায্য করে না, কিন্তু রসসৃষ্টি করে, বাচ্যার্থ হতে বহুদূরে অবস্থিত গূঢ় অর্থের ইঙ্গিত করে, তখন বুদ্ধি বিভ্রম ঘটালেও, বিচার শক্তিকে বিহ্বল করে দিলেও, মেটাফরকে সার্থক বলে মনে করা হয়। বাচ্যার্থ কাব্যের অর্থ হলে তা করা হত না। বাচ্যার্থ কাব্যের অর্থ নয়।

অবশ্য একথা আমাদের রসবাদেই নিয়ে যায়। কারণ ব্যঙ্গ অর্থ তিন প্রকার; বস্তু, অলংকার ও রস, এবং রসই পরম ব্যঙ্গ। যাই হক, অলংকরণ ব্যতিরেকে কাব্য নাই, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও নাই। কাব্যের ভাষা ও গদ্যের ভাষার মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নাই, একথা তিনি লিখেছিলেন বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কাব্য রচনা কালে বিস্মৃত হয়েছিলেন, এবং স্থিতধী জনসনের words too familiar or too remote defeat the purpose of a poet, এই উক্তিকে তাঁর কবি কর্মে নিয়ামক করতে অধিকাংশ সময়ই অবহেলা করেন নাই।

কাব্যে বাচ্যার্থ নিরর্থক। বৈয়াকরণ মতে যেমন শ্রূয়মাণ ক্রম-বিধ্বংসী বর্ণসমূহ অর্থবোধক নয়, পরন্তু ক্রমোচ্চারিত বর্ণসমূহের দ্বারা যে অখণ্ড স্ফোটরূপ শব্দ অভিব্যক্ত হয়, সেই শব্দই অর্থবোধক, ঠিক তেমনিই বাচ্যার্থ চারুত্ব-বিবর্জিত, চমৎকারত্বশূন্য, এবং নিরর্থক বর্ণসমূহ সদৃশ। বাচ্যার্থ যে অর্থান্তরকে প্রকাশ করে, যে গূঢ় অর্থ প্রাকৃতজন সংবেদ্য নয়, যা স্ব-শব্দের দ্বারা অভিহিত হয় না, এবং গ্রহণের জন্য সহৃদয় পাঠকের অপেক্ষা করে, যা প্রিয়াবিভ্রমের মত অবধি ও পুনরুক্তি শূন্য যা বিদগ্ধ রমণীর মুখ-নিঃসৃত উক্তির মত, সেই ব্যঙ্গ অর্থই কাব্যের অর্থ। কাব্যে বাক্যের অন্তর্গত শব্দ প্রাকৃত, অথবা বৈজ্ঞানিক বাক্যের শব্দের মত অর্থ সংকেতিত করে না। একথা সত্য যে বাচ্যার্থকেও কাব্যে সংকেতিত করতে হয়। বাচ্যার্থই ব্যঙ্গ অর্থের অভিব্যক্তির কারণ। বাচ্যার্থকে ত্যাগ করে ব্যঙ্গ অর্থে যাওয়া যায় না। শব্দের সমাজসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করে, বাচ্যার্থ বর্জন করে, পাঠকের চিত্তে প্রবেশ করা, পাঠকের অন্তরে রসোন্মেষ করা, ব্যঙ্গ অর্থ পরিস্ফুট করা সম্ভব নয়। বৃদ্ধ জনগন

তাই remote শব্দের কথাও বলিছিলেন। এরিষ্টটলও কাব্যে dignity এবং clarityর কথা বলেছিলেন। বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে না গেলে, কাব্য মহিমা লাভ করে না, আবার বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলে কাব্যের গ্রহণ যোগ্যতা নাশ পায়। ধ্বনিবাদীরাও বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন। বাচ্যার্থ কাব্যের অর্থ না হলেও বাচ্যার্থ বর্জন কাব্যে সম্ভব নয়। তবু কাব্যে শব্দের সাংকেতিক ব্যবহার symbolic use নাই। বাচ্যার্থ উপায় মাত্র, instrumental। ব্যঙ্গ অর্থই উপেয়। আনন্দ বর্ধনের ভাষায় বনিতাবদনারবিন্দ অবলোকনের জন্যই গৃহে দীপশিখা আনি। দীপশিখার সার্থকতা প্রিয়ার মুখপদ্ম দর্শনের যোগ্য উপায় হিসাবে। বাচ্যার্থের সার্থকতা উপায় রূপে। আনি দীপশিখা, কিন্তু দেখি প্রিয়া-মুখপদ্ম। বাচ্যার্থকে বর্জন করি না, কিন্তু উপভোগ করি ব্যঙ্গ অর্থ। শব্দের সাংকেতিক ব্যবহার ও কাব্যিক ব্যবহার symbolic use ও emotive use, স্বরূপতঃ পৃথক, Ogden এবং Richards এর ভাষায় in principle distinct ; এবং

ব্যঙ্গ ব্যঞ্জকাভ্যামেব সুপ্রযুক্তাভ্যাম্ মহাকবিত্বলাভো
মহাকবীনাং ন বাচ্যবাচক রচনা মাত্রেণ।

কাব্যিক শব্দ ব্যবহার প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার, বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার হতে যে মূলতঃ পৃথক তা কাব্যের শব্দ ও অর্থের মধ্যে যে পার্বতী পরমেশ্বরের মত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে তা থেকেও বোঝা যায়। লৌকিক ব্যবহারে গদ্যে এরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। কোনও কাব্যের অর্থ ঐ কাব্যের ভাষাতেই বলা যায়। শোনা যায় যে কবিগুরুকে কোনও কাব্যের অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি ঐ কবিতাটিই আবৃত্তি করে শোনাতেন। কাব্যে শব্দ চারুত্ব-ব্যক্তি-হেতু, তাই উক্তি-অন্তর-অশক্য। অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন form ও content অবিচ্ছেদ্য, এক অখণ্ড শিল্প চেতনার অখণ্ড প্রকাশ, কাব্যের ক্ষেত্রেও তাই। বিটোফেনের কোন সিম্ফনির অর্থ ঐ সিম্ফনিই, ভিঞ্চির কোন চিত্রের অর্থ ঐ চিত্রই, অন্য কিছু তা প্রকাশে অক্ষম। কাব্যের ক্ষেত্রেও তাই। তবে এ ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহৃত হয় বলে, এই অমূলক ধারণার সৃষ্টি হয় যে লৌকিক ক্ষেত্রে ভাষা ও অর্থ যেমন অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ নয়, কাব্যের ক্ষেত্রেও বোধ হয় তাই। কিন্তু তা নয়। এখানেও form এবং content, form এর content অথবা content এর form নয়, form-content অথবা এমন নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ যে বাচ্যার্থ জ্ঞাপক শব্দে অপ্রকাশ্য। বৈজ্ঞানিক বাক্যের অনুবাদ হয় কাব্যের অনুবাদ হয় না। বিজ্ঞানের অধ্যাপনা সম্ভব, কাব্য অধ্যাপিত হতে পারে না। কাব্যের অধ্যাপক কেবল অধ্যেতার রস নয়ন উন্মোচনে

সাহায্য করতে পারেন, তার প্রাকৃত চিত্তকে সহৃদয় চিত্তে রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করতে পারেন।

কাব্যে বাক্য রচিত হয় না। কাব্যের ভাষা স্বতন্ত্র; symbolic নয় emotive। কাব্যে বাক্য নাই। সুতরাং কাব্যের বাক্য ও দর্শনের বাক্য পরস্পর বিরোধী এই বাক্যটিরও কোন অর্থ নাই। প্রথম পক্ষটি অসিদ্ধ। অবশ্য এই পক্ষটি হতে, আর একটি পক্ষ পাওয়া যায়; যেমন কাব্যে বাক্য নাই এবং দর্শনে বাক্য আছে, সুতরাং কাব্য ও দর্শন পরস্পর বিরুদ্ধ। এই পক্ষটি তৃতীয় পক্ষেই পর্যবসিত হবে। এর কোন স্বতন্ত্র বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা এখন দ্বিতীয় পক্ষের বিচার করতে পারি।

দ্বিতীয় পক্ষটি: কাব্যবুদ্ধি ও দর্শনবুদ্ধি পরস্পর বিরুদ্ধ। এই পক্ষটিও মূলতঃ অসিদ্ধ হয়, যদি কাব্যবুদ্ধি ও দর্শনবুদ্ধি, অথবা কোন প্রকার বুদ্ধিই না থাকে। তাই আমাদের দেখতে হয় কাব্যবুদ্ধি বলে কোন প্রকার বুদ্ধি আছে কি না। বলা বাহুল্য, যে কাব্যবুদ্ধি বলতে কাব্যের বুদ্ধি, অথবা কাব্যত্ব প্রকারক বুদ্ধি, অথবা ইহা কাব্য এই আকারের বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে, এবং তা আমাদের জিজ্ঞাসার বিষয় নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় কাব্যের রচনা ও আস্বাদনে কোন বুদ্ধি থাকে কি না এবং সেই বুদ্ধি দার্শনিক বুদ্ধির বিপরীত কি না।

কাব্য রচনা ও আস্বাদনে যে বুদ্ধির কোন স্থান নাই কবি চেতনা যে বৌদ্ধিক চেতনা নয়, এই মতটি একটি প্রসিদ্ধ দার্শনিক মত। গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর দু একজন সাম্প্রতিক ভাষ্যকর ছাড়া প্রায় সকলেই এই মতটিকে প্লেটোর মত বলে মনে করে থাকেন। আমরাও তাই এই মতটিকে প্লেটোর মত বলে অভিহিত করব, এবং তাঁরই রীতিতে পরিবেশন করব।

অবাধিত অর্থ বিষয়ক বুদ্ধিই বুদ্ধি। অন্যবুদ্ধি বুদ্ধি পদবাচ্য নয়। সতত-চঞ্চল ক্ষণ-বিধ্বংসী ব্যক্তি আমাদের চেতনার বিষয় হতে পারে। কিন্তু এরূপ চেতনা বুদ্ধি নয়। চেতনার বিষয় যখন এমন অর্থ হয় যা কোন কালেই বাধিত হয় না, যা নিত্য, যা সৎ, যা সামান্য, বা Idea তখনই আমরা চেতনাকে বুদ্ধি আখ্যা দিতে পারি। সুতরাং যেখানে সামান্য নাই, নিত্য সৎ নাই, Idea নাই, সেখানে কোন বুদ্ধি নাই। ব্যক্তির বোধ, বিশেষের বোধ, সামান্য-অনুবিদ্ধ ব্যক্তির, বিশেষের বোধ, এবং প্রকৃত বোধ অর্থাৎ বুদ্ধি নয়। সুতরাং কাব্যে যেখানে কারবার অপমূরককে নিয়ে, সেখানে কোন বুদ্ধি থাকতে পারে না। কাব্যে যে বুদ্ধি নাই, কাব্য রচনায় যে বুদ্ধি অপেক্ষিত নয়, তা একটু মন দিলেই টের পাওয়া যায়।

আচার্য ভরত লিখেছিলেন :—

ন তচ্ছিল্পং ন তচ্ছাস্ত্রং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ॥

অর্থাৎ কবি কর্ম কি দুরূহ, এমন শিল্প নাই, এমন শাস্ত্র নাই, এমন কলা নাই যা কাব্যাঙ্গ বা কাব্য রচনার উপযোগী না হতে পারে। আচার্য ভরতের এই এই উক্তিটিকে প্লেটোর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই, তাঁর মত বুঝতে পারা যাবে। জুতা সেলাই হতে চণ্ডীপাঠ, গণিতের যোগ বিয়োগ হতে আরম্ভ করে বিরহ-মিলন কথা সব কিছুই কাব্যের বিষয় হতে পারে। এমনও কবি আছেন যাঁদের একক রচনায় উল্লিখিত হয় নাই, কাব্যায়িত হয় নাই, এমন বিষয় দুর্লভ। 'যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে ;' রামায়ণ সম্পর্কেও এই কথা বলা যায় ; হোমরের সম্পর্কেও। কিন্তু প্রশ্ন এই, সব কিছুই জানা, সব কিছুর স্বরূপ বুদ্ধিস্থ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব কি ? হোমর কি রাজনীতি, রণনীতি, অর্থনীতি, পশুচিকিৎসা, গণিত, আবহাওয়াতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, আচারনীতি, সবই জানতেন ? অবশ্যই না। (বেদব্যাস এবং বাল্মীকি সম্বন্ধেও এই প্রশ্ন করা যায়, তবে তাঁরা ঋষি হওয়ায় মুশকিল হয়েছে যদিও তাঁদের ঋষিত্ব এই প্রশ্নের উত্তর নয়)। কাব্য সৃষ্টিতে বুদ্ধি অপেক্ষিত নয়। অসিতত্ত্ব সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না রেখেও, এবং অসির ব্যবহার না জেনেও অসি নিয়ে কবিতা লেখা যায়। কোন শাস্ত্রেই কবির প্রকৃত প্রবেশ অপেক্ষিত নয়। কবির শাস্ত্র প্রবেশ কৃত্রিম প্রবেশ, উপরে উপরে, ভাসা ভাসা প্রবেশ, অনুকরণ কৌশল আয়ত্ত করবার জন্য যে প্রবেশ অপেক্ষিত সেই প্রবেশ। জুতা সেলাই হতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব কাজ আমরা কেউ একা একা করতে পারি না। কিন্তু দর্পণ পারে, চিত্রকর পারে, ক্যামেরা পারে। সব কিছু অনুকরণ কববার জন্য, প্রতিবিম্ব রচনা করবার জন্য, প্রতিবিম্বিত করবার জন্য, কোন তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভের প্রয়োজন হয় না। কেবল অনুকরণ করবার কৌশলটুকু জানলেই চলে। কাব্য রচনায় অপেক্ষিত তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, ভাসা ভাসা জ্ঞান—অনুকার বুদ্ধি। সুতরাং কবি কর্ম মোটেই দুরূহ নয়। যাই হক, কবির জ্ঞান জ্ঞান নামের অযোগ্য। উপরন্তু আমাদের বিচারশীল, মননশীল সত্তা কাব্যের উৎস নয়, কাব্যের আবেদনও আমাদের সত্তার এই অংশের প্রতি নয়। কবিরা প্রকৃতপক্ষে মহেন্দ্রের তপোভঙ্গের দূত। উদ্দামের উতরোলই তাঁদের ছন্দে ক্রন্দন করে। Passion, আবেগ, রস হতেই কাব্যের উৎপত্তি, রসোন্মেষই কাব্যের অভিপ্রায়, এবং রসেই কাব্যের পরিণতি। কাব্যবুদ্ধি বুদ্ধি নয়।

বলা বাহুল্য যে অনেকেই প্লেটোর এই মত স্বীকার করতে পারেন নাই, এবং সূক্ষ্ম বিচার পূর্বক খণ্ডন করতে চেয়েছেন। তবু একথা বলা যায় যে কাব্য সম্পর্কে প্লেটো একটি অখণ্ডনীয় সত্য কথা বলেছেন, যদিও তাঁর কবিদের আদর্শ রাষ্ট্র হতে নির্বাসনে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। প্লেটো ঠিকই বলেছেন যে কাব্যবুদ্ধিকে যদি আমরা বুদ্ধি বলি তাহলে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, লৌকিক, ব্যবহারিক বুদ্ধি, নাম জাতি প্রভৃতি যোজনা সহিত বুদ্ধিকে আর বুদ্ধি বলতে পারব না। এই কথাটি এতই সত্য যে প্লেটোর সমালোচকরাও, অধিকাংশ সময়ে অজ্ঞাতসারে স্বীকার করে নিয়েছেন। যেমন অনেকে বলে থাকেন কাব্য অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। কিন্তু এতে কি প্লেটোর মত খণ্ডিত হয়; না আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? অর্থাৎ কবি স্রষ্টা এ কথার অর্থ কি? অবশ্যই অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতি। কিন্তু এর অর্থ কি এই নয় যে কাব্যে তত্ত্বজ্ঞান, বিষয়ের স্বরূপজ্ঞান, সামান্যমুখীজ্ঞান, অর্থ সংকেতক পদযুক্ত বাক্যে প্রকাশিত হয় যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান, বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন পদযুক্ত বাক্যাকার জ্ঞান, অপেক্ষিত নয়? তেমনি যাঁরা প্লেটোর সমালোচনায় বলে থাকেন, কাব্যবুদ্ধি সামান্য যোজনা সহিত বুদ্ধি না হলেও বুদ্ধি, তাঁরাও স্বীকার করেন যে কাব্যবুদ্ধি সামান্য বিষয়ক বুদ্ধি নয়, প্রকারতা নিরূপিত বিশেষ্যতাশালী বুদ্ধি নয়, সপ্রকারক বুদ্ধি নয়, predicative awareness নয়, এমন কি সবিকল্প প্রত্যক্ষ বুদ্ধির কারণরূপে যে নিষ্প্রকারক বুদ্ধির, simple apprehension এর কথা অনেক দর্শনে বলা হয় সেরূপ বুদ্ধিও নয়। প্রকৃত কথা এই যে সব কথাই কথা নয়, সব বাক্যই বাক্য নয়, সব বোধই বুদ্ধি নয়। কাব্যে ভাষা থাকে কিন্তু বাক্য থাকে না, বোধ থাকে কিন্তু বুদ্ধি থাকে না। সেই বোধকেই বুদ্ধি বলা যায় যা সংকেতক শব্দযুক্ত বাক্যে আকার পায়, যা সত্য অথবা মিথ্যা হয়, যা অর্থ প্রকাশ করে, যার সাহায্যে বিবেচনা প্রস্থান রচনা করা যায়, বা বিবেচনা প্রস্থানে যার স্থান থাকার প্রশ্ন ওঠে। অথবা নিষেধমুখে বলা যায়, যে বোধ বাক্যে আকার পায় না, যা সত্য অথবা মিথ্যা হয় না, যা অর্থ প্রকাশ করে না, বিবেচনা প্রস্থানে যার স্থান থাকার প্রশ্ন ওঠে না, সে বোধকে বুদ্ধি বলা চলে না। কাব্য বুদ্ধি যে বাক্যে আকার লাভ করে না, কাব্যিক বাক্য যে বাক্য নয়, এ আমরা দেখেছি। ঠিক তেমনই কাব্য বুদ্ধি সত্য কি মিথ্যা এ প্রশ্নও ওঠে না।

সত্য শব্দটির ব্যাপক অর্থে কাব্যকে সত্য অথবা মিথ্যা বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্যাপক অর্থটি বর্তমানে অভিপ্রেত নয়। বস্তুতঃ সত্য শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলে শব্দটি তার নির্দিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন অনুগত অর্থ হারিয়ে ফেলে

পঙ্গু হয়ে যায় কি না, অকেজো হয়ে পড়ে কি না, এ প্রশ্ন মোটেই কুপ্রশ্ন নয়। সত্য শব্দটিকে বিনা প্রয়োজনে, বাক্যের শোভা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আমরা ব্যবহার করি না। কোন বাক্য অথবা বুদ্ধিকে যখন আমরা সত্য অথবা মিথ্যা বলি তখন ঐ বাক্য অথবা বুদ্ধির সহিত অপর কিছুর এক নির্দিষ্ট সম্বন্ধের কথা বলি। সুতরাং ঐ বাক্যকে, বুদ্ধিকে যেমন নির্দিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন হতে হয় অপর কিছুকেও, অর্থকেও ঠিক তেমনি নির্দিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন হতে হয়। সত্য শব্দটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধির সহিত নির্দিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন অর্থের নির্দিষ্ট পরিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বাচক। এই বাচ্য অর্থের বাচক হিসাবেই সত্য শব্দ ব্যবহারের সার্থকতা। ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলে এই অর্থ হারিয়ে যায়, এবং শব্দটি নিরর্থক শব্দে পর্যবসিত না হলেও, আর ঠিক সার্থক শব্দ থাকে না। কাব্যবুদ্ধি ব্যাপক অর্থে সত্য শব্দের বাচ্য হলেও হতে পারে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সত্য শব্দটি প্রায় বাচার্থ্যহীন। তাই ব্যাপক অর্থটি আমাদের অভিপ্রেত নয়। অভিপ্রেত পরিচ্ছিন্ন অর্থটি, এবং এই অর্থে কাব্যবুদ্ধিকে সত্য অথবা মিথ্যা বলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এর অর্থ কেবল এই নয় যে কাব্য উপভোগ করার সময় কাব্যে পরিবেশিত তথ্য, যদি কোন তথ্য কাব্যে পরিবেশিত হয় তা হলে সেই তথ্য সত্য কি মিথ্যা এ প্রশ্ন আমরা করি না। এর আরও গভীর অর্থ রয়েছে। কোন বুদ্ধি সত্য কি না, এ প্রশ্ন আমরা তখনই তুলতে পারি যখন ঐ বুদ্ধিটি এবং তার অর্থ উভয়েই পরিচ্ছিন্ন হয়। কাব্যের অর্থ যে পরিচ্ছিন্ন নয়, তা বলার আর প্রয়োজন নাই। যখনই ব্যঙ্গ অর্থকে কাব্যের অর্থ বলা হয়, তখনই কাব্যের অর্থ যে পরিচ্ছিন্ন নয় একথাও বলা হয়। কাব্যের অর্থ যদি পরিচ্ছিন্ন না হয়, কাব্যবুদ্ধিই বা কেমন করে পরিচ্ছিন্ন হবে? বুদ্ধির আকার অর্থের দ্বারাই নিরূপিত হয়। পরিচ্ছিন্ন অর্থ বিশিষ্ট বুদ্ধিই পরিচ্ছিন্ন হয়। উপরন্তু কাব্যে যেমন শব্দ ও অর্থ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ, বোধ এবং অর্থও ঠিক তেমনই অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ। তাই কাব্যার্থ অপরিচ্ছিন্ন বলে কাব্য বোধও অপরিচ্ছিন্ন। কাব্যবুদ্ধির প্রসঙ্গে সত্যতার প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারে না। প্রকৃত কথা এই যে, সত্য শব্দটি একটি সম্বন্ধ বাচক শব্দ। বুদ্ধি ও বুদ্ধি প্রকাশিত অর্থের সম্বন্ধ বাচক শব্দ। তাই যেখানে বোধ ও বোধের বিষয় অর্থের মধ্যে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে অর্থাৎ সম্বন্ধ বলতে যা বোঝা হয়, তা যেখানে ঠিক থাকে না, সেখানে এই শব্দটি প্রয়োগের কোন অবসরই থাকে না। কাব্যবুদ্ধি প্রসঙ্গে সত্যতার প্রশ্ন ওঠে না।

কাব্যবুদ্ধি যে অর্থ প্রকাশক এ কথাও বলা যায় না। যে বুদ্ধি তার বিষয়ের

সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ নয়, সেই বুদ্ধিকেই অর্থ প্রকাশক বলা যায়। একথা সত্য যে অনেক দার্শনিক অর্থকে প্রতীতি মাত্র শরীর বলেছেন, essie কে বলেছেন percipi। কিন্তু এ কথাও কি সত্য, অধিক সত্য নয় যে তাঁরা সকল বুদ্ধিকে বুঝেছেন কাব্যবুদ্ধির দৃষ্টান্তে? উপরন্তু যখন তাঁরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থ প্রকাশক বুদ্ধির অর্থকে বুদ্ধিভিন্ন বলে মনে করেন, তখন ঘটবুদ্ধি, পটবুদ্ধি প্রভৃতি বুদ্ধি, কাব্যবুদ্ধি তার অর্থের সঙ্গে যেরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেরূপ সম্বন্ধে যে নিজ নিজ অর্থের সঙ্গে সম্বদ্ধ নয়, একথা মনে করতেও তাঁরা বাধ্য। পারমার্থিক দৃষ্টিতে অর্থ যাই হক না কেন, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অর্থ ও অর্থ বিষয়ক বুদ্ধি ভিন্ন, এবং এই ভিন্নত্ব অর্থ প্রকাশে অপেক্ষিত। অর্থ ও বুদ্ধি যদি ভিন্ন, অর্থাৎ ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও ভিন্ন, না হত, তাহলে বুদ্ধি অর্থ প্রকাশক এ কথারও কোন অর্থ থাকত না। সংক্ষেপে সেই বুদ্ধিই অর্থ প্রকাশক, যে বুদ্ধি অর্থ হতে ভিন্ন। কাব্যবুদ্ধি ও কাব্যার্থ ভিন্ন নয়, ব্যবহারিক দৃষ্টিতেও নয়। কাব্যবুদ্ধিকে আমরা বুদ্ধি বলতে পারি না। বস্তুতঃ কাব্যবুদ্ধি কোন অর্থ প্রকাশক বুদ্ধি নয়, এবং কাব্য অর্থও কোন অর্থ নয়। নীলমণিলতা পেটুনিয়া নয়। কাব্য প্রতিভাকে যখনই দিব্য উন্মাদনা বলা হয়, যখনই স্বীকার করা হয় যে কাব্যে জগৎ কবির রুচি অনুসারেই নির্মিত হয় এবং নিয়তি কৃত-নিয়ম-রহিত, অনন্য-পরতন্ত্র, তখনই কাব্যবুদ্ধি যে অর্থ বিষয়ক বুদ্ধি নয়, কাব্য-অর্থ যে অর্থ নয় একথাও স্বীকার করা হয়। তাই কাব্যবুদ্ধি সপ্রকারক বুদ্ধি নয় বলে যে নিষ্প্রকারক বুদ্ধি তাও নয়। কাব্যে শব্দ ব্যবহার হয়, তাই কাব্য বোধ নাম জাতি প্রভৃতি যোজনা রহিত নির্বিকল্প বোধও নয়। কাব্যবুদ্ধি ও বুদ্ধি ভিন্ন জাতীয়, তাদের ভেদ বিজাতীয় ভেদ। কাব্যবুদ্ধিকে বুদ্ধি বলা চলে না। সুতরাং দ্বিতীয় পক্ষটিও হয় না। অবশ্য এই দ্বিতীয় পক্ষ হতে আর একটি পক্ষ পাওয়া যায়। বলা যায় যে কাব্যে বুদ্ধি নাই এবং দর্শনে বুদ্ধি আছে, সুতরাং কাব্য ও দর্শন পরস্পর বিরোধী। এই পক্ষটি বাক্য থাকায় ও না থাকায় দর্শন ও কাব্য পরস্পর বিরোধী এই পক্ষেরই তুল্য এবং তৃতীয় পক্ষেই এর পর্যবসান।

তৃতীয় পক্ষটি হল, কাব্যবস্তু ও দর্শনবস্তু পরস্পর বিরোধী। কাব্যবস্তুটি ঠিক কি তা বলা না গেলেও অলঙ্কার যে কাব্যবস্তু তা বলা যায়। ঠিক তেমনি দর্শনবস্তু বিচার। অর্থাৎ এমন কোন কাব্য নাই, যাতে শব্দ, অর্থ ও অলঙ্কার নাই। তেমনি এমন কোন দর্শন নাই যাতে শব্দ, অর্থ ও বিচার নাই। সুতরাং কাব্যবস্তু ও দর্শনবস্তু পর বিরুদ্ধ কি না, এই প্রশ্নটিকে অলঙ্কার ও বিচার পরস্পর বিরুদ্ধ কিনা, এই প্রশ্নরূপে নেওয়া যায়।

এখন, অলঙ্কার ও বিচার কি পরস্পর বিরুদ্ধ? লৌকিক অর্থে অলঙ্কার ও বিচার অর্থাৎ প্রসাধন ও রণং দেহির মধ্যে কিছুটা বিরুদ্ধতা আছে। রণক্ষেত্রে আমরা বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী যাই না; এবং বাসর কক্ষেও আমরা মুক্ত অসিহস্তে প্রবেশ করি না। তাই অলঙ্কার ও বিচারের মধ্যে কিছুটা বিরোধ আছে। কিন্তু কিছুটাই। অর্থাৎ এ বিরোধ আংশিক, পূর্ণ নয়, স্বরূপতঃ নয়। রণক্ষেত্রেরও বেশ আছে, ভূষণ আছে, অলঙ্কার আছে। বাসর কক্ষেও রণ আছে, দ্বন্দ্ব আছে, সংগ্রাম আছে। অলঙ্কার ও বিচারের মধ্যে যে স্বরূপতঃ বিরোধ আছে তা আমরা বলতে পারি না। আমরা বলতে পরি না যে বিচার নিরলঙ্কার হবে বা অলঙ্করণ নির্বিচার হবে।

কাব্যালঙ্কার ও দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রেও একথা খাটে। কাব্যালঙ্কারেও বিচার থাকে, এবং দার্শনিক বিচারেও অলঙ্কার থাকে। দার্শনিকেরা যখন তাঁদের বক্তব্যকে পরিবেশন করেন, তখন অলঙ্কারবিহীন, চারুত্ববিহীন বাক্যে তা পরিবেশন করেন না। জার্মাণ দার্শনিকদের কথাই বলি, আর নব্যনৈয়ায়িকদের কথাই বলি, তাঁরা সকলেই বক্তব্যকে প্রসাদাদি গুণমণ্ডিত করেন। কবিরা অবশ্য, অতএব, সুতরাং প্রভৃতি শব্দ তেমন ব্যবহার করেন না। তবে 'তাই বুঝি,' ব্যবহার করেন। উপরন্তু তাঁরা এমন কথা বলেন যা শুনে মনে হতে পারে এ তত্ত্বকথা কবির বাণী নয়, এবং তারপর আবার যখন দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন, এ তত্ত্বকথাই নয় কবির কাব্য, এবং এর অনুকূলে বলেন, আমি বলব এ সত্য তাই এ কাব্য, তখন তিনি কি বিচার বর্জন করে কথা বলেন? আরও কথা, দিব্য উন্মাদনা বশে কবি কাব্য নির্মাণ করেন, কিন্তু কাব্যটি উন্মাদনা মাত্রই নয়। তাতে অনেক তত্ত্বকথা থাকে। এই তত্ত্বকথার তাত্ত্বিকতা দিয়ে কাব্যের কাব্যত্ব নির্ণীত না হতে পারে, তবু এর তাত্ত্বিকতা বর্জন করা যায় না। কাব্যটি সুকাব্য কিনা দেখবার জন্য কাব্যের তত্ত্বকথার বিশ্লেষণ অপেক্ষিত নয়, কিন্তু মহৎ কাব্য কিনা দেখবার জন্য অপেক্ষিত। কাব্যে form এবং content যেমন অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, ঠিক তেমনি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ কাব্যাবেশ এবং আবেশ পরিবেশিত তত্ত্ব। তত্ত্বগুলি বিচারের বিষয়। কাব্যে বিচার মুখে তারা পরিবেশিত না হতে পারে, কিন্তু বিচার অনর্হ তারা নয়। কাব্যের আস্বাদন আস্বাদন ক্ষণেই শেষ হয়ে যায় না। বিবেক ক্ষণেও এই আস্বাদন ক্রিয়া চলতে থাকে। ক্রোচের ভাষায় artistic activityর অব্যবহিত উত্তরক্ষণে logical activityর আবির্ভাব হয়। বিবেকক্ষণে যা পরিস্ফুট হয়, তা যদি বীজাকারেও আস্বাদনক্ষণে উপস্থিত না থাকে, তাহলে বিবেকক্ষণের বিষয় ও কাব্যের মধ্যে কোন সম্বন্ধই থাকবে না, অথবা সেই জাতীয় সম্বন্ধই থাকবে, যে জাতীয় সম্বন্ধ থাকে এই

বিষয়ের সঙ্গে মঙ্গলগ্রহের মরুবাত্যার। প্রকৃত কথা এই যে আমাদের বিচারশীল সত্তাকে ত্যাগ করা, সাময়িক ভাবেও সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। কাব্য উপভোগ কালেও আমরা আমাদের পুরুষার্থবোধ, নীতিবোধ, জীবন দর্শন ত্যাগ করতে পারি না। অবশ্য এই বোধ প্রভৃতি যদি সচেতন ভাবে উপস্থিত থাকে, তাহলে আমাদের পক্ষে কাব্যের রসগ্রহণ সম্ভব নয়। যে পাঠক সচেতন ভাবে এই বোধাদির ব্যবহার করেন, আস্বাদনক্ষণেও করেন, তাঁকে অরসিক বলা যায়। কিন্তু রসিকের অর্থ এই নয় যে এই বোধাদির উপস্থিতি বিবেকক্ষণেও রোধ করতে হবে, আস্বাদন ক্ষণে এদের অসচেতন উপস্থিতিও বন্ধ করতে হবে। এই যদি রসিকের অর্থ হয়, তাহলে রসিক অর্থে সর্বপ্রকার সংস্কৃতি বর্জিত, সংস্কার বর্জিত ব্যক্তিকে বুঝতে হয়, যার কাছে পুস্পিন সেক্সপীর অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে কাব্য আস্বাদন আস্বাদন মাত্রই নয়। এক প্রকারের অস্বাদন অন্য প্রকারের আস্বাদন হতে আস্বাদনরূপে পৃথক নয়। আস্বাদন অতিরিক্ত কিছু স্বীকার না করলে কাব্য আস্বাদন হতে প্রাকৃত আস্বাদনকে পৃথক করার মানদণ্ড থাকে না। এক আস্বাদন অন্য আস্বাদন হতে অধিক তীব্র হতে পারে, অথবা অধিক ম্লান হতে পারে— কিন্তু আস্বাদনটি প্রাকৃত না কাব্যজ তা আস্বাদন বলতে পারে না। আস্বাদন অতিরিক্ত কিছু আস্বাদনে উপস্থিত থাকবেই, পল্লবিত আকারে না থাকলেও বীজভাবে থাকবেই। কাব্যে বিচার প্রচ্ছন্ন আকারে থাকে। কাব্যালঙ্কার বিচার বিহীন নয়। দার্শনিক বিচারেও অলঙ্কার থাকে এবং কাব্যেও বিচার থাকে।

সুতরাং আমরা কি বলব কাব্যবস্তু ও দর্শনবস্তুর মধ্যে কোন বিরোধ নাই? তাও বলতে পারি না, অন্ততঃ নিঃসংশয়ে, সর্ত আরোপ না করে পারি না, উপরে যা বলা হয়েছে তা থেকে পারি না। কাব্য ও দর্শনের মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ আছে তা বহুবাদি সম্মত। তর্ক করে হয়ত একথা খণ্ডন করা যায়। কিন্তু তর্ক একথা প্রতিষ্ঠিত করে নাই। একথা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অনুভবে। দর্শনের গ্রন্থ পাঠকালে প্রসাদাদি গুণ বর্জিত ভাষা আমাদের বিরক্ত করতে পারে, ক্ষুণ্ণ করতে পারে, কিন্তু নিরাশ করে না; আমাদের দার্শনিক সত্তাকে বিমুখ করে না। আমাদের দার্শনিক সত্তা তখনই বিমুখ হয়, যখন কেবল সুমধুর, অলঙ্কার মণ্ডিত বাক্যই দর্শনের গ্রন্থটি পরিবেশন করে। দর্শনের গ্রন্থে আমরা চাই বিচার, অলঙ্কার নয়: বিচার যদি যোগ্য অলঙ্কারে মণ্ডিত হয় আমরা সুখী হই। কিন্তু বিচারের পরিবর্তে যদি অলঙ্কার মাত্রই পরিবেশন করে, অথবা অতিরিক্ত অলঙ্কার মণ্ডিত বিচার পরিবেশন করে,

আমরা গ্রন্থটির তীব্র সমালোচনা করি। যোগ্য অলঙ্কারযুক্ত বিচার কাম্য। কিন্তু কিন্তু নির্বিচার, শ্লথবিচার অলঙ্কার আমাদের কাম্য নয়। তাই মনে হয়, অলঙ্কার, কাব্যরস, উপরি পাওনা। থাকলে ভাল, না থাকলে ক্ষুণ্ণ হতে পারি, কিন্তু নালিশ করতে পারি না। তেমনই কাব্যের ক্ষেত্রে তত্ত্ব, বিচারসহ তত্ত্ব, কাব্যে থাকলে কাব্য মহিমা পায়। কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টি না করে, রসোন্মেষ না করে, রস পরিবেশন না করে, অলঙ্কার মণ্ডিত শব্দ যোজনা না করে, কাব্য যদি দার্শনিক তত্ত্বকথা অথবা অন্য কোন তত্ত্বকথা প্রচার করে, তাহলে সে কাব্য কি আমরা পাঠ করি, পাঠের যোগ্য বলে মনে করি? দার্শনিকতা কাব্যে পেলে আমরা খুসী হই, না পেলে ক্ষুণ্ণ হই। ওটা আমাদের উপরি পাওনা। কবিতায় দার্শনিকতা প্রকট হয়ে উঠলে, কাব্যত্বকে ছাড়িয়া গেলে কবিতা দুঃসহ হয়, দর্শনভার মন্থর হয়ে রসিকের চিত্তে আর অভিসারে যাত্রা করতে পারে না। কাব্য ও দর্শনের মধ্যে, উভয়ের বস্তুর মধ্যে অলঙ্কার ও বিচারের মধ্যে, রস ও তত্ত্বের মধ্যে যে বিরোধ নাই এ কথা নিঃসংশয়ে, কোন সর্ত আরোপ না করে বলা যায় না।

অতএব আমরা এক ন যযৌ, ন তস্থৌ, অবস্থায় উপনীত হয়েছি। অলঙ্কার ও বিচার, রস ও তত্ত্বের মধ্যে যে বিরোধ আছে তাও বলতে পারছি না, আবার নাই, এও বলতে পারছি না। এই অচল অবস্থার অবসান কি ভাবে হতে পারে? অলঙ্কার ও বিচারকে কেন্দ্র করেই প্রশ্নটি তুলি, এবং প্রশ্ন করি, কি করে এই সমস্যার সমাধান করা যায়? একটি মাত্র উপায় আছে বলে মনে হয়। এই উপায়টি হল কাব্যিক ও দার্শনিক ভাষা বিশ্লেষণ। কাব্য ও দর্শন উভয় ক্ষেত্রেই ভাষা ব্যবহৃত হয় এবং এই ব্যবহারে এমন কিছু থাকে যার জন্য কখনও মনে হয় অলঙ্কার ও বিচার পরস্পর বিরুদ্ধ, এবং কখনও এর বিপরীত বোধই উৎপন্ন হয়।

কাব্যের ভাষা ব্যবহারের বিশ্লেষণ আমরা পূর্বেই করেছি, এবং দেখেছি যে কাব্যের ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ নিরর্থক, ব্যঙ্গ অর্থই অর্থ। আলঙ্কারিক শব্দ ব্যবহার বাচ্যার্থ বোধক, বাচ্যার্থ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার নয়। কিন্তু বিচারে শব্দ ব্যবহার কিরূপ? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে বিচার সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলে নিতে হয়। বিচার আমরা করি কিন্তু সব সময় এক উদ্দেশ্যে করি না। বিচারের প্রধান উদ্দেশ্য দুটি, বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় এবং মত প্রতিষ্ঠা। অধিকাংশ সময় দুটি উদ্দেশ্যই উপস্থিত থাকে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে। অনেক সময় উদ্দেশ্য দুটি হয় জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে মিলিত হয়ে যায়। আবার অনেক সময় উদ্দেশ্য দুটিকে জ্ঞাতসারেই পৃথক রাখা হয়, যেমন জল্পকালে তর্কে নিজ মত প্রতিষ্ঠারই আমরা চেষ্টা

করি, বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করি না। আবার অনেক সময় উদ্দেশ্য দুটি পৃথক থাকে তবে জ্ঞাতসারে নয়। আমরা তখন প্রকৃত পক্ষে মত প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা করি, কিন্তু ভাবি বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা করছি। এই তৃতীয় প্রকারের বিচার তখনই চলতে পারে যখন পরীক্ষণাদির সাহায্যে কোনও বাক্যের খণ্ডন সম্ভব হয় না। বিচার্য বাক্যগুলি এত বেশী ব্যাপক থাকে, অথবা অনুভব হতে এত দূরে অবস্থিত থাকে, যে পরীক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে তাদের বিরোধী বাক্যগুলিকে খণ্ডন করে তাদের প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নই ওঠে না। এই তিন প্রকার বিচারের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের বিচারই আমাদের আলোচ্য। কারণ দ্বিতীয় প্রকারের বিচারে ব্যঙ্গ অর্থ যে প্রধান হয়ে উঠতে পারে, এ কথা বুঝতে পরিশ্রম করতে হয় না।

প্রথম প্রকারের বিচারে, অর্থাৎ যে বিচারে পরীক্ষণাদির সাহায্যে বিরোধী বাক্য খণ্ডন পূর্বক কোন বাক্যের প্রতিষ্ঠা এবং বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করা হয়, সেই বিচারে, অলঙ্কারের, ব্যঙ্গ অর্থের স্থান নাই। পাশ্চাত্য যুক্তি বিজ্ঞানের তাদাত্ম্যনীতি এই বিচারের কথা মনে রেখেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। বাক্যার্থ লঙ্ঘন করলে, হারিয়ে গেলে, ছাড়িয়ে গেলে, এই বিচার চলতে পারে না। বিচার বিভ্রাট হয়। কিন্তু লক্ষণীয় যে স্বাভাবিক ভাষায় আমরা যখন কথা বলি,তখন বাচ্যার্থকে লঙ্ঘন না করে পারি না। স্বাভাবিক ভাষায় যে সব ঐতিহাসিক বিচার হয়েছে তা নিয়ে সামান্য চিন্তা করলেই একথা বুঝতে পারা যায়। শঙ্কর, উদয়ন প্রভৃতি বেদ বিশ্বাসী আচার্যরা বৌদ্ধাচার্যদের কি এমন ভাবে খণ্ডিত করেছিলেন যে বৌদ্ধ মতের পুনরুত্থান সম্ভব নয়? মহাপ্রভু বাসুদেব সার্বভৌমকে কি এমন ভাবেই পরাজিত করেছিলেন যে অদ্বৈত মত সমূলে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল? এই সব বিচারের ক্ষেত্রে বিচারী মনীষিদের উপস্থিত বুদ্ধি, বিচার কৌশল, ব্যক্তিত্ব, এবং আরও অনেক অনৈয়ায়িক গুণ উপস্থিত ছিল, এবং খণ্ডনাদিও এদের ফল। বিজ্ঞানে কোন সিদ্ধান্ত একবার খণ্ডিত হলে, আর ফিরে আসে না। বিজ্ঞানের দেশে মৃত্যু আছে, resurrection নাই। (এই জন্যই অনেক বৈজ্ঞানিক পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন না কি না কে জানে)। কিন্তু যে সব বিচারের কথা উল্লেখ করেছি, তারা এমন নয়। এক্ষেত্রে মরেও না মরে রাম এ কেমন বৈরী, এই রাবণের খেদোক্তিই প্রযোজ্য। বস্তুতঃ স্বাভাবিক ভাষায় কথা বলার সময় বক্তার চরিত্র, বাচন ভঙ্গী আকার ইঙ্গিত, চেষ্টা, সব কিছুই উপস্থিত থাকে। লিখিত অবস্থায় এরা সব উপস্থিত না থাকলেও, কেউই একেবারে অনুপস্থিত থাকে না। স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহারে কখনই বাচ্যার্থ মাত্র উপস্থিত হতে পারে না। কাব্যে যাকে ব্যঙ্গ অর্থ বলা হয়, তা সর্বদা উপস্থিত না হলেও,

বাচ্যার্থ নিয়তই অতিক্রান্ত হয়। এই জন্যই বিজ্ঞানে যখন বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বিচার করা হয়, তখন স্বাভাবিক ভাষা পরিত্যাগ পূর্বক গণিতের সাংকেতিক, কৃত্রিম ভাষার প্রয়োগ করা হয়। গণিতের ভাষা, অথবা ঐরূপ কৃত্রিম ভাষা যে বিচারে ব্যবহার করা হয় না, সেখানে বাচ্যার্থ পরিত্যক্ত হবেই, এবং ন্যায়ের ছদ্মবেশে, অন্যায়, কুন্যায়, আসবেই। আমরা যখন তৃতীয় প্রকারের বিচার করি, অপরকে প্রভাবিত (persuade) করবার চেষ্টা করি, সম্প্রদায় রক্ষার চেষ্টা করি, তখন আর গণিতের ভাষা ব্যবহার করতে পারি না। গণিতের ভাষা দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। এর অনেক কারণ। যে গাণিতিক প্রস্থান প্রয়োগ করব, সেই প্রস্থানের প্রাথমিক সংকেত-গুলিকে তথ্য বোধক সংকেত, (semantic) করে নিতে হবে। এই কাজ দর্শনে সম্ভব নয়, আর সম্ভব না থাকার প্রধান কারণ দর্শনে ঠিক আনুভবিক অর্থ নাই। এখন, যদি আমরা এই অসাধ্যকে সাধন করেও ফেলি, তাহলেও আমরা দেখতে পাব যে গণিতের রীতিতে, কথা বলা সম্ভব নয়। লাইবনিৎস যে সার্বভৌম ভাষার কথা বলেছিলেন, সেই সার্বভৌম ভাষা আর যেখানেই সম্ভব হক না কেন দর্শনের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুজন দার্শনিক কখনই এক অর্থে এক শব্দ প্রয়োগ করেন না। বার্ক্‌লে বারবার বলেছেন যে তিনি আপেল, ঘর, বাড়ী, এদের অস্বীকার করছেন না। কিন্তু তাঁর সমালোচকরা কি একথা স্বীকার করেন? অধ্যাপক মূর ভেবেছিলেন যে তিনি তাঁর হস্তখানিকে দৃঢ়ভাবে প্রসারিত করলেই বাহ্যার্থ ভঙ্গ বাদীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে। কিন্তু তিনি তা পেরেছেন কি? হিউম এবং কাণ্ট একই রণাঙ্গনে রণ করেছেন কি না, এবং এই রণের কোন নিষ্পত্তি হয়েছে কি না, তা আজও স্থির হল না। ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজন নাই। যা দেওয়া হয়েছে তা থেকেই উপলব্ধি করা যাবে যে দার্শনিক সমাজে, নির্দিষ্ট অর্থ, বাচ্যার্থ, বাচক, শব্দ-ব্যবহার প্রচলিত নাই। উক্তিটিকে অত্যুক্তি বলে মনে হতে পারে। অত্যুক্তির আভাস যে আছে তাতে সন্দেহ নাই। তবে নিছক অত্যুক্তি নয়। দর্শনে যে সর্ববাদি সম্মত কোন বাক্যই নাই, এটা অত্যুক্তি নয়, যদিও যাই সর্ববাদিসিদ্ধ তাই যথার্থ এই উক্তিটি অত্যুক্তি। অর্থাৎ সর্ববাদি-সিদ্ধ বাক্যের প্রতি ক্রীতদাস সুলভ মনোবৃত্তি, এবং সুবিচারক সুলভ মনোভাব পোষণ করা যায়। প্রথম প্রকার মনোভাবের অর্থ যা সর্ববাদি-সিদ্ধ তাই যথার্থ, যা বেশী লোক বলে তাই ঠিক। দ্বিতীয় প্রকার মনোভাবের অর্থ, সর্ববাদি-সিদ্ধ না হলে তাকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে হবে, এবং যেখানে সর্ব পদের দ্বারা লুব্ধ, ক্ষুব্ধ, আত্মার দৃষ্টিহারাদের পাওয়া যাবে, সেখানে সর্ববাদি-সিদ্ধকেই ত্যাগ

করতে হবে। এখন দ্বিতীয় প্রকার মনোভাব নিয়ে দর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, যে দর্শনের রাজ্যে যে সর্ব পদের দ্বারা আত্মার দৃষ্টিহারা কাউকেই পাওয়া যায় না (অবশ্য আমর মত চাকুরীমাত্র-ইষ্ট দর্শনের অধ্যাপক বাদে), তখন সর্ববাদি-সিদ্ধ মতের অভাবের কারণ বিশ্লেষণ করতেই হবে, এবং দার্শনিক বিচারের স্বরূপ কি তা নির্ণয় করতেই হবে। দার্শনিকরা পরমত খণ্ডন করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তথ্যের সাহায্যে করেন কি ? তা যদি করতেন তা হলে দার্শনিক প্রয়োগশালা থাকৃত। আসলে সহজ অনুভবে যা তথ্য বলে প্রতিভাত হয় তা সকল দার্শনিকেরই জানা, এরূপ কোন তথ্য নির্দেশ দার্শনিক মত খণ্ডনে অপ্রাসঙ্গিক। এবং প্রয়োগ শালায় যে জাতীয় তথ্য সংগৃহীত হয়, তার প্রতিও দর্শন উদাসীন। দার্শনিক মত আনুভবিক তথ্য-মাত্র-নিরূপ্য নয়, fact এর one-valued function নয়। দার্শনিক বিচারের প্রধান ন্যায় লাঘব ন্যায়। কিন্তু লাঘব ন্যায়ের নির্দিষ্ট প্রয়োগ-রীতি নাই। এক দার্শনিকের কাছে যা লঘু, অপরের কাছে তাই গুরু। লাঘব ন্যায় বিজ্ঞানেও প্রযুক্ত হয়, সেখানেও এ সমস্যা আছে। তবু তার জন্য বিজ্ঞানে কোন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় না। কোপার্নিকাসের মত লঘু, না টলেমির মত লঘু এ নিয়ে আমরা দর্শনে বিশ্রামবিহীন তর্ক করে যেতে পারি—কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার প্রয়োজন হয় না। ওখানে লাঘবের সহিত আরও কিছু আছে। ব্যবহার আছে, সমাজ আছে। দর্শনে নাই। তাই লাঘব ন্যায় ব্যতীত অন্য কোন ন্যায় দর্শনে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ পাওয়া যায় না ; এবং এখানে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যা রুচিসম্মত, সংস্কার-সম্মত, চরিত্র-সম্মত তাই লঘু। দার্শনিক বিচার persuade করবার বিচার, স্বমত প্রতিষ্ঠার বিচার, সম্প্রদায় রক্ষার বিচার। এই কার্যে অনেকে সহজ অনুভবকে পরিত্যাগ করেন না, বরং এই অনুভবেরই দার্শনিক ভাষ্য রচনা করেন। অনেকে এই অনুভবের সহিত অপর অনুভব মিশ্রিত করেন ; আবার আরও অনেকে আছেন যাঁরা নির্ভর করেন সম্পূর্ণ বিজাতীয় অনুভবের উপর। এই তিন সম্প্রদায়ের দার্শনিকের এক ভাষা হতে পারে না। দর্শনে আমরা কখনই সার্বভৌম ভাষা পাব না। যাই হক, দর্শনের মত শাস্ত্রে বিচার কালে আমরা ভাবি বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করছি, কিন্তু তা করছি না। আমরা প্রকৃতপক্ষে অপরকে স্বপক্ষে আনতে চাই, নিজ মত বিস্তৃত করতে চাই, persuade করতে চাই ,নিজেকে project করতে চাই। তাই এই বিচারে বাচ্যার্থ অবহেলিত হবেই। সংক্ষেপে, যেখানে গাণিতিক পদ্ধতিতে বিচার পরিচালনা করা হয়, সেখানে বাচ্যার্থের কোন হানি হয় না ; অন্য সকল

বিচারের ক্ষেত্রেই হয়। সুতরাং অলঙ্কারকে যখন আমরা বিচারের সঙ্গে তুলনা করি, এবং বিচারের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে সচেতন থাকি না তখন মনে করি যে বিচার ও অলঙ্কার পরস্পর বিরুদ্ধ। আবার যখন আমরা দর্শনের বাক্য বিশ্লেষণ করি, তখন সেখানে অলঙ্কার দেখে বিস্মিত হই ; এবং প্রভাবিত করার জন্য যে ভাষা ব্যবহার হয় সেই ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে বিচার ও অলঙ্কার মিশ্রিতভাবে থাকে, একথা না বুঝে, কাব্যের ক্ষেত্রে বিচারের মত কিছুকে উপস্থিত থাকতে দেখে আরও বিস্মিত হই। এই বিস্ময় অন্যায় বিস্ময়। ভাষা ব্যবহারের দুটি সীমা। এক সীমায় গণিত, বাচ্যার্থ যেখানে এতটুকু অবহেলিত হয় না, আর এক সীমা বিশুদ্ধ কাব্য, বাচার্থ যেখানে সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত। আমাদের স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহার দুই সীমার মধ্যবর্তী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবস্থান করে। কাব্যের ভাষা ও দর্শনের ভাষা বিসদৃশ ভাষা নয়, একজাতীয় ভাষা—অথবা দুই সীমা বিন্দুকে যদি কোন রেখার সাহায্যে যুক্ত করা হয়, সেই যোজক রেখায় পাশাপাশি অবস্থিত ভাষা। আমরা যতক্ষণ দার্শনিক বিচারকে প্রথম প্রকারের বিচার বলে মনে করি, ততক্ষণ অলঙ্কার ও বিচার কিরূপে মিশ্রিত হতে পারে, বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন হতে পারে, তা বুঝতে পারি না। বহুকাল ধরে আমরা তাই ভেবেছি, আর প্রতিক্রিয়া রূপে পেয়েছি নৈয়ায়িক দৃষ্টবাদ, ও তার বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষ। আজকের বহু পরাবৈজ্ঞানিক এ ধারণার অমূলকত্ব উপলব্ধি করেছেন। এই প্রসঙ্গে একজন হেগেলপন্থী দার্শনিকের একটি কথা উদ্ধৃত করব : Philosophy as an attitude of the mind towards the world occupies a region midway between poetry on the one hand and science on the other. হেগেলপন্থী দার্শনিকের কথা উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য, হেগেলই মনে করতেন দর্শন, artএর অনেক উচ্চে—যে দ্বান্দ্বিক ত্রিতয়ের নয় কলা, গত নয় ধর্মসাধনা, তারই সমন্বয় দর্শন, দর্শন artএর image কে pure conceptএ রূপান্তরিত করে। প্রকৃত পক্ষে কাব্যের কারবার image নিয়ে এবং দর্শনের concept নিয়ে, কাব্য imagination এবং দর্শন reason, প্রভৃতি বিশ্বাস বহু যুগের ; এবং এই বিশ্বাসই কাব্যবস্তু ও দর্শনবস্তু যে পরস্পর বিরোধী এই মতবাদের মূলে। তাই প্রশ্ন reason, প্রজ্ঞা কি ? Pure concept, বিশুদ্ধ প্রত্যয় কি ? Reason যে reasoning নয়, প্রজ্ঞা যে যুক্তি নয়, একথা বলার প্রয়োজন নাই। প্রজ্ঞা সমগ্রের অখণ্ড আস্বাদনে সক্ষম, কিন্তু বিচার বুদ্ধি নয়। তাই প্রজ্ঞা পদার্থটি কি ? বস্তুতঃ প্রজ্ঞাবাদীদের প্রজ্ঞা থেকে mysticদের intuitionকে পৃথক করা প্রায় অসম্ভব।

এই প্রজ্ঞাতে দ্বৈত এবং অদ্বৈত, সীমা এবং অসীম, স্থিতি এবং গতি, হাঁ এবং না, এক কথায় সকল খণ্ড সত্যের বিরোধ সামঞ্জস্য লাভ করে। এই প্রজ্ঞা অবশ্যই তর্ক নয়, বোধ হয় তর্ক যাকে পরিহাস করে সেই মর্ম। ইন্দ্রিয়জনিত লৌকিক অনুভব বোঝা যায়, অনুভবলব্ধ তথ্যগুলিকে বিন্যস্ত করে যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিকেও বোঝা যায়, বিন্যাসের কাজে লিপ্ত হয়ে যে সকল মৌলিক তত্ত্বের, basic concept-এর, ব্যবহার বুদ্ধি করে সেই তত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে যে মনন, speculative reflection তাও বোঝা যায়, আবার রসের দৃষ্টি, মর্মের দৃষ্টি দিব্যানুভূতি এও বোঝা যায়। বোঝা যায় না, এই প্রজ্ঞাকে। তাই মনে হয় প্রজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে যে মূল অনুভবে দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই মূল অনুভব। অর্থাৎ বিচারপূর্বক দার্শনিক তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেন না। তিনি প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তকেই বিস্তৃত করেন বিচারের সাহায্যে। অন্যভাবে বলা যায়, দার্শনিক বিচার স্বমত বিস্তারের বিচার, সম্প্রদায় রক্ষার, বিস্তারের বিচার। কিন্তু স্বমত, স্বসম্প্রদায় সৃষ্ট হয় কেমন করে, দার্শনিকের স্বীকৃতি লাভ করে কি ভাবে? এই প্রশ্নের সর্বাপেক্ষা সহজ উত্তর, এবং সেই জন্যই দুর্বোধ্য উত্তর, ঋষি দৃষ্টি। এই উত্তরটি কেবল দুর্বোধ্যই নয়, অপ্রাসঙ্গিকও বটে। সব দার্শনিকই ঋষি, সব দর্শন সম্প্রদায়ের মূলে রয়েছে ঋষি দৃষ্টি একথা বিশ্বাস করা অপেক্ষা, টসের সাহায্যে দার্শনিক তাঁর মৌলিক বাক্যগুলির যাথার্থ্য নির্ণয় করেন, একথা বিশ্বাস করা সহজ। আর একটি উত্তর হতে পারে, সমাজ ব্যবস্থার মূলে থাকে এক একটি জীবন দর্শন এবং কোনও সমাজ ব্যবস্থা ভাঙার মূলেও থাকে জীবন দর্শন। সমাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রীতি অথবা অপ্রীতি, দার্শনিককে নিয়ন্ত্রিত করে স্বমত রচনায়, জীবন দর্শন গ্রহণে। এই উত্তরটি ভ্রান্ত না হলেও অনুপযুক্ত, যোগ্য সংশয় নিরাস পূর্বক একে স্থাপন করা যায় না। আর এক উত্তর হতে পারে, দার্শনিকের চরিত্র, সেই চরিত্র যার বিশ্লেষণ করে থাকেন মন-সমীক্ষকরা। এই উত্তর হতে প্রাক্তন কর্মই আমাদের দার্শনিক মতের নিয়ামক, এই উত্তরের নৈয়ায়িক মর্যাদা হীন নয়। প্রকৃত পক্ষে, দার্শনিকের স্বমত কারণমাত্র জন্য নয়, বহু কারণ—নির্দেশ্য ও অনির্দেশ্য-জন্য। সমাজ ব্যবস্থা প্রীতি, চরিত্র, অবচেতন মন, এমন কি প্রাক্তন কর্ম, অসাধারণ অনুভূতি, ইত্যাদি কারণ একত্রিত হয়ে দার্শনিকের মূল অনুভবটিকে উৎপন্ন করে। এই অনুভবটি কবিদৃষ্টিরই মত। তবে কবিদৃষ্টি বলে মনে করলে, পাছে একে অসত্য বলে মনে করা হয়, তাই আমরা একে কবিদৃষ্টি বলি না। আবার ঋষিদৃষ্টি আখ্যা দিলে একে অনেক বেশী মর্যাদা দেওয়া হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা এর একটা নাম তৈরী করেছি প্রজ্ঞা, reason। এই

মূল অনুভবেই দার্শনিকের সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত থাকে—কিন্তু বাক্যাকারে থাকে না। কবিপ্রতিভা যেমন intuition ও expression দর্শন ও বর্ণন, দার্শনিক প্রতিভাও তাই reason ও expression। এই মূল অনুভব দার্শনিক বিচারের বীজ। কিন্তু কেবল বিচারই এখানে বীজাকারে থাকে না। অলঙ্কারের বীজও এখানে। সত্য—ব্যাপক অর্থে—ও সৌন্দর্য্য এখানে মিশ্রিত অবস্থায়, অবিশ্লিষ্ট অবস্থায় থাকে। বিচার প্রকাশ করে সত্যাংশকে এবং অলঙ্কার প্রকাশ করে সৌন্দর্যাংশকে। তাই কবির অভিপ্রায় ও দার্শনিকের অভিপ্রায় এক হয়ে যায়। রম্য বীণা অমল কমল মাঝে বাঝে, আবার হৃদয় কমল মাঝেও বাজে—এই উভয় সঙ্গীতের সম্বন্ধ কি, তারা কি এক মহাসঙ্গীতের দুটি দিক, এ প্রশ্ন যেমন দার্শনিকের প্রশ্ন, ঠিক তেমনই কবিরও প্রশ্ন। তামসলোক হতে জ্যোতির্লোকে, অসৎ হতে সতে, মৃত্যু হতে অমৃতে আমায় নিয়ে চল, এ প্রার্থনা যেমন দার্শনিকের প্রার্থনা, কবিরও। কবি যেমন উপমায়, অলঙ্কারে, কথা বলেন, দার্শনিকও তেমনই কথা বলেন উপমায়, তবে উপমার উপাদান অংশ ত্যাগ করে, বস্তু অংশ ত্যাগ করে, যৌক্তিক অংশের সাহায্যে। দার্শনিকের মহাসামান্য ভূয়োদর্শনলব্ধও নয়, স্বতঃসিদ্ধও নয়, মূল অনুভবে আস্বাদিত তত্ত্বের বৈচারিক রূপ। কাব্য ও দর্শন প্রথম দর্শনে বিরুদ্ধ বলে মনে হয়। বিরোধ যে এদের মধ্যে নাই তা নয়। তবে এ বিরোধকে বেশী মূল্য দেওয়া সঙ্গত হবে না। কাব্যের মহত্ত্ব তার দর্শনের উপর নির্ভর করে, এবং দর্শনের ভিত্তি কবিদৃষ্টি, অথবা কবিদৃষ্টি সদৃশ মূল অনুভব এবং এই অনুভবের গভীরতা, ও ব্যাপকতাই দর্শনকে গভীর ও ব্যাপক করে।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা

১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] কার্ত্তিক [১৩৬২ সাল

সূচীপত্র

দর্শন-সমালোচনা

শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে যেন দু'রকমের জ্ঞান-সাধনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়—বিজ্ঞান ও দর্শন। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা লব্ধ, পরিদৃশ্যমান বস্তুনিচয় ও গুণধর্মসমূহের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান লাভ করতে চান বিজ্ঞানী। জল, মাটি, আলো, বাতাস, প্রাণী, গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতির দৃঢ়মূল, প্রামাণ্য জ্ঞান লাভ করাই বিজ্ঞানের কাজ। সেই জ্ঞানকে ব্যবহার ক'রে মানুষের বহুবিধ সুবিধা বা অসুবিধা সৃষ্টি করে প্রায়োগিক বিজ্ঞান। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের বিশেষ বিশেষ দিক নিয়ে গবেষণা করে আর নব নব আবিষ্কারের দ্বারা জ্ঞানরাজ্যের সীমা বিস্তৃত করে। কিন্তু সমগ্র জগতের এক অখণ্ড, অবিভাজ্য জ্ঞান লাভ করতে চান দার্শনিক। শুধু গ্রহপুঞ্জের বা প্রাণীকুলের জ্ঞান দিয়ে তাঁর মন ভরে না—তিনি চান বিশ্বজগতের যাবতীয় তত্ত্বের জ্ঞান। এক কথায় তিনি হ'তে চান সর্ববিদ্। সমগ্র বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা দার্শনিকেরা বল্‌তে চেয়েছেন আর সে সব কথা যেন যুক্তি দিয়ে প্রমাণও করতে চেয়েছেন। এ প্রবন্ধে আমরা দেখ্‌তে চেষ্টা করব যে দার্শনিকদের এই কথাগুলো কি শুধু কথার কথা, শুধুই বাগ্‌বিন্যাস, না তাঁদের কথাগুলো প্রকৃত তত্ত্বনির্দেশী।

জ্ঞানের প্রকাশ হয় বিবৃতিবোধক বাক্যের মাধ্যমে। প্রশ্নজ্ঞাপক, অনুজ্ঞা বা ইচ্ছাবোধক বাক্যগুলো বিবৃতিমূলক নয়, জ্ঞানের প্রকাশও নয়। "আমার হাতের কাগজটি সাদা," "কলিকাতা বড় নোংরা সহর" প্রভৃতি বিবৃতিবোধক বাক্য আমরা সদা সর্বদা ব্যবহার করি। এ সব জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতালব্ধ ও এই সাধারণ জ্ঞানই আরও দৃঢ়, নিশ্চয়াত্মক হ'লে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে ওঠে। "পৃথিবী সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে," "সুখ-দুঃখ পরস্পর বিরোধী আবেগ," "উত্তাপ পদার্থের ঘর্ষণজনিত," "সাতে পাঁচে বার" প্রভৃতি বিজ্ঞানের বাক্য। দার্শনিক কিন্তু, কিছুই বাদ না দিয়ে, সমস্ত জগতসম্বন্ধেই কিছু বলতে চান, যেমন, "জগতের সব কিছুই

পরিবর্ত্তনশীল বা ক্ষণিক," "ব্রহ্মই একমাত্র সত্য আর পরিদৃশ্যমান জগত মিথ্যা" ইত্যাদি। সমগ্র জগত কিন্তু আমাদের খণ্ডিত, পরিচ্ছিন্ন ঐন্দ্রিয়ক অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে না—তার কোন অংশবিশেষই ঐরূপ অভিজ্ঞতায় ধরা দেয়। তাই দার্শনিক বিবৃতিগুলি যেন অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞানবোধক। এদিক থেকে বিজ্ঞানের ও দর্শনের (অধিবিদ্যার) বাক্যগুলির মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে।

কবিতা বা কাব্য কিন্তু জ্ঞান-সাধনা নয়। তাই কবিতায় বাক্য থাকলেও বিবৃতিমূলক বাক্য নেই। সার্থক কবিতার ভাষা সুন্দর ; কিন্তু জ্ঞান প্রাকাশক নয় বলে সত্য বা মিথ্যা নয়। বিজ্ঞানের ভাষা সাদামাটা, আবেগ-বজ্জিত ভাষা ; সে ভাষা শুধু প্রামাণ্য জ্ঞানের বাহন হ'তে চায়। কিন্তু ভাষা যে শুধু জ্ঞানেরই বাহন হবে এমন কোন নিয়ম করা যায় না। জ্ঞানের দিক থেকে একেবারে অর্থহীন হ'য়েও সে রসাত্মক ভাষা হ'তে পারে। "A rose, is a rose, is a rose, is a rose," [১] "ব্যাথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী" [২] ইত্যাদি বাক্যগুলো আক্ষরিক ভাবে অর্থহীন হ'লেও এদেরকে ভালো লাগে, এরা সুন্দর। কিন্তু বিশ্বজগত বা তার কোন অংশ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে এরা অক্ষম। অবশ্য কবির উদ্দেশ্য জ্ঞানদান নয়—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা, মানুষকে আনন্দ দেওয়া। কবিতা সঙ্গীতের মতো, গানের মতো। বাদ্যযন্ত্রের মিঠে আওয়াজ, নৃত্যের সুঠাম ছন্দ, মর্মরমূর্ত্তির ঋজু, দৃঢ় রেখাবলী প্রভৃতি দিব্য আনন্দের কারণ হ'তে পারে। কবিও তেমনি ভাষার শব্দ-সম্পদকে নানা অলঙ্কার পরিয়ে, সুষমা সৌকর্য্যে আনন্দময় করে উপস্থিত করে থাকেন।

দর্শন কিন্তু বিজ্ঞানও নয়, কাব্যও নয়। দর্শনের ভাষা ও বাক্য কবিতার ভাষা থেকে পৃথক। অন্ততঃ দার্শনিকেরা তাঁদের কথিত বাক্যগুলিকে উল্লাসের বা আবেগের প্রকাশ বলে কিছুতেই মেনে নেবেন না। তাঁদের দাবী, ওগুলি বিবৃতি-বোধক, নিশ্চয়াত্মক নিত্য জ্ঞানের প্রকাশ ও যুক্তি দিয়ে সমর্থন যোগ্য। এঁদের মতে দর্শন বিজ্ঞানের স্বগোত্র ; বিশেষ শুধু এই যে দার্শনিক বাক্যগুলো সমগ্র জগত সত্তার পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানবোধক। প্লেটো ছিলেন দার্শনিক—আর ছিলেন কবিদের ওপর খড়্গহস্ত। কবিরা মানুষকে বিভ্রান্তির বন্যায় ভাসিয়ে তার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, অনুকরণ-প্রিয়তার জন্য খাঁটি সত্যকে চিনে নেবার পথে সৃষ্টি করে বাধা। তাই তিনি কবিদের নির্বাসিত করতে ব্যবস্থা দিয়েছেন। তবু অনেকের মতে প্লেটোর দার্শনিক গ্রন্থগুলো গভীর বিচারমূলক হলেও অতি সুকুমার কাব্য

১ Prof. A. J. Ayer. ২ রবীন্দ্র নাথ।

সুষমামণ্ডিত। কিন্তু আপাতঃ দৃষ্টিতে প্লেটো, আরিষ্টটল, ডেকার্ট, স্পিনোজা, শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণ যুক্তিবাদী; তাঁরা প্রমাণ্য জ্ঞানই লাভ করতে চেয়েছেন। বিচার করে দেখতে হবে দার্শনিকদের এই কবিদের থেকে ভিন্ন হবার দাবী কতখানি যুক্তিসহ।

যাঁরা দর্শনচর্চা করেন তাঁরাই দার্শনিক। 'দর্শনচর্চা' বলতে এখানে বুঝতে হবে কোনও লোকাত্তর জগতের খবরাখবর নেওয়া; অতীন্দ্রিয় জগতসত্তার প্রামাণ্যজ্ঞান দেওয়া; ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি পরমতত্ত্বের অভ্রান্ত সংবাদ দেওয়া। এই দর্শনকে অধিবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা বা পরাবিদ্যা (metaphysics) নাম দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান শতকে ইউরোপ ও আমেরিকায় এই তত্ত্ববিদ্যার ঐতিহ্য ভীষণভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। এখনকার দার্শনিকগণ উপরোক্ত দার্শনিকদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেন; আধিবিদ্যক দর্শনচর্চা যে যুক্তিসহ নয়, দার্শনিক জ্ঞান যে প্রামাণ্য নয়, এসব কথা প্রমাণ করতে চান। হিউম, কান্ট প্রভৃতি এইরূপ "দর্শনের সমালোচক" রূপে দার্শনিক। বর্তমানে শতকে ভাষার বিশ্লেষণ-পন্থী দার্শনিকদের পূর্বসূরী বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জর্জ এডওয়ার্ড মূর, হ্বিটগেনষ্টাইন্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা অতীন্দ্রিয় বিষয়ে জ্ঞানের অসারতা দেখতে চেয়েছেন। শেষোক্ত দার্শনিকের মতে অধিকাংশ আধিবিদ্যক সমস্যা ভাষাগত শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার-জনিত; আর ভাষার প্রকৃত বিশ্লেষণে সমস্যাগুলোই যে নেই তা দেখিয়ে তাদের চরম সমাধান করা যায়। এঁদেরই পতাকাবাহী "যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরা (logical positivists) আধিবিদ্যক দর্শনচর্চাকে অর্থহীন পাগলামী বলতে আরম্ভ করেছেন। এঁদের দর্শনকে প্রধানতঃ আমি "সমালোচনা-দর্শন" বলে অভিহিত করব আর এঁদের সমালোচনা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলতে চেষ্টা করব।

(২)

আধিবিদ্যক বাক্যগুলির স্বরূপ কী? "এ জগতের সব কিছুই পরিবর্তনশীল," "সমগ্র জগতপ্রপঞ্চ একটা বিরাট অবভাস," "ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ও সর্বত্র বিরাজমান," "সব কিছুই কালগত", "সব কিছুই কালাতীত", "জড় বলে আসলে কিছুই নেই, সবই চেতন" ইত্যাদি বাক্য কী ধরণের বিবৃতি? বাক্যগুলির চেহারা দেখে নিশ্চয়ই এগুলিকে ভাবোদ্দীপক কবিতার পঙ্‌ক্তি বলে মনে হয় না। অন্ততঃ আপাতঃদৃষ্টিতে এগুলিকে সাধারণ ভাষায় বিবৃতি বোধক বাক্যই বলতে হবে। তবু কখনও কখনও ওগুলির মধ্যে পরস্পরবিরোধ লক্ষ্য করা যায় যেমন—"সব

কিছুই কালগত", "সব কিছুই কালাতীত"। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং"। বিভিন্ন দার্শনিক জগত সম্বন্ধে এরূপ স্ববিরোধী মত পোষণ করে থাকেন। কিন্তু এই দুই মতই কিছু একই জগত সম্বন্ধে সত্য হতে পারে না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেও কোনও প্রাকৃতিক বিষয়ের ব্যাখ্যায় এরূপ পরস্পর বিরোধী প্রকল্প (hypothesis) সৃজন করা যেতে পারে। কিন্তু "নির্ণায়ক ঘটনা বা দৃষ্টান্তের" (crucial instance) দ্বারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত একটি প্রকল্প ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়ে অপরটি প্রামাণ্য বলে গৃহীত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলতেই থাকে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে তাই বিভিন্ন স্তর দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর স্তরে স্ববিরোধী প্রকল্প সৃজন এবং অপেক্ষাকৃত অগ্রসর স্তরে কোনও বিশেষ প্রকল্পের প্রামাণ্য-স্থাপন ও বিরোধের দূরীকরণ, বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে দেখতে পাই। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যায় কোনও অগ্রগমন নেই, কারণ এমন কোন "নির্ণায়ক ঘটনা" অধিবিদ্যায় পাই নে যা দিয়ে পরস্পর-বিরোধী উক্তির বিরোধ দূর করা যাবে। বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন যুক্তিতে স্ববিরোধী মতবাদ স্থাপন করতে চেষ্টা করেন; আর মজা এই যে সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে কোনও মতবাদ অপ্রমাণিত করা যায় না।

বৈজ্ঞানিক বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার না করে যেন উপায় নেই। জাগতিক তথ্য সম্বন্ধে কোন মতের প্রমাণ বা অপ্রমাণ শেষ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়জ পরীক্ষা নিরীক্ষার ওপরই নির্ভর করে। জল যে তৃষ্ণা নিবারণ করে তা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা দিয়েই জেনেছি। প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে কোন সামান্য বাক্য, পুরোপুরি না হলেও, কিছুটা অন্ততঃ প্রমাণ করা যায় ঐন্দ্রিয়ক অভিজ্ঞতায়। "সকল মনুষ্য মরণশীল" এই সামান্য বাক্যের অন্তর্গত সব উদাহরণ দেখতে না পেলেও, কিছু কিছু দেখা যায়। এর কারণ, এরা সমগ্র বিশ্বজগত সম্বন্ধে বিবৃতি নয়। কিন্তু অধিবিদ্যার বাক্যগুলি বৈজ্ঞানিক প্রথায় প্রমাণ অপ্রমাণ করা যাবে না। যদি বলি "এ বিশ্বের সব কিছুই অবভাস বা মিথ্যা" তা হলে ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতায় স্বয়ংসৎ বস্তু বলে তো কিছুই পেলাম না। ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায় যাই পাই না কেন তাই যদি অবভাস হয় তবে ঐ উক্তিটি কী করে প্রমাণিত হবে? রজ্জুসর্পভ্রমে বলা যায় যে রজ্জুই সর্পের মতো মনে হয়, আসলে ওটা রজ্জুই; কারণ ভ্রম হবার পর ভাল করে দেখলে ওটা রজ্জু বলেই দেখতে পাই। এখানে অবভাস ও স্বয়ংসৎ-বস্তু দুটোই ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার মধ্যে। রজ্জুজ্ঞান হলে পর সর্পবোধ আর থাকে না। কিন্তু অধিবিদ্যার বাক্যটি সমগ্র জগত সম্বন্ধে বলে সৎবস্তু তো পেলামই না; তাই সমস্তই অবভাস তা কী করে বলি? যে দেশে সমস্ত টাকাই মেকী—একটিও খাঁটি নয়—সে দেশের টাকা যে

মেকী তা কি বলা যায় ? কার নকল হয়ে সে টাকা মেকী হবে ? সমস্ত জগতই যদি মিথ্যা তবে তো সে মিথ্যা নয়। কিছু সত্য না থাকলে কিছু মিথ্যা হয় না। যদি ধরেও নি যে জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণে দার্শনিক প্রদর্শিত যুক্তিগুলি খুবই শক্তিশালী, তবুও এরূপ প্রমাণের পর আমাদের জগদ্‌বোধ নষ্ট হয় না; যেমন রজ্জুজ্ঞানের পর সর্পবোধ নষ্ট হয়। যদি জগদতিরিক্ত কোনও তত্ত্বের আমার সাক্ষাৎ অনুভূতি হত আর জগদ্‌বোধ নষ্ট হতো তবেই "জগত মিথ্যা" বাক্যের প্রমাণ হত। কিন্তু মানুষের এমন কোন অতীন্দ্রিয় সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানীয় শক্তি নেই। জগতের একাংশ মিথ্যা, ভিন্নাংশ সত্য এরূপ জ্ঞানই ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা প্রসূত হতে পারে—সমগ্র জগত সম্বন্ধে আমাদের অমন কোন প্রামাণ্যজ্ঞান হয় না। তাই দার্শনিক বাক্য বা যুক্তি প্রমাণগুলো অভিজ্ঞতা প্রসূত (empirical) নয়।

অধিবিদ্যার বিবৃতি যেমন প্রমাণ করা যায় না তেমন অপ্রমাণও করা যায় না। অতীন্দ্রিয় জগতের মজাই এই। মানুষের দুঃখকষ্ট দেখে যদি বলি যে "জগত-কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছাটা শয়তানী রকমের" তুমি ক্ষুব্ধ হতে পার; কিন্তু তুমি আমার বাক্য অপ্রমাণ করবে কী করে ? "ক" মহাশয় যে শয়তান তা অপ্রমাণ করা যায় "ক" মহাশয়ের ব্যবহার বা ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করে। কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁর ক্রিয়াকলাপ কী আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি অথবা তিনি কী উদ্দেশ্যে জগতসৃষ্টি করেছেন তার প্রামাণ্য জ্ঞান কী পেতে পারি ? তাই অধিবিদ্যক বাক্যের প্রমাণও নেই অপ্রমাণও নেই। এখানে যথেচ্ছাচার চল্‌বে। উর্বর কল্পনায় যা ইচ্ছে তাই ভাবা চল্‌বে; তাই বলে তাকে জ্ঞান বলা চলবে কী ?

আধিবিদ্যক বিবৃতিগুলি ও তাদের প্রমাণে বা অপ্রমাণে উপস্থাপিত যুক্তিগুলি যদি ঐন্দ্রিয়ক অভিজ্ঞতাশ্রয়ী না হয়, তবে তাদেরকে গণিতের বিবৃতিও যুক্তির মতো প্রত্যক্ষপূর্ব (a priori) বলা যায় কী না দেখতে হবে। অনেক দার্শনিক এদের প্রত্যক্ষপর বিবৃতি না বলে, সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রত্যক্ষপূর্ব, সুচিরস্থায়ী যৌক্তিক বিবৃতি বলে স্বীকার করেন। আর কোন বিশেষ আধিবিদ্যক বিবৃতির বিরোধী বিবৃতিকে স্ববিরোধী (self-contradictory) প্রমাণ করে প্রথমটির প্রামাণ্যস্থাপন করতে তৎপর হন। জিনো, ব্রাডলি প্রভৃতি তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা গতি, কারণতা, দেশ, কাল প্রভৃতি সামান্য প্রত্যয়ের মূলে স্ববিরোধ প্রমাণ করে দেখাতে চেয়েছেন যে ওগুলি সংবস্তুর পরিচায়ক হতেই পারে না। তাই যেন বিশ্বজগত ও তার অন্তর্নিহিত সত্তা বাস্তবিকই কালাতীত; আর অভিজ্ঞতালব্ধ কালগত ঘটনা-পরম্পরা ভ্রমাত্মক অবভাস মাত্র। কিন্তু আধিবিদ্যক যুক্তিগুলো গণিত বা জ্যামিতিশাস্ত্রের

প্রত্যক্ষপূর্ব যুক্তিজালের মতো হতেই পারে না ; কারণ গণিতে কিছু কিছু মতবিরোধ থাকলেও এখানে অধিকাংশ মতই সকলে গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু বিভিন্ন তত্ত্বজিজ্ঞাসুর বিভিন্ন মতের প্রামাণ্যস্থাপনে উপস্থাপিত প্রত্যক্ষপূর্ব যুক্তির বিরোধ আজ পর্য্যন্ত শেষ হল না। জিনো বা ব্রাড্‌লি যে যুক্তিকে অকাট্য বলে মনে করেন, অন্য দার্শনিক তার মধ্যে শুধু কুযুক্তিই দেখতে পান। পরন্তু যদি গতি, দেশ বা বস্তু এবং বস্তুন্তরের সম্বন্ধকে স্ববিরোধী বলে প্রমাণই করা গেল, তা হলে ওগুলি যে আবার কী করে অবভাসিক সত্ত্বা নিয়েও আমাদের অভিজ্ঞতায় ভাস্‌তে পারে তা বোঝা যায় না। "বন্ধ্যাপুত্র" বা "ওপরদিকে সিঁড়ি দিয়ে নামা'' একেবারেই স্ববিরোধী কল্পনা। সিঁড়ি দিয়ে ওঠাও সম্ভব, নামাও সম্ভব। 'ওঠা' মানেই ওপরদিকে যাওয়া, 'নামা' মানেই নীচের দিকে যাওয়া : তাই যদি হবে তবে তো "ওপরদিকে সিঁড়ি দিয়ে নামা'' একেবারেই আত্মঘাতী কল্পনা। ওই বাক্যাংশকে বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই "ওপরদিকে নীচের দিকে যাওয়া"। এমন ঘটনা একেবারেই অসম্ভব, ন ভূত ন ভবিষ্যতি। এখন বন্ধ্যাপুত্রকে আমরা ভ্রমেও কোন জায়গায় দেখতে পাই কী? কাউকে "ওপর দিকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে" যেতে দেখি কী ? তাই গতি, দেশ, কাল, সম্বন্ধ যদি স্ববিরোধী কল্পনা হয়, তবে তারা কেমন করে আমাদের অভিজ্ঞতায় ভাস্‌বে তা বোঝা যায় না। প্রত্যক্ষপূর্ব যুক্তি দিয়ে কোন কিছুকে স্ববিরোধী আর অসম্ভব বলে প্রমাণ করলে, ঐ কল্পনাটি একেবারেই "নাই'' হয়ে যায়, তার ত্রৈকালিক নিষেধ হয় ; শুধুমাত্র যে তার নৈসর্গিক সম্ভাবনা দূরীকৃত হয় এমন নয়। মাত্র তিন মিনিটে কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া এখন অসম্ভব। এটা নৈসর্গিক অসম্ভাবনা ; কিন্তু কল্পনাটি স্ববিরোধী নয়। যান বাহনের আরও উন্নতি হলে ভবিষ্যতে এটা সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু বন্ধ্যানারীর পুত্র একান্তই অসম্ভব। এটা কেবলমাত্র নৈসগিক অসম্ভাবনা নয় বলে, প্রত্যক্ষপূর্ব যুক্তি দিয়ে কোন কিছু স্ববিরোধী প্রমাণ করে, নৈসর্গিক-জগত-সম্বন্ধে কোনও সত্য বিবৃতি প্রমাণ করা একেবারেই অযৌক্তিক। তাই আধিবিদ্যক বিবৃতিগুলি যদি সমগ্র জগত সম্বন্ধে কোন জ্ঞান দিতে সক্ষম বলে দাবী করে, তবে সে দাবী একেবারেই মূল্যহীন। তাই আধিবিদ্যক বিবৃতি বা যুক্তি প্রত্যক্ষপূর্ব নয়।

(৩)

অধিবিদ্যার উপরোক্ত সমালোচনা বর্ত্তমান শতকের ইউরোপে খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে। সত্যিকারের জ্ঞান বলতে যদি প্রামাণ্যজ্ঞান বুঝি তবে অধিবিদ্যার

বাক্য গুলি জ্ঞান প্রকাশক নয়। যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীগণ (Logical positivists) দুরকমের বাক্যকে সারগর্ভ জ্ঞানপ্রকাশক বলে থাকেন : (১) নৈসর্গিক জগত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষপর বৈজ্ঞানিক বাক্য আর (২) গনিতশাস্ত্রের প্রত্যক্ষপূর্ব বাক্য। অধিবিদ্যার তথাকথিত বাক্যগুলি এদের কোনটাই নয় বলে এরা একেবারেই অর্থহীন (nonsensical)—নিছক পাগলামী মাত্র। যে বাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয় তারও কিছু অর্থ আছে, আর ঐ অর্থটাই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। অধিবিদ্যার বাক্য সত্যও নয় মিথ্যাও নয়—একেবারেই নিরর্থক। কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীগণ "অর্থবান্ বাক্যের" একটা মনগড়া লক্ষণ খাড়া করেছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে কিন্তু আধিবিদ্যক বাক্যগুলি অর্থবান বলেই মনে হয়, যদিও তার প্রমাণ—অপ্রমাণ সুকঠিন। "মূর্খতাকে নীলশাড়ী দিয়ে গুণ করলে হট্টিমাটিমটিম পাওয়া যায়"! এ বাক্যের মতো আধিবিদ্যক বাক্য নিশ্চয়ই অর্থহীন নয়। অধুনা একশ্রেণীর দর্শনের সমালোচক যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের উপরোক্ত "অর্থবান্ বাক্যের" লক্ষণটি গ্রহণ করেন না। তাঁরা বলেন যে আধিবিদ্যক বাক্যগুলো অর্থবান ঠিকই, আর ওগুলি বলার বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে। তবে ঐ বাক্যগুলি তীব্র উত্তেজনা বা আবেগের কাব্যিক উচ্ছ্বাস মাত্র। যেমন, মৃত্যুভয় একটা তীব্র আবেগ। তা কাটিয়ে ওঠবার জন্যই কোন কোন দার্শনিক বিশ্বাস করেন যে "জগতে কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় না; সব কিছুই কালাতীত"। ভয়, আনন্দ, ক্ষোভ থেকে দার্শনিক বাক্যের উৎপত্তি; তার প্রমাণে যুক্তিগুলো নিছক মনকে চোখ ঠারা। দার্শনিক যে আবেগ দ্বারা চালিত হন তা তাঁর মনের নির্জ্ঞান স্তরে থাকে বলে, তাঁর উচ্ছ্বাসের প্রকাশটা যুক্তির সাহায্যে বৌদ্ধিক রূপ গ্রহণ করে। আবার কেউ কেউ বলছেন যে "দার্শনিক" আখ্যাধারী প্রাণীগুলো এক ধরণের মানসিক রোগে ভুগছে—মনঃসমীক্ষণ করে তাঁদের ভাল করা দরকার। দর্শন একরকমের চিত্তবিকার। দার্শনিক একটা মতবাদকে এমন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেন যে তা থেকে তাঁকে টলানো যায় না। বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তিও এরূপভাবে আবিষ্ট হতে পারে; শত যুক্তি দিলেও তার ভ্রান্ত ধারণা দূর করা যায় না।

এখন আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয় যে দর্শনের উপরোক্ত সমালোচকেরাও এক ধরণের প্রাণী—এরা অধিবিদ্যাবিরোধী। এঁরা দর্শনবিকারগ্রস্ত মানুষের মনঃসমীক্ষণ করার কথা বল্‌লেও, রোগ নিরাকরণ করতে চিকিৎসার সাহায্য না নিয়ে, যুক্তিজালই বিস্তার করেন; প্রমাণ করতে চান যে দর্শন নিরর্থক, ভাষাগত বিভ্রান্তি, অসাধারণ অর্থে সাধারণ পদগুলি ব্যবহার করতে প্ররোচনা দেবার

অপচেষ্টা। এ কথা না হয় স্বীকার করলাম যে আধিবিদ্যক বাক্যের, সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক অর্থে, প্রমাণও হয় না, অপ্রমাণও হয় না। কিন্তু অধিবিদ্যার সমালোচকেরাও কী যুক্তি দিয়ে, বিচার করে, এক দর্শনের যায়গায় অন্য দর্শন এনে হাজির করেন নি? অধিবিদ্যার নেতিমূলক সমালোচনায় এঁরা সবাই একজোট্ হলেও, ভাবাত্মক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় এঁদের মধ্যেও বিরোধের অন্ত নেই। কেম্ব্রিজের দার্শনিক জন উইজ্‌ডম্ একজন অধিবিদ্যা বিরোধী। তিনি কিন্তু যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীদের "অর্থবান বাক্যের" লক্ষণকে আধিবিদ্যক বাক্য বলেই মত প্রচার করেছেন। (তাঁর 'Philosophy and Psychoanalysis" পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তাই আমার মনে হয় কিছু না কিছু আধিবিদ্যক চিন্তন ছাড়া বুদ্ধিমান মানুষের গতি নেই। মানুষ চিন্তার ও জ্ঞানের দুরূহ শিখরে উঠতে চায় বলেই তো তার মহিমা। কী পেলাম তার হিসেব নিয়ে কী হবে; কী হতে চেয়েছিলাম তাই বা কম কী? ফল লাভের সীমিত সম্ভাবনা আর ব্যর্থতাই তো মানুষকে চিরকাল অনুসন্ধিৎসু করে রেখেছে। যেদিন সে বিশ্বজগতের রহস্য ভেদ করার সৃষ্টিছাড়া খেয়াল পরিত্যাগ করবে সে দিন সে হবে বড় সাধারণ আর চিন্তারাজ্যে রিক্ত। অনেকটা কাব্যধর্ম্মী হলেও কাব্যের সঙ্গে অধিবিদ্যার গুণগত পার্থক্য ভুললে চলবে না। আধিবিদ্যক বাক্যগুলি যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত। কবিতা যদি এরূপ হয় তবে তা নিছক প্রবন্ধ হয়ে দাঁড়ায়—সরস কবিতা হয় না। অবশ্য, আধিবিদ্যক যুক্তিগুলি তার সিদ্ধান্ত প্রমাণ বা অপ্রমাণ করতে সক্ষম নয়। এরূপ যুক্তি সাধারণ প্রাকৃত বিজ্ঞানের ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতাশ্রয়ী যুক্তিও নয়; গণিতশাস্ত্রের প্রত্যক্ষপূর্ব যুক্তিও নয়। কিন্তু সব যুক্তি, তর্ক বা বিচারই যে কোন বাক্যের প্রামাণ্য বা অপ্রমাণ্য স্থাপনের জন্য নিয়োজিত হবে এমন কোন কঠোর নিয়ম করা যায় না। কোন বিষয়ের অগভীর, অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট, গভীরতর করবার জন্যও যুক্তি প্রদর্শিত হতে পারে। বিশ্বজগতের গর্ভীভূত আর তার ভিত্তি স্বরূপ পরমতত্ত্বের জ্ঞানবিকাশের জন্যও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের প্রয়োজন হতে পারে। প্রকাণ্ড মহীরুহের মূলদেশ ভূগর্ভে প্রোথিত থাকে বলে তার প্রতি দৃষ্টি না পড়াই স্বাভাবিক; উপরন্তু সেই মূলদেশেরই ফলস্বরূপ পত্রপুষ্পপল্লবের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। সেইরূপ সংসারমহীরুহের বীজস্বরূপ পরমতত্ত্ব সাধারণের দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন থাকে। সাধারণ লোকের বা বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি সর্বদাই বিষয়াভিমুখী; আর এই বিষয়মুখিতাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু যে বিষয়ী বা সাক্ষী বিষয়পরম্পরার জ্ঞান গ্রহণ করে, সেই মূলীভূত আত্মবস্তুর

সাক্ষাৎকার সাধারণ জ্ঞান বা বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাইরে। এই অলৌকিক "আমি" রূপ যে আত্মবস্তু (Transcendental Self) বা বিষয়ী সে কখনই সংশয়াচ্ছন্ন হয় না—সে স্বতঃসিদ্ধ পরমতত্ত্ব। কিন্তু বিষয়ীর দ্বারা উদ্ভাসিত বিষয়পুত্তলী নিয়েই আমরা ব্যস্ত থাকি বলে, এই পরমতত্ত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতে চায় না। বিচারবুদ্ধির মননশীলতা দিয়ে আর যৌক্তিক চিন্তার বিস্তারের ফলে, মন বিষয়মুখিতার থেকে নিরস্ত হয়ে তত্ত্বাভিমুখে নীত হতে পারে। এতে করে কোন নতুন জ্ঞান লাভ হয় না; সকল সময়ই যে স্বতঃসিদ্ধ বা স্বতঃপ্রকাশ হয়ে আছে তারই পুনঃপ্রকাশ হয়। প্রত্যক্ষপূর্ব অবরোহী যুক্তি বা প্রত্যক্ষপর আরোহী যুক্তি কোনটাই অধিবিদ্যার উপযোগী নয়। এরা উভয়েই কতকগুলি পূর্বস্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে; আর তাই জগতের চরমতত্ত্বের উদ্ঘাটনে তারা নিরর্থক। দার্শনিক যুক্তি কিছুই প্রমাণ বা অপ্রমাণ করে না। যা সর্বদাই স্বতঃপ্রমাণ, তার বিস্তার করে মাত্র; আর এই বিস্তারের ফলে তত্ত্বানুভব হতে পারে; অস্পষ্ট ধারণা স্পষ্টিকৃত হতে পারে। যুক্তি তাই দুরকমের: (১) প্রামাণ্য যুক্তি বা logic of proof যা দিয়ে কোন বাক্য বা বিবৃতিকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যায়; আর (২) বিস্তারের যুক্তি বা logic of elaboration যা সংশয়াচ্ছন্ন পরমতত্ত্বের নিঃসন্দিগ্ধ সাক্ষাৎকারের দিকে নিয়ে যায়। অধিবিদ্যার যুক্তি এই দ্বিতীয় প্রকারের যুক্তি; এখানে কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণের প্রশ্ন নেই। আধুনিক দর্শন সমালোচকেরা দার্শনিক যুক্তিকে তর্কাভাস বলেন; কারণ বিজ্ঞানের মতো দর্শন কিছুই প্রমাণ বা অপ্রমাণ করে না। কিন্তু দার্শনিক যুক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এঁরা উদাসীন। বৌদ্ধিক বিস্তারের ফলে অগভীর থেকে গভীর, গভীর থেকে গভীরতর এবং গভীরতম প্রদেশে আমাদের দৃষ্টি সংসর্পিত হয় আর এইরূপ যুক্তি আমাদের কোন সূক্ষ্ম দার্শনিক ভূমিতে অধিষ্ঠিত করে দেয়। যদি সেই দার্শনিক ভূমির দৃষ্টিকোণ থেকে জগত সংসারের প্রতি তাকাতে পারি তবেই দার্শনিক বাক্যের তাৎপর্য্য অনুভূত হবে। এই দার্শনিক গভীরতার স্তরভেদ অনুযায়ী অনেক আধিবিদ্যক বাক্য, এমন কি বিরোধী বাক্যও, সত্য বলে সমাদৃত হতে পারে; তবে গভীরতম স্তরে হয়তো সব বিরোধের অবসান হয়ে চিত্তের প্রশান্তি ও স্থৈর্য্য লাভ হয়। চিত্তচমৎকারী দার্শনিক পরমতত্ত্ব "নিহিতং গুহায়াম্"। বহুল আয়াসে, বৌদ্ধিক বিস্তারপরম্পরা দ্বারা তার উন্মেষ হয়তো বা সম্ভব। অর্থহীন প্রলাপ বললেই দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হয় কী? বরং যৌক্তিক দৃষ্টিবাদীরাই 'নিরর্থক' প্রভৃতি আবেগময় ভাষা ব্যবহার করে অধিবিদ্যার প্রতি আমাদের বিদ্বেষ আর হিংসা উদ্রিক্ত করতে চান। সংযত মন নিয়ে, সহৃদয় যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে যে কোন দার্শনিক কী ধরণের ভুল করেছেন বা তাঁর কথা কতোখানি মানা যায়। তাই মনে হয়, দর্শনচর্চ্চা যাই হোক না কোন, তার প্রয়োজনীয়তা কখনই একেবারে লোপ পাবে না।

অস্তিত্ববাদী দর্শন।

অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭২৪—১৮০৪)-য়ের পর থেকে ইউরোপীয় দর্শন-চিন্তায় জ্ঞানতত্ত্ব একটি বিশিষ্ট স্থান করেছে দেখা যায়। জগতের মূল সত্য কী, তাই জানাই যদি দর্শনের উদ্দেশ্য, তাহ'লে সেই জ্ঞান যার দ্বারা লাভ করা যায় সেই জ্ঞান ক্রিয়ার আলোচনা করা আমাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাই জ্ঞানের স্বরূপ কী, কী তার উপায়, এবং কতটুকুই বা তার মূল্য—এই সব প্রশ্নের আলোচনা একমাত্র না হ'লেও, বর্ত্তমান যুগের দর্শনের একটি মস্ত বড় অংশ জুড়ে র'য়েছে। বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করা ও শ্রেণী বিভাগ করার উপায় হ'লো জ্ঞানক্রিয়া। অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়া হ'লো একটি যন্ত্র। কিন্তু প্রত্যেক যন্ত্রের যেমন একজন যন্ত্রী আছে, এবং সেই যন্ত্রের ব্যবহার যেমন নির্ভর করে সেই যন্ত্রীর উপর, তেমনি জ্ঞানক্রিয়ারও একটি কর্তা আছে। তারই উপর নির্ভর করে জ্ঞানক্রিয়ার প্রয়োগ ও ব্যবহার। সুতরাং সেই কর্তার কথা বাদ দিয়ে জ্ঞানক্রিয়ার আলোচনা কখনই সম্ভব হ'তে পারে না আর সে চেষ্টা যদি আমরা করি তা'হলে আমাদের আলোচনা হ'য়ে দাঁড়াবে অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই দেখা দিলো বর্ত্তমান যুগের অস্তিত্ববাদী দর্শন।

আজ পর্যন্ত দর্শনের যাবতীয় চিন্তা ও বিজ্ঞানের গবেষণা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষের অস্তিত্বটা যেন সর্বদাই উপেক্ষিত হ'য়েছে। দেশ-কালে বিধৃত এই বস্তু জগতকে পর্যবেক্ষণ করে একটা নির্বিশেষ সার্বিক সত্য আবিষ্কার করা ও তার সাহায্যে জগতের ব্যাখা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তার স্থান সেখানে নেই। যা নির্বিশেষ, সার্বিক, তা স্বভাবতই তাই নৈর্ব্যক্তিক। আর, যা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা, ও বৈচিত্র্যের বাইরে, অনিবার্যরূপে তা নির্ভর করে abstraction-য়ের উপর। সেই জন্যই বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে abstraction একটি অপরিহার্য পদ্ধতি। এর ফল হ'য়েছে এই যে, বিজ্ঞানের জগৎ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ প্রাণহীন গাণিতিক নিয়ম মাত্র। এখানে অনিশ্চয়তা নেই, আকস্মিকতা নেই, নেই অভাবনীয়তা বা নতুনত্ব। কিন্তু এই পদ্ধতির একটা মস্ত বড় মোহ আছে। সে হ'ল জগতের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ গ'ড়ে

তোলার চেষ্টা। আজ পর্যন্ত কোন দর্শন চিন্তাকে এই মোহ থেকে মুক্ত থাকতে দেখা যায়নি। এবং এই মোহাবিষ্ট প্রচেষ্টার চরম অভিব্যক্তি হ'লো হেগেলের দর্শন। তাই অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রথম প্রতিবাদ হ'লো প্রধানতঃই হেগেলের বিরুদ্ধে।

হেগেলীয় দর্শনের প্রধান কথা হ'লো 'একবাদ'। একমাত্র সেই 'পরম একই' পূর্ণ সত্য। আর যা কিছু আছে তা সবই বিচ্ছিন্ন অপূর্ণ, ও সেই জন্যই অসত্য। সুতরাং যে কোন ব্যক্তি সত্তাও অসম্পূর্ণ ও অসার্থক। হেগেলীয় দর্শনে তাই প্রকৃতপক্ষে বিচ্ছিন্ন বিশিষ্ট স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন স্থান নেই। মানুষ সেখানে একটি ধারণা মাত্র। রক্ত-মাংসের যে ব্যক্তি মানুষ সে সেখনে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। অস্তিত্ববাদের প্রতিবাদ এলো ঠিক এইখানে। কেননা, ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে বাদ দিয়ে এই যে বিশুদ্ধ চিন্তা, এ একেবারেই অর্থহীন ও অসার কল্পনা মাত্র। অর্থাৎ প্রধান কথা তত্ত্ব নয়, অস্তিত্ব। এখন, এই অস্তিত্বকে যদি শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে সীমায়িত করা যায়, তাহ'লে অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল কথা হবে আত্মানাং বিদ্ধি, নিজেকে জানো। এই নিজেকে জানা ও তার বর্ণনা করাই হ'লো অস্তিত্ববাদী দর্শনের একমাত্র প্রচেষ্টা। অবশ্য কোন আধ্যাত্মিক অর্থে নিজেকে জানার কথা এখানে বলা হয়নি। রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে, সৃষ্টির অন্যতম একটি সচেতন ঘটনা হিসেবে, মানুষের অস্তিত্বের কী অর্থ, কী তাৎপর্য, তার বিভিন্ন সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা এষণা ইত্যাদির মূল উৎস কোথায়—এইগুলি উপলব্ধি করাই নিজেকে জানা। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হ'য়ে যেসব মনীষিরা অস্তিত্ববাদী দর্শন গড়ে তুলেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হ'লেন Soren Kierkegaard (১৮১৩—১৮৫৫); Karl Jaspers (১৮৮৩ ·····); Gabriel Marcel (১৮৮৯······); Martin Heide-ggar (১৮৮৯······) ; ও Jean Paul Sartre (১৯০৫······), যদিও সকলেই এঁরা অস্তিত্ববাদী দার্শনিক, তবু খুটিনাটি নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মতের পার্থক্য-ও এঁদের মধ্যে কম নয়। তবে সে পার্থক্য বাদ দিলে এঁদের মধ্যে মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সাধারণ ভাবে উপস্থিত আছে দেখা যাবে।

প্রথমতঃ, এঁরা বলতে চান যে, অস্তিত্বের প্রশ্নটি আসে সন্দেহ ও আগ্রহ থেকে। যেমন, টাকা সম্বন্ধে আগ্রহ আছে বলেই মাঝে মাঝে আমরা পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিই, ব্যাগটা অছেে তো। তা না হ'লে এ বিষয়ে কোন প্রশ্নই আমাদের মনে আসতো না। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আগ্রহ আছে বলে মনে আমাদের এমনও একটা সম্ভাবনার ধারণা রয়েছে যে, টাকার ব্যাগটি হয়তো নাও থাকতে পারে। অর্থাৎ যে কোন বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গে তার নিজেরই সম্ভাব্য অনস্তিত্ব যেন অবিচ্ছেদ্য

হ'য়ে র'য়েছে। সুতরাং নিজেকে জানা বা নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মানেই অনস্তিত্বকে স্বীকার করা। অন্য কথায় বলা যায় যে, অনস্তিত্বই হ'চ্ছে অস্তিত্বের উপাদান।

যে আগ্রহ থেকে অস্তিত্বের এই প্রশ্ন দেখা দেয় তার আবার বিভিন্ন ক্রম আছে। বিশেষ কোন একটি মাত্র বস্তু সম্বন্ধে আগ্রহ হ'তে পারে। যেমন উপরের দৃষ্টান্তে টাকার ব্যাগ। এ ক্ষেত্রে অস্তিত্ব হ'চ্ছে টাকার ব্যাগের, আর অনস্তিত্ব দেখা দিচ্ছে ঐ একটি বস্তুর, অন্য কারু নয়। কিন্তু প্রশ্ন হ'তে পারে সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে; সে ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনস্তিত্ব হবে সমগ্র জগতের; এবং আমাদের সামনে দেখা দেবে পরিপূর্ণ শূন্যতা। কিন্তু সাধারণতঃই আমরা আগ্রহশীল থাকি মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, তাই মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তার একটি সম্ভাব্য অনস্তিত্বও রয়েছে। মানুষের অস্তিত্ব নাও থাকতে পারতো। কিন্তু রয়েছে। এ একটি সম্পূর্ণ অনিশ্চিত আকস্মিক ঘটনা। কোন যুক্তি কোন সঙ্গতি নেই মানুষের অস্তিত্বের পিছনে। মানুষের অস্তিত্ব আছে, এই 'আছে' কথাটিই মূল্যবান। কেন আছে, কিম্বা বিশেষ একটি অস্তিত্ব বিশেষ একটি মানুষের অস্তিত্ব আছে। এই দেশ-কালের মধ্যে কেন আছে, অন্য কোন দেশ-কালে নেই কেন,—এর কোন ব্যাখা নেই। যখনই আমার মধ্যে চেতনা জেগে উঠেছে তখনই আমি নিজেকে এই জগতের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। আমার এই অস্তিত্ব আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা রুচি স্বাধীনতা ইত্যাদি সব কিছুকে উপেক্ষা করে যেন কোন্ এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে নিক্ষেপ করেছে। বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত আমি কোথা থেকে কীভাবে যেন হঠাৎ এসে পড়েছি। পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ আকস্মিক।

এখন, এই অবস্থায় জগতের সঙ্গে আমার অর্থাৎ মানুষের সম্পর্ক কী হবে? —এই প্রশ্ন নিয়ে মানুষ বহুদিন থেকে চিন্তা করে আসছে। কেননা, আমাদের সমগ্র জীবন দর্শন ও জীবনপদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে নির্ভর করে জগতটিকে আমরা কোন দৃষ্টিতে দেখেছি তার উপর। যদি আমরা মনে করি যে, এই জগৎ হ'চ্ছে দুদিনের এক সরাইখানা, কিংবা নৈতিক প্রস্তুতি ক্ষেত্র, তাহলে আমাদের জীবন দর্শন এই দুই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এক হবেনা। তেমনি আবার পার্থক্য দেখা যাবে যদি আমরা বলি এই জগৎ 'মায়া'; অথবা নিজের দেশ, অথবা কারাগার, অথবা বিদেশ। বস্তুতঃ, মানুষের চিন্তার ইতিহাসে দেখা যায় যে, এই জাতীয় বিভিন্ন সম্ভাবনার প্রত্যেকটিই কোন না কোন সময়ে গ্রহণ করা হ'য়েছে। কিন্তু যে কোন সম্ভাবনাই গ্রহণ করা

হোক না কেন, সব ক্ষেত্রে একটি মূল কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা হ'য়েছে। সে হ'চ্ছে এই যে, জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর একটি বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য আছে। সেই অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারলেই জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় করা সহজ হ'য়ে যায়। আর, সাধারণ ভাবে বলতে গেলে দর্শনের কাজই হ'লো জগতের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা। কিন্তু এই মূল কথাটিই অস্তিত্ববাদী দর্শন অস্বীকার করলো। জগতের কোন অর্থ নেই; এবং সেই অর্থহীন জগতের মধ্যে মানুষ সম্পর্কহীন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক আগন্তুক মাত্র। আমি এ কোথায়? আমি কে? কী করে এখানে এলাম আমি? এই যে যাকে আমরা জগৎ বলছি সেটাই বা কী? কী-বা তার অর্থ? কে আমাকে এখানে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে? কেনই বা আমাকে এখানে ফেলে গেলো? আমার মতামত না নিয়ে আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা অগ্রাহ্য করে, এখানকার আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কোন পরিচয় না দিয়ে ঠিক যেন অপহরণ করার মতো ক'রে কেনই বা আমাকে নিক্ষেপ করা হ'লো? —এই হ'চ্ছে এই জগতের মধ্যে মানুষের অবস্থা। অস্তিত্ববাদীরা এর নাম দিয়েছেন অসম্পৃক্ততা (estrangement)।

এখন, এই জগতের যদি কোন অর্থ না-ই থাকে তাহ'লে স্বভাবতঃ বলা যায় যে, এখানে 'সত্য' বলে কোন জিনিষও নেই। কেননা, 'সত্য' বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন বস্তুর অর্থপূর্ণ ও বোধগম্য সামঞ্জস্য। আর, বুদ্ধির কাজ যদি হয় বস্তুর অর্থ উদঘাটন করা তাহ'লে অস্তিত্ববাদ অনুসারে বুদ্ধি সম্বন্ধে কোন আশা পোষণ করাও আর চলে না। এই দিক থেকে দেখলে অস্তিত্ববাদ হ'চ্ছে একপ্রকার বুদ্ধিবিরোধী দর্শন। সুতরাং বুদ্ধি দ্বারা বস্তুজগতের মধ্যে সত্যের সন্ধান না ক'রে করা উচিত মানুষের অন্তর্জগতের মধ্যে। কিন্তু তবু এই আত্মগত (subjective) সত্য-কে বস্তু জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করাও ভুল হবে। বস্তু জগতের সঙ্গে এই সত্যের একটি নেতিবাচক সম্পর্ক আছে। 'বস্তুজগৎ থেকে কোন সত্য পাওয়া যাবে না' এইটেই একটা মস্ত সত্য; এবং বস্তুজগতেরই সত্য। এই সত্যটিকে দু'টি বিকল্প বাক্য দ্বারা প্রকাশ যায়। (১) কোন বস্তুগত সত্যই জ্ঞাতার ব্যক্তিগত সত্য হ'তে পারে না; এবং (২) কোন ব্যক্তিগত সত্যই বস্তুগত সত্য হ'তে পারে না। এর কারণ হ'লো এই যে, অস্তিত্ববাদের মতে 'সত্য' জিনিষটিকে দু'দিক থেকে বিচার করা যায় —আত্মগত (subjective), ও বস্তুগত (objective)। প্রথমতঃ জ্ঞান জিনিষটি সব সময়ে মানুষের বৈশিষ্ট্য। এবং কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যে সার্থক রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মানুষের পক্ষে তার প্রয়োজন। আর, যদি বস্তুর

অর্থ উপলব্ধি করাকেই জ্ঞান বলা হয় তাহ'লেও মনে রাখতে হবে যে, মানুষের অস্তিত্বের পরিস্থিতি বা পটভূমি বাদ দিয়ে সে অর্থ পাওয়া যায় না। কেননা, কোন বস্তু দ্বারা বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে যে কাজ পাওয়া তাই হ'চ্ছে সেই বস্তুটির অর্থ। যেমন ধরা যাক্ একটি ঘড়ি। তাকে দেখা ও বস্তুজগতের মধ্যে তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা জ্ঞান নয়। যখনই জানলাম যে ঐ বস্তুটি কী, কী কাজ সে করে, কী তার প্রয়োজন, তখনই বলা যায় জ্ঞান হ'লো। এ যে শুধু বিশেষ কোন একটি বস্তু সম্বন্ধে সত্য তা নয়। যে কোন বস্তু সম্বন্ধেই এ সত্য। এই জিনিষটিকে অস্তিত্ববাদীরা বলে উপকরণত্ব (utensility)। এই দিক থেকে দেখলে সমগ্র জগৎটাই হ'চ্ছে মানুষের বিভিন্ন উপকরণের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং মানুষের অস্তিত্ব ও প্রয়োজন বাদ দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক বিশুদ্ধ যে সত্য, অবাস্তব তত্ত্বদর্শনে তার মূল্য যাই হোক না কেন, বাস্তব মানব দর্শনে কোন স্থানই তার নেই। বাস্তব মানুষের জীবনে র'য়েছে নানা সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, সমস্যা প্রয়োজন। এ জিনিষগুলি কালাশ্রয়ী, নৈর্ব্যক্তিক বিশুদ্ধ সত্যের মতো কালাতীত নয়। এই জন্যই 'সত্য' জিনিষটি সর্বদাই ব্যক্তি মানুষের 'সত্য'। অর্থাৎ 'সত্য' ব্যক্তিগত বা আত্মগত। আর, সত্যের অর্থ যদি হয় ব্যক্তিগত 'সত্য', তাহলে কোন 'সত্য'-ই নৈর্ব্যক্তিক বস্তুগত হ'তে পারে না। এবং যে-সত্য নৈর্ব্যক্তিক বস্তুগত, তা কোন ব্যক্তি-জীবনের পক্ষেই 'সত্য' নয়।

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম যে, অস্তিত্ববাদের মতে জগতের মধ্যে মানুষের অবস্থাটা হ'চ্ছে ঠিক একটি অবাঞ্ছিত আগন্তুকের মতো। কোন অর্থ কোন সত্য-ই সেখানে নেই। এখন অস্তিত্ববাদীরা বলছেন যে, এই পরিস্থিতির মধ্যে মানুষ কখনো স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। তার অস্তিত্ব সর্বদাই অসম্পূর্ণ! মানব অস্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যটি পাওয়া যায় মানুষের চেতনাবৃত্তি থেকে। চেতনা মানেই কোন বিষয়ের চেতনা। অর্থাৎ চেতনা সব সময়ে বিষয়াশ্রয়ী। নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয় বাদ দিয়ে চেতনা নিজেই নিজের বিষয় হ'তে পারে না। শুধু মাত্র কোন একটি বিষয় যখন নিজের সামনে উপস্থিত থাকে তখনই ঐ বিষয়ের মাধ্যমে চেতনা নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়। কিন্তু ঐ বিষয়টি চেতনা নয়। অর্থাৎ, যার মাধ্যমে চেতনার অস্তিত্ব অনুভূত হয়, সে হ'চ্ছে চেতনান্তর কোন একটি পদার্থ। এই দিক থেকে বিচার ক'রে অস্তিত্ববাদীরা বলেছেন যে, চেতনা যেন একটি শাশ্বত 'না'। 'ইহা নহে' 'ইহা নহে'—এই ভাবে বিভিন্ন বস্তু থেকে পৃথক করেই চেতনার অস্তিত্ব। আর, তা যদি হয় তাহলে সচেতন মানুষের অস্তিত্ব-ও হবে ঠিক এই রকম। সে

অস্তিত্ব এমনই যে, নিজের বাইরের কোন একটি বস্তু তার পক্ষে সর্ব্বদাই প্রয়োজন। এই বৈশিষ্ট্যকে এঁরা বলেছেন মানব-অস্তিত্বের আত্ম-অতিক্রমণ (bounding leap). জড় পদার্থের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্য নেই। যে-কোন জড়পদার্থের একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট পরিমেয় রূপ আছে। কিন্তু মানুষের তা নেই। মানুষ সব সময়েই নিজেকে অতিক্রম ক'রে এমন একটা জিনিষের দিকে ধাবিত হ'চ্ছে যা তার নিজের প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ; এবং তারই মাধ্যমে সে খুঁজে পাচ্ছে তার নিজের অস্তিত্ব। বস্তু জগতে প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন বস্তুর সম্মুখীন হ'য়ে তারই মাধ্যমে যেহেতু মানুষ তার অস্তিত্ব খুজে পাচ্ছে, এবং বস্তুজগৎ যেহেতু সীমাহীন, মানুষের অস্তিত্ব-ও সেইজন্য কখনই সসীম নয়। এইজন্যই মানুষকে অস্তিত্ববাদীরা বর্ণনা করেছেন সম্ভাবনা বলে (man is a possibility)। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, মানব অস্তিত্বের এই যে আত্ম-অতিক্রমণ, আত্ম-সচেতনতা, এ সবই ঘটছে বিশেষ একটি জাগতিক পরিবেশের মধ্যে। সেই পরিবেশ আমার নিজের অস্তিত্বের বাইরে আর একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। আমার আত্ম-অতিরিক্ত, সেই অনাত্ম অস্তিত্বের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এই জিনিষটিকে অস্তিত্ববাদীরা বলেছেন অস্তিত্বের জাগতিকতা (being in the world). এটা যে শুধুই আকস্মিক তা নয়। কেন না, মানুষের অস্তিত্ব গ'ড়ে উঠছে এই জগতের মাঝ দিয়ে : আমার কর্ম, প্রচেষ্টা. আশা, আকাংখা সমস্তই আমার অস্তিত্বের এই দিকটি অভিব্যক্ত করছে। অবশ্য কর্ম, প্রচেষ্টা, আশা, আকাংখার বিষয় সব সময়েই থাকবে। তা না হ'লে আমার অস্তিত্বও অসম্ভব হ'য়ে পড়বে। সুতরাং বলা যায় যে, মানুষের সামনে উপস্থিত বস্তু জগৎটা শুধুই জগৎ নয়, মানুষের অস্তিত্বেরই একটা দিক। আর আত্ম-অতিক্রমণ, জগতের উপকরণত্ব ও অস্তিত্বের জাগতিকতা যদি আমরা মেনে নিই তাহলে একথা স্বীকার করা আমাদের অসুবিধে হবে না যে, আমাদের অস্তিত্ব সব সময়েই অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত (being with other), অর্থাৎ জগতের অস্তিত্ব ও নিজ অস্তিত্বের বাইরে অন্য ব্যক্তি সত্ত্বার অস্তিত্ব আমাদের অস্তিত্বেরই একটা অপরিহার্য অঙ্গ। ফরাসী দার্শনিক ডেকার্টে (Descartes) বলেছিলেন যে, আত্ম অস্তিত্বই সব চেয়ে নিঃসন্দেহ ও মৌলিক অস্তিত্ব ; এবং অন্য যে কোন অস্তিত্বই সেই মৌলিক অস্তিত্বেরই এক যুক্তিগত সিদ্ধান্ত। অস্তিত্ববাদীরা যা বললেন তা হ'লো ডেকার্টের ঠিক বিপরীত। মানুষের অস্তিত্ব হ'চ্ছে সম্বন্ধযুক্ত অস্তিত্ব (shared existence). সুতরাং সঙ্গকামনা, সাহচর্য প্রীতি, সমাজ গঠন এগুলি আমাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বেরই উপাদান।

আমরা আগেই দেখেছি যে, মানব-অস্তিত্বকে অস্তিত্ববাদীরা বর্ণনা করেছেন অনন্ত সম্ভাবনা বলে। এই দিক থেকে দেখলে অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে অরূপ। বিভিন্ন সম্ভাবনার মাঝ দিয়ে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে রূপায়িত করে বয়ে চলেছে তার প্রবাহ। এইভাবে রূপায়িত করাকেই আমরা উল্লেখ করেছি 'সম্বন্ধযুক্ত অস্তিত্ব' বলে। কিন্তু এ দায়িত্ব মানুষের সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ব্যক্তিগত। এখানে মানুষ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ একা। কোন্ সম্ভাবনাকে সে গ্রহণ করবে, কোন্ জিনিষটাকে সে কোন্ কাজে ব্যবহার করবে, কার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক হবে—এ সবই নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার উপর। এই পৃথিবীতে তার আবির্ভাবের উপর তার অস্তিত্বের উপর মানুষের কোন হাত নেই। কিন্তু কী সে হ'য়ে উঠবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর। এখন অস্তিত্ববাদীরা বলছেন যে, এই গুরু দায়িত্বের সম্মুখীন হ'য়ে মানুষ যখন তার নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব উপলব্ধি করে তখন তার মধ্যে দেখা দেয় এক 'শঙ্কা' (dread). সাধারণ ভাবে 'ভয়' বলতে যা আমরা বুঝি, এই 'শঙ্কা' তার থেকে বিশেষ ভাবে আলাদা জাতের। ভয় সাধারণতঃ দেখা দেয় কোন বিশেষ বস্তু অবলম্বন করে। যেমন, সাপের ভয়, আগুনের ভয় ইত্যাদি। কিন্তু অস্তিত্ববাদীদের এই শঙ্কার কোন বিশেষ বস্তু নেই। কিছু নেই, কেউ নেই—বিরাট এক শূন্যের মাঝখানে আমি এক গুরু-দায়িত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি—অস্তিত্বের এই উপলব্ধি থেকে দেখা দেয় এই শঙ্কা। এ যেন শূন্যতার ভয়। প্রকৃতপক্ষে এই শূন্যতা বোধ ও তার থেকে সঞ্জাত শঙ্কা মানুষের জীবনের এক অতি বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেন না, এই শঙ্কার মাঝ দিয়ে মানুষ নিজেকে চিনতে শেখে, নিজের পরিচয় পায়। এই শঙ্কার মুখোমুখি হয়ে মানুষ যেন মুহূর্তের মধ্যে অন্ধ আত্মতৃপ্তি ও পরম নিশ্চিন্তিতার আরাম ছিন্ন ক'রে নিজের অস্তিত্বের আকস্মিকতা ও অর্থহীনতার মধ্যে জেগে ওঠে। সাধারণভাবে দেখতে গেলে মনে হবে মানুষ তো বেশ সুখেই আছে। অস্তিত্বের নিঃসঙ্গতা বা একাকীত্বের কোন বেদনা তো তার নেই। কোন শূন্যতা বোধও তার নেই। যদিই কোন ক্ষেত্রে এই বেদনা ও শূন্যতা দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে সেটা অস্বাভাবিক ; অসুস্থতার লক্ষণ। অস্তিত্ববাদীরা বলেন একথাটা ভুল। প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অস্তিত্ব একান্তই নিঃসঙ্গ, একক ও শূন্য। কিন্তু সেই অস্তিত্বের মুখোমুখী হ'তে আমরা সাহস পাইনে। তাই প্রতি মুহূর্তে তাকে আমরা ভুলে থাকতে চেষ্টা করি। আমাদের আত্মতৃপ্তি তাই অন্ধ ; আত্মপ্রতারণার নামান্তর মাত্র

এই যে শঙ্কা, এর থেকে পাওয়া যায় অস্তিত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য। সে হ'লো উদ্বেগ (care, sarge)। এ-ও অস্তিত্বের একটি উপাদান; এবং এর মধ্যে আছে তিনটি মুহূর্ত বা লক্ষণ (moment or element)। প্রথমতঃ মানব অস্তিত্ব যেহেতু কখনই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, এবং সব সময়েই 'সম্ভাবনা' মাত্র, সেইজন্য মানুষের মধ্যে সব সময়েই চ'লেছে এক আত্ম-অতিক্রমণ। মানব অস্তিত্বের যথার্থ অর্থ ও তাৎপর্য তাই 'না' ধর্মী। যা নেই অথচ হ'তে পারে সেই সম্ভাবনার দিকেই তার সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত। এরই মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে মানব অস্তিত্বের মধ্যে ভবিষ্যতের আভাস। মানুষই একমাত্র প্রাণী যার কাছে ভবিষ্যৎ ব'লে কোন জিনিষ আছে; এবং যার কাছে ভবিষ্যতের বিশেষ মূল্য-ও আছে। আর এই যে ভবিষ্যৎ চিন্তা, ভবিষ্যৎ-ময়তা একেই বলা হ'য়েছে উদ্বেগের প্রথম লক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ এই জগতে আবির্ভাব বা তার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের কোন হাত নেই। অতি আকস্মিক ভাবে যেন একদিন সে এখানে নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে। তাই, মানুষ যখন আত্মচেতনা লাভ করে তখন সে উপলব্ধি করে যে, তার অনেক আগেই সে এই জগতে আবির্ভূত হ'য়েছে। এই উপলব্ধি থেকে আসে 'অতীত'। এই হ'লো উদ্বেগের দ্বিতীয় লক্ষণ। তৃতীয়তঃ যে জগতের মধ্যে মানুষ নিক্ষিপ্ত হ'য়েছে সে জগতটা তার কাছে প্রত্যক্ষ। নিজের যে সম্ভাবনাকে সে সার্থক করতে চায় তার জন্য উপকরণ হিসেবে সে ব্যবহার করছে এই প্রত্যক্ষ বস্তুজগতকে। সুতরাং বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের একটা 'বর্তমান' রূপ আছে। এইটেই হচ্ছে উদ্বেগের তৃতীয় লক্ষণ। এখন, উদ্বেগকে যদি অস্তিত্বের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ ব'লে স্বীকার করা যায় তাহ'লে বলা যায় যে, অস্তিত্বের একটা কালগত (temporal) রূপ আছে। শুধু তাই নয়, সেই কালগত রূপের বিন্যাসটি-ও লক্ষ্য করার মতো। অস্তিত্ববাদীদের মতে মানব জীবনে ভবিষ্যতের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে পিছনের দিকে তাকাবার আগে সামনের দিকে তাকায়। তার ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি সবই হ'চ্ছে ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক। সেইখানেই তাদের মূল্য। অর্থাৎ 'অতীত' মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করেনা, সে নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে ভবিষ্যতের আলোকে। আর অতীতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হ'য়ে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দ্বারা এই যে নিয়ন্ত্রিত হওয়া, একেই অস্তিত্ববাদীরা বলেছেন স্বাধীনতা। এ প্রসঙ্গে একটু পরে আমরা বিশদ ভাবে আলোচনা করবো।

এতোক্ষণ পর্যন্ত তাহ'লে আমরা যা পেলাম সে হ'লো এই যে, ব্যক্তিগত মানব অস্তিত্ব কখনই সম্পূর্ণ নয়। অনন্ত সম্ভাবনার মুখোমুখী হ'য়ে মানুষকে

ক্রমাগত এক সম্ভাবনা থেকে অন্য সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'চ্ছে। এই চলার যেন আর শেষ নেই। তারপর একদিন দেখা দেয় মৃত্যু। সমস্ত সম্ভাবনার চরম পরিণতি যেন এই মৃত্যু। মৃত্যুর ধারণাটি তাই অস্তিত্ব দর্শনে বিশিষ্ট একটি স্থান অধিকার ক'রে র'য়েছে। মানব অস্তিত্ব কখনই সম্পূর্ণ নয়, তার প্রকৃতি হ'চ্ছে 'না' ধর্মী। 'ইহা নহে', 'ইহা নহে'—এই নেতিবাচক অভিধা দ্বারাই তার অর্থ। প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্ব যে বিভিন্ন সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'চ্ছে, তার মানে হ'লো এই যে অস্তিত্ব তার এই 'নেতি-রূপ্' ত্যাগ করে 'ইতি-রূপ' নিতে চাইছে। নিজের নেতিধর্ম অতিক্রম করে এই ইতি-রূপ গ্রহণ করাকেই আমরা অস্তিত্বের আত্ম-অতিক্রমণ ব'লে উল্লেখ করেছি। এখন, অস্তিত্বের স্বধর্ম যদি হয় 'না', তাহ'লে কোন 'হাঁ'-তে রূপান্তরিত হওয়া মানেই অস্তিত্বের বিনাশ বা মৃত্যু। সেই জন্যই অস্তিত্ববাদীরা বলছেন যে, অস্তিত্বের একটা বড় কথা হ'লো 'মৃত্যু'। অস্তিত্বের অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে মৃত্যু-রূপী এই পরিণতিটি হ'চ্ছে অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে নবজাতকের সম্বন্ধে একটি কথাই আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। সে হ'চ্ছে 'এর মৃত্যু হবে'। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে একথাটা আমরা মনে রাখি না। এমনকি কখনও যাতে এই সত্যটি আমাদের মনে না থাকে তার জন্য-ও আমরা বিশেষ সতর্ক থাকি। অস্তিত্ববাদীদের এই কথাটা যেন অনেকটা মহাভারতের সেই মহাপ্রশ্ন—'কিমাশ্চর্যম্ অতঃ পরম্'? —যা একান্ত নিশ্চিত অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী তা যে আমার জীবনেও একদিন দেখা দেবে একথাটা আমরা সব সময়েই ভুলে থাকতে চাই। শুধু তাই নয়, অন্য যে কোন সম্ভাবনার উপরও মৃত্যুর অতি গভীর প্রভাব দেখা যায়। কেননা, এরই আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, যে কোন সম্ভাবনাই কতো অনিশ্চিত ও অর্থহীন। এখন, মৃত্যুতেই যদি সমস্ত সম্ভাবনার লোপ হ'য়ে যায়, তা'হলে বলা যায় যে, অস্তিত্বের এক প্রান্তে র'য়েছে বিরাট শূন্যতা। আর, কীভাবে, কোথা থেকে কেনই বা আমরা এই পৃথিবীতে এলাম তা যখন আমাদের আয়ত্তের বাইরে তখন অস্তিত্ব-পূর্ব অবস্থাটাও শূন্যতা ভিন্ন আর কী! ব্যক্তিগত অস্তিত্ব তাই যেন শূন্যতা থেকে শূন্যতায় সঞ্চরণ। শঙ্কার মধ্য দিয়ে জীবনের এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যটি আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে। এই অবস্থায় মানুষের সামনে দেখা দেয় দু'টি মাত্র পথ। হয় সে দৈনন্দিন জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে মগ্ন ক'রে দিয়ে অস্তিত্বের কথা ভুলে থাকতে পারে, এবং মৃত্যুকে একটি নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ ঘটনা ব'লে মনে করে তৃপ্ত থাকার চেষ্টা করতে পারে, আর না হয় মৃত্যু যে তার নিজ অস্তিত্বের অনিবার্য পরিণতি, তার সকল

সম্ভাবনার সমাপ্তি—এই গভীর সত্যটিকে সচেতন স্বীকৃতি দ্বারা গ্রহণ ক'রে নিয়ে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতা অর্থহীনতা উপলব্ধি করতে পারি। এই অবস্থাটাকে অস্তিত্ববাদীরা বলেছেন অস্তিত্বের সার্থক রূপ, বা সার্থক অস্তিত্ব (authentic-existence), আর প্রথম অবস্থাটাকে বলেছেন অসার্থক অস্তিত্ব (unauthentic-existence)। মানুষ যখন অসার্থক অস্তিত্ব থেকে সার্থক অস্তিত্বে উন্নীত হয়, তখন তার মধ্যে দেখা দেয় মোহমুক্তি জনিত এক পরম নিঃস্পৃহতা। সমস্ত কর্তব্য তখন মানুষ নিখুঁতভাবে পালন করে যায়, কিন্তু সম্পূর্ণ নিরাসক্ত মন নিয়ে।

শঙ্কার মধ্য দিয়ে জেগে উঠে মানুষ যখন তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয় তখন তার সামনে খোলা থাকে এই দু'টি পথ। এদের মধ্যে, মৃত্যুকে স্বীকার ক'রে তারই আলোকে জগৎ ও জীবনের মূল্যায়ন করাতেই যে মানুষের অস্তিত্বের সার্থকতা —এই বোধটি মানুষ পায় তার বিবেক (conscience) থেকে। বিবেক আমাদের আচরণের মূল্য বিচার করে না, করে অস্তিত্বের যাথার্থ্য নির্ণয়। তারপর, বিবেক দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে মানুষ যখন তার অস্তিত্বের অসার্থকতা উপলব্ধি করে ও সার্থক অস্তিত্বের দিকে অগ্রসর হয় তখন তার জীবনে দেখা দেয় আর একটি অনুভূতি। অস্তিত্ববাদীরা তার নাম দিয়েছেন অপরাধ-বোধ (guilt)। বিশেষ কোন অন্যায় আচরণের জন্য যে এই অপরাধ বোধ তা নয়। স্বাধীন মানুষ হ'য়েও যে এতোদিন পর্যন্ত আমি অস্তিত্বের সার্থক রূপটি গ্রহণ না করে তার অসার্থক রূপ নিয়ে নিজেকে প্রতারিত করেছি সেই বোধই হ'লো এই অপরাধ বোধ। এবং এরই থেকে আসে সার্থক অস্তিত্ব গ্রহণ করার সঙ্কল্প।

আমরা দেখেছি যে অস্তিত্ববাদীদের মতে মানব-অস্তিত্বের একটি 'নেতি বাচক' দিক আছে। 'ইহা নহে', 'ইহা নহে'—এই জাতীয় অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে তাকে বোঝা যায়। এই অস্বীকৃতি যখন হয় বিশেষ কোন বস্তু সম্পর্কে তখন কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যখন এই অস্বীকৃতির বিষয় হয় সমগ্র জগৎ। আর, সমগ্র জগতই যদি অস্বীকৃত হ'য়ে যায়, তাহ'লে বাকিতো আর কিছু থাকে না, তাই সেই অবস্থাটাকে বলা হয় শূন্যতা। অর্থাৎ শূন্যতার মাঝ দিয়েই পাওয়া যায় অস্তিত্বের পূর্ণতা। এই জন্যই অস্তিত্ববাদী দর্শনে শূন্যতার ধারণা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে র'য়েছে দেখা যায়। 'শূন্যতা' শুধুমাত্র অস্তিত্বের অভাব বা 'না' নয়। একে প্রত্যক্ষ করা যায়। শূন্যতার সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই আসে শঙ্কা, যার সম্বন্ধে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে,

যদিও শূন্যতাকে অস্তিত্বের উপাদান বা অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা যায় না তবু সেই শূন্যতার আলোকেই উদ্ভাসিত হয় অস্তিত্বের স্বরূপ।

শূন্যতার আলোকে অস্তিত্বের স্বরূপ যখন উদ্ভাসিত হয় তখন তার মধ্যে দেখা যায় অস্তিত্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য। অস্তিত্ববাদীরা-তার নাম দিয়েছেন স্বাধীনতা। স্বাধীনতা কোন বাইরের বস্তু নয়, সুতরাং তাকে অর্জন করার প্রশ্নও উঠতে পারে না। মানব অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা এক অর্থসূচক। মধ্যযুগের ঈশ্বর বিশ্বাসী মনীষিরা মানুষকে মনে করতেন ঈশ্বরের মনের এক অভিব্যক্তি বলে। ঈশ্বরের মনের মধ্যে যে মানব-প্রকৃতি ধারণা হিসেবে র'য়েছে তার এক একটি বিশেষ অভিব্যক্তি হ'চ্ছে মানুষ। সুতরাং মানুষের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের (individualtty) একমাত্র অর্থ ও সার্থকতা হ'লো সেই শাশ্বত মানব-প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও উপলব্ধি করা। কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা বললেন 'ঈশ্বর মরে গেছেন'। সুতরাং অস্তিত্ব-পূর্ব শাশ্বত কোন মানব অস্তিত্বও নেই। ফলে মানুষের কোন কর্ম আচরণ চিন্তা তার অস্তিত্বপূর্ব কোন ধারণাকে অনুসরণ করে না। মানুষ তাই মুক্ত স্বাধীন। প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ প্রতি মুহূর্তে নিজেকে অতিক্রম ক'রে সামনের দিকে এগিয়ে চ'লেছে। অস্তিত্বপূর্ব কোন নির্দিষ্ট আদর্শ যখন তার নেই, তখন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে অনন্ত সম্ভাবনার মাঝ থেকে কোন একটিকে গ্রহণ করে সেইভাবে মানুষ নিজেকে গ'ড়ে তুলছে। এই ভাবে নিজেকে গ'ড়ে তোলা, হ'য়ে ওঠাই তার স্বাধীনতা। অস্তিত্ব-পূর্ব কোন অতীত অদর্শ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে না, অস্তিত্বপূর্ব কোন অতীতের কাছে মানুষের কোন জবাবদিহি-ও নেই। কেননা ঈশ্বরতো আর নেই, অস্তিত্বের পূর্বে তাই আছে শুধু বিরাট শূন্যতা। অর্থাৎ এই মুক্তি, এই স্বাধীনতা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য। ইচ্ছে করলেও একে বর্জন করা যায় না। এ-ই মানুষের নিয়তি (condemend to be free)। এই অপরিহার্য স্বাধীনতার ফল হ'চ্ছে মানুষের মূল্য-বোধ (sense of value)। কেননা যা নেই অথচ পাবার জন্য চেষ্টা করা তাই তো মূল্যবান ! এই দিক থেকে মূল্য-বোধ ও স্বাধীনতা প্রায় এক অর্থ সূচক। আর, এই জন্যই বলা হয় যে স্বাধীনতার ভিত্তি হ'চ্ছে পাওয়া ও না পাওয়ার দ্বন্দ্ব। সবই যদি পাওয়া হ'য়ে যায়, সমস্ত সম্ভাবনা যদি বাস্তব হয়, তাহ'লে আত্ম অতিক্রমণ ও সম্মুখ গতির আর কোন অবকাশ থাকে না ; এবং এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষ দেখা দেবে নির্দিষ্ট একটি পরিচিত রূপ নিয়ে। জড় পদার্থের সঙ্গে কোন পার্থক্য-ই তার থাকবে না। সুতরাং সে অবস্থায় স্বাধীনতা এবং মূল্য-বোধ কিছুই থাকবে না।

তারপর, কোন ব্যক্তি মানুষ তো আর এক নয়। তারই মতো আরও বহু

মানুষ তার চার পাশে র'য়েছে। তাদের অস্তিত্ব আমার নিজের অস্তিত্ব থেকে অনুমান দ্বারা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন নেই; আমার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গেই তা উপস্থিত আছে। একথা আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারি, যখন অন্য কেউ আমরা দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় হয়তো আমি একটি পার্কে বসে আছি। মৃদু বাতাস বইছে, আশে পাশের রমনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমি আনন্দ বোধ করছি। অদূরে আর একটি লোক বসে কিছু পড়ছে। ঐ লোকটি আমার কাছে আমার জ্ঞানের বস্তুজগতের অন্তর্গত। যে বেঞ্চের উপর লোকটি বসে আছে তার সঙ্গে লোকটির মৌলিক কোন পার্থক্য আমার কাছে নেই। হঠাৎ লোকটি মাথা তুলে আমার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে মূল্যায়ন-ও বদলে গেল। সে আর এখন শুধু একটি বস্তু নয়, —কর্তা, সচেতন জ্ঞাতা। এবং ঐ লোকটির জ্ঞানের জগতের অন্তর্ভূক্ত হ'য়ে আমি এখন নিজেই যেন কিছু পরিমাণে বদলে গেলাম। আমি এখন আর জ্ঞাতা নই; নিজেকে এখন আমি দেখতে পাচ্ছি অন্য এক জ্ঞাতার জ্ঞেয় বস্তু হিসেবে। আমার স্বাতন্ত্র্য কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে পড়েছে। সুতরাং ঐ লোকটি আমার স্বাতন্ত্র্যের প্রতিকূল। এরকম ব্যাপার আমাদের জীবনে প্রতি নিয়তই ঘটছে। কিন্তু আমাদের স্বাতন্ত্র্য আমরা কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হ'তে দিতে চাই না। তাই বিভিন্ন উপায়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করি। কিন্তু সব প্রচেষ্টার শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হ'য়ে যায়। অন্যের দৃষ্টির সামনে নিজেকে আমরা উপলব্ধি করি বস্তু হিসেবে, এবং অন্যকে উপলব্ধি করি জ্ঞাতা হিসেবে। এই ভাবে আমরা নিজেদের আত্মময়তা (solipsism) অতিক্রম করে যাই, এবং আত্ম-অতিরিক্ত অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি। এই অস্তিত্বও একটি চেতনা, একটি ব্যক্তি সত্তা। এর সঙ্গে নিজেকে আমি এক ক'রে ফেলতে পারি না। কেননা, অন্য থেকে পৃথক ক'রেই আমি আমাকে উপলব্ধি করতে পারি। তবে এই পৃথক-করণ এক তরফা নয়, পারস্পরিক। আমি যেমন চাই সব কিছুকে বস্তু হিসেবে সামনে রেখে তার থেকে পৃথক ক'রে নিজেকে উপলব্ধি ক'রতে, আত্ম-অতিরিক্ত ঐ অস্তিত্বটিও চায় তেমনি নিজেকে উপলব্ধি করতে। নিজের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে কেউই আমরা বস্তুতে পর্যবসিত হ'তে চাই না। ফলে দেখা দেয় এক আপোষ-রফা। নিজের কিছুটা অন্যের হাতে তার বস্তু হিসেবে ছেড়ে দিয়ে আমরা যেন নিষ্কৃতি পাই। আমাদের এই বিচ্ছিন্ন বস্তু আমি অংশ হ'চ্ছে জগতের সঙ্গে আমাদের বন্ধনসূত্র।

মোটামুটি এই হ'লো অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল কথা। অস্তিত্বের আকস্মিকতা, অনিশ্চয়তা, অর্থহীনতা, শূন্যতাবোধ, শঙ্কা, নৈরাশ্য প্রভৃতি অনুভূতিগুলি তার

মৌলিক উপাদান। ব্যাপক ও বিশদ ব্যাখ্যা না ক'রে শুধুমাত্র এই দিক থেকে অগ্রসর হ'য়েও অস্তিত্ববাদী দর্শনকে বোঝা যেতে পারে। এই মৌলিক উপাদান-গুলির প্রকৃতি একান্তই নেতিবাচক। অস্তিত্ববাদী দর্শনও তাই প্রধানতঃ নেতিবাচক। আর যা একান্তই নেতিবাচক, তা নিয়ে আর যা কিছু হোক্ সুনির্দিষ্ট কোন দর্শন গ'ড়ে তোলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা সে চেষ্টাও করেন নি। বরং তাঁরা এই কথাই বলেছেন যে, অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন দর্শন গঠন করা যায় না। সুতরাং অস্তিত্ববাদী দর্শনের যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হ'লে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে অন্য দিকে। জীবনের অতি গভীর কয়েকটি সত্যের দিকে এঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিগত যুগের কোনো আশা কোনো আদর্শ যখন আজ আর ধ'রে রাখা সম্ভব হ'চ্ছে না, মানুষের সমাজ, নীতি, মূল্য-বোধের সমস্ত বন্ধন যখন আজ ভেঙ্গে পড়ছে, তখন আত্মস্থ হ'য়ে নিজের দিকে দৃষ্টি দেওয়া ও আত্ম-সন্ধানের যে বিশেষ সার্থকতা আছে সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সম্ভবতঃ এই কারণেই অস্তিত্ববাদী দর্শনের আবেদন আজকের জগতে অতি গভীর ভাবে অনুভূত হ'চ্ছে। তবে একথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে যে, অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রধানতঃই দুঃখবাদী দর্শন। এ জীবন অর্থহীন, সঙ্গতিহীন, সঙ্গীহীন, মৃত্যুতেই তার সকল সম্ভাবতার অনিবার্য পরিসমাপ্তি—একথাটা খুব আনন্দের নয়। অস্তিত্ববাদী দর্শন এই দুঃখের কথাই আমাদের শোনাতে চায়। কিন্তু এই দুঃখকে অতিক্রম করা যায় কি না, বৃহত্তর কোন সত্যের আলোকে জীবনের মধ্যে কোন অর্থ ও সঙ্গতি উপলব্ধি করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে এই দর্শন সম্পূর্ণ নীরব। মনে হয় এ প্রশ্নের কোন উত্তর সে খুঁজে পায়নি।

জগন্মিথ্যাবাদ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

ওঁ

সত্যং শিবং জ্ঞানমনন্তমেক—
মনাদিমাদিং ভুবনস্য চান্তম্।
আনন্দরূপং পরমং মহিষ্ঠং
তমীশ্বরং সর্ব্বগুরুং নমামি॥

জগন্মিথ্যাবাদের বিরুদ্ধে বহু বহু সুযুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে। কিন্তু এস্থলে তাহা উত্থাপিত হইবে না। কারণ, তাহা হইলে আলোচনা অতি সুদীর্ঘ হইবে। এস্থলে কেবলমাত্র মায়াবাদের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করিয়াই যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইবে।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে আচার্য শঙ্করস্বামী মায়াবাদকে একটি মতবাদ (systsm of philosophy) ভাবে দাঁড় করিয়াছেন এবং তাঁহার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শিষ্য প্রশিষ্যগণ সেই মতকে আরও উন্নত ও সুদৃঢ় করিয়াছেন। আচার্য্য গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকা হইতে মায়াবাদের বিশেষভাবে আরম্ভ। অনেকে বলেন যে গৌড়পাদ বৌদ্ধ ছিলেন ও তাঁহার কারিকাও শূন্যবাদ সমর্থক। শঙ্করাচার্য্য গৌড়পাদের শিষ্যের শিষ্য। সুতরাং তিনি স্বাভাবিক ভাবেই বৌদ্ধ শূন্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। 'এইরূপ ভাবেই বৌদ্ধ অবিদ্যা শঙ্কর-মায়াবাদ রূপ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং আচার্য্য শঙ্করের স্বীকৃত বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া যদি জগন্মিথ্যাবাদ খণ্ডন করা যায়, তবে তাহাই উৎকৃষ্টতম প্রণালী। যাহার যে কথা, তাহার সেই কথা দ্বারাই যদি উত্তর দেওয়া যায়, তবে মীমাংসা সহজলভ্য ও নিশ্চিত হয়। ইহাই সাধারণ প্রণালী।

বেদান্ত দর্শনের "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" (১।৪।২৬) সূত্রের ব্যাখ্যায় আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে ব্রহ্মই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। মায়াবাদি-গণ এখনও এই তত্ত্ব স্বীকার করেন। এই সূত্র তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দ-বল্লীর ৬ষ্ঠ ও ৭ম অনুবাকের উপর প্রতিষ্ঠিত। শঙ্কর ভাষ্য ও শ্রুতিমন্ত্রের অর্থ

সুস্পষ্ট। অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া তাঁহারই উপাদানত্বে এবং তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। এই সূত্রে ব্রহ্মের পরিণামে জগদুৎপত্তির কথাও আছে। "পরিণাম" শব্দটি পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং এই তত্ত্ব শ্রুতি এবং বেদান্ত দর্শন উভয় দ্বারা প্রমাণিত হইল। তৈত্তিরীয়োপনিষদের উক্ত মন্ত্রদ্বয় ব্রহ্ম প্রকরণে অবস্থিত। ঐ প্রকরণ হইতেই "সত্যং জ্ঞান মনন্তং ব্রহ্ম" মন্ত্র আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের স্বরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাহাই সত্য হইল, তবে ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের উপাদানত্বে এবং তাঁহার নিজ কর্ত্তৃত্বে যে জগতের উৎপত্তি, তাহা কি প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে? দেখা গেল যে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ বা কিছু জগতের চতুঃসীমার মধ্যে আসেন নাই। আর ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু বা অন্য কেহ দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইলে ব্রহ্মই স্বয়ং সীমাবদ্ধ হন। সুতরাং তাহা অসম্ভব। এই সকল আলোচনায় শ্রুতি ও বেদান্ত দর্শনের মধ্যে মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। এই অবস্থায় জগৎ মিথ্যা, মায়ার খেলা মাত্র, এই সিদ্ধান্ত কিরূপে আসিতে পারে? উপনিষদের আরও বহু স্থলে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম হইতেই তাঁহার ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগৎসৃষ্ট। অনেকে বহু স্থলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বলেন। এই মন্ত্র সম্পূর্ণ ভাবে এইরূপ :—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।" (ছা—৩।১৪।১)

এই মন্ত্রের প্রথম অংশের (অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এর) উল্লেখ করিয়াই অনেকে ব্যাখ্যা করেন যে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, কিন্তু জগৎ একেবারেই মিথ্যা, মায়া মাত্র। তাহারা উহার সহিত "তজ্জলানিতি"র উল্লেখ করেন না। এই মন্ত্র হইতে বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্ম হইতেই জগৎ আসিয়াছে, (সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান), ব্রহ্মে জগৎ অবস্থিত এবং তাহাতেই লীন হইবে। অর্থাৎ এই তিন কারণে জগৎকে ব্রহ্ম বলা যায়। কারণ, জগতের উপাদান ব্রহ্মই। এই মন্ত্রের এবং অন্যান্য সমভাবাপন্ন ঔপনিষদিক মন্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই বেদান্ত দর্শনের "জন্মাদ্যস্যযতঃ" (১।১।২) সূত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ শ্রুতি মন্ত্র সমূহ উল্লেখযোগ্য।

"যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।"

(তৈত্তি—৩।১)

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" (তৈত্তি—৩।৬)

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ।
খং বায়ু জ্যোতি রাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্ত ধারিণী।"

(মুণ্ডক—২।১।৩)

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি । তত্তেজোঽসৃজত।"

(ছান্দোগ্য—৬।২।৩)

"একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।" (কঠ—৫।১২)

একং বীজং বহুধা যঃ করোতি।" (শ্বেত—৬।১২)

এই সম্পর্কে তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২।৬-৭ অনুবাক দ্বয়ও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

এই সকল মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায় যে ব্রহ্ম হইতেই তাঁহারই ইচ্ছায় জগৎ উৎপন্ন। ইহাতে মায়ার কোনই উল্লেখ নাই। সুতরাং ব্রহ্মের উপাদানত্বেও কর্ত্তৃত্বে যে জগতের উৎপত্তি, তাহা মিথ্যা হইতেই পারে না। মায়াবাদ উপনিষদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী। উপনিষদ যখন বলেন যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে, তখন সেই জগৎকে মায়াবাদ কেন এবং কি প্রকারে মিথ্যা বলেন? উপনিষদকে অভ্রান্ত বলিব, আবার জগৎকে মিথ্যা বলিব, ইহা স্ববিরোধী উক্তি। উপনিষদের উক্তিকে শব্দ প্রমাণ বলা হয়। শঙ্করও তাহাই বলেন; তবে কি প্রকারে সেই শব্দ প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া জগন্মিথ্যাবাদ স্থাপন করা যায়?

আবার বেদান্ত দর্শনের "দৃশ্যতেতু" (২।১।৬) সূত্রের ভাষ্যেও আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে ব্রহ্মের সত্তাই জগতের সত্তা। তাঁহার উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"অথো চ্যেত, অস্তি কশ্চিৎ পার্থিবত্বাদি স্বভাবঃ পুরুষাদীনাং কেশনখাদিষনু-বর্ত্তমানো গোময়াদীনাঞ্চ বৃশ্চিকাদিষিতি, ব্রহ্মণোঽপিতর্হি সত্তালক্ষণ স্বভাবঃ আকাশাদিষনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে।"

বঙ্গানুবাদ:—যদি বল, পুরুষেরও গোময়ের যে পার্থিব স্বভাব আছে, সেই স্বভাব কেশ নখাদিতে ও বৃশ্চিক প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়, সুতরাং তদনুসারে প্রকৃতি বিকৃতি ভাবের অভাব হয় না। ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি, ব্রহ্মে যে সত্তা নামক স্বভাব আছে, সেই স্বভাব তদুৎপন্ন আকাশাদি পদার্থেও আছে। তদনুসারে ব্রহ্মের সহিত আকাশাদির প্রকৃতিবিকৃতির ভাব সংরক্ষিত হইবেক।

(কালীবর বেদান্তবাগীশ)

এ স্থলেও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের সত্তাই জগতের সত্তা। এ স্থলে প্রকৃতির বিকৃতির কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রহ্ম প্রকৃতি, জগৎ তাঁহারই

বিকৃতি বা পরিণাম। সুতরাং যে পদার্থের সত্তায় ব্রহ্মসত্তা চির বর্তমান, সেই পদার্থ মিথ্যা হইতে পারে না। ব্রহ্ম যে সত্য স্বরূপ, তাহা উভয় পক্ষ সম্মত। সুতরাং সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সুতরাং তাঁহারই উপাদানত্বে গঠিত জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। পূর্ব্বোল্লিখিত সুত্রে এবং সেই সুত্র যে শ্রুতি মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাতেও দেখা গিয়াছে যে ব্রহ্ম তাঁহার হইতেই এবং তাঁহার দ্বারাই জগৎ গঠন করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদোক্তা মায়া দ্বারা কিছু না হইতে জগৎ সৃজন করেন নাই। কিছু না হইতে যে জগৎ আসিতে পারে না, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।২।১—৩ মন্ত্র সমূহ সুস্পষ্ট ভাবে প্রচার করেন। উহাতে জগৎকে সৎ বলিয়াই কথিত হইয়াছে। এই মন্ত্রত্রয় অন্য নিরপেক্ষ ভাবে মায়াবাদকে সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডন করিতে পারে। তথাপিও কেন উহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া জগৎকে মিথ্যা বলা হয়? এই সকল মন্ত্রই ব্রহ্মপ্রকরণে অবস্থিত। এই প্রকরণেই সুপ্রসিদ্ধ "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এ স্থলে দুইটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। একটি স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যটি সমুদ্রতরঙ্গ। এই উভয়েই জাগতিক পদার্থ। ইহাদের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে স্বর্ণালঙ্কারের অলঙ্কারত্ব বা কারুকার্য্য এবং সমুদ্রতরঙ্গের তরঙ্গত্ব যথাক্রমে স্বর্ণ ও সমুদ্র জলের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। উহাদের হইতে স্বর্ণ ও সমুদ্রজল বাদ দিলে স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য এবং তরঙ্গের তরঙ্গত্ব বা উহাদের নামরূপের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং প্রোক্ত সুত্রদ্বয় ও উহাদের ভাষ্যের অবলম্বনে আমরা বুঝিতে পারি যে জগৎ=ব্রহ্ম+নামরূপ। স্বর্ণালঙ্কার এবং সমুদ্র তরঙ্গের নামরূপ যেমন স্বর্ণ ও সমুদ্রজল হইতে বিভিন্ন (বিভক্ত) নহে, কিন্তু পৃথক্ (Distinct), জগতের নামরূপও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত ভাবে ভিন্ন নহে, কিন্তু পৃথক্ (Distinct) ভাবেই ভাসমান; প্রোক্ত পদার্থদ্বয়ের নামরূপ যেমন উহাদের উপাদান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সত্তাশূন্য কথার কথা মাত্র হয়, সেইরূপ জগৎ হইতে উহার উপাদান পদার্থ বা সত্তা ব্রহ্মকে বাদ দিলে উহার নামরূপও সম্পূর্ণরূপে কথার কথায় মাত্রে পর্যবসিত হয়। এইরূপ পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব। স্বর্ণালঙ্কারের ও সমুদ্রতরঙ্গের স্বর্ণ ও সমুদ্রজল বাদ দিয়া কেবলমাত্র উহাদের নামরূপের চিন্তা অসম্ভব। তাই উহাকে false abstraction বলা যাইতে পারে। সেইরূপ ব্রহ্মরূপ উপাদান বাদ দিয়া জাগতিক নামরূপ সম্বন্ধেও চিন্তা অসম্ভব। সুতরাং কেবলমাত্র জাগতিক নামরূপের চিন্তাও false abstraction।

এখন প্রশ্ন হইবে যে আমরা ত কেবল নামরূপই দেখিতেছি। সুতরাং উহাদের চিন্তা করিতে পারি না, একথা সত্য নহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে আমরা কেবল নামরূপের চিন্তা করি না। আমরা কখনও মৃত্তিকা বাদ দিয়া ঘটের নামরূপের মাত্র চিন্তা করিতে পারিনা। ঘটের স্থূল উপাদান মৃত্তিকাই বটে, কিন্তু ultimate analysisএ আমরা ব্রহ্মেই উপনীত হইব। ইহা যখন স্বীকৃত যে জগতের উপাদান ব্রহ্ম, তখন প্রত্যেক জাগতিক পদার্থের উপাদানই ব্রহ্ম। ঘটের মৃত্তিকাকে অপে লয় করিলে ঘটের স্থূল উপাদান মৃত্তিকা থাকিবে না বটে, কিন্তু অপ্ থাকিবে। এইরূপে আমরা ক্রমশঃ ব্রহ্মেই উপনীত হইব। সুতরাং ঘটের আদি উপাদান ব্রহ্মই। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন জাগতিক নামরূপের চিন্তা অসম্ভব। তথাপিও যে ব্রহ্মের চিন্তা না করিয়া আমরা ঘটের নামরূপের চিন্তা করি বলিয়া মনে করি, তাহার কারণ এই যে আমরা জড়ভাবে জর্জ্জরিত, তাই আমরা স্থূল লইয়াই থাকি এবং স্থূলকেই স্বীকার করি, কিন্তু সূক্ষ্মকে সহজে স্বীকার করিতে চাহি না। অর্থাৎ আমরা দুধের সাধ ঘোলে মিটাই। আর ইহা যখন সত্য যে উপাদান ভিন্ন নামরূপের কোনই অস্তিত্ব নাই বা থাকিতে পারে না এবং ইহাও যখন সত্য যে ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, তখন ব্রহ্ম ভিন্ন জাগতিক নামরূপের অস্তিত্ব নাই।

এখন আমাদের প্রশ্ন হইবে যে মায়াবাদ কেন আচার্য্য শঙ্কর স্বীকৃত সত্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল নামরূপকেই জগৎ বলিয়াছেন। আমরাও বলি যে falsely abstracted নামরূপের কোনই অস্তিত্ব নাই, ছিল না বা থাকিবে না। যদি জগৎ অর্থে উহার কেবল নামরূপকেই ধরা যায়, তবে উহা মিথ্যা বটে, কিন্তু জগৎত কেবল নামরূপই নহে, উহার উপাদান ভাবে ব্রহ্ম চির বর্ত্তমান। আবার উপাদান শূন্য নামরূপ বলিয়া কিছুই নাই। ঘটের নাম রূপকে কেবল ঘট বলা হয় না। ঘট=মৃত্তিকা+কারুকার্য্য বা নামরূপ। সুতরাং দেখা যায় যে মায়াবাদ জগতকে মিথ্যা প্রমাণ করিবার জন্য জগতের একটী অসত্য সংজ্ঞা দিয়াছেন, অর্থাৎ জগৎকে উপাদানশূন্য সুতরাং ভিত্তিশূন্য নামরূপ মাত্র বলা হইয়াছে। অথচ মায়াবাদ ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলেন। ইংরাজীতে একটী কথা আছে :—"Give the dog a bad name and hang it." এ ক্ষেত্রেও কি সেই পন্থা অবলম্বিত হয় নাই? জগৎ যাহা প্রকৃত পক্ষে নহে, উহার সেইরূপ একটি সংজ্ঞা দিয়া উহাকে মিথ্যা বলা হইয়াছে। ইহা কতদূর ন্যায় সঙ্গত হইয়াছে, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে পাশ্চাত্য মহাদার্শনিক Kant বলিয়াছেন যে Phenomena এর পশ্চাতে Noumenon বর্ত্তমান এবং তাহাই Thing in itself। সুতরাং তিনিও বলেন যে Phenomenaই সমুদায় নহে। উহা নামরূপ মাত্র এবং আসল বস্তু উহার উপাদান ভাবেপশ্চাতে বর্ত্তমান। অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাই জগতের সত্তা। অর্থাৎ Noumenon ভিন্ন Phenomena এর অস্তিত্ব অসম্ভব। মনুষ্যের এরূপ শক্তি নাই যে ব্রহ্মসত্তা বাদ দিয়া কেবল জাগতিক নামরূপকেই সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বিভক্ত ভাবে দেখিবেন!

আমরা ইতিপূর্ব্বে "ব্রহ্ম+নামরূপ=জগৎ" বলিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ব্রহ্মের সহিত কি কিছু যোগ হইতে পারে? আমরাও বলি যে ব্রহ্মের সহিত কিছু যোগ হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রেও স্বর্ণালঙ্কার সম্বন্ধে চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে উহা স্বর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু উহারই উপদানত্বে উহা হইতেই উহারই নামরূপ রচিত হইয়াছে। অর্থাৎ নামরূপ স্বর্ণ হইতে বিভক্ত না হইয়াও পৃথক্ (Distinct) ভাবে প্রতীয়মান। সেইরূপ ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং জাগতিক নামরূপ তাঁহার হইতে বিভিন্ন না হইয়াও তাঁহারই হইতে রচিত হইয়া পৃথক্ (Distinct) ভাবে ভাসমান। এই ভাবটি বুঝাইতে যাইয়া ভাষায় বলা হইয়াছে যে "ব্রহ্ম+নামরূপ=জগৎ"। নতুবা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের সহিত কিছুই যুক্ত হয় নাই বা হইতেও পারে নাই।

মায়াবাদ সত্য শব্দের অর্থ বলেন "ত্রিকালে অবাধিত সত্য বা নিত্য"। মায়াবাদ উপনিষদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী। এখন দেখা যাউক্ উপনিষদ্ সত্য শব্দের অর্থে কি বলেন। 'সত্য' শব্দের নিরুক্ত সম্বন্ধীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৫।৫।১, ছান্দোগ্য উপনিষদের ৮।৩।৫ এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদের ২।৬ মন্ত্রসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"তে দেবাঃ সত্যমেবোপাসতে। তদেতত্র্যক্ষরং সত্যমিতি স ইত্যেকমক্ষরং তীত্যেকমক্ষরং যমিত্যেকমক্ষরং প্রথমোত্তমে অক্ষরে সত্যং মধ্যতোঽনৃতং তদেতদনৃতমুভয়তঃ সত্যেন পরিগৃহীতং সত্যভূয়মেব ভবতি নৈবং বিদ্বাংসমনৃতং হিনস্তি।

বঙ্গানুবাদ:—সেই দেবগণ সত্যই উপাসনা করিয়া থাকেন, এই সত্য তিনটি অক্ষরযুক্ত। 'স' একটি অক্ষর, 'তি' (অর্থাৎ 'ৎ') একটি অক্ষর এবং 'যম্' (অর্থাৎ 'য') একটি অক্ষর। প্রথম এবং শেষ অক্ষর সত্য এবং মধ্যবর্ত্তী অক্ষর অসত্য। সুতরাং এই অসত্য ('ৎ' অক্ষর) উভয় দিকে সত্য দ্বারা আবেষ্টিত। এই জন্য (ইহা অসত্য হইলেও) সত্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি ইহা জানেন, অসত্য তাঁহাকে হিংসা করিতে পারে না। (মহেশচন্দ্র ঘোষ, বেদান্তরত্ন)

তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতিয়মিতি, তদ্ যৎ সত্তদমৃতমথ যত্তি-তন্মার্ত্ত্যমথ যদ্ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্বা এবং বিৎ স্বর্গং লোকমেতি।”

বঙ্গানুবাদ :—(সত্যম্ এই শব্দের) তিনটি অক্ষর—সৎ (বা ‘স’) তি, যম্। এই যে সৎ অক্ষর, ইহা অমৃত। আর যে ‘তি’ অক্ষর তাহা মর্ত্ত্য। যম্ অক্ষর দ্বারা এই উভয়কে (অর্থাৎ ‘সৎ’ ও ‘তি’ কে অথবা অমৃত ও মর্ত্ত্যকে) নিয়মিত করা হয়। যেহেতু ইহা দ্বারা এতদুভয়কে নিয়মিত করা হয়, সেই জন্য ইহার নাম ‘যম্’। যিনি ইহা জানেন, তিনি অহরহঃ স্বর্গলোকে গমন করেন।

(মহেশচন্দ্র ঘোষ, বেদান্তরত্ন)

“তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চত্যচ্চাভবৎ। নিরুক্তঞ্চা-নিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ। বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে।

বঙ্গানুবাদ :—(ব্রহ্ম) তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সৎ ও ত্যৎ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত হইলেন, সবিশেষ ও নির্বিশেষ, আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন, সত্য ও অসত্য যাহা কিছু আছে, সত্য স্বরূপ ব্রহ্ম তৎসমুদায় হইলেন, সেইজন্য ব্রহ্মকে সত্য বলে।

(সীতানাথ তত্ত্বভূষণ)

ইহাতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে স্বয়ং নিত্য সত্য ব্রহ্ম এবং মৃত্যুশীল জাগতিক পদার্থ সমূহ সত্য শব্দের অন্তর্ভুক্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৫।৫।২ মন্ত্রে সুস্পষ্ট ভাবে আদিত্যকেও (জড় সূর্য্যকেও) সত্য বলা হইয়াছে। মায়াবাদ যখন উপনিষদকে অভ্রান্ত শাস্ত্র মনে করেন এবং সেই দর্শনকে উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া থাকেন, তখন প্রামাণ্য তিনখানি শ্রেষ্ঠ উপনিষদের সত্য শব্দের প্রোক্ত অর্থ গ্রহণ না করিয়া মায়াবাদ নিজকৃত ব্যাখ্যা অর্থাৎ যাহা ত্রিকালে অবাধিত সত্য, তাহাই একমাত্র সত্য, অন্য সমুদায় মিথ্যা, এরূপ ব্যাখ্যা কেন অবলম্বন করিলেন? আমারাও বলি যে ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য সত্য, কিন্তু তাঁহারই উপাদানত্বে যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকেও আমরা সত্য বলিতে বাধ্য। ইহার অন্যথা যে করা যায় না, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। যে হেতু জাগতিক পদার্থ মাত্রেরই উপাদান আছে, যেহেতু সেই উপাদানের আদি কারণ বা আদি উপাদান সত্য স্বরূপ ব্রহ্মই এবং যেহেতু জাগতিক পদার্থের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সেই হেতুই জগৎ সত্য। রজ্জু-সর্পের উপাদান নাই। কেহই যুক্তিযুক্ত ভাবে বলিতে

পারিবেন না যে রজ্জুই রজ্জু-সর্পের উপাদান। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে ব্যোম ভিন্ন অন্য কোনও জড় পদার্থ হইতে কিছু উৎপন্ন হইলে উহা সর্ব্বক্ষেত্রেই বিকৃত হয়। অর্থাৎ উপাদান উৎপন্নে পরিণত হইলে উহা বিকৃত হয়। কিন্তু সর্পের উৎপত্তির জন্য রজ্জুর কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। সুতরাং রজ্জু সর্প কোনই জড় পদার্থ নহে এবং রজ্জু উহার উপাদানও নহে। উপাদান শব্দের অর্থ চিন্তা করিলেও রজ্জুকে সর্পের উপাদান বলা চলে না। সূত্র বস্ত্রের উপাদান। Aristotle বলেন যে কাষ্ঠ নৌকার উপাদান সুতরাং রজ্জুকে কিছুতেই তথাকথিত সর্পের উপাদান বলা যাইতে পারে না। মায়াবাদী ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু উহার প্রধান দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা খণ্ডন করা হইল।

রজ্জু-সর্পের সাময়িক অস্তিত্বও নাই। কারণ, যাহা দেখা যায়, তাহা ভ্রম মাত্র, কোন পদার্থই নহে। মিথ্যা জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না। মিথ্যা অস্তিত্বকেও অস্তিত্ব বলা যায় না। ভ্রমের বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে ভ্রান্ত পদার্থ (যদি উহাকে আলোচনার জন্য একান্তই পদার্থ বলিতে হয়) সম্বন্ধে তথাকথিত জ্ঞান সত্য জ্ঞান নহে। মিথ্যা জ্ঞান জ্ঞান নহে। সুতরাং উহার তথাকথিত সাময়িক অস্তিত্বও সত্য নহে। মিথ্যা অস্তিত্ব মুহূর্ত্তের জন্যও সত্য হইতে পারে না। জ্ঞানের অনুসরণে ইহাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য যে আমরা যেন সত্য জ্ঞান এবং মনঃকল্পিত (Imaginary and illusory) জ্ঞানকে এক পর্য্যায় ভুক্ত মনে না করি। অতএব জাগতিক নামরূপ কখনও স্বাধীন ভাবে ছিল না বা থাকিতেও পারে নাই। অতএব জাগতিক নামরূপ কখনও উপাদান বর্জ্জিত ভাবে নাই। সুতরাং উপাদানসহ নামরূপের অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সত্য। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে শঙ্কর মতে জগতের উপাদান ব্রহ্মই। সুতরাং জাগতিক পদার্থ সমূহ সত্য। যে পদার্থের উপাদান ব্রহ্ম, তাহা যে মিথ্যা হইতে পারে না, ইহা সহজ বোধ্য।

মায়াবাদ কল্পবাদ স্বীকার করেন। কল্পবাদ অনুযায়ী জগৎ নিত্য। বলা হয় যে কল্পান্তে জগৎ ব্রহ্মে সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান থাকে এবং কল্পান্তে পুনঃ বিকশিত হয়। সুতরাং সমষ্টি জগতের (universe as a whole এর) কখনই নিরন্বয় ধ্বংস হয় না। উহা কল্পের পর কল্পক্রমে অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং অনন্তকাল চলিবে। সুতরাং উহাও নিত্য সত্য। জগতের যে পরিবর্ত্তন, তাহা উপরি উপরি মাত্র। মূলগত (fundamental) কোনই পরিবর্ত্তন নাই। আধুনিক বিজ্ঞানও বলেন যে Matter and Energy এর হ্রাস বৃদ্ধি নাই, আকারের মাত্র পরিবর্ত্তন হয়। আবার জাগতিক পদার্থ যে অবস্থায়ই থাকুক্ না কেন, উহার

কোন না কোন আকার থাকিবেই। সুতরাং মূলগত ভাবে আকারেরও কোনই পরিবর্ত্তন হয় না। উহা একটি আকার পরিত্যাগ করিয়া অন্য আকার ধারণ করে মাত্র, কিন্তু উহার কোনও না কোনও আকার থাকিবেই। অর্থাৎ আকারও চিরস্থায়ী। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে। "সত্য দর্শনানুমত সৃষ্টিতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে ইহার বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। উহা ইতিপূর্ব্বে দর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা হউক্, কল্পবাদ অনুযায়ী দেখা গেল যে জগতের ধ্বংস নাই, উহা নিত্য স্থায়ী। সুতরাং জগৎ ও ত্রিকালে অবাধিত সত্য হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং মায়াবাদের সংজ্ঞানুযায়ী জগৎও সত্য হইতে বাধ্য।

বহু দার্শনিক মতবাদ আছে, যাহা জগৎকে অনাদিঅনন্ত বলে। মায়াবাদেও সেই মত গৃহীত হইয়াছে। যদি বলেন যে উহা ব্যবহারিক ভাবে মাত্র সত্য, তবে বলিতে হয় যে যাহা অনাদি অনন্ত, তাহা নিত্য সত্য। জগৎ নিত্য না বলিয়াই উহাকে মায়াবাদে ব্যবহারিক সত্য বলা হয়। কিন্তু উহা যখন অনাদিঅনন্ত, সুতরাং নিত্য সত্য, তখন 'সত্য' শব্দের পূর্ব্বে "ব্যবহারিক" বিশেষণ লোপ করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং এই ভাবেও জগৎ মায়াবাদ অনুযায়ী ত্রিকালে অবাধিত সত্য।

মায়াবাদ জগৎকে মিথ্যা বলেন। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। মায়াবশতঃ লোকে ব্রহ্মের স্থলে জগৎ দর্শন করে। মায়ার বিগমে সকলই ব্রহ্ম বলিয়া দৃষ্ট হয়। জগতে বহু মহাজন অবশ্যই ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে কেহই সাক্ষ্য দেন নাই যে মায়ার অপগমে জগৎ মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয় এবং একমাত্র ব্রহ্মই দৃষ্ট হন। প্রামাণ্য দ্বাদশ খানি উপনিষদে বহু বক্তা বহু সারবান তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদ কোথায়ও খুজিয়া পাওয়া যায় না। হিন্দুগণ উপনিষদের বক্তাগণকে ঋষি (ব্রহ্মদ্রষ্টা) বলেন। কিন্তু তাঁহারাও এইরূপ তত্ত্ব প্রকাশ করেন নাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি সমূহ মায়াবাদিগণ নিজ মত সমর্থনে পুনঃ পুনঃ উদ্ধার করেন। কিন্তু তিনি কোথায়ও বলেন নাই যে জগৎ মিথ্যা, মায়ার খেলা মাত্র। তাঁহার দ্বারা কথিত অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ ভেদাভেদ তত্ত্বই সমর্থন করেন। রামানুজাচার্য্য উক্ত অধ্যায়ের উপর নির্ভর করিয়াই স্বগতভেদ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যই মৈত্রেয়ীকে প্রকৃত প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই প্রেমতত্ত্ব ব্যাখানে জাগতিক পদার্থও বাদ পড়ে নাই। উহাদিগকে অবশ্যই তিনি সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতেন। নতুবা উহাদিগের প্রতি প্রেমের কোনই অর্থ থাকে না। তিনিই অন্য স্থলে ব্রহ্মকে পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, সকল হইতে প্রিয় বলিয়াছেন। এই

দুই স্থলের ব্যাখান দৃষ্টে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মকে তিনি প্রেম স্বরূপ এবং জগতকে সত্য বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ জাগতিক পদার্থের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে মহর্ষি আরুণি কর্ত্তৃক কথিত "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান"তত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায় যে তিনি জাগতিক নামরূপকে তুচ্ছ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি উহাদিগকে মিথ্যা বলেন নাই। আমরাও বলিবে ব্রহ্মের তুলনায় জাগতিক নামরূপ অতি তুচ্ছ বটে, কিন্তু সেইজন্য উহারা মিথ্যা হইতে পারে না। যে বস্তুকে আমরা তুচ্ছ মনে করি, তাহাই মিথ্যা নহে। ইতি-পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে নামরূপের অবিচ্ছিন্ন উপাদান ব্রহ্মই, তাহা মিথ্যা হইতে পারে না। সুতরাং জাগতিক পদার্থ মিথ্যা নহে। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে মায়াবাদ 'তুচ্ছ' শব্দের অর্থ 'মিথ্যা' বলেন। ইহা যে সত্য নহে, তাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬।২।১-৩ মন্ত্রসমূহ হইতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়। উহাদিগেতে জগৎকে 'সৎ'ই বলা হইয়াছে। এই মন্ত্রত্রয়ের বক্তাও মহর্ষি আরুণিই।

কেহ কেহ দৃক্ ও দৃশ্য দ্বারা বুঝাইতে চাহেন যে দ্রষ্টা এবং দৃশ্য কখনই এক হইতে পারে না। দ্রষ্টা সত্য, সুতরাং দৃশ্য মিথ্যা। দুইটি সত্য হইতে পারে না। একটি সত্য হইবে সুতরাং দৃশ্য মিথ্যা। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে দৃশ্য দ্রষ্টা হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিভক্ত ভাবে বিভিন্ন নহে, কিন্তু দ্রষ্টা হইতে উৎপন্ন হইয়া উহা পৃথক্ (Distinct) ভাবে প্রতীয়মান হয়। যেমন তরঙ্গ সমুদ্র হইতে বিভক্ত না হইয়াও পৃথক্ (Distinct) ভাবে ভাসমান। এ স্থলে দ্রষ্টা বলিতে আমাদের বুঝিতে হইবে যে জীবাত্মা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। কিন্তু দেহযোগে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান। ব্রহ্ম যখন একমেবাদ্বিতীয়ম্, তখন তিনি ভিন্ন অন্য কিছুর বস্তু সত্তা নাই বা থাকিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও সেই তত্ত্বই প্রকাশিত হইয়াছে। সমুদ্র তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে পৃথক্ ভাবে প্রতীয়মান হইলেও সমুদ্রেরই অন্তর্গত, সেইরূপ জগৎও পৃথক্ ভাবে প্রতীয়মান হইলেও উহা ব্রহ্মেরই অন্তর্গত। সুতরাং উহা বিভক্ত নহে, কিন্তু উহা অন্তর্গত হইয়া ব্রহ্মে চির বর্ত্তমান। Hegelian Philosophy এর ভাষায় বলা যাইতে পারে যে জগৎ ব্রহ্মেরই Externalisation (বহিঃপ্রকাশ) মাত্র। সুতরাং দৃক ও দৃশ্য বিভক্ত ভাবে ভিন্ন নহেন। দৃক ও দৃশ্য যে এক প্রকারের তাহা তাঁহাদের কার্য্য দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়। উহারা পরস্পর পরস্পরের উপর কার্য্য করিতে পারে ও করে। উহারা এক প্রকারের না হইলে তাহা সম্ভব হইত

না। "Like alone can act upon Like" তত্ত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। দৃক ও দৃশ্যের একটি সত্য ও অন্যটি মিথ্যা হইলে উহারা পরস্পরের উপর কার্য্য করিতে পারিত না। সুতরাং দৃক ও দৃশ্য উভয়ই সত্য।

মায়াবাদ জগন্মিথ্যাবাদের সমর্থনে রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। রজ্জু-সর্প কোন জাগতিক পদার্থই নহে, উহা ভ্রম মাত্র। ইতি-পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে রজ্জু-সর্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান জ্ঞান নহে এবং উহার সাময়িক অস্তিত্বও অস্তিত্ব নহে। উহারা ভ্রম মাত্র, সুতরাং উহারা জ্ঞান ও অস্তিত্ব পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে "রজ্জু-সর্পের মিথ্যাত্ব" নামক প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। জগৎ সম্বন্ধীয় বিচারে জাগতিক পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ভ্রমের বিশ্লেষণে জগতের মিথ্যাত্ব বা সত্যত্ব প্রমাণিত হয় না বা হইতেও পারে না। কোন বৈজ্ঞানিক জলের ধর্ম জানিতে কাষ্ঠ খণ্ডের বিশ্লেষণ করে না। কেহই সন্দেশের আস্বাদন পরীক্ষা করিতে কুইনাইন বটিকা জিহ্বায় সংস্থাপন করে না। জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতে রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বোক্ত "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান" তত্ত্বের একান্ত বিরোধী। রজ্জু-সর্প ও জগৎ যে এক জাতীয় পদার্থ নহে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ রজ্জু-সর্প ভ্রম মাত্র। উহা জাগতিক পদার্থ হওয়া দূরে থাকুক, উহা কোন পদার্থই নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে রজ্জু-সর্পের কোনই উপাদান কারণ নাই। কিন্তু জগৎ এবং জাগতিক পদার্থ মাত্রেরই উপাদান আছে। উপাদান বিহীন পদার্থ জগতে নাই। জগতের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের বিচারে "এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান" তত্ত্ব অনুযায়ী যদি জাগতিক পদার্থের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা হইত, তবে জগৎ সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হইত। ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ মন্ত্রত্রয়ে উক্ত মৃৎপিণ্ড, সুবর্ণপিণ্ড ও নখকৃন্তন দ্বারা ক্রমান্বয় মৃন্ময়, সুবর্ণময় ও লৌহময় পদার্থ-সমুহ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায় বলা হইয়াছে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র একটি মৃৎপিণ্ডের পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত মৃত্তিকার বা সকল মৃন্ময় বস্তুর তত্ত্ব লাভ করা যায়। সেইরূপ জাগতিক কোন এক পদার্থের বিশ্লেষণ করিলে জগতের সত্য তত্ত্ব লাভ করা যায়। কিন্তু জগদতিরিক্ত মিথ্যার বিশ্লেষণ করিয়া কোন জ্ঞানই লাভ করা যায় না। পাঠক বিবেচনা করিবেন যে সম্পূর্ণ উপাদান বিহীন সুতরাং সম্পূর্ণ মিথ্যা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া জগৎকে মিথ্যা বলা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। এখন আমাদের প্রশ্ন হইবে যে জগতে অসংখ্য জাগতিক পদার্থ রহিয়াছে, তাহা ত্যাগ করিয়া মায়াবাদ কেন রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত দিলেন? ইহার কোন সদুত্তর নাই।

দার্শনিক বিচারে প্রত্যক্ষ প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। জগৎ আমরা সত্য ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। মায়াবাদও ইহাকে ব্যবহারিক ভাবে সত্যই বলেন। সুতরাং জগৎ সত্য। আমরা কখনও কখনও এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করি। তাহার কারণ এই যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ও মস্তিষ্ক অপটু (Defective)। আমরা সর্ব্ব ভাবেই অপূর্ণ অবস্থায় জগতে আসিয়াছি, আমাদের জ্ঞান লাভের যন্ত্র সমূহ অপূর্ণ ও অপটু। সুতরাং ভুল ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেইজন্য সকলেই সর্ব্বদা জগৎ ও জাগতিক পদার্থ সম্বন্ধে ভুল করিতেছে ও চিরকাল করিবে, ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে জাগতিক সকল কার্য্যই অচল হইত। মায়াবাদও রজ্জু-সর্পকে জাগতিক পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াই মিথ্যা বলেন। সুতরাং জগৎ অসত্য হয় কি প্রকারে? এই বিষয়টি পাশ্চাত্য দর্শনের Epistemology পর্য্যায় ভুক্ত অতি বৃহৎ বিষয়। এস্থলে ইহার বিস্তারিত আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু সত্য ভাবে যুক্তি, শ্রুতি ও বিজ্ঞান দ্বারা ইহা সুপ্রমাণিত হইতে পারে যে জগৎ সত্য।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে যে ঔপনিষদিক ঋষিগণের মধ্যে কেহই বলেন নাই যে জগৎমায়ার সৃষ্টি। বরং ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় খণ্ডের প্রথম মন্ত্রত্রয় দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে মায়া হইতে জগৎ সৃষ্ট হয় নাই এবং ব্রহ্মই ইহার সৃষ্টিকর্তা। এই মন্ত্রত্রয়কে মায়বাদ খণ্ডনের মন্ত্রও বলা যায়। কারণ, ইহারা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন যে জগৎ কিছু না হইতে উৎপন্ন হয় নাই ও হইতেও পারে না। মায়ায় সৃষ্টি বলাও যাহা, কিছু না হইতে সৃষ্টি বলাও তাহা। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বৌদ্ধ শূন্যবাদই মায়াবাদের জনক।

পঞ্চদশী মায়াবাদের একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ। ব্রহ্মজ্ঞানী সম্বন্ধে অর্থাৎ যিনি মায়ামুক্ত হইয়াছেন এবং একমাত্র ব্রহ্মই দর্শন করেন, কিন্তু জগৎকে জগৎভাবে দেখেন না, তাহার সম্বন্ধে উহা কি বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা হউক্।

"জিহ্রেতি ব্যবহর্ত্তুঞ্চ ভোক্তাহমিতি পূর্ব্ববৎ।
ছিন্ননাসইব হ্রীতঃ ক্লিশ্যন্নারব্ধমশ্নুতে॥" (৭—২২০)

বঙ্গানুবাদ :—পূর্ব্বোক্ত সেই জ্ঞানী (ব্রহ্মজ্ঞানী) পুরুষ তখন আপনাকে ভোক্তা বলিয়া ব্যবহার করিতেও ঘৃণাবোধ করেন। তবে কেবল ছিন্ননাসিক ব্যক্তির ন্যায় লজ্জারসহিত ক্লিষ্ট হইয়াও অগত্যা প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করেন মাত্র। (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন)

অতএব সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট জগৎ জগৎ

বলিয়াই বর্ত্তমান থাকে। কেবল তাহাই নহে। তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মেরও ফল অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোগ করেন এবং দ্বৈতভাব এবং বদ্ধভাব তাঁহাতে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। সুতরাং "ব্রহ্মজ্ঞানে মায়ার ধ্বংস হয় এবং সেইজন্য একমাত্র ব্রহ্মই দৃষ্ট হন, জগৎ শূন্য হইয়া যায়," এই উক্তি সত্য নহে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে কোনও ব্রহ্মদ্রষ্টা ঋষি এইরূপ ভাবে সাক্ষ্য দেন নাই। কোনও মায়াবাদী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও সাক্ষ্য দেন নাই যে মায়ার অপগমে জগৎ শূন্য হয়। অপর দিকে ব্রহ্মদ্রষ্টা পরমর্ষি গুরুনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সমস্তই ব্রহ্মময় দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রত্যেকটি ব্রহ্ম বলিয়া দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ডে নিখিল পদার্থের সত্তায় ব্রহ্ম সত্তা প্রতীয়মান হয়। মনে কর, তুমি ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থায় একটি নদী দর্শন করিতেছ। নদী পূর্ব্বেও যেমন দেখিয়াছ, এখনও সেইরূপই দেখিবে, অধিকন্তু প্রতীয়ান হইবে যে ব্রহ্ম উহাতে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত আছেন। সুতরাং অন্তরেও যেমন ব্রহ্ম দর্শন হইতেছে, বাহিরেও তদ্রূপ ব্রহ্ম দর্শন হওয়াতে তোমার মুক্তি লাভ হইল।"

তত্ত্বজ্ঞান সাধনা—১২৫ পৃঃ

অতএব ব্রহ্মদ্রষ্টার সাক্ষ্য বা শব্দ প্রমাণ দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম যে ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ মিথ্যা হইয়া যায় না। জড় জগৎ, জগৎই থাকে, উহার জগত্বের লোপ হয় না। প্রোক্ত নদীর জল জলই থাকে, উহার বিশ্লেষণে দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও এক ভাগ অক্সিজেন পাওয়া যাইবে। জল শূন্য নদী থাকে না। এস্থলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক আমাদের স্মরণে রাখিতে হইবে।

ময়াততমিদং সর্ব্বং জগদ্ব্যক্ত মূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ (৯।৪)

সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানাবস্থায় জগতে ওতপ্রোত ভাবে ব্রহ্ম দর্শন অযৌক্তিক নহে।

মায়াবাদ-সৃষ্টির প্রধান কারণ এই যে ব্রহ্মকে নির্বিকার ও অদ্বৈত রাখিতেই হইবে। পরিণামবাদে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না বলিয়া মায়াবাদ মনে করেন। মায়াও তজ্জাত বিবর্ত্তবাদ দাড় করিতে পারিলেই ব্রহ্মকে এক, অদ্বিতীয় ও নির্বিকার রক্ষা করা যাইতে পারে মনে করিয়াই মায়াবাদের সৃষ্টি। "সত্যদর্শনানুমত সৃষ্টিতত্ত্ব" প্রবন্ধে সুপ্রমাণিত হইয়াছে যে জগৎ ব্রহ্ম হইতেই আসিয়াছে, কিন্তু তাহাতে তিনি যেমন ছিলেন, তেমনি আছেন। তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই। মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়াও দেখা গিয়াছে যে জগৎ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ম দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে। সেই প্রবন্ধের সহিত ঔপনিষদিক সৃষ্টিতত্ত্বের কোনই বিরোধ নাই.

বরং ঐক্য বর্ত্তমান। মায়াবাদ দ্বারা স্বীকৃত তত্ত্ব যে ব্রহ্ম জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তাহাও উহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল কঠিন সমস্যার উহাতে সরল, প্রাঞ্জল ও সুমীমাংসা বর্ত্তমান।

অতএব আমরা মায়াবাদেরই স্বীকৃতি ও নানাবিধ উক্তির বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে জগৎ মিথ্যা নহে। জগন্মিথ্যাবাদের বিরুদ্ধে আরও বহু যুক্তি প্রদর্শন করা যায়, কিন্তু তাহা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উত্থাপন করা যায় না। আর আমাদের বিচার্য্য বিষয় ছিল যে মায়াবাদের স্বীকৃত বিষয় দ্বারা জগন্মিথ্যাবাদ খণ্ডিত হইতে পারে কি না। পাঠক বিবেচনা করিবেন যে সেই উদ্দেশ্য সাধনে আমরা কতদূর সফলকাম হইয়াছি।

ওঁ সত্যং সৃজন-পালন-কারণং ব্রহ্ম ওঁ

পুস্তক পরিচয়

সাংখ্য ও যোগ : শ্রীতারকচন্দ্র রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স : মূল্য চারি টাকা

আজকের দিনে আমরা দর্শন শব্দটি ব্যবহার করি, এবং বুঝেই করি যে দৃশ ধাতু হতে নিষ্পন্ন শব্দ রূপে ব্যবহার করছি না। কিন্তু এজন্য কোন আন্দোলন করার যে প্রয়োজন আছে তা নয়। Philosophyর পর্যায় শব্দরূপে 'দর্শন' শব্দটি ব্যবহার করা, কোন অন্যায় কাজ নয়। বরং এই নিয়ে অস্বস্তি অনুভব করা, ভ্রূ কুঞ্চিত করা, ভাষার কি দুর্দশাই না হয়েছে বলে বিলাপ করা অথবা ক্ষুব্ধ হওয়া ঠিক ন্যায়সঙ্গত নয়। প্রকৃতপক্ষে যখন আমরা philosophyর পর্যায় শব্দ খুঁজেছিলাম, philosophyকে অনূদিত করতে চেয়েছিলাম, তখন কোন আনকোড়া-নূতন শব্দ আমদানী না করে, একটি পুরাতন শব্দ যে নিয়েছিলাম, তার একটা অর্থ আছে। দর্শনের সঙ্গে philosophyর অনেক সাদৃশ্য আছে, এবং এই সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে philosophy অনূদন দর্শন-এর সাহায্যে করা যেতে পারে। তাই সাংখ্য দর্শন, অথবা ন্যায় দর্শন প্রভৃতিকে ঠিক পাশ্চাত্য দেশে যে অর্থে Plato অথবা Kant-এর philosophyকে philosophy বলা হয়, একেবারে হুবহু সেই অর্থে philosophy বলা না গেলেও, কিছুটা পরিবর্তিত অর্থে, কিছু নূতন অর্থে বলা যায়। সেইজন্য যখন আমরা আজকের দিনে বাংলা বা অন্য কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সাংখ্য, কি ন্যায়, কি বেদান্ত, কি অন্য কোন ভারতীয় দর্শনের বই পড়বার চেষ্টা করি, তখন আমাদের এই আশা, অথবা দাবী থাকে যে লেখক philosophy পরিবেশনের ভঙ্গীতে তাঁর আলোচ্য বিষয় পরিবেশন করবেন। অবশ্য, philosophy পরিবেশনের ভঙ্গী বলতে ঠিক কি বুঝতে হবে, এমন কোন প্রশ্ন যদি উত্থাপন করা হয় তাহলে আমরা কোন সদুত্তর দিয়ে উঠতে পারব না। কিন্তু সেজন্য একথা বলা খুবই অনুচিত হবে যে ঐরূপ কোন বিশিষ্ট, নির্দিষ্ট ভঙ্গী নাই। ঐ ভঙ্গী অবশ্যই আছে, তবে ভঙ্গীটি খুব সরল নয়, এক কথায় প্রকাশযোগ্য নয়, এমন কি বিচিত্র বর্ণের কোন একটি চিত্রের দ্বারা চিত্রণ যোগ্যও হয়ত নয়। তবু আমরা দেখলে চিনতে পারি। অন্ততঃ

তাঁরা পারেন, যাঁদের মনে এইরূপ চিনে নেবার উপযুক্ত সংস্কার উৎপন্ন হয়েছে! তাই একথা কি করে বলব, যে এইরূপ ভঙ্গী বলে কোন নির্দিষ্ট ভঙ্গী নাই। কোন গ্রন্থকে দর্শন গ্রন্থের আখ্যা পেতে চাইলে, এ ভঙ্গীতে অবশ্যই পরিবেশিত হতে হবে। গ্রন্থটি যদি গ্রন্থকারের নিজের দর্শনের প্রকাশক না হয়ে, অন্য কোন দার্শনিকের অথবা সম্প্রদায়ের দর্শনের প্রকাশক হয়, তা হলেও হতে হবে। কোন ইতিহাসই নিছক বিবরণ ধর্মী নয়, দর্শনের ইতিহাস আরও নয়। কোন দর্শনের পরিচয় কেবল মাত্র ঐ দর্শনের কয়েকটি সিদ্ধান্তের, অথবা কয়েকটি অতি পরিচিত ছকে আঁকা যুক্তির সাহায্যে দেওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে কোন দর্শনের উপযুক্ত ব্যাখ্যাতা ঐ দর্শনের স্রষ্টা স্বয়ং এবং তাঁরই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দার্শনিকেরা। একথা অবশ্য বিবক্ষিত নয় যে অন্য কেউ, ঐ দর্শনের আলোচনা করবেন না। তবে একথা অবশ্যই বিবক্ষিত যে যিনি আলোচনা করছেন, তিনি ঐ দর্শন সম্পর্কে নূতন আলোকপাত করবেন, নিজের আলোচনাকে দর্শনের স্তরে উন্নীত করে আলোচনা করবেন। দর্শন বিষয়ক আলোচনাই দর্শন আলোচনা নয়। দার্শনিক আলোচনা, যে বিশিষ্ট ভঙ্গীর কথা বলেছি, সেই ভঙ্গীতে আলোচনাই, দর্শন আলোচনা। কথাটি এতই সহজ ও সুপ্রসিদ্ধ যে তার উল্লেখই কারণ নির্দেশের অপেক্ষা রাখে, এবং এই কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে কেবল এইটুকুই বলব যে বর্তমানে বাংলায় অনেক দার্শনিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে যাদের দার্শনিক আখ্যা পাওয়ার একমাত্র দাবী বোধ হয় এই যে দর্শনের কথা তারা বলেছে। বিরক্তিকর উদ্ধৃতি, প্রসাদবর্জিত ভাষা, অনেক সময় গুরুর ভঙ্গীতে বলছি তাই মেনে নাও নীতির অনুসরণ, বিশ্লেষণ, বিচার প্রভৃতিকে সিকেয় তুলে রেখে, তোপ দাগা ন্যায়ে একের পর এক বাক্য, নামের পর নাম বলা—এক কথায় সম্পূর্ণরূপে অদার্শনিক রীতির অনুসরণ, এই সব গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাই তাদের আমরা দার্শনিক গ্রন্থের মর্যাদা দিতে পারি না। বাংলা ভাষার, দর্শনেরও, হিত কামনায় তার প্রতিবাদ না করে পারি না। আলোচ্য গ্রন্থ যে এই দোষ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত তা আমরা বলতে পারি না। তবে গুণযুক্ত না হলে সমালোচনা কার্যে আমরা প্রবৃত্ত হতাম না। যে জাতীয় বিচার, বিশ্লেষণ, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতির পরিচয় পেলে academic ব্যক্তিরা, অভিরূপেরা সন্তুষ্ট হতেন, তা এই গ্রন্থটিতে তেমন মেলে না। তবু তাঁদের এই গ্রন্থ হতাশ করে না। সাংখ্য দর্শনের ছাত্র মাত্রেরই একথা জানা আছে যে এমন বিশৃঙ্খল দর্শনের তুলনা বিরল। বিশৃঙ্খল বলতে unsystematic বুঝছি না। বুঝছি কেবল এই কথাটি যে এত বিভিন্ন প্রকার দর্শনকে সাংখ্য বলা হয় যে প্রকৃত সাংখ্য দর্শন কোনটি

তা হলফ. করে বলা যায় না। প্রকৃত পক্ষে দর্শন আলোচনা অনেক সময় ঐতিহাসিক আলোচনায় পরিণত হয় অথবা ঐতিহাসিক আলোচনা পূর্বক হয়ে থাকে একথা অন্য কোন দর্শনের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য না হলেও হতে পারে, কিন্তু সাংখ্য দর্শনের ক্ষেত্রে বটে। এই আলোচনা, অন্ততঃ পক্ষে এই আলোচনার উপাদান, সংক্ষেপে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করে গ্রন্থকার সাংখ্যের অনুরাগী পাঠকের অনেক উপকার করেছেন। যোগের সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। আর বৈশ্লেষিক আলোচনার অভাব সম্পর্কে উপরে যা বলা হয়েছে তাও কিঞ্চিৎ দ্রব করে গ্রহণ করতে হবে। দেশ, কাল, প্রমাণ, অভিব্যক্তি, মহৎ, (বিশেষ করে গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে এই তত্ত্বের তুলনা) প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা বিশেষ যত্ন সহকারে করা হয়েছে। উপরে যা বলেছি, তা অংশতঃ সত্য মাত্র। পাঠকেরা এই গ্রন্থের আদর করবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে, যদিও অনেক মুদ্রাকর প্রমাদ তাঁদের দৃষ্টি এড়াবে না। এবং উৎসর্গ পত্রে 'ভালবাসারনি দর্শন স্বরূপ' মুদ্রিত অংশটি হয়ত তাঁদের ভাবিয়ে তুলবে এ আবার কোন নূতন দর্শন নাকি!

কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নানা কারণে 'দর্শন' পত্রিকা এ পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে বাহির করা সম্ভব হয় নাই। ১৩৬৫ সাল প্রায় শেষ হইয়া ১৩৬৬ সাল আসিতে চলিল অথচ বর্ত্তমান সংখ্যা মাত্র ১৩৬২ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা। দর্শন পরিষদের কার্য্যকরী সমিতি স্থির করিয়াছেন যে পত্রিকার ১৩৬৩, ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ সালের সংখ্যাগুলি বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া ১৩৬৬ সালের বৈশাখ হইতে পত্রিকা বাহির করা হইবে। যাঁহারা ১৩৬২ সাল পর্য্যন্ত পত্রিকার চাঁদা দিয়াছেন তাঁহাদের পরবর্ত্তী দেয় (বা প্রদত্ত) চাঁদা ১৩৬৬ সালের চাঁদা বলিয়া গণ্য করা হইবে।

সম্প্রতি কাগজের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় আমরা পত্রিকার প্রতি সংখ্যার মূল্য ১।০ করিতে বাধ্য হইলাম। ১৩৬৬ সাল হইতে এই দামে দর্শন পত্রিকা পাওয়া যাইবে।

আশা করি আমরা পরিষদের সভ্য ও পত্রিকার গ্রাহকদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না। তাঁহাদের সক্রিয় সহানুভূতি পাইলে এখন হইতে আমরা নিয়মিতভাবে পত্রিকা বাহির করিতে পারিব ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কর্ম্মাধ্যক্ষ
বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১।০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্
২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

PUBLISHED BY K. C. GUPTA, M. A. FROM 20-2, HALDAR BAGAN LANE,
CALCUTTA AND PRINTED BY SRI RAMRANJAN DAS,
SRI HARI ART PRESS, [illegible]
CALCUTTA-6.
[illegible]

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] মাঘ [১৩৬২ সাল

মূল্য ১।০ বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] মাঘ [১৩৬২ সাল

সূচীপত্র

১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]　　দর্শন　　[মাঘ ১৩৬২ সাল

দার্শনিকের জীবনধারা

।সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম.এ, পি-এচ্. ডি

দর্শন ও দার্শনিকের জীবন সম্বন্ধে প্রায়শঃ অনেক ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। এ সব ধারণা কেবল অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে, পরন্তু শিক্ষিত জনসমাজেও উহাদের প্রসার আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে দর্শন কতিপয় বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তির কল্পনাবিলাস মাত্র এবং দর্শনচর্চা একটি অনাবশ্যক ও অনর্থক ক্রীড়ার সমতুল্য অথবা কয়েকজন অকর্মা লোকের সময় কাটানর উপায় মাত্র। দার্শনিকের জীবনধারা সম্বন্ধেও লোকের মনে দুই রকম ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। অনেকে ভাবেন যে দার্শনিকত এক জগৎ-ছাড়া লোক। তিনি পরমার্থ চিন্তায়, জ্ঞান-বিচারে দিনরাত কাটান, বাস্তব জীবনের সংগে তাঁর কোন সম্পর্ক নাই এবং সংসার ও মানব সমাজের কোন কাজে বা চিন্তায় তিনি তাঁহার সময় ও শক্তির অপব্যয় করেন না। আবার অপর দিকে অনেকে, এমন কি কোন কোন দার্শনিকও, মনে করেন যে দার্শনিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই বা থাকা উচিত নয়। একজন সাধারণ সংসারী লোক যেমন বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের সহিত জড়িত থাকেন এবং সত্য-মিথ্যা ধর্মাধর্ম বিচার না করিয়া জীবনে আর্থিক ও ঐহিক উন্নতির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেন, সেইরূপ দার্শনিকও সংসারের সব বিষয়ে মন দিবেন, সাংসারিক ও ঐহিক উন্নতির জন্য সব চেষ্টা করিবেন, তবে তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা করিবেন এবং জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা মতবাদ পোষণ করিবেন বা জ্ঞানবিচারে পারদর্শী হইবেন।

এ সব ধারণাই ভ্রান্ত এবং সেগুলি নিরসন করা আবশ্যক। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে দর্শন ও দার্শনিকের জীবনধারা সম্পর্কে যে সব ভুল ধারণা দেখা যায় তাহার জন্য দার্শনিকরা কতকটা দায়ী। কারণ কোন কোন দার্শনিকের মতে দর্শনশাস্ত্র শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান বিচারেই নিবদ্ধ থাকিবে এবং তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে

জীবজগৎ সম্বন্ধে কোন একটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবে। তাঁহাদের মতে দর্শনে মানুষের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের সমস্যাগুলির বিচারের স্থান নাই এবং মানুষের নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা সমাধানের কোন প্রয়াস যুক্তিযুক্ত নহে। দার্শনিক সাংসারিক ও জাগতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হইবেন এবং পরমতত্ত্ব ও পরমার্থ চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিবেন। অপরপক্ষে অবার কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, দর্শন শাস্ত্র সর্ব বিজ্ঞানের সমষ্টি বা সমন্বয় মাত্র এবং দার্শনিক সব বিষয়েই বিচার বিশ্লেষণ করিয়া সব সমস্যারই সমাধান করিতে পারেন। আবার দার্শনিকদের মধ্যে কাহারও কাহারও জীবন ও কর্মধারা সাধারণ সংসারী লোকের জীবন প্রণালী হইতে বিশেষভাবে বা একেবারেই ভিন্ন নহে। অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে কোন কোন দার্শনিক অতি অ দার্শনিক জীবন যাপন করেন।

দর্শন মানবের কল্পনাবিলাস বা ক্রীড়ার আনন্দোচ্ছাস মাত্র নহে। উহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ও প্রকৃতিগত মনোবৃত্তি। মানুষ দেহেন্দ্রিয়-বিশিষ্ট শরীর মাত্র নহে। তাহার বাহ্যতঃ জড় দেহের মধ্যে মন ও চিন্ময় আত্মা অবস্থিত। এজন্য মানুষকে দেহবিশিষ্ট ও বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন চেতন প্রাণী বলিতে হইবে। মানুষের বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার (thought and reason) স্বভাব এরূপ যে সে সব বিষয়ে জ্ঞান-লাভ করিতে চায়। এ জ্ঞানপিপাসা মানুষের চিরসাথী, কিন্তু যেন চির অতৃপ্ত। ইহা মিটাইবার জন্য মানুষ জীবজগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টা হইতে মানুষের বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শনের উৎপত্তি হয়। মানুষ যখন তাহার ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মূলে এবং বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার সাহায্যে জীবজগৎ ও ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা করে তখন এক প্রকার দর্শনের উৎপত্তি হয়। তাহাকে কেহ প্রাকৃত দর্শন (Natural Philosophy), কেহ প্রত্যক্ষমূলক দর্শন (Empirical Philosophy), কেহ বৈজ্ঞানিক দর্শন (Scientific Philosophy), কেহ দৃষ্টিবাদী দর্শন (Positivist Philosophy), কেহ বাস্তব দর্শন (Realistic Philosophy), আবার কেহ শুদ্ধ দর্শন (Philosophy) আখ্যা দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ দর্শনই এই প্রকার দর্শনের অন্তর্গত। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে বৌদ্ধ, জৈন, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন শাখাকে এ প্রকার দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

দর্শনের উৎপত্তির আর একটি মূল হইতেছে মানুষের আধ্যাত্মিক অনুভূতি। মানুষের যেমন দেহ ও বহিরিন্দ্রিয় আছে, তেমন তাহার মন বা অন্তঃকরণ এবং

চৈতন্যময় বা চেতন আত্মাও আছে। এজন্য সব মানুষেরই কিছু না কিছু আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি আছে। অনুকূল অবস্থায় এ অনুভূতি পরিস্ফুট হয়, আবার প্রতিকূল পরিবেশে উহা ক্লিষ্ট বা প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। ধ্যান, ধারণা ও সাধনা দ্বারা কাহার কাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকর্ষ লাভ করে। এরূপ প্রকৃষ্ট আধ্যাত্মিক অনুভূতির মূলে বা ভিত্তিতে তাঁহারা পরমার্থ তত্ত্ব ও জীবজগৎ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আর এক প্রকার দার্শনিক মতবাদ রচনা করেন। এরূপ দর্শনকে আধ্যাত্মিক দর্শন (Spiritualistic Philosophy বা Idealistic Philosophy) বলা যায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন এইভাবে রচিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় দর্শনকে এই জাতীয় দর্শন বলা যায়। কিন্তু অনেক স্থলেই ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনের মূলে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ (sense experience) ও অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি (supersensuous or spiritual experience) বিদ্যমান আছে মনে হয় এবং এতদুভয়ের বিচার-বিশ্লেষণ হইতে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। দৃষ্টান্তরূপে ভারতীয় সাংখ্য-যোগ প্রভৃতি সব আস্তিক দর্শনের, এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি দর্শনের নাম উল্লেখ করা যায়। অপর পক্ষে পাশ্চাত্য দেশের দর্শনের মধ্যে প্লেটো, আরিষ্টটল, প্লোটিনাস, স্পিনোজা, হেগেল, ব্রাডলি প্রমুখ চিন্তানায়কদের দর্শনকে, এমন কি হোয়াইটহেড ও এক্সিস্‌টেনসালিষ্টদের (Existentialists) দর্শনকেও এই প্রকার দর্শনের দৃষ্টান্ত-স্থল বলিতে পারা যায়।

মানুষের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং বিচার-বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা হইতে দর্শনের উৎপত্তি হইলে উহাকে আমাদের কল্পনা-বিলাস এবং দর্শন চর্চাকে অনাবশ্যক ক্রীড়ামোদ বলা চলে না। মানুষের বিচার-বুদ্ধিই মানুষকে মনুষ্যেতর প্রাণী হইতে পৃথক করিয়াছে। একেবারে বিচারবুদ্ধিহীন লোককে মানুষ বলা যায় না এবং মানুষ বলাও হয় না। কাহারও মধ্যে প্রজ্ঞা বা বিচার-বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখিলে তাহাকে আমরা 'মানুষের মত মানুষ' বলি, আবার বিচার-বুদ্ধির অল্পতাহেতু কাহাকেও 'মানুষের মত মানুষ নয়' বলি। তারপর ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম ও কর্ম। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ যে মানুষের সহজ ও অপরিহার্য ব্যাপার সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক অনুভূতি যে মানুষের সেইরূপ একটি সহজ ও স্বাভাবিক কর্ম সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ থাকিতে পারে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে একথা সত্য। আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলিতে কোন দূরস্থ, দুষ্প্রাপ্য ও দুরধিগম্য

বাহ্য বস্তুর অনুভূতি বুঝি না। এরূপ মনে করিলে আধ্যাত্মিক অনুভূতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে এবং উহা অস্বীকার করা অসঙ্গত হইবে না। আধ্যাত্মিক অনুভূতি বলিতে আমি মানুষের নিজ আত্মার অনুভূতিই বুঝি। সকল মানুষেরই স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে দেহেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আত্মার অনুভূতি আছে। 'আমি নাই' বা 'আমার অস্তিত্ব নাই' একথা বড় কেহ বলে না। যদি কখন কেহ এক সর্বগ্রাসী সন্দেহের আশ্রয় লইয়া বলেন যে, "আমার নিজ আত্মাকেও আমি সন্দেহ করি' তবে বলিব যে, 'আপনি আত্মাকে স্বীকার করিয়াই সন্দেহ করিতেছেন বা সন্দেহ করিতে পারেন'। পাশ্চাত্য দার্শনিক মহামতি ডেকার্টের দর্শন পাঠ করিলে একথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। অতএব বলিতে হয় যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, যাহা আত্মানুভূতিরই নামান্তর, সব মানুষেরই অল্পবিস্তর আছে এবং চিরকালই থাকিবে। যদি তাহাই হয় তবে দর্শন বাহ্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের ভিত্তিতেই স্থাপিত হউক বা আন্তর আধ্যাত্মিক অনুভূতিমূলকই হউক তাহাকে আলেয়ার অনুসন্ধানের মত নিরর্থক ও নিন্দনীয় বস্তু বলা সমীচীন হইবে না। পরন্তু দর্শন যে মানুষমাত্রের অপরিহার্য্য বৃত্তি ও নিত্য সহচর তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দর্শন ব্যতীত কোন মানুষেরই জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। ভাল হউক, মন্দ হউক জীবজগৎ ও নিজ আত্মা বা জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা লইয়াই মানুষকে জীবনে চলিতে হয় এবং এই ধারণাই তাহার দর্শন। অবশ্য এ ধারণাকে একটি দার্শনিক মতবাদ বলিয়া সকলেই গ্রহণ করিবেন অথবা সে বিষয়ে সচেতন থাকিবেন এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু সচেতন হউক বা নাই হউক, যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থন করা হউক বা নাই হউক, প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তি একটা না একটা দার্শনিক মত পোষণ করেন এবং তদনুসারে নিজ জীবনে চলিয়া থাকেন। যদি কেহ বলেন যে দার্শনিক তত্ত্ব বা সত্য বলিয়া কিছু নাই, দর্শন শাস্ত্র সর্বৈব মিথ্যা ও আত্মপ্রবঞ্চনামাত্র তবে তাঁহাকে বলিব যে আপনার মতও একটি দার্শনিক মত এবং উহাকে দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক দর্শন, জড়বাদ, অজ্ঞেয়বাদ, সন্দেহবাদ, দৃষ্টবাদ প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এখন দার্শনিকের জীবনধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি যে এ বিষয়ে দুইটি বিপরীত ও অত্যুগ্র মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতে দার্শনিকের জীবন সাধারণ সাংসারিক মানুষের মতই হইবে। তিনিও বিষয়ী লোকের মত সংসারাসক্ত ও স্বার্থান্বেষী হইবেন এবং নির্বিচারে ভোগ-সুখ লাভের চেষ্টা করিবেন। অপর মতে দার্শনিক বিষয়বিরাগী ও সংসারত্যাগী পুরুষ হইবেন।

তিনি সংসারের কোন বিষয়েই মন দিবেন না, একান্তে পরমার্থ চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তাই করিবেন না এবং অন্য লোকের, সমাজের বা সংসারের কোন হিত বা অহিত কর্মে লিপ্ত থাকিবেন না।

আমার মনে হয় এই দুইটি পরস্পরবিরোধী মতই চরমপন্থী বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য। অবশ্য একথা স্বীকার করি যে এই দুই মতই জগতে বা লোকসমাজে প্রচলিত আছে এবং বিভিন্ন লোক ও সম্প্রদায় কর্তৃক গৃহীত, সমাদৃত ও জীবনে অনুসৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

সাধারণতঃ দার্শনিকের জীবনধারায় তাঁহার দার্শনিক মত প্রতিফলিত ও অনুসৃত হইয়া থাকে। অতএব দার্শনিক চিন্তার ও তত্ত্বোপলব্ধির বিভিন্ন স্তর অনুসারে দার্শনিক জীবনধারারও বিভিন্ন মান ও স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ দার্শনিক চিন্তা ও জীবনধারার পার্থক্য হইতেই বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ভারতীয় দর্শন পাঠ করিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধ হইবে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনগুলি কেবল দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ (system) বলিয়াই পরিচিত নয়। অধিকাংশ দর্শন মতের মূলে এক একটি দার্শনিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখনও ভারতে বেদান্ত সম্প্রদায়, সাংখ্য সম্প্রদায়, যোগ সম্প্রদায় বিদ্যমান আছে। আবার বেদান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়, যথা— অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত ইত্যাদি। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসেও আমরা বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ ও সম্প্রদায় দেখিতে পাই, যদিচ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের মত সেগুলি তত স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত নহে। তাহার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে পাশ্চাত্যে দর্শনের সহিত জীবনের সম্বন্ধ তত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় নহে। আরও এক কারণ হইতেছে যে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদ ও উহাদের সমালোচনা, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ইত্যাদি লইয়াই পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনের মত কয়েকজন মহর্ষি দার্শনিকের সূত্রাকারের গ্রথিত ও প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মতবাদের ভাষ্য ও ব্যাখ্যামূলে উহার অগ্রগতি ঘটে নাই এবং সেগুলিকে অকাট্য ও অনবদ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া পরবর্তীকালের একাধিক দার্শনিক জীবনে তাহা অনুসরণ করেন নাই। তথাপি আমরা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের Platonist, Aristotelian, Kantian, Hegelian, Marxist প্রভৃতি নামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি, কারণ তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তাধারা ভিন্ন এবং জীবনধারাও তদনুসারে কতকটা ভিন্ন হইবে।

পূর্বে দার্শনিকের জীবনধারা সম্বন্ধে যে দুইটি মতের উল্লেখ করিয়াছি

তাহাদের মূলেও দুইটি বিভিন্ন দার্শনিক মত বা চিন্তাধারা আছে। সাধারণভাবে একটিকে জড়বাদ এবং অপরটিকে আধ্যাত্মবাদ (materialism and spiritualism) বলা যায়। প্রথমটির মতে জড় বা অচেতন পদার্থ বা প্রকৃতি হইতে সমুদয় জাগতিক দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। অচেতন মৃৎপাষাণাদি, বৃক্ষলতাদি, জীবদেহ, মানুষের সচেতন মন এবং আত্মাও জড় প্রকৃতির কার্য বা ক্রমপরিণতির ফলমাত্র। দেহাতিরিক্ত এবং দেহাসম্বন্ধ আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, চেতন দেহই আত্মা, দেহের বিনাশেই আত্মার বিনাশ হয়। অতএব পরলোক, পাপপুণ্য, অদৃষ্ট, কর্মফল ও ঈশ্বর প্রভৃতি সত্য বা সৎ পদার্থ নহে। 'যেন তেন প্রকারেণ' সুখভোগই মানুষের একমাত্র কাম্য বস্তু এবং পরম পুরুষার্থ। এরূপ দার্শনিক মতবাদ হইতে যে জীবনধারার প্রবর্তন হয় তাহাকে সুখবাদ (hedonism) বলা হয়। জড়বাদী দার্শনিকের জীবনধারা নির্বিচারে সুখান্বেষণের ও সুখভোগের প্রবৃত্তি ও প্রগতি।

কিন্তু জড়বাদ ও তদনুবর্তী সুখবাদ বিচারসহ ও আদরণীয় বলিয়া মনে হয় না। জড়বাদ একাধিক ন্যায়াভাস দোষদুষ্ট দার্শনিক মত এবং সুখবাদ স্ববিরুদ্ধ ও আত্মঘাতী জীবন পথ। অতি অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও বর্বর ব্যক্তি বা জাতির নিকট উহা গ্রহণযোগ্য ও আদরণীয় হইবে। সভ্যতার আদিম যুগে, আদিম মনুষ্য জাতির জন্য, অথবা আধুনিক কালের দানব প্রকৃতির লোকের জন্য এরূপ দর্শনমত ও জীবন পথের বিধিব্যবস্থা করা যায়, কিন্তু তাহাতে তাহাদের কল্যাণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। বোধ হয় এই জন্যই আমাদের দেশে চার্বাক দর্শনের কোন ব্যাখ্যাকার বলিয়াছেন যে দেবগুরু বৃহস্পতি দৈত্যদের অকল্যাণ সাধন করিবার জন্যই এই মত তাহাদের মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় সব কালেই একরকম প্রকৃতির লোক থাকিবে যাহাদের জন্য চার্বাক মতই বিধেয় এবং তাহাতে তাহাদের প্রথমে অকল্যাণ হইলেও চরমে কল্যাণ হইবে। মানুষের সুখভোগের লালসা তৃপ্ত হইলেই সে ত্যাগের মহিমা বুঝিতে শিখিবে, প্রবৃত্তি মার্গে চলিয়া ক্লান্ত হইলেই মানুষ নিবৃত্তির পথে চলিতে শিখিবে।

পূর্বে উল্লিখিত দার্শনিক জীবনধারা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতের মূলেও একটি ভিন্ন প্রকার দার্শনিক মত বা চিন্তাধারা নিহিত আছে। ইহাকে আমরা অধ্যাত্মবাদ বলিয়াছি। সাধারণভাবে অধ্যাত্মবাদ মতে আত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জীবজগতের মূল তত্ত্ব বা পরমার্থ এবং তাহা হইতেই জীবজগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অর্থাৎ জগতের মূল কারণ ও উপাদান এক অদ্বিতীয় চেতন সত্তা, উহা জড় পদার্থ বা

অচেতন প্রকৃতি নহে। কিন্তু অধ্যাত্মবাদের বিভিন্ন রূপ বা প্রকার ভেদ আছে। ইহাদের মধ্যে অদ্বৈতবাদকে অনেকে দ্বিতীয় দার্শনিক জীবনধারার ভিত্তিরূপে পরিগণনা করেন। অবশ্য বৌদ্ধ দর্শনের অন্তর্গত মাধ্যমিকদের শূন্যবাদকেও এরূপ জীবনধারার ভিত্তি বলা হয়। কারণ অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মস্বরূপ ; আর শূন্যবাদ অনুসারে শূন্যই পরমার্থ, উহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎ উভয় নহে, আবার সৎও নয় অসৎও নয় এমনও নহে। যদি তাহাই হয় তবে জগৎকে মায়াময় ও মায়াসৃষ্ট অসত্য ও মিথ্যা বা শূন্য ও অপরমার্থ বলিতে হয়। অতএব তত্ত্বদর্শী দার্শনিকের এ সংসারের কোন বস্তুতেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত নহে, তিনি ইহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবেন, পরমার্থ চিন্তা ছাড়া জগৎ-সংসারের কোন বিষয়ই চিন্তা করিবেন না, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া বিজনে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিবেন। দার্শনিকের এরূপ জীবনধারাকে আমরা ত্যাগের, নিবৃত্তির নৈষ্কর্ম্যের বা সন্ন্যাসের পথ (asceticism) বলিয়া থাকি।

দার্শনিকের এই প্রকার জীবনও আদর্শ বা প্রকৃষ্ট বলিয়া মনে হয় না। যদি পূর্বোক্ত সুখবাদী জীবনধারায় মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তাকে অস্বীকার বা অবমাননা করা হয়, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনধারায় মানুষের আত্মাকে দ্বিখণ্ডিত, অবসাদিত ও সঙ্কুচিত করা হয়। শ্রীঅরবিন্দ উভয়কেই নেতিবাচক পথ (negative path) বলিয়াছেন। দুই নেতিবাচক দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে এরূপ নেতিবাচক ও নিষেধাত্মক পথ দুইটির সন্ধান পাওয়া যায়। জড়বাদে মানুষের আত্মার নিষেধ এবং কেবল দেহেন্দ্রিয়ের স্বীকৃতি থাকায় জড়বাদী দার্শনিকের জীবনে শুধু দেহসুখের অন্বেষণ ও আত্মতুষ্টির বিসর্জন করা হয়। তিনি শ্রেয় পথ ছাড়িয়া প্রেয় পথের অনুসরণ করেন, যেন কাঞ্চন ছাড়িয়া কাঁচ পাইবার জন্য ব্যাকুল হন। অপর দিকে কোন কোন বেদান্তীর মতে ব্রহ্মে জগৎপ্রপঞ্চ ত্রিকাল নিষিদ্ধ এবং আত্মা ত্রিকাল সিদ্ধ থাকায়, তাঁহারা প্রবৃত্তির পথ একেবারে ত্যাগ করিয়া নিবৃত্তির পথে বিচরণ করেন, সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়া নৈষ্কম্যসিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মে এই জগৎপপঞ্চ ত্রিকাল নিষিদ্ধ একথা মূল বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের কথা বলিয়া মনে হয় না। উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনায় সগুণ সবিশেষবাচক বাক্যও পাওয়া যায় আবার নির্গুণ ও নির্বিশেষ বাচক বাক্যও পাওয়া যায়। এই দুই প্রকার বাক্যকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা এবং সমমর্যাদা দেওয়া উচিত। কোন কোন অদ্বৈতবাদী এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী তাহা করেন নাই। অদ্বৈতীরা নির্গুণ ও নির্বিশেষ বাক্যের উপর জোর দিয়া অপর প্রকার বাক্যগুলির একটু অপব্যাখ্যা করিয়াছেন.

এবং দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা ঠিক তাহার বিপরীত কার্য করিয়াছেন। আমার মনে হয় ব্রহ্ম নির্গুণ-নির্বিশেষও বটেন, আবার সগুণ-সবিশেষও বটেন। আর এক কথা 'ব্রহ্ম এব ইদং বিশ্বম্', 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সত্য হইলে জগৎপ্রপঞ্চকে একেবারে অসৎ, মিথ্যা বা মায়ামরীচিকা বলা ঠিক হইবে না। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এবাক্য যেরূপ সত্য, 'যেন জাতানি ভূতানি' ইত্যাদি বাক্যও সেরূপ সত্য। এক প্রকার বাক্য সত্য, অপর প্রকার বাক্য অসত্য বা ব্যবহারিক, অথবা সব বাক্যই সগুণবাচক, কোন কোন বেদান্তীর এসব কথা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই, বোধ হয় তাঁহাদের নিজ নিজ অভিপ্রেত বা অভিলষিত দর্শনমতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শেষ কথা শঙ্করাচার্য প্রমুখ প্রাচীন অদ্বৈতবাদীরা জগৎ-সংসারকে পরমার্থ সৎ না বলিলেও অসৎ বা অলীক কল্পনামাত্র বলেন নাই এবং নিশ্চেষ্ট ও নিষ্কর্মা জীবন যাপনও করেন নাই, পরন্তু ভারতবাসীর তথা বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য বহু কর্ম করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছি যে সর্বকর্মত্যাগ ও জীবজগতের প্রতি অত্যুগ্র ঔদাসীন্য দার্শনিকের আদর্শ জীবনের লক্ষণ নহে। জগদ্‌বরেণ্য অদ্বৈত-বেদান্তী স্বামী বিবেকানন্দের কর্মময় জীবন তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

দার্শনিকের আদর্শ জীবনধারার কয়েকটি লক্ষণের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। দার্শনিক সর্বাগ্রে বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন হইবেন। নিত্যানিত্য সদসদ্ বস্তু এবং ন্যায়ান্যায় কর্ম বিচার করিয়া তিনি তাহাদের প্রতি যথোচিত আচরণ করিবেন। সত্যনিষ্ঠা দার্শনিক জীবনের পরম প্রয়োজন ও অমূল্য সম্পদ। দর্শন পরমার্থ সৎ বা সত্যের অনুক্ষণ অনুসন্ধান। যাঁহার জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত নহে তাঁহার পক্ষে পরম সত্যের জ্ঞান বা সাক্ষাৎকার সুদূরপরাহত। দার্শনিক সংযত-জীবন যাপন করিবেন। তিনি অহিংসা প্রভৃতি পঞ্চ মহাব্রত বা পঞ্চশীলের অনুশীলন করিবেন। দার্শনিক সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবেন। তিনি আত্ম-তুলনায় পরের সুখে সুখী হইবেন এবং পরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করিবেন। অন্যের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা বা অনিষ্ট চিন্তাও দার্শনিকের নিকট গর্হিত কর্ম বলিয়া বিবেচিত হইবে। দার্শনিকের স্থিতধী, আত্মপ্রতিষ্ঠ ও আত্মতুষ্ট হওয়া উচিত। তাঁহার বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মক হইবে এবং তিনি চিত্তপ্রসাদ লাভে সচেষ্ট হইবেন। নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও দার্শনিক তাহাতে নিমগ্ন বা নিমজ্জিত হইবেন না, তিনি সর্বদাই বিষয়াতিরিক্ত ও বিষয় কর্তৃক অসংস্পৃষ্ট আত্মার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা করিবেন। দার্শনিক জীবনে যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট হইবেন। তিনি

ভোগসুখের জন্য লালায়িত হইবেন না, যথাযোগ্য আয়াসলব্ধ এবং জীবন রক্ষার জন্য যথেষ্ট দ্রব্যসামগ্রী পাইলেই তাহার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ইন্দ্রিয়সুখে এবং ভোগৈশ্বর্যে অনাসক্তি আদর্শ দার্শনিক জীবনের একটি বিশেষ লক্ষণ। তিনি অনাসক্তভাবে সংসারের সকল কর্ম করিবেন এবং কর্মের ফলাফলের জন্য ব্যস্ত ব্যথিত বা উল্লসিত হইবেন না। জ্ঞানসাধনাই দার্শনিকের প্রধান কর্তব্য এবং তাহার সাধনরূপে তিনি অদাম্ভিত্ব, অমানিত্ব, ক্ষান্তি, সরলতা, চিত্তশুদ্ধি, স্থৈর্য, অনহঙ্কার, সাম্যভাব, আস্তিক্য বুদ্ধি, বিবিক্তদেশানুরাগ, চিত্তবিক্ষেপকারী পরিবেশ ত্যাগেচ্ছা, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা এবং তত্ত্বজ্ঞানালোচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুশীলন করিবেন। সর্বজীবের সেবা দার্শনিকের জীবনের ব্রত হইবে। তিনি সাধ্যমত দেশের ও দশের তথা বিশ্বমানবের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিবেন। আদর্শ দার্শনিকের জীবন-যজ্ঞের পবিত্র মন্ত্র হইবে :—

"নত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

নৈতিক বাক্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ

রমাপ্রসাদ দাস

১

আমাদের আলোচ্য বিষয় নৈতিক বাক্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ। প্রস্তাবিত বিশ্লেষণ কর্মে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে আলোচ্য বিষয়টি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করে নেবার দরকার কি বিশ্লেষণ করতে হবে, কি ভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। তার মানে প্রথমেই আলোচ্য-বিষয়বোধক নামের অন্তর্গত বিশ্লেষণ, বাক্য ও নৈতিক বাক্য এ শব্দ কয়টির তাৎপর্য আলোচনা প্রয়োজন।

মনে হয় আলোচ্য প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ বলতে বুঝতে হবে লক্ষণ নির্ণয় বা স্বরূপ উদ্ঘাটন। প্রকৃতপক্ষে এটা বিশ্লেষণের অর্থ নয়, বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে সম্ভবত তাকেই বিশ্লেষণ আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে এ বিশ্লেষণ হল যৌক্তিক বিশ্লেষণ, কোনো বা কোনো-প্রকারের বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধার, প্রদত্ত বাক্য বা বাক্য-প্রকারের উৎপাদক বা উপপাদিত বাক্য অনুসন্ধান। যৌক্তিক বিশ্লেষণ কথাটি আবার দ্ব্যর্থবোধক। যুক্তিবিজ্ঞানের ঔচিত্য-বোধক দিকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করলে মনে হতে পারে যে বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হল বিশ্লেষণীয় বাক্য যে অর্থে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত সে অর্থ আবিষ্কার। কিন্তু বিশ্লেষণ বলতে আমরা বর্তমানে বুঝছি বিশ্লেষণীয় বাক্য বস্তুত: যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সে অর্থ উদ্ধার। কারণ আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্লেষণের লক্ষ্য নৈতিক বাক্যের লক্ষণ নির্ণয় ও স্বরূপ উদ্ঘাটন; কি রকম বাক্যকে নৈতিক বাক্য আখ্যায় অভিহিত করা উচিত সে সম্বন্ধে কোনো নির্দেশনামা প্রচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ঔচিত্যবোধক বিশ্লেষণ সংস্কারকের কাজ, এক রকম নীতিশাস্ত্রের কাজ, সত্যানুসন্ধানীর কাজ নয়। তার মনে নৈতিক বাক্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে হলে নৈতিক বাক্যে কোনো ঔচিত্যবোধক বাক্যের ব্যবহার বর্জনীয়, ব্যবহার করতে হবে নির্দেশীবাক্য, নিছক বিবৃতিবোধক বাক্য। এমন কি যদি দেখা যায় যে নৈতিক বাক্য ও বিবৃতিবোধক বাক্যের মধ্যে, শ্রেয়জ্ঞাপক ও নির্দেশী বাক্যের

মধ্যে, বস্তুত কোনো ভেদ নেই তাহলেও আমরা নৈতিক বাক্য বিশ্লেষণে ঔচিত্য-বোধক বাক্য ব্যবহার থেকে বিরত থাকব। কারণ নীতিশাস্ত্রের আলোচনা কোনো নৈতিক কর্ম নয়, এক রকম বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া। যে দু রকম বিশ্লেষণের কথা বলা হল তাদের পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাধারণতঃ এদের বিভেদ অগ্রাহ্য করে ঔচিত্যবোধক বিশ্লেষণের ফলে কোনো বাক্যে উপনীত হলে পরে দাবী করা হয় যে বিশিষ্ট বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য এই; অথচ এরকম ক্ষেত্রে একমাত্র যুক্তিযুক্ত দাবী হতে পারত এই যে অমুক বা অমুক রকমের বাক্য এ রকম অর্থে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত, আমি এ প্রকার ব্যবহার অনুমোদন করি। সাম্প্রতিক বিশ্লেষণবাদী দার্শনিকরাও "সাধারণ ব্যবহার"-এর কথা বলে থাকেন। কিন্তু দেখা যায় যে অনেক সময়, যেমন লক্ষণবাক্যের লক্ষণ আলোচনায়, তাঁরা সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। যেমন মানুষের লক্ষণ কি, দর্শন কাকে বলে—এ জাতীয় লক্ষণ-প্রত্যাশী প্রশ্নের উত্তরে সাধারণতঃ বলা হয় যে মানুষ হল চিন্তাশীল প্রাণী, মানুষ হচ্ছে পক্ষহীন দ্বিপদ জন্তু, দর্শন হল……। কিন্তু অনেক বিশ্লেষণবাদী দার্শনিকের মতে ঐ লক্ষণবাক্যগুলির প্রকৃত বক্তব্য হল: মানুষ পদটির অর্থ হল চিন্তাশীল প্রাণী কথাটির যা অর্থ তাই, দর্শন পদটির অর্থ হল অমুক পদের যা অর্থ তাই। মানে এদের মতে লক্ষণ বাক্যের যৌক্তিক আকার হল "ক পদের অর্থ হল খ পদের যা অর্থ তাই"। এ রকম ভাষান্তর করণের পরামর্শ সৎ পরামর্শ হতে পারে, এর দ্বারা হয়ত অন্যকে বিশেষ কোনো মতে দীক্ষিত করা যায়, কিন্তু এটা আর যাই হোক আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্লেষণ নয়।

আমরা যা বলতে চেয়েছি তার মানে এই নয় যে বাক্যাকারের যাথার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা অসঙ্গত, অথবা কোনো বাক্যকে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বাক্যাকারে পরিবর্তন করা অযৌক্তিক। বস্তুতঃ যদি কোনো বাক্যবোধিত বিবৃতি অসঙ্গত বাক্যাকারে ব্যক্ত হয়ে থাকে তবে তাকে সঙ্গত বাক্যাকারে "অনুবাদ" করা বিশ্লেষণের কাজ। আমরা বলতে চেয়েছি যে বিশ্লেষণ করে বাক্যের যে অর্থ উদ্ধার করা হয় তার যাথার্থ্য বিচারের মানদণ্ড হল সাধারণ ব্যবহার। রাসেল্ সাধারণ ব্যবহারকে যতই বিদ্রূপ করুন না কেন, সাধারণ ব্যবহারকেই আমরা নৈতিক বাক্যের স্বরূপ বিশ্লেষণের যাথার্থ্যের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করলাম।

বাক্য কথাটি অনেকার্থবাচক। "বাক্য"-এর সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থ হল অর্থবহ পদসমষ্টি। কিন্তু বিবৃতি অর্থেও বাক্য ব্যবহার করা হয়। আবার বাক্য বলতে অনেক সময় বুঝি বিবৃতির শব্দসাংকেতিক বাহন। এখন, প্রস্তাবিত আলোচনা

প্রসঙ্গে "বাক্য" কোন অর্থে ব্যবহার করব? মনে হয় যে আমাদের আলোচনার বিষয়জ্ঞাপক নামে বাক্য কথাটি বিবৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমরা মুক্ত দৃষ্টি নিয়ে অগ্রসর হতে চাই, আলোচনা আরম্ভ করার পূর্বেই কোনো মতবাদ মেনে নিতে চাই না এজন্য "বাক্য"কে আমরা উক্ত সীমিত অর্থে ব্যবহার করা অসঙ্গত মনে করি। কেন না, এমন ত হতে পারে যে নৈতিক বাক্য প্রকৃতপক্ষে বিবৃতি বা বিবৃতিজ্ঞাপক বাক্য নয়। এজন্য বাক্য কথাটি আমরা এর ব্যাপকতম অর্থে ব্যবহার করব। এ অর্থে বাক্য ব্যবহারের দিক থেকে বাক্য নানা প্রকারের। একজন তো "বাক্যের নয় রকম ব্যবহার" এর কথা বলেছেন। অনেক সময় কেবল দু' প্রকার ব্যবহারের—নির্দেশী ও আবেগসঞ্চারী ব্যবহারের—বিভেদের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আমরা চার রকমের প্রাসঙ্গিক ব্যবহারের আর এ ব্যবহার ভেদে চার রকম বাক্যের কথা বলব। এ চার প্রকার বাক্য হল: অনুজ্ঞাবোধক, আবেগবহ, বিবৃতিজ্ঞাপক ও প্রস্তাবজ্ঞাপক বাক্য।

অনুজ্ঞাবোধক বাক্যে কোনো আদেশ, ইত্যাদি ব্যক্ত হয়। কিন্তু বাক্যের কোন বৈয়াকরণ আকার দেখে সব সময় বোঝা যায় না কোনো বাক্য অনুজ্ঞাবোধক কি অন্যবিধ। যেমন, ১৩ই মার্চ্চ বি.এ. পরীক্ষা আরম্ভ হবে প্রসঙ্গ বিশেষে এ বাক্য অনুজ্ঞাবোধক।

আবেগবহ বাক্যে বক্তাও পছন্দ, অপছন্দ, আবেগ অনুভব ইত্যাদি ব্যক্ত হয় এবং/অথবা শ্রোতাদের আবেগ সঞ্চার করে। কাব্যের ভাষা, রাজনীতিক নেতাদের বক্তৃতা, ভক্তের স্তব ও প্রেমিকের প্রেমগুঞ্জরণের ভাষা সাধারণতঃ আবেগবহ ও আবেগসঞ্চারী। এ জাতীয় বাক্যের কোনো আকারগত বৈশিষ্ট্য নেই। আর আবেগসঞ্চারী বাক্য যে বিবৃতিবোধক হতে পারে না তা নয়, বরং সাধারণতঃ যে বাক্য আবেগ বহন ও সঞ্চার করে সে বাক্যই যুগপৎ বিবৃতিবোধকও বটে।

যে বাক্য নির্দেশিত অর্থ বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করার যোগ্য, সত্য বা অসত্য বলে বিবেচিত হবার যোগ্য, সে বাক্যকে বলে বিবৃতিবোধক বাক্য। বলা বাহুল্য যে কোনো বাক্য বিবৃতিবোধক কি অন্যরূপ কেবল বাক্যাকার দেখে তা নির্ণয় করা যায় না। যেমন—"বাংলাদেশের সব চেয়ে নোংরা সহর দেখতে চাও ত কৃষ্ণনগর চলো"—বিবৃতিজ্ঞাপক, অনুজ্ঞাবোধক নয়। তারপর প্রসঙ্গ বিশেষে বিবৃতিবোধক বাক্যও আবেগসঞ্চারী বলে, আবার আবেগসঞ্চারী বাক্যও বিবৃতিবোধক বাক্য বলে, বিবেচিত হতে পারে।

প্রস্তাবজ্ঞাপক বাক্যে, কোনো প্রস্তাব ব্যক্ত হয়। এ জাতীয় বাক্যের বৈশিষ্ট্য হল এই যে এদের উদ্দেশ্যপদ সব সময় উত্তমপুরুষ একবচনে ও বাক্যের ক্রিয়াপদ বর্তমান কালে ব্যক্ত হয়। যেমন আমি প্রস্তাব করি, আমি প্রতিজ্ঞা করি, আমি অনুমোদন করি ইত্যাদি। কিন্তু আমি প্রস্তাব করেছিলাম, সে প্রস্তাব করে ইত্যাদি প্রস্তাবজ্ঞাপক নয়, বিবৃতিবোধক। প্রস্তাবজ্ঞাপক ও বিবৃতিবোধক বাক্যের পার্থক্য লক্ষনীয়। "আমি ক কাজটি অনুমোদন করি"- এ বাক্য আমার, আমার মানসিক অবস্থার বা ক-এর বর্ণনা নয়। আমি যখন বলি আমি প্রস্তাব করি তখন বস্তুত যে একটা ঘটনা ঘটে—আমার প্রস্তাবকরণ যে একটা ঘটনা—তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু "আমি প্রস্তাব করি"-এর দ্বারা সে ঘটনা বর্ণনা করা যায় না। কারণ এ বাক্য উচ্চারণ করার পূর্ব্বে সে ঘটনা ঘটতে পারে না, সুতরাং সে ঘটনা বর্ণনার প্রশ্নও উঠতে পারে না।

উপরের আলোচনা থেকে যে দুইটি সিদ্ধান্ত অনিবার্য্যভাবে নিঃসৃত হয় তা হল এই: প্রথমতঃ কোনো বাক্যের বৈয়াকরণ আকার তার যুক্তিসঙ্গত আকার নাও হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু উক্ত বাক্য বিভাগের ভিত্তি হল বাক্যের ব্যবহার এবং যেহেতু একই বাক্য যুগপৎ একাধিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে সেজন্য উক্ত শ্রেণীকরণের বিভিন্ন শ্রেণীগুলির সম্বন্ধ পূর্ণ বহির্ভুক্তির সম্বন্ধ নয়। বাক্য সম্বন্ধে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে নিলে আমাদের আলোচনার সুবিধা হবে। প্রত্যেক বাক্যের দু দিক: বাক্য কোনো মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তি, এবং বাক্য অর্থবহ। বাক্যের অর্থ ও বাক্য যে মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তি সে অবস্থা ভিন্ন জাতের। একটি মানসিক অবস্থা অন্যটি তার বিষয়। বাক্যে মানসিক অবস্থার অভিব্যক্তি হতে পারে কিন্তু বাক্য বিষয়বিষয়ক। হাসপাতালে গিয়ে যখন উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি, "ডাক্তারবাবু ও কেমন আছে, বাঁচবে তো?" তখন আমার উৎকণ্ঠা অভিব্যক্ত হয় সত্য কিন্তু উক্তিটি আমার মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত নয়, রোগীর শারীরিক কুশল সংক্রান্ত একটি জিজ্ঞাসা। যখন বলি "ক হল খ" তখন ক যে খ এ সত্য নির্দেশিত হয়, আর এ বাক্যে অভিব্যক্ত হয় আমার বিশ্বাস বা জ্ঞান, কিন্তু বাক্যটি আমার বিশ্বাস বা জ্ঞান বিষয়ক নয়।

বাক্য সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ এই যে নীতিবাক্যের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন যে নৈতিক বাক্য প্রকৃতপক্ষে অনুজ্ঞাবোধক, কারও কারও মতে নৈতিকবাক্য আবেগবহ বাক্য, কেউ কেউ আবার মনে করেন যে নৈতিক বাক্যের যৌক্তিক আকার হল প্রস্তাবজ্ঞাপক বাক্যাকার। আমরা দেখতে

চেষ্টা করব যে এ সব মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং মতবাদগুলির মূলে আছে অভিব্যক্তি ও বাক্যের অর্থের সম্বন্ধ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা, বা এদের বিভেদ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। আমরা আরও দেখাতে চেষ্টা করব যে প্রাত্যহিক জীবনে আমরা যে নৈতিক বাক্য ব্যবহার করি সে বাক্যাকার অসঙ্গত নয়।

নীতি কথাটি অনেকার্থবাচক হলেও নৈতিক পদটি আমরা মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করি। সাধারণতঃ আমরা যে সব নৈতিক বাক্য প্রয়োগ করি তার আকার হল : এটা করণীয়, এ কাজ সঙ্গত, এ কাজ অসঙ্গত, এ নিয়ম পালনীয়, এ কাজ ভাল, ও কাজ মন্দ ইত্যাদি। এ বাক্যাকারগুলি কিন্তু ঠিক এক জাতের নয়। বিধানজ্ঞাপক, ঔচিত্যবোধক ও শ্রেয়বাচক—এ তিনটি শ্রেণীতে এদের ভাগ করা যায়। যে বিধান অনুমোদন করা হয় তা যে সঙ্গত, অথবা তার ফল যে শ্রেয়প্রাপ্তি এমন কোনো ইঙ্গিত বিধানজ্ঞাপক বাক্যে আছে বলে মনে হয় না। ঔচিত্যবোধক বাক্য হল বিধানজ্ঞাপক বাক্যের সমর্থন প্রচেষ্টা। এ কাজ করণীয় কেন? কারণ এ কাজ সঙ্গত। এ প্রকারের নৈতিক বাক্যে যুক্তির প্রতিশ্রুতি আছে, কিন্তু যৌক্তিক সমর্থন নেই। আর শ্রেয়জ্ঞাপক বাক্যে ঔচিত্য-বোধক বাক্যের যাথার্থ্যের সমর্থনে বলা হয় যে এটা সঙ্গত কারণ এটা শ্রেয় বা শ্রেয় লাভের সহায়ক। উল্লিখিত নৈতিক বাক্যাকারগুলি যে সমার্থক নয় এ ভাবে তা দেখান যায়। আমরা বলি "ক কাজটি সঙ্গত"। কিন্তু এ কথা সব সময়ে বলা যায় না যে ক অবশ্য কর্তব্য। কারণ কোনো বিশেষ অবস্থায় ক ও খ যদি সমভাবে সঙ্গত বলে বিবেচিত হয় তাহলে বলা যায় না যে ক কর্তব্য, কারণ আমি খ কার্যটিও করতে পারি, আবার এও বলা যায় না যে খ অবশ্য কর্তব্য কারণ ক কাজ করেই আমি আমার নৈতিক কর্তব্য পালন করতে পারি। মানে এ কথা বলা যায় না যে সঙ্গত কাজ মাত্রই কর্তব্য। এও বলা যায় না যে শ্রেয়মাত্রই সঙ্গত, কারণ একই শ্রেয় লাভের একাধিক সঙ্গত পন্থা থাকতে পারে। তাহলে শ্রেয়মাত্রই সঙ্গত নয়, আর সঙ্গত কাজ মাত্রই অবশ্য কর্তব্য কাজ নয়। কিন্তু কর্তব্য মাত্রই সঙ্গত আর সঙ্গত কাজ মাত্রই শ্রেয়। অর্থাৎ, এদের পরিবর্তে যদি যথাক্রমে ক, খ ও গ প্রতীক ব্যবহার করি তাহলে বলতে পারি ক ধর্মের মধ্যে খ ও গ ধর্ম এবং খ-ধর্মের মধ্যে গ-ধর্ম নিহিত। তার মানে ক শ্রেণী খ-শ্রেণীর আর খ গ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত তিন প্রকারের নৈতিক বাক্যের মধ্যে যৌক্তিক অনুক্রম লক্ষ্য করলাম। এদের ঐতিহাসিক আনুপূর্বও লক্ষণীয়। মানুষের নৈতিক বোধের বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বিধানবাচক বাক্যই নৈতিক বাক্যের

প্রাথমিক রূপ। তারপর মানুষ যখন আরও যুক্তি প্রত্যাশী হল তখন দেখা দিল ঔচিত্যবোধক বাক্য, এবং সর্বশেষ পর্য্যায়ে দেখি শ্রেয়জ্ঞাপক বাক্য। এ বিবর্তনের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে মানুষের যুক্তি অনুগামিতার ইতিহাস। উক্ত পর্যায় তিনটির পৌর্বাপর্যের দ্বিতীয় তাৎপর্য হল মানুষের নৈতিক জীবনে অবশ্য করণীয়ের বন্ধন থেকে ক্রমমুক্তি। কারণ কোন শ্রেয়লাভের উপায় যদি সঙ্গত বলে বিবেচিত হয় তাহলে মানুষের অনুসরণীয় বিধানের বিকল্প বিধানও অনেক বেড়ে গেল। এর মানে নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে বিচারক-মানুষের সহনশীলতার ক্রমবৃদ্ধি। আলোচ্য শ্রেণীবিন্যাসের তৃতীয় তাৎপর্য হল নৈতিক বিচারের বিষয়ের ক্রমবিস্তার। বিধানের বিষয় মানুষের কর্ম, কিন্তু মানুষের ভাবনা চিন্তা আবেগ ইত্যাদিও সঙ্গত অসঙ্গত হতে পারে। আমরা বলি না যে প্রিয়জনের বিয়োগে দুঃখ পাওয়া কর্তব্য, কিন্তু বলি এমন অবস্থায় দুঃখ পাওয়া সঙ্গত। তারপর মানুষের চরিত্রও নৈতিক বিচারের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। একথা বলা যায় না যে তার চরিত্র সঙ্গত বা অসঙ্গত, কিন্তু আমরা বলি যে তার চরিত্র ভাল বা মন্দ। উপরে যে তাৎপর্যগুলির কথা বলা হল তাদের মূলে আছে কিন্তু ক, খ ও গ-এর যৌক্তিক আনুপূর্ব। আর সেজন্য গ, মানে শ্রেয়বোধক বাক্যই, নৈতিক বাক্যের ব্যাপকতম রূপ, সুতরাং নৈতিক বাক্যের দুর্বলতম অর্থ।

২

নৈতিক বাক্যের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে: নৈতিক বাক্য বিবৃতিবোধক কি অন্যরূপ বাক্য? কেউ কেউ বলেছেন যে: নৈতিক বাক্যে কোনো বিবৃতি ব্যক্ত হয় না, নৈতিক বাক্য প্রকৃতপক্ষে অনুজ্ঞাবোধক বাক্য। মানে (এ কাজ ভাল, এ কাজ সঙ্গত প্রভৃতি) নৈতিক বাক্যের যৌক্তিক আকার হল: এ ক'রো। করবে। ক'রো না। করবে না। কোনো বাক্য বিবৃতিবোধক কি অন্যরূপ তা নির্ণয় করতে হলে বিবৃতির লক্ষণ—সত্য বা অসত্য বলে বিবেচিত হবার যোগ্যতা, বিশ্বাস বা অবিশ্বাস যোগ্যতা— প্রয়োগ করে দেখতে হয়। সাধারণ ব্যবহার লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে নৈতিক বাক্যের ক্ষেত্রেও এ লক্ষণ প্রযোজ্য। আমরা বলি: এ বাক্য সত্য, আমি বিশ্বাস করি দর্শনের ভিত্তি যুক্তিবিজ্ঞান ইত্যাদি; সে রকম এও বলা হয় যে আমি জানি কাজটি সঙ্গত, আমি বিশ্বাস করি প্রতিজ্ঞা পালন করা ভাল, একথা সত্য যে মিথ্যা বলা অন্যায়। উক্তরূপ ব্যবহার থেকে

বোঝা যায় যে নৈতিক বাক্যকে বস্তুতঃ এক রকম বিবৃতির বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

তারপর অনুজ্ঞাবোধক বাক্যের উদ্দেশ্য হল শ্রোতা বা পাঠককে কোনো কর্মে লিপ্ত করানো। নৈতিক বাক্য যদি নিছক অনুজ্ঞাবোধক হত তাহলে বলা যেত না যে "কাজটি সঙ্গত কিন্তু তুমি এ কাজ করতে পারবে না", আমি জানি কাজটি ভাল, কিন্তু আমার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়"; এ রকম ব্যবহার তাহলে স্ববিরোধী বলে বিবেচিত হত। অনুজ্ঞা বাক্যের আকার হল: তুমি বা তোমরা এ কাজ ক'রো। করবে ইত্যাদি। এ বাক্যাকারে "তুমি", "তোমরা", "ক'রো", "করবে" আকারধারক, অনপনীয় শব্দ, যুক্তিবিজ্ঞানে যাকে বলে অব্যয় (constant), আর কেবল "এ কাজ" অপনীয় পদ (variable)। কিন্তু নৈতিক বিচারে আমরা নিম্নোক্তরূপ বাক্যও ব্যবহার করি: আমার এ কাজ করা উচিত, তার ও কাজ করা অন্যায় হয়েছে, অমুকের ঐ কাজ করা উচিত ছিল। লক্ষণীয় যে কাউকে কোনো কর্মে প্রবৃত্ত করনো উক্তরূপ বাক্যের উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যবহারগুলির যদি বৈয়াকরণ যাথার্থ্যও থাকে তাহলে নৈতিক বাক্য অনুজ্ঞাবোধক বাক্য বলে গণ্য হতে পারে না। বক্তার নিজের সম্বন্ধে, তৃতীয় ব্যক্তি সম্বন্ধে, অতীত সম্বন্ধে যে কাজ করা হয় নি কিন্তু হতে পারত সে কাজ সম্বন্ধে, অনুজ্ঞা ব্যবহার করা যায় না! অর্থাৎ (উক্ত আকারধারক শব্দগুলি অপরিবর্তিত রেখে) সব নৈতিক বাক্যকে উল্লিখিত অনুজ্ঞা বাক্যাকারে রূপান্তর করা যায় না।

নৈতিক বাক্যের অর্থের মধ্যে কখনই যে অনুজ্ঞা নিহিত থাকে না তা নয়। কিন্তু নিছক অনুজ্ঞায় কোনো যুক্তির প্রতিশ্রুতি থাকে না। এজন্য "এ কাজ করবে, কিন্তু কেন এ কাজ করতে হবে তা বলব না" এ উক্তি অসঙ্গত নয়। যে বলে "এ কাজ করো", কেন এ কাজ করতে হবে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে তার কোনো যৌক্তিক বাধ্য বাধকতা নেই। অন্য দিকে নৈতিক বাক্য বলে "এ কাজ করো, কারণ এ কাজ ভাল, এ কাজ কল্যাণকর, সুখকর ইত্যাদি। এ যুক্তিগুলি গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য সে প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আসল কথা নৈতিক বাক্য যদি অনুজ্ঞা বাক্যাকারেও ব্যক্ত হয় তাহলে তাতে যুক্তি-প্রতিশ্রুতি থাকে। "এ কাজ করা উচিত/ভাল, কিন্তু কেন উচিত/ভাল তার কোনো যুক্তি নেই, তা বলতে আমি বাধ্য নই" এ বাক্য স্ববিরোধী। যারা বলেন যে নৈতিক বাক্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো অনুজ্ঞা ব্যক্ত হয়, তারা এ অনুজ্ঞার বৈশিষ্ট্য কি, অন্যবিধ অনুজ্ঞা থেকে নৈতিক বাক্য বোধিত অনুজ্ঞার পার্থক্য কি এ সব প্রশ্নের কোনো সঙ্গত উত্তর দিতে পারেন

না। কিন্তু অনুজ্ঞা বাক্য মাত্রই যে নৈতিক বাক্য নয় তা অনস্বীকার্য। তারপর অনুজ্ঞাও ভাল মন্দ হতে পারে। একথার মানে অনুজ্ঞাবাক্য নৈতিক বাক্য নয়। সাধরণভাবে বলা যায় যে নৈতিক বাক্যের উদ্দেশ্যপদ হ'ল স্বেচ্ছাকৃত কর্মবোধক কোনো পদ। যেহেতু আলোচ্য মতানুসারে নৈতিক বাক্যের যৌক্তিকরূপ অনুজ্ঞা-বাক্য এবং যেহেতু অনুজ্ঞাবাক্যবোধিত আদেশ অনুরোধ ইত্যাদিও এক রকমের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম, সেজন্য অনুজ্ঞাবাক্য প্রকৃতপক্ষে নৈতিকবাক্যের উদ্দেশ্যপদ। "এ গোলাপটি সুন্দর" এ বাক্যবিবৃত বিবৃতি সম্বন্ধে বলা যায় না যে বিবৃতিটি সুন্দর, "কাজটি ভাল" এ বাক্যবোধিত বিবৃতি সম্বন্ধে বলা যায় না যে বিবৃতিটি ভাল। নৈতিক বাক্য যে-অনুজ্ঞা বোঝায় বলে মনে করা যায় সে-অনুজ্ঞা সম্বন্ধেও ভাল, মন্দ, সঙ্গত, অসঙ্গত প্রভৃতি বিধেয় প্রযোজ্য। অর্থাৎ অনুজ্ঞাবাক্য নৈতিকবাক্য নয়, নৈতিকবাক্যের এক জাতীয় উদ্দেশ্যপদ।

যাঁরা বলেন যে নৈতিকবাক্য অনুজ্ঞাবোধক তাঁরা অনেকেই স্বীকার করবেন যে সোজাসুজি অনুজ্ঞার সাহায্যে কাউকে কোনো কর্মে প্রবৃত্ত করান যায় না। নিছক অনুজ্ঞার প্রতিক্রিয়া হল প্রস্তাবিত কর্ম-বিমুখিতা ও বিরুদ্ধতা। এজন্য প্রচ্ছন্নভাবে অনুজ্ঞা ব্যবহার করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন আবেগবহ ও আবেগসঞ্চারী ভাষার। এজন্য কেউ কেউ মনে করেন, নৈতিকবাক্য প্রকৃতপক্ষে আবেগসঞ্চারী বাক্য।

আমরা আগেই বলেছি যে বিবৃতিবোধক ও আবেগসঞ্চারী বাক্যের মধ্যে বহির্ভুক্তির সম্পর্ক নেই। যে কাব্যিক বাক্য আবেগ সঞ্চার করে সে বাক্যই সাধারণতঃ কোনো না কোন বিবৃতি প্রকাশ করে। যেমন. তোমায় ডাকিনু যবে কুঞ্জবনে তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল, বধু-আগমন গাথা গেয়েছে মর্মরচ্ছন্দে অশোকের কচি রাঙা পাতা, প্রভৃতি বিবৃতিবোধক বটে। বস্তুতঃ উঃ, আহা, ছিছি, মরি মরি, বাঃ, কি মজা, আবেগের এ জাতীয় অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য সব আবেগ-সঞ্চারী বাক্য বিবৃতিবোধক আর "আহা ছিছি"-র ভাষায় যে নৈতিকবাক্য প্রকাশ করা যায় না তা বোধ হয় অনস্বীকার্য। নৈতিক বাক্যে যে আবেগের অভিব্যক্তি হয় না তা নয়। তবে নৈতিক বাক্যের অর্থ আর অভিব্যক্ত আবেগ এক নয়। নৈতিক বাক্য যদি আবেগ বিষয়কও হয় তাহলেও বলতে হবে যে নৈতিক বাক্য বিবৃতিবোধক। যখন বলি "এটা ভাল" তখন অন্ততঃ এ বিবৃতি ব্যক্ত হয় যে "আমি এটা পছন্দ করি"। যাঁরা বলেন যে নৈতিক বাক্য আবেগসঞ্চারী তাঁরা আবেগ কথাটি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁদের

আবেগ মানে পছন্দ ও অপছন্দ, অনুমোদন ইত্যাদি। তাঁরা বলেন যে নৈতিক বাক্যে যে বিশেষ ধরণের আবেগ ব্যক্ত হয় তার ভাষাসাংকেতিক প্রকাশ হল "আমি অনুমোদন করি"। এজন্য কেউ কেউ বলেছেন যে "এটা ভাল" এ বাক্যের যৌক্তিক আকার হল: আমি অনুমোদন করি, তুমিও অনুমোদন ক'রো। এ বাক্যের প্রথম অংশ বিবৃতিবোধক আর দ্বিতীয় অংশ অনুজ্ঞাবোধক। কিন্তু প্রথম অংশ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ যখন কেউ বলে "আমি অনুমোদন করি..." তখন বক্তা যে অনুমোদন করছে সে সম্বন্ধে মতানৈক্য হয় না, হয় বক্তার অনু-মোদনের যাথার্থ্য নিয়ে। তার মানে আলোচ্য বাক্যাকারের "তুমি অনুমোদন ক'রো" অংশই নৈতিক বলে বিবেচ্য। কিন্তু আমরা দেখেছি যে অনুজ্ঞা বাক্য নৈতিক বাক্যের উদ্দেশ্যপদ, নৈতিক বাক্য নয়।

যারা আলোচ্য মত প্রচার করেন তারাও স্বীকার করবেন যে-কোনো আবেগসঞ্চারী বাক্য নৈতিক বাক্য নয়। কিন্তু সাধারণ আবেগসঞ্চারী বাক্যের সঙ্গে কোন্ গুণ যুক্ত হলে ঐ বাক্য নৈতিক বাক্যে পরিণত হয় আলোচ্য মতে এ প্রশ্নের কোনো সঙ্গত উত্তর আছে বলে মনে হয় না। তারপর নৈতিক বিধান যে আমরা মেনে নিই, নৈতিক বিচার করে যে তার যাথার্থ দাবী করি, তার যাথার্থ এই বলে সমর্থন করি না যে অমুক অনুমোদন করেছে বা আমি অনুমোদন করেছি, কাজেই কাজটি ভাল। বরং বলি কাজটি ভাল সুতরাং আমি অনুমোদন করি। তারপর, "এ কাজটি ভাল" আর "এ কাজটি আমি অনুমোদন করি" যে সমার্থক বাক্য নয় এ উক্তির সমর্থনে বলা যায় যে "কাজটি ভাল কিন্তু আমি অনুমোদন করি না" অথবা "কাজটি মন্দ কিন্তু আমি অনুমোদন করি" এ রকম বাক্যের মধ্যে কোনো যৌক্তিক অসঙ্গতি নেই। এ রকম বাক্য "ছবিখানা সুন্দর কিন্তু আমার পছন্দ হয় না", "জানি ছবিখানা যামিনী রায়ের নকল (কাজেই উৎকৃষ্ট শিল্পকৃতি নয়) তবু ছবিখানা আমি পছন্দ করি" প্রভৃতি বাক্যের মত। অনুজ্ঞার মত অনুমোদনও সঙ্গত অসঙ্গত হতে পারে। আমি যদি বলি "আমি নরবলি পছন্দ করি, বহুবিবাহ অনুমোদন করি তাহলে আপনারা শুধু এই বলে প্রতিবাদ করবেন না যে বহুবিবাহ খারাপ, নরবলি ভীষণ অন্যায়, এও বলবেন যে বহুবিবাহ বা নরবলি অনুমোদন করা, পছন্দ করাও অন্যায়। যখন বলি যে আমি অনুমোদন করি তখন প্রচ্ছন্নভাবে এ কথাও বলা হয় যে এ অনুমোদনের সমর্থনে যুক্তি আছে এবং সে যুক্তি আমার অনুমোদন-অনপেক্ষ। এখানেই "অনুমোদন করি" আর "ঘোষণা করি", "আমার হুকুম" প্রভৃতির পার্থক্য।

যাঁরা বলেন যে নৈতিক বাক্য আবেগসঞ্চারী তাঁরা আসলে নৈতিক বাক্যকে পূর্বোল্লিখিত প্রস্তাবজ্ঞাপক বাক্যে রূপান্তর করেন। মনে করা হয় যে আমি প্রস্তাব করি, আমি অনুমোদন করি প্রভৃতি প্রস্তাবজ্ঞাপক বাক্য, বিবৃতিবোধক নয়। কিন্তু আমি অনুমোদন করেছিলাম বিবৃতিবোধক। এখন নৈতিক বাক্য যদি প্রস্তাবজ্ঞাপক হয় তাহলে "আমি ক-কাজ অনুমোদন করি" নৈতিক বাক্য। কিন্তু এ বাক্য উচ্চারিত হবার পরমুহূর্তে যখন বলি "আমি ক-কাজ অনুমোদন করেছিলাম অথবা অন্যেরা যখন বলে "অমুক ক-কাজ অনুমোদন করে বা করেছে" তখন আর এ বাক্যগুলি নৈতিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। নৈতিক বাক্যের সঙ্গে উত্তম-পুরুষ আর বর্তমান কালের উক্তরূপ যাদুকরী সম্পর্ক আছে বলে মনে করার কোনো সঙ্গত যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। আর এ কথা সত্য নয় যে "আমি অনুমোদন করি" বিবৃতিবোধক নয়। আমি যদি বলি "আমি ক অনুমোদন করছি" আর বস্তুতঃ খ অনুমোদন করি তাহলে উক্ত বাক্য মিথ্যা হয়ে পড়ে, এবং যা মিথ্যা হতে পারে তাই বিবৃতি।

এতক্ষণ আমরা একটা কথাই বলতে চেয়েছি যে নৈতিক বাক্যে আবেগ অভিব্যক্ত হতে পারে, অনুজ্ঞাও নিহিত থাকতে পারে ; কিন্তু নৈতিক বাক্য বিবৃতি-বোধক, এতে আবেগ ও অনুমোদনের বিষয় সম্বন্ধে কিছু বিবৃত হয়। তাহলে এখন থেকে আমরা "নৈতিক বিবৃতি"ও ব্যবহার করতে পারি।

৫

নৈতিক বিবৃতি সম্বন্ধে আমরা আরও একটি অতি সাধারণ উক্তি করতে চাই যে যে কোনো নৈতিক বাক্য যদি সত্য হয় তাহলে তা সত্য, মিথ্যা নয়। এ কথা যদি সত্য হয় যে ক কাজ ভাল, তাহলে ক কাজ ভাল, মন্দ হতে পারে না। মানে কোনো নৈতিক বাক্য যুগপৎ সত্য ও মিথ্যা হতে পারে না, কোনো কাজ যুগপৎ ভাল ও মন্দ হতে পারে না। "ক ভাল" আর "ক মন্দ"। "ক ভাল নয়"—এর মধ্যে অন্ততঃ বাস্তব বিরুদ্ধতা আছে। এটা নৈতিক বাক্য সম্বন্ধে ন্যূনতম, দুর্বলতর দাবী। মনে হয় এ দাবী অবশ্য স্বীকার্য। আমি যদি বলি "ক ভাল" আর প্রবাসবাবু বলেন "ক মন্দ" তাহলে মনে হয় যে আপনারা বস্তুতঃ মনে করবেন আমাদের উক্তি দুটির মধ্যে বাস্তব বিরুদ্ধতা আছে। কিন্তু অনেকে এ সামান্য দাবীটিও মেনে নিতে চান না। বরং বলা উচিত অনেকে নৈতিক বাক্য সম্বন্ধে এমন

মতবাদ পোষণ করেন যে ঐ মতবাদ গ্রহণ করলে আমাদের উক্ত দাবীটি আর মেনে নেওয়া যায় না।

দেখা যাক, নৈতিক বাক্য সম্বন্ধে কি জাতীয় মতবাদ গ্রহণ করলে আমাদের উক্ত দাবী স্বীকার করা যায় না। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে নৈতিক বিচারে মতভেদ দেখা যায়। এখন যদি বলা হয় যে নৈতিক বাক্যে বক্তার অনুভূতি সম্বন্ধে কোনো কিছু বিবৃত হয় তাহলে এ সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় একই কাজ যুগপৎ ভাল ও মন্দ হতে পারে, একই নৈতিক বাক্য সত্য ও অসত্য হতে পারে। কারণ, যদি আমি যখন বলি "কেনো বিশিষ্ট কাজ, ক, ভাল" তখন এ কথাই বলা হয় যে "আমি ক পছন্দ করি / অনুমোদন করি", তাহলে আমি সত্যই পছন্দ / অনুমোদন করলে "ক ভাল" এ বাক্য সত্য ; কেন না নৈতিক বাক্য যে অনুভূতি বিষয়ক সে অনুভূতির অস্তিত্ব ও অভাবই নৈতিক বাক্যের সত্যমূল্যের নির্ণায়ক। কিন্তু আপনি যদি বস্তুতঃ ঐ ক অপছন্দ করেন তা হলে "ক মন্দ"/"ক ভাল নয়"—এ বাক্য সত্য। তার মানে "ক ভাল" ও "ক মন্দ"/"ভাল নয়" যুগপৎ সত্য হয়ে পড়ে, "ক ভাল" যুগপৎ সত্য ও মিথ্যা হয়ে পড়ে। কেবল উক্ত মতবাদ মেনে নিলেই যে আমাদের উল্লিখিত প্রাথমিক দাবীটি অস্বীকার করতে হয় তা নয়। যদি বলা হয় যে নৈতিক বাক্য বিশ্বাস-বিষয়ক, অর্থাৎ যদি যখন বলি ক ভাল তখন এ কথাই বলা হয় যে আমি মনে করি যে ক ভাল তাহলেও এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে একই কাজ ভাল ও মন্দ হতে পারে, একই নৈতিক বাক্য সত্য ও অসত্য হতে পারে। আমরা এতক্ষণ সম্ভাব্য পূর্বপক্ষরূপে উক্ত মতবাদ দুটি উল্লেখ করেছি। কিন্তু নৈতিক বাক্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে অনেকে বস্তুতঃ উক্তরূপ মতবাদ প্রচার করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেবার দরকার। উক্তরূপ যে কোন মতবাদ মেনে নিলেই যে আমাদের প্রাথমিক দাবীটি অস্বীকৃত হয় তা নয়। অস্বীকৃত হয় কি হয় না তা নির্ভর করে নৈতিক বাক্যকে যে-বক্তার অনুভব বিশ্বাস সংক্রান্ত বলে মনে করা হয় সে বক্তাবোধক "বক্তা" বলতে কি বুঝি তার উপর। যেমন, যদি এ কথা সত্য হয় বা এমন দাবী করা হত যে একই বিষয় বিভিন্ন মানুষের মনে একই ভাবনা ও বিশ্বাস উৎপাদন করে, আমার যদি ক কাজ ভাল লাগে তাহলে অন্য সবারইও ক ভাল লাগবে, তাহলে অবশ্য কোনো কাজ এক সঙ্গে ভাল ও মন্দ বলে বিবেচ্য হতে পারত না। কিন্তু এটা একটা তাত্ত্বিক সম্ভাবনামাত্র। এ মত কেউ গ্রহণ করবেন বলে মনে হয় না ; কারণ একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষের যে ভিন্ন ভিন্ন আবেগ ও বিশ্বাস থাকতে পারে, বস্তুত থাকে তা অস্বীকার করা যায় না।

কেউ কেউ বলেছেন যে কোনো নৈতিক বাক্যে ঐ বাক্যের বক্তার—যেমন "ক ভাল" এ বাক্যের ক্ষেত্রে এ বাক্যের বিশেষ বক্তার—অনুভব বা বিশ্বাস বিবৃত হয়। আবার কারও কারও মতে নৈতিক বাক্যে সমাজের অধিকাংশ লোকের অনুভব বা বিশ্বাস বিবৃত হয়। তাহলে নৈতিক বাক্য অনুভব বিষয়ক ও নৈতিক বাক্য বিশ্বাস বিষয়ক এ মতবাদ দুইটির প্রত্যেকটির আবার দুটি বিশেষ রূপ আছে। এ মতবাদ চারটি অনুসারে "ক ভাল" আমার এ উক্তির অর্থ হল :—(১) আমি ক পছন্দ / অনুমোদন / করি, (২) অধিকাংশ লোক ক পছন্দ / অনুমোদন /—করে, (৩) আমি মনে করি ক ভাল, (৪) অধিকাংশ লোক মনে করে যে ক ভাল।

উক্ত মতবাদগুলি সম্বন্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ আগেই উল্লেখ করেছি। আমরা মনে করি যে কোনো কাজ একসঙ্গে ভাল ও মন্দ হতে পারে না। কিন্তু উক্ত মতগুলি মেনে নিলে একই নৈতিক বাক্য যুগপৎ সত্য ও অসত্য হয়ে পড়ে, বলতে হয় যে ক ভাল ও মন্দ। নৈতিক বাক্য যদি ব্যক্তিবিশেষের আবেগ বা বিশ্বাস বিষয়ক হত তাহলে নৈতিক বিচারে কোনো মতভেদ থাকতে পারত না। আমি যদি বলি "আমি চা পছন্দ করি" আর শিববাবু বলেন "আমি চা পছন্দ করি না" আর আমরা যদি মিথ্যাভাষণ না করি তাহলে আমাদের উভয়ের উক্তিই সত্য ; কিন্তু এ উক্তি দুটির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, আমি শিববাবুর উক্তি অস্বীকার করছি না, শিববাবুর উক্তি আমার উক্তির বিরোধী নয়। কিন্তু আমি যদি বলি ক ভাল (এমন কি যদি বলি চা খাওয়া ভাল) আর শিববাবু বলেন ক ভাল নয় (চা খাওয়া ভাল নয়) তাহলে আমাদের বিবৃতি দুটি বিরোধী বলে বিবেচিত হবে। এবং এ রকম ক্ষেত্রে আমরা নিজের উক্তির সত্যতা ও বিরুদ্ধ উক্তির অসত্যতা প্রমাণের জন্য অবিলম্বেই তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হব। কিন্তু আলোচ্য মতানুসারে নৈতিক বিচারে কোনো মতানৈক্য হতে পারে না। কেন না আলোচ্য মতে "ক ভাল" আমার এ উক্তির মানে আমি ক পছন্দ করি, "ক মন্দ" শিববাবুর উক্তির মানে শিববাবু ক পছন্দ করেন না, এবং এ উক্তি দুটি মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। এ কথা যদি স্বীকার করা যায় যে নৈতিক বিষয় নিয়ে বস্তুত মতভেদ হয় তাহলে আলোচ্য মত যে ভ্রান্ত তাও অবশ্য স্বীকার্য। সে রকম আমি যদি বলি "আমি মনে করি ক ভাল" আর আপনি বলেন "আমি মনে করি ক ভাল নয়" তাহলে আমাদের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেবে না। কারণ আমি যে মনে করছি তা আপনি অস্বীকার করবেন না, আর আপনি যে অন্যরূপ মনে করছেন এ বাস্তব ঘটনা কোনো যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং যে

কারণে প্রথমোক্ত মতবাদ ভ্রান্ত বলে বিবেচ্য ঠিক সে কারণেই "নৈতিক বাক্য বিশ্বাস বিষয়ক" এ মতবাদ ভ্রান্ত। আমরা দেখতে চেষ্টা করলাম যে নৈতিক বাক্যকে ব্যক্তিবিশেষের আবেগ বা বিশ্বাস বিষয়ক বলে বর্ণনা করলে এ অসত্যও মানতে হয় যে নৈতিক বিষয়ে মতভেদ হয় না। যদি বলা যায় যে নৈতিক বাক্য ব্যক্তিবিশেষের নয়, কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোকের অনুভব ও বিশ্বাস বিষয়ক তাহলেও উক্ত অসত্যটি স্বীকার করে নিতে হয়, কারণ এক সমাজের অধিকাংশ লোক ক পছন্দ করলে / ক ভাল মনে করলে আর অন্য সমাজের অধিকাংশ লোক ক অপছন্দ করলে / ক মন্দ মনে করলেও এ দুই সমাজের মধ্যে কোনো মতানৈক্য হতে পারে না। অধিকাংশ লোকের অনুভব বা বিশ্বাস সংক্রান্ত মতবাদটি সম্বন্ধে আরও বলা যায় যে : ক ভাল কিন্তু সাধারণতঃ ক অপছন্দ করা হয় / মনে করা হয় যে ক মন্দ অথবা ক ভাল নয় কিন্তু অধিকাংশ লোক ক পছন্দ করে / মনে করে যে ক ভাল, এসব বাক্য যে স্ববিরোধী নয় তার মানে হল এই যে "ক ভাল" এ কথার অর্থ এই নয় যে অধিকাংশ লোক ক পছন্দ করে / মনে করে যে ক ভাল। বস্তুতঃ ক ভাল কি মন্দ তা বিচার করতে হলে আমরা পরিসংখ্যানের সাহায্য গ্রহণ করার কথা ভাবি না, অধিকাংশ লোক কি মনে করে বা কি অনুভব করে তার হিসাব কষতে বসি না। অন্যেরা ক সম্বন্ধে কি অনুভব করছে কি ভাবছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হলেও ক ভাল কি মন্দ এ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

আমি যদি বলি ক ভাল তাহলে নৈতিকবাক্য আমাদের বিশ্বাস বিষয়ক এই মত অনুসারে, আমি এ কথাই বলি যে "আমি মনে করি / বিশ্বাস করি যে ক ভাল"। আমরা আগেই বলেছি যে বাক্যে যা অভিব্যক্ত হয় তা বাক্যের অর্থ নয়, অর্থ আর অভিব্যক্ত বিষয় এক নয়। যদি বলি ক ভাল তাহলে এ বাক্যে আমার আবেগ অনুমোদন, বিশ্বাস বা জ্ঞান অভিব্যক্ত হতে পারে সত্য; কিন্তু এ বাক্যটি দিয়ে আমি যা বোঝাতে চাই তা হল "ক ভাল" যা বোঝায় তাই। অর্থাৎ "ক ভাল"-এর পরিবর্তে "আমি মনে করি / বিশ্বাস করি যে ক ভাল" ব্যবহার করা যায় না, কারণ বাক্য দুটি সমার্থক নয়। কারণ বিশ্বাস ও বিশ্বাসের বিষয় এক নয়। যদি কোনো কিছু আমরা বিশ্বাস করি, তাহলে একথা বলা যায় না যে ঐ বিশ্বাস করাটাই আমরা বিশ্বাস করি, কেননা তা যদি বলা যেত তাহলে বিশ্বাসের বিষয় থেকে বিশ্বাস করণ পৃথক করা যেত না। আলোচ্য মতে ক ভাল মানে কেউ (আমি, আপনি বা অন্য কেউ) মনে করে / বিশ্বাস করে যে ক ভাল। আমি যদি বিশ্বাস করি যে ক ভাল তাহলে আলোচ্য মতানুসারে

আমার বিশ্বাসের বিষয় হল "কেউ বিশ্বাস করে যে ক ভাল" এ বাক্যার্থ। মানে আমি বিশ্বাস করি যে কেউ বিশ্বাস করে যে ক ভাল। কেউ কি বিশ্বাস করে? বলা যায় না যে, ক যে ভাল তা বিশ্বাস করে। "ক ভাল" মানে ত কেউ বিশ্বাস করে যে ক ভাল। তার মানে আমাদের বিশ্বাসের বিষয়টি কি?—এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হলে বলতে হবে: আমাদের বিশ্বাসের বিষয় হল: কেউ বিশ্বাস করে যে, কেউ বিশ্বাস করে যে—কেউ বিশ্বাস করে যে·· ···। তাহলে "ক ভাল" মানে কেউ মনে করে যে ক ভাল, "ক ভাল" এবং "কেউ মনে করে যে ক ভাল" এ বাক্যটি সমার্থক, এ মতবাদের পরিণাম হল এই যে কেউ কি মনে করে / বিশ্বাস করে অনবস্থার অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে কখনও ধরা যাবে না।

এতক্ষণ আমরা কি আলোচনা করলাম এবার তার হিসাব নেবার সময় হল। এ কথা অস্বীকার করতে পারি না যে আমাদের আলোচনার অনেকটা পর্বতের মূষিক প্রসবের মত। এ দীর্ঘ আলোচনায় আমরা দুটি অতি সাধারণ বিবৃতির সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছি। আমরা বলতে চেয়েছি যে প্রথমতঃ নৈতিকবাক্য বিবৃতিবোধক, দ্বিতীয়তঃ নৈতিক বিবৃতি সত্য এবং মিথ্যা হতে পারে না, কোনো কাজ এক সঙ্গে ভাল ও মন্দ হতে পারে না। দ্বিতীয় বিবৃতিটির তাৎপর্য হল এই যে নৈতিকবাক্যের বিধেয় বিষয়ীগত নয়, বিষয়গত, মন্ময় নয় তন্ময়। অর্থাৎ ভাল ও মন্দ বস্তুগত ধর্ম, শ্রেয়ত্ব ও অশ্রেয়ত্ব আমাদের ইচ্ছা, অনুভব, বিশ্বাস প্রভৃতি মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়।

মনে হতে পারে যে বিবৃতি কথাটি দ্ব্যর্থবোধক। প্রচলিত অর্থে বিবৃতি বলতে বুঝি যা সত্য বা মিথ্যা বলে বিবেচ্য তাই এবং বিবৃতি হল কোনো কিছুর বর্ণনা। বিবৃতি সংক্রান্ত বিবৃতিটির দ্বিতীয় অংশ অনেকে স্বীকার করেন না, কারণ মনে করা হয় যে বিবৃতিমাত্রই বর্ণনাজ্ঞাপক নয়, এক রকম বিবৃতি পদার্থের মূল্যবোধক। অর্থাৎ বিবৃতি কথাটি একটি ব্যাপক অর্থে নিয়ে "বিবৃতি"বোধিত পদার্থের অন্তর্গত দুটি প্রকারের—বর্ণনাজ্ঞাপক বিবৃতি, মূল্যবোধক বিবৃতি-এর কথা বলা হয়। এ উভয় প্রকারের উদ্দেশ্যপদ দ্রব্য, কর্ম, গুণ প্রভৃতি সাধারণ প্রাকৃত-পদার্থবোধক শব্দ, উক্ত প্রকার দুটির উদ্দেশ্যপদ বোধিত পদার্থের মধ্যে বিজাতীয়

ভেদ নেই। কিন্তু বর্ণনাজ্ঞাপক বিবৃতির বিধেয়ের সঙ্গে মূল্যবোধক বিবৃতির বিধেয়ের বিজাতীয় ভেদ আছে বলে মনে করা হয়। মনে করা হয় যে ভাল, মন্দ প্রভৃতি অনন্য অপ্রাকৃত গুণ। তার মানে কোনো বর্ণনাজ্ঞাপক বাক্য কোনো নৈতিক বাক্যের সমার্থক বলে গণ্য হতে পারে না, অর্থের লাঘব না করে কোনো নৈতিক বাক্যকে বর্ণনামূলক বাক্যে রূপান্তরিত করা যায় না; কেন না, বলা বাহুল্য, নৈতিক বাক্যকে এক রকমের মূল্যবোধক বাক্য বলে মনে করা হয়। যেমন, "ক সুখকর", "ক মানুষের সুখশান্তি বর্দ্ধক" প্রভৃতি কোনো বর্ণনাজ্ঞাপক বাক্যই "ক শ্রেয়"এর সমার্থক হতে পারে না। কারণ শ্রেয়ত্ব একটি অপ্রাকৃত গুণ। এ মতবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থক হলেন জি, ই, মূর। মূর বলেন যে শ্রেয়-এর লক্ষণ নির্দেশ করা যায় না। তাঁর মতে শ্রেয়-এর বিশেষত্ব হল এই যে "শ্রেয়" ব্যবহার না করে "শ্রেয় হল—" এ বাক্যাকারের শূন্যস্থান এমন কোনো জটিল পদ বা বাক্যাংশ দিয়ে পূরণ করা যায় না যা "শ্রেয়" যে গুণ বোঝায় সে গুণের সমার্থক গুণ; এ শূন্য স্থান পূর্ণ করে কোনো বৈশ্লেষিক বাক্য পাওয়া যায় না। শ্রেয় সংক্রান্ত বাক্য মাত্রই সাংশ্লেষিক, বৈশ্লেষিক নয় ("Propositions about the good are all of them synthetic and never analytic"—Principia Ethica, ৭ পৃঃ)। মূর স্বীকার করেন যে "শ্রেয়" বোধিত পদার্থের সঙ্গে অন্য পদার্থের শ্রেণীগত (অর্থাৎ ধর্মীগত) তাদাত্ম্য দেখান যায়, কিন্তু গুণগত (ধর্মগত) তাদাত্ম্য দেখান যায় না। তার মানে মূরের মতে "শ্রেয়" বোধিত ধর্মী পদার্থের লক্ষণ রচনা সম্ভব, কিন্তু ধর্ম-পদার্থের লক্ষণ উল্লেখ করা যায় না, অর্থাৎ শ্রেয়-এর লক্ষণ নির্দেশ করা যায়, কিন্তু শ্রেয়ত্ব-এর লক্ষণ রচনা সম্ভবপর নয়। কারণ মূরের মতে গুণগত তাদাত্ম্য লক্ষণের পর্যাপ্ত-অপরিহার্য নিয়ামক। শ্রেণীগত তাদাত্ম্য থেকে গুণগত তাদাত্ম্য অনুমান করাকে, প্রথম প্রকারের তাদাত্ম্যকে দ্বিতীয় প্রকারের তাদাত্ম্য বলে ভুল করাকে মূর "প্রাকৃতবাদ উদ্ভূত অপযুক্তি" আখ্যায় অভিহিত করেছেন। শ্রেয়-এর লক্ষণ কি, "শ্রেয়-বোধিত ধর্মের লক্ষণ রচনা সম্ভব কি না, বা শ্রেয়ত্ব-এর লক্ষণের আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি না এ সব আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। তবে এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে মূর লক্ষণ কথাটির একটি বিশেষ অর্থে, অতি-সংকীর্ণ অর্থে (সংজ্ঞাকরণ অর্থে ও ধর্মগত সমার্থতা অর্থে) ব্যবহার করেছেন বলে তাঁকে আলোচ্য মতবাদ গ্রহণ করতে হয়েছে। যারা লক্ষণ-এর মূর-অনুমোদিত ব্যবহার স্বীকার করে না এবং মনে করে যে যে-কোন পর্যাপ্ত অপরিহার্য নিয়ামক বা ধর্মীগত সমার্থতাই লক্ষণ-

পদবাচ্য তারা মূরের মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। নৈতিকবাক্য মূল্যবোধক—এ উক্তির সমর্থনে মূরের যুক্তি হল এই যে শ্রেয়ত্ব অপ্রাকৃত গুণ। শ্রেয়ত্ব-এর অপ্রাকৃততা এবং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত গুণের প্রভেদ দেখাতে গিয়ে মূর বলেছেন:

> এটা কি কল্পনা করা যায় যে শ্রেয়ত্ব কোনো প্রাকৃত বস্তুর গুণ নয়, শ্রেয়ত্ব-এর সয়ম্ভু কালিক সত্তা আছে? আমি অন্ততঃ এ রকম কল্পনা করতে পারি না। অপর পক্ষে বস্তুর অধিকাংশ গুণ—যাকে আমি প্রকৃতগুণ বলেছি—বস্তুনিরপেক্ষ বলে আমার মনে হয়। বস্তুত এ গুণগুলি বস্তুর সঙ্গে যুক্ত বিধেয়মাত্র নয়, বলা যায় বস্তুর উপাদানের অংশ। বস্তু থেকে এদের সরিয়ে নিলে বস্তুও বিলীন হয়ে যাবে, এমন কি নির্গুণ পদার্থও পড়ে থাকবে না! কারণ এ গুণগুলির নিজেরই দ্রব্যত্ব আছে এবং এদের জন্যই দ্রব্য তার দ্রব্যত্ব লাভ করে। কিন্তু শ্রেয়ের বেলায় এ কথা খাটে না। (Can we imagine "good" as existing *by itself* in time, and not merely as a property of some natural object? For my-self I cannot so imagine it, whereas the greater number of properties of objects—those which I call the natural pro-perties—there existence does seem to me to be independent of the existance of those objects. They are, in fact, rather parts of which the object is made up than were predicates which attach to it. If they are all taken away, no object would be left, not even a bare substance: for they are in themselves, substantial and give to the object all the subs-tance it has. But this is not so with good)—Principia Ethica, ৪১ পৃঃ।

এটা মূরের ১৯০৩ সালের উক্তি। এ অযৌক্তিক উক্তির বিরুদ্ধে আমাদের কোনো প্রতিবাদ করার প্রয়োজন দেখি না। কারণ মূর নিজেই ১৯৪২ সালে উক্ত উক্তির বিরুদ্ধে অযৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। মূর বলেছেন:

> আমি আর বিশ্বাস করি না যে যাদের প্রাকৃত গুণ বলেছি সেগুলিরও সয়ম্ভু কালিক সত্তা আছে, শুধু তাই নয়, আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস যে এদের এ ধরণের অস্তিত্ব থাকতেও পারে না। Principiaতে আমি এ রকম উক্তি করেছিলাম, এখন মনে হয় যে ঐ উক্তি সম্পূর্ণ নির্বোধ ও উদ্ভট। আমি

স্বীকার করি যে প্রাকৃত গুণ সম্বন্ধে একথা বলা ভুল যে প্রাকৃত গুণ বস্তুর সঙ্গে যুক্ত বিধেয় মাত্র নয়, বস্তুর উপাদানের অংশ।

(I not only do not believe that such properties could exist in time by themselves ; I feel perfectly sure that they could not. This suggestion which I made in Principia seems to me now to be utterly silly and preposterous. I also agree... that it is wrong to say, as I did, of the natural properties of a thing that 'they are rather parts of which the thing is made up than mere predicates which attach to it')—Philosophy of G. E. Moore (শিল্‌প সম্পাদিত) ৫৮২ পৃঃ।

মূর পরিষ্কার বলেছেন যে "শ্রেয় অপ্রাকৃত গুণ" এ উক্তির কোনো সঙ্গত ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নি ("I agree...that in Principia I did not give any tenable explanation of what I meant by saying that "good" was a non-natural property", ঐ)।

শ্রেয়ত্ব বলতে আমরা প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত গুণ বুঝি, নৈতিক বাক্য দিয়ে আমরা কোনো স্বেচ্ছাকৃত মানবিক কর্ম বর্ণনা করতে চাই, নাকি ঐ সংক্রান্ত মূল্য-জ্ঞাপক বিবৃতি প্রকাশ করতে চাই, তা নির্ণয়ের সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হল নৈতিকবাক্যের ব্যবহার। সাধারণ ব্যবহার লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বস্তুত মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের কোন বাস্তব ধর্ম বোঝাবার জন্যই আমরা নৈতিক বাক্য ব্যবহার করি। আপনি যদি বলেন "ক-কাজ ভাল" আর আমি যদি জিজ্ঞাসা করি "কেন, ক ভাল বলছেন কেন ?" "কি করে বুঝলেন যে ক ভাল" তার উত্তরে আপনি কি বলবেন যে "ক ভাল বলেই ক ভাল", বলবেন কি যে "আমার মত আপনিও প্রত্যক্ষ করুন—বাহ্য বা মানসপ্রত্যক্ষে দেখুন, অনুভব বা বোধিতে দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে ক ভাল" ? বস্তুত এ রকম ক্ষেত্রে আমরা আমাদের নৈতিক বিচারের যাথার্থ্যের সমর্থনে কোনো বর্ণনাজ্ঞাপক বাক্য উল্লেখ করি, যেমন ক সুখকর, ক আত্মার উন্নতি সহায়ক, ক কাজ করলে মোক্ষ লাভ হয়, অনুভব সমূহের সামঞ্জস্য হয়, ক সমাজ হিতকর ইত্যাদি। এ যুক্তিগুলি সঙ্গত কি অসঙ্গত সে প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যা এখানে প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে নৈতিক বাক্যের যাথার্থ সমর্থন করতে হলে আমরা বস্তুত সমর্থনীয় নৈতিক বাক্যকে সমার্থক-বলে-গৃহীত অন্য বর্ণনাবোধক বাক্যে রূপান্তর করি। অবশ্য আপনি

যদি বলেন "ফুলটি সাদা" আর আমি যদি ফুলটির শ্বেতত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করি "সাদা বলছেন কেন?", "কি করে বুঝলেন, ফুলটি সাদা?" তাহলে আপনি অবশ্যই উত্তর দেবেন "সাদা বলছি কেন না এটা সত্যই সাদা", "আর আপনি তাকিয়ে দেখুন আপনি যদি আমার ভাষা ব্যবহার করেন এবং আপনার চোখ যদি সুস্থ থাকে তাহলে আপনিও বলবেন যে ফুলটা সাদা"।

উক্ত দৃষ্টান্ত দুটি তুলনা করলে মনে হয় যে অনন্য যদি বলতে হয় তাহলে সাদা, লাল, ঠাণ্ডা, গরম প্রভৃতি শব্দবোধিত গুণকেই অনন্য বলতে হয়। কারণ "অভিজ্ঞতার ভাষা" ছাড়া অন্য ভাষায় এদের ব্যাখ্যা করা যায় না, কিন্তু নৈতিক বাক্যের বিধেয়কে অন্য বর্ণনাবোধক বিধেয়ের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়, এবং মনে হয়, ব্যাখ্যা করা যায়। মূর বলেছেন যে "শ্রেয়"-এর সমার্থক কোনো ধর্ম নেই, "শ্রেয় হল—" এক বাক্যাকারের শূন্য স্থান "শ্রেয়" বাদ দিয়ে কোন জটিল বিধেয় প্রয়োগ করে পূর্ণ করলে যে বাক্য পাওয়া যাবে তা সাংশ্লেষিক, বৈশ্লেষিক নয়। প্রথমতঃ মনে হয় যে সাংশ্লেষিক ও বৈশ্লেষিক বাক্যের ভেদ অনেকাংশে কৃত্রিম। "মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী" বৈশ্লেষিক বাক্য কেন, আর "মানুষ পক্ষহীন দ্বিপদ প্রাণী" সাংশ্লেষিক কেন তা বোঝা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ "শ্রেয়"-এর সঙ্গে ধর্মনির্দেশী তাদাত্ম্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হতে পারে এমন গুণবোধক কোন জটিল পদ-প্রতীক নেই—এ গৃহীত সত্য থেকে এ সিদ্ধান্তান্ত নিঃসৃত হয় না যে "শ্রেয়"-এর সমার্থক জটিল শব্দ-প্রতীকের কোনো প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। কারণ অন্য প্রাকৃতধর্ম ব্যবহার করেই "শ্রেয়" ব্যবহারের যে-উদ্দেশ্য সাধিত হয়। বস্তুতঃ শ্রেয়-কে যে অনন্য ধর্ম মনে করা হয় না তার একটা প্রমাণ মেলে আমাদের ভাষাতে। ভাষায় এমন কোন শব্দ নেই যা ঐকান্তিকরূপে নৈতিক বাক্যের বিধেয় হিসাবেই ব্যবহার করা হয়। শ্রেয়, ভাল, মন্দ, সঙ্গত, অসঙ্গত, উচিত, অনুচিত প্রভৃতি যে শব্দগুলি নৈতিক বাক্যে ব্যবহার হয়, বস্তুতঃ সে শব্দগুলিই আবার অন্য প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হয়। "ভাল"-এর প্রতিশব্দ হল শুভ, কল্যাণকর, মঙ্গলজনক, হিতকর, নিপুণ, সৎ, সুস্থ, সুন্দর, শোভন ইত্যাদি। ভাষায় যে এমন কোনো শব্দ নেই যা কেবল নৈতিক বাক্যের বিধেয়রূপেই ব্যবহৃত হয় তার থেকে কি এ কথাই মনে হয় না যে নৈতিক বাক্য বর্ণনা-অতিরিক্ত নৈতিক-মূল্য নামক কোনো অপ্রাকৃত পদার্থ বিষয়ক নয়?

তাহলে কি আমরা বলব যে নৈতিক বাক্যের সঙ্গে অন্য বর্ণনাজ্ঞাপক বাক্যের কোনো ভেদ নেই ? বলব কি যে "ফুলটি লাল" আর "এ কাজ ভাল" এক রকমের বাক্য ? না তা বলা যায় বলে মনে হয় না। কারণ লাল, নীল প্রভৃতি শব্দবোধিত গুণ ও ভাল, মন্দ, সঙ্গত প্রভৃতি শব্দের তাত্পর্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভেদ বর্তমান। প্রথমতঃ লাল, নীল প্রভৃতি পদের তাত্পর্য হল গুণ, আর 'ভাল" "সঙ্গত" প্রভৃতি ধর্ম। গুণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্তু ধর্ম বুদ্ধিগ্রাহ্য। দ্বিতীয়তঃ, নৈতিক ধর্ম গুণের মত অনপেক্ষ নয়। অন্য কিছুর সঙ্গে—অন্য কর্ম, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য বা আদর্শের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে কোনো কাজ ভাল / সঙ্গত হতে পারে না। মানুষের সব স্বেচ্ছাকৃত কর্মেই যে ভাল, মন্দ ইত্যাদি শব্দবোধিত ধর্ম আরোপ করা যায় না তার থেকে এ সত্যই নিঃসৃত হয় যে ভাল, মন্দ, সঙ্গত প্রভৃতি শব্দবোধিত ধর্ম আপেক্ষিক। বলা বাহুল্য যে কোনো ধর্মকে আপেক্ষিক বলে বর্ণনা করলে এ কথা বলা হয় না যে ধর্মটি মন্ময়। যেমন বিবৃতি প্রসঙ্গে অসত্য, সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে যথার্থ, অযথার্থ প্রভৃতি বিশেষণ পদ বোধিত ধর্ম আপেক্ষিক, কিন্তু তন্ময়। এ দৃষ্টান্তগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি, কারণ নৈতিক বিশেষণগুলি উল্লিখিত বিশেষণের সঙ্গে তুলনীয়। যাথার্থ্য ও অযাথার্থ্য কোন বিচ্ছিন্ন বাক্যের গুণবাচক নয়, অন্য বাক্যের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বাক্যের (সিদ্ধান্ত বাক্যের) ধর্মবোধক ; এবং কোনো নীতির সঙ্গে সঙ্গতি বা অসঙ্গতি হেতুই সিদ্ধান্ত যথার্থ বা অযথার্থ হয়। সে রকম কোনো গৃহীত আদর্শের মানদণ্ডেই স্বেচ্ছাকৃত কর্ম ভাল মন্দ বলে বিবেচিত হয়। সঙ্গত মানে গৃহীত আদর্শানুসারী. আর অসঙ্গত মানে ঐ আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। ধরা যাক মানুষের সুখ শান্তিই আমাদের মুখ্য নৈতিক লক্ষ্য। প্রশ্ন উঠবে যে, লক্ষ্যটি কি সঙ্গত ? অর্থাৎ "ভাল / "সঙ্গত" আর গৃহীত আদর্শের সঙ্গে "সঙ্গতি" যদি সমার্থক হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে কিসের সঙ্গে সঙ্গতির ফলে উক্ত লক্ষ্যটি সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে, আর লক্ষটি অসঙ্গত হলেও এ ধরণের প্রশ্ন উঠবে। উত্তরে বলা যায় যে দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহৃত লক্ষ্যটি যে সঙ্গত তার কারণ মানবজীবনের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য আছে। মানে মানবজীবন মেনে নিয়ে মানবজীবন আমাদের প্রিয় এ কথা মেনে নিয়ে মানুষের সুখশান্তি কামনা যে সঙ্গত তা অস্বীকার করলে মনে যৌক্তিক অসঙ্গতি হয়। আর "মানব-জীবন আমাদের প্রিয়" নৈতিক বাক্য নয়। কাজেই অনবস্থা প্রদর্শন প্রত্যাশী

সমালোচক এখানে বলতে পারবেন না যে মানবজীবন যে ভাল তার কারণ কি, কোন্ লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতির ফলে মানবজীবন মূল্যবান্। পারবেন না, কারণ মানবজীবন শ্রেয় কি শ্রেয় নয় এ নৈতিক প্রশ্ন উঠতে পারে না, কারণ প্রথমতঃ জীবন আমাদের স্বেচ্ছাকৃত কর্ম নয়, এমন কি স্বেচ্ছায় গৃহীত দানও নয়। কিন্তু জীবন নৈতিক বিচারের অপরিহার্য নিয়ামক, জীবন স্বীকার করে না নিলে নৈতিক বিচারের প্রশ্নও ওঠে না। জানি মানবজীবন কথাটি অত্যন্ত অস্পষ্ট। কিন্তু এর বিশদ ব্যাখ্যা করতে গেলে আর একটি প্রবন্ধের অবতারণা করতে হয়। আর এ কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য যদি আমি ব্যাখ্যা করতে না পারি, জানি পারব না, তাহলেও একথা প্রমাণ হবে না যে নৈতিক বাক্য সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা অযৌক্তিক।

নীতি-বাচক বাক্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী

"অমুকের কাজটি ভাল" এই নীতি-বাচক বাক্যটির রূপ "অমুকের কাজটি দ্রুতগতি" এই বিবৃতিমূলক প্রাকৃত বাক্যের মত। সুতরাং সাধারণ ও প্রাথমিক দৃষ্টিতে প্রথম বাক্যটির অর্থ এমন ভাবে করতে উদ্যত হই যে ভালকে একটি প্রাকৃত বা লৌকিক গুণ হিসেবে ধরতে হয়। কাজটি ভাল বলতে বুঝি ওটি বক্তার পছন্দমত, কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণী বা সংখ্যাগুরু জনতার সমর্থনপ্রাপ্ত, কিম্বা কোন শাস্ত্রসঙ্গত, কিম্বা মনুষ্যজাতির সুখ বা জীবনধারণের উপায়স্বরূপ। এইরূপ বিশ্লেষণ করলে বাক্যটির সত্যাসত্যের প্রশ্ন সহজেই মীমাংসিত হয় এবং এই বাক্যের সহিত অপরের (যথা, "কাজটি মন্দ") ন্যায়গত সম্বন্ধটি সাধারণভাবেই নিরূপিত হয়। কিন্তু এরূপ সুবিধা সত্ত্বেও এই প্রকার বিশ্লেষণের স্থান দর্শনে নেই বললেই হয়। কারণ স্পষ্টই। "অমুকের কাজটি ভাল" বলতে যদি আমরা কাজটির কোন প্রাকৃত গুণের প্রতি ইঙ্গিত করি তাহলে কাজটি যে আমাদের সমর্থনযোগ্য বা কর্ত্তব্য সে বিষয়ে কিছুই বলা হল না। অথচ যে কোন নীতিবাচক বাক্যের প্রধান বক্তব্য এই যে, যাকে সে ভাল বলে তাকে সকলের করণীয় বলে উপস্থিত করে। কাজটি ভাল বলতে যদি এইমাত্র বুঝতাম যে এটি বক্তার বা অন্য অনেকের মনোমত বা বৃহত্তম সংখ্যক জনতার বৃহত্তম সুখের উপায় বিশেষ তাহলে কাজটির বর্ত্তমান গুণ সম্বন্ধেই বিবৃতি দেওয়া হয়, তার ভবিষ্যৎ অনুশীলন বা তার নৈতিক উপযোগিতা সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। অথচ নীতিধর্ম আমাদের এইটিই বলে। জগতে কী ঘটছে তা বলা নীতি ধর্মের কাজ নয়, কী ঘটা উচিত সেইটাই বলা কাজ। এইরূপভাবে দেখলে প্রাকৃত বিশ্লেষণ ত্রুটীপূর্ণ মনে হয়। কাহারো কাহারো মতে (যেমন ইংরাজ দার্শনিক মূর) ভাল মন্দ দুইটি অতিপ্রাকৃত গুণকে বোঝায় যার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ প্রাকৃত গুণাবলী দ্বারা সম্ভব নয়। অতিপ্রাকৃত হলেও আমরা ভাল মন্দকে সরাসরি বুঝি আমাদের স্বতঃ-জ্ঞানে। ভাল মন্দের সংজ্ঞা নির্দেশ ও তার যুক্তি বিচার দ্বারা প্রমাণ তাই সম্ভব নয় যেমন কোন মৌলিক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, ধরো নীল রঙের বেলাতেও, দেখি। ভাল এমনই একটি স্বতঃ-প্রামাণ্য ধর্ম যে তার দিকে মানুষের নৈতিক

বুদ্ধি মানুষকে প্রভাবিত করে, মানুষ ভাল কাজকে উচিত বলে গ্রহণ করে। সেই কাজ ভাল যা মানুষের পক্ষে মোটের ওপর বৃহত্তর ভাল ও অল্পতর মন্দের কারণ হয় আর মানুষকে সেই কাজই করতে তার নীতিবোধ প্রণোদিত করে। অবশ্য ভাল মন্দের ন্যায়সঙ্গত বিশ্লেষণ বা সংজ্ঞা-নির্দেশ সম্ভব নয় তবে তাহাদের নিত্য অনুষঙ্গ কতগুলি প্রাকৃত গুণ বা ধর্ম জানা যায় এবং এদের দ্বারা ভাল মন্দের বাহ্যিক বা পরোক্ষ পরিচয় ও পরিমাপ পাওয়া যায়। বৃহত্তম সংখ্যক মানুষের বৃহত্তম সুখ এইরূপ একটি আনুসঙ্গিক প্রাকৃত ধর্ম। ভাল বলতে এই সুখবৃদ্ধির উপায় না বোঝালেও ভালর সঙ্গে এর সেইরূপই সম্পর্ক, যেমন নীল রঙের সঙ্গে একটি বিশেষ দৈর্ঘের ইথার-তরঙ্গমালার।

এই ধরণের বিশ্লেষণের গুণ এই পর্যন্ত যে ইহাতে নীতিবাচক বাক্যটির যে বিবৃতিমূলক রূপ পাই এবং তাকে সাধারণ-জ্ঞানে যে বিবৃতিমূলক বলে মনেও হয় এই দুইটি ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা হয়। আবার এইরূপ বাক্য যে সত্য বা মিথ্যা হতে পারে এবং একটি বাক্যকে তার বিপরীত দিয়ে খণ্ডন করা যেতে পারে এইরূপ ধারণাও সাধারণ জ্ঞানে অবস্থিত। এই ধারণাকেও এইরূপ বিশ্লেষণ সম্মান করে। কিন্তু মুস্কিল এই যে এই সবকে রক্ষা করতে গিয়ে এবং সেই সঙ্গে নীতি ধর্মের ঔচিত্য বা কর্ত্তব্যবোধকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে গিয়ে এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি আমাদের সামনে এমন একটি দার্শনিক প্রস্তাব করে যা গ্রহণ করতে মন সায় দেয় না। ভাল মন্দ আমরা অনেকেই সহজেই বুঝি, চুরি করা মন্দ তা বুঝতে বেশী বিচারের প্রয়োজন হয় না, তবুও ভাল মন্দ যে অতিপ্রাকৃত ধর্ম যা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মতই আমাদের নীতিবোধে উদ্ভাসিত হয় একথা মানতে রাজী নই। তাই যদি হোত তাহলে ভাল মন্দ নিয়ে এত বিরোধের কারণ কী আর এত যুক্তিতর্কের প্রয়োজন কী? ভাল মন্দকে অধিবিদ্যক বিষয়ে পর্যবসিত করলে নীতি বিচারে গোঁড়ামী আর ধোঁয়ার অবতারণা করা হবে। কোন কিছুই যুক্তি তর্কের বহির্ভূত আদি সত্য বলে স্বীকার করা বিজ্ঞান বিরোধী মনোভাব। ভাল মন্দের জ্ঞান আমাদের অনেক দেখে আর শিখেই হয় এবং দেখা শেখার তারতম্যে ভাল মন্দের ধারণাও বিভিন্ন হয়। সুতরাং যে সব ক্ষেত্রে ভাল মন্দের জ্ঞানকে সহজ স্বতঃসিদ্ধ মনে হয় তার পেছনে থাকে অনেক দেখা ও শেখা। ভাল মনে হলেই ভাল বলে উপস্থাপিত করা চলে না, কেন ভাল দর্শাতে হয়। কোন কাজই আন্তরিক বা অন্তিমরূপে ভাল হয় না যদিও তা আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে; সেই কাজটির নানা ফলাফল বিচার করেই সেটির ভাল মন্দ

বোঝা যায়। প্রত্যেকটি কাজই উপায় হিসাবে দেখতে হয় এবং তার ফলাফল-গুলির ভাল মন্দও তাদের ফলাফল দিয়ে বিচার করতে হয়। সুতরাং কোন কাজ ভাল কি না নির্ভর করে তার সঙ্গে কার্য-কারণ সূত্রে সম্পর্কিত অন্যান্য ঘটনার শ্রেয়তার ওপর। আপাত দৃষ্টিতে যা নিরপেক্ষ ভাবে ভাল মনে হয়, যেমন জ্ঞানলাভ, মোক্ষলাভ বা সত্যভাষণ, সূক্ষ্ম বিচারে তাও একদা অন্য কোন ব্যাপারের সহায়ক বা উপায় রূপেই ভাল বলে গৃহীত হতো এবং সম্প্রতি সেই উদ্দেশ্য বা ফলটির কথা মন থেকে মুছে গেছে। এইরূপে উপায়কে একটি স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করা মনোবিজ্ঞানে পরিলক্ষিত ব্যাপার। সুতরাং ভাল মন্দ স্বতঃ-প্রামাণ্য বিষয় নয় বরং পরতঃ প্রামাণ্য। অর্থাৎ ভাল মন্দ বিচারের বস্তু, প্রত্যক্ষানুভূতির ব্যাপার নয়। এই প্রত্যক্ষানুভূতি স্বীকার করলে অবশ্য নীতি-বাচক বাক্যের সত্যমিথ্যার ব্যাখ্যা দেওয়া চলে। কিন্তু এই ব্যাখ্যা ভাষাগত বা আকারগত মাত্র, প্রকৃতপক্ষে নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে কেহই বলতে পারে না যে সে কোন বাক্যের সত্যমিথ্যা প্রত্যক্ষ করতে পারে। সত্যমিথ্যার বিচার হতে পারে একমাত্র ভালর সঙ্গে অপর ভালর সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যের সাহায্যে যেমন হয় সাধারণ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বেলাতেও। সুতরাং নীতিবাচক বাক্যের সত্য মিথ্যা সাধারণ অর্থে পাওয়া যায় না। কোন বাক্য সত্য বলতে আমাদের বুঝতে হবে যে সেই বাক্যটি অন্যান্য সত্য বাক্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর সামঞ্জস্য রাখে; কোন বাক্যই ধ্রুব সত্য বা একেবারে মিথ্যা হতে পারে না। এই সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন নীতি শাস্ত্রের একটি ধারণা। সেটি এই: আমাদের কয়েকটি মূল বা স্বকীয় ভাল মন্দের জ্ঞান আছে এবং এদের মধ্যে কোনটি যথার্থ তাহা নিরূপণ করাই নীতি বিচারের কাজ—অন্য কোন কাজের ভাল মন্দ বিচার হবে তাহার দ্বারা এই স্বকীয় ভাল কতখানি সাধিত হবে এই বিচার দিয়ে। শেষোক্ত কাজটি বিজ্ঞানের, নীতি বিচারের নয়। কারণ ইহা নির্ভর করে সংসারে ও মনুষ্য মনো-বিজ্ঞানে একটি কর্ম্মের সঙ্গে অন্যান্য কর্ম ও ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কের ওপর। আমার মতে নীতিশাস্ত্রের এই ধারণাটি ভুল। অর্থাৎ ভালর মধ্যে পরিষ্কার শ্রেণীভেদ, একটি পরম ভাল ও অন্যান্য আপেক্ষিক ভাল.—একটি সকল কর্মের চরম উদ্দেশ্য ও অপরগুলি তাহার উপায়মাত্র—একথা ঠিক নয়। প্রথমতঃ এইরূপ ধ্রুব ভালর ধারণা বাস্তবপক্ষে অনেকগুলি আছে এবং এদের মধ্যে কোনটি যথার্থ ও কোনগুলি ভ্রমমাত্র তার বিচার আজ অবধি হয়নি এবং হবার কোন সঙ্গত উপায় দেখি না। গায়ের জোরে বা মানুষের সাময়িক ও পরিবর্তনশীল ভাবাবেগের ওপর

প্রভাববিস্তার করে তাকে কোন একটি ভালর ধারণাকে গ্রহণ করানো সম্ভব হতে পারে, তবে তাহাতে কোন ফল হয় না এবং যুক্তি বিচারের দিক দিয়ে কিছুই প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ নীতি বিচারে দুই পক্ষের মতৈক্য ঘটাতে হলে যে তাহাদের একটি পরম ভাল সম্বন্ধে একমত হতে হবে এবং তারপর বিচার্য কাজটির ভাল মন্দ সেই পরম ভালর উপায় হিসাবে দেখে তার কার্যকারিতা সম্বন্ধেও একমত হতে হবে—এ ধারণা ভ্রান্ত। কারণ দুই পক্ষের দুটি ভিন্ন ভালর আদর্শ থাকতে পারে এবং একটি কাজ দুজনেই ভাল বলতে পারে যদি সেটি এই দুইটি আদর্শেরই সহায়ক হয়। সুতরাং নীতি ব্যাপারে আমাদের মতৈক্য বা মতবিরোধের ব্যাখ্যার জন্য পরম বা স্বকীয় ভাল বলে একটি ধারণার শরণ নেওয়ার আবশ্যকতা নেই। সুতরাং "কাজটি ভাল" অর্থে কাজটি কোন একটি পরম বা স্বয়ংসিদ্ধ ভালর সহায়ক,—এমন বলা চলে না। তৃতীয়তঃ, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়েছি যে এই স্বকীয় ভালর ধারণাটি অভিজ্ঞতাবাদী বা বিজ্ঞানের পক্ষে গ্রহণীয় নয়, কারণ কেন ভাল তা না বলতে পারলে গোঁড়ামী ও অন্ধ বিশ্বাসের শরণাপন্ন হতে হয়, এবং সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখলে প্রত্যেক আপাত-অন্তিম ভালর পিছনে দেখা যাবে তার কোন উদ্দেশ্য সাধনের বিস্মৃত ইতিহাস।

এতক্ষণে আমরা কী দেখলাম? দেখলাম "কাজটি ভাল" এই বাক্যটি বিবৃতিমূলক বলে মনে করলে নানান্ অসুবিধা হয়। ভাল বলে কোন প্রাকৃত বা অতিপ্রাকৃত ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং এদের প্রকল্প নীতি বিচারে বিশেষ কোন সাহায্য করে না। বরং নানা ধাঁধাঁর সৃষ্টি করে। তাহলে কী কাজটি ভাল বলতে কোন বিষয়গত জ্ঞানকে বুঝব না? অনেকের মতে এখানে আমাদের কোন বস্তুধর্ম বা ব্যাপারকে বুঝতে হবে না, বরং উপলব্ধি করতে হবে একটি আবেগকে যার ব্যঞ্জনা করাই উক্তিটির লক্ষ্য। "কাজটি ভাল" অর্থে "বেশ! বেশ!" "বাহবা! বাহবা!" এইরূপ মনে করতে হবে। এই অর্থে নীতি-বাচক বাক্য বাক্যই নয়, উচ্ছ্বাসমাত্র। আবেগ প্রকাশক চিহ্ন হিসাবে উক্তিটি গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং এর সত্য মিথ্যার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এইরূপ বিশ্লেষণ আমাদের নীতিবোধক উক্তিগুলির প্রতি ন্যায় বিচার করে না। কাজটি ভাল বলতে আমরা কেবল আমাদের সাময়িক আবেগ প্রকাশ করি না বরং আমাদের কোন বিশ্বাসকেও অপরের সামনে উপস্থিত করি। এবং এই সঙ্গে অপরকে আমাদের বিশ্বাসটি বিচার-পূর্বক গ্রহণ করতেও বলি। এই সমস্ত উদ্দেশ্য বা অর্থ উহ্য থাকে। বিশ্লেষণের কাজ এই উহ্যার্থ প্রকাশ করা।

কাজটি ভাল বলবার পেছনে যে সব সমর্থক বাক্যগুলি উহ্য থাকে সেগুলি কী প্রকারের ? একটি কাল্পনিক সংলাপ দ্বারা এইটি বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

রাম : কাজটি ভাল হয়েছে।

শ্যাম : তার মানে তোমার ভাল লেগেছে ?

রাম : শুধু আমার ভাল লাগেনি, আমার ভাল লাগার যোগ্য হয়েছে।

শ্যাম : তার মানে ?

রাম : তার মানে কাজটির এমন গুণাবলী আছে যে তা সকলের ভাল লাগা উচিত এবং আমি এটা ভাল বললাম এই জন্য যে তা শুনে অপরে যাতে এটাকে ভাল বলে বোধ করে আর এই রকম কাজ করতে প্রণোদিত হয়।

শ্যাম : কি গুণ দেখলে এই কাজের মধ্যে ? কিসে ভাল হয় ? ভাল বলতে কী বোঝ ?

রাম : ভাল বলতে বুঝি যা মানুষের মোক্ষ লাভের সহায়ক, যা মানুষকে এই সংসারের অনিত্যতা আর দুঃখ-ক্লেশ সম্বন্ধে সচেতন করতে সাহায্য করে আর এর থেকে নিবৃত্তি লাভের পথে এগিয়ে দেয়। এই কাজটিতে সেইগুণ দেখতে পাই।

শ্যাম : তাহলে ভালর একটি বিশেষ সংজ্ঞা নির্দেশ করা এবং এই সংজ্ঞাটিকে অপরকে গ্রহণ করতে প্রণোদিত করাই তোমার প্রধান উদ্দেশ্য। তুমি যে কাজটি সমর্থন করো ও এই সংজ্ঞাটিকে গ্রহণ করো এই সংবাদ জ্ঞাপন বা ঘোষণা করা তোমার গৌণ উদ্দেশ্য। সুতরাং দেখা যায় তোমার স্বকীয় মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গীটি অপরের মধ্যে সংক্রামিত করাই তোমার নীতিবোধক উক্তির মুখ্যার্থ এবং বলাবাহুল্য এই মুখ্যার্থটি ব্যঞ্জনার্থ, বাচ্যার্থ নয়। তোমার মনোভাবের বিবৃতিজ্ঞাপব গৌণার্থটিও ব্যঞ্জনার্থ। এই দুই প্রকার ব্যঞ্জনা তোমার উক্তি থেকে উদ্ধার করাই কি বিশ্লেষণের কাজ নয় ?

রাম : ঠিক তাই।

এখানে দেখতে পাই নীতিবোধক উক্তির পিছনে আছে দুটি অংশ, একটি বিবৃতি বা ঘোষণা-মূলক, অপরটি প্রণোদনা-মূলক। এই অর্থ দুইটিই সাধার ন্যায়বিচার মতে উক্তিটির বিশ্লেষণের ফলস্বরূপ পাওয়া যাবে না। এই দুটি অ ধ্বনিত হয়, সরাসরি ভাবে প্রকটিত হয় না। এইরূপ পরোক্ষভাবে উক্তিটির উদ্ধা

উদ্ধার করা নৈয়ায়িকের কাজ নয়, বরং আলংকারিকের কাজ, এবং এই কাজে একান্ত বিষয়ধর্মতা ও আবশ্যিকতা আশা করা যায় না। কারণ স্পষ্টই। যেমন কাব্যের ব্যঞ্জনার্থ প্রকাশ করতে হলে পাঠক বা আলংকারিক তার নিজস্ব ভাবধারা, ব্যক্তিগত মতামত একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে না তেমনি নীতিবিষয়ক আলোচনাতেও হয়। সে যাই হোক, এখন আমাদের সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে দু একটি কথার উল্লেখ ও আলোচনা করা যাক্।

প্রথমেই দেখতে পাই যে নীতিবোধক বাক্যের অর্থ বলতে আমরা সাধারণ অর্থে অর্থ বুঝি না। অর্থ কথাটির এখানে অর্থান্তর ঘটে, যেমন ঘটে কাব্যের ক্ষেত্রে। এখানে ভাবগত অর্থ, যা সরলভাবে কিছু না ব'লে পরোক্ষভাবে বলে, তাই নিয়েই কাজ। অথচ নীতিবোধক বাক্যের ভাষাগত আকার বিবৃতিমূলক এবং এর থেকে এমন ভ্রান্ত ধারণা জন্মে যে এই বাক্য কোন বিষয়গত ধর্ম সম্বন্ধে কিছু খবর দেয়। এখানে উল্লেখ করতে হয় যে যদিও আমরা দেখাতে পারি যে এই ধারণাটি ভ্রান্ত, যে ভাল মন্দ বলে কোন পদার্থ বা বস্তু নেই, তবু এ কথার উত্তর দিতে হয় যে এই ভ্রান্তির মূল কারণ কী? কেন আমরা প্রণোদনা-মূলক বা ভাবব্যাঞ্জক কথাগুলি বিবৃতিমূলক বাক্যের রূপে প্রকাশ করি? যেমন জগত মায়া প্রমাণিত হলেও মায়ার উৎপত্তি নিয়ে প্রশ্ন জেগে থাকে তেমনি আমাদের এই ভাবাবেগের ও কর্ম প্রণোদনার ভাষায় নীতিবোধক বাক্যের ব্যাখ্যার পেছনে ঐ রকম একটি প্রশ্ন থেকে যায় যার উত্তর এখনও পাইনি। এই প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত এক শ্রেণীর দার্শনিক বলবেন যে আমাদের এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্যক্ নয় এবং নীতি-বোধক বাক্যকে বিবৃতিমূলক বলেই গ্রহণ করা উচিত।

আর একটি কথা এই যে, কাজটি ভাল বলার পিছনে থাকে ভালর একটি সংজ্ঞা যাকে প্রকাশ করে কাজটির প্রত্যক্ষিত গুণাবলী। কাজটি সেই ভালর সংজ্ঞাটির উদাহরণ স্বরূপ। এই সংজ্ঞাটির নির্মাণে যুক্তি বিচারের চেয়ে স্বাধীন মনোভাব বা ব্যক্তিগত রুচিবোধই বেশী কার্যকরী হয়। এই সংজ্ঞা-নির্ম্মাণ তাই একটি স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বোঝায় এবং ইহা ভাব-নির্ভর আর তার বিবৃতি প্রণোদনা-মূলক। "ভাল সেই যা মোক্ষলাভের সহায়ক হয়" এই বিবৃতির প্রকৃত অর্থ এই "ভালকে আমি মোক্ষলাভের সহায়ক মনে করি আর আমার ইচ্ছা তোমরাও তাই করো।" এখানে বিবৃতি শুধু বক্তার মনোভাব সম্বন্ধীয়, কিন্তু এই বিবৃতি বক্তার আত্মচরিতকে প্রকাশ করে এবং বক্তা এর জন্য তেমন আগ্রহান্বিত নয়। বক্তার প্রধান উদ্দেশ্য শ্রোতার হৃদয়-পরিবর্ত্তন ঘটানো, এবং সেইজন্য এই

বাক্যটি (যা প্রথম বাক্য "কাজটি ভাল"র মধ্যে উহ্য থাকে) প্রধানতঃ ভাব ও আদেশ বাহক চিহ্ন। সুতরাং দেখা যায় "কাজটি ভাল কারণ এর এই এই গুণ আছে" এইরূপ বলার প্রধান অর্থ হচ্ছে "কাজটি অমুক আদর্শের দৃষ্টান্ত স্বরূপ এবং সেই আদর্শ ও এইরূপ কাজ সকলের প্রিয় হওয়া উচিত।" এখানে প্রণোদনা, কোন বিশেষ ভাব ও কর্মে প্রেরণা দান, এই লক্ষ্য। এর জন্য বক্তা পরে যুক্তি দিতে প্রস্তুত আছে এবং অপরের সমালোচনা শুনতে ও তাহার উত্তর দিতেও রাজী, কিন্তু তার প্রাথমিক উক্তির প্রধান অর্থ কোন বিবৃতি নয়, প্রণোদনা। এদিক দিয়ে দেখলে প্রত্যেক নীতিবাগিশগণই মুখ্যতঃ প্রচারক। নীতির রাজ্যে ভাবের অনেকান্ততার জন্য একটা নৈরাজ্যই দেখা যায়, মতৈক্য কমই। কারণ, মানুষ নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে বড় হয় আর তার রুচি আর মতিগতি বিভিন্ন প্রকার। এ অবস্থায় যুক্তি তর্ক দিয়ে মতৈক্য গড়ে তোলা তেমন সার্থক হয়নি যদিও সে চেষ্টাও মানুষকে করতে হবে। এক্ষেত্রে নীতিবোধক বাক্য যে প্রধানতঃ প্রণোদনা-মূলক হবে তা স্বাভাবিক। এবং এইরূপ প্রণোদনার মধ্য দিয়েই বেশীর ভাগ মতৈক্য গড়ে ওঠে।

সুতরাং দেখা যায় যে একজন আর একজনকে তার বিশেষ ভালবোধটি দ্বারা প্রভাবিত করতে চায়,—এইটিই নীতিবোধক বাক্যের প্রধান উদ্দেশ্য ও ব্যঞ্জনার্থ। ভাল কথাটির তাহলে কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। ভাল বলতে কেউ সুখবোধকে বোঝে, কেউ মোক্ষলাভকে, কেউ মানুষের বা তার নিজের গোষ্ঠির নিরাপত্তাকে বোঝে আবার কেউ সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতাকে বোঝে। রাম বললে, "যদু খুব ভাল, দেখো কেমন দানধান করে"। শ্যাম উত্তর দেয়, "যদু অপরের কাছ থেকে অনেক কেড়েছে তাই অপরকে দিতে পারছে আর এই দান করে তাদের পরনির্ভরতা বাড়াচ্ছে, এতে ভাল কোথায় দেখলে ?" তাহলে ওদের দুজনের ভালর ধারণা ভিন্ন। তবু ওদের ঝগড়া হয় কেন ? এ কি শুধু কথা নিয়ে ? ওরা কেন বলে না যে আমার ভাল এক তোমার ভাল আর এক, সুতরাং বিরোধ ও তর্কের অবকাশ নেই। যদি কোন পাকা বাড়ী দেখে আমার পূর্ব্ববঙ্গীয় বন্ধু বলে "দেখ কেমন দালান", তাহলে প্রথমে আমি তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতে পারি, কিন্তু পরে যখন দেখব দালান বলতে সে এক বোঝে আর আমি অন্য এক বস্তু, তখন তর্ক থেমে যাওয়াই স্বাভাবিক। তখন আমি যদি বলি, তুমি কেন দালান কথাটা অপপ্রয়োগ করছ ? তার উত্তরে সে বলবে কথায় কী আসে যায়। তেমনি তুমি যদি ভাল বলতে এক বোঝ আর আমি আর এক, আর যদি আমরা এই দুটি

পৃথক অর্থে বুঝে নিই তাহালে বিবাদের কারণ কী? কিন্তু কারণ আছে। "ভাল" কথাটির একটি সর্বজনগৃহীত ভাবার্থক আছে—যে অর্থে একটি ভাল কাজ সকলেরই কর্তব্য বলে মনে করি এবং তাহা কর্তাকে প্রশংসা ও গৌরব দান করে। এখন ভাল কথাটি যদি কেউ তার ইচ্ছামত এমন ভাবে ব্যবহার করে যে তাহা চতুর স্বার্থপর কাজ বা ব্যক্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তাহলে আমরা অবশ্যই আপত্তি করব। সুতরাং দেখা যায় যে "ভাল মন্দ" "উচিত অনুচিত" এই সব নীতিবোধক কথাগুলির বিবৃতিমূলক অর্থ ছাড়াও একটি করে ভাবার্থ বা আবেগব্যঞ্জনা আছে এবং এইজন্যই আমাদের বিভিন্ন বিবৃতিমূলক অর্থে তাহাদের ব্যবহার আমাদের মধ্যে বাদ-বিবাদের সৃষ্টি করে। আমাদের প্রশংসা ও আদর্শের বস্তু ভাল, যেমন হচ্ছে সত্য ও সুন্দর, এবং এই বস্তুটির রূপ কী হবে, এর সংজ্ঞা কী হবে, এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের চিত্তের ভাব ও কর্মকেন্দ্রগুলির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত; বিশুদ্ধ জ্ঞান বা জিজ্ঞাসার বিষয় নয়। সুতরাং ভাল মন্দের সংজ্ঞা গঠনের মধ্যে যে বিবৃতি ও তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায় এবং ইহার সমর্থনে যে যুক্তি বিচারেরও অবতারণা হয় এ সবই গৌণ ও অনেকটা বাচন ভঙ্গী মাত্র। প্রকৃতপক্ষে "ভাল অর্থে ক, খ, গ ইত্যাদি" এই কথার অর্থ হচ্ছে ভাল বা আদর্শকে ক, খ, গ ইত্যাদি রূপে গ্রহণ করতে আবেদন করি। অথচ একেবারে অন্ধ ভাবে কাহাকেও এই সংজ্ঞা গ্রহণ করতে বলা হয় না, এর পেছনে এক প্রকার যুক্তি দেওয়াও হয়—যে যুক্তি দেখায় এই আদর্শটির কতকগুলি আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি। কিন্তু এই সকলের পেছনে এদের ধারণ করে থাকে একটি সুসমঞ্জস মনোভাব যেটিকে অপরের চিত্তে প্রবাহিত করবার জন্য চাই প্রণোদনা। যুক্তি-তর্কের বাইরে তাই থাকে অলংকারপূর্ণ আবেগময় ভাষা, বক্তার ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও চারিত্রিক শক্তি। এই জন্যই লোকে নীতি শিখতে নীতিবাগীশের কাছে না গিয়ে যায় সাধু সন্তদের কাছে। নীতিধর্মের নানান্ মত ও পথের স্রষ্টা এই সাধু সন্তরাই। যুক্তি তর্ক দিয়ে অপরের নীতি বিষয়ে ভাবপরিবর্তন খুব কমই হয়ে থাকে, আবেগ ও ব্যক্তিগত আবেদন ও আদেশের মাধ্যমেই এ কাজ বেশীর ভাগ হয়। নীতিবাচক বাক্যগুলি তাই আবেগপ্রধান ও প্রেরণাময়, জ্ঞানজ্ঞাপক নয়। নীতিবিষয়ক আলোচনায় এই কথাটিই সব চেয়ে স্মরণীয়।

ন্যায়প্রকরণে বৈজ্ঞানিক তথ্য

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এম, এ

মানব সভ্যতায় বিজ্ঞানের ইতিহাস এত আধুনিক যে প্রায় সকল সভ্য দেশেই দর্শন শাস্ত্রের সহিত বিজ্ঞানের সংশ্রব অতি অর্বাচীন কালেই ঘটিয়াছে। এই সত্য বুঝিলে স্পষ্টই ধারণা জন্মে যে—(ক) যে দেশের দর্শন শাস্ত্রে কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য মিলে সে দেশ বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধানে যত্নশীল ছিল ইহা মানিতে হইবে, (খ) সে দেশে হয় কোন বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ছিলেন, নয় কোনও দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, (গ) যেখানে ন্যায় শাস্ত্রের শেষ সেখান হইতেই দর্শন শাস্ত্রের আরম্ভ—এই সত্য মতে ন্যায় শাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক তথ্য থাকিলে সেই ন্যায় শাস্ত্রকেও সেদেশে প্রকৃত যুক্তিমূলক করিবার চেষ্টা হইয়াছিল—ইহা নিঃসন্দেহ। অবশ্য ইহা বুঝিয়া রাখা প্রয়োজন যে বৈজ্ঞানিক তথ্যকে একেবারে ভিত্তি না করিয়াও শুদ্ধমাত্র যুক্তি আশ্রয় করিয়াই ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র গড়িয়া উঠিতে এবং বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তবে আশার কথা এই যে, ভারতীয় ন্যায়-দর্শনকে বিজ্ঞানের অধিকারে পরিচালিত এবং বিজ্ঞানের অনুশীলনে সহায়ক দেখিতে সুপ্রাচীন বার্ত্তিক-কার ভারদ্বাজ উদ্যোতকর একান্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনে বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধান করিতে গেলে উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে।

ভারতবর্ষে যে এক সময়ে বিজ্ঞানের অনুশীলন হইয়াছিল তাহার প্রমাণ ভারতীয় বর্ণমালার বিজ্ঞানসম্মত উচ্চারণ প্রণালী এবং ভারতের উদ্ভাবিত দশাঙ্ক গণনা লেখনপদ্ধতি; কিন্তু এই অনুশীলনের কাল আমাদের নিকট অজ্ঞাত। তবে বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদ যুগে হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রকে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব এই যুগেই বৈশেষিক ন্যায়দর্শনের উদ্ভব। বৈশেষিক দর্শনের স্রষ্টা কণাদ আপনাকে পদার্থের গুণ নির্ণয়ে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি বিজ্ঞানসম্মত পরমাণুবাদ ভিত্তিতে তাঁহার দর্শনশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই দর্শনের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার প্রশস্তবাদ পৃথিবীস্থ দেহীগণের বিভাগ সম্বন্ধে প্রথমে (ক) যোনিজ ও (খ) অযোনিজ বিভাগ পরে যোনিজ দেহীর বিভাগকে পুনরায় (i) জরায়ুজ ও (ii) অণ্ডজ যে বিভাগ করিয়াছেন

তাহাও একেবারে বিজ্ঞানসম্মত সন্দেহ নাই। বস্তুত উপরোক্ত সিদ্ধান্তটি যে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ মূলীভূত তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করিতে হয়। প্রশস্তপাদ প্রভৃতি বৈশেষিকের ভাষ্যকার মতে যদিও বৃক্ষাদি শরীর নহে, তথাপি কিরণাবলী-কার উদয়নাচার্য দৃঢ় যুক্তি দ্বারা বৃক্ষাদির সজীবত্ব সমর্থন করিয়াছেন। আচার্যের এই সমর্থন বৃক্ষায়ুর্বেদ, মহাভারত (শান্তিপর্ব—১৮৪ আঃ) ও মনুসংহিতা (৪.৫৯ ও ১২।৯) প্রভৃতির মতের আবৃত্তি মাত্র; কারণ এই সমস্ত গ্রন্থে বৃক্ষাদির সজীবত্ব ও সুখ দুঃখ রোগাদিবোধ বর্ণিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়বৈশেষিক গ্রন্থ "ভাষা পরিচ্ছেদ" বৃক্ষাদির ভগ্ন ক্ষতের সংরোহণ (অর্থাৎ ছেদনাদির জন্য বিভক্ত অবয়বের পূরণ) ও উপচয় প্রভৃতি দ্বারা ইহাদের প্রাণ বায়ুর সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছেন [ভগ্ন ক্ষত সংরোহণাদি তদনুমানাৎ—৩৮ কারিকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলী]। ন্যায়-দর্শন ৪।২।১৫ সূত্রেও পরমাণুবাদ স্বীকৃত।

সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়-বার্ত্তিক-কার উদ্যোতকর তাঁহার গ্রন্থে বিজ্ঞানের প্রভাব বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"নৈষ দোষো বিজ্ঞানস্যাধিকৃতত্বাৎ (পৃঃ—৪৫)"। ইহার প্রসিদ্ধ তাৎপর্য-টীকায় সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিখ্যাত বাচস্পতি মিশ্র "নৈষ দোষ" অংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে—"বিশিষ্টজ্ঞানম্ বিজ্ঞানম্"। এমতে বিজ্ঞান আন্বীক্ষিকী অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। ন্যায়মঞ্জরী-কার গৌড় নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় "পূর্ণচন্দ্রোদয়াদ্বৃদ্ধিরম্বুধেরবগম্যতে" বলিয়া একটি বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ন্যায় বৈশেষিকবাদে বিজ্ঞানকে যে নিস্পৃহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেই বিচার করা হইয়াছে তাহা সাংখ্যের মনোবিজ্ঞানকে অভিব্যক্তিবাদের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস হইতেই বুঝা যায়। প্রাণী বা মানুষের ব্যবহার (behaviour) যে অভিব্যক্তি নিবন্ধনই প্রকাশ পায় তাহা সাংখ্য প্রবচন সূত্রের—'অভিব্যক্তি নিবন্ধনৌ ব্যবহারা-ব্যবহারৌ (১০।১২০)" মর্মার্থে প্রকাশ করা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত দর্শন নহে বটে কিন্তু দর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট যোগদর্শনে মনো-বিজ্ঞানের বহু তথ্য মিলে বলিয়া সাংখ্যের উক্ত সূত্রটিকে বৈজ্ঞানিকতার প্রমাণ হিসাবে ধরা যায়। আচার্য জয়ন্ত ভট্ট ১।১।১২ ন্যায় সূত্র ব্যাখ্যায় অহঙ্কার আলোচনা প্রসঙ্গে উক্ত তথ্যের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছেন।

মীমাংসাদর্শন মূলতঃ যাগযজ্ঞভিত্তিক সামাজিক শাস্ত্র কিন্তু ইহার মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য আলোচিত হইতে দেখা যায় এবং সেজন্য সুবিখ্যাত "ন্যায়রত্নমালা" গ্রন্থে আচার্য পার্থসারথি মিশ্রের উক্তি এই যে—বিজ্ঞানাদেব

প্রামাণ্যং ভাতীতি"। এই দর্শনের উপর নারায়ণ ভট্ট (১৫৬০—১৫৬৫ খৃঃ) লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মানমেয়োদয়ে" ধ্বনি অর্থাৎ sound সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থমতে—"ধ্বনি বায়ুগুণঃ শব্দাভিব্যঞ্জক (পৃঃ—২২৫)"। শব্দ সঞ্চরণ সম্পর্কে এই গ্রন্থের অভিমত লক্ষ্য করিলে বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিবে। এই গ্রন্থের ২২২।২২৩ পৃষ্ঠায় শব্দের সঞ্চার সম্বন্ধে অভিঘাত দ্বারা শব্দ সৃষ্টি এবং বেগ (valocity) দ্বারা প্রেরণ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে! মানমেয়োদয়ের উক্তি এই যে—"তাব্বাদি ব্যাপারোৎপন্ন শ্রোত্রসংযোগস্যৈবাভিব্যঞ্জকত্বাঙ্গীকারাৎ ধ্বনিনাং বায়ুবিশেষত্বাৎ তৎপ্রেরক তাব্বাদি -ব্যাপারবলানুসারেণ অদূর শ্রবণাদি ব্যবস্থোপপত্তেশ্চ"। মীমাংসা শাবর ভাষ্যেও—"অভিঘাতেন হি প্রেরিতা বায়বঃ স্তিমিতানি বায়ুস্তরাণি প্রতিরোমানা সর্বতোদিক্কান সংযোগবিভাগানুৎপাদয়ন্তো যাবদ্বেগ অভিপ্রতিষ্ঠিতে—(১।১।১৩)" বলা হইয়াছে। উক্ত সূত্রদ্বয়ে শব্দের বিস্তারের জন্য যে বাস্তব মাধ্যম আবশ্যক এবং বায়ুই যে ঐ মাধ্যম এই বৈজ্ঞানিক সূত্র সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া শব্দ প্রবাহিত হইতে থাকিলে শব্দপ্রেরক ও শব্দগ্রাহক অর্থাৎ কর্ণমধ্যস্থিত বায়ু যে তরঙ্গধর্ম মানিয়া সংযোগ অর্থাৎ সঙ্কোচন ও বিভাগ অর্থাৎ প্রসারণ, সর্বতোদিক্কান অর্থাৎ চতুর্দিকে পাইতে পাইতে ধাবিত হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত বেগ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শব্দ সৃষ্টি করে তাহাও বলা হইয়াছে। আচার্য জয়ন্ত ভট্টের ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থের ২১২ পৃষ্ঠায় উক্ত সত্যের প্রথম আলোচনা দেখা যায়।

ন্যায় শাস্ত্রের মধ্যে নিঃশ্রেয়স, অপবর্গ ইত্যাদির আলোচনা থাকায় ইহাকে একদল পণ্ডিত দর্শনের মর্যাদা দান করিলেও কৌটিল্য প্রভৃতি মনীষি ইহাকে প্রয়োগবিদ্যা হিসাবে বিবেচনা করিয়াই আন্বীক্ষিকী আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। বৈশেষিকের সহিত পরমাণুবাদ ভিত্তিতে সংযুক্ত থাকায় ইহাতে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা দ্বারা ইহাতে স্বতন্ত্রভাবে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান মিলে তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। কৌণ্ড ভট্টের "পদার্থ-দীপিকা" গ্রন্থে অভাববিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে শরীর সৃষ্টির হেতুত্ব নির্ধারণ করিতে গিয়া অভিব্যক্তিপরম্পরাকেই (Evolutionism) যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াছেন [অভিব্যক্তি পরম্পরা চ জন্য জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নে শরীরস্য হেতুত্বেন তদভাবাস্নযুক্তা— পৃঃ—৪৭]।

সমগ্র পৃথিবীতে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশে সকল জ্ঞান বিভাগ এমন কি

(মার্ক্‌স) এঙ্গেল্‌সবাদ (এঙ্গেল্‌সের—The Part played by Labour in the transition from Ape to Man) আজ এই মতবাদ আশ্রয় করিয়াই চলিতেছে। এই তথ্যের বাস্তব ভিত্তি স্বীকার করিয়াই বর্তমান যুগে Paleontology গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের ন্যায়শাস্ত্রে অখ্যাতনামা কোন লেখক কর্তৃক এরূপ বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন দেখিয়া আমরা আমাদের দর্শনগুলি লইয়া নিশ্চয় গৌরব অনুভব করিতে পারি। অবশ্যই এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য সর্বথা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কারণ প্রাচীন যুগে পার্থিব সুখসুবিধার মূল্যহীনতায় অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলেই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সহিত হিন্দু মনীষার সংস্রব ছিন্ন হইয়া ভারতভূমিতে বয়েল (Boyle) বা নিউটনের আবির্ভাব অসম্ভব হইয়াছিল ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভারতীয় শাস্ত্রের এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য আমাদিগকে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হইবার যথেষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে।

যদিও মূল বেদান্ত সূত্রে কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য নাই তথাপি বিজ্ঞান শাস্ত্রের সংজ্ঞা বুঝিবার জন্য এই দর্শনের কথঞ্চিত আলোচনা পরিশেষে করা কর্তব্য। এই দর্শনে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদ (৩।৯।২৮) হইতে উদ্ধৃত সূত্রদ্বারা জানা যায় "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"। দর্শনটীর বিভিন্ন ভাষ্যে ব্রহ্মকে নিরুপাধিক শাস্ত্র বলা হইয়াছে। আর "মানমেয়োদয়" মতে—নিরুপাধিকত্বমবমধারণং চ ভূয়োদর্শন সাধ্যমেব ইতি তৈরপ্যুক্তম্‌ (পৃঃ—৩৭)। কাজেই অবধারণ ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ, ভূয়োদর্শন ফলে সম্ভব—একথা দার্শনিকেরা স্বীকার করিয়া অনুশীলন তত্ত্ব পরিষ্কার ভাবে বলিয়া গিয়াছেন। বাচস্পতির তাৎপর্যটীকায় ইহাই বিশেষভাবে স্বীকৃত।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত একটী বৈজ্ঞানিক তথ্য এই যে—যেখানে ন্যায়বৈশেষিকের শেষ সেখানেই প্রকৃত দর্শনের আরম্ভ। এই জন্য বিদ্যারণ্য মুনি তৈত্তিরীয় উপনিষদের দীপিকায় লিখিয়াছেন—"মূলকারণাৎ পরব্রহ্মণে উপেক্ষা আকাশ কাল দিশত পর মানবশ্চ সদা ব্যবস্থিতাঃ তদা তত আরভ্য উত্তর কালীনা সৃষ্টি গৌতমাদ্যুক্ত প্রকারেণ ব্যবতিষ্ঠতাম্‌"। এই উক্তি বৈজ্ঞানিক তথ্য দ্বারাও বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে পরীক্ষার স্থান আগে কি নিয়মের স্থান আগে তাহা সুনিশ্চিত ভাবে বলিতে গিয়া বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য (১২৬৯—১৩৫০ খ্রীঃ) লিখিত বিশিষ্টাদ্বৈত নৈয়ায়িক গ্রন্থ "ন্যায়-পরিশুদ্ধি"র উক্তি এই যে—"সম্বন্ধাসম্বন্ধাভ্যাং নিয়মাদিতি চেৎ ন সম্বন্ধস্যাপি সমবায়নায়ঃ সার্বত্রিকত্বাভ্যুপগমাৎ তত্রাভিব্যক্তি নিয়মস্যত্রষ্টব্যত্বাৎ (পৃঃ—৫০০।১)"। আমরা ন্যায় বা

আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রের আধুনিক আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্য নির্ণয়ে সমবায় শাস্ত্রকে প্রধান সহায়ক বলিয়া ধরিতেছি, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে পরীক্ষা দ্বারা কোনও সত্য প্রতিষ্ঠা করিবার পূর্ব্বেই অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য সঙ্গত নিয়ম আমাদের জ্ঞানের সীমায় ধরা দিতে পারে, তাহা—"ন চ তদেবানুমিতম্, অনবগতনিয়মত্বাৎ (ন্যায় লীলাবতী ; পৃঃ—৪৯৩)" সিদ্ধান্তমতে স্বীকৃত। অতএব আমরা যে তথ্যগুলি পাইতেছি সেগুলি বিভিন্ন দর্শনের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করিলেও ন্যায় প্রকরণের মাধ্যমে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। আমরা যে বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করিতেছি সেযুগে ইহা অপেক্ষা উন্নততর নৈয়ায়িক তথ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভিত্তিতে অন্য কোনও দেশ প্রকাশ করিয়াছে মনে হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—

নানা কারণে 'দর্শন' পত্রিকা এ পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে বাহির করা সম্ভব হয় নাই। দর্শন পরিষদের কার্য্যকরী সমিতি স্থির করিয়াছেন যে পত্রিকার ১৩৬৩, ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ সালের সংখ্যাগুলি বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া ১৩৬৬ সালের বৈশাখ হইতে পত্রিকা বাহির করা হইবে। যাঁহারা ১৩৬২ সাল পর্য্যন্ত পত্রিকার চাঁদা দিয়াছেন তাঁহাদের পরবর্ত্তী (বা প্রদত্ত) চাঁদা ১৩৬৬ সালের চাঁদা বলিয়া গণ্য করা হইবে।

সম্প্রতি কাগজের দাম বাড়িয়া যাওয়ায় আমরা পত্রিকার প্রতিসংখ্যার মূল্য ১।০ এবং বার্ষিক মূল্য ৫৲ করিতে বাধ্য হইলাম। ১৩৬৬ সাল হইতে এই দামে দর্শন পত্রিকা পাওয়া যাইবে।

আশা করি আমরা পরিষদের সভ্য ও পত্রিকার গ্রাহকদের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব না। তাঁহাদের সক্রিয় সহানুভূতি পাইলে এখন হইতে আমরা নিয়মিতভাবে পত্রিকা বাহির করিতে পারিব ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

কর্ম্মাধ্যক্ষ—

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ।

Statement about ownership and other particulars about newspaper* Darsan *to be published in the first issue every year after last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	Calcutta
2.	Periodicity of its Publication	Quarterly
3.	Printer's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20/2, Halderbagan Lane, Cal.-4
4.	Publisher's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20/2, Halder Bagan Lane, Cal-4
5.	Editor's Name	Sri Kali Krishna Bannerjee
	Nationality	Indian
	Address	26/4A, Sashibhushan De St., Cal.-12
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent. of the total capital.	Bangiya Darsan Parishad 20/2, Halderbagan Lane, Calcutta—4

I, Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of ny knowledge and belief.

Dated 22nd May, 1959

Signature of Publisher

K. C. Gupta

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১।০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট (২৬।৪।এ, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২) পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্
২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

PUBLISHED BY K. C. GUPTA, M. A. FROM 20-2, HALDER BAGAN LANE, CALCUTTA AND PRINTED BY SRI RAMRANJAN DAS. SRI HARI ART PRESS, 1, HARITAKI BAGAN LANE, CALCUTTA—6.

May, 1959—150.

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা]　　　　শ্রাবণ　　　　[১৩৬৬ সাল

সম্পাদকীয় সমিতি

অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (প্রধান সম্পাদক)

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী, এম.এ.

মূল্য ১।৹　　　　বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা-৪

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৩শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা] শ্রাবণ [১৩৬৬ সাল

সূচীপত্র

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ পালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ কর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

—:০:-

রজ্জু-সর্পের মিথ্যাত্ব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বলা হয়। এস্থলে বলা উচিত "রজ্জুতে সর্প-ভ্রম"। কারণ, রজ্জুতে সর্প-দৃষ্টির দ্বিতীয় স্তরে (stage এ) আসিলেই বুঝিতে পারা যায় যে রজ্জুতে সর্প ছিল না, নাই এবং থাকিবে না। সুতরাং এই সর্প-দৃষ্টি একেবারেই ভ্রান্ত, সুতরাং মিথ্যা। মায়াবাদ এইরূপ মিথ্যার এবং শশ-শৃঙ্গ ও আকাশ-কুসুম প্রভৃতির মিথ্যাত্বের মধ্যে পার্থক্য স্থাপন করেন। অর্থাৎ মায়াবাদ বলেন যে শশশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম, বন্ধ্যাপুত্র কেহ কখনও দেখে নাই, কিন্তু রজ্জু-সর্প প্রথমে দেখা যায়, তৎপর ভ্রম সংশোধন হইলে রজ্জুতে সর্প থাকে না, রজজুকে রজ্জু ভাবেই দেখা যায়। সুতরাং রজ্জুতে সর্প-দর্শন ভ্রমজনিত। এই ভ্রমের কারণ নানাবিধ। যথা, চক্ষু রোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, অল্পালোক, রজ্জুর সর্পাকারে অর্থাৎ আঁকা বাঁকা ভাবে অবস্থান, পূর্ব্ব সংস্কার প্রভৃতি। এই যে আমাদের ভ্রম, ইহা নানা প্রকারের এবং নানা ভাবেই সংঘটিত হয়। আমরা যদি স্বপ্ন সম্বন্ধে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে অধিকাংশ স্বপ্নই মিথ্যা। মিথ্যা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু ও ঘটনা সমূহ সম্পূর্ণ মিথ্যা। মিথ্যা স্বপ্নে দৃষ্ট মিথ্যা বস্তু সমূহের কোনই অধিষ্ঠান নাই। উহারা মস্তিষ্ক বিকৃতি ও পূর্ব্ব সংস্কারের ফল মাত্র। অতএব দেখা গেল যে প্রোক্ত উভয় প্রকার পদার্থই সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু এই মিথ্যার Presentation বিভিন্ন। Presentation বিভিন্ন হইলেই যে উভয় প্রকার পদার্থই সমভাবে মিথ্যা,

তাহা প্রদর্শিত হইতেছে, বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শনের কারণ আমাদের ভ্রান্তি। এই প্রকার ভ্রমকেই Illusion বলা হয়। এখন ভ্রম সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাউক্।

আমরা অসংখ্য প্রকারের ভুল করি। ভুলের কারণও অনেক। নিম্নলিখিত কারণ সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও প্রধান কারণ আমাদের স্বাভাবিক অপূর্ণতা। অপূর্ণ জীবে যাহা আমরা জ্ঞান বলিয়া মনে করি, তাহা প্রকৃত পক্ষে সত্য জ্ঞান নহে। আত্মার জ্ঞানই মস্তিষ্কের মাধ্যমে চারিভাবে প্রকাশিত হয় যথা— বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহংকার। ইহাদিগের সমষ্টিকেই অন্তঃকরণ বলা হয়। আত্মার জ্ঞান নিত্য বিশুদ্ধ, কিন্তু মস্তিষ্ক সংসর্গে আসিয়া বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। আবার অন্তঃকরণের ভাব ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহিঃপ্রকাশিত হইলে উহা আরও বিকৃত হয়। কাহারও মস্তিষ্ক বা ইন্দ্রিয়গণ আত্মার জ্ঞান বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। ইহার উপর সকলেরই মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণ অল্পাধিক বিকৃত ও অপটু (Defective). আবার ইহার উপরও বহু সংস্কার অন্তঃকরণে সঞ্চিত থাকে। সুতরাং আত্মার জ্ঞান অতি বিকৃত ভাবেই বাহিরে প্রকাশিত হয়। আত্মার জ্ঞান আছে, ইহা সত্য। কিন্তু অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না ইত্যাদি। আবার চক্ষুরোগ থাকিলে দ্বি-চন্দ্র কেন বহু-চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু চন্দ্র একটী। সেইরূপ কর্ণ রোগগ্রস্থ ব্যক্তি এককথায় অন্য কথা শুনে ইত্যাদি। সুতরাং বহিরিন্দ্রিয়ে Defect থাকিলে যে জ্ঞানের বিকৃতি হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেকেরই মস্তিষ্ক অল্পাধিক বিকৃত এবং উহা স্বাভাবিক ভাবেই অপূর্ণ ও জড় পদার্থ দ্বারা গঠিত। সুতরাং উহা আত্মার জ্ঞান পূর্ণভাবে ধারণা ও প্রকাশ করিতে পারে না। এস্থলে ইহা অবশ্য বক্তব্য যে কর্ণ, চর্ম, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা ক্রমান্বয় ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতির সত্ত্বাংশ প্রধানভাবে গঠিত এবং মস্তিষ্ক এই পঞ্চ সত্ত্বাংশের সমষ্টি প্রধান ভাবে গঠিত। সত্ত্ব গুণ স্বচ্ছ। সেইজন্য আত্মার জ্ঞান মস্তিষ্কের মাধ্যমে প্রকাশিত হইতে পারে। আবার আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় নানা ভূতের সত্ত্বাংশ দ্বারা গঠিত বলিয়া আত্মার জ্ঞান মস্তিষ্কের মাধ্যমে আংশিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারে। অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান Indirectly (গৌণ ভাবে) অর্থাৎ মস্তিষ্কের মাধ্যমে উহাদের সহিত যুক্ত হয় বলিয়া আমরা বাহিরের বস্তুর জ্ঞান লাভ করি। ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের ১২/ ৪-৫ মন্ত্র দ্বয়ে বলা হইয়াছে যে জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ও মনঃ যন্ত্র মাত্র, আত্মাই দেখেন, শুনেন, মনন করেন ইত্যাদি। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম যে আত্মার জ্ঞানে ভ্রম নাই বটে, কিন্তু দেহ সংসর্গে আসিয়া বিকৃত হয় এবং মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণের Defect এর পরিমাণানুযায়ী বিকৃতির

মাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারাও আমরা বুঝিতে পারি যে এই তত্ত্ব সত্য। একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক্। সূর্য্যরশ্মি শুভ্রবর্ণ। কিন্তু উহা যখন গৃহে নানাবর্ণের কাচের মধ্য দিয়া আসে, তখন আমরা উহাকে নানাবর্ণে রঞ্জিত দেখি। সেইরূপ আত্মার জ্ঞান নিত্য বিশুদ্ধ, কিন্তু উহা যখন যেরূপ মস্তিষ্কের ও ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়, তখন উহা সেইরূপ ভাবেই বিকৃত হয়। মস্তিষ্কের ও ইন্দ্রিয়ের বিকৃতির মাত্রা যত অধিক হইবে, আত্মার জ্ঞানও ততোঽধিক বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হইবে। এই ভ্রমের মাত্রা ততই হ্রাস পাইতে থাকিবে, যতই আমরা মস্তিষ্ক ও ইন্দ্রিয়গণের Defect দূর করিতে পারিব। আত্মার জ্ঞান কখনই অসম্পূর্ণ বা অশুদ্ধ নহে। কিন্তু যে সকল যন্ত্রের মধ্য দিয়া উহা প্রকাশিত হয়, উহাদের Defect এর জন্য সেই জ্ঞান বিকৃত হইবেই। সময় সময় যন্ত্রগুলির বিকৃতির মাত্রা এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে উহা জ্ঞানকে অত্যন্ত ভাবে আবরণ করিয়া রাখে এবং এককে অন্য ভাবে প্রদর্শন করে। উন্মাদ ও Hysteria রোগের Acute অবস্থায় রোগী অধিষ্ঠান ব্যতীতও নানা অবাস্তব বস্তুও দেখে। তাহাদের পক্ষে আকাশ-কুসুম, শশশৃঙ্গ দেখা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ইহা যখন সত্য, তখন রজ্জুতে সর্প-দর্শন, মিথ্যা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু সমূহ যেমন মিথ্যা, আকাশ-কুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতিও তেমনি মিথ্যা। এই সকল স্থলে মিথ্যাত্বের কোনই পার্থক্য নাই, অধিষ্ঠানের কোনই অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই। এই তিন প্রকার পদার্থের (যদি উহাদিগকে একান্তই পদার্থ বলা হয়) কোনই উপাদান কারণ নাই। যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে রজ্জু-সর্প বা মিথ্যা-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু-সমূহের যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞান নহে, বিকৃত জ্ঞানও নহে, কিন্তু মিথ্যা কল্পনা মাত্র। মিথ্যা জ্ঞান জ্ঞান নহে। উহার মধ্যে সত্যের লেশ মাত্রও নাই। সুতরাং সেইরূপ জ্ঞানকে জ্ঞান বলাও যাহা, বন্ধ্যা পুত্রের অস্তিত্ব স্বীকার করাও তাহা। অতএব ইহা প্রমাণিত হইল যে রজ্জু-সর্পের জ্ঞান ও বন্ধ্যা-পুত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা ও এক পর্য্যায়ভুক্ত। মিথ্যা মিথ্যাই। "There cannot be degree of unreality. যাহা একমাত্র subjective ভাবেই উৎপন্ন অর্থাৎ Imagination দ্বারা রচিত, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যাই, কখনও সত্য নহে —সাময়িক ভাবেও নহে।

দর্শনশাস্ত্র মূল অনুসন্ধান করিবে। উহা বাহিরের স্থূল বা ভ্রান্ত প্রকাশ লইয়াই বিচার করিবে না। আমরা ভ্রমের মূল অনুসন্ধানে পাইলাম যে রজ্জু-সর্পের এবং স্বপ্ন-দৃষ্ট-বস্তুসমূহের অস্তিত্ব কোন কালেও ছিলনা, নাই এবং থাকিবেনা। সুতরাং উহারাও আকাশ-কুসুম, বন্ধ্যা-পুত্র ও শশ-শৃঙ্গের ন্যায় সম্পূর্ণ মিথ্যাই।

উহাদের জন্য ভিন্ন Category সৃষ্টি করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। রজ্জুকে সর্পে পরিবর্ত্তিত হইতে কেহ কখনও দেখে নাই। মিথ্যা স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু ও ঘটনা-সমূহ কেহ কখনও জাগরণ অবস্থায় বাস্তব ভাবে দেখে নাই। সুতরাং উহারা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এখন Illusion এর জন্য যে অধিষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজন নাই, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। বাতুলতা ও Hysteria রোগের উৎকট অবস্থায় বাতুল ও স্ত্রীলোক অধিষ্ঠান ব্যতীত ও বহু অবাস্তব বস্তু বাস্তব ভাবে দেখিতে পায়। আবার যদি কোন বিকৃত মস্তিষ্ক পুরুষ কোনও স্ত্রীলোকের রূপ-মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে চিন্তা করে, তবে সেই ব্যক্তিও সময় সময় জাগরণ অবস্থায়ও সেই স্ত্রীলোকের ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিতে পারে। সেইরূপ কোনও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি কোনও বিষয়ের জন্য দুশ্চিন্তা দ্বারা বিশেষ ভাবে আক্রান্ত হইলে সে সেই সম্বন্ধীয় কিছুনা কিছু জাগরণ অবস্থায়ও দেখিতে পারে। দুই ব্যক্তির কল্পনা করা যাউক্। একজন বিকৃত মস্তিষ্ক, চক্ষু রোগগ্রস্থ, Nervous ও ভীরু স্বভাব। অন্যজন সুস্থ মস্তিষ্ক, চক্ষুরোগ হীন, শান্ত ও সাহসী। উভয়েরই অবশ্য সর্প সম্বন্ধে পূর্ব্ব সংস্কার আছে। এই ব্যক্তিদ্বয় যদি অল্পালোকে আঁকা বাঁকা ভাবে স্থাপিত রজ্জু দেখে, তবে প্রথম ব্যক্তি উহাকে সর্প মনে করিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি কখনই উহাকে সর্প মনে করিবে না। বরং প্রথম ব্যক্তি যখন সাপ সাপ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিবে, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে বলিয়া দিবে যে উহা সর্প নহে, রজ্জু মাত্র অর্থাৎ উহা তাহার ভ্রান্তি মাত্র। স্বপ্নাবস্থায়ও অধিষ্ঠান ব্যতীত বহু বহু অবাস্তব বস্তু বাস্তব ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। স্থূল, বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি সংস্কার, দুশ্চিন্তা প্রভৃতির জন্য স্বপ্নে যেমন নানাপ্রকার অসম্ভব বস্তু বাস্তব ভাবে দেখে, জাগরণেও সেইরূপ দেখিতে পারে। পার্থক্য এই যে জাগরণে দেখা মস্তিষ্ক বিকৃতির উৎকট অবস্থায় মাত্র সম্ভব হয়। কারণ, সাধারণের জ্ঞান তখন বিশেষ ভাবে জাগ্রত থাকে। তাই ভ্রমের সম্ভাবনা অল্পে পরিণত হয়। সুতরাং রজ্জু অধিষ্ঠান ব্যতীতও Illusion হইতে পারে। সুতরাং Illusion এর জন্য অধিষ্ঠান অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সকলেরই অল্পাধিক মস্তিষ্ক বিকৃতি আছে। স্বপ্নে ও জাগরণে যে সকল অসম্ভব বস্তু বাস্তবভাবে দেখা যায়, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ মস্তিষ্ক বিকৃতি ও পূর্ব্ব সংস্কার। অধিষ্ঠানের কোনই অবশ্য প্রয়োজনীয়তা নাই।

যদি দ্রষ্টার মস্তিষ্ক বিকৃতি না থাকিত, চক্ষুরোগ না থাকিত, যদি সর্প সম্বন্ধে

পূর্ব্ব সংস্কার না থাকিত, অল্লালোক না থাকিত, তবে রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইত না, উহা আঁকা বাঁকা ভাবে থাকিলেও নহে। দিবা দ্বিপ্রহরে যখন সূর্য্য আলোক দিতেছে এবং আকাশ মেঘশূন্য, তখন সুস্থমস্তিষ্ক, চক্ষুরোগহীন, পূর্ব্ব সংস্কার বিবর্জ্জিতের পক্ষে রজ্জুতে সর্প-ভ্রম অসম্ভব। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে ঐ সকল অবস্থাই অর্থাৎ মস্তিষ্ক বিকৃতি, পূর্ব্ব সংস্কার প্রভৃতি রজ্জু-সর্পের প্রধান কারণ, অধিষ্ঠান নহে।

নিম্নলিখিত কথাগুলির উপর পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

No two men agree.

No two clocks can go together.

এমন দুইটী মানুষ নাই যাহাদের দেহের গঠন সম্পূর্ণরূপে এক। দুইটী যমজ ভ্রাতা ও ভগ্নীর দেহও সম্পূর্ণরূপে এক নহে। প্রত্যেক শ্রেণীর জীব জন্তু সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। আবার কেহই এমনভাবে দুইটী জিনিষ তৈয়ার করিতে পারেনা যাহারা সম্পূর্ণরূপে এক হইবে। মানুষের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করিলেও বুঝিতে পারা যায় যে নানা ব্যক্তির নানা অবস্থা। আবার ইহাও দেখা যায় যে কেহ বা পশুজীবন যাপন করিতেছে, অপরজন দেব জীবন যাপন করিতেছে। কিন্তু সকল প্রকার মানুষকেই মানুষ বলা হয়। বিভিন্ন প্রকারের জীবজন্তু এবং মনুষ্য কৃত জিনিষ পত্রের মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও উহাদিগকে এক একটী শ্রেণীতে ভুক্ত করা হয়। যথা—সকল সিংহই সিংহ, সকল ব্যাঘ্রই ব্যাঘ্র, সকল table ই table, সকল chair ই chair ইত্যাদি। সুতরাং মিথ্যা মিথ্যাই। উহার প্রকার ভেদের কোনই প্রয়োজন নাই। যদি প্রকার ভেদ করিতে হয়, তবে প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক কৃত্রিম বস্তু, প্রত্যেক নৈসর্গিক পদার্থ এক একটী পৃথক্ পৃথক্ পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। সুতরাং category অসংখ্য হইবে। তাহা কিন্তু কেহই বলে না। অঙ্ক শাস্ত্রে দেখা যায় যে কোন কোন অঙ্কের দুই বা ততোধিক process এ ফল বাহির করা যায়। সকল process এই একই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেইরূপ আকাশ-কুসুম, মিথ্যা-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সমূহ, রজ্জু-সর্প প্রভৃতি বিভিন্ন process এ বলিয়া দিতেছে যে উহারা সকলেই সর্ব্বৈব মিথ্যা। আরও একভাবে আমরা মিথ্যা অনুমান করি। কেহ Aeroplane এ অতি উচ্চ স্থান হইতে কলিকাতা নগরী দর্শন করিলে উহাকে অত্যধিক ভাবে ক্ষুদ্র দেখায়। সূর্য্য হইতেও বৃহত্তর নক্ষত্রও আমাদিগের নিকট বিন্দু মাত্র মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উক্ত নক্ষত্রসমূহ বা কলিকাতা নগরী ক্ষুদ্র নহে। সুতরাং সেইরূপ অনুমান মিথ্যা। ইহার কারণ আমাদের দৃষ্টি শক্তির

অক্ষমতা। এইরূপ আরও বহু প্রকারের ভ্রম আছে। ভ্রমের কারণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। এই সকল মিথ্যাই সম্পূর্ণ মিথ্যা। উহাদের মিথ্যাত্বের প্রণালীগত যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও উহারা সমভাবে সর্ব্বৈব মিথ্যা।

যদি বলেন যে সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করিলে বন্ধ্যাপুত্র ও রজ্জু-সর্পের মিথ্যাত্বের যৎকিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, তবে বলিতে হয় যে আরও সূক্ষ্মতর ভাবে চিন্তাদ্বারা মূলে পৌঁছিলে সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারা যায় যে উভয় পদার্থই সম্পূর্ণ মিথ্যা—মিথ্যা কল্পনা প্রসূত বই আর কিছুই নহে। উহাদের ন্যায় কোনও পদার্থ কখনও ছিলনা, নাই এবং থাকিবেনা। রজ্জু সর্পের সাময়িক অস্তিত্বও ছিলনা, উহা মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল মাত্র। ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে রজ্জু-সর্প সম্বন্ধে তথাকথিত জ্ঞান জ্ঞান নহে এবং উহার সাময়িক অস্তিত্বও সত্য অস্তিত্ব নহে, উহা ভ্রম মাত্র, সুতরাং মিথ্যা।

অতএব আমরা সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে রজ্জু-সর্প মিথ্যা-স্বপ্ন দৃষ্ট বস্তু সমূহ, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মিথ্যাত্বের বিচারে উহারা এক পর্য্যায়ভুক্ত। যাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহা বুঝিতে পারা যে রজ্জুতে সর্প-দর্শনকে জ্ঞান পর্য্যায় ও সত্য পর্য্যায় ভুক্ত করা হইয়াছে। অথচ উহা যে ভ্রম সুতরাং সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে, ভ্রমকে (Illusion কে) জ্ঞান ও সত্য পর্য্যায়ভুক্ত করাই অযৌক্তিক ও অসঙ্গত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই যত অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

সত্য বস্তু কি? এই সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ব্রহ্ম যখন জগতের উপাদান কারণ, তখন জগৎ কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎ কেবল নাম রূপ নহে, কিন্তু ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ + নাম রূপ। সুতরাং জগৎ নিত্য সত্য না হইলেও আপেক্ষিক ভাবে চিরকাল সত্য। অর্থাৎ জগতের অর্থ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম এবং তদুপরি উহার উপাদানত্বে রচিত নাম রূপ। মায়াবাদ জগৎকে কেবল নাম রূপই বলিয়াছেন। সুতরাং উহাতে অবশ্যম্ভাবিরূপে ভ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। জগৎ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ + তদবলম্বনে নাম রূপ। ইহাই যখন সত্য, তখন নাম রূপের পৃথক্‌ভাবে চিন্তাকে false abstraction বলা যাইতে পারে। স্বর্ণালঙ্কারের কারুকার্য্য সমূহ যেমন একমাত্র স্বর্ণের উপাদানত্বে রচিত এবং স্বর্ণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে উহাদিগের চিন্তা অসম্ভব, সেইরূপ একমাত্র অব্যক্ত স্বরূপের উপাদানত্বে রচিত জাগতিক নাম রূপও অব্যক্ত স্বরূপ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা যায় না। উহারা অবিচ্ছিন্ন

ভাবে চিরকাল যুক্ত। স্বর্ণালঙ্কার স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করিলে উহার কারুকার্য্য থাকেনা। সেইরূপ মহাপ্রলয়ে জগৎ অব্যক্তে লয় হইলে জাগতিক নামরূপও থাকিবে না। স্বর্ণালঙ্কারের স্বর্ণ থাকিবে না, কিন্তু কারুকার্য্য থাকিবে, ইহা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ জগতের উপাদান অব্যক্ত স্বরূপ থাকিবেনা, কিন্তু জাগতিক নাম রূপ থাকিবে, ইহাও সেই রূপই অসম্ভব। মায়াবাদ নাম রূপকেই জগৎ বলিয়াfalse abstraction করিয়াছেন। সেইজন্যই উহা জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন। রজ্জু-সর্প ও মিথ্যা-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তু সমূহের কোনই উপাদান কারণ নাই, সুতরাং উহারা জাগতিক পদার্থ নহে, কিন্তু উহারা মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলমাত্র সুতরাং উহারা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। অপর পক্ষে জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মের অব্যক্ত স্বরূপ সুতরাং ব্রহ্ম। সুতরাং উহা (জগৎ) সত্য না হইয়াই পারেনা। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে জগতের নামরূপ উহাদের উপাদান ব্যতীত থাকিতে পারেনা। সেই উপাদান যে নিত্য সত্য, তাহা উভয় পক্ষ সম্মত। সুতরাং জগৎ ও সত্য। জগৎ সত্য কিনা, এই প্রশ্নের বিচারে আমরা দেখিব যে তাহা অস্তিত্ববান কিনা এবং উহার উপাদান কারণ আছে কিনা। এই দুইটি অবস্থা যাহাতে আছে, তাহাই সত্য। জগতের অস্তিত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। মায়াবাদও জগৎকে ব্যবহারিক ভাবে এবং অনিত্য ভাবে সত্য বলেন। আবার অব্যক্ত স্বরূপই জগতের সুতরাং জাগতিক পদার্থ সমূহের উপাদান কারণ। অব্যক্ত ব্রহ্মেরই একতম স্বরূপ, সুতরাং উহা নিত্য সত্য। সুতরাং জগৎ সত্য না হইয়াই পারে না। যদি বলেন যে রজ্জু-সর্পেরও ত সাময়িক অস্তিত্ব আছে, তবে বলিতে হয় যে উহার উপাদান কারণ নাই এবং সেই অস্তিত্ব যে সত্য অস্তিত্ব নহে, কিন্তু মস্তিষ্ক বিকৃতির ফল মাত্র সুতরাং সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সে অস্তিত্বকে অস্তিত্ব বলা যায় না।

অতএব আমরা দেখিলাম যে রজ্জুসর্প, মিথ্যা-স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুসমূহ, আকাশ-কুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি সমভাবে সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। উহাদের মিথ্যাত্বের কোনই প্রভেদ নাই। রজ্জু-সর্প ও মিথ্যা-স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহের তথাকথিত সাময়িক অস্তিত্ব ও তদ্‌সম্বন্ধীয় তথাকথিত জ্ঞানকে সত্য ও জ্ঞান পর্য্যায়ভুক্ত করা অসঙ্গত হইয়াছে।

আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত প্রমাণ করিতে রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত নাই। ইহার উত্তরে প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হইয়াছে, ইহা আমরা চিন্তা করিতে যাই কেন? মায়াবাদের পক্ষ হইতে ইহার একমাত্র উত্তর হইবে যে ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলে তাঁহার বিকারও

হইয়াছে বলিতে হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মকে এক অখণ্ড ও নির্ব্বিকার রক্ষা করার জন্যই মায়াবাদ, বিবর্ত্তবাদ এবং সেইজন্য রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্তের একান্ত আবশ্যকতা। কিন্তু "সত্যদর্শনানুমত সৃষ্টিতত্ত্ব" গ্রন্থে যাহা প্রমাণিত হইয়াছে,(ক) তাহাতে সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে অনন্ত নিরাকারত্ব ও অনন্ত সাকারত্বের একত্ব নামক ব্রহ্মের একতম স্বরূপ হইতে তাঁহারই ইচ্ছাশক্তিযোগে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্বরূপকেই অব্যক্ত বলা হয়। ইহাও তথায় প্রমাণিত হইয়াছে যে এই পরিণাম জন্য অব্যক্তের কোনই বিকার হয় নাই, সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। যদি তাহাই হইল, তবে বিবর্ত্ত কল্পনার প্রয়োজন কোথায়? পরিণাম বাদে যদি ব্রহ্মের কোনই বিকার না হইল, তবে অস্বাভাবিক বিবর্ত্তবাদের কল্পনার আবশ্যকতা কি? ব্রহ্ম যদি নিজ হইতে নিজ দ্বারা (আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ সূত্র ও তৈত্তিরীয়োপনিষদের ২।৬-৭ মন্ত্রদ্বয়) জগৎ উৎপাদন করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য তাঁহার কোনই বিকার হয় নাই, তবে বিবর্ত্তবাদের উদ্দেশ্যও পূর্ণ হইল, অথচ মিথ্যামায়ার প্রয়োজন থাকিল না। ব্রহ্মের একতম স্বরূপের সুতরাং ব্রহ্মের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন, ইহা শ্রুতি ও বেদান্ত দর্শন সম্মত।* আবার ব্রহ্ম যে নিত্য নির্ব্বিকার, ইহাও শ্রুতিসম্মত। সুতরাং সত্যদর্শনানুমত সৃষ্টিতত্ত্বের ত্রুটী কোথায়?

শ্রুতি নানাস্থলে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মে যদি বিবর্ত্ত হইয়া আপনা আপনি জগৎ হয়, তবে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ উভয়কেই নাকচ করিতে হয়। কিন্তু মায়াবাদও ব্রহ্মের উপাদানত্ব ও নিমিত্ত কারণত্ব স্বীকার করেন। যদি ব্রহ্মের বিবর্ত্তে জগৎ আপনা আপনি হইয়া থাকে, তবে তিনি যেমন উপাদান কারণ নহেন, সেইরূপ নিমিত্ত কারণও নহেন। মায়ার নিজস্ব এমন কোন শক্তি নাই যাহা দ্বারা উহা ব্রহ্মের উপর কার্য্য করিতে পারে। শক্তিমান ভিন্ন শক্তি অচলা। সুতরাং ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা তিনি নিমিত্ত কারণও হইতে পারেন না। আবার যদি জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তে নিত্য তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে, তবে সেই জগৎকে কেন মিথ্যা বলিব? জগতের অনিত্যতার জন্যই মায়াবাদ উহাকে অসত্য—মিথ্যা বলেন। যদি উহা

---

* কঠ—৪।১২, শ্বেত—৬।১২, তৈত্তি—২।৬-৭, ছা—৬।২।১-৩ মন্ত্র সমূহ এবং বেদান্ত দর্শনের জন্মাদ্যস্য যতঃ এবং আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ সূত্রদ্বয় দ্রষ্টব্য। বেদান্ত দর্শনের "দৃশ্যতে তু" সূত্রের শঙ্কর ভাষ্যও এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য।

(ক) উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ "সত্য দর্শনানুমত সৃষ্টিতত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। উহা দর্শন পত্রিকার ১৩৬০ সালের কার্ত্তিক ও মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

নিত্যই হইল, তবে উহা কেন মিথ্যা হইবে? এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে মায়াবাদের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় যে উহা বৌদ্ধ শূন্যবাদ হইতে উদ্ভূত। গৌড়পাদ কৃত মাণ্ডুক্য কারিকা ইহার মূলে। তিনি আচার্য্য শঙ্করের গুরুর গুরু। গৌড়পাদ বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। শঙ্কর বৌদ্ধদিগের সহিত বহু তর্কযুদ্ধও করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে এই সকল কারণে তিনি বৌদ্ধ দর্শন দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাই অনেক পণ্ডিত তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিতেও ক্রটী করেন নাই। সম্প্রতি ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত মহাশয়ও তাঁহার History of Indian Philosophy গ্রন্থে সেইরূপ মতই প্রকাশ করিয়াছেন। মায়াবাদে বহুস্থলে উপনিষদের অর্থে কষ্ট কল্পনা আছে। উপনিষদে মায়াবাদের উল্লেখ নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২।৫।১৯ মন্ত্রে যে মায়ার উল্লেখ আছে, তাহা মায়াবাদের মায়া নহে। এই সম্বন্ধে মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন লিখিয়াছেন :—

"মায়াভিঃ—ঋগ্বেদের এস্থলে মায়ার অর্থ শক্তি, নব্যবৈদান্তিকের মায়া নহে। ঋগ্বেদে বিশেষতঃ এই স্থলে (৬।৪৭।১৮) মায়াবাদের কোন চিহ্ন নাই।"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে মায়ার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সেই মায়াও মায়াবাদের মায়া নহে। কারণ, সেই উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহু বহু স্থলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা মায়াবাদ বিরোধী। উহা আধুনিক উপনিষদ্ এবং ভক্তি ভাব প্রধান। পুরাতন উপনিষদ্ জ্ঞান প্রধান। শূন্যের প্রতিষ্ঠাও করিতে হইবে এবং উপনিষদিক ব্রহ্মের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করিতেও হইবে। তাই মায়াবাদ, বিবর্ত্তবাদ ও রজ্জু সর্পের দৃষ্টান্তের প্রয়োজনীয়তা।

ব্রহ্ম নিজে নিজেকে বিবর্ত্ত করিয়া জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকিলে তাঁহার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল। ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু মায়াবাদ তাহা স্বীকার করেন না। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ভিন্ন কোনও কার্য্য হয় না। ইহা আমাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য এবং ন্যায় দর্শনও তাহাই বলেন। যাহা হউক্, রজ্জু-সর্প দৃষ্টান্তে তমঃ এবং রজঃ পাওয়া যায়, কিন্তু সত্ত্ব পাওয়া যায় না। কিন্তু মায়াবাদ অনুযায়ী মায়া ত্রিগুণ সম্পন্না। জীবকুলসহ জগদুৎপত্তির জন্য উর্ণনাভের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। উর্ণনাভ নিজ হইতে নিজ দ্বারা জাল সৃষ্টি করিয়া নিজেই উহাতে আবদ্ধ হয়। ইহা মুণ্ডক শ্রুতির উক্তি। (১।১।৭)। আবার সেই উপনিষদই বলিয়াছেন যে দেহে আবদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম ক্ষুদ্রভাবে ভাসমান হইয়াছেন। (৩।১।১-৩)। ইহা প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত এবং রজ্জু-সর্প দৃষ্টান্ত হইতে কোন অংশে হীন নহে। অর্থাৎ তিনি নিজ হইতে নিজ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া নিজেই তাহা দ্বারা আবৃত হইয়া

বহুভাবে ভাসমান হইয়াছেন। এইরূপ বহু প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতে পারে। মায়াবাদ যদি রজ্জু-সর্পের অর্থাৎ ভ্রমের দৃষ্টান্ত দিতে পারেন, তবে অন্যে কেন প্রাকৃতিক সমুদ্র তরঙ্গের দৃষ্টান্ত দিতে পারিবেন না? যদি বলেন যে সেই দৃষ্টান্তে পরিণামে বিকার দেখা যায়, তবে বলিতে হয় যে এক, অখণ্ড ও অনন্ত নিরাকার পরব্রহ্মের বিকার অসম্ভব। এক, অখণ্ড ও নিরাকার ব্যোমের পরিণামে চতুর্ভূতোৎপত্তি. কিন্তু উহাতে উহার কোনই বিকার হয় নাই। সুতরাং জগদুৎপত্তির জন্য ব্যোম হইতেও সূক্ষ্মতর অব্যক্ত স্বরূপের সুতরাং ব্রহ্মেরও কোনই বিকার হয় নাই। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে Practically ব্যোমের বিবর্ত্তে চতুর্ভূত উৎপন্ন। সেইরূপ Practically অব্যক্ত স্বরূপেরও বিবর্ত্ত হইরা জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ অব্যক্তের পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই কার্য্যে তাঁহার (অব্যক্ত স্বরূপের) কোনই বিকার হয় নাই। আবার first cause এর পরিণামে সকলই হয়, কিন্তু উহা নির্ব্বিকার থাকে। অন্যথা first cause লুপ্ত হইত। পুনরাং first cause থাকিত না। তাহা অসম্ভব। প্রত্যেক পদার্থেরই first cause আছে। সৃষ্টি শূন্য হইতে by chance আসে নাই। (ছান্দোগ্য—৬৷২৷১-৩) প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans ও সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে সৃষ্টি হঠাৎ হয় নাই।

ব্রহ্ম যদি বিবর্ত্তভাবে জগৎ প্রকাশ করিতে পারেন, তবে তিনি নিজ স্বরূপ যোগে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগং সৃষ্টি করিতে পারিবেন না কেন? ব্রহ্ম সম্বন্ধে জাগতিক পদার্থ ব্যোম হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে ব্যোমের যেমন চতুর্ভূতোৎপত্তির জন্য কোনই বিকার হয় নাই, সেইরূপ অব্যক্তের সুতরাং ব্রহ্মেরও জগদুৎপত্তির জন্য কোনই বিকার হয় নাই। অব্যক্ত স্বরূপ অবশ্যই ব্যোম হইতেও সূক্ষ্মতর। সূক্ষ্মাৎ স্থূলম্। ইহাকি রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত হইতে উৎকৃষ্টতর নহে? বিশেষতঃ ব্যোম জাগতিক পদার্থ, ভ্রম নহে।

যদি আমাদের কথিত তত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে যে মায়াবাদের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই, ইহা সুনিশ্চিত। মায়াবাদে ব্রহ্মকে এক, অখণ্ড, একরস ও নির্ব্বিকার বলেন। আমরাও তাহাই স্বীকার করি। আমরাও ব্রহ্মকে সর্ব্বব্যাপী অনাদি অনন্তও বলি। আমরা ব্রহ্মকে একপাদ ও ত্রিপাদে ভাগ করিনা। অনন্তকে চারি দ্বারা ভাগ করা যায় না। তিনি এক পাদে সগুণ ও ত্রিপাদে নির্গুণ, ইহাও বলিনা। ব্রহ্ম বিশ্বের সর্ব্বত্র এবং বিশ্বের অতীত অনন্তে পূর্ণভাবেই, অনন্ত গুণাতীত ভাবেই নিত্য বর্ত্তমান। তাঁহার গুণাতীতত্বকেই নির্গুণত্ব বলা হয়।

তাঁহাতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণ নাই। সেইজন্যই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াছেন। তাঁহার রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ রূপ জড়ীয় গুণ নাই। সুতরাং তিনি সেই ভাবেও নির্গুণ। আমরা সৃষ্টির ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সগুণ ব্রহ্মের কল্পনা করি নাই। ব্রহ্মের মায়োপহিত এক চতুর্থাংশ সগুণ ব্রহ্ম। নিত্য অনন্ত অখণ্ড ব্রহ্মকে কি ভাগ করিয়া অংশ করা যায়? আবারও প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্মের এক চতুর্থাংশ মায়োপহিত করিলেন কে? ইহার উত্তরে ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। স্থূল, অচৈতন্য কোথায় হইতে আসিল, এই প্রশ্নের সত্য মীমাংসা করিতে না পারিয়াই দর্শন সমূহ সত্য সৃষ্টিতত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই। সত্য দর্শন ইহার সুমীমাংসা করিয়াছে। উহা ব্রহ্মকে এক-মাত্র চৈতন্য স্বরূপ বলেন নাই, কিন্তু অনন্ত চৈতন্য ও অনন্ত অচৈতন্যের অনন্ত সংমিশ্রণই তাঁহার একতম স্বরূপ বলিয়াছেন এবং তাহা প্রমাণও করিয়াছেন। অব্যক্ত অচেতন। নিরাকারত্ব ও সাকারত্ব যে অচেতন, তাহা সহজবোধ্য। উহা হইতে অচেতন জগৎ উৎপন্ন এবং জগৎ হইতে অচেতন দেহ উৎপন্ন। তাই জীব-কুলের এত অজ্ঞতা। সাংখ্যমতে অচেতন প্রধানের কল্পনা আছে বটে, কিন্তু তাহা নিরীশ্বর দর্শন। বিশেষতঃ উহাতে পুরুষ বহু ও নিষ্ক্রিয় এবং প্রধান পুরুষের বিপরীত তত্ত্ব। সুতরাং তাহাও অদ্বৈতবাদ নহে, বহুবাদ মাত্র। সত্য দর্শনে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব। অব্যক্ত তাঁহারই অনন্ত স্বরূপের একতম স্বরূপ মাত্র এবং ইচ্ছাশক্তি তাঁহারই একতমা শক্তি। তাঁহার ইচ্ছাশক্তিও অনন্ত ও নিত্যা। উহা মায়াবাদের মায়ার ন্যায় সৃষ্টিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই, মায়ার ন্যায় সাধকের ব্রহ্ম জ্ঞান লাভে উহা ধ্বংসও হয় না। তাঁহার অনন্ত স্বরূপ অনন্ত সংমিশ্রণে সংমিশ্রিত হইয়া যে একটি মাত্র স্বরূপ হইয়াছে তাহাই তাঁহার একমাত্র স্বরূপ বা পরম রূপ। সুতরাং তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ বা একরস। সপ্তবর্ণ সংমিশ্রিত হইয়া যেমন সূর্য্যরশ্মির শুভ্রবর্ণ হয়, সেইরূপ তাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধগুণের অনন্ত সংমিশ্রণে তাঁহার শিবত্ব (শুভত্ব) রূপ একমাত্র পরম রূপ হইয়াছে। তাই তিনি শিবমদ্বৈতম্ (তুরীয় ব্রহ্মের রূপ—মাণ্ডুক্য—১২)। যাঁহাতে অনন্ত বিরুদ্ধ গুণ বা রূপ নাই, তিনি শিব হইতে পারেন না। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে মায়াবাদ ব্রহ্মের তিনটী স্বরূপ মাত্র স্বীকার করেন। কিন্তু আমরা তাঁহার অনন্ত স্বরূপ স্বীকার করি। অনন্তের সকলই অনন্ত। সুতরাং তাঁহার স্বরূপও অনন্ত। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ তাঁহাকে অনেকরূপম্ বলিয়াছেন। গুণ ও স্বরূপ যে একই, তাহাও প্রমাণ করা যায়। মায়াবাদকে শ্রুতি সম্মত বলিলে সত্য বলা হইবে না। উহা বহু স্থলেই

নিজ মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে সত্য দর্শন শ্রুতি সম্মত, বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তি সঙ্গত। মায়াবাদের উৎপত্তি মিথ্যা হইতে। উহা মিথ্যা দৃষ্টান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহা সর্ব্বজন প্রত্যক্ষ জগৎকেও মিথ্যা বলেন। সুতরাং উহা সত্য নহে।*

ওঁ সত্যং জগৎকারণং ওঁ

---

* পাঠক এই সম্পর্কে জগন্মিথ্যাবাদ প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। উহা দর্শন পত্রিকায় ১৩৬২ সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

মানস নিয়ন্ত্রণবাদ ও নীতি

অধ্যাপক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অধিবিদ্যা ও নীতি বিজ্ঞানের ছাত্ররা ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য ও পরতন্ত্রতা নিয়ে যে মতভেদ, সে বিষয়ে সবিশেষ পরিচিত আছেন। ইচ্ছার স্বাধীনতা ও পরাধীনতা নিয়ে পরস্পর বিরোধী যে দুটি মত প্রচলিত আছে তাদের নাম যথাক্রমে—স্বাতন্ত্র্যবাদ ও নিয়ন্ত্রণবাদ। স্বাতন্ত্র্যবাদী বলেন: ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন। মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। মানুষ স্বেচ্ছায়ই সব কাজ করে থাকে, তাই তার কাজের জন্য মানুষ দায়ী। অপর দল বলেন—ইচ্ছা সম্পূর্ণ পরাধীন। মানুষ স্বেচ্ছায় কিছু করে না, কাজেই তার কাজকে ভাল বা মন্দ বলে তাকে তার কাজের জন্য দায়ী করা যায় না। অতএব নীতিবিচার অসম্ভব।

এই ইচ্ছার স্বাধীনতা ও পরাধীনতা বিষয়ে পরস্পর বিরোধী দু'টি দল স্ব স্ব মতের পক্ষে বিশেষ বিশেষ যুক্তি দেখিয়েছেন। দর্শন বা নীতি বিজ্ঞানের পুস্তকে এ যুক্তিগুলিকে আলোচনা করে এই দুটি চরম মতকেই খণ্ডন করে একটি মধ্যবর্তী মত গ্রহণ করা হয়ে থাকে যা'কে আমরা হেগেলীয় মত বলতে পারি। এই মতে ইচ্ছা স্বাধীন বটে আবার স্বাধীন নয়। স্বাধীন নয় এই অর্থে যে ব্যক্তির চরিত্র থেকেই ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি প্রসূত হয়; তাই ইচ্ছায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকে। সেটা তাই ব্যক্তির চরিত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, ইহা স্বয়ম্ভু বা স্বয়ং-ক্রিয় নয়; আর স্বাধীন এই অর্থে যে ইচ্ছা বাইরের কোনও শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হয় যে ব্যক্তির ইচ্ছা তার দ্বারাই। ইট নিক্ষেপ করলে তার ছুটে যাওয়ার ব্যাপারে ইট যেমন পরনিয়ন্ত্রিত—ইচ্ছার ব্যাপারে সেরকম বহির্নিয়ন্ত্রণ কিছু নেই। অতএব এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে ইচ্ছা আত্মনিয়ন্ত্রিত (self-determined)। আর যে হেতু আত্মনিয়ন্ত্রণে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে তাই ইচ্ছাকে আত্মনিয়ন্ত্রিত বললে নীতি (morality) ও নীতিবিচার সম্ভব।

এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হল এই যে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বলতে যদি অনিয়ন্ত্রণ (Indetermination) না বুঝে আত্মনিয়ন্ত্রণ (self-determination) বুঝে থাকি তাহলে ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানে যে মানসনিয়ন্ত্রণবাদের (Psychic Determinism, অবতারণা আছে তা নীতির পরিপন্থী নয়। অনেকের মত এই যে ফ্রয়েডীয় মনো-

বিজ্ঞান অনুযায়ী নীতি বিচার সম্ভব নয়। কারণ (১) ফ্রয়েডের মতে ইচ্ছার কোনও স্বাধীনতা নেই। বস্তুজগতের মত মনোজগতও কার্য-কারণ নিয়মদ্বারা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। (২) দ্বিতীয়তঃ ফ্রয়েডের মতে মানুষ নির্জ্ঞান মন দ্বারা পরিচালিত এবং সেই নির্জ্ঞান মন (unconscious mind) ব্যক্তির চেতন নিয়ন্ত্রণের বাইরে। যেমন ডক্টর যদুনাথ সিংহ তাঁর Manual of Psychology বইতে (৪৩৪ পৃঃ) Psycho-Analysis এর সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন : "Freud holds that our conscious thoughts and desires are the reflections of unconscious wishes, which are not known and therefore, cannot be controlled. The conscious is determined by the unconscious which is beyond our control. Thus Psycho-Analysis leads to determinism which saps the very foundations of morality."

আমাদের বক্তব্য হ'ল যে Psycho-Analysis যে 'Determinism' বা নিয়ন্ত্রণের কথা বলে তাও আত্মনিয়ন্ত্রণ বা self-determination. আর হেগেলীয় দর্শনে আত্মনিয়ন্ত্রণ যদি নীতি বিচারের পরিপন্থী না হয়ে থাকে তাহ'লে ফ্রয়েডের ক্ষেত্রেই বা তা হবে কেন ? এখন ফ্রয়েডীয় মানস-নিয়ন্ত্রণবাদ কেন নীতির পরিপন্থী নয় তা বিচার করে দেখা যাক।

(১) প্রথমতঃ ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে বলা হয় যে তিনি মানস-নিয়ন্ত্রণবাদে বিশ্বাসী। তাঁর মতে মানুষের কাজকর্ম সব কার্য-কারণ নিয়মের বশীভূত। বস্তুজগত যেমন অমোঘ কার্য-কারণ নিয়মের অধীন মনোরাজ্যও সেই নিয়মের দাস। কিন্তু দাসের কাজের স্বাধীনতা কোথায় ? তাই মানুষের কাজের স্বাধীনতা নেই এবং নীতি অসম্ভব

এর উত্তর হ'ল : ইচ্ছার স্বাধীনতা বলতে কোনও দায়িত্বসম্পন্ন নীতিবিজ্ঞানীই বলেন না যে ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারী বা স্বয়ম্ভু (uncaused)। কারণ ইচ্ছা স্বয়ম্ভু হলেই বরং নীতিবিচার চলবে না। কাজেই নীতিবিজ্ঞানীরা মেনে থাকেন যে কর্মগুলো ইচ্ছাপ্রসূত এবং ইচ্ছাও ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর সেই কারণেই আমরা পৃথকভাবে ইচ্ছা বা কার্যের উপর নীতিবিচার না চাপিয়ে সমগ্রভাবে ব্যক্তিকেই বিচার করে থাকি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে নীতি সম্ভব হতে হলে ইচ্ছা অনিয়ন্ত্রিত (uncaused) হওয়া চলে না। Psychic Determinism-ও ত একই কথা বলে থাকে যে প্রতিটি কর্মের কারণ আছে। সে কারণ হল ইচ্ছা এবং ইচ্ছা ব্যক্তির চরিত্রের গঠনের উপর নির্ভর করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে হেগেলীয় দর্শন এবং

ফ্রয়ডীয় মনোবিজ্ঞান উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে—ইচ্ছা চরিত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ইচ্ছা স্বয়ম্ভু বা স্বেচ্ছাচারী নয়।

তবে মনোবিজ্ঞানীরা আরও একটু বেশী বলে থাকেন। তা'হল এই যে—চরিত্র, যা ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে তার গঠন নির্ভর করে বংশগতি ও পারিপার্শ্বিকের উপর। কিন্তু বংশগতি ও পারিপার্শ্বিক এ' দুটোই ত কর্তার আয়ত্তের বাইরে। কাজেই এই বহিঃশক্তি যদি চরিত্র গঠন করে আর সেই চরিত্র থেকে যদি ইচ্ছা উৎসারিত হয় তা'হলে ইচ্ছাও বহিঃশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অতএব তার আর, স্বাতন্ত্র্য কোথায়? কাজেই মনোবিজ্ঞানীর এই মানসনিয়ন্ত্রণবাদ নীতির পরিপন্থী।

কিন্তু চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব যে বংশগতি (heredity) ও পারিপার্শ্বিকের (environment) প্রভাবে ও সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে এতো বহুপরীক্ষিত ও প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য। বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি আজ এ বৈজ্ঞানিক সত্যকে অস্বীকার করবেন কি করে? তা যদি না করে থাকেন এবং স্বীকার করেন যে এ তথ্য সত্য তাহ'লে আবার তাঁকে ঠিক করতে হয় যে—এ তথ্যকে সত্য বলে মানলে তিনি ইচ্ছাকে স্বাধীন বলবেন অথবা পরাধীন বলবেন। যদি বলেন যে ব্যক্তিত্বের গঠনে বহির্নিয়ন্ত্রণের কথা সত্য হলেও মানুষের-ইচ্ছার স্বাধীনতা জানা যায় এবং নীতি সম্ভব, তাহলে তা দর্শন এর ক্ষেত্রে যেমন সত্য হবে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য হবে। অর্থাৎ মানসনিয়ন্ত্রণবাদে মানলেও মনোবিজ্ঞানীরা নীতির পরিপন্থী কিছু বলেন না—দার্শনিককে একথা স্বীকার করতে হবে!

আর যদি বলেন যে ব্যক্তিত্বের গঠন বহির্নিয়ন্ত্রিত বলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা কিছু নেই এবং নীতি অসম্ভব—তাহ'লে নীতির অসম্ভাব্যতা দর্শন এবং মনোবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই সমান প্রয়োজ্য হবে। অর্থাৎ কেবল ফ্রয়ডীয় মত মানলেই যে নীতি অসম্ভব তা নয়। ব্যক্তিত্বের গঠনে বহির্নিয়ন্ত্রণ যে হেতু সার্বিক, নীতির অসম্ভাব্যতাও তাই সার্বিক হবে।

কিন্তু চরিত্র গঠনে বহির্নিয়ন্ত্রণ থাকলেও ইচ্ছার আমাদের কোনও স্বাধীনতা থাকা সম্ভব কিনা তা বিচার করে দেখা দরকার। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত কাজকর্ম আমরা করে থাকি সেগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা ইচ্ছার স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মর্ম কিছুটা বুঝতে পারি। ব্যবহারিক জীবনে ক্ষেত্র বিশেষে ত আমরা এমন কথা বলে থাকি যে 'এই কাজটি আমি করেছি' অথবা 'এই কাজটি আমি করবই' অথবা 'আমার যেমন ইচ্ছা তেমনি করেছি'। আবার এর বিপরীত

কথাও শোনা যায় যেমন—'এক্ষেত্রে আমি নাচার' অথবা 'আমার কোনও হাত নেই' বা 'আমি বাধ্য হয়ে করেছি' ইত্যাদি। এই দুই প্রকার বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এদের মধ্য দিয়ে আমরা এক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছার ও ক্রিয়ার স্বাধীনতা ও অপর ক্ষেত্রে পরাধীনতার কথাই ব্যক্ত করছি। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আমি ফুটবল খেলা দেখতে যাচ্ছি ; অপর ক্ষেত্রে কয়েকজন দুর্বৃত্ত আমাকে প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে অপর এক ব্যক্তিকে প্রহার করতে বাধ্য করল। দুক্ষেত্রেই কাজ আমি করছি। কিন্তু দুক্ষেত্রে আমার মনের ভাব কি এক রকম ? প্রথম কাজটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সেটি আমি স্বেচ্ছায় করছি কিন্তু দ্বিতীয়টির বেলা অপরের ইচ্ছা আমার উপর চাপান হচ্ছে এবং আমি কাজটি করতে বাধ্য হচ্ছি। এক্ষেত্রে আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা আমি বোধ করছি অপর ক্ষেত্রে আমি আমার ইচ্ছার স্বাধীনতার কোনও অবকাশ নাই তাই বোধ করছি। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আমার চরিত্র বহির্নিয়ন্ত্রিত। কাজেই দেখা যায় যে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের কাজকর্মকে বিশ্লেষণ করে আমরা ইচ্ছার স্বাধীনতা বা পরাধীনতা বলতে কি বুঝব সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারি। অধ্যাপক এ, জে, এয়ার দর্শনের ক্ষেত্রে ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য বা নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বুঝব—এ প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে আত্ম সচেতনতার সাক্ষ্যের উপরই জোর দিয়েছেন। আর এই আত্মসচেতনতার নিরিখে যদি ইচ্ছার স্বাতন্ত্র ও পারতন্ত্রতা নির্ণয় করা যায় তাহ'লে ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র বহির্নিয়ন্ত্রিত হলেও দার্শনিক মতে ইচ্ছার স্বাধীনতা মানা যায় এবং নীতি সম্ভব হয়। আর তাহ'লে ঐ একই কারণে ফ্রয়েডের ক্ষেত্রেও নীতি সম্ভব হওয়া উচিত।

(২) ইচ্ছার স্বাধীনতার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি উঠে থাকে নির্জ্ঞান নিয়ন্ত্রণ (unconscious determination) নিয়ে। বলা হয় যে ফ্রয়েডের মতে মানুষ মনের দ্বারা পরিচালিত এবং এই মনোরাজ্য ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বরং ব্যক্তিই এই মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কাজেই যে হেতু কর্মে ব্যক্তির হাত নেই সেই কারণে ব্যক্তিকে ভালমন্দের বিচারের আওতায় ফেলা যাবে না। অতএব নীতি অসম্ভব।

এই জাতীয় আপত্তি উঠে থাকে ফ্রয়েডীয় মনের গঠন সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকার জন্য। সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় যে ব্যক্তি ও মন যেন পৃথক সত্বা অথবা ব্যক্তি ও নির্জ্ঞান মন যেন পৃথক সত্বা। মন বা ব্যক্তির আসল রূপটি কিন্তু তা নয়। নির্জ্ঞান বস্তুটি কি ? এটি একদিন সজ্ঞান ছিল আজ নির্জ্ঞান হয়েছে। কাজেই নির্জ্ঞানে যা রয়েছে সেটি বিজাতীয় কিছু নয়। আবার সেটির সাথে আমি সম্পূর্ণ

অপরিচিত ও নই। কারণ পূর্ব্বে জীবনের যে কোনও এক সময়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। এই পূর্ব্ব পরিচিত কিন্তু বর্ত্তমানে নির্জ্ঞান ও বর্ত্তমানের সজ্ঞান এই দুই মিলিয়েই ব্যক্তি। শৈশবে ব্যক্তিত্বের গঠন ও বৃদ্ধির সময় বিভিন্ন প্রবৃত্তি কাজ ক'রতে থাকে। এই সময় বিভিন্ন ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে কল্পনায় ভোগ করে, প্রকৃতি বুঝে তাদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় স্থাপন (adjustment) ব্যক্তি নিজেই করে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সাথে এই প্রবৃত্তিসমূহের অনেকগুলিই নির্জ্ঞানে চলে যায় এবং সেখানেই অবস্থান করে। কাজেই নির্জ্ঞানে যা রয়েছে ব্যক্তি সেই তাকে দেখেছে, চিনেছে ও কিছু ভোগও করেছে। আর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেটা যখন অবচেতনে যাচ্ছে—তখন তা ব্যক্তির দ্বারাই নির্জ্ঞানে রক্ষিত হচ্ছে। আর প্রতিটি সুস্থ ও সুসংবদ্ধ মনে (perfectly adjusted mind) এই প্রবৃত্তিগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেই নির্জ্ঞানে অবস্থান করে। সজ্ঞান মনকে তা সাহায্য করেই চলে। সুগঠিত ব্যক্তিতে সজ্ঞান মনকে নির্জ্ঞানের অন্ধভাবে পরিচালনা করবার কোনও অবকাশ নেই। এরকম অন্ধ পরিচালনার কথা আসে অসংবদ্ধ (maladjusted) ও অসুস্থ মনে। সেখানে সজ্ঞান ও নির্জ্ঞানে কোনও সংগতি থাকে না। সজ্ঞান মন হয়ে পড়ে দুর্ব্বল ও নির্জ্ঞান মন যা দুর্দম প্রবৃত্তিতে পূর্ণ থাকে—তা প্রচণ্ডভাবে সজ্ঞান মনকে চালিত করে। ব্যক্তি তখনই নিজেকে অসহায় বোধ করে। কিন্তু তা হল অসুস্থ মনের কথা। আর অসুস্থ মনের অবস্থাকে সুস্থ মনের উপর ভুল করে চাপিয়ে একথা বলা ঠিক নয় যে ফ্রয়েডের মতে সাধারণ-ভাবে মনের বা ব্যক্তির স্বাধীনতা কিছু নেই।

আরও লক্ষ্যণীয় যে অসুস্থ মনে—যেখানে সজ্ঞান নির্জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়—সেখানেও এই অবস্থার পরিবর্ত্তন আনা যায়। মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) দ্বারাই সজ্ঞান মনকে সত্য ও বাস্তব দেখিয়ে শক্তিশালী করা যায় এবং তার হাতেই নির্জ্ঞানের বল্গা তুলে দেওয়া হয়। কোনও মনকে সমীক্ষণ করা মানেই হচ্ছে—নির্জ্ঞানে যা ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি রয়েছে সেগুলিকে সজ্ঞান করে তাদের দ্বন্দ্ব দূর করে, স্বরূপ বুঝে তাদেরকে সজ্ঞান মনের নিয়ন্ত্রণে আনা। এ সম্বন্ধে ডক্টর গিরীন্দ্র শেখর বসু বলেছেন : "It is, therefore, possible by Psycho-Analysis to adjust this irrational portion of our mind so that we we may be better able to understand the workings of our own mind and to get a better control over ourselves and a better appreciation of reality. ....By adjusting the unconscious it removes a good

deal of our inhibitions which stand in the way of progress. ....
Psycho-Analysis claims to remove these defects and place a man in a position where he would have a fuller realization of his own self." (Everyday Psycho-Analysis. Page 246),

নিজ্ঞ´ান যে কোনও বাইরের জিনিষ (alien) নয়, তা যে ব্যক্তিত্বেরই একটা অংশ তা উপলব্ধি করানই হচ্ছে মনঃসমীক্ষণের কাজ। ইচ্ছাও বাস্তবের স্বরূপ দেখিয়ে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে ব্যক্তিকে আত্মসচেতন ও শক্তিসম্পন্ন করে তোলাই মনঃসমীক্ষণের উদ্দেশ্য। তাই যদি হয় তাহলে কেমন করে বলা যায় যে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞান মানুষের মনকে দাস করেছে এবং তা নীতির পরিপন্থী? হেগেলীয় আত্মনিয়ন্ত্রণবাদ মানলে যদি নীতি সম্ভব হয় তাহলে ফ্রয়েডের Psycho-Analysis প্রকৃত অর্থ বুঝলে তাকে নীতিবিরোধী একথা বলা যায় কি করে। নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে মানুষ যে আত্মনিয়ন্ত্রিত—হেগেল ও হেগেলীয়রা যা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করে গেছেন— ফ্রয়েড তাকেই তথ্য সাহায্যে পরীক্ষা করে প্রাণবান সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কাজেই ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তির বা মনের স্বাধীনতা নেই, অতএব নীতি অসম্ভব—একথা বলা ঠিক হবে না।

ন্যায় শাস্ত্রে সর্বলোক সিদ্ধ নিয়ম

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মাইতি, এম, এ,

যে প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কার এবং বাস্তবক্ষেত্রে তাহার অনুশীলন বর্তমান প্রগতিশীল বিজ্ঞানের ভিত্তি সেই নিয়ম সূত্রকে আবিষ্কার ও গ্রহণ প্রচেষ্টা প্রাচীন ন্যায়ের পরিণতির যুগেই সূত্রপাত হইয়াছিল। নব্যন্যায়ে এরূপ সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা পরাধীনতা বা যে কারণেই হউক ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, দেখা যায়।

দর্শন শাস্ত্রে এই প্রচেষ্টা অবশ্য প্রথমে মীমাংসা দর্শন ভাষ্যেই দেখা গিয়াছিল। ভট্টকুমারিল তাঁহার শ্লোক বার্ত্তিক টীকার অনুমান প্রকরণ ৪র্থ ও ৫ম কারিকাতেই* প্রথম এই সূত্র সঞ্চার করেন। উল্লিখিত কারিকাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত ৪র্থ কারিকাটির দ্বারা The law or principle of excluded middle এবং ৫ম কারিকাদ্বারা The law or principle of contradiction নিয়মদ্বয় গ্রথিত করিয়া যান। উক্ত নিয়ম যদিও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে সাক্ষাৎভাবে সাহায্যোপযোগী নহে, তথাপি প্রথমটি 'বিকল্প প্রতিষেধ নিয়ম' হিসাবে চিন্তার মূল সূত্র গঠনে বিশেষ সহায়ক এবং দ্বিতীয়টিও অনুরূপ কিঞ্চিত সাহায্য করে। বাচস্পতি ৫ম সূত্রের ন্যায়রত্নাকর টীকায় বলিয়াছেন—"অথাঽস্মিন সম্বন্ধে কস্য গমকত্বং কস্য বা গম্যত্বং তদ্দর্শয়তি"।

মীমাংসা দর্শনের এই প্রচেষ্টা যে ক্রমে নৈয়ায়িকগণকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল তাহার প্রমাণ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র আচার্য বাচস্পতি মিশ্র, মীমাংসক পার্থসারথি মিশ্র এবং নব্যনৈয়ায়িক শঙ্কর মিশ্রের আলোচ্য বিষয় ক্রমে ধরা পড়ে। কিন্তু তাহা আলোচনার পূর্ব্বে ন্যায় দর্শনে কিভাবে ইহা গ্রহণোপযোগী ভিত্তি গঠিত করিয়াছিল সে বিষয়ের বিবরণ কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করা আবশ্যক।

সম্বন্ধোব্যাপ্তি রিষ্টাত্তত্র লিঙ্গ ধর্মস্ত লিঙ্গনা
ব্যাপ্যস্ত ব্যাপকত্বঞ্চ ব্যাপকং গম্যমিষ্যতে॥ ৪।
যো যস্ত দেশ কালাভ্যাং সমোন্যূনোঽপি বা ভবেৎ
স ব্যাপ্যো ব্যাপকস্তস্ত সমোবাঽনধিকোঽপি বা॥ ৫

ন্যায়ের আদি বাৎস্যায়ন ভাষ্য এবং বৈশেষিকের টীকাকার প্রশস্তপাদের "পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ" ভাষ্যদ্বয় মধ্যে কোনটি প্রথম তাহা জানা যাইতেছেনা বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায় বাৎস্যায়ন মতে প্রত্যক্ষের উপবিভাগ অর্থাৎ লৌকিক সন্নিকর্ষের ষড় বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সমবায়দ্বয় অন্যতম ; কিন্তু পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ ভাষ্য স্বীকৃত ষট্ পদার্থের মধ্যে সমবায় সূত্র অন্যতম এবং গুণ পদার্থের চতুর্বিংশতি বিভাগের মধ্যে সংযোগ একটি উপ-পদার্থ। আচার্য প্রশস্তপাদ এই দুই বিষয় লইয়া শুধু যে পৃথক ভাবে সংযোগ ও সমবায় প্রকরণে আলোচনা করিয়াছেন তাহা নহে পরন্তু 'বিভাগ প্রকরণোদ্দেশে'ও তুলনা করিয়াছেন। ফলে বৈশেষিক সূত্র "ইহেদমিতি যতঃ কার্য কারণয়োঃ স সমবায়ঃ (৭।২।২৬) লক্ষণ ছাড়া অন্য পার্থক্য যাহা নির্ধারিত হইয়াছে তাহা এই যে অযুতসিদ্ধ সম্বন্ধ (অযুত সিদ্ধাণাং সম্বন্ধঃ সমবায় বিনাশক্ষণ পর্য্যন্তং যয়োরাশ্রয়াশ্রয়িভাবস্তাব যুত সিদ্ধৌ) দ্বারাই সমবায় এবং যুতসিদ্ধ সম্বন্ধ দ্বারাই সংযোগ সিদ্ধ হয়।

বাৎস্যায়নের পরবর্তী ন্যায়াচার্য "ন্যায় বার্তিক" কার উদ্যোতকর উক্ত পার্থক্য নির্দেশে আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন। সে অগ্রগতি বুঝিবার পূর্বে ইহা মনে রাখাপ্রয়োজন যে ন্যায়মতে সমবায় ও সংযোগ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ব্যাপার ; কিন্তু বৈশেষিক ও (প্রভাকর) মীমাংসা মতে উভয়েই অনুমান সিদ্ধ মাত্র। তবে অনুমানের ভিত্তি ব্যাপ্তিকে মীমাংসকেরা "স্বাভাবিক সম্বন্ধ" বলিয়া গণ্য করেন [পার্থসারথি মিশ্রের ন্যায়রত্নমালা ৪র্থ কারিকা উপোদ্ঘাত দ্রষ্টব্য]।

বার্তিককার ন্যায় দর্শনের অনুমান নির্দেশক ১।১।৫ সূত্রের ব্যাখ্যায় উক্ত সূত্রের "তৎপূর্বকম্" অংশ বার্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পুনরায় আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ পূর্বক অনুমানের "নৈষোদোষো বিজ্ঞানস্যাধিকৃতত্বাৎ" স্বীকৃতি ভিত্তিক প্রসজ্য বিধান করিয়াছেন। উক্ত স্বীকৃতিতে পূর্বোল্লিখিত নিয়মগুলির কোনই ইঙ্গিত নাই বটে কিন্তু ন্যায় শাস্ত্রকে যে বিজ্ঞানের অধিকারে আনিবার আবশ্যকতা আছে তাহার বিধানই এই অগ্রগতির পরিচায়ক। উদ্যোতকর শুধু এইটুকু বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, বরং উল্লিখিত ১।১।৫ সূত্রের পরবর্তী অংশের "ত্রিবিধম্" প্রকার নির্দেশের প্রথম বিভাগ "অনুমানস্য প্রত্যক্ষ বৈলক্ষণ্যম্" প্রকরণে বলিয়াছেন যে "স্বতন্ত্র সমবায়িণাং সমবায়ইতি" (চৌখাম্বা সংস্করণ ; পৃঃ ৫২)। অর্থাৎ সমবায় যেখানে থাকে তাহা স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে; সংযোগ বা সমবায়ের ন্যায় অতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধে নহে। এতদ্ব্যতীত ৪।২।১৫ সূত্র "পরং বা ত্রুটেঃ" দ্বারা গৌতম দর্শন বৈশেষিকের ন্যায় যে পরমাণু স্বীকার করিয়াছে তাহার সহিত লক্ষণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া উক্তি করিলেন যে

"পরমাণুবদনাশ্রিতঃ সমবায় ইতি (পৃঃ ৫৩)। অবশ্য বৈশেষিক সূত্র ভিত্তিতে "সমবায়স্চ কার্য কারণয়োর্বর্তত ইতি বৃত্তিরস্য বাচ্যা (পৃঃ ৫৩)", লক্ষণও স্বীকার করিয়াছেন। "সংযোগ" সম্বন্ধে উক্ত সূত্র ব্যাখ্যায় কোনও উল্লেখ না থাকিলেও তৎপূর্ববর্তী ১।১।৪ সূত্র প্রসঙ্গে—"তেন সন্নিকর্ষঃ সংযোগস্তয়োর্দ্রব্য স্বভাবত্বাৎ (পৃঃ ৩১)" উক্তি করিয়াছেন। এতদুভয়ের পার্থক্য নির্দেশে আর মাথা ঘামান নাই।

ন্যায় বার্ত্তিক হইতে আমরা 'সর্বলোক সিদ্ধ নিয়ম' সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচ্য উপাদান পাইতেছি না বটে কিন্তু ইহার পরবর্তী টীকাকার সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য টীকার 'অনুমানস্য প্রত্যক্ষ বৈলক্ষণ্যম্' অংশের প্রত্যক্ষ শব্দের টীকায় প্রথম কারিকা মাধ্যমে স্বীকার করিলেন যে—

> কার্য কারণ ভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বা নিয়ামকৎ।
> অবিনাভাব নিয়মোঽ দর্শনান্ন ন দর্শনাৎ। (পৃঃ ১৫৮)

অর্থাৎ কার্য্য কারণ ফলে কিংবা স্বভাব হেতু অথবা নিয়ামকতা সঙ্কেতে যে অবিনাভাব (ব্যাপ্তি) নিয়ম ধরা পড়ে তাহা চোখে দেখা না গেলেও দৃষ্টিসিদ্ধ নহে বলিয়া অস্বীকার করা যাইবে না।

এই সকল নিয়মকে সিদ্ধ অনুগম রূপে গ্রহণ করিবার যে সূত্র কারিকা মাধ্যমে পরবর্তী আলোচনা প্রসঙ্গে নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা এই যে—

> সিদ্ধানুগম মাত্রং চ কর্তুং যুক্তং পরীক্ষকৈঃ
> ন সর্ব লোক সিদ্ধস্য লক্ষণেন নিবর্ত্তনম্ (পৃঃ ১৬৩)

অর্থাৎ সর্ব্ব লোক সিদ্ধ নিয়মকে কেবলমাত্র লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধানুগম রূপে স্বীকার করা সঙ্গত নহে বরং ইহাদের পরীক্ষা অর্থাৎ অনুশীলন মাধ্যমেই ঐরূপ স্বীকৃত হওয়া উচিত। এবং পরীক্ষা বলিতে ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট মতে—"লক্ষিতস্য তল্লক্ষণমুপপদ্যতে ন বেতি বিচার তু পরীক্ষা (পৃঃ ১১)" বুঝায়।

উভয় কারিকার তুলনামূলক আলোচনায় সুস্পষ্ট যে আচার্যদেব ন্যায়শাস্ত্রে গ্রহণ যোগ্য নিয়ম হিসাবে কেবলমাত্র সর্বলোক সিদ্ধ নিয়মকে স্বীকারের পক্ষপাতী এবং এই নিয়মের অঙ্গীকার ন্যায় শাস্ত্রের কোন প্রকরণের অধিকারভুক্ত হইবে তাহা উক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে না বলিলেও, সমানাধিকরণ সম্বন্ধ মাধ্যমে যে হওয়া উচিত তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'কাল্পনিক' নিয়মমাত্রেরই অবাস্তবতা হেতু কোনও তত্ত্বগত উপপত্তি সম্ভব নহে—"কাল্পনিকস্যাবাস্তবত্বেন তত্ত্বানুপপত্তেঃ" বলিয়া টীকাকার ন্যায় পদার্থের সম্বন্ধ নির্দেশক কোন প্রকরণের সন্ধান করিতে গিয়া বৈশেষিক ও সাংখ্য সিদ্ধ অনুমান বিভাগের বিবেচনা করিয়াছেন; কিন্তু শেষ

পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত না হইয়া "স্বাভাবিক নিয়ত" আখ্যায় এই নিয়মকে কোনও গম্য গমক ইতর সম্বন্ধের সহিত যোগযুক্তি নির্দেশ করিয়াছেন। "তস্মাদ্যো বা স হন্ত সম্বন্ধঃ কেবলং যস্যাসৌ স্বাভাবিকো নিয়তঃ স এব গমক গম্যশ্চেতর সম্বন্ধীতি যুজ্যতে (পৃঃ ১৬৫)"। উক্ত সূত্রের বিশদী করণে আরও অগ্রসর হইয়া আচার্যদেব যে কয়েকটি সিদ্ধান্ত নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাদের মুখ্য তিনটী হইতেছে—(ক) কেন পুনঃ প্রমাণেন স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধো গৃহ্যতে-প্রত্যক্ষ সম্বন্ধিষু প্রত্যক্ষেণঃ (খ) উপাধি ভেদস্য চাদৃশ্য মানস্য কল্পনায়াং প্রমাণাভাবাৎ বিশেষ স্মৃত্যপেক্ষস্য চ সংশয়স্যানুপলব্ধ পূর্বে অনুৎপাদাৎ উৎপাদে চাতি প্রসঙ্গাৎ প্রেক্ষাবৎ প্রবৃত্ত্যুচ্ছেদাৎ স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধোঽবধার্যতে ; এবং (গ) তত্তদ সাধরণ কারণ প্রেক্ষায়া চ তৎপ্রমাণ ব্যপদেশে স্বত্রাপি ভূয়ো দর্শনম্ সাধারণমিতি প্রমাণান্তরং জ্ঞাতম্ (পৃঃ ১৬৬)

উল্লিখিত ত্রিবিধ সিদ্ধান্তের প্রথমটির ভিত্তিতেই পরে অবশ্য—"স্থিতিঃ স্বাবয়বেষু সমবায়ো বা প্রদেশ বিশেষে সংযোগ বা (পৃঃ ১৬৮)" উক্তিতে এই নিয়ম মাত্রকেই সমবায় বা সংযোগের অন্তর্ভুক্ত করা চলে বলিয়াছেন। অবশ্য এই নীতি পরবর্ত্তী নিয়ম বিন্যাসকারীগণের এমন কি নিজেরই সম্পূর্ণ অনুমোদন পায় নাই এবং তাহা আলোচনার পূর্বে আচার্য বাচস্পতি সমবায় ও সংযোগের যে পার্থক্য লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করা দরকার। তিনি বৈশেষিকের সমবায় সংজ্ঞা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন 'ইহবুদ্ধি নিমিত্তকং কারণত্বম্।' সংযোগের সহিত ইহার পার্থক্য রক্ষায় বলিয়াছেন—সংযোগেনানৈকান্তো মাভূদিত্যুক্ত উক্তং ব্যাপকত্বে সতীতি। সত্যুপলব্ধি কারণান্তর সদ্ভাবে সর্বত্রোপলভ্যতা ব্যাপকত্বম্ (পৃঃ ১৮৫)" অর্থাৎ ব্যাপকতা বা সর্বত্রোপলব্ধতা সূত্র ভিত্তিই এতদুভয়ের পার্থক্যের কারণ। এবিষয়ে আরও সুনির্দিষ্ট ইঙ্গিত দিতে গিয়া বলিয়াছেন "সংযোগে প্রাপ্তিত্বস্য ন বৃত্ত্যা স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ (পৃঃ ১৮৬)" ; অর্থাৎ পূর্ব্বাচার্যগণ অন্য কোনও পার্থক্য সূত্র নির্দেশ করুন বা না করুন "স্বাভাবিক সম্বন্ধ" প্রাপ্তি সংযোগের বৃত্তি নহে। টীকাকার 'স্বাভাবিক নিয়ত নিয়ম' অর্থাৎ Law of the Uniformity of Nature-কে সংযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে অনিচ্ছুক। আমরা বাচস্পতির আলোচনা হইতে বিজ্ঞান সিদ্ধ নিয়মকে ন্যায় শাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইতে শুধু দেখিতেছি না ; পরন্ত এই নিয়মের স্বরূপ সম্বন্ধেও উৎকৃষ্ট আলোচনা পাইতেছি। বিজ্ঞানের প্রতি আচার্য্যের আস্থা মূলগ্রন্থের বিজ্ঞানের গুরুত্বসূচক সূত্র ব্যাখ্যায় "বিশিষ্টং জ্ঞানং বিজ্ঞানম্" (পৃঃ ১৭০) টীকায় বেশ সুস্পষ্ট এবং এই বিজ্ঞান যে কেবল চিন্তা ভিত্তিক থাকিতে পারে না পরন্ত আচার্যের মতানুযায়ী পরীক্ষা বা অনুশীলন সিদ্ধ হওয়া উচিত তাহা

ঐ সঙ্গে—"বিশেষশ্চ স্মৃতেরন্যৎ" উক্তিতে বুঝা যায় ; অর্থাৎ ন্যায় মতে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ লব্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞানই বিজ্ঞান।

আচার্য বাচস্পতির পরে প্রাচীন ন্যায়ের আলোচনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে থাকে ; কাজেই আচার্যদেব যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূত্রপাত ন্যায় শাস্ত্রে করিয়াছিলেন তাহা আর অধিক বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। তবে পরবর্ত্তী যুগের বিখ্যাত মীমাংসক পার্থসারথি মিশ্র (আঃ ১০৫০—১১২০) তাঁহার বিখ্যাত "ন্যায় রত্নমালা" গ্রন্থে ব্যাপ্তিবাদের আলোচনায় পূর্বোল্লিখিত ভট্টকুমারিলের কারিকা সূত্রদ্বয় গ্রহণ করেন। এবং এতদ্ব্যতীত নিম্নরূপ কারিকা—

যো যথানিয়ত যেন যাদৃশেন যথাবিধঃ।
স তথা তাদৃশস্যৈব তাদৃশেঽন্যত্র বোধকঃ॥

দ্বারা The law or principle of Identity অর্থাৎ তাদাত্ম্য নিয়ম নিজস্ব চিন্তা-ধারায় উল্লেখ করিয়াছেন। চিন্তার এই অন্যতম মূলসূত্র (fundamental Laws of Thought) ধরিবার ইঙ্গিত তাহার নিকটে যে বাচস্পতির আলোচনা হইতেই লক্ষ্যভূক্ত হইয়াছিল তাহা কারিকা মধ্যস্থিত "নিয়ত" শব্দ এবং মীমাংসা প্রকরণ হইলেও "ন্যায়রত্নমালা" এই গ্রন্থ নাম দ্বারা ধরা পড়ে। তবে এখানে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে ভট্ট ও পার্থসারথির সূত্রত্রয় চিন্তার মূল সূত্ররূপে ন্যায়ের অনুমান প্রকরণে মাত্র গ্রাহ্য হইতে পারে। ন্যায়ের প্রত্যক্ষ খণ্ডের সহিত ইহাদের বিশেষ কোনও সংস্রব আসিতে পারে না। সেজন্য ইহারা নিয়ত নিয়ম হইলেও স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত এবং সংযোগ বা সমবায় কাহারও সহিত যুক্ত হইবে না।

স্বাভাবিক নিয়মকে নিয়ত নিয়ম হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে উল্লিখিত (খ) সিদ্ধান্ত মতে মানিতে হইবে যে প্রকৃতির সর্ব্বত্রই নিয়ম আছে এবং তাহা চিন্তার মূল সূত্রাবলী হইতে স্বতন্ত্র। উল্লিখিত বাক্যের অর্থ আরও বিশদ করিয়া বুঝিতে গেলে মনে রাখিতে হইবে যে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রধাণতঃ ঘটনা সম্বন্ধীয় নিয়ম। বিজ্ঞান জগৎকে অসংখ্য ঘটনা প্রবাহের সমষ্টি রূপেই দেখিয়া থাকে। যাহা ঘটনা নহে তাহার সম্বন্ধে যে কোনও সাধারণ নিয়ম হইতে পারে না এরূপ নহে। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একটা বৃহৎ অংশ ঘটনা সম্বন্ধীয় নিয়মের জ্ঞান হইতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ প্রাকৃতিক নিয়মই বলিয়া দেয় যে কতকগুলি বিশেষ ঘটনার মধ্যে এমন যোগসূত্র আছে যে এক বা একাধিক ঘটনা ঘটিলে অপর একটি ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। এই যোগ সূত্র যে নানা প্রকারের হইতে পারে তাহা

বিজ্ঞান স্বীকার করে এবং এই যোগসূত্রের নানা রূপকে "সমবায়ান্ত নানা কৃত্তিরত্তি" সূত্র মাধ্যমে ন্যায় শাস্ত্রের অন্তর্ভূত করা যায়।

প্রকৃতির এই নিয়মগুলি শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। জগতের একাংশে যে সকল নিয়মানুসারে ক্রিয়া চলিতেছে তাহাদিগকে বুঝিতে হইলে জগতের অন্যান্য অংশে যে সকল নিয়ম রহিয়াছে উল্লিখিত (গ) সিদ্ধান্ত মতে তাহাদের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। ইহা লক্ষ্য করিলে আমরা এই সকল নিয়মের বৈষম্য ও পার্থক্যের মধ্যেও একরূপতা বা সার্বত্রিক সিদ্ধতা খুঁজিয়া পাই। কেবল তাহাই নহে। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই বাড়ে ইহার হইবে যে একটি অখণ্ড ঐক্য (unity of nature) আছে তাহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। এই জগৎ অসংখ্য স্বতন্ত্র অসংলগ্ন বস্তু বা ঘটনার সমাবেশ মাত্র নয়; ইহার প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অপরাংশের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট। আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র বেদান্ত শাঙ্কর ভাষ্যের সুপ্রসিদ্ধ উপটীকা "ভামতী" লিখিতে গিয়া উপনিষদের "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সূত্র মাধ্যমে তাহা উপলব্ধি করিয়াই ন্যায় শাস্ত্রের নিয়ম সূত্র বিভাগে এই স্বাভাবিক নিয়মের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছেন কিন্তু পরবর্ত্তী নব্য নৈয়ায়িকেরা অসার বহুল কূট তর্কে মাথা ঘামাইতে গিয়া ন্যায় শাস্ত্রে ইহার প্রকৃত মর্যাদা চিন্তা করেন নাই।

তবে নিছক তর্ক করিতে গেলেও যে কিছু সর্ব্বলোকসিদ্ধ বা সার্ব্বজনীন নিয়ম স্বীকারের প্রয়োজন হয় তাহা আচার্য্য বল্লভের নিকট ধরা পড়িয়াছিল। এবং তিনি তাঁহার প্রেয়সীর নামাঙ্কিত "ন্যায় লীলাবতী" গ্রন্থে পরার্থানুমান (Mediate Inference) প্রসঙ্গে গ্রীক পণ্ডিত Aristotle এর সুপ্রসিদ্ধ Dictum এর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—"অতএব হেতু পদমপি সাধ্য স্বরূপ মাত্রবৎ (পৃঃ ৬০৩)"। পরে নৈয়ায়িক উপায় কারক বর্ধমানোপাধ্যায় তাঁহার "প্রকাশ" টীকায় Whately অনুরূপ উক্ত সূত্র ব্যাখ্যা রূপে বলিয়াছেন যে "সাধ্যস্য বিষয়ত্বেঽপি তদুপরক্ত সাধ্যস্যাপি বিষয়ত্বাৎ" (পৃঃ ৬০৩) অর্থাৎ কোন ব্যাপ্য পদের সম্বন্ধে যাহা স্বীকার বা অস্বীকার করা যায় তাহা সেই পদের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও বস্তু সম্বন্ধে স্বীকার বা অস্বীকার করা যাইতে পারে। উক্ত Dictum-de-omni-et-nullo ব্যতীত সুপ্রসিদ্ধ পক্ষধর মিশ্র ভগীরথ ঠকুরও উল্লিখিত 'প্রকাশে'র বিবৃতি টীকায় সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক John Stuart Mill এর উক্ত সূত্র ব্যাখ্যা ভিমত বলিয়াছেন যে—"পদানাং প্রত্যেকমেব তাদৃশ জ্ঞান জনকত্বাদতিব্যাপ্তিরিতি বাক্যপদং তাদৃক পদোপস্থিত সমুদায় পরম্" (পৃঃ ৬০৩); অর্থাৎ কোনও শ্রেণী সম্বন্ধে যাহা স্বীকার

বা অস্বীকার করা হয় তাহা তাহার অন্তর্ভুক্ত যে কোনও বস্তু সম্বন্ধে স্বীকার বা অস্বীকার করা যাইতে পারে।" এই টীকাও উপটীকা সম্বলিত সর্বলোকসিদ্ধ নিয়মটিকে বর্ত্তমান সময়ে "মৈথিল সূত্র" রূপে গ্রহণের তাগিদ আসিয়াছে। তবে ইহার মূল্য স্বাভাবিক নিয়মের মূল্যানুরূপ নহে; যদিও তিনিই প্রথম আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রে সাধারণ নিয়মের স্থান আগে, বিশেষ বস্তু বা ঘটনার স্থান পরে স্বীকার করিয়া ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে—"ন চ তদেবাস্তুমিতম; অনবগতনিয়মত্বাৎ (ন্যায় লীলাবতী পৃ—৪৯৩)" এবং কার্যকারণ সংক্রান্ত নিয়ম (Law of Causation) নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"অসতি বাধকে সামান্য নিষ্ঠম্ সদৃশ কার্য্যস্য তথৈবোপলব্ধেঃ, অন্যথা কার্য্য সাদৃশ্যস্যাকস্মিকত্ব প্রসঙ্গাৎ—(ঐ পৃঃ ৮০৯)"।

যদিও শ্রীশ্রীহর্ষ রচিত "খণ্ডন খণ্ড খাদ্যে" গ্রন্থ প্রচণ্ড আঘাতে ন্যায় শাস্ত্রে উক্ত স্বাভাবিক নিয়মটির প্রকৃত মূল্যায়নের সুযোগ দিয়াছিল তথাপি একমাত্র শঙ্কর মিশ্র ভিন্ন কেহই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। ন্যায়শাস্ত্রে এই পণ্ডিতের খ্যাতি বিশেষ গুরুত্ব অর্জ্জন করে নাই সত্য কিন্তু তিনি উল্লিখিত "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" গ্রন্থের "শাঙ্করী" বা "আনন্দবর্ধন" টীকা লিখিতে গিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে বাচস্পতির উক্ত সূত্রের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন আছে এবং সেজন্য বৈশেষিকের ৭।২।২৬ সূত্র ব্যাখ্যায় কারণত্ব ভিত্তি অস্বীকার করিয়াও তৎপরিবর্ত্তে উল্লিখিত অধিকরণ ভিত্তির উন্নতি বিশ্বাসে (নিয়মাধিকরণ তয়োবোয়েরত্ব ব্যাখ্যা ৭।২।২৬ সূত্রের উপস্কার) "স্বভাব শক্তিরেব সর্বত্র নিয়ামিকা" এই মূল্যবান অথচ সমবায় লক্ষণ তাঁহার "বৈশেষিক সূত্রোপস্কার" গ্রন্থে নির্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য কারণত্ব (Law of Causation) ভিত্তি অস্বীকারের দ্বারা সমবায়কে তিনি নৈয়ায়িকত্বে অঙ্গহীন করিয়াছেন। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক সূত্র সংশ্রব জন্য আমরা সমবায়কে ন্যায় ও বৈশেষিক সিদ্ধ কারণত্ব সংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র বিশিষ্ট প্রকরণরূপে সুগঠিত করিতে পারি। এই গঠনের আবশ্যকতা বিখ্যাত মনিষী Karal K. Darrow লিখিত The Renaissance of Physics গ্রন্থে লিখিত উক্তি "Ours is this generation which first of all in history is able to perceive the unity of nature not as a baseless dogma or a hopeless aspiration but as a principle of science based on proof as sharp and clear as anything which is known. Old as the belief is in Asia and Europe it is interesting to compare some of the latest conclusions of science with the fundamental ideas underlying the "Adwaita Vedantic Theory" —

হইতে পাইতেছি। তবে বেদান্তে কারণত্বের স্থান না থাকায়, মীমাংসা মতে 'সমবায়' সকল সম্প্রদায় স্বীকৃত না হওয়ায় এবং বৈশেষিকে কারণত্ব ও স্বভাবশক্তিকে একসঙ্গে স্বীকারের অসুবিধা থাকায় একমাত্র ন্যায় শাস্ত্রেই ইহা স্বীকৃত হইতে পারে। তর্ক সংগ্রহের ন্যায় বোধিনী টীকাকার আচার্য গোবর্ধনও নৈয়ায়িক সমবায়ে নিয়মের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—"সম্বন্ধত্বং বিশিষ্ট প্রতীতি নিয়মেকত্বম্" (বোম্বাই সংস্করণ ন্যায় বোধিনী-সহ তর্ক সংগ্রহ ; পৃঃ ৬২)।

পূর্বেই বলিয়াছি যে ন্যায় বার্তিককার উদ্দ্যোতকর মতে সমবায় যেখানে থাকে তাহা স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে এবং সমবায় সংযোগ প্রভৃতির ন্যায় আশ্রিত নয়। এই সঙ্কেত স্বীকার করিয়া এই সমবায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপবিভাগ মাত্র না থাকিয়া স্বতন্ত্র প্রকরণ রূপে অথচ প্রত্যক্ষসিদ্ধ থাকিয়াও গৌতম দর্শনের ১।১।৫ সূত্রের "তৎপূর্বকম" অংশ এবং তাহার ব্যাখ্যায় রাধা মোহন গোস্বামীর "সহচার প্রত্যক্ষপর" ইত্যাদি উল্লেখ (কেচিত্তু তৎপূর্বকমিত্যত্রতৎপদং সহচার প্রত্যক্ষপরং তত্র প্রত্যক্ষমিন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানত্বং তথা চ সহচার বিষয়কেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানমনুমানমিত্যর্থ ইত্যাহুঃ—ন্যায় সূত্র বিবরণ, পৃঃ ১৫।১৬) হেতু সমবায় সহচার সংশ্লিষ্ট বলিয়া ন্যায় ব্যতিরিক্ত পদার্থ বিভাগ নির্দিষ্ট অনুমানের অনুযোগী রূপে দাঁড়াইতে সক্ষম এবং সংযোগ (colligation of facts) ইহারই বিভাগ রূপে পরিগৃহীত হইবে। বার্তিককারের আলোচনা আমাদের সেই ইঙ্গিতই প্রদান করে এবং এই পথ ন্যায় শাস্ত্রের পুনর্জাগরণের জন্য অত্যাবশ্যক সন্দেহ নাই। এইভাবে সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে 'সর্বত্র নিয়ামক স্বভাবশক্তি' সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার পর নানা যুক্তিত্ব হেতু ইহাকেই আবার আমরা অন্যান্য সমবায়ের মূল সূত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে থাকিব অর্থাৎ যে মূল সূত্রের উপর সমবায়ানুমান প্রতিষ্ঠিত তাহাকেই আবার অন্যান্য পূর্বগামী সমবায়ানুমানের সিদ্ধান্ত (The ground of Induction is itself an Induction) রূপে পাইব।

বিদ্রোহের অন্তরালে।

ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় আমরা কত বিদ্রোহের কাহিনী পাঠ করিয়া থাকি। এই সব বিদ্রোহের ফলে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রীয় জীবনে সুদূর প্রসারী পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়ে; শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের পরিবর্ত্তন হয় এবং এই পরিবর্ত্তন আকস্মিক ভাবে সংগঠিত হয়। বিদ্রোহের ফলে সূচিত পরিবর্ত্তন রাজনৈতিক হইলেও ইহার অন্তরালে অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও বিবিধ মানসিক কারণ কার্য্যকরী থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিদ্রোহের কারণ নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব। ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে এক একটি বিদ্রোহের পশ্চাতে কয়েকটী বিশেষ ধরণের কারণ থাকিতে পারে; আমরা এখানে কোন বিশেষ বিদ্রোহের আলোচনা না করিয়া সাধারণ ভাবে বিদ্রোহের আলোচনা করিব।

বিদ্রোহ সম্বন্ধে সাধারণের মনে কতকগুলি ধারণা আছে—এইগুলি সম্পূর্ণভাবে ভুল না হইলেও একেবারে ঠিক নহে। প্রথমে আমরা বিদ্রোহ সম্বন্ধে প্রচলিত এই ধারণাবলীর পর্য্যালোচনা করিব।

অনেকেরই বিশ্বাস আছে যে বিদ্রোহের আবির্ভাব একেবারে অতর্কিতে ঘটিয়া থাকে; অর্থাৎ সাধারণ সমাজ-বিবর্ত্তন চলে ধীরে ধীরে আর বিদ্রোহ দেখা দেয় হঠাৎ বা আকস্মিক ভাবে; বিবর্ত্তন চলে মন্থর গতিতে, আর বিদ্রোহের প্রসার হয় তড়িৎগতিতে। বিদ্রোহের ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় বিদ্রোহপূর্ব্বযুগে বিদ্রোহের প্রস্তুতি সাধিত হইয়া থাকে। যে অসন্তোষের প্রকাশ হিসাবে বিদ্রোহ দেখা দেয়, তাহা ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। যেমন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আমাদের কাছে আকস্মিক বলিয়া প্রতিভাত হইলেও ভূগর্ভে অনেকদিন ধরিয়া তাহার প্রস্তুতি চলে, সেইরূপ বিদ্রোহও হঠাৎ সংঘটিত হইলেও দীর্ঘদিনের অসন্তোষের পটভূমিতে ধীরে ধীরে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিদ্রোহ সম্বন্ধে আর একটা সাধারণ বিশ্বাস এই যে, জনগণের মন যখন নৈরাশ্যে পূর্ণ হইয়া পড়ে, তখনই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। নৈরাশ্য বা হতাশা যে বিদ্রোহের অন্যতম কারণ একথা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু কেবলমাত্র হতাশাই

বিদ্রোহের জন্মদান করিতে পারে না। বিদ্রোহের পশ্চাতে থাকে বিদ্রোহকারীদের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা। বিদ্রোহপূর্ব্ব যুগে জনগণ যদি অত্যাচারে ও নিপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া যাইত, যদি তাহারা নির্জীব হইয়া পড়িত, যদি তাহাদের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইত, তাহা হইলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকিত না। বিদ্রোহ-পূর্বযুগে বিদ্রোহীদের যেমন একদিকে থাকে রাষ্ট্রীয় অত্যাচার জনিত মনোবেদনা, তেমনি অপরদিকে থাকে এক বলিষ্ঠ মনোভাব। বিদ্রোহীর এই তেজোদৃপ্ত ভাবকে কবি নজরুল তাঁহার 'বিদ্রোহী' নামক কবিতায় সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কল্পিত বিদ্রোহীর ভাষায়,—

"আমি বেদুইন আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ।"

বিদ্রোহীদের মনে স্বীয় শক্তি সম্বন্ধে থাকে দৃঢ় বিশ্বাস আর সুনিশ্চিত আশা। ভাবীকালের বিদ্রোহীদের মনে আশা থাকে যে তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে একদিন এই দুর্দ্দশার অবসান ঘটিবে। তাহাদের মনে আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার একটী ছবি সর্ব্বদা জাগরুক থাকে এবং তাহাদের এই পরিকল্পিত আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করিবার জন্য তাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে বিদ্রোহের প্রেরণা জোগাইয়া থাকে আশা, নিরাশা নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বর্ত্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার অসন্তোষ, বর্ত্তমান অবস্থার অবসান ঘটান সম্ভব বলিয়া ধারণা, বর্ত্তমান অবস্থার অবসান ঘটিলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা হইবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা আছে বলিয়া ধারণা—এই কয়েকটি মনোভাব বিদ্রোহের পথে মানুষকে পরিচালিত করিতে পারে।

অনেকের ধারণা আছে রাষ্ট্রের শাসকবর্গের অত্যাচার যখন সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছায়, তখনই কেবল বিদ্রোহ ঘটিতে পারে। অত্যাচার চরমে উঠিলে যে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও বিদ্রোহ হইতে পারে। আমেরিকা যখন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন তথাকার অধিবাসীরা যে তৃতীয় জর্জের শাসন ব্যবস্থায় অত্যন্ত নিপীড়িত হইতেছিল তাহা নহে; ফরাসী বিদ্রোহের পূর্ব্বে সাধারণ কৃষকেরা এক-তৃতীয়াংশ জমির স্বত্ব ভোগ করিত; প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে জার্ম্মানীর যত অবনতি ঘটিয়াছিল, হিটলারের ক্ষমতালাভের সময় রাষ্ট্রীয় অবস্থা তত মন্দ ছিল না। মোট কথা, দুর্দ্দশা চরম সীমায় আসিবার পূর্ব্বেই বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়া থাকে; বরং অত্যাচার

যদি চরমে আসিয়া পৌঁছায়, তাহা হইলে তাহা অনেক সময় জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়া বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমাইয়া দেয়।

কেবলমাত্র অর্থ-নৈতিক কারণেই সর্ব্বদা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, এ বিশ্বাসও সম্পূর্ণভাবে ঠিক নহে। জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইলে, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ন্যূনতম দাবী মিটাইতে পারিলেই শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতে পারে না, এরূপ মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে যে অসাম্য থাকিয়া যায়, তাহাও অনেক সময় মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কোন প্রকার অর্থ-নৈতিক বণ্টনেই রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ণ সাম্য আনা সম্ভব নহে; সুতরাং জীবনধারণের সাধারণ প্রয়োজন মিটিয়া যাইলেও একদল লোক অধিক হইতে অধিকতর সুখভোগ ও সামাজিক প্রতিপত্তি কামনা করে। সুতরাং তাহাদের মনে অসন্তোষ থাকিয়া যাইবেই। তাহারা সুবিধা পাইলেই অধিক ক্ষমতালাভের জন্য রাষ্ট্রে নানা আপত্তির সৃষ্টি করিবে। তাহা ছাড়া সাধারণ ভাবে বলিতে পারা যায় যে পারস্পরিক ঈর্ষ্যা ও ক্ষমতালোলুপতা বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রেরণা জোগাইতে পারে। অতএব একদল লোক স্বভাবতঃই জনসাধারণের সাধারণ দুরবস্থার সুযোগ লইয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে।

বিদ্রোহপূর্ব্বযুগে বুদ্ধিজীবীদের দানও বিশেষ লক্ষণীয়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, সাধারণতঃ বুদ্ধিজীবীরা শান্তিপ্রিয় লোক, সুতরাং বিদ্রোহ ইত্যাদি রক্তক্ষয়ী কার্য্যে তাঁহারা লিপ্ত হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত না থাকিলেও জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, বিদ্রোহের ভাব-ধারা যোগাইয়া থাকেন। ফরাসী বিদ্রোহের মূলে ছিল রুশো, দিদারো, ভলটেয়ার ইত্যাদির রচনা; আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, টম্ পেইন ইত্যাদি; রুশ বিদ্রোহের দাবানল জ্বালাইয়াছিল গোগোল, পুশ্‌কিন, টলষ্টয়, গোর্কি ইত্যাদির সাহিত্য ও দর্শন; ব্রিটিশযুগের ভারতীয়দের অন্তরে স্বাধীনতাস্পৃহা তীব্র করিয়া তুলিয়াছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। বিদ্রোহের প্রেরণা যোগাইবার জন্য দুইটি জিনিষের প্রয়োজন—বর্ত্তমানের দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতনতা ও সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা। সাধারণ লোকের এই দুইটি বিষয় সম্বন্ধে ধারণা থাকিলেও তাহাদের ভাবধারা সুস্পষ্ট থাকে না। বর্ত্তমানের দুরবস্থার কাহিনী কখনও যথাযথ ভাবে লিখিয়া, কখনও বা অতিরঞ্জিত ভাবে লিখিয়া এই সমস্ত সাহিত্যিকরা জনসাধারণকে উত্তেজিত করেন এবং বর্ত্তমান অবস্থার অবসান ঘটিলে ভবিষ্যতে কিরূপে ধরাধামে স্বর্গলোক রচিত

হইবে তাহারই বর্ণনা করিয়া থাকেন। তবে সব লেখকই যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটাইবার সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া লেখনী ধারণ করেন, তাহা নহে।

বিদ্রোহ আরম্ভ করিতে এবং তাহা চালাইয়া যাইবার জন্য প্রয়োজন বিদ্রোহ কারীদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা ও ঐক্য। এই কারণে অনেক সময়ই দেখা যায় যে বিদ্রোহের পরিকল্পনা রচিত হয় ছোট ছোট গুপ্ত সভা সমিতিতে যেখানে প্রায় সকল সদস্যেরই ভাবধারা একই আদর্শে রচিত। হিট্‌লারের ক্ষমতা লাভের পূর্ব্বে তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুগামীরা 'বিয়ার' পানালয়ে সমবেত হইত। বিদ্রোহের কার্য্য চালাইবার জন্য সামরিক শক্তির প্রয়োজন; এইজন্য অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত বিদ্রোহের কার্য্য চালাইয়া যান কয়েকজন বিদ্রোহী সামরিক নেতা। সাম্প্রতিক কালের মিশরের বিদ্রোহ পরিকল্পিত হইয়াছিল নাগুইব, নাসের ইত্যাদি সামরিক কর্ম্মচারী দ্বারা (অবশ্য এই বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন হয় নাই) বৎসরাধিক কাল পূর্ব্বে ফরাসী দেশে যে বিদ্রোহের আভাস দেখা গিয়াছিল তাহারও পরিকল্পনায় কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।

সমাজমনের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে বিদ্রোহের আত্মপ্রকাশের পূর্ব্বে উহা কয়েকটী স্তরের মধ্য দিয়া অতিক্রম করে: (ক) বর্ত্তমান অবস্থায় সমাজ জীবনে চাঞ্চল্য, অশান্তি ও অসন্তোষ, (খ) ঐ অসন্তোষকে সাহিত্যা-দির মাধ্যমে স্পষ্ট রূপ দান করা, (গ) কতকগুলি দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তির মধ্যে ভাবধারার ঐক্য এবং তাহাদের সক্রিয় চেষ্টা, (ঘ) তাহাদের এই আদর্শ ও ভাবধারার সহিত জনসাধারণের ভাবধারা ও আদর্শের মোটামুটি মিল। ইহা থাকিলে সহজেই তাহারা জনসাধারণকে স্বদলে আনিতে পারে। আদর্শের ঐক্য থাকিলে তাহাদের ভাবধারা জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং বিদ্রোহ তখন সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়। দৃঢ়সঙ্কল্প বিদ্রোহীদের বৈশিষ্ট্য হইল যে কেবলমাত্র কথায় নহে, কার্য্যের মাধ্যমেও তাহারা তাহাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে এবং তাহাদের তড়িৎগতিতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা জনগণের মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

আবার বিদ্রোহ-পরিচালকদের সঙ্ঘবদ্ধতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে উপযুক্ত নেতৃত্বের উপর। দক্ষ নেতার অভাবে বিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বিদ্রোহের গোড়াপত্তন যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা করিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া যান এবং তাঁহাদের ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া দেখা দেন এক বা একাধিক নেতা। এই নেতারা হ'ন দৃঢ়সঙ্কল্প ও কর্মে অটুট। ইহাদের যদি বাগ্মিতার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা সহজেই

সাফল্য অর্জন করিতে পারেন। নেতার বাগ্মিতা থাকিলে জনগণের দুঃখদুর্দশা (সত্য বা কাল্পনিক) এবং তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্ট, তেজোদৃপ্ত ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিতে পারেন এবং অনায়াসেই জনগণের হৃদয় জয় করিতে পারেন।

অনেক সময়ই দেখা যায়, বিদ্রোহপূর্ব্ব এবং বিদ্রোহকালীন জননায়কদের পার্থক্য আছে। বিদ্রোহপূর্ব্ব নেতারা লেখক, অধ্যাপক, ব্যবহারজীবী ইত্যাদি—ইঁহাদের ব্যক্তিত্বে মননশীলতারই প্রাধান্য অর্থাৎ ইঁহারা দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থার তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রচারের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; প্রকৃত কর্ম্ম-ক্ষমতা ও জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ ইঁহাদের অনেকেরই বেশী থাকে না। মনো-বিদ্‌রা এই জাতীয় লোকের ব্যক্তিত্বকে আত্মকেন্দ্রিক (introvert) বলিয়া আখ্যা দেন। বিদ্রোহকালীন নেতাদের ব্যক্তিত্ব অনেক সময়ই ইহার বিপরীতধর্ম্মী, অর্থাৎ ইঁহাদের ব্যক্তিত্ব বহির্মুখী (extrovert)। ইঁহারা 'কাজের লোক' সূক্ষ্ম বিশ্লে-ষণের কার্য্যে ইঁহারা ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসেন না। ইঁহারা অনেকেই জনসাধা-রণের সঙ্গে মিশিবার ক্ষমতা রাখেন এবং স্বীয় অনুগামীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন, ও তাহাদের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি গঠণমূলক কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন। ইঁহারা যে উচ্চ নৈতিক আদর্শ অনুযায়ী সকল সময় কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা নহে।

বিদ্রোহের সাফল্য কতকাংশে নির্ভর করে শাসকগোষ্ঠীর দুর্ব্বলতার উপর। শাসকগোষ্ঠীর যদি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থাকে, যদি তাঁহাদের শাসনপদ্ধতি মোটামুটি ভাবে নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাফল্যের আশা কম। আবার বিদ্রোহের সাফল্য নির্ভর করে বিদ্রোহীদের কার্য্যের গতিবেগের উপর। রাষ্ট্রের অবস্থা যদি বিদ্রোহীদের পরিকল্পনার অনুকূলে থাকে, তাহা হইলে বিদ্রোহ তড়িৎগতিতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং শাসকবর্গের পরাজয় ঘটে। বিদ্রোহের গতি যত দ্রুত হইবে, রাষ্ট্রের সাধারণ লোকের মনে ততই একটা ত্রাসের ভাব সঞ্চারিত হইবে এবং বিদ্রোহের বিরুদ্ধকারীদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা কমিয়া আসিবে। বিদ্রোহকারীরা সাধারণতঃ ভীতি ও ত্রাস উৎপাদনের কৌশল অবলম্বন করিয়া নিজেদের সাফল্য লাভের চেষ্টা করে। জনসাধারণের মনকে যখন ভীতি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন তাহাদের সুস্থভাবে চিন্তার ক্ষমতা থাকে না। এই সুযোগে বিদ্রোহীকারীরা নিজেদের শক্তি ও সাফল্য সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রচার ও অপপ্রচার চালাইতে থাকে। জনসাধারণ সহজেই সেগুলি বিশ্বাস করিয়া বিদ্রোহকারীদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লয়। বিদ্রোহকারীরা ঠিক সে সময়

জয়লাভ করিয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। সাধারণতঃ বলা হয় যে দেশে সেই সম অরাজকতা বিরাজ করে; কিন্তু একথা সম্পূর্ণভাবে ঠিক নহে। এক শাসন-ব্যবস্থা হইতে অন্য শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের এই সন্ধিক্ষণে যে কোন প্রকার শাসন ব্যবস্থা থাকে না এবং জনসাধারণ যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, তাহা নহে। তখন যে শাসন ব্যবস্থা চলিতে থাকে, তাহাকে স্বৈরাচারতন্ত্র বলা যাইতে পারে—যে কে বিদ্রোহীদের বিরোধিতা করিবে, তাহারই বিনাশের সম্ভাবনা। এই সময় বিজয়গর্বে উল্লসিত মদমত্ত বিদ্রোহী নেতাদের হস্তে সুবিচারের আশা করা যায় না।

এই অবস্থা অরাজকতা নহে, ইহা 'সুরাজকতা'র অভাব। ফরাসী বিদ্রোহে সময় আড়াই হাজারের অধিক লোকের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল; কিন্তু ইহার মধ্যে মাত্র ছয় শত তথাকথিত অত্যাচারী ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত—বাকী সবই সাধারণ মধ্যবিত্ত লোক!

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যাইতেছে যে বিদ্রোহের জন্য প্রয়োজন সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক দুরবস্থা বা সম্ভবতঃ অব্যবস্থা, সামাজিক অসাম্য, নূতন ভাবধারা ও সামাজিক আদর্শ, দৃঢ়সঙ্কল্প সামরিক গোষ্ঠীর আবির্ভাব এবং কুশলী নেতার পরিচালনা

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কেন একদল ব্যক্তি বিদ্রোহের কার্য্যে লিপ্ত হ'ন এ বিষয় সর্ব্ববাদিসম্মত কোন মত মনোবৈজ্ঞানিকদের নাই। ফ্রয়েড ও তাঁহার অনুগামীরা মনে করেন যে রাষ্ট্র পিতার প্রতীক এবং পিতার অনুশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের নির্জ্ঞান স্তরে (unconscious) যে প্রতিবাদের স্পৃহা থাকে, তাহাই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তির (যাহা আমাদের সম্বন্ধে নানা অনুশাসনের ভার চাপাইয়া দেয়) বিরুদ্ধে সুযোগ মত প্রকাশ পায়। অর্থাৎ ফ্রয়েড ইত্যাদি মনে করেন প্রতি বালকেরই অন্তরে শৈশব হইতেই পিতার প্রতি এই নির্জ্ঞান স্তরে বিদ্বেষ জাগরিত হয় এবং যখন সে পরিণত বয়সে তাহার সামাজিক বন্ধন বুঝিতে পারে তখন সে তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে; কিন্তু ফ্রয়েডীয় মতবাদ সকলে গ্রহণ করেন না। প্রতি শিশুরই পিতৃদ্বেষী ভাব থাকে ইহা সকলে স্বীকার করেন না এবং তাহা যদি হইত এবং সকলেই যদি রাষ্ট্রীয় অনুশাসনকে পিতার অনুশাসনের তুল্য বোধ করিত, তাহা হইলে অল্পবিস্তর সকলেই রাষ্ট্রদ্রোহী কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিত। সুতরাং এই মতবাদ সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যায় না

কেহ কেহ বলেন যাহাদের অন্তরে তীব্র হীনতা বোধ (inferiority complex) থাকে, তাহারা উহারই প্রতিক্রিয়ার হিসাবে বাহ্য ব্যবহারে নিজেদের

ক্ষমতাসম্পন্ন দেখাইবার চেষ্টা করে, অর্থাৎ তাহাদের দম্ভভাব (superiority complex) দেখা দেয়। ইহারই ফলে তাহারা অত্যন্ত ক্ষমতালোভী হইয়া পড়ে। হিট্‌লারের মৃত্যুর পর তাঁহার মোটর-চালক তাহার যে জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে পাছে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এই ভয়ে হিট্‌লার বক্তৃতাদানের পূর্ব্বে অনেক ঔষধ খাইতেন; তাঁহার দৃষ্টিশক্তি পরিণত বয়সে ক্ষীণ হইয়া পড়িলেও তিনি প্রকাশ্যে চশমা ব্যবহার করিতে চাহিতেন না—অর্থাৎ জনসাধারণ যেন তাঁহাকে দুর্ব্বল বা ক্ষীণশক্তির অধিকারী না মনে করে এই ভয়ে হিট্‌লার সর্ব্বদা ভীত থাকিতেন। এই কাহিনী কতদূর সত্য তাহা আমরা জানি না; তবে যদি সত্য হয়, তাহা হইলে একদল মনোবিৎ বলিবেন যে হিট্‌লারের নির্জ্ঞান বা অবচেতনস্তরে গুপ্ত হীনতাবোধ ছিল। তবে সকল নেতার ক্ষেত্রেই যে এই মতবাদ প্রযুক্ত হইতে পারে তাহা বোধ হয় না।

কোন কোন চিন্তানায়ক মনে করেন যে আদিমকালে মানুষের মনে হত্যার বা হিংসার প্রবৃত্তি ছিল, বিবর্ত্তনের ফলে আমরা তাহা পাইয়াছি; তবে আমরা সর্ব্বদাই এই ভাব প্রকাশ করি না—আমরা কোন সুযোগ বা 'অছিলা'র অপেক্ষা করি। এই মতের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া একদল মনোবিৎ বলেন যে, যে সব ব্যক্তি সভ্যতার আব্‌হাওয়ার মধ্যেও আদিম প্রবৃত্তিগুলি মার্জ্জিত করিতে পারে না, তাহারাই ভাবীকালে বিদ্রোহী মনোভাব দেখাইয়া থাকে। কিন্তু কেন একদল ব্যক্তি তাহাদের আদিম প্রবৃত্তিগুলি পরিমার্জ্জিত করিতে পারে না, তাহা এই মতবাদ দ্বারা অব্যাখ্যাত রহিয়া গেল।

ফরাসী মনোবিৎ ও সাংবাদিক গুস্তাভ ল্য বঁ (Gustave Le Bon) মনে করেন রাষ্ট্রদোহিতা সাধারণ জনতার বিশৃঙ্খল কার্য্যাবলীর (Crowd Behaviour) পর্য্যায়ভুক্ত—রাষ্ট্রদোহের মূলে থাকে রাষ্ট্রের উচ্চস্তরের লোকের হস্ত হইতে নিম্নস্তরের লোকের ক্ষমতা লাভের চেষ্টা। উদাহরণ স্বরূপ তিনি ফরাসী বিদ্রোহের সময়ের রবেস্পিয়ারের (Robespierre) কথা বলিয়াছেন—ল্য বঁর মতে ইনি ছিলেন অতি সাধারণ তৃতীয় শ্রেণীর লোক। লে বঁর এই মতবাদও সম্পূর্ণ ঠিক নহে। সকল বিদ্রোহই নিম্নস্তরের লোকদ্বারা পরিচালিত হয় তাহা নহে, বরং নিম্নস্তরের লোকের দুঃখদুর্দ্দশার সুযোগ গ্রহণ করিয়া উচ্চস্তরভুক্ত এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার চেষ্টা করে।

সকল বিদ্রোহী নেতাদের মনোভাব ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোন সাধারণ সূত্র নির্দ্ধারণের চেষ্টা বৃথা। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সংঘাতে বিভিন্ন ব্যক্তির মনে বিভিন্ন

কারণে তীব্র প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ সংগ্রামী মনোভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণ ভাবে বলিতে পারা যায় মানুষ মাত্রই কোমল ও কঠোর প্রবৃত্তির সমন্বয়। প্রতিকূল অবস্থার প্রভাবে পড়িয়া কোমল প্রবৃত্তির প্রকাশ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে এবং তখন কঠোর বিদ্রোহী মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিবে।

বিদ্রোহ ও সংগ্রামের প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট; সুতরাং বিদ্রোহের সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হইতে পারে না। তবে শান্তিপূর্ণ, সুশাসিত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে থাকিলে মানুষের সংগ্রামী মনোবৃত্তি সুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। অতএব সকল রাষ্ট্রেরই কর্ত্তব্য জনগণের অসন্তোষ দূরীকরণের চেষ্টা করা। সেই সঙ্গে দেখিতে হইবে যেন তাহাদের কোমল বৃত্তিগুলি সুপ্রকাশিত হইতে পারে। সামান্যমাত্র উত্তেজনাকেও রাষ্ট্রনায়কগণের সহানুভূতিশীল মনোভাব লইয়া দেখা উচিত এবং তাহার কারণ নিরূপণ করিয়া তাহা অপসারণের চেষ্টা করা উচিত।

দর্শন ও ভাষা বিশ্লেষণ

শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

১

"অনেক কথা যাওযে বলে কোন কথা না বলি,
তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।"

এই কবিকথার উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি কে তা না জেনেও কোন কোন ক্ষেত্রে দার্শনিকদের উদ্দেশে এ বাক্য প্রয়োগ করা যায়। বর্তমান শতাব্দীর ইঙ্গ-আমেরিকান্ চিন্তানায়কেরা, প্রথাগত দর্শনের বক্তব্য যে ভাষায় প্রকাশিত হ'য়েছে সেই ভাষার বিশ্লেষণ করে দেখতে চান যে উক্ত ভাষা কোন প্রকৃত তত্ত্বনির্দেশী না অর্থহীন বাগ্‌বিস্তারমাত্র। দার্শনিকদের ভাষার বিশ্লেষণ করেই দার্শনিক সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে এই চিন্তানায়কেরা মনে করেন। দার্শনিক ভাষার যৌক্তিক প্রয়োগ লক্ষ্য করলেই ঐ ভাষার অর্থ প্রকট হয় ও দর্শনের মূল্য বিচার হয়। অবশ্য ভাষার যৌক্তিক ব্যবহার, তার ব্যাকরণগত ব্যবহার থেকে ভিন্ন। দুটি বাক্যের ব্যাকরণগত মিল থাকলেই যে, তাদের মধ্যে অর্থগত মিলও থাকবে এমন মনে করা ভুল। 'সে ছ ফুট লম্বা' আর 'সে সৎ ব্যক্তি' বাক্য দুটির ব্যাকরণ-সাম্য থাকলেও, (উভয়ই উদ্দেশ্য-বিধেয়মূলক বাক্য), যৌক্তিক অর্থসাম্য নেই কারণ, প্রথমটি তথ্যের বর্ণনামূলক ও দ্বিতীয়টি মূল্যবোধক। ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণের সাহায্যে এই অর্থগত (সিমানটিক্) ভেদ প্রকট করা যায়; এবং এক-শ্রেণীর বাক্যকে অন্য কোন শ্রেণীভুক্ত মনে করার প্রলোভন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। চিরাচরিত দর্শনের অধিকাংশ সমস্যাই এই শ্রেণীবিভ্রান্তি (ক্যাটিগরী মিস্-টেক-রাইল্) থেকে জন্মেছে বলে আধুনিক বিশ্লেষক মনে করেন। এ প্রবন্ধে আমরা ভাষার এইরূপ বিশ্লেষণমুখী আলোচনার কিছু উদাহরণ দিতে চেষ্টা করব, আর এই ভাষা বিশ্লেষণকে কি অর্থে 'দর্শন' বলা যায় তা দেখতে চেষ্টা করব।

২

ভাষার সঙ্গে ভাবের, শব্দের সঙ্গে ধারণার, বাক্যের সঙ্গে অবধারণের অভিন্নতা না থাকলেও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে। জ্ঞান বা চিন্তা ভাষা দিয়েই তৈরী ও প্রকাশিত হয়। ভাষাই চিন্তার একমাত্র ধারক ও বাহক। মূকবধির মানুষের অঙ্গভঙ্গী যদি তাদের মনোভাবের বাহক হয় তবে ঐ অঙ্গভঙ্গীকেও একপ্রকার ভাষা বলতে হবে। তবে সাধারণের ভাষা বলতে এখানে অর্থবহ কৃত্রিম পদ ও বাক্যসমূহই বুঝতে হবে। দার্শনিকের বক্তব্য, বিজ্ঞানীর জ্ঞান, কবির বেদনা, সাহিত্যিকের আলেখ্য ঐ কৃত্রিম ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশিত বা পরিচালিত হ'য়ে এসেছে। কথিত বা লেখা ভাষাই সমাজজীবনের দৃঢ়মূল ভিত্তি আর মানুষের সভ্যতা ও কৃষ্টির ধারক। কি দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলিকে ভাষিত প্রশ্নের আকারে সাজাতে হয় ও তাদের সমাধানগুলিও যথোচিত ভাষার মাধ্যমে আসে। ভাষা চিন্তার বাহারী বা আটপৌরে পোষাক নয়—অপরিহার্য অঙ্গ। মনের ধারণার কোন স্থির রূপ দিতে হলে ঐ ধারণা বা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট, পরিষ্কার, একার্থ বোধক পদের মধ্যে ধরে দিতে হবে। ভাষার অস্পষ্টতা ধারণারই অস্পষ্টতার পরিচায়ক। ভাষা যেন চিন্তার ছবি, জ্ঞানের মূর্ত্তরূপ, ধারণার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যাকার।

চিন্তা ও ভাষার এই অঙ্গাঙ্গী-ভাবের জন্য ভাষার দোষ চিন্তারই দোষ হ'য়ে দাঁড়ায়। ভাষার বন্ধন জ্ঞানের বন্ধন, ভাষার মুক্তি চিন্তার মুক্তি। উপযুক্ত শব্দসম্ভারের অভাব হ'লে যথোচিতরূপে কোন ধারণা যেন ফুটে উঠতেই চায় না। এখন কৃত্রিম সাধারণ চলিত ভাষা যে একেবারে দোষমুক্ত তা বলা কঠিন। যুক্তি-বিদ্যার পুস্তকে যে সব দোষের তালিকা পাওয়া যায় তা দুষ্টভাষার তালিকা বলেই মনে হয়। তবে সাধারণ কথ্য বা লেখ্য ভাষা নিজে দুষ্ট না হলেও, ভাষা প্রতীকের অর্থ ভুল বোঝার দরুণ বা প্রতীকগুলির শ্রেণীভেদ না বোঝার দরুণও ভাষার দোষ উৎপন্ন হতে পারে। ব্যাকরণের নিয়মাবলীর দ্বারা শাসিত নয় এমন দুষ্ট পদবিন্যাস কোন ভাষাই নয়। আকাঙ্খা, সন্নিধির অভাব না থাকলেও কোন বাক্য অর্থহীন হতে পারে যেমন, "মূর্খতাকে ফুল দিয়ে গুণ করলে বর্গমূল উৎপন্ন হয়"! এ বাক্যের একটি অংশ "ফুল দিয়ে গুণ করা" লক্ষ্য করুণ। "ক দিয়ে গুণ কর" এ বাক্যাকারে একটি চল (ভেরিয়েবল্) 'ক' আছে। ওর কোন মূল্য বা মান (ভ্যালু) দিতে পারলে বাক্যাকারটি একটি বাক্য হয়। এই মূল্য একাধিক হলেও (যেমন ২,৩,৪,৮৪ ইত্যাদি), খুসীমতো যে কোন মূল্য বা

মান এ বাক্যাকারে খাটানো যায় না। "ক দিয়ে গুণ কর" বাক্যাকারে 'ক' এর স্থলে "ফুল" শব্দ বসালে অর্থটা অদ্‌ভুত হয়; এই কারণে সংখ্যা (২,৩ প্রভৃতি) ও "ফুল" বিভিন্ন ন্যায়সম্মত শ্রেণীর অন্তর্গত। এইরূপ ভিন্নশ্রেণীকে একই মনে করার শ্রেণী বিভ্রান্তির জন্যেই (ক্যাটিগরী মিস্‌টেক) "মূর্খতাকে ফুল দিয়ে গুণ করা" অর্থহীন হয়ে গেছে। ভারতীয় শব্দতত্ত্বে এই দোষ পদের যোগ্যতার অভাব বলে বর্ণিত হ'য়েছে। অবশ্য কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি "পঁচিশের বর্গমূল লেপমুড়ি দিয়ে শুয়েছে" প্রভৃতি অর্থহীন বাক্য ব্যবহার করে না। তবু চলিত ভাষায় পদগুলি এমন ভাবে ব্যবহৃত হয় যে তাদের পদশক্তিগত অর্থকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা এড়ানো কঠিন। বিভিন্ন ভাষায় এরূপ ভুলবোঝার বিভিন্ন প্রলোভন থাকে। গল্প আছে যে এক বোকা জামাই যখন শ্বশুরবাড়ী যায় তখন মা বল্লেন "কুটুমবাড়ী খালি হাতে যেতে নেই, বাজার থেকে কিছুমিছু কিনে নিয়ে যাস।" তার পর গল্পটিতে জামাইয়ের "কিছুমিছু" নামক পদার্থ কিন্‌তে যেয়ে অপদস্থ হবার কথা দিয়ে বেশ রসের সঞ্চার হ'য়েছে। "কিছুমিছু" বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হলেও ওটা কোন বিশেষ জিনিষের নাম নয়। ওটা যে কোন বস্তুর একটা অতিসাধারণ নাম! লর্ড রাসেল একে "অসম্পূর্ণ প্রতীক" বা ইনকম্‌প্লিট সিম্বল বলেছেন। এটা একটা চল বা ভেরিয়েবল্‌, যার মূল্য না দিলে অর্থবান হয় না। ভাষাকে নানা ভাবে ভুল বুঝে, তার প্রলোভন কাটাতে না পেরে, দার্শনিকেরাও অনেক সময় অনেক অদ্ভুত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাই আজ ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়েছে। ভাষা প্রতীকের ঠিক ঠিক শ্রেণীবিন্যাস করে দার্শনিক সমস্যাগুলির চরমতম সমাধান করে দেওয়াই বর্ত্তমান শতকের দার্শনিকতা।

৩

ভাষার বিশ্লেষণ-পন্থী দার্শনিকদের পূর্বসূরী হচ্ছেন লুডউইগ হ্বিটগেনষ্টাইন্‌। তাঁর মতে ভাষা যখন তার সরকারী কর্ত্তব্য ছেড়ে ছুটি উপভোগ করতে যায় তখনি দার্শনিক সমস্যার জন্ম হয়। ছুটির দিনগুলো বেহিসেবী আর তাই বোধ হয় উপভোগ্য। কাজের দিনে সাফল্য অর্জনের প্রতিটি দণ্ডপল নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। ছুটির দিনের নিয়ম (কি জিনিষ?) কাজের দিনে প্রয়োগ করলে অসাফল্যই কুড়োতে হয়। ভাষা প্রতীককে অর্থবহ হ'তে হ'লে তার কিছু নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন। এগুলিকে হ্বিটগেনষ্টাইন্‌ বৈয়াকরণ নিয়ম (Grammatical rules) বলে বর্ণনা করেছেন। একই শব্দের বিভিন্ন বিকল্প প্রয়োগ লক্ষ্য করলে পদ-

প্রয়োগের নিয়মগুলি পরিষ্কার হয় ; আর বিভিন্ন প্রসঙ্গে সম্ভব বা অসম্ভব প্রয়োগ কল্পনা করে নিয়ে এই প্রতীক প্রয়োগের যুক্তি বা ন্যায় সম্বন্ধে অবহিত হওয়াই যৌক্তিক ভাষাবিশ্লেষণ। এক নিয়মশাসিত প্রতীক অন্য নিয়মে ব্যবহার করলেই ভাষা ছুটি নেয়। ভাষা একপ্রকার জীবন (mode of life), ক্রিয়া বা ব্যবহার। এর প্রতীকগুলি পেরেক, বল্‌টু, হাতুড়ি, কাস্তে, দা প্রভৃতির মতো ব্যবহারের অস্ত্র। এই ব্যবহারের নিশ্চয়ই কিছু নিয়ম আছে। এখন মনে করুণ পেরেকের এক-রকম ব্যবহার। কিন্তু সময় সময় আমরা পেরেক দিয়ে কান খোঁচাতে পারি, কাস্তে দিয়ে পিঠ চুল্‌কাতে পরি। কিন্তু ঐ গুলিই যদি তাদের একমাত্র, এমনকি একটা ন্যায় সঙ্গত ব্যবহার বলেও মনে করি তো গোলমাল হবার কথা। ভাষা প্রতীকের এমন অবকাশ যাপনের কিছু দৃষ্টান্ত দেখা যাক্।

(ক) ***ক্রিয়াপদ ঃ*** আমরা বলি "রাত কাটে, হাতও কাটে ;" "ফুল ফোটে মুখও ফোটে"; "যাঁতা ঘোরে ভাবনাও ঘোরে;" "সন্দেশ খাই, জল খাই, খাবি খাই"; 'ছাগল ছোটে, গন্ধও ছোটে" ইত্যাদি। শ্রীসুকুমার রায় ভাষাকে বেআক্কেলে ছুটি দিয়েছেন। তিনি পটকার মতো ঠাস্‌ ঠাস্‌ করে ফুল ফুটিয়েছেন, খ্যাঁশ খ্যাঁশ করে 'রাত' কেটে ফেলেছেন। এখন "হাত কাটে" আর রাতও বাংলা ভাষায় 'কাটে' বলে, হাত ও রাতকে যদি একই শ্রেণী-ভুক্ত মনে করি, তবে রাত যেমন "পুইয়ে" যায়, হাতকেও তেমনি 'পুইয়ে' যেতে হয়। কিন্তু তা হয় না বলে 'হাত' ও 'রাত' ভিন্ন নিয়মে শাসিত, ভিন্ন শ্রেণীর পদ। সাধারণ ভাষায় এদের বিকল্প ব্যবহার দেখলেই এদের নিয়মানুশাসনগুলি প্রকট হয়। একই ক্রিয়াপদ ব্যবহার জনিত প্রলোভন না কাটাতে পেরে অনেক দার্শনিকও ছায়ার সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মধুপান করি ও সৌন্দর্যসুধা পান করি বলেই কি মধুর সঙ্গে সৌন্দর্য্যের আত্মীয়তা থাকবে ? এখন ধরুণ একটি টেবিল আমার সম্মুখে 'আছে', তার কোন কিছুর সম্ভাবনও 'আছে'। এখন সম্ভাবনা থাকাটা কি রকমের 'থাকা' এটা একটা দার্শনিক সমস্যা। কোন কোন দার্শনিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাধ্যক্ষ যেমন 'আছেন' তেমনি ভবিষ্যৎ উপাধ্যক্ষ এখনই 'আছেন' বলে ভাবেন। "সম্ভব উপাধ্যক্ষ" যেন কোন অতীন্দ্রিয় জগতে এখন আছেন এবং তিনিই যেন একদিন ঐন্দ্রিয়িক জগতে রূপধারণ করবেন। ঐ 'সম্ভব উপাধ্যক্ষ' উপাধ্যক্ষ না উপাধ্যক্ষা, তাঁর বয়স ৪০ এর উপরে না নীচে, তাঁর বিদ্যা কতদূর ইত্যাদি সমাধানহীন সমস্যা, কোনকিছুর সম্ভাবনার অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতার দার্শনিক সমস্যাটিকে জটিল, অবাস্তব ও আজগুবি বলে

প্রতিপন্ন করে। এ সমস্যাটিকে 'আছে' বা 'থাকে' ক্রিয়াপদের শ্রেণীবিভ্রান্তি-মূলক অপব্যবহার জনিত মনে হয়।

আবার দেখুন, 'মুখে দেওয়া' 'খাওয়া 'ও 'গেলা' এই তিন ক্রিয়াপদ দিয়ে একই কার্য বোঝাতে পারে যদিও আবেগ জনিত পটভূমির জন্য এদের পার্থক্যও খুব স্পষ্ট। এই ক্রিয়া পদগুলির অর্থ দুইস্তরে প্রকাশ হয়, যদিও এই স্তরভেদ আমরা সব সময় করে উঠতে পারি নে। "আমি মুখে দিচ্ছি," "তুমি খাচ্ছ" আর "ঐ লোকটা গিল্‌ছে" এই তিন বাক্যের প্রমাণ-অপ্রমাণ একই পরীক্ষা নিরীক্ষা দিয়ে হয় ব'লে এই তিনবাক্যে একটি সমানধর্ম নিশ্চয়ই আছে; আর তা হচ্ছে ঐ 'খাওয়া' রূপ ক্রিয়াটি। তবে ঐ তিন বাক্য ঐ কার্যটিকে তিন বিভিন্ন ঢংয়ে প্রকাশ করে—তাদের আবেগ জনিত অর্থের মধ্যে পার্থক্য প্রকট। 'আমি মুখে দিচ্ছি' খানিকটা সম্ভ্রমের সঙ্গে ক্রিয়াটি প্রকাশ করে, কিন্তু "তুমি খাচ্ছ" বাক্যে ক্রিয়াপদটি আবেগজনিত অর্থের প্রতি উদাসীন। "ঐ লোকটা গিল্‌ছে" বাক্যে কার্যটি ঘৃণিত ভাবে প্রকাশ করা হয়। এখন যে লোক কিছু 'খায়' সে কিছু 'গেলে'ও বটে অর্থাৎ গলাধঃকরণ করে। এই জন্যেই সুকুমার রায়ের "খাচ্ছে কিন্তু গিল্‌ছে না" স্ববিরোধী মনে হয়; কিন্তু আবেগজনিত অর্থের স্তরভেদ মান্‌লে উক্ত বাক্য মোটেই স্ববিরোধী নয়; কারণ যে কোন ভদ্রব্যক্তি না 'গিলেও' 'খেতে' বা 'মুখে দিতে' পারে। এ সব যায়গায় ক্রিয়াপদের অর্থের দুটো স্তর আছে- বর্ণনামূলক ও আবেগমূলক; এক স্তরে ক্রিয়াটির নির্দেশ হয়, অন্যস্তরে আবেগের প্রকাশ হয়। এই দুই দিক রাসায়নিক মেলনের মত এমনভাবে পরস্পরকে আচ্ছন্ন করে যে, সময় সময় এই অর্থগত স্তরভেদ বেশ কঠিন হ'য়ে পড়ে। বর্তমান ভাষাবিশ্লেষণে এই স্তরবিন্যাস পরিষ্কার হচ্ছে, আর 'শুভাশুভ' 'মঙ্গলামঙ্গল' প্রভৃতি নৈতিক বাক্যগত বিধেয়গুলির বর্ণনামূলক ও আবেগ-মূলক দিকগুলির বিশ্লেষণ সম্ভব হ'চ্ছে।

(খ) **অসম্পূর্ণ প্রতীক**: "কিছুমিছু" "জলটল," "পানটান," শব্দগুলি অর্থহীন নয়, কিন্তু সাধারণ ভাষায় এগুলির অর্থ প্রতিপত্তির জন্য এগুলোকে কোন বিশেষ বস্তুর 'নাম' বলে ভাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এইরকম কোন কোন অসম্পূর্ণ প্রতীককে কোন বিশেষ বস্তুর নাম বলে ধরে নিয়ে, দার্শনিকেরা ঐ অস্পষ্ট বস্তুগুলির স্থান কোন অস্বচ্ছ অতীন্দ্রিয় জগতে নির্দেশ করেন। কারণ তাদেরকে দেশকালাবচ্ছেদে পাওয়া যায় না। আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি হয়েছে?"; আপনি উত্তর দিলেন "কই, কিছু না তো।" এ উত্তরের

কোন দোষ নেই। কিন্তু যদি মনে করি যে আপনার যেমন জ্বর হয়, বয়স হয়, তেমনি 'কিছু না'ও হয় তবেই ভাষা ছুটির দরখাস্ত পেশ করে। 'কিছু না' অসম্পূর্ণ প্রতীকটি তখন কোন বিদ্ঘুটে বস্তুর নাম হয়ে পড়ে আর জটিল দার্শনিক আবর্ত্ত সৃষ্টি করে। আপনার কি হ'য়েছে? প্রশ্নের উত্তরে যখন বলেন 'কিছু না' তখন আপনার বক্তব্য এই নয় যে আপনার 'কিছু না' নামক কিছু হ'য়েছে; আপনার বক্তব্য এই যে আপনার কিছু হয়নি। সাধারণ ভাষার বাক্যকে এইরূপ ন্যায়-সম্মত সমার্থক বাক্যে অনুবাদ করলে "নাম—বস্তু" রূপ ছবিটি মুছে ফেলা যায় ও দার্শনিক সমস্যাটাই উবে যায়। বাক্যনির্দিষ্ট অর্থকে পরিষ্কার করে অনুবাদ করা একরকমের ভাষাবিশ্লেষণ, আর এ দিয়ে অনেক প্রলোভন দূর করা যায়। "যে কোন" রাস্তা দিয়ে আমি হাঁটতে পারলেও, "চিত্তরঞ্জন এভিন্যুর" মত "যে কোন" পদটি কোন বিশেষ রাস্তার নাম নয়। ওটি অসম্পূর্ণ প্রতীক।

এ প্রসঙ্গে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করুণ। "এ ঘরে কোন গরু নেই" বাক্যটি সত্য। কিন্তু এ বাক্যের যায়গায় "এ ঘরে গরুর অভাব আছে" বাক্যটি ব্যবহার করতে পারব, কারণ বাক্যদুটি সমার্থক। তবু দ্বিতীয় বাক্যটি একটা প্রলোভন জাগায়। ওর বিন্যাস থেকে মনে হ'তে পারে যে "গরুর অভাব" যেন একটা কিছু, আর ওটা এ ঘরে আছে। নৈয়ায়িকেরা এমন অভাবীয় পদার্থ শুধু স্বীকারই করেছেন এমন নয়, সেই পদার্থের শ্রেণী বিভাগও করেছেন। কিন্তু "গরু নেই" আর "গরুর অভাব আছে" এ বাক্য দুটির মধ্যে শুধু ভাষাগত পার্থক্যই আছে, তথ্যগত পার্থক্য থাকবে কেন? তথ্যগত পার্থক্য থাকলে এরা সমার্থক হতো না আর সমার্থতা বলে কোন যৌক্তিক ধারণাও থাকত না। আর ঠিক এই কারণেই "ঘটাভাবের প্রত্যক্ষ" আর "ঘটের অপ্রত্যক্ষ" বা প্রতিযোগীর যোগ্যানুপলব্ধি সমার্থক মনে হয়, যদিও তাদের ভাষাগত পার্থক্য প্রকট। অথচ এই ভাষাগত পার্থক্য নিয়ে নৈয়ায়িক ও ভাট্টমীমাংসকেরা কত কলরবই না সৃষ্টি করেছেন!

(গ) ***অনিশ্চিতার্থক পদ ও সর্বনামঃ*** 'আমি-তুমি,' 'এই-সেই' 'এখন-তখন' ইত্যাদি অনিশ্চিতার্থক শব্দ। আমি যে অর্থে 'আমি' কথাটি ব্যবহার করি আর কেউ সে অর্থে ব্যবহার করতে পারে না। 'আমি' কথাটি, 'যে কোন' প্রভৃতি অসম্পূর্ণ প্রতীকের মতো সাধারণভাবে সর্ববস্তুর নামও হয় না। এমনকি 'আমি' অর্থ 'নিজও' নয়। কারণ নিজের সম্বন্ধেও 'আমি' কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। নৈতিক জীবনে যখন বোধ হয় যে আমি আমাকে নিয়ন্ত্রিত করছি,

বা আমি স্বরচিত নিয়মদ্বারা বদ্ধ, তখন এই দুই 'আমি' বা 'নিজ' একই বস্তুকে নির্দেশ করে কিনা সন্দেহ। তাই 'আমি' সর্বব্যবহারেই অনিশ্চিত, আর অর্থের দিক থেকে প্রায় গণিতের শূন্যের মতো ;—এর অস্পষ্টতার সীমা নেই। অথচ এই শব্দের ভিত্তিতে আত্মা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠেছে। দর্শনের ঐতিহ্যে ঐ আধ্যাত্মিক বস্তুই পরম উপাদেয় বস্তু বলে স্বীকৃত। "আমার দেহ" এই সাধারণ ভাষায় মনে হতে পারে যে, অহম্ পদবাচ্যের দেহাতিরিক্ত সত্তার বোধ রয়েছে। কিন্তু যেমন "আমার দেহ" "আমার মন" "আমার বুদ্ধি" বলি, তেমনি "আমার আত্মা" বলতেও তো বাধা নেই। সাধারণ ভাষার নির্দেশ যদি আত্মাকে দেহ থেকে ভিন্ন বলে নির্দেশ করে, তবে সে ভাষার নির্দেশ কি আত্মাকেও আত্মা থেকে ভিন্ন বলে নির্দেশ করবে না? 'আমি' শব্দের অর্থ তাই শূন্যে পর্যাবসান হয়, আর এ শব্দের ব্যবহারের উপর দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। যে শব্দের অর্থ চরমতম ভাবে অনিশ্চিত, যে শব্দার্থ এতো সূক্ষ্ম যে নাই বলেই মনে হয়, সেই সব শব্দই কি দার্শনিককে প্রলুব্ধ করে নি? 'এখন-তখন' (কাল), "এখানে-সেখানে" (দেশ), "আমি-ইহা" "আমি-তুমি" "সত্য-মিথ্যা" "শুভাশুভ" প্রভৃতি অনিশ্চিতার্থক শব্দগুলিই দর্শনমহারথীদের ব্রহ্মাস্ত্র। 'লোহা,' 'গাছ', 'অক্সিজেন' প্রভৃতি নিশ্চিতার্থক শব্দগুলির প্রতি দার্শনিকের কৃপাদৃষ্টি নেই। এর কারণ কি এই নয় যে নিশ্চিতার্থক শব্দে কলহ করার অবকাশ নেই? দর্শন শুধুই ঝগড়া—ভাষার অপব্যবহার জনিত একটা অখণ্ড কলহ।

(ঘ) ***শব্দের রূপক ব্যবহার ঃ*** সাধারণ ভাষায় শব্দের আলঙ্কারিক বা রূপক ব্যবহার এতোই স্বাভাবিক হ'য়ে যায় যে, রূপক অর্থকে স্বাভাবিক অর্থ ধরে নিয়ে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাষায় জড় ও চেতনের ভেদ বোধক পদ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু মন, বুদ্ধি, চিত্ত, চিত্তবৃত্তি, সংবেদন ও তাদের প্রতিচ্ছায়া, ইত্যাদি চেতন পদার্থবোধক শব্দের ব্যবহারে, আমরা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নিছক জড়বস্তুতে প্রযোজ্য বিশেষণ, ক্রিয়া বা ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার করে থাকি। অন্ততঃ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের একটা দূরাগত প্রতিধ্বনি মন, বুদ্ধি প্রভৃতিতে প্রযোজ্য শব্দাদিতে পাওয়া যায়। উদাহরণ—"চিন্তার বোঝা", "মনের ভার" "বিনয়ে অবনত," "মন ছুটেছে তেপান্তরে," "মনে রং লেগেছে," "স্বপ্ন ভেসে যায়," "বুদ্ধির আলো," "জ্ঞানের জ্যোতি," "গরম মেজাজ," "ঠাণ্ডা স্বভাব", "পিচ্ছিল ধারণা," "তৈলাক্ত মনোভাব," "বুদ্ধির ছুরি," "মলিন চিত্ত" ইত্যাদি। সাক্ষাৎভাবে

জড়বস্তুতে প্রযোজ্য এই ক্রিয়া, বিশেষণ প্রভৃতি, চৈতন্যবোধক শব্দে এতোই স্বভাবিক ভাবে লেগে গেছে যে এদের আলঙ্কারিক অর্থ সম্বন্ধে আমরা তেমন সচেতন নই। জন লক্‌ প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের বুদ্ধিকে "অলিখিত কোরা কাগজ" বা "লিপিহীন ফলক" বলে বর্ণনা করেছন। আর তিনি যে, সবসময় এর রূপক অর্থের প্রতি সজাগ ছিলেন এমন বলা যায় না। অনেক ভারতীয় দর্শনপ্রস্থানে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, চিত্তবৃত্তি, অহঙ্কার প্রভৃতিকে অচেতন, অতিসূক্ষ্ম, ধোঁয়াটে জড়বস্তু বলা হ'য়েছে। ভাষার আলঙ্কারিক অর্থের প্রতি সজাগ না থাকা ঐ-রূপ মতবাদের অন্যতম প্রধান কারণ মনে হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বা ঘটনা ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় আমরা ঠিক-ঠিক বুঝতে পারি নে। তাই তথাকথিত মরমীলোকের নাগরিকেরাও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপছবির মাধ্যমে আমাদের ভাষায় ব্যক্ত হয়। ভাষার এই ঢংটির সম্বন্ধে অবহিত হ'লে অনেক দার্শনিক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

(ঙ) ***সম্বন্ধনির্দেশী পদ ঃ*** মধ্যে, ভিতরে, বাইরে, সম্মুখে, পিছনে, উপরে, নীচে প্রভৃতি পদের, মানসিক বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যবহার আলঙ্কারিক। কিন্তু এই ব্যবহার দ্বারা দার্শনিকগণ বিভ্রান্ত হ'য়েছেন। যে অর্থে টেবিলটি ঘরের "মধ্যে" আছে সে অর্থে আমার সুখানুভূতি আমার মনের "মধ্যে" থাকে না। আমরা বলতে পারি না যে আমার মন বলে একটা কিছু আছে ও তার মধ্যে বা একাংশে আমার সুখানুভূতি আছে। আমরা শুধু বলতে পারি যে আমার ওরকম অনুভূতি হচ্ছে। আমরা বলি "ধারণাটি আমার মনের সামনে রয়েছে," "আবেগটি রয়েছে মনের পিছনে," 'কিছু র'য়েছে মনের উপরিভাগে আর কিছু রয়েছে মনের নীচে বা গভীরে।" এসব কথার আলঙ্কারিক ব্যবহার বিস্মৃত হ'লে নানা অনর্থের সৃষ্টি হয়। লর্ড রাসেল "প্রত্যয়সমূহের মনের মধ্যে বা ভিতরে থাকা" রূপ অতিকথার অনিশ্চয়তা দেখিয়েছেন। বিজ্ঞানবাদী দর্শন এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। কোন দার্শনিক নিবন্ধ রচনা করতে হ'লে বা দার্শনিক প্রস্তাব উত্থাপন করতে হলে কোন ভাষার সাহায্য নিতেই হবে। বর্তমানে বাংলাভাষায় দার্শনিক নিবন্ধ রচনার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করবেন। বাঙালীকে মৌলিক দর্শনপ্রস্থান বানাতে হ'লে বাংলাভাষাতেই করতে হবে। বাংলাভাষার কতকগুলি বিশেষ প্রলোভন আছে আর ভাষার চোরাবালি সতর্কতার সঙ্গে পরিহার না করতে পারলে আমাদের মৌলিক চিন্তা ব্যর্থ হওয়া সম্ভব।

তাই নবীন দার্শনিকদের দর্শনেতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে হবে আর ভাষার কারচুপি সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে।

ভাষার বিভিন্ন বংশ-পরিচয় ও স্তরভেদ : কবিগণ ভাষার আক্ষরিক বা শক্য অর্থের পরোয়া করেন না; ভাষার লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা দিয়েই তাঁদের বস্তু উপস্থিত হয়। সাধারণ লোকে কখনও কবিতার ভাষা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে না। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানের জ্ঞাননির্দ্দেশী ভাষায় আক্ষরিক অর্থই মুখ্য। কবির 'না বলা বাণীর ঘন যামিনী' আক্ষরিক অর্থে প্রলাপ, কারণ "না বলা বাণী" স্ববিরোধী। কিন্তু কবির ভাষায় আক্ষরিক অর্থ চাপা পড়ে যায় বলেই তাকে অর্থহীন বলার মানে নেই। মরমী কবির সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অনুভূতির হৃদয়গ্রাহী রূপ দিতে হ'লে, চিন্ময় অমরসংজ্ঞাকে রূঢ় মৃৎসংজ্ঞায় সাজিয়ে দিতে হ'লে, স্বভাবতঃই কবি ভাষার স্থূলরূপ পরিহার ক'রে তার ব্যঞ্জনা ও রসের অভিব্যক্তি চাইবেন। কবির ভাষা তাই বিজ্ঞানের ভাষার মতো হউক এমন দাবী কোন পামর করতে পারে না। তাই জড়বিজ্ঞানের ভাষা, গণিতের ভাষা, কবির ভাষা, সাহিত্য-সমালোচকের ভাষার ভিন্ন গোত্র, তাদের বংশ পরিচয়ও ভিন্ন। তেমনি ভাষার স্তরভেদ স্বীকার না করলে বিপদের অবধি থাকে না। নৈতিক বাক্য বা ভাষা, যেমন "মিথ্যাবলা অন্যায়", প্রাথমিক স্তরের ভাষা; কিন্তু নীতিবিজ্ঞানের ভাষা নৈতিক-ভাষা সম্বন্ধে ভাষা, নীতিবাক্য সম্বন্ধে বাক্য, দ্বিতীয় স্তরের ভাষা বা পরানৈতিক বাক্য (meta-moral statements)। নীতি বিজ্ঞান নৈতিক বাক্য সম্বন্ধেই কিছু বলে, যথা "(মিথ্যাবলা অন্যায়) একটা আবেগের প্রকাশ" এই সমগ্র বাক্যটি কোন বিশেষধরণের নীতিবিজ্ঞানের পরানৈতিক বাক্য। এমন ভাবে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বহুস্তরের ভাষা স্বীকার করা যায়। স্তরভেদ না মানলে "মিথ্যাভাষীর কূটাভাস" (Liar paradox) সমাধান করা যায় না। ধরুণ যে ব্যক্তি মিথ্যা ছাড়া কখনও সত্য বলে না সে বলল, "আমি এখন মিথ্যা বল্‌ছি"; এমতাবস্থায় সে যদি মিথ্যা বলে থাকে তবে সে সত্য বল্‌ছে বল্‌তে হবে; আর যদি সত্য বলে থাকে তবে সে মিথ্যে বল্‌ছে। ভাষার স্তরভেদ স্বীকার করলে এই স্ববিরোধ দূর হয়। মিথ্যাভাষীর সব কথা মিথ্যা ধরে নিলেও তার "আমি মিথ্যা বল্‌ছি" এ বাক্যটি সত্য হতে পারে; কারণ একটি প্রকৃতপক্ষে তার বাক্য (যা মিথ্যে) নয়, কিন্তু তার বাক্য

সম্বন্ধে বাক্য বা দ্বিতীয় স্তরের বাক্য। প্রথম স্তরের ধর্ম এই দ্বিতীয় স্তরের বাক্যে আরোপ করা যায় না। টার্স্কি ও রাসেল ভাষার স্তরভেদ স্বীকার করে মিথ্যেবাদীর সত্যবলার অসুবিধে দূর করেছেন। বর্ত্তমান ভাষাবিশ্লেষণের সাহায্যেই আমরা ভাষার এইসব শ্রেণী ও স্তরের কথা জানতে পারি। এক রাজ্যের ভাষাকে আর এক রাজ্যে অধিকার দিলে গোলমালই বাড়বে।

দর্শনের ভাষা বিজ্ঞানের ভাষার সগোত্র। কারণ চিরাচরিত দর্শন জীবন ও জগত সম্বন্ধে সামগ্রিক, অখণ্ড, পূর্ণ জ্ঞানই দিতে চেষ্টা করেছে। তাই দর্শনের ভাষা বিজ্ঞানের ভাষার মতো আবেগবর্জ্জিত, নিরলঙ্কার, বর্ণনামূলক ভাষা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যুগে যুগে দর্শন অনিশ্চিতার্থক শব্দাবলীর ধোঁয়াটে হেঁয়ালীর হাওয়ায় দুলেছে; ভাষার লক্ষণাকে আক্ষরিক অর্থ ধরে নিয়ে, ভাষার সাদৃশ্যকে বস্তু সাদৃশ্য ভেবে, উপমানানুমানের ভিত্তিতে অনেক আজগুবি বিষয়ের অবতারণা করেছে, যার কোন প্রমাণ বা অপ্রমাণ নেই। দার্শনিকের কলহ তাই সুনিশ্চিতভাবে মিট্‌তে চায় নি। উপরে আমরা সামান্য কিছু উদাহরণ দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে অনেক দার্শনিক সমস্যা ভাষার অবকাশযাপনের আলস্য থেকে উদ্ভূত। বেকন্, হবস্, লক্, বার্কলে প্রমুখ, দার্শনিকগণ ভাষার ফাঁদ সম্বন্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন; কিন্তু তাঁরাও সবসময় খুব ধীরতার সঙ্গে সেই ফাঁদ থেকে মুক্ত হ'তে পারেননি। কেউ কেউ আবার সাধারণ ভাষার নানাছিদ্র দেখে এক নতুন আদর্শ ভাষা বানাবার চেষ্টা করেছেন, যার মধ্যে কোন কারচুপি থাকবে না। রাসেল ও হিবটগেনষ্টাইন, অন্ততঃ তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ে, এমন আদর্শ ভাষা গড়তে চেয়েছেন যা সর্বপ্রকার জ্ঞানই প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু তাঁদের আশা ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ বোধ হয় এই যে অমন ভাষা যদি বা তৈরী হয় তবে তা বিশেষজ্ঞের ভাষা হবে। সাধারণলোক তা ব্যবহারও করবে না ও দার্শনিক সমস্যা থেকে মুক্ত হবে না। দার্শনিকচিন্তা একমাত্র বিশেষজ্ঞের একচেটিয়া নয়। রাসেল তাঁর "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা" গ্রন্থে গানিতিক ন্যায়ের অঙ্গীকার ও বাক্যগুলি যে প্রতীকধর্ম্মী ভাষায় বর্ণনা করেছেন সেই ভাষার সাহায্যে তিনি এক অনুপম ভাষা বানাতে চেয়েছেন। এই ভাষার ভিত্তিমূলে থাকে কতকগুলি মৌলিক (এ্যাটমিক্) বাক্য, আর তারপর তাদের সহযোগে যৌগিক (মলিকিউলার) বাক্যসমূহ গঠিত হয়, গানিতিক ন্যায়ের অঙ্গীকার অনুযায়ী। এ ভাষার সমস্ত যৌগিক বাক্যকে এমন কতকগুলি মৌলিক বা আণবিক

বাক্যে পর্য্যবসান করা যায়, যেগুলি বাস্তব ঘটনা বা তথ্যের পরিষ্কার চিত্র মাত্র। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেছে যে, অমন ভাষাবিশ্লেষণে, সাধারণ ভাষার সমস্ত ঐশ্বর্য ঐ আদর্শ ভাষায় ধরা যায় নি। যৌগিক বাক্য গঠনের স্থায়ানুগ, কয়েকটি ধ্রুবক (কনস্ট্যাণ্ট) হচ্ছে 'না', 'এবং', 'যদি-তাহলে', 'হয়-অথবা, ইত্যাদি। রাসেলের গাণিতিক স্থায়ে 'এবং' সংযোজক অব্যয়টি যে মৌলিক বাক্যগুলি সংযুক্ত করবে, তাদের ইচ্ছামতো স্থান পরিবর্ত্তন করলে অর্থের তারতম্য হয় না। যেমন "রাম এবং শ্যাম" মানেও যা "শ্যাম এবং রাম" মানেও তাই। কিন্তু সাধারণ ভাষায় "এবং" অনেক সময় এমন অর্থে ব্যবহার হয় যে সংযোজিত বাক্য বা পদকে আবর্ত্তিত করা যায় না। যেমন "তিনি বিষপান করলেন এবং/ও মারা গেলেন।" এখানে বলা যায় না যে "তিনি মারা গেলেন এবং/ও বিষপান করলেন"। এখানে "এবং" এর মধ্যে কিছুটা কালিক পরম্পরা রয়েছে। সাধারণ ভাষার শব্দগুলি রাসেলের গাণিতিক স্থায়ের ভাষায় খানিকটা সংস্কৃত ও মার্জ্জিত হ'য়ে গৃহীত হ'য়েছে বলে সাধারণ-ভাষার সব ঐশ্বর্য আমরা কৃত্রিম আদর্শ ভাষায় পাইনে। জি, রাইল বলেন যে গাণিতিক স্থায়ের ভাষা যেন 'প্যারেড' করা ভাষা, কুচকাওয়াজ করা শিক্ষিত সৈন্য, সাধারণ ভাষার এলোমেলো নাগরিক নয়। উপরন্তু একেবারে সুনির্দিষ্ট অর্থবান সব আণবিক বাক্য গঠন করাও সম্ভব হয় নি। তাই আদর্শ ভাষা গড়ার চেষ্টা পরিত্যক্ত হ'য়েছে। বর্ত্তমানে বলা হচ্ছে যে সাধারণ ভাষা এমন কিছু ভুল বা অনিশ্চিত নয় যে তাকে আদর্শ ভাষায় রূপান্তরিত করতে হবে। সাধারণ লোকে সাধারণ-ভাষায় বিভ্রান্ত হয় না। দার্শনিকেরাই শুধু তার রূপকে, অলঙ্কারে, লক্ষণায় বিভ্রান্ত হ'য়ে অতীন্দ্রিয় লোকবিহারী সত্তার কল্পনা করেন—যা প্রমাণ অপ্রমাণের বাইরে। হ্বিটগেনষ্টাইনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের ভাষাবিশ্লেষণে তাই আদর্শ ভাষা সৃষ্টির প্রয়াস নেই। নবপর্য্যায়ে তাঁর মতে সাধারণ ভাষাই ঠিক; তবে তার বিশ্লেষণ করে দার্শনিকদের প্রলোভন দূর করতে হবে। বর্ত্তমান ভাষাবিশ্লেষণ তাই এক ধরণের দার্শনিক রোগের চিকিৎসামাত্র—ভাষার সংস্কার নয়। এ বিশ্লেষণে সাধারণ-ভাষার নানা ব্যবহার পর্য্যালোচনা করে ঐ ব্যবহারের নিয়মগুলি প্রকট করা হয়, আর উপরে বর্ণিত নানারূপ শ্রেণী-বিভ্রান্তি অপনীত করা হয়। ঐ শ্রেণীবিভ্রান্তি বা ভাষার অবকাশ যাপনের জন্য দার্শনিক যে সৌধ শূণ্যে নির্মান করেন তাকেই ধূলিসাৎ করা বর্ত্তমান ভাষাবিশ্লেষণের উদ্দেশ্য। শূন্যে নির্মিত সৌধ ভেঙ্গে ফেললে যেমন বাস্তব

জগতের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তেমনি অতীন্দ্রিয়-লোকবিহারী দর্শনের অপনয়ে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না।

৫

অধুনা অধিকাংশ ইঙ্গ-আমেরিকান্ দার্শনিক মনে করেন যে দর্শন শুধুই ভাষা-বিশ্লেষণ ও দর্শনেতিহাসের পূর্বাচার্য্যগণের মধ্যে তাঁরা একধরণের ভাষা-বিশ্লেষণই আবিষ্কার করতে চান। যে সব যায়গায় মনে হয় যে পূর্বাচার্য্যগণ জীবন ও জগত সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান দিতে চেষ্টা করেছেন, সে সব যায়গায় হয় তাঁরা অর্থহীন প্রলাপ বকেছেন অথবা, অমন পূর্ণজ্ঞান যদি বা সম্ভব হয় তো তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই পেতে হবে; দিব্যানুভূতি অথবা ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ সাক্ষাৎকাররূপ কোন অদ্ভুত পদ্ধতি জগতের স্বরূপ-জ্ঞানে দর্শন প্রয়োগ করতে পারে না। অন্ততঃ এইটাই বর্ত্তমান ভাষাবিশ্লেষকের প্রস্তাব। দর্শনের স্বরূপ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। এমতাবস্থায় কোন বিশেষ গোষ্ঠির সম্মত দর্শনের লক্ষণটি একটা প্রস্তাব না হয়ে পারে না। প্রস্তাব সত্য বা মিথ্যা হয় না—যৌক্তিক বা অযৌক্তিক হ'তে পারে। অবশ্য দর্শনকে শুধুই ভাষাবিশ্লেষণ বললে, আধুনিক অবভাসবিজ্ঞান (ফেনোমেনলজি) বা অস্তিবাদ (এক্‌জিস্‌টেন্‌সিয়ালিজ্‌ম্) দর্শন পদবাচ্য হয় না, আর হুসার্ল বা হাইডেগারকে দার্শনিক বলা যায় না। কিন্তু তবু ভেবে দেখতে হবে যে দর্শনের নাট্যশালাকে আমরা ভূতপেত্নীর নৃত্যশালা বানাতে রাজী হব কি না। 'অস্তিবাদ দর্শন কি না' এ আলোচনা এখনও চল্‌ছে, আর, ভীতি, উৎকণ্ঠা ও মৃত্যুর আবেগময় ব্যঞ্জনা, সাধারণ অর্থে, দর্শন হয় কি না, খুবই সন্দেহজনক। তাই দর্শন যে কেবলমাত্র সাধারণ ভাষার বিশ্লেষণ এই প্রস্তাবের মূল্য বিচার করতে বসে আমাদের দেখ্‌তে হবে যে, দর্শন যদি বিজ্ঞানের মতো জাগতিক তথ্যাদির জ্ঞান না দিতে পারে, তবে দর্শন কি শুধুই বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিমূলে অবস্থিত অঙ্গীকাররূপ মূল প্রত্যয়গুলির বিশ্লেষণই হবে না? দর্শন অবশ্য নিছক শব্দতত্ত্ব নয়—মূলীভূত ধারণাগুলির বিশ্লেষণ; কিন্তু এই বিশ্লেষণ ঐ প্রত্যয়বহ ভাষার বিশ্লেষণ দিয়েই করতে হবে; কারণ, প্রত্যয় ও তৎপ্রকাশী ভাষার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। গতি, কারণতা, দেশ, সদসত, শুভাশুভ প্রভৃতি মূল প্রত্যয়গুলি অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। এদের ছাড়া আমাদের চলে না, অথচ এরা যৌক্তিক চিন্তার বিভ্রাট ঘটায়। গ্রীক দার্শনিক জিনো গতি প্রত্যয়ের বিভ্রান্তি

দেখিয়ে দার্শনিক সমস্যার অবতারণা করেছেন। এখন দর্শন যদি বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু হ'তে চায় তবে তার কাজ হবে ভাষাবিশ্লেষণের সাহায্যে এই প্রত্যয়গুলির বিভ্রান্তি দূর করা। ভাষার প্রয়োগে এই সব মূলীভূত প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয় ও ভাষার বিভিন্ন বিকল্প ব্যবহার আলোচনা করেই এই প্রত্যয়-গুলির বিভ্রান্তি দূর হ'তে পারে। এই প্রত্যয়বিভ্রান্তির জন্য যে সব প্রলোভন চিরাচরিত দর্শনে দেখা যায়, তা ভাষার যৌক্তিক বিশ্লেষণে অবরুদ্ধ হ'তে পারে। অবশ্য দর্শনের কোন ছিম্ ছাম্, আঁটসাট লক্ষণ করা বোধ হয় ঠিক নয়, আর যদি কোন দার্শনিক জীবন ও জগতের অস্তিমমূল্য বা পরমার্থ সম্বন্ধে ব্যাপক মতবাদ সৃষ্টি করতে চান তো তাতে আপত্তি করার প্রয়োজন নেই। তবে ভষার বিশ্লেষণের সাহায্যে মূলধারণাগুলির বিভ্রান্তি দূর করার চেষ্টায় বর্ত্তমান ভাষাবিশ্লেষণ যে খানিকটা সফল হ'য়েছে ও দর্শনজগতের ঘোলাটে আবহাওয়া যে খানিকটা দূর করতে সমর্থ হ'য়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এখন আমরা জগতের জ্ঞানে অঙ্গীকাররূপে নিয়োজিত মূলপ্রত্যয়রাজিকে অপেক্ষাকৃত ভালভাবে, বিশ্লেষিতরূপে পাচ্ছি, এইটাই আমাদের লাভ।

কাণ্টের দর্শনে নৈতিক ইচ্ছার স্বরূপ

শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়

কাণ্টের দর্শনে যদিও জ্ঞানের দিক্ দিয়ে সকল বস্তুই দৃশ্যতঃ সত্য তবুও বস্তুর দৃশ্যসত্তার অন্তরালে পারমার্থিক সত্তা উহার অধিষ্ঠানরূপে স্বীকৃত হয়েছে। কারণ বস্তু মাত্রই জ্ঞানের দিক্ দিয়ে দেশ ও কালের যে পূর্ব্বতঃ সিদ্ধ (a priori) আকারে দৃশ্য, বস্তুটি স্বরূপতঃ সেই আকারে দৃশ্য হতে পারে না। বস্তুটি দৃশ্যতঃ সত্য বলতে যে একজন জ্ঞাতার কাছে দৃশ্যতঃ সত্য তা নয়, সকল জ্ঞাতার কাছেই দৃশ্যতঃ সত্য—সকল জ্ঞাতার কাছে দৃশ্যতঃ সত্য হতে গেলে বস্তুটির দৃশ্যসত্তার নিয়ামক শুধু দেশ ও কালের আকারে দৃশ্য হওয়ার অবশ্যম্ভাবিতা মাত্র নয়, এই অবশ্যম্ভাবিতার নিয়ামক রূপে কার্য্যকারণ তত্ত্বের উপযোগিতা (অর্থাৎ পূর্ব্বতঃ সিদ্ধ প্রয়োজনীয়তা a priori necessity) অনস্বীকার্য্য। কার্য্যকারণ তত্ত্ব (category of causality) কাণ্টের মতে বুদ্ধির পূর্ব্বতঃ সিদ্ধ আকার, দেশ ও কালের মত ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বতঃ সিদ্ধ আকার নয় (অর্থাৎ form of intuition নয়)। সুতরাং কার্য্যকারণ তত্ত্ব বুদ্ধির আকার হলেও এবং সেই আকার বস্তুর দেশ ও কালের আকারে একই জ্ঞাতার জ্ঞানে সমন্বিত (synthesized) হলেও, কার্য্যকারণ তত্ত্বটিকে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ আকারে বস্তু মাত্রের সম্ভাব্য কার্য্যকরণতার তত্ত্ব হিসাবে (category of objects in general বা transcendental ground) স্বীকার করতে কোন বাধা থাকে না—বিশেষ করে যখন বুদ্ধি সমগ্র বস্তুজগৎকে অখণ্ড কার্য্যধারার দিক থেকে জানতে চায় এবং যেখানে জ্ঞানের বিষয় (বস্তুজগৎ) সম্ভাব্য বিষয় মাত্র (indeterminate)। বস্তু মাত্রের ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ দৃশ্যতা (sense conditioned givenness) এই জানার পরিপন্থী হতে পারে না, তবে এই জানার নিয়ামক হতে পারে। বস্তুর দৃশ্য সত্তার অন্তরালে বুদ্ধি কার্য্যকারণ-ধারার বিশ্রান্তি পায় বস্তুর পারমার্থিক সত্তায়—যে সত্তা ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ ভাবে দৃশ্য নয় এবং কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন নয়। কাণ্ট এইভাবে বস্তুর পারমার্থিক সত্তাকে নেতিমূলক ভাষায় যাহা ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ ভাবে দৃশ্য নয় এবং কার্য্যকারণ নিয়মের অধীন নয় বলে

স্বীকার করেছেন এবং বস্তুর দৃশ্যসত্তার সঙ্গে পারমার্থিক সত্তার সম্বন্ধ দৃশ্যসত্তা কার্য্য, পারমার্থিক সত্তা কারণ এরূপ না বলে 'পারমার্থিক সত্তাকে দৃশ্যসত্তার অধিষ্ঠান বলে' কার্য্যকারণ তত্ত্বের প্রয়োগের সীমা নির্দ্দেশ করেছেন। কাণ্টের এই অধিষ্ঠান-অধিষ্ঠিত-সম্বন্ধ কোনরূপ মায়িকতার ইঙ্গিত করে না, কারণ ইহা কার্য্যকারণ সম্বন্ধেরই ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ বুদ্ধিসম্ভাব্য পরিণতি। অধিষ্ঠান-অধিষ্ঠিত (ground and consequent) সম্বন্ধের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা (Reason) পারমার্থিক সত্তা ও দৃশ্যসত্তার সম্বন্ধ চিন্তা করতে পারলেও, এই চিন্তা জ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত হতে পারে না, কারণ পারমার্থিক সত্তা দেশ-কাল নিরপেক্ষ সত্তা— কাণ্টের মতে জ্ঞান হতে গেলে বুদ্ধির আকার দেশ-কালের আকারের সঙ্গে সমনিয়ত হওয়া চাই।

বস্তু দৃশ্যতঃ সত্য হলেও বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ এবং বস্তুর সঙ্গে ইচ্ছার সম্বন্ধ পৃথক। বস্তুর সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ মানুষের বেঁচে থাকবার আকুতি (appetitive faculty বা vital force) হ'তে উদ্ভূত নয়; কিন্তু বস্তুর সঙ্গে ইচ্ছার সম্বন্ধ মানুষের বেঁচে থাকবার আকুতি হ'তে উদ্ভূত। মানুষের বেঁচে থাকবার আকুতি মানুষের অন্তরিন্দ্রিয়ের (inner sense) অবস্থা মাত্র নয়, সেই অবস্থা মানুষের চেতনাকে সুখের আশায় উন্মুখ করে। এইভাবে জীবনের আকুতি প্রধানতঃ অভিলাষ, আসক্তি (desire, inclination) ইত্যাদির আকারে মানুষের চেতনায় সুখের প্রয়োজক হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুর সঙ্গে ইচ্ছার এই আদিম, আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধকে কাণ্ট প্রবর্ত্তনার সম্বন্ধ (practical relation) বলেছেন।

এখন সাধারণভাবে এই প্রবর্ত্তনার সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়,— এখানে মানসিক কোন অবস্থা (যেমন অভীষ্টরূপে কোন বস্তুর চিন্তা) কারণরূপে সুখরূপ কার্য্য উৎপাদন করে। ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তনার এই আভ্যন্তরীণ কার্য্যকারণ নিয়ম (যাকে আমরা inner dynamicity of the will বলতে পারি) সজ্ঞানে বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় না; কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে প্রবর্ত্তনার এই নিয়ম সজ্ঞানে বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহার প্রমাণ এই যে মানুষের ইচ্ছা সর্ব্বদাই কোন না কোন অনুজ্ঞাকে (Imperative) অনুসরণ করে—ইহা গোড়া থেকেই অনুজ্ঞা-ধর্ম্মী। মানুষের এই অনুজ্ঞা ধর্ম্মী ইচ্ছাকে কাণ্ট Practical Reason আখ্যা দিয়েছেন। মানুষের ইচ্ছা যাকে আমরা volition বলি তার স্বরূপ কান্টের বিশ্লেষণে এই দাঁড়ায়—এইরূপ ইচ্ছা সর্ব্বদাই কোন না কোন অনুজ্ঞাকে অনুসরণ করে। কিন্তু প্রবর্ত্তনার আভ্যন্তরীণ নিয়মের প্রভাবে প্রভাবিত (always deter-

mined by reason yet affected by inclination)। আমার মিতব্যয়ী হওয়া উচিত, আমার জীবনে সাফল্য অর্জন করা উচিত, আমার স্বাস্থ্যবান হওয়া উচিত ইত্যাদি কান্টের মতে মানুষের ইচ্ছা মাত্রের দৃষ্টান্ত। কোন বস্তু বা ইষ্ট (state of affairs) এরূপ ইচ্ছার সাধ্য এবং কর্ম এরূপ ইচ্ছার সাধন। বস্তু বা ইষ্ট যেখানে সাধ্য, সেখানে সাধ্যরূপে বস্তুর চিন্তা আভ্যন্তরীণ প্রবর্ত্তনা নিয়মের অধীন হয়ে সেই ইষ্টকে সিদ্ধ করে, সুখের প্রত্যাশা করে। সাধ্যরূপে বস্তুর চিন্তা মানুষের মনে সুখের সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলে (ইচ্ছার causation in anticipation in the human subject) এবং মানুষ এই সুখের সম্ভাবনাকে সফল করবার জন্য ইষ্ট বা বিষয়কে আশ্রয় করে বস্তুতঃ কর্মে উপযুক্ত হয় (ইচ্ছার causation in actuality in the object)। সাধ্যরূপে বস্তুর চিন্তা বস্তুটিকে সর্বত্র অনুজ্ঞার আকারে চিন্তা। যেমন সাধ্যরূপে স্বাস্থ্যের চিন্তা স্বাস্থ্য আমার লাভ করা উচিত ; সাধ্যরূপে মিতব্যয়িতার চিন্তা আমার মিতব্যয়ী হওয়া উচিত ; সাধ্যরূপে সাফল্যের চিন্তা আমার সাফল্য অর্জন করা উচিত ইত্যাদি। এইভাবে মানুষের ক্ষেত্রে সকল ইচ্ছাই মানুষের যে যে বিষয়ে অভাব আছে সেই সেই অভাবের পরিপূরণে নিয়োজিত। আমার স্বাস্থ্যের অভাব আছে বলেই আমার স্বাস্থ্য লাভের ইচ্ছা আছে, আমার সাফল্যের অভাব আছে বলেই আমার সাফল্য লাভের ইচ্ছা আছে, আমার মিতব্যয়িতার অভাব আছে বলেই আমার মিতব্যয়ী হওয়ার ইচ্ছা আছে। এরূপ নির্বাচন নিয়মের আকারে অভাববোধ মানুষের পক্ষেই সম্ভব, ইতর প্রাণীর পক্ষে নয়।

সাধারণ ক্ষেত্রে অনুজ্ঞাধর্মী ইচ্ছার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কাণ্ট বলেছেন এরূপ অনুজ্ঞা, সাপেক্ষ অনুজ্ঞা (Hypothetical Imperative)। ইহার অর্থ এরূপ অনুজ্ঞায় বিধি (ought) মুখ্য নয়, গৌণ। গৌণ কারণ, এখানে বিধি নিজের আদেশের মর্য্যাদা পায়নি। তার আদেশের মর্য্যাদা বহির্জগতের বস্তুর স্বাস্থ্য, সাফল্য ইত্যাদির মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমি যদি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আগেই স্বাস্থ্য, সাফল্য ইত্যাদির পুরুষার্থ (end) হিসাবে মূল্য না জানতাম, তা হলে আমার ইচ্ছা এরূপ বিধির মর্য্যাদাই দিত না। কাজেই অনুজ্ঞার আদেশের অর্থ এখানে অভিজ্ঞতার পূর্বেই সিদ্ধ নয়, অভিজ্ঞতার পরে সিদ্ধ (ইহা a posteriori, a priori নয়)। তাছাড়া বিধিমাত্রই কোন না কোন কর্ত্তাকে (agent) অধিকার করে। বিধি নিয়ম (Law) হলেও ইচ্ছার নিয়ম (Practical Law) ; জ্ঞানের নিয়ম (Theoretical Law) নয়। বিধির কর্তার

সঙ্গে সম্বন্ধ সেই বিধিনির্দিষ্ট নিয়মকে নিজের কর্মপ্রেরণায় স্বীকার করা। সাপেক্ষ অনুজ্ঞার স্থলে কর্তা বিধিনির্দিষ্ট নিয়মকে স্বীকার করে সুখের আশায়। অর্থাৎ কর্তার মনের ধারণা তখন হয় এইরূপ—প্রত্যেকেই সুখের জন্য স্বাস্থ্য, ধন ইত্যাদি নির্বাচন করে; আমারও সেইরূপ করা উচিত। এইভাবে বিধির আদেশের মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয়ে বিধি শুধু উপদেশের (recommendatory) মর্য্যাদা পায়, যাতে করে' বুদ্ধি অনুজ্ঞার মাধ্যমে নিজেকে বহির্জগতে ঐ সব পুরুষার্থের সাধনের (means) সন্ধানে নিয়োজিত করে এবং ইচ্ছাকে সেইভাবে বহির্জগতের বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে' কার্য্যকরী হতে হয়। আদেশের মর্য্যাদা নিয়ে বিধির যে স্বতন্ত্র অধিকার (কাণ্ট যাকে বলেছেন—objective condition of the ought) এইরূপে তাহা ব্যাহত হয়।

এখন প্রশ্ন হল—ধন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যে সব পুরুষার্থলাভের আশায় মানুষের অনুজ্ঞাধর্মী ইচ্ছা প্রতিনিয়তই ব্যাপৃত, তার থেকে মানুষের ইচ্ছার কি আর কোন পৃথক্ প্রয়োগক্ষেত্র নেই? কাণ্ট বলেছেন সাধারণ মানুষের স্বীকৃতিতেও আর একটি প্রয়োগক্ষেত্র সর্বদাই উন্মুক্ত দেখা যায়। সাধারণ মানুষও কর্তব্য (duty) বলতে কি বুঝায় তা জানে। অন্ততঃ এটুকু জানে যে কর্তব্যরূপে নির্দিষ্ট যে অনুজ্ঞা (Imperative) এবং তাহার সূচক যে বিধি (ought) তার মধ্যে আদেশের মর্যাদা পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত। তাই সাধারণ মানুষও সুখের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময়ে কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হয় না। এরূপ বিধিকে কাণ্ট বলেছেন নিরপেক্ষ অনুজ্ঞা বা নৈতিক বিধি (categorical imperative বা moral ought); কারণ এরূপ বিধির বিধেয়তা বিধিবহির্ভূত কোন পুরুষার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এরূপ বিধির নির্বাচন কর্তার অভিজ্ঞতার পরে সিদ্ধ নয়। অর্থাৎ অন্য অনেকে কর্তব্য করে তাই দেখে আমি আমার কর্তব্য স্থির করি না। এরূপ অভিজ্ঞতা না থাকলেও আমি আমার কর্তব্য করতে পারি। তা ছাড়া, এরূপ অভিজ্ঞার কোন সার্থকতাও নেই। কারণ, নৈতিক ক্ষেত্রে কর্তব্য বলে' যা আমি সাধ্য মনে করি তাকে সিদ্ধ করতে ইচ্ছার বহির্জগতের বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে' কার্যকরী হওয়ার অপেক্ষা নেই; যা অপেক্ষিত তা হল ইচ্ছার নৈতিক সম্ভাবনা (moral possibility, physical possibility নয়)। ইচ্ছার এই নৈতিক সম্ভাবনা প্রবর্তনার আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ নিয়মকে আমার বিধির নির্বাচনের কারণ বলে' প্রতিহত করার সম্ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য ভাবে ঘুরিয়েও বলা যায়, ইচ্ছার এই নৈতিক সম্ভাবনা নৈতিক বিধিকে (moral ought) স্বতঃ পুরুষার্থ অর্থাৎ

সম্পূর্ণরূপে অভিলাষ নিরপেক্ষ ভাবে পুরুষার্থ (end in itself) বলে' অঙ্গীকার করার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন অপরের সুখ যদি আমার কর্তব্য বলে ধারণা করি তবে সেই কর্তব্যের নির্বাচন সকলে সুখ চায় এই প্রবর্তনার নিয়মে করা যাবে না; কারণ, এই নিয়মে অভিলাষের সার্বত্রিকতা পূর্বতঃ সিদ্ধ নয়, ইহা আমার অভিজ্ঞতালব্ধ। অভিলাষের অভিলাষ হিসাবে সার্বত্রিকতার কোন যোগ্যতা নেই। অভিলাষ অর্থে—সুখাভিলাষ, ইহা প্রতি মানুষে পুরুষার্থের বৈচিত্র্যে বিচিত্র—একই কারণে অভিলাষ সকল কর্তা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য এই নিয়ম সিদ্ধ করা যায় না। অথচ মানুষের ইচ্ছাকে এই সার্বত্রিক প্রয়োগের যোগ্য হতে হলে—একই কারণে সকল কর্তা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে হবে। নৈতিক অনুজ্ঞাকে নিরাসক্ত কর্তা শুধু কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করলে এই নির্বাচন নিয়মের আকার-গত সার্বত্রিকতা (form of universal legislation) সিদ্ধ হয়, কারণ এই নির্বাচন নিয়ম (maxim) একই কারণে সকল নৈতিক ইচ্ছা বিশিষ্ট কর্তা (rational moral agent) সম্বন্ধে পূর্বতঃ সিদ্ধ ভাবে (a priori) প্রযোজ্য। এই ভাবেই অপরের সুখ আমার কর্তব্য এই অনুজ্ঞা বচনের নিরপেক্ষতা (unconditionality) উপপন্ন হয়। তাছাড়া নির্বাচন নিয়মের আকার-গত সার্বত্রিকতা সিদ্ধ হলেই বিধির আদেশ স্বতঃই চরিতার্থতা লাভ করে। কারণ কর্তব্যরূপে বিধিকে কর্তা নিজের নৈতিক ইচ্ছায় গড়ে নেয়—বিধির আদেশ নিজের নৈতিক ইচ্ছার আদেশ বলে' কর্তার কাছে স্বীকৃতি পায়।

ইচ্ছার এই নৈতিক সম্ভাবনা কর্তার নির্বাচন-নিয়মকে শুধু আকারে অবধারিত (restrict) করার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে বলে' কর্তব্যের সঙ্গে অভিলাষের বিরোধ (conflict between duty and desire) অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। কারণ কর্তব্য অর্থে কান্টের মতে নিরাসক্ত কর্তব্য। কাজেই নৈতিক বিধির স্বতঃ পুরুষার্থতার অর্থ—ঐ বিধি আমার ঈপ্সিত (desirable in itself) এই অর্থ হতে পারে না। কান্ট অভিলাষের মধ্যে উচ্চ স্তরের অভিলাষ ও নিম্ন স্তরের অভিলাষ এই ভেদ স্বীকার করেন না। অভিলাষ অর্থেই সুখাভিলাষ। আগেই দেখান হয়েছে—নৈতিক বিধি স্বতঃই আমার ঈপ্সিত এবং ঐ বিধির অনুবর্তনে আমার সুখ এই মনোভাব নিয়ে নৈতিক বিধির কর্তব্যতা আদৌ সিদ্ধ হতে পারে না। কাজেই একই সময়ে সুখের প্রত্যাশা করব অথচ কর্তব্যও করব ইহা নৈতিক বিধির ক্ষেত্রে স্বভাব বিরুদ্ধ। এটা শুধু তর্কের বিরোধ নয়, নৈতিক

অনুজ্ঞাধর্মী ইচ্ছার সঙ্গে প্রবর্তনার আভ্যন্তরীণ নিয়মের বিরোধ। সাপেক্ষ অনুজ্ঞাধর্মী ইচ্ছা, অভিলাষ ও সুখের সমর্থন পায় কিন্তু নৈতিক অনুজ্ঞাধর্মী ইচ্ছার সেই অভিলাষ ও সুখের আকর্ষণ উপেক্ষা করবার সামর্থ্য থাকা চাই। যদি অভিলাষ ও সুখের আকর্ষণকে প্রতিহত করার সামর্থ্য ইচ্ছার না থাকে তবে নৈতিক বিধির কর্তব্যতা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং নৈতিক বিধির ক্ষেত্রে আদেশ বা অনুজ্ঞার মর্য্যাদা প্রজ্ঞায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত বলে' সেই অনুজ্ঞা-নিয়োজিত ইচ্ছার অভিলাষ ও সুখের আকর্ষণকে প্রতিহত করা এবং সেই আকর্ষণের মূল যে প্রবর্তনার আভ্যন্তরীণ কার্যকারণ নিয়ম সেই নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র নৈতিক অনুজ্ঞার নিয়মে প্রতিষ্ঠিত করার সামর্থ্য আছে বলে স্বীকার করতে হবে। এই জন্যই নিরপেক্ষ অনুজ্ঞাকে সংশ্লেষণধর্মী পূর্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা বলে কাণ্ট উপপন্ন করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ নিরপেক্ষ অনুজ্ঞার ও অভিলাষ ও সুখকে বিষয় করতে হয়, সেই অভিলাষ ও সুখের প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, সেই অভিলাষ ও সুখকে বিরুদ্ধ বা নিষেধ করবার জন্য। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই ইহা ইচ্ছা ক্ষেত্রে সংশ্লেষণধর্মী পূর্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা (Practical synthetic a priori proposition), জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংশ্লেষণধর্মী পূর্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা থেকে (Theoratical synthetic a priori proposition) থেকে পৃথক্।

প্রশ্ন হবে—নৈতিক অনুজ্ঞার নিয়ম কি? তার উত্তরে কাণ্ট বলেছেন—ইচ্ছার দৃশ্যতঃ সত্যরূপে (phenomenally or objectively real) সুখ ও অভিলাষের কার্য্যকারণ নিয়ম হতে স্বতন্ত্র নৈতিক ইচ্ছার পারমার্থিক সত্যরূপে (noumenally or subjectively real) অনুজ্ঞাধীন কারণতার স্বতঃস্ফূর্ত নিয়ম। অর্থাৎ সাপেক্ষ অনুজ্ঞায় ইচ্ছা দৃশ্যতঃ সত্য; নৈতিক অনুজ্ঞায় ইচ্ছা পারমার্থিক সত্য। ইহাকেই কাণ্ট আখ্যা দিয়াছেন—অভিলাষ নিরপেক্ষ ইচ্ছার প্রজ্ঞাভূমিতে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতা (moral freedom)। ইচ্ছা পারমার্থিক সত্য এর অর্থ—আপন সত্তায় স্বতঃ পুরুষার্থ (free being বা eternal value) নয়; এরূপ—স্বতঃ পুরুষার্থ যে নৈতিক বিধির অনুজ্ঞা তাহার প্রজ্ঞাভূমির (kingdom of ends) স্বতঃস্ফূর্ত কারণতাকে (free causality) কর্তব্যের মধ্যে কর্তার উপলব্ধি। কাণ্টের মতে তাই নৈতিক কর্মের অর্থ দৃশ্যতঃ সত্যরূপে ইচ্ছার কর্ম নয়; পারমার্থিক সত্যরূপে ইচ্ছার কার্য্য; যদিও আপাতদৃষ্টিতে এরূপ কর্মও দৃশ্যতঃ সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। কাজেই কোন কর্ম নৈতিক কি না এই বিচার কাণ্টের মতে কর্মের ফলের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না—নৈতিক কর্ম নৈতিক ইচ্ছার স্বাধীন অভিব্যক্তি

(free act) এবং এই কারণে স্বতঃ প্রমাণিত (self-justifying)। কোন কর্ম নৈতিক কি না এই বিচার কাণ্টের মতে কর্তার কর্মেচ্ছা নির্বাচন নিয়মের আকারগত সার্বত্রিকতায় অবধারিত কিনা এই প্রশ্নে সীমাবদ্ধ। কারণ এইরূপ নির্বাচন নিয়মের দ্বারাই নৈতিক অনুজ্ঞার প্রজ্ঞাভূমির কারণতা নির্দিষ্ট (specifically determined) হতে পারে—কর্মের দ্বারা নয়। ইচ্ছা দৃশ্যতঃ সত্যরূপে প্রজ্ঞাভূমির কারণতায় অধিষ্ঠিত (grounded) এবং নৈতিক ইচ্ছার প্রজ্ঞাভূমির কারণতা ইহার অধিষ্ঠান (ground)। অধিষ্ঠান-অধিষ্ঠিত সম্বন্ধ কাণ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন করেছেন ; ইচ্ছার ক্ষেত্রে সেই সম্বন্ধের অনুসরণে ঘুরিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন—পুরুষার্থ এমন কি হতে পারে যা সকল অবস্থায়, সকল ক্ষেত্রে পুরুষার্থ (unconditioned good)। কাণ্ট প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন নৈতিক ইচ্ছা নৈতিক বিধির অনুজ্ঞার অনুবর্তনে প্রজ্ঞাভূমির কারণতায় প্রতিষ্ঠিত বলে' ইহাই কর্তব্য উপলব্ধির মর্য্যাদায় অবিসংবাদিতরূপে স্বতঃ পুরুষার্থ—এখানেই কর্তব্যরূপে নির্বাচন নিয়মকে আকারগত সার্বত্রিকতায় অবধারিত করে। বিধিকে গড়ে দেওয়ার সামর্থ্য ইচ্ছার আছে - (ইহা কাণ্টের মতে—positive freedom বা autonomy বা law-making power of the will)। কিন্তু নৈতিক ইচ্ছার বিধিনির্মাণ সামর্থ্যের সঙ্গে নৈতিক বিধির অনুজ্ঞা বা আদেশের অনুবর্তন ও অবশ্যম্ভাবীরূপে জড়িত এবং এই অনুবর্তনে ইচ্ছা যে প্রবর্তনার আভ্যন্তরীণ কার্য্যকারণনিয়মের অধীন নয় তা ইচ্ছাকে অভিলাষ ও সুখকে প্রতিহত করার সামর্থ্যের মধ্যে উপলব্ধি করতে হবে (ইহা কাণ্টের মতে negative freedom)। অভিলাষ ও সুখকে প্রতিহত করার সামর্থ্যের গুণেই নৈতিক বিধি (moral ought) কর্তার নৈতিক চেতনায় ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ তথ্যের (sole fact of moral consciousness) মর্য্যাদা লাভ করে এবং কর্তার নৈতিক ব্যক্তিত্ব যে স্বয়ং সম্পূর্ণ (self-sufficient) ইহা কোনরূপ প্রয়োজনের নিয়মের (Law of needs) অধীন নয়, এই বোধ সুপরিস্ফুট হয়। নৈতিক ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা বোধ নৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্ভ্রমবোধের (dignity for the moral person) নামান্তর। মূলতঃ ইহা নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা (reverence for the moral law) থেকে পৃথক্ নয়। এই শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম কাণ্টের মতে বুদ্ধিসঞ্জাত এক প্রকার বিজাতীয় অনুভূতি (intellectual feeling)—নৈতিক বিধি নির্দিষ্ট আদেশের অনুবর্তনে নৈতিক ইচ্ছার স্বাধীন, অভিলাষ নিরপেক্ষ সামর্থ্যে ইহার প্রকাশ। এই বিজাতীয় অনুভূতির সঙ্গেই নৈতিক ইচ্ছার মূল্যমান (value, worth) জড়িত।

নৈতিক পুরুষার্থ (moral good) কান্টের মতে নৈতিক নিয়মের সঙ্গে একাত্মক (indentical)—নৈতিক ইচ্ছা থেকে পৃথক্ কোন বস্তু নয়। কাজেই দৃশ্যতঃ সত্য হিসাবে মূল্যমানের প্রশ্ন এখানে অবান্তর, যদিও ধন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি দৃশ্যতঃ সত্য পুরুষার্থের (conditioned good) মূল্যমান অভিজ্ঞতায় সিদ্ধ বস্তু হিসাবে অনুভূতির সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন করা যায়। এ সত্ত্বেও অভিলাষের সঙ্গে কর্ত্তব্যের বিরোধের পরিস্থিতি থেকে একান্ত করে' নৈতিক ইচ্ছার উপলব্ধির এমন স্তর দেখান যেতে পারে যেখানে নৈতিক ইচ্ছা নৈতিক বিধির আদেশের অপেক্ষা না করেই নৈতিক নিয়মের সঙ্গে একাত্ম। এরূপ নৈতিক ইচ্ছার কোন কর্মই নৈতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে না এবং করতেও পারে না, কারণ ইহা নৈতিক নিয়মের স্বাধীন কারণতার প্রজ্ঞাভূমিতে সহজেই প্রতিষ্ঠিত। এরূপ ইচ্ছার মূল্যমান যদি কোন অনুভূতির সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন করতে হয়, তা একমাত্র নৈতিক নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধার বুদ্ধিসঞ্জাত বিজাতীয় অনুভূতির সাক্ষ্য। এই অর্থেই কান্ট দৃশ্যতঃ সত্য পুরুষার্থের মূল্যমান থেকে নৈতিক ইচ্ছার মূল্যমান পৃথক্ করতে চেয়েছেন। দৃশ্যতঃ সত্য পুরুষার্থ—ধন, মান, স্বাস্থ্য প্রভৃতির সাধারণ অনুভূতির সাক্ষ্যে মূল্য আপেক্ষিক—ইহারা সকল অবস্থাতে, সকল সম্বন্ধে শ্রেয়স্কর এরূপ বলা যায় না। যে ধন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি চায় এরূপ লোকের কাছে ইহাদের মূল্য; তাছাড়া ইচ্ছা যদি নৈতিক বিধির অনুগামী না হয় তবে শ্রেয়স্কর না হইয়া অমঙ্গলের সম্ভাবনা ইহাদের আছে। অর্থাৎ এই সব দৃশ্যতঃ সত্য পুরুষার্থ শ্রেয়স্কর কিনা বিচার করবার আগেই যে ইচ্ছার কাছে শ্রেয়স্কর, সেই ইচ্ছা নৈতিকবিধির অনুগামী কিনা এই প্রশ্নের অবকাশ আছে। কিন্তু নৈতিক নিয়মের সঙ্গে একাত্ম ইচ্ছার মূল্যমান সম্বন্ধে একথা বলা যায় না; কাজেই এরূপ ইচ্ছার মূল্যমানের কোন অবস্থাতেই, কোন সম্বন্ধে অমঙ্গল জনকতার সম্ভাবনা নেই—ইহার মূল্যমান এরূপ কোন সর্ত্ত সাপেক্ষ নয় (unconditioned good) এবং ইহার স্বাধীন (free) কর্মের মধ্যে স্বপ্রমাণিত (self justifying)।

মনে রাখতে হবে এখানে নৈতিক ইচ্ছার একটি আদর্শ পরিণতির সম্ভাবনা কান্ট দেখাতে চেয়েছেন; বস্তুতঃ এরূপ দিব্য ইচ্ছা (Holy will) সম্বন্ধে এ ইচ্ছা স্বাধীন (free) বা পরাধীন (unfree) এ প্রশ্ন অবান্তর। সাধারণ ভাবে মানবিক সম্বন্ধে কান্টের মতে নৈতিক ইচ্ছাকে অভিলাষের সঙ্গে কর্ত্তব্যের বিরোধের পরিস্থিতি থেকে একান্ত করে' উপলব্ধি করা যায় না।

Statement about ownership and other particulars about the newspaper* Darsan *to be published in the first issue every year after the last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1. Place of Publication — Calcutta
2. Periodicity of its Publication — Quarterly
3. Printer's Name — Sri Kalyan Chandra Gupta
   Nationality — Indian
   Address — 20/2, Halder Bagan Lane, Cal.-4
4. Publisher's Name — Sri Kalyan Chandra Gupta
   Nationality — Indian
   Address — 20/2, Halder Bagan Lane, Cal.-4
5. Editor's Name — Sri Kali Krishna Bannerjee
   Nationality — Indian
   Address — 26/4A, Sashibhushan De St., Cal-12
6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent. of the total capital. — Bangiya Darsan Parishad 20/2, Halder Bagan Lane, Calcutta-4

I, Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 2nd March, 1960

Signature of Publisher
K. C. Gupta

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১।০।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট (২৬।৪।এ, শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২) পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্নঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত
কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ্
২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

PUBLISHED BY K. C. GUPTA, M. A. FROM 20-2, HALDER BAGAN LANE,
CALCUTTA AND PRINTED BY SRI RAMRANJAN DAS,
SRI HARI ART PRESS, 1, HARITAKI BAGAN LANE,
CALCUTTA—6.

March, 1960—200.

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা

১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা | কার্ত্তিক | [১৩৬৬ সাল

সূচীপত্র

বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা

ডক্টর শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কোন প্রকার দর্শন-মত কোন অর্থে বিশ্বজনীন হইতে পারে কিনা, এবং যদি তাহা হয় তবে তাহার ভাবধারা বা মূল প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ হইবে ইহাই আমার আলোচ্য বিষয়। এ সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন হইতেছে—বিশ্বজনীন দর্শন কাহাকে বলে? দ্বিতীয় প্রশ্ন—কোন্ অর্থে উহা সম্ভব নয় ও কোন্ অর্থে উহা সম্ভব? তাহার পর প্রশ্ন—উহার মূল ভাবধারা ও প্রধান সিদ্ধান্তই বা কিরূপ হইবে? এই কয়টি প্রশ্নের যথাযোগ্য আলোচনা করিব।

বিশ্বজনীন দর্শন (World philosophy) বলিতে এমন কোন দার্শনিক মত বুঝি না যাহা সর্বদেশে ও সর্বকালে সব লোকই সঙ্গত ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিবে বা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিবে। এ অর্থে দর্শন কেন, কোন বিজ্ঞানও বিশ্বজনীন অর্থাৎ সার্বকালিক, সার্বদেশিক ও সর্বলৌকিক নয়। অবশ্য একথা সত্য যে সচরাচর আমরা বলি, যে কোন বিজ্ঞান সার্বজনীন (universal); উহা কোন দেশ, কাল বা জাতি বিশেষের জন্য নহে; উহা সকলের নিকট সত্য এবং সর্ব কালে ও দেশে সত্য। কাজেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেশ-কাল-জাতিভেদে বিজ্ঞানের ভেদ করি না বা ইহা প্রাচ্য বিজ্ঞান, উহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইহা ভারতীয় বিজ্ঞান, উহা ফরাসী বা ইংলণ্ডীয় বিজ্ঞান এইরূপ কথা বলি না। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে এরূপ ভেদ করা হয় এবং প্রাচ্য দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন প্রভৃতি কথাও বলা হয়। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরূপ ভিন্ন ধারণা ও ব্যবহারের মূল কারণ এই নয় যে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি সব দেশ ও কালেই সত্য ও স্বীকৃত আর দার্শনিক মতগুলি কোথায়ও সত্য ও কোথায়ও মিথ্যা, কোথায়ও স্বীকৃত ও কোথায়ও অস্বীকৃত। এসব দিক

দিয়া দর্শন ও বিজ্ঞানের ভেদ করা যায় বলিয়া মনে হয় না। সব বৈজ্ঞানিক সত্যই যে সর্বত্র সত্য ও স্বীকৃত এ কথা বলা যায় না। এক বৈজ্ঞানিকের মত আর এক বৈজ্ঞানিক খণ্ডন করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। টোলেমির ভূকেন্দ্রবাদের উচ্ছেদ করিয়া কপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রবাদের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রাচীন পদার্থ বিদ্যার জড়তত্ত্ব আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে অস্বীকৃত হইয়াছে। মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে হয় আবার কোন কোন লোক আছে যেখানে উহার কোন ক্রিয়া নাই এবং পৃথিবীতে যে সব দ্রব্য ভারী সে সব লোকে তাহাদের কোন ভারই নাই। যোগবলে এই পৃথিবীতেই যে মাধ্যাকর্ষণ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে তাহা যোগশাস্ত্রে দেখা যায়।

অতএব উপরে লিখিত অর্থে বিজ্ঞানকে সার্বজনীন এবং দর্শনকে অসার্বজনীন বা কাদাচিৎক বলা যায় না। দর্শনের ক্ষেত্রে যে প্রাচ্যপাশ্চাত্য বা ভারতীয় পাশ্চাত্য ভেদ করা হয় তাহার প্রকৃত কারণ বোধহয় এই যে এক এক দর্শন মতের এক এক বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার জন্য দেশ ও কালের আশ্রয় লওয়া হয় এবং এজন্যই এদেশের দর্শন ওদেশের দর্শন এরূপ কথা বলা হয়। বিজ্ঞান ও কলার ক্ষেত্রেও আমরা এরূপ শব্দ ব্যবহার করি, যেমন প্রাচীন পদার্থবিদ্যা, আধুনিক পদার্থবিদ্যা। গ্রীক কলা, ভারতীয় কলা ইত্যাদি।

আমরা দেখিলাম যে বিশ্বজনীন দর্শন বলিতে সব দেশ কাল ও লোকে সত্য এবং স্বীকৃত কোন বিশেষ দর্শন-মত বুঝায় না এবং এ অর্থে কোন বিজ্ঞানও বিশ্বজনীন্ নহে। এই অর্থে দর্শন বা বিজ্ঞানের সার্বজনীন হওয়া সম্ভব বলিয়াও মনে হয় না। এখন দেখা যাক কি অর্থে উহাদিগকে সার্বজনীন বলা যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে বিজ্ঞানের কতকগুলি মূল তত্ত্ব বা মুখ্যসূত্র আছে যাহা সার্বত্রিক বা সর্বত্রব্যাপী, আর কতকগুলি গৌণতত্ত্ব বা অপ্রধান সত্য আছে যাহা দেশে ও কালে অবিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ। যে বিজ্ঞানে যতবেশী মূল তত্ত্ব পাওয়া যায় এবং মূল তত্ত্বগুলির সাহায্যে অপ্রধান তত্ত্ব বা সত্যগুলি এবং তাহাদের দেশ-কালে ব্যতিক্রম যতটা বুঝা যায় তাহা ততটা সার্বজনীন বলিয়া বিবেচিত হয়। এই হিসাবে মহামতি আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক বাদকে (theory of relativity) নিয়ুটনের নিরপেক্ষিক (absolute) বৈজ্ঞানিক মত অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক, সার্বজনীন ও সমাদরযোগ্য বলা হয়। গ্রীক্ দার্শনিক আরিষ্টটল দর্শনের সংজ্ঞা নির্দেশ করিতে বলিয়াছেন, 'দর্শন মূল তত্ত্বগুলির বিজ্ঞান' (Science of first principles)। অতএব আমরা বলিতে পারি, যে দর্শনে পরমাতত্ত্ব বা পরম

সত্যগুলির সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহাদের সাহায্যে অপর তত্ত্বগুলির, এমন কি বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিরও ব্যাখ্যা করা যায় তাহাই বিশ্বজনীন দর্শন হইবে। এই অর্থে আমরা বিশ্বজনীন দর্শনের কথা বলিতে পারি।

যদি এই অর্থে বিশ্বজনীন দর্শন বা দার্শনিক মত সম্ভব হয়, তবে তাহার ভাবধারা অর্থাৎ মূল প্রত্যয় ও সিদ্ধান্তগুলি কিরূপ হইবে তাহাই আলোচনা করিব। মনে রাখিতে হইবে যে বিশ্বজনীন দর্শনে পরম তত্ত্বের এরূপ নির্দেশ থাকিবে যে তদ্দ্বারা অন্য ও অপর তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করা যায়, উহা এমন এক দর্শনমত হইবে যে তাহাতে অন্য দর্শন মতের সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় এবং তাহাদের সমন্বয় সাধন করা যায়। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিতও উহার একান্ত বিরোধ হইবে না।

পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ মতবাদ দেখা যায়। কেহ বলেন অচেতন জড় পদার্থ পরম তত্ত্ব, কেহ বলেন উহা জড়বিরোধী চেতন সত্তা। কেহ বলেন উহা এক ও অদ্বৈত, কেহ বলেন উহা দ্বৈত বা অনেক ও বহু। কেহ বলেন উহা সগুণ, সক্রিয় ও সবিশেষ, কেহ বলেন উহা নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও নির্বিশেষ। আবার কেহ বলেন উহা পরিণামশীল বিজ্ঞানধারা মাত্র এবং উহাতে বাহ্য বা জড় বস্তুর স্থান নাই; অপরপক্ষে কেহ কেহ বলেন উহা ইন্দ্রিয়গোচর অথচ জ্ঞানাতিরিক্ত ও জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তু নিচয়ের সংঘাত মাত্র। আবার কেহ বলেন উহা চিরপরিণামী শক্তি, কেহ বলেন অপরিণামী শাশ্বত সত্তা। আবার কেহ বলেন উহা জড় প্রকৃতি ও চেতন আত্মার যুগ্ম সত্তা, কেহ বলেন উহা চিদচিদ্-বিশিষ্ট পরমাত্মা বা তত্ত্বত্রয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক মতের অন্ত নাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকদের মধ্যে বিসম্বাদ ও মতবিরোধের শেষ নাই।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে এত বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত দেখা যায় কেন এবং কিভাবেই বা তাহাদের সমন্বয় সাধন করা যায়। যদি এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় তবে তাহা এক বিশ্বজনীন দর্শনের সূচনা করিবে। আমরা এখন তাহারই চেষ্টা করিব।

সকল দর্শনমতের মূলে কোন না কোন প্রকার অনুভূতি (experience) নিহিত আছে। কেবল দর্শন কেন সকল জ্ঞানের মূলেই কোন এক বা একাধিক প্রত্যক্ষ বা অনুভূতি আছে। পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ দেখা যায় তাহাদের মূলেও এক না এক প্রকার অনুভূতি বিদ্যমান। এ হিসাবে সকল দর্শনমতকেই এক না এক ভাবে সত্য বলা যায়। উহারা পরম তত্ত্বের কোন এক বা

একাধিক গুণ, ধর্ম বা রূপের পরিচয় দেয় বলিয়া উহাদিগকে আংশিকভাবে সত্য বা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু যদি কোন মত একভাবে সত্য হয়, তবে উহাকে সম্পূর্ণভাবে সত্য বলা ঠিক নয়। দার্শনিকগণ যখন নিজ নিজ মতকেই সর্বভাবে ও সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া ভিন্ন মতগুলিকে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন তখনই তাহাদের মধ্যে বিবাদ ও বিরোধের সূত্রপাত হয়। যদি কেহ তাঁহাদের বুঝাইয়া দেন যে তাঁহাদের সকলের মতই এক না এক-ভাবে সত্য, কিন্তু কোন মতই সর্বভাবে বা সম্পূর্ণরূপে সভ্য নয় তবে তাঁহাদের মতবিরোধ দূর হইবে এবং বিবাদের অবসান ঘটিবে। এ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ স্মরণ করা উচিত। চার অন্ধ ব্যক্তি এক হস্তীর দেহের চার ভাগ স্পর্শ করিয়া হস্তী সম্বন্ধে চারিটি বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে এবং প্রত্যেকে নিজ মতটি সত্য ও অপর মতগুলি মিথ্যা বলিয়া কলহ করে। দার্শনিকরাও এই অন্ধব্যক্তিদের মত নিজ নিজ মতটিকে সত্য এবং অপর সকল মতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়া কলহে প্রবৃত্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণও বহুরূপীর দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথাই বুঝাইয়াছেন। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে এক বহুরূপীকে বিভিন্ন বর্ণযুক্ত দেখিয়া প্রত্যেকে নিজ দৃষ্ট বর্ণটিকেই উহার প্রকৃত বর্ণ বলিয়া ঝগড়া করিতে থাকে। তারপর বহুরূপী যে বৃক্ষে থাকিত তাহার তলদেশে যে ব্যক্তি সর্বদা বাস করিত তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিলে তিনি বুঝাইয়া দেন তাহাদের প্রত্যেকের কথিত বর্ণ বহু-রূপীতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখা যায়, আবার কখন উহার কোন বর্ণই দেখা যায় না। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা নিজ নিজ ভুল বুঝিতে পারিয়া কলহে নিবৃত্ত হন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বহুরূপীর দৃষ্টান্তে যে কথা বলিয়াছেন তাহা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। পরমতত্ত্ব (Reality বা Absolute) এমন এক সার্বভৌম তত্ত্ব যে তাহাতে সব জীব-জগৎ, সব গুণ-ধর্ম-রূপ আছে, অবার উহা এ সবের অতীত ; উহা সর্বগুণের আশ্রয় আবার গুণাতীত, সর্বগুণাভাস ও সর্বগুণ-বিবর্জিত। ঋগ্বেদ উপদেশ করিয়াছেন 'একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মারতিশ্বানমাহুঃ (১।১৬৪। ৪৬)। এ শ্রুতিবাক্যের অর্থ হইতেছে যে সব দেবদেবী এক পরম তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ। ইহাতে আরও বুঝা যায় যে পরম তত্ত্ব এক বা অদ্বিতীয় হইলেও উহা অনন্তরূপে, অনন্তধর্মে, অনন্ত আকারে ও অনন্ত প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে তত্ত্ব অনেকান্ত ও অনন্তধর্মক। শুধু পরমতত্ত্ব কেন, বিশ্বের যে কোন বস্তুতেই অনেক ও অনন্ত ধর্ম দেখা যায়। একটি মনুষ্যে যে সব ধর্ম বিদ্যমান এবং যে সব ধর্ম অবিদ্যমান অর্থাৎ অস্তিবাচক ও নাস্তিবাচক ধর্ম

(positive and negative characters) তাহাদের ইয়ত্তা করা যায় না। এজন্য আমাদিগকে আর একটি কথাও স্বীকার করিতে হইবে। তত্ত্ব যেমন অনেকান্ত তেমনি সত্যও অনেকান্ত, অনেকরূপ ও অনেকপ্রকারক। বিভিন্ন বিজ্ঞান দর্শন বা ধর্মমত এক তত্ত্বের বিভিন্ন দিকের বা রূপের প্রকাশ, উহারা এক পরম সত্যের বিভিন্ন অংশের বা কলার পরিচয় দেয়।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় কি? তত্ত্বানুভূতি বা তত্ত্বসাক্ষাৎকারই তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু মানুষের মনের এমনই গঠন এবং তাহার অনুভূতির এমনই গতি ও রীতি যে সে এককালে মাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গী বা একটি জ্ঞানস্তর হইতে যে কোন তত্ত্বের অনুভূতি করিতে পারে। একথা পর বা অপর উভয় তত্ত্ব সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। একটি প্রাসাদ আমরা মাত্র একদেশ হইতে ও এককালে দেখিতে পাই। উহাকে সব দেশ হইতে এবং সব কালে যুগপৎ দেখিতে পাই না। আবার একদেশ ও কাল দ্বারা অবচ্ছিন্ন আমাদের ঐ প্রাসাদের জ্ঞানও এক বিশেষ প্রকারের হয় এবং ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন কালে লব্ধ জ্ঞান হইতে কতকটা ভিন্ন হয়। এজন্য বলিতে হয় কোন তত্ত্বের অনুভূতি বা জ্ঞান আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানের স্তর সাপেক্ষ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানের স্তরভেদে তত্ত্বের অনুভূতিরও প্রকার ভেদ ঘটিবে। সকলেরই এক প্রকার তত্ত্বানুভূতি হয় না। যিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বা জ্ঞানের যে স্তর হইতে তত্ত্বের অনুভূতি করেন তাঁহার তত্ত্বানুভূতিও তদুপযোগী হয়। আর একথা সত্য যে তত্ত্বানুভূতিতেই তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। অতএব বলিতে হয় যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানস্তর ভেদে তত্ত্বের অনুভূতি ও প্রকাশ ভিন্ন হইবে এবং তদনুসারে বিভিন্ন লোকের তত্ত্ব জ্ঞানও কতকটা বিভিন্ন হইবে। এজন্যই আমরা দর্শনের ইতিহাসে তত্ত্ব সম্বন্ধে এত বিভিন্ন মত দেখিতে পাই।

এখন কি ভাবে আপাতবিরোধী বিভিন্ন দর্শনমতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কি ভাবে তাহাদের একটা সমন্বয় করা যায় তাহাই আলোচনা করিব। পূর্বে বলিয়াছি জ্ঞানের স্তরভেদে তত্ত্বের প্রকাশভেদ ঘটে এবং তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞানেরও কতকটা প্রকারভেদ ঘটিবে। বাহ্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সর্বসাধারণ এবং সম্ভবতঃ সর্বনিম্ন স্তর। এই স্তর হইতে মানুষ তত্ত্বের যে অনুভূতি পায় তাহাতে তত্ত্ব রূপ রস গন্ধ স্পর্শ ও শব্দময় বলিয়া প্রকাশিত হয় এবং এজন্য সে তত্ত্বকে রূপ রস গন্ধাদি গুণবিশিষ্ট দেশকালান্তর্গত জড় পদার্থ বলিয়া বুঝে ও নির্ণয় করে। ভারতীয় চার্বাক দর্শন এবং পাশ্চাত্য জড় বাদ, মানববাদ, দৃষ্টবাদ (positivism) স্বভাববাদ

(naturalism) যদৃচ্ছাবাদ (mechanism) নাস্তিক্যবাদ (atheism) মানুষের এই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ-লব্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহারই ব্যাখ্যা ও আলোচনায় নিবদ্ধ। পক্ষান্তরে মানুষ যখন তাহার মনোবুদ্ধির স্তর হইতে তত্ত্বকে অনুভব করে এবং প্রজ্ঞার (reason) সাহায্যে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করে তখন তাহার নিকট তত্ত্ব মনোময় বা বিজ্ঞানময় অর্থাৎ চেতন বলিয়া প্রকাশিত হয়। এখন যদি সে তাহার বাহ্যেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে, তবে তাহার দর্শন বিজ্ঞানবাদে (subjective idealism) পর্যবসিত হইবে। যোগাচার বৌদ্ধের এবং বিশপ বার্কলের বিজ্ঞানবাদ জ্ঞানের এই স্তর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে মনে হয়। আবার যদি সে প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সত্যতা ও উপযোগিতা স্বীকার করে তবে তাহার নিকট তত্ত্বের দুইটি রূপ প্রকাশিত হয়, একটি চেতন রূপ অপরটি অচেতন বা জড়রূপ। এই দুইটি রূপকে স্বীকার করিলে তত্ত্বকে দ্বৈত বলিয়া বুঝিতে হয়, যদিচ মনোবুদ্ধিলব্ধ চেতনরূপকেই প্রাধান্য দিতে হয়। এইভাবে তত্ত্বকে এক পরম চেতন সত্তা এবং বহু চিদচিদ্ সত্তার মিলন বা সংযোগ বলিয়া বুঝিতে হয়। যে সব ধর্ম বা দর্শন মতে দুই বা বহু তত্ত্ব (pluralism ও dualism) স্বীকার করিয়া তাহাদের মধ্যে চেতনকে প্রধান ও স্বতন্ত্র এবং অচেতনকে অপ্রধান ও অস্বতন্ত্র অথবা উভয়কেই স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে জ্ঞানের এইস্তরে অধিষ্ঠিত বলা যায়। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত জৈন, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মধ্বাচার্যের দ্বৈত বেদান্ত প্রভৃতি এবং পাশ্চাত্য দর্শনের অন্তর্গত ডেকার্ট, লক, কাণ্ট, প্রমুখ দার্শনিকের মতবাদ এই স্তরের জ্ঞানভূমিতে অবস্থিত মনে হয়।

ধ্যানযোগে ও সবিকল্প সমাধির স্তরে তত্ত্বের যে অনুভূতি হয় তাহাতে তত্ত্ব চৈতন্যগুণ বিশিষ্ট আত্মা বা পুরুষ বলিয়া প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের এই স্তরে আত্মা ও চৈতন্য বা জ্ঞান ভিন্ন বস্তু বলিয়া অনুভূত হয়, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধ নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য এরূপ প্রত্যয়ও হয়। আত্মা ও জ্ঞানের মধ্যে ভেদ অনুভূতির সংগে তাহাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধও অনুভূত হয়। এরূপ অনুভূতির ভিত্তিতে তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদিগকে দ্রব্য ও গুণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ, অংশী ও অংশ এসব সম্বন্ধ প্রত্যয়ের (Categories of relation) প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্‌বিধায় তত্ত্ব আমাদের নিকট অনন্ত-গুণ-বিশিষ্ট দ্রব্য, চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ঈশ্বর ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রুতি বা উপনিষদের সগুণ ও সবিশেষ বাচক বাক্যগুলির এবং রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূলে জ্ঞানের এই স্তর নিহিত আছে। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে স্পিনোজার অখণ্ড গুণযুক্ত ও অদ্বিতীয় দ্রব্যবাদ (philosophy

of substance as absolute) এবং হেগেলের পরম চেতনবাদকে ও (absolute idealism) এই স্তরে উদ্ভূত ও অবস্থিত বলা যায়।

জ্ঞানের শেষ স্তর হইতেছে নির্বিকল্প সমাধি। ইহাকে তুরীয় বা ব্রহ্ম বলা হয়। এটি শুদ্ধ জ্ঞানের অবস্থা। ইহাতে সব চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া মনের এককালীন লয় হয়। এই জ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, বিষয় ও বিষয়ী, আত্মা ও চৈতন্য দুইটি ভিন্ন অথচ নিত্যসম্বন্ধযুক্ত বস্তু বলিয়া প্রতিভাত হয় না। পক্ষান্তরে উহারা এক ও অভিন্ন বলিয়া অনুভূত হয়। আত্মাই জ্ঞান এবং জ্ঞানই আত্মা এরূপ অনুভূতি হয়। প্রকৃতপক্ষে এ অবস্থায় আত্মা, জ্ঞান ও উভয়ের অভেদজ্ঞান এরূপ অনুভূতি থাকে না বরং জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-ভেদ-বিনির্মুক্ত শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র থাকে। উহা সাধারণ বিষয়ে জ্ঞানের মত জ্ঞান নহে। এজন্য কেহ কেহ উহাকে অজ্ঞানের অথবা একটি কাল্পনিক বা অসত্য জ্ঞানের অবস্থা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা তাহা নহে, উহা বিষয়জ্ঞান নহে বটে, কিন্তু অজ্ঞানও নহে, উহা পরাজ্ঞান বা জ্ঞানাতীত জ্ঞান। এই জ্ঞানে তত্ত্বের যে প্রকাশ ঘটে তাহা অন্য সব জ্ঞানস্তরলব্ধ প্রকাশ হইতে ভিন্ন হইবে। এই জ্ঞানের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমাদিগকে অন্য সব জ্ঞান প্রত্যয় (categories of experience) ছাড়িয়া কেবল "অদ্বৈত" এই প্রত্যয় (category of the non-dual) প্রয়োগ করিতে হয়। এতদ্‌বিধায় আমরা তত্ত্বকে অদ্বৈত, নির্গুণ, নির্বিশেষ সন্মাত্র বা চিন্মাত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করি এবং কখন কখন উহাতে জীব-জগৎ ও ঈশ্বর পর্যান্ত ত্রিকাল নিষিদ্ধ বলিয়া ধারণা করি। শ্রুতির নির্গুণ ও নির্বিশেষ-বাচক বাক্যগুলির এবং সগুণ-সবিশেষ বাচক বাক্যের নিন্দাসূচক বাক্যগুলির মূলে এই অদ্বৈতানুভূতি নিহিত আছে। গৌড়পাদাচার্য ও শঙ্করাচার্য প্রমুখ বেদান্তীদের অদ্বৈতবাদ এবং মাধ্যমিক বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এই অদ্বৈতানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলা যায়। পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে পারমিনাইডিস, প্লেটো, প্লোটিনাস প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে এবং আধুনিক কালে এফ. এচ. ব্রাডলির দর্শনমতেও অদ্বৈতানুভূতির কিছু আভাস পাওয়া যায়।

কোন কোন দার্শনিক ও ধর্মগুরু দ্বৈত এবং অদ্বৈত মতের মিলন সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা যেন সবিকল্প ও নির্বিকল্প উভয় স্তরের জ্ঞানকেই স্বীকার করিয়া তত্ত্বের একটি সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এইভাবে বৈষ্ণব বেদান্তী নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত, ভাস্করাচার্যের ভেদাভেদ, শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদ, বল্লভাচার্যের শুদ্ধাদ্বৈত এবং অভিনব গুপ্ত বর্ণিত শৈবদর্শনের কোন কোন শাখা বিশেষতঃ কাশ্মীর শৈবদর্শন, ভগবদ্গীতার পুরুষোত্তমবাদ এবং তন্ত্রের শিব-

শক্তিবাদের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রসার ঘটিয়াছে মনে হয়। ইহারা পরমতত্ত্বকে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয় প্রকারই বলিয়াছেন এবং উহাতে একত্বের সহিত বহুত্বের মিলন সাধন করিয়া পরম ব্রহ্মকে জীবজগদ্রূপে প্রকাশমান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আধুনিক কালে শ্রীঅরবিন্দও দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাবের, চেতন আত্মা ও অচেতন জড়ের, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং এজন্য তাঁহার দার্শনিক মতবাদকে সামগ্রিক চেতনবাদ (Integral Idealism) আখ্যা দেওয়া হয়।

পূর্বে বলিয়াছি অনুভূতি তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় এবং সব অকৃত্রিম ও অকপট অনুভূতিতেই তত্ত্ব এক না একভাবে প্রকাশিত হয়। মনের বিভিন্ন ভূমিতে ও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে তত্ত্ব কিরূপ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় তাহাও বলিয়াছি। নির্বিকল্প জ্ঞান বা সমাধিতে তত্ত্ব নির্গুণ ও নির্বিশেষ শুদ্ধ চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হয়। নির্বিকল্প ভূমির শুদ্ধ অধ্যাত্ম জ্ঞানে (pure spiritual consciousness) তত্ত্ব নিত্য অপরিণামী ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া প্রতিভাত হয়। আবার প্রাণ-চেতনার সাক্ষাৎ অনুভূতিতে (intuition of life process বা vital consciousness) এবং প্রযত্ন-চেতনায় (intuition of volitional process বা conative consciousness) উহা চিরপরিণামশীল ও চঞ্চল শক্তিরূপে অনুভূত হয়। এরূপ অনুভূতি হইতেই বৌদ্ধদর্শন, হার্টম্যান ও সোপেন-হাওয়ারের দর্শন এবং বার্গসোঁর দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছে বলা যায়। এভাবে অন্যান্য জ্ঞানের স্তরে তত্ত্ব অন্যরূপে অনুভূত হয় এবং আমরা উহাকে অন্যরূপে বুঝি বা ব্যাখ্যা করি। সর্বনিম্নে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের স্তরে তত্ত্ব আমাদিগের নিকট রূপ-রস-গন্ধাদিময় জড় জগদ্রূপে প্রকাশিত হয় এবং আমরা জড় জগৎকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া বুঝি। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কোন এক জ্ঞানস্তর হইতে আমরা তত্ত্বের যে রূপ পাই তাহাই উহার একমাত্র বা সম্পূর্ণ রূপ নহে। এক একটি জ্ঞানস্তর হইতে আমরা তত্ত্বের এক একটি মাত্র রূপের পরিচয় পাই। তত্ত্বের কোন একটি রূপ যেমন উহার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়, তেমনি উহার অনুভূত কোন রূপই মিথ্যা বা অলীক নয়। যেমন এক জগতত্ত্ব বিভিন্ন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে বিভিন্নরূপে প্রাকাশিত হয় এবং তাহার কোন একটি রূপই তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যাও নয়, তেমনি পরম তত্ত্বের বিভিন্ন অনুভূতি লব্ধ রূপ তৎসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যাও নয়। যেমন আমরা একই জলে রাসন ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়লব্ধ স্বাদ গন্ধাদি গুণ স্বীকার করি, তেমনি পরম তত্ত্বের বিভিন্ন অনুভূতিলব্ধ রূপকে তাহার বিভিন্ন ভাবের

প্রকাশ ও সত্যরূপ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। জলে নীল বা সাদা বর্ণ আছে, কোন স্বাদ বা গন্ধ নাই বলা চলে না, আবার স্বাদ আছে, গন্ধ বা স্পর্শগুণ নাই বলা যায় না। একই জলে বর্ণ, স্বাদ ও স্পর্শগুণ আছে এবং উহারা তাহার বিভিন্নরূপ প্রকাশ করে। ঠিক এই ভাবেই তত্ত্ব নির্গুণ, সগুণ নহে, নিরাকার, সাকার নহে, জড় মাত্র, চিদ্রূপ নহে, গতিশীল, স্থিতিশীল নহে এরূপ বলা যায় না। যদি অনুভূতি সামান্যই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায় হয় এবং বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের অনুভূতি একই তত্ত্বকে প্রকাশ করে, তবে বলিতে হইবে যে তত্ত্ব সাকারও বটে নিরাকারও বটে, সগুণ ও সবিশেষও বটে, নির্গুণ ও নির্বিশেষও বটে, নিত্য ও অপরিণামীও বটে, লীলান্বিত ও পরিণামীও বটে।

এখানে কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে একতত্ত্ব কিরূপে সগুণ ও নির্গুণ প্রভৃতি বিরুদ্ধ গুণযুক্ত হইবে এবং একই তত্ত্ব যে বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের অনুভূতিতে পাওয়া যায় তাহা কিরূপে বুঝিব ? ইহার উত্তরে প্রথমে বলিব একই জল কিভাবে রস ও স্পর্শগুণযুক্ত হইতে পারে এবং তরল দ্রব্য বাষ্প ও কঠিন পদার্থ হইতে পারে তাহা বুঝিলে একথা বুঝা যাইবে। জলে আমরা রস ও স্পর্শ অথবা স্বাদ ও শৈত্যগুণ স্বীকার করি। কিন্তু এই গুণ দুইটি একেবারে ভিন্ন, রস স্পর্শ নহে, স্বাদ শৈত্য নহে, আবার স্পর্শ রস নহে, শৈত্য স্বাদ নহে, ইহাদের পরস্পরাভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে। রস স্পর্শ হইতে ভিন্ন, স্পর্শ রস হইতে ভিন্ন, সেইরূপ স্বাদ ও শৈত্য, তথাপি উহারা এক জলেরই দুইটি গুণ। তারপর একই জল কখন তরল পানীয় আবার কখন বাষ্প, কখন কঠিন বরফ হইয়া যায়। কিন্তু মূলে ও স্বরূপে সে জলই থাকে। জলে স্বাদ ও শৈত্যরূপ অত্যন্ত ভিন্ন গুণের সমাবেশ অথবা পরস্পরবিরুদ্ধ তরল, বাষ্পীয়, কঠিন রূপের সম্ভাব্যতা আমরা সহজে এবং নিঃসন্দেহে স্বীকার করি। তাহার কারণ জলে এসব ভিন্ন গুণের ও বিরুদ্ধ অবস্থার অনুভূতি আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু পরম তত্ত্ব বা ব্রহ্ম যে সগুণ ও নির্গুণ দুইই হইতে পারেন তাহা আমরা সহজে স্বীকার করিতে পারি না, কারণ সেরূপ অনুভূতি আমাদের সচরাচর ও সকলের হয় না। যদি কেহ বলেন জলত দেশ কাল ও অবস্থাভেদে তরলাদি রূপ ধারণ করে, একই দেশ কাল ও অবস্থায়ত সেরূপ হয় না, তাহার উত্তরে বলিব তত্ত্ব বা ব্রহ্মও অবস্থাভেদে সগুণ ও নির্গুণ হয়েন। তিনি যখন জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ম করেন তখন তাঁহাকে সগুণ বলি, আবার যখন সেসব কর্ম হইতে বিরত হন ও স্বরূপে অবস্থিত হন তখন তাহাকে নির্গুণ বলি। অথবা যেমন জলের অবস্থান্তরের সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 'জল তরল না

কঠিন ?' এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে বলিতে হয়, 'জল তরলও বটে কঠিনও বটে', তেমনি তত্ত্বে বা ব্রহ্মে জগদ্‌ব্যাপারের ভাবাভাবের সম্ভাব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলিতে হয় 'ব্রহ্ম সগুণও বটে নির্গুণও বটে'। কিন্তু জল ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য এই যে জলকে একই অবস্থায়, একই দেশকালে তরল ও কঠিন বলা যায় না, ব্রহ্মকে একই কালে ও অবস্থায় সগুণ ও নির্গুণ বলা যায়। আত্মাই ব্রহ্ম এবং আত্মাকে একই কালে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়, সগুণ ও নির্গুণ বলা যায়। আমি যখন কোন কর্ম করি তখন কর্ম নিষ্পাদক হিসাবে আমার আত্মা সক্রিয় ও সগুণ, কিন্তু ঐ কর্মের নিশ্চল দ্রষ্টা ও সাক্ষী হিসাবে আত্মা নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ।

আর এক তত্ত্বই যে বিভিন্ন জ্ঞানস্তরের অনুভূতিতে পাওয়া যায় তাহা আমরা স্মৃতির সাহায্যে বুঝিতে পারি। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে যে একই ব্যক্তি একই জগতের বিভিন্নরূপ দর্শন করে তাহ স্মৃতি সহায়ে বুঝা যায়। তেমনি নির্বিকল্প সমাধি হইতে সবিকল্প জ্ঞানে নামিয়া আসিলে অথবা সবিকল্প জ্ঞান হইতে নির্বিকল্প জ্ঞানে উঠিলে পূর্বানুভূতির কিছু স্মৃতি বা বোধ থাকিয়া যায় এবং তাহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে উভয় জ্ঞানস্তরেই এক তত্ত্ব বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্নরূপে অনুভূত হয়। অতএব আমরা বলিতে পারি যে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ এক তত্ত্বেরই বিভিন্ন দিক বা রূপের পরিচয় দেয় এবং তাহাদের প্রত্যেকটিই একভাবে সত্য, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নয়। এই সত্যটিই তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য হইবে। এইভাবে আমরা বিভিন্ন ও আপাতবিরুদ্ধ দর্শনমতের একটা সঙ্গত সমন্বয় সাধন করিতে পারি এবং যে ভাবধারা দ্বারা তাহা সাধিত হইবে তাহাকেই বিশ্বজনীন দর্শনের ভাবধারা বলা যাইবে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের মূলে এই ভাবধারা নিহিত আছে এবং তাহা পরিস্ফুট ও প্রতিপন্ন করিতে পারিলে এক বিশ্বজনীন দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইবে। এখানে তাহার আভাসমাত্র দেওয়া হইল।

নিরীশ্বর ধর্ম সম্ভব কি না?

শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়
(আশুতোষ কলেজ)

ধর্ম ও ঈশ্বর কথা দুইটির কোন নির্দিষ্ট বা সর্ববাদিসম্মত সংজ্ঞা নাই। এমন কি বহুজন গ্রাহ্য কোন সংজ্ঞা আছে, এমন কথা ও বলা যায় না। সেজন্য ধর্ম বলিতে কি বুঝি, ঈশ্বর বলিতে বা কি বুঝি, সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। অবশ্য ধর্ম বা ঈশ্বরের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা আমরা দিতে যাইতেছি না। আদৌ ঐ রকম কোন সংজ্ঞা দেওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কেন ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রথমত, ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কোন সংজ্ঞা দেওয়া যাউক না কেন, দেখা যাইবে যে বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন সমাজের মানুষের ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল ধারণা আছে তাহা ঐ সংজ্ঞানুসারে সম্যকরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। দ্বিতীয়ত, ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন সংজ্ঞা যদি সম্ভব হয় যে তাহার দ্বারা ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সকল ধারণাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে, তবে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে সংজ্ঞা এতই অস্পষ্ট ও ব্যাপক হইবে যে তাহা প্রায় অর্থহীন হইয়া পড়িবে। তৃতীয়ত, ঐরূপ অস্পষ্ট ও ব্যাপক সংজ্ঞা ধর্ম ও ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন বিষয়কেও বুঝাইয়া দিতে পারে। বস্তুতঃ বহু ধর্মমত ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় এমন ধারণা আছে যাহাদের আমরা সাধারণত যথাযথ ধারণা বলি না; কিন্তু ধর্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে অতি ব্যাপক ও অস্পষ্ট সংজ্ঞা গ্রহণ করিলে কাহারও পক্ষে ঐ সকল ধারণাকে যথাযথ নয় বলা সম্ভব নয়। সর্বশেষে, যাহারা ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাহারাই অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে ধর্ম ও ঈশ্বরের কোন পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা সম্ভব নয়; যদি তাহাই হয় তবে ধর্ম বা ঈশ্বরের যে কোন সংজ্ঞা উহাদের সম্বন্ধে আমাদিগকে মাত্র আংশিক ধারণা দিতে পারে।

আমরা এখানে ধর্ম ও ঈশ্বর বলিতে কি বুঝি সে সম্বন্ধে যাহা বলিব তাহাকে উহাদের আংশিক সংজ্ঞা বলিয়া গ্রহণ করা হইলে আমরা আপত্তি করিব না। সে যাহাই হউক, আমরা এখানে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে কয়েকটি বৈশিষ্টের উল্লেখ করিব

যাহা, আমাদের বিশ্বাস, যাহারা ধর্ম ও ঈশ্বরে বিশ্বাসী তাহাদের অনেকেই স্বীকার করিবেন ; এবং পরে আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে ঐ সকল বৈশিষ্ট্যানুসারে ধর্মের সঙ্গে ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ আছে বা থাকিতে পারে।

ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট হইতেছে যে উহা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের ধারক, বাহক বা প্রতীক। ধর্ম সকল সময় মানুষের নিকট আদর্শরূপে উপস্থিত হইয়াছে, বা তাহাকে আদর্শের সন্ধান দিয়া আদর্শ-সন্ধানী করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের জীবনে যে আদর্শ আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না, বা এ সম্বন্ধে কোন মতানৈক্যের অবকাশ নাই—যদি কোন মতানৈক্য থাকে তবে তাহা আদর্শের স্বরূপ বা তাৎপর্য লইয়া। আমার আদর্শ তোমার আদর্শ না ও হইতে পারে, বা আমাদের আদর্শ পরস্পরকে খণ্ডন করিতে পারে, কিন্তু আদর্শ আমাদের আছেই। আমাদের মতে একথা ঠিক যে আদর্শ সন্ধাণী বলিয়াই মানুষ মানুষ। মানুষের আদর্শ সমূহ কিন্তু এক পর্যায়ভুক্ত নয়। কোন আদর্শকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে প্রায়শঃ তাহা অন্য কোন উচ্চতর বা ব্যাপকতর আদর্শে পৌছাইবার পন্থা বা উপায় মাত্র। ঐ উচ্চ বা ব্যাপক আদর্শ অনুরূপ ভাবে অন্য কোন তাহাপেক্ষা উচ্চ বা ব্যাপক আদর্শে উপনীত হইবার উপায় মাত্র। কিন্তু এই ভাবে আদর্শ হইতে আদর্শান্তরে গমন করিয়া আমরা অবশেষে এমন আদর্শে পৌছাই যাহাদের আমরা সর্বোচ্চ আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করি। অনেকের মতে সত্য, শিব ও সুন্দর আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ।

সর্বোচ্চ আদর্শ কিন্তু মানুষের আদর্শ আলোচনায় শেষ কথা নহে। মনুষ্য জীবনের বিভিন্ন দিক আছে এবং সত্য, শিব ও সুন্দর তাহার বিভিন্ন দিকের সর্বোচ্চ আদর্শ। এজন্য ইহাদের মনুষ্য জীবনের পরম বা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ বলা যায় না। বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও মানুষের জীবন এক ও অখণ্ড এবং তাহার জীবনের চেতনাময় অংশগুলি এক ঐক্যবোধের দ্বারা গ্রথিত। মানুষ বিশ্বাস করে যে তাহার জীবনের এক পরম ও পূর্ণাঙ্গ আদর্শ আছে যাহা তাহার জীবনের ঐক্যবোধের যথার্থ উৎস এবং যাহাকে সাধন ও অর্জন করিয়া তাহার জীবন সৎ, সার্থক ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে। ধর্মই মানুষের জীবনের পরম বা পূর্ণাঙ্গ আদর্শ, বা উহা ঐ আদার্শর ধারক ও বাহক। ধর্মকে বাদ দিয়া এজন্য মানুষের জীবন ব্যর্থ ও নিরর্থক। ছন্দহীন কবিতার মত ধর্মহীন জীবন এজন্য পীড়াদায়ক ও অবাঞ্ছনীয় অভিশাপ মাত্র।

ঐ পরম আদর্শ বোধ হইতে মানুষের মনে তাহার নিজের সম্বন্ধে এক অসম্পূর্ণতা বোধ আসিয়াছে। সে কি এবং সে কি হইতে পারে—ইহাদের পার্থক্য তাহার মনে অহরহ উঁকি মারে। অন্ততঃ এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে মানুষের বহুবিধ কার্যকলাপ ও প্রাচষ্টার মূলে ঐ অসম্পূর্ণতা বোধ রহিয়াছে। অর্থাৎ মানুষ একটি নিছক সীমাবদ্ধ, অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্বাযুক্ত জীব নহে, পরন্তু সে নিজেকে সীমাবদ্ধ, অসম্পুর্ণ ও আংশিক সত্বাযুক্ত বলিয়া জানে। অনেক খ্যাতনামা লেখক দেখাইয়াছেন যে মনুষের মনে নিজের সম্বন্ধে এই অসম্পুর্ণতা বা খণ্ডতা বোধ আসিতই না, যদি না তাহার মনে যাহা পূর্ণ, পরিপূর্ণ, অসীম ও অখণ্ড তাহার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ধারণা না থাকিত। সহজাত প্রেরণা হইতে হউক বা সচেতন ভাবেই হউক মানুষ নিজের খণ্ড সত্বাকে অখণ্ড সত্বার সঙ্গে যুক্ত করিয়া তাহার সঙ্গে একাত্বতা বোধ করিতে চায়। ইহাকেই অনেক ধর্ম বা ধর্মবোধ বলিয়াছেন। আমাদের মতে ইহাই ধর্ম বা ধর্মের অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট। আমাদের বিশ্বাস প্রায় সকল ধর্মেই—তাহা প্রাচীনা বা পরবর্ত্তী, সীমাবদ্ধ বা সার্বজনীন, যাহাই হউক না কেন—এই বৈশিষ্ট কে খুজিয়া পাওয়া যাইবে।

ইহা অবশ্য ঠিক যে সীমা ও অসীমের বা খণ্ড ও অখণ্ডের পার্থক্য মানুষ সভ্যতার স্তরে পৌছাইয়া উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার পূর্বে তাহার যে সীমা বা অসীমের সম্বন্ধে কোন বোধ ছিল—একথা বলা যায় না। তথাপি একথা বলা যায় যে মানুষের ধর্মবোধকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে মানুষ সকল সময়ই নিজেকে এক অধিকতর ক্ষমতাবান ও অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর নির্ভরশীল মনে করিয়াছে এবং অন্য সময় না হউক বিপদ বিপর্যয়ে ঐ শক্তির নিকট সাহায্য চাহিয়াছে। এই শক্তিকে মানুষ সর্বশক্তিবান বলিয়াই মানিয়া নিয়াছে—ইহার সীমা বা অসীমতা লইয়া ব্যস্ত হইয়া উঠে নাই। এজন্য একথা বলা যাইতে পারে যে প্রারম্ভ হইতেই মানুষের ধর্মবোধের মধ্যে খণ্ড ও অখণ্ড বা সীমা ও অসীমের পার্থক্য স্পষ্টত না হউক বীজরূপে বর্ত্তমান ছিল।

ধর্মের এই বৈশিষ্টকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার অপর একটি বৈশিষ্ট পাই। ধর্মবোধে মানুষ নিজেকে সকল সময় এক পৃথক সত্বায় সত্বাবান মনে করিয়াছে। তাহার ধর্মপ্রচেষ্টার অন্যতম লক্ষ হইতেছে স্বীয় সত্বাকে আরও সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধিবান করিয়া তুলা। বস্তুতঃ মানুষের কাছে সে কি বা কি হইয়াছে তাহা বড় প্রশ্ন নয়, পরন্তু সে কি হইয়া উঠিতে পারে তাহাই প্রধান প্রশ্ন। নিজের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অহরহ সচেতন হইয়াও মানুষ নিজের বিরাট সম্ভবনাকে কখনও

ভুলিয়া যায় নাই। এই সম্ভবনাকে সে তখনই সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিবে যখন সে আদর্শকে নিজের জীবনে যথার্থভাবে রূপদান করিতে পারিবে। কিন্তু এই খানেই তাহাকে জীবনের অন্যতম প্রধান দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হয়। যতই সে আদর্শাভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে ততই সে আদর্শ যেন দূরে সরিয়া যায়। মানুষের ধর্মবোধের সঙ্গে এই দ্বন্দ্ববোধও তাহার জীবনে স্পষ্টতঃ না হউক বীজরূপে সর্বদাই বর্ত্তমান।

এই দ্বন্দ্ববোধ হইতে মানুষের মনে দেবতা বোধ আসিয়াছে। ধর্মের মূর্ত্ত প্রতীক দেবতা। মানুষ নিজে যাহা হইয়া উঠিতে পারে নাই, দেবতার মধ্যে তাহা পরিপূর্ণভাবে প্রকট দেখিয়াছে। যে আদর্শের কোন বাস্তব সত্তা নাই তাহা নিছক কল্পনা মাত্র এবং সেজন্য তাহা যথার্থ আদর্শ নয়। এজন্য আদর্শ বিশ্বাসী মানুষ আদর্শের বাস্তব সত্তায় বিশ্বাসবান। জগতের অন্যান্য বিষয়ের মত মানুষের ধর্মবোধের ও ক্রমবিকাশ হইয়াছে এবং ফলে তাহার দেবতারও ক্রমবিকাশ হইয়াছে। গাছ পাথর, নদনদী হইতে শুরু করিয়া এক অনন্তশক্তিমান সত্তা সকলেই পর্যায়ক্রমে মানুষের কাছে দেবতার পদ লাভ করিয়াছে। এজন্য বহু ভাবে ও বহুরূপে দেবতা মানুষের ধর্মজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে; ইহাকে ধর্মজীবন হইতে পৃথক করিয়া লইতে গেলে সে জীবন নিঃস্ব, নিরর্থক ও নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে: দেবতা ও ঈশ্বর কি এক? ইহার কোন সরাসরি উত্তর সম্ভব নয়। ঈশ্বরের কল্পনা ও মানুষ বহুভাবে করিয়াছে। কোথায়ও ঈশ্বর ও দেবতা এক; কোথায়ও বা ইহারা পৃথক। কোন কোন ধর্মে দেবতা আছে ঈশ্বর নাই; কোন ধর্মে বা ঈশ্বর আছে দেবতা নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে বহুক্ষেত্রে মতানৈক্য যত না বিষয়বস্তু লইয়া তাহার অধিক নাম বা উপাধি লইয়া। বস্তুত নিছক নামে কিছু নাই। এজন্য ঈশ্বর বলিতে আমরা কি বুঝি তাহা নির্ণয় করাই অধিক প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে যেমন অনায়াসে বলা যায় যে ঈশ্বর বিহীন ধর্ম সম্ভব নয় তেমনই বিনাবাধায় বলা যায়, নিরীশ্বর ধর্ম সম্ভব।

আমরা যেভাবে এই পর্যন্ত বিষয়টি আলোচনা করিয়াছি তাহাতে ইহা বুঝিতে কোন অসুবিধা নাই যে আমাদের মতে ধর্মবোধের সঙ্গে এক পূর্ণাঙ্গ সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে; এবং ঐ পূর্ণাঙ্গ সত্তা ও নিজের খণ্ডিত সত্তার পার্থক্য বোধ একদিকে যেমন ধর্মবোধের পক্ষে অপরিহার্য্য তেমনি অপরদিকে

পূর্ণাঙ্গ সত্ত্বার উপর নির্ভরশীলতা ইহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা এই পূর্ণাঙ্গ সত্ত্বাকেই ঈশ্বর বলিয়া বুঝি এবং সেজন্য ইহা বলিতে আমাদের কোন দ্বিধা নাই যে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া কোন ধর্ম সম্ভব নয়। অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি যে অখণ্ড বা অনন্ত সত্ত্বার কল্পনা মানুষ সকল সময় একই ভাবে বা একইরূপ স্বচ্ছতা সহকারে করে নাই; এমন কি বহু ক্ষেত্রে মানুষের মনে ইহা মাত্র বীজরূপে বর্তমান ছিল এবং সে সকল ক্ষেত্রে মানুষের ঈশ্বর কল্পনা কোন সচেতন রূপ গ্রহণ করে নাই। কিন্তু আমাদের মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা আর ধর্মকে অবান্তর বা অবাস্তব বলা একই কথা।

কিন্তু নিরীশ্বর ধর্ম সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নয়। খণ্ড ও অখণ্ড, সীমা ও অসীমের পার্থক্যবোধ যেমন ধর্মবোধের পক্ষে অপরিহার্য্য, অপরদিকে ইহাদের মধ্যে ঐক্য ও একত্ববোধ ও ধর্মের পক্ষে অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয়। খণ্ড অখণ্ডেরই অংশ, সীমা অসীমের মধ্যেই অস্তিত্ববান। ইহারা অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। ধর্মবোধ মানুষকে তাহার পৃথক সত্ত্বা সম্বন্ধে যেমন সচেতন করিয়া তুলে, তেমন তাহার সত্ত্বার সঙ্গে পরম ও পূর্ণাঙ্গ সত্ত্বার সুগভীর সম্বন্ধ বিষয়ে তাহাকে সজাগ করিয়া দেয়। মানুষের ধর্মবোধ যতই গভীর ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ততই সে নিজের সঙ্গে পরম সত্ত্বার নৈকট্য ও একত্ব উপলব্ধি করে। বস্তুতঃ ঈশ্বরকে জানাই যদি ধর্মের শেষ কথা হয়, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে এক ও অভেদ হইয়া যাওয়াই মানুষের ধর্ম প্রেরণার শেষ পরিণতি। ঈশ্বরকে জানা মানেই ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়া। আমাতেই আমার পরম সত্ত্বা নিহিত ও ব্যপ্ত হইয়া আছে, এই বোধই ঈশ্বরোপলব্ধি। তাহাই যদি হয়, তবে এই হিসাবে বলা যায় যে নিরীশ্বর ধর্ম সম্ভব। অর্থাৎ ঈশ্বরকে লাভ করিয়া যদি মানুষ ধর্মাচরণ করে, তখন সে ধর্মকে নিরীশ্বর ধর্ম, বলা যায়। ভিন্ন ভাষায়, একমাত্র জীবন্মুক্ত পুরুষের ধর্মকে নিরীশ্বর ধর্ম আখ্যা দেওয়া যায়।

ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম কি সম্ভব?

ডক্টর প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

(এক)

ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম কি সম্ভব? —এ প্রশ্নের উত্তর দান করিবার পূর্ব্বে প্রশ্নটির সম্যক্ তাৎপর্য্য অনুধাবন করা যাউক্। আমরা যখন কোন বিষয় সম্বন্ধে সম্ভাব্যতার প্রশ্ন তুলি, তখন তাহার অর্থ হইল যে উহা বাস্তবে পরিণত হইতেও পারে, আবার নাও পারে; অর্থাৎ সম্ভাবনার ক্ষেত্র বাস্তবের ক্ষেত্র হইতে ব্যাপকতর। আবার মধ্যে মধ্যে সম্ভাবনা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের সহিত ঔচিত্যেরও একটা প্রশ্ন জড়িত থাকে। যেমন, যদি প্রশ্ন করা যায়: 'রামবাবুর মত দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ আচরণ করা কি সম্ভব?', তখন ইহার অর্থ হইল: বোধ হয় রামবাবু এরূপ আচরণ করেন নাই; আর যদি তিনি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা অন্যায় হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে আদর্শচ্যুতি ঘটিয়াছে।

এখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন করা হয় যে ঈশ্বর ব্যতীত উহা সম্ভব কি না, তখন ঔচিত্য বা আদর্শের প্রশ্নও জড়িত থাকে। প্রশ্নটী যদি কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বন্ধীয় হইত, অর্থাৎ প্রশ্নটী যদি কেবলমাত্র ইহাই হইত যে মানবের ইতিহাসে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ধর্ম্ম কখনও অনুষ্ঠিত হইয়াছে কি না, তাহা হইল ইহার উত্তর-দান একটি সহজসাধ্য ব্যাপার হইল। মানবের ইতিহাস অনুধাবন করিলে যেহেতু দেখা যায় এরূপ প্রচেষ্টা হইয়াছে, সেই হেতু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ইহার উত্তর হইবে সদর্থক। দর্শনের ছাত্র কিন্তু যখন এই প্রশ্নের আলোচনায় অবতীর্ণ হইবেন, তখন ইহার সহিত ঔচিত্যের প্রশ্নেরও সমাধান করিবার চেষ্টা করিবেন। তাঁহাকে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা হইল ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম্ম-স্থাপনের কোন চেষ্টা যদিই বা হইয়া থাকে তাহা কতদূর সঙ্গত বা উচিত হইয়াছে। আবার এই সঙ্গতি বা ঔচিত্যের প্রশ্নের সমাধান দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী হইতে করিতে হইবে: একটি হইল আদর্শের দিক্ হইতে এবং অপরটি হইল তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে

সুতরাং আমাদের উত্তরদানকালে দুই প্রকার বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। যাঁহারা বলিবেন যে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে ঈশ্বরবিহীন ধর্মস্থাপনের চেষ্টা একটী বাস্তব ঘটনা, তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতে হইবে ঐরূপ ঘটনা কতদূর সার্থক ও আদর্শানুগ হইয়াছে এবং যাঁহারা বলিবেন যে যুক্তি ও দর্শনের দিক্ হইতে ঈশ্বরকে পরিহার করাই শ্রেয়ঃ, তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের বিরুদ্ধ-যুক্তি বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

(দুই)

আমাদের উত্তরদানের পদ্ধতি মোটামুটি স্থির করিলাম। এখন আমরা আর একটী কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইব। ইহা হইল ধর্ম্ম কি? এই প্রশ্নের উত্তরদান দুরূহ ব্যাপার ; কারণ ধর্ম্ম মানবের ইতিহাসের ন্যায় সুপ্রাচীন—যতদিন মানুষের বির্বতন হইয়াছে, ততদিন কোন না কোন প্রকারের ধর্ম্ম মানুষ অনুধাবন করিয়া আসিতেছে। মানবজাতির বিস্তারের সহিত বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ধর্ম্মের উদ্বর্ত্তন হইয়াছে—ইহাদের সহিত জড়িত আছে বিভিন্ন ধারণা, বিভিন্ন আদর্শ, বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপাদি। সুতরাং ধর্ম্মের যথোপযুক্ত সংজ্ঞা দান করিতে হইলে উহা এইরূপ ব্যাপক হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহাতে এই সব বিভিন্ন ধর্ম্মই যতদূর সম্ভব ঐ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ দেখিতে হইবে যে সংজ্ঞাটি যেন অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট না হয়।

'ধর্ম্মন্' পদটীর ব্যুৎপত্তি হইল : ধৃ+মন্। ইহার অর্থ হইল যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম ; কিন্তু মানুষকে ধারণ বা রক্ষণ করে কি বা কাহারা? এখানে হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র 'ধর্ম্ম' পদটী একটী ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছে। চারিটী আশ্রমের উপযুক্ত বিভিন্ন কর্ত্তব্যের উল্লেখ করিয়াছে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র। ধর্ম্ম কথাটি কত ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছে তাহা বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়বস্তু আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে। গৌতম, বৌধায়ন, আপস্তম্ব এবং বশিষ্ঠ তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সাধারণ ভাবে নিম্নলিখিত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন : বিভিন্ন বর্ণ ও আশ্রমের উপযুক্ত কর্ত্তব্য, গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি পর্য্যন্ত বিবিধ সংস্কার, ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য, অনধ্যায়, স্নাতকের কর্ত্তব্য, বিবাহ, গৃহীর কর্ত্তব্য, শৌচ, পঞ্চযজ্ঞ, দান, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, শুদ্ধি, অশৌচ, শ্রাদ্ধ, স্ত্রীধর্ম্ম, স্ত্রী-পুংধর্ম্ম, ক্ষাত্রধর্ম্ম, ব্যবহারবিধি, আপদ্ধর্ম, প্রায়শ্চিত্ত, কর্ম্মবিপাক, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমের কর্ত্তব্য ইত্যাদি।[১]

---

[১] P. V. Kane, *History of Dharmasastra*, Vol. II, Pt. I, p. 1.

এই তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে ধর্ম্ম অর্থে এখানে সামাজিক ব্যক্তি হিসাবে দৈনন্দিন জীবনের আদর্শ বা কর্ত্তব্যের কথা বলা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল আত্মিক উৎকর্ষ সাধন।[২] এই দিক্ হইতে বিচার করিলে ধর্ম্মের ভিতর নিষ্ঠা সহকারে আচরণের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এইজন্য বেদে বিভিন্ন করণীয় কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে। উপনিষদেও আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়াই আমরা 'ধর্ম্মং চর' (তৈঃ, ১ম, ১১) এই বাণী শুনি। এই ধর্ম্মের মধ্যে একটা আবশ্যিকতার ভাব আছে। ধর্ম্ম অবশ্য করণীয় ইহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পূর্ব্বমীমাংসায় বলা হইয়াছে, "চোদনালক্ষণার্থো ধর্ম্ম"। এই ধর্ম্ম পালনেরই ফলে আসে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স (তুলনীয়: বৈশেষিকসূত্রে "যতঃ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ, স ধর্ম্ম")।

ইহা হইতে মনে হইতে পারে যে কতকগুলি আচারপালনের মধ্যেই হিন্দুধর্ম্মের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। আচারের উপর হিন্দু ধর্ম্ম ও দর্শনের গুরুত্ব আরোপ করিবার কারণ যে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে শুদ্ধভাবে আচার পালনের মাধ্যমেই ব্যক্তি-বিশেষ উচ্চতর ঐশী সত্তার উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। ধর্ম্মের পথ বন্ধুর—নীতি ও বুদ্ধি-শক্তির উৎকর্ষ-সাধনের দ্বারাই ধীরে ধীরে আত্মজ্ঞান তথা জগতের আদি সত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়।[৩] উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে

[১]হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্ররচয়িতৃগণের এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর কাণে মন্তব্য করিয়াছেন: "The writers on dharmasastra meant by dharma not a creed or religion but a mode of life or a code of conduct which regulated a man's work and activities as a member of society and as an individual and was intended to bring about the gradual development of a man and to enable him to reach what was deemed to be the goal of human existence" (*Ibid.*, p. 2)

[২]এইজন্য অধ্যাপক হিরিয়াণ্ণা বলিয়াছেন: "Whatever else a religion may or may not be, it is essentially a reaching forward to an ideal, without resting in mere belief or outward observances. Its distinctive mark is that it serves to further right living ......" (*Outlines of Indian Philosophy*, p. 18.)

[৩]এই আদর্শকেই ব্যাখ্যা করিয়া ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলিয়াছেন: "While the supreme aim of social order is to train human beings for a state of spiritual perfection and sanctity, its essential aim is directed, by reason of its temporal ends, towards such a development of social conditions as will lead the mass of people to a level of moral, material and intellectual life

হিন্দু শাস্ত্রে ও দর্শনে দয়া, অহিংসা ইত্যাদির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে অথবা নিজের যাহা প্রতিকূল অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ নিষেধ করা হয়*; ইহার গূঢ় কারণ হইল যে অধিকাংশ হিন্দু বিশ্বাস করেন যে সর্ব্বজীবে একই ঈশ্বর বিরাজমান এবং অপরের ক্ষতি সাধন করিলে নিজেরই অন্তরাত্মার ক্ষতি করা হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন যে যাহা নিজের প্রতিকূল সেই আচরণ অপরের প্রতি করিবে না।*

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ধর্মীয় উপদেশ ও আচরণের পশ্চাতে এক অতীন্দ্রিয় চিৎশক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে এবং আচারের মাধ্যমে এই সত্তার সন্নিধিলাভ করা যায়, আশীর্ব্বাদ লাভ করা যায় ইত্যাদি বিশ্বাসও অনেকেরই আছে। ধর্ম কথাটির সঙ্কীর্ণ অর্থে এইরূপ শক্তির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়। ইংরাজিতে *Religion* পদটীও সাধারণতঃ এই অর্থের গৃহীত হয়। অতি প্রাচীন যুগের টোটেম্ পূজা, প্রেতপূজা ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের বহু দেববাদ, একেশ্বরবাদ পর্য্যন্ত সকল প্রকার ধর্মীয় মতবাদেই মনুষ্য

in accord with the good and peace of all, as these conditions assist each person in the progressive realisation of his life and liberty.

"The basic principle of dharma is the realisation of the dignity of the human spirit, which is the dwelling place of the Supreme. The knowledge that the Supreme Spirit dwells in the heart of every living creature is the abiding root principle of all dharma."

"ভগবান্ বাসুদেবো হি সর্ব্বভূতেষু অবস্থিতঃ
এতদ্ জ্ঞানং হি সর্ব্বস্য মূলং ধর্ম্মস্য শাশ্বতম্।"

(*Religion & Society*, Kamala Lectures, p. 107).

* যথা দেবল: — শ্রূয়তাং ধর্ম্মসর্ব্বস্বং শ্রুত্বা চৈবাবধার্য্যতাম্।
আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ ॥"

* P. V. Kane-এর ভাষায়: "The reason given for cultivating such virtues as *daya, ahimsa* is based upon the philosopical doctrine of one self being immanent in every individual as said in the words 'tat-tvamasi'. This is the highest point reached in Indian Metaphysics and combines morality and metaphysics. That doctrine requires us to regard the goodness or badness of one's actions from the standpoint of other individuals who will be affected by such actions." (*Op. cit.* p. 7).

অপেক্ষা উচ্চতর এক বা একাধিক শক্তিতে বিশ্বাস করা হয়; অর্থাৎ এমন এক বা একাধিক শক্তিতে বিশ্বাস করা হয় যিনি বা যাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী, গুণশালী অথচ মানুষের পূজাদির ফলে তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারেন না—বরং মধ্যে মধ্যে তাহাদের প্রার্থনাদি পূরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাকে বা ইঁহাদের কেন্দ্র করিয়াই মানুষের মনে ভয়, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম ইত্যাদি ভাবাবেগের অভ্যুদয় হয়। আবার এই সব ভাবরাশি হইতে নানারূপ ক্রিয়াকলাপাদি, বিবিধ পূজা, আচার ইত্যাদি দেখা দিয়াছে। ধর্মের ভিতর জ্ঞান, অনুভূতি ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। অবশ্য বলা বাহুল্য যে আদিযুগে ধর্মের সহিত যে ধারণা, ভাব ও ক্রিয়া জড়িত ছিল ধর্মের বিবর্তনের সহিত তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্বে যেখানে ধর্মের আরাধ্য শক্তিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ, ক্রোধী, অমিত দৈহিক বা প্রাকৃত শক্তির অধিকারী মনে করা হইত, আজ তাঁহাকে জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ, প্রেমময়, ক্ষমাসুন্দর, আত্মিকশক্তির অধিকারী মনে করা হয়। পূর্বে যেখানে আরাধ্যশক্তিকে স্বার্থের জন্য তুষ্ট রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করা হইত, যেখানে ভক্তি অপেক্ষা ভয়েরই প্রাধান্য ছিল, আজ সেখানে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ অহৈতুকী ভক্তি দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্বে যেখানে অনৈতিক বীভৎস ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইত, আজ সেখানে সুন্দর, সরল পূজা, উপাসনা, প্রার্থনা ইত্যদি কার্য মানুষ একক বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে করিতেছে। তাহা হইলেও বলিতে পারা যায় যে ধর্মের বাহ্যরূপ পরিবর্তিত হইলেও ধর্মের ভিতর জ্ঞান ও বিশ্বাস, আবেগ ও অনুভূতি, কার্য বা ক্রিয়াকলাপাদি কোন না কোন রূপে চিরকাল বিদ্যমান। ধর্মের আর একটি দিক্ হইল ইহার সামাজিক মূল্য। ধর্মীয় বিশ্বাস, আবেগ ইত্যাদি হইতে দেখা দেয় ইহার সঙ্ঘবদ্ধতাকরণের ও শ্রেণীসংগঠনের শক্তি।

এইজন্য ধর্মের একটা সুসমঞ্জস সংজ্ঞা দান করিতে হইলে বলিতে হয় যে ধর্ম হইল মানুষ অপেক্ষা মহত্তর, উচ্চতর, শ্রেয়ঃ এক বা একাধিক শক্তিতে বিশ্বাস ও ধারণা, উহাকেকেন্দ্র করিয়া কতকগুলি ভাবের সঞ্চার এবং তাহা হইতে প্রসূত কতকগুলি কর্মপ্রবৃত্তি—ইহাদের সহিত জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে জড়িত আছে ব্যক্তিগতভাবে পার্থিব বা অপার্থিব কোন কিছু প্রাপ্তির আশা; আবার এই সব আচরণের মধ্য দিয়া উদ্ভূত হয় সুদৃঢ় সামাজিক বন্ধন এবং গঠিত হয় সামাজিক আদর্শ।[৭] অবশ্য

---

[৭] তুলনীয়: (১) Religion is man's belief in a being or beings mightier than himself and inaccessible to his senses, but not indifferent to

এ কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে ধর্মের কোন সংজ্ঞাই একেবারে দোষমুক্ত নহে এবং উহার মধ্যে কোন না কোন ত্রুটি থাকিয়া যাইবে। তবে উপরের এই বর্ণনাকে মোটামুটিভাবে সকল ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

(তিন)

এখন প্রধান প্রশ্নে আসা যাউক্।

যাঁহারা বলেন যে ঈশ্বর ব্যতীত ধর্ম সম্ভব, তাঁহারা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে কি কি দিয়াছেন দেখিতে হইবে। আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ তিনটী প্রচেষ্টার উল্লেখ করিব—ফরাসী দার্শনিক কোঁতের মতবাদ, এবং ভারতবর্ষের জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদ। এই সকল মতবাদের প্রবর্ত্তকেরা পুরুষবিশেষ হিসাবে ঈশ্বর-পূজা বাদ দিয়া কেবলমাত্র উচ্চ নৈতিক আদর্শ রাখিয়াছেন। প্রাচীন জৈন দার্শনিকেরা সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র এই ত্রিরত্নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং ইহাদেরই মাধ্যমে মোক্ষ সম্ভব এই কথাই বলিয়াছেন। আবার সম্যক্ চরিত্র লাভের জন্য কঠোর ভাবে পঞ্চমহাব্রত (অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যা-

---

his sentiments and actions, with the feelings and practices which flow from such belief." (Dr. Flint, *Theism*, p. 32).

(২) Religion is the endeavour to secure the conservation of socially recognised values through specific actions that are believed to evoke some agency different from the ordinary ego of the individual, or from other merely human beings, and that imply a feeling of dependence upon this agency". (W. K. Wright, *A Student's Philosophy of Religion*, p 47).

ধর্মের বিবর্তনের ফলে যে একেশ্বরবাদের উদ্ভব হইয়াছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে যে বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার দুইটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

1. "Religion is a belief in an ever-living God, that is, a Divine Mind and Will ruling the universe and holding moral relations with mankind, (*Study of Religion*, Vol. I).

2. "A man's religion is the audacious bid he makes to bind himself to creation and to the Creator. It is his ultimate attempt to enlarge and to complete his own personality by finding the supreme context in which he rightly belongs." (Allport, *The Individual and his Religion*, p. 142).

পরিগ্রহ) পালন একান্ত আবশ্যক। সেইরূপ বৌদ্ধরাও মোক্ষমার্গ হিসাবে আটটী মার্গের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা: সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। আবার আধুনিক যুগে ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (Comte) বলিয়াছেন যে নর-পূজা (worship of Humanity) ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিবে।[৮] মোট কথা, যাঁহারা ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ধর্ম স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা ধর্মকে নৈতিক নিয়মে পর্য্যবসিত করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়, এমন কি অবাস্তব বলিয়াছেন। ধর্ম বলিতে তাঁহারা বুঝেন 'মানবিকতাবাদ' (Humanism)[৯] এবং ঈশ্বরকে পূজা না করিয়া বিশ্বমানবের সেবায় ও কল্যাণে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য, এই কথা তাঁহারা বলেন।

---

[৮] সাম্প্রতিক কালে Joseph Needham নামক প্রাণিতত্ত্ববিশারদ বলিয়াছেন যে: "Religion becomes no more or no less than the reaction of the human spirit to the facts of human destiny and the forces by which it is influenced; and *natural piety* or a divination of sacredness in heroic goodness, becomes the primary religious activity." (*Time: The Refreshing River*, p. 57)

[৯] 'মানবিকতাবাদ' পদটীর অর্থ সুনির্দ্ধারিত নহে। মানবিকতার প্রকৃত তাৎপর্য্যের সহিত তত্ত্ববিদ্যার চিরন্তন সমস্যা জড়িত। অর্থাৎ মানুষের সত্তা কি তাহাতেই সীমাবদ্ধ, না মানুষ কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার সহিত জড়িত। এই প্রশ্নের যেরূপ সমাধান হইবে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের যথার্থ স্থান নির্দ্ধারণ করা যাইবে। Jacques Maritain-এর ভাষায়: "One sees immediately that the word *humanism* is ambigious. It is clear that whoever uses the word brings into play at once an entire metaphysic, and that the idea we form of humanism will have wholly different implications according to whether we hold or do not hold that there is in the nature of man something which breathes an air outside of time and personality whose profoundest needs surpass the order of the universe." (*True Humanism*, p. xii). তবে যাঁহারা ঈশ্বর-পূজা বাদ দিয়া মানবিকতাবাদ প্রচার করেন, তাঁহারা বিশ্বের সব কিছু মনুষ্য-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করেন; অর্থাৎ "concentrating the world in man" হইল ইঁহাদের ব্যাখ্যার মূলসূত্র।

(চার)

বিজ্ঞানের প্রগতি মানুষকে আজ মুগ্ধ করিয়াছে। সেই বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা কোঁতের চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। সুতরাং ঈশ্বর-বিহীন ধর্মস্থাপনের আধুনিক প্রচেষ্টা হিসাবে আমরা কোঁতের দর্শন বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করিব।

কোঁতের মতে মানুষের চিন্তাধারা ক্রমবিবর্তনের ফলে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রম পার হইয়া আজ তৃতীয় ক্রমে উপনীত হইয়াছে। প্রথম ক্রম হইল কল্পনার যুগ (imaginative stage)—এই যুগে মানুষ ছিল শৈশব অবস্থায় এবং তাহাদের চিন্তা-ধারা বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করে নাই। সুতরাং কল্পনাপ্রবণ আদিম মানুষ জাগতিক বিভিন্ন বস্তুকে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী দেবদেবীর অধিষ্ঠানরূপে দেখিতে লাগিল। এইভাবে এই যুগে মানুষের চিন্তাধারা ছিল দেব-কেন্দ্রিক (theocentric)। দ্বিতীয় ক্রম বা যুগে প্রথম যুগের কাল্পনিক দেবদেবীতে বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল এবং মানুষ ক্রমশঃ বিমূর্ত চিন্তা (abstract thought) করিবার ক্ষমতা লাভ করিল। তাই আর মনুষ্যাকৃতি দেব-দেবীর কল্পনা না করিয়া মানুষ অতিজাগতিক, অতীন্দ্রিয় শক্তির কল্পনা করিতে লাগিল—এই দ্বিতীয় যুগ হইল তত্ত্ববিদ্যার ক্রম (metaphysical stage)। সর্বশেষ আসিয়াছে বিজ্ঞানের যুগ (scientific age)—এ যুগে অতীন্দ্রিয় কোন কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না এবং দৃষ্টবস্তুর আলোচনাতেই আমাদের সীমিত থাকিতে হইবে। এই যুগের নাম হইল দৃষ্টবাদের যুগ (positivistic stage)। এ যুগেও যদি আমরা ঈশ্বর বা কোন দেব-দেবীর পূজা করি, তাহার কারণ যে অনেকে এখন পর্যন্ত আদিম চিন্তার অভ্যাস (primitive habit of thinking) ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক, দৃষ্টবাদের যুগে ঈশ্বর একেবারে অচল, কিন্তু ধর্ম অচল নহে—অর্থাৎ এই যুগে ধর্মের জন্য প্রয়োজন এমন কিছু যাহা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সমাজতত্ত্ব-বিদ্যার প্রবর্তক হিসাবে কোঁৎ সামাজিক সংহতি ও ঐক্য রক্ষায় ধর্মের অবদাম সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাহা ছাড়া, কোঁৎ ইহাও বুঝিতেন যে ধর্মচর্চ্চার ফলে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি উৎকর্ষতা লাভ করে, এবং ইহার ফলে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। যেমন, দয়া, প্রেম, করুণা ইত্যাদি অনুভূতিগুলির সুস্থ প্রকাশ হইলে সমাজে শান্তি স্থাপিত হয়।[১০]

[১১] ধর্মের সামাজিক মূল্য সম্বন্ধে কোঁতের মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া J. A. Nicholson বলিয়াছেন: "(According to Comte) .... religion secures social harmony .... or, to use one of Comte's favourite analogies, religion may be represented

সুতরাং ধর্মের সংস্কার প্রয়োজন। ধর্মের মাধ্যমে যদি সামাজিক সংহতি রক্ষা করিতে হয় এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির উৎকর্ষতাসাধন করিতে হয়, তাহা হইলে অতীন্দ্রিয় সত্তাকে বাদ দিয়া মানব-পূজা করিতে হইবে। মানুষ যদি মানুষের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি ইত্যাদি অর্পণ করে তাহা হইলেই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কোঁৎ ঈশ্বরকে বাদ দিলেও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের পূজার অনেক আচার ব্যবহার তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রার্থনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। মানবতার উদ্দেশ্যে গীত রচনা করা হইয়াছিল; এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে এই মানবতার পূজা করা হইত। মানবতার পূজার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল মহাজনের স্মৃতি তর্পণ। কোঁতের ধর্মবাদে ৮১টা অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে—ইহাদের উদ্দেশ্য হইল মহাজনের নিকট আমাদের ঋণ সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়া তুলা। তাহা ছাড়া, দুইটা বিখ্যাত অনুষ্ঠান হইল, Festival of Commemoration ও Festival of Humanity—প্রথমটি বৎসরের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হইবে ও ঐদিন মহাজন-গাথা গীত হইবে এবং দ্বিতীয়টি বৎসরের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হইবে ও ইহা মানুষের জয়গান গাহিবে।[১১]

কোঁতের মতবাদের প্রশংসাযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে ইহা বিভিন্ন নৈতিক গুণের কৃষ্টি সাধনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। মানুষের জীবনে ধর্মের স্থান যে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং প্রার্থনা, পূজা ইত্যাদির জন্য মানবের মনে যে তীব্র ইচ্ছা থাকে তাহা কোঁৎ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে যে মানব-প্রেম এবং নরপূজা কি ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরপূজার স্থান গ্রহণ করিতে পারে?

---

as one of the vital organs in the social organism. Social life, he believed, could not function properly without a healthy religion .... ." "The primary function of religion is to cultivate the affective side of man's nature. It seeks to attach man's love finally to a supreme object of value." (*Philosophy of Religion*, p. 155 and p. 161).

[১১] এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে কোঁত ব্যক্তির অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। আত্মার অমরতা বলিয়া কিছু নাই। একমাত্র মহৎ কার্য্য দ্বারা মানুষের স্মৃতিতেই মানুষ অমর বা স্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারে।

[১২] তুলনীয়: "... Comte discovered that there was something positive in man's craving for a being to worship." (*Modern Cyclopaedia*, p. 508).

কোঁতের মতবাদ যে অসম্পূর্ণ তাহা নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে :

(১) কোঁতের মতবাদের ভিত্তিভূমি হইল ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ; ইনি মনে করেন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানই চরম জ্ঞান এবং ইহার অধিক আর কিছুই নাই। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রকৃতিরাজ্যের নিয়মের তালিকা দান করে এবং তাহাদের কোন পূর্ণ ব্যাখ্যা দান করিতে পারে না— এ কথা অনেক বৈজ্ঞানিকই বলিয়াছেন। এইজন্য দর্শন কেবলমাত্র বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না বা দর্শন কেবলমাত্র বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের সমন্বয় মাত্র হইতে পারে না। অর্থাৎ তথাকথিত বিজ্ঞানের পর প্রজ্ঞানের প্রয়োজন।[১৩]

(২) নর-পূজায় পূজার্হ ব্যক্তি বা বস্তু কে বা কি ? সকল মানবই কি পূজার যোগ্য ? বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কত নীচতা, কত ক্ষুদ্রতা, কত হীনতা আছে। যদি মানুষকে পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে কি তাহাকে তাহার হীনতা, ক্ষুদ্রতা সব কিছু সমেতই পূজা করিতে হইবে ? কোঁতের নিশ্চয়ই এই মনোভাব ছিল না। তাঁহার ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিতে আদর্শ নরের জয়গান করা হইত। বাস্তবিক তিনি Human beings বা মানবকে পূজা না করিয়া Humanity বা মানবতাকে পূজা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এই মানবতা হইল আদর্শ মানবতা (idealised humanity) যাহা সব কিছু হীনতা, মলিনতা ও ক্ষুদ্রতার বহু ঊর্ধ্বে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে কোঁৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে আদর্শ পূজার জন্য এমন এক সত্তার প্রয়োজন যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে নাই—যাহাকে বিমূর্ত চিন্তার মাধ্যমে কল্পনা করিতে হইবে।[১৪]

[১৩] প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যৌবনে কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদ দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন, কিন্তু পরে উহা পরিত্যাগ করেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'জ্ঞান' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন : 'প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র মূল'। ঐ প্রবন্ধ তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' পুনঃপ্রকাশের সময় মন্তব্য করেন : 'এই সকল মত আমি এক্ষণে পরিত্যাগ করিয়াছি।'

[১৪] এইজন্য A. Wolf বলিয়াছেন : "Humanity, as we know it, does not appear worthy of worship, and if we amend our creed to indicate that we worship idealized humanity, we are confronted with the somewhat remarkable demand that we should worship what in the theory of Positivism itself, does not exist and is, moreover, incapable of being adequately described." (*An Outline of Modern knowledge*, Ed. by W. Rose, p. 65).

(৩) মানবতার সহিত সসীমতা বিশেষভাবে জড়িত। একটা বিশেষ যুগে ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। মানুষের জ্ঞানশক্তির ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ তাহার বিবর্ত্তনের কারণ ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করে। মানুষ কোথা হইতে আসিল? কি তাহার পরিণতি? মানুষের আবির্ভাব কিসের ইঙ্গিত দিতেছে? —এই সব প্রশ্ন উচ্চতর ধর্ম্মীয় মতবাদের সহিত জড়িত। কোঁতের মতানুসারে কিন্তু মানুষ যদি নিজেই নিজের পূজার বস্তু হয়, তাহা হইলে এই সব সমস্যার উপর কোন আলোকপাতই হইবে না।[১৫]

(৪) কেবলমাত্র মানবতার উপরই গুরুত্ব আরোপ করার জন্য কোঁতের দর্শনে মানবতাকে 'স্বয়ম্ভু', 'স্বাধীন' সত্তার পর্য্যায়ে স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং 'ঈশ্বরহীন' জগতে 'মানবতাই' ঈশ্বরের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। আবার কোঁৎ কিন্তু নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে, সে প্রতিনিয়তই বাহ্য প্রকৃতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। তাহা হইলে মানুষ তথা মনুষ্যত্ব কিরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ পূজার্হ সত্তা হইবে?[১৬]

(৪) কোঁৎ সম্বন্ধে পরিশেষে প্রশ্ন এই যে, খৃষ্টধর্ম্মের (বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিক) পরিবেশের মধ্যে থাকিয়াও কি পৃথক্‌ভাবে প্রেমধর্ম্ম প্রচারের তাঁহার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল। বাস্তবিক কেবলমাত্র খৃষ্ট-ধর্ম্ম নহে জগতের সকল প্রগতিশীল ধর্ম্মেই—যথা, হিন্দু-ধর্ম্ম, মুস্লিমধর্ম্ম ইত্যাদি সকল ধর্ম্মেই—বিশ্ব-সৌহার্দ্দ্য, বিশ্বপ্রেম, দয়া, করুণা ইত্যাদি গুণের সমাদর করা হইয়াছে। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া শুধু নৈতিকতা প্রচারের দ্বারা তিনি উহার ভিত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন বোধ হয়।[১৭]

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে দুইটি নিরীশ্বরধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল—উহারা হইল জৈনধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম। এই দুই ধর্ম্মেও নৈতিক আদর্শের

[১৫] H. Hoffding-এর কথা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য : ". the religious problem proper only begins where Comte's religion ends, viz., with the question as to how the development of the world is related to that of the human race and the human ideal." (*History of Modern Philosophy*, ii, p. 359).

[১৬] Pringle-Pattison, *Idea of God*, p. 145 দ্রষ্টব্য।

[১৭] যীশুর একটি বিখ্যাত উক্তি হইল: "He that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?"

উপরই প্রাধান্য অর্পণ করা হইয়াছে (যেমন আধুনিক যুগের কোঁতীয় মতবাদে করা হইয়াছে)। এখানে আমাদের ব্যক্তব্য হইল যে ঈশ্বরানুরক্তির স্থান নৈতিক আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে না। উচ্চতর ধর্ম্মীয় আদর্শের সহিত নৈতিক আদর্শের কোন বিরোধ নাই এবং নৈতিক আদর্শ উচ্চতর ধর্ম্মীয় আদর্শের নিকটবর্ত্তী; কিন্তু তাই বলিয়া উহা ধর্ম্মের স্থান লইতে পারে না। উচ্চতর প্রগতিশীল ধর্ম্মমাত্রেই সমগ্র অন্তর দিয়া চরমতম সত্তার নিকট আত্মনিবেদনের ভাব থাকে; কিন্তু ঈশ্বরবিহীন নৈতিক জীবনের মধ্যে উহা পাওয়া যায় না। ধর্ম্মীয় জীবনের এমনই এক অভিনবত্ব আছে উহার মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের এরূপ অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছে—যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের মননশীলতা, বা কলাবিদের সূক্ষ্ম অনুভূতি বা নীতিবাদীর কর্মজীবন কোন কিছুই ধর্ম্মীয়জীবনের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা যায় না।[১৮]

মানবের মনকে যদি সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ক্ষুদ্র বর্ত্তমানকে লইয়া বা জাগতিক বস্তুনিচয় লইয়াই উহা সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। অর্থাৎ কবির ভাষায় সে 'সুদূরের পিয়াসী'—তাই সে তাহার অতৃপ্ত হৃদয়ের বাসনাকে রূপদান করিয়া বলে—

'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্ খানে।'

এই অতৃপ্ত অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘটে যখন সে অনন্ত পুরুষের সন্নিধি লাভ করে।

এই জন্য দেখা যায় যে, জৈনধর্ম্মের অনুগামিগণ ঈশ্বরকে বাদ দিলেও তীর্থঙ্করদের ইচ্ছায় হউক্ বা অনিচ্ছায় হউক্ ঈশ্বরের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন।[১৯]

[১৮] W. L. King এই বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন : "If we are then to sum up the essential distinction between religion and the disciplines of science, philosophy, art and morality, it will be found in the fundamental goal religion keeps always before it : To make a total personal response to most ultimate reality in the universe." (*Introduction to Religion*, p. 85). তিনি আবার বলিয়াছেন : "The earnestly moral person comes nearest the full-scale response of religion......Yet he too fails of the full responsiveness sought by religion when he cuts his ideals and standards loose from cosmic reality and wishes to say these are his own." (*Ibid.* p. 86).

[১৯] তুলনীয়: "Though Jainism itself is a godless religion, yet the later followers of Jainism could not long adhere to the atheistic character of their religion". (J. B. Noss, *Man's Religions*).

ঈশ্বরবিশ্বাসীরা যেরূপ নিষ্ঠার সহিত ঈশ্বরের আরাধনা করেন, সেইরূপ ঐকান্তিকতার সহিত জৈনগণ পঞ্চপরমেষ্ঠির (যথা, অর্হৎ, সিদ্ধ, আচার্য্য, উপধ্যায় এবং সাধুর) নিকট প্রার্থনা জানাইয়া থাকেন। অর্থাৎ সাধারণ জৈন ভক্ত নৈতিক জীবনের কর্ত্তব্যের মধ্যে তৃপ্তি বোধ করিতে পারেন না বলিয়া অর্হৎ ইত্যাদির নিকট আত্মনিবেদন করেন এবং যখন এইরূপ আত্মনিবেদন করেন তখন তাঁহাদের অতি-মানবের পর্য্যায়ে তুলিয়া থাকেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবের নীরবতার জন্য তাঁহার সঠিক মতবাদ সম্বন্ধে বিরোধের যথেষ্ট অবকাশ আছে।[২০] বুদ্ধদেবের নিজস্ব মতবাদ যাহাই হউক্, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে একদল নিরীশ্বরবাদ পরিত্যাগ করেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নাম হইল মহাযান সম্প্রদায়। ইঁহারা শেষ পর্য্যন্ত এক মহান্ জগতাতীত আত্মার কল্পনা করেন এবং রাজকুমার গৌতমকে ইঁহারই অবতার মনে করেন।

আধুনিক কালে কোঁতের মতবাদ সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। ধর্ম হিসাবে ইহা বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই—উহাকে বহু দার্শনিক মতবাদেরই মধ্যে অন্যতম মতবাদ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, নিরীশ্বর ধর্মস্থাপনের চেষ্টা যেমন একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, সেইরূপ মনুষ্য-সমাজ কর্তৃক এই তথাকথিত ধর্ম্মীয় মতবাদ পরিত্যাগ বা কার্য্যক্ষেত্রে ইহার অসাফল্যও একটা বাস্তব ঘটনা। বাস্তবিকই সাফল্যের দিক্ হইতে বিচার করিলে এইরূপ মতবাদ বুদ্ধিশক্তির বিলাস ব্যতীত আর কিছু নহে।[২১]

[২০] আমরা এখানে উদাহরণ স্বরূপ পরলোকগত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের অভিমত উল্লেখ করিতে পারি: "কেহ কেহ অনুমান করেন, বুদ্ধদেবের ধর্ম কোঁৎ ধর্মেরই পূর্বরূপ—অর্থাৎ বুদ্ধদেবও দৃষ্টবাদী ছিলেন। এ অনুমান ভিত্তিহীন। যে বুদ্ধদেব বলিতেন—দৃষ্টের চেয়ে অদৃষ্ট অনেক বড়, যিনি চর্মচক্ষুর পশ্চাতে দৈবচক্ষুঃ মানিতেন, যে বুদ্ধদেব প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই 'জাত-ভূত-কৃত-সংখত' বিশ্বের পশ্চাতে এক 'অজাত-অভূত-অকৃত-অসংখত' শাশ্বত সত্তা বিদ্যমান আছে—তাঁহাকে দৃষ্টবাদী বলা খুব সাহসিকতা নয় কি ?" (দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ৪৬)।

[২১] এইজন্য A. T. Boisen সমাজবিদ্যা ও মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন: "Religions in which the idea of a personal God does not appear are religions of an intellectualist aristocracy." (*Religion in Crisis and Custom*, p. 197).

(পাঁচ)

আধুনিক যুগের একদল লেখক বলেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা অলীক, অসার বা কোন অভিসন্ধি-প্রসূত। এই সব মতবাদ গৃহীত হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন থাকে না এবং বর্ত্তমান আলোচনাও নিরর্থক হয়। এইজন্য আমরা পরিশেষে অতি সংক্ষেপে ঈশ্বরবাদী ধর্ম্মের সমালোচনাকারী কয়েকটি মতবাদের উল্লেখ করিব।

১। মনঃসমীক্ষণ-প্রণালীর উদ্ভাবক জিগ্‌মুণ্ড্‌ ফ্রয়েড্‌ বলেন ঈশ্বরের কল্পনা নিতান্তই অলীক, এবং এই কল্পনা আমাদের নির্জ্জ্ঞানস্তরে বিরাজমান অপূরিত বাসনা-পূরণের ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মানুষ কঠোর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে নিতান্ত একা দেখিয়া বড়ই বিব্রত বোধ করে। কোন শিশু যখন নিজেকে একা মনে করে, তখন কল্পনার মানসনেত্রে সে অনেক সঙ্গী দেখিতে পায়। সেইরূপ নির্বান্ধব নিরুপায় মানুষ স্নেহ, ভালবাসা লাভ করিবার আশায় জগৎ-পিতার অস্তিত্ব কল্পনা করে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া ফ্রয়েড্‌ মনে করেন ধর্ম্ম অলীক কল্পনাবিলাস মাত্র; আজকের দিনে মানুষের কর্তব্য বীরদর্পে জগতের প্রতিকূল শক্তির সম্মুখীন হওয়া।[২২]

আমরা ইহার বিরুদ্ধে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিব :

(ক) কোন বিশেষ সঙ্গীহীন শিশুর সঙ্গী সম্বন্ধে কল্পনা কি যুগ যুগ ধরিয়া সমগ্র মানবজাতির ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কল্পনার সমতুল্য ? আজও মানুষ কেন এই অসার কল্পনায় নিমগ্ন আছে ? মানবজাতি আজও কেন এই মানসিক বিকারে ভুগিতেছে ?

(খ) যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার করা যায় যে নির্জ্জ্ঞানস্তরে থাকিয়া অবদলিত ইচ্ছাগুলি সর্বদাই তৃপ্তির পথ খুঁজিতেছে এবং যদি বলা যায় যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণা অতৃপ্ত বাসনা পূরণের চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহা কি মানিতে হইবে যে, যেহেতু আমরা কোন কিছু ইচ্ছা করিতেছি, সেই হেতু তাহা মিথ্যা ? আমরা প্রকৃত বস্তু ইচ্ছা করিতে পারি আবার অলীক বস্তুও ইচ্ছা

---

[২২] ফ্রয়েড ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন তাঁহার *The Future of Illusion* গ্রন্থে। মানুষের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "Man cannot remain a child for ever, he must venture at last into the hostile world." (পৃঃ ৮৬)।

করিতে পারি। একমাত্র বাস্তবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নিরূপণ করিতে হইবে আমাদের ইষ্ট বস্তু সত্য না মিথ্যা।

(গ) ফ্রয়েড তাঁহার বিরুদ্ধ সমালোচনার জন্য যে সব তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা তিনি বিশেষ নিরপেক্ষ দৃষ্টি হইতে করেন নাই। ধর্ম্মের উদ্ভাবনের সহিত অনেক অবাস্তব অসার কল্পনা ও কুসংস্কার জড়িত আছে—ফ্রয়েড সেইগুলিই লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু উচ্চতর স্তরে পবিত্রচেতা মানুষের অন্তরে কিরূপ বিশুদ্ধ ধর্ম্মীয় অনুভূতির আবির্ভাব হয়, তাহা তিনি দেখেন নাই।[২০]

(ঘ) তাহা ছাড়া ধর্ম্মীয় জীবনের কতকগুলি মনোভাব সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করেন নাই এবং সেগুলি অসার প্রতিপন্ন করেন নাই। আমাদের ধর্ম্মীয় জীবনে অনুতাপ, ক্ষমাভিক্ষা, আত্মনিবেদন ইত্যাদির যে বাসনা জাগে তাহা তিনি অস্বীকার করেন নাই।[২১]

২। অতি আধুনিক মার্ক্সীয় মতবাদের প্রভাবে একদল বলেন যে সেশ্বর ধর্ম্ম পালন অহিফেন সেবনেরই নামান্তর। ইঁহারা মনে করেন, দরিদ্র জনসাধারণের নিপীড়নের প্রচেষ্টা হইতেই ধনিক সম্প্রদায় কর্তৃক ধর্ম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাই সাধারণ মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূলে আছে ভয়।

(ক) আমরা এই ক্ষেত্রে এইটুকু মাত্র মন্তব্য করিব যে মানুষের ইতিহাসের সহিত সমান্তরাল হইল ধর্মের ইতিহাস। ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ গঠনের

[২০] এইজন্য Samuel M. Thompson দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন: "...... he (Freud) saw the frequent close relation of religious ideas with neurotic syndromes. But nowhere in Freud's principal writings is there the slightest indication that he ever dreamed of what religion at its best means to men and women whose religious faith feels itself completely at home and entirely secure in the company of their own highly developed critical intelligence." (*A Modern Philosophy of Religion*, p. 135).

[২১] ফ্রয়েড সম্বন্ধে T. R. Miles বলেন "......... as far as the central religious notions of repentence, forgiveness, commitment, and dedication are concerned, there is nothing in psycho-analytic theory—any more than in any other factual investigation—to prove or even make plausible the view that such ideas are unimportant or that a life which gives expression to these ideas is the wrong sort of life to live." (*Religion and Scientific Outlook*, p. 133).

বহু পূর্ব্ব হইতেই কোন না কোন ভাবে ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখা যায়। (খ) তাহা ছাড়া, উচ্চতর ধর্ম্মের ভিতর আমরা কোন নিপীড়নের পরিচয় পাই না; বরং উচ্চতর ধর্মে প্রেম, ভালবাসা, দয়া, করুণা ইত্যাদি সম্বন্ধেই শিক্ষা দান করা হয়। ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত ব্যক্তিরা সদ্‌গুণেরই ধারক ও বাহক। (গ) ধর্ম্মের ইতিহাসে এমন দেখা যায় না যে সমাজের একদল (অর্থাৎ 'শোষিত দল') ধর্ম্মের আচারাদি পালন করিতেছে এবং অপর দল (অর্থাৎ 'শোষকবর্গ') ঐ সম্বন্ধে উদাসীন; বরং সমাজের সকলকেই সধারণতঃ কিছু না কিছু আচারাদি পালনে আগ্রহান্বিত দেখা যায়। (ঘ) ধর্ম্মপ্রচারের মূলে সকল সময় অত্যাচার ও শোষণের ইচ্ছা থাকে তাহা নহে (যদিও ধর্মের নামে অনেক সময় অত্যাচার হইয়াছে ইহা স্বীকার্য্য), বরং ইতিহাস অনুধাবন করিলে দেখা যায় ধর্মপ্রচারকেরা নিজেরাই অনেক সময় অত্যাচারিত হইয়া থাকেন। (ঙ) ঈশ্বরসাধনা-লিপ্ত মানুষ যে কত মহান্ হইতে পারেন আবার ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জাগরিত হওয়ায় কত মানুষ যে পাপকার্য্য হইতে বিরত হইয়াছে তাহা ইঁহারা লক্ষ্য করেন নাই।[২২]

৩। সমসাময়িক কালের দৃষ্টবাদীরা (logical positivists) বলেন যে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় বচন অর্থহীন, কারণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে ঐরূপ বচনের যাথার্থ্য নির্ণয় করা যায় না।[২৩]

ইঁহাদের সমালোচনার উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতাই সকল বচনের সত্যাসত্য নির্ণয়ের একমাত্র উপায় নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে "কোন বচন ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গৃহীত না হইলে অর্থপূর্ণ হইবে না" —তাঁহাদের এই মতবাদ কিরূপে সত্য বলিয়া তাঁহারা মনে করেন? নিশ্চয় এই সার্ব্বিক বচনটী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গৃহীত হয় নাই। ইঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান অভিযোগ হইল যে, অভিজ্ঞতা যে বাহ্যেন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ হইতে পারে, তাহা ইহারা ভাবিয়া দেখেন নাই।

৪। অনেকে আবার শেষ পর্য্যন্ত এইটুকু স্বীকার করেন যে ধর্ম্মের একমাত্র

[২২] এইজন্য D. E. Trueblood মন্তব্য করিয়াছেন: "It has nei her the belief in the inherent dignity of man as a child of God nor the belief in n.an's chronic sin, which is an antidote to self-righteousness. In short, it misses both sides of Pascal's famous paradox : it sees neither the essential greatness nor the essential misery of man."(*Philosophy of Religion*, p. 176).

[২৩] A. J. Ayer, *Language, Truth and Logic*, pp. 114, 115.

উদ্দেশ্য সামাজিক-বন্ধন রক্ষা করা। সেই কারণে কেবল মাত্র সামাজিক আদর্শের রক্ষক হিসাবে কতকগুলি নিয়মপালন করিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে যদিও ধর্ম্মের বন্ধনে সামাজিক বন্ধন আসিতে পারে, যাহাই সামাজিক বন্ধন আনে তাহাই ধর্মপদবাচ্য হইতে পারে না। সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করিতে পারা যাইবে, এই উদ্দেশ্য লইয়া কেহ ধর্মের পথে অগ্রসর হয় না।[২৭]

(ছয়)

উপসংহারে আমরা বলিতে চাই যে ঈশ্বরকে বাদ দিয়া ধর্ম্মগঠন সম্ভব নহে। ঈশ্বরভক্তিই ধর্মের সার এবং উহাতেই পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ঈশ্বরকে বাদ দিয়া নৈতিক জীবনের মধ্যেই ধর্মকে সীমিত রাখিলে উহা বিশ্বের অপর অংশের সহিত মানুষের নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝাইতে পারে না, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, আকর্ষণ ও সেবার কোন স্থায়ী অনুপ্রেরণা দান করিতে পারে না, অহং-এর ক্ষুদ্র সীমা লঙ্ঘন করিয়া ব্যক্তিত্ব প্রসার লাভ করিতে পারে না, মানুষ আত্মিক উন্নতির পথে সমধিক অগ্রসর লাভ করিতে পারে না, মানুষের অন্তরের সুকোমল বৃত্তিগুলি যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি পায় না, মানুষ অন্তরে প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করে না এবং মনুষ্য সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় হয় না। তাই বলি, ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া ধর্মরচনার চেষ্টা অপক্ব বুদ্ধির অত্যাচার বিশেষ।

[২৭] প্রখ্যাতনামা সমাজ-মনোবিৎ Allport তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন: "The social scientist argues that the function of religion is to produce social stability. Yet no individual, I venture to assert, is religious for any such reason. Indeed, most people would discard their religion if they thought it was merely a device to keep them out of the hands of the police and out of their neighbour's hair." (*The Individual and his Religion*, p. 25).

দর্শনের ইতিহাস

শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য

আমাদের দেশের বহুলোকের ধারণা এই যে দর্শন শব্দের মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য নিহত আছে—উহাতে সত্যদ্রষ্টা মুনিঋষিদের সাক্ষাৎ উপলব্ধ পরমতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এবং এই জন্যই ইহার এত মূল্য ও আদর; কিন্তু পাশ্চাত্য ফিলসফি হইতেছে পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকজন বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তির স্বাধীন-তর্কপ্রসূত বিবিধ কল্পনা-জল্পনার সংগ্রহমাত্র; উহার মূলে পরমতত্ত্বের অনুভূতি না থাকায়, উহার তেমন কিছু মূল্য নাই। এই ধারণা বস্তুতঃ সঙ্গত কিনা, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। কিন্তু যে যুক্তিতে, এইভাবে ইউরোপীয় দর্শনকে অবজ্ঞা করা হয়, সেই যুক্তিটি হয়ত, ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সে যাহা হউক, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের এই নিন্দাবাদ সমূলক হইলে, সাধারণতঃ যাহা দর্শনের ইতিহাস নামে খ্যাত, তাহা বিশেষভাবে এই নিন্দার পাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কারণ শুধু কয়েকজন প্রথিতযশা ব্যক্তির মতামতের সংগ্রহদ্বারা প্রকৃত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

কিন্তু দর্শনের, (বিশেষতঃ ইউরোপীয় দর্শনের), ইতিহাস কেবল ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিকের মতামতের বিবরণী নিশ্চয়ই নহে। এমন কি কোন দেশের সাধারণ ইতিহাসও অতীত ঘটনা সমূহের সংগ্রহমাত্র নহে। এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, যদি দর্শনেতিহাস দার্শনিক মতের বিবরণী মাত্র না হয়, তাহা হইলে উহার বিজ্ঞান—সম্মত প্রকৃত ধারণাটি কি, এবং উহার সহিত দর্শন শাস্ত্রেরই বা সম্বন্ধ কি?

দর্শনেতিহাসের নির্দোষ লক্ষণ দেওয়া আমার পক্ষে দুরূহ। সুতরাং আমি দর্শন, উহার ইতিহাস, ও এই দুইটির মধ্যে সম্বন্ধ বলিতে কি বুঝি, তাহার একটি মোটামুটি বিবৃতি দেওয়ার চেষ্টা করিব।

দার্শনিকের বিশিষ্ট কাজটি হইতেছে এক প্রকার আত্মচেতনা অর্থাৎ নিজেকে কিংবা নিজের অনুভবকে জানার ক্রিয়া। আহার, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিমূলক অথবা নীতিমূলক, কিংবা সৌন্দর্য্যবোধমূলক, অথবা ধর্মমূলক, যে-রকম

জীবনই হউক না কেন, মানুষ যখন শুধু ঐরূপ জীবন যাপনেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, কিন্তু এইরূপ জীবন-যাপনের কোন পারমার্থিক মূল্য অথবা সার্থকতা আছে কিনা, তাহা জানিতে চাহে, তখনই এই আত্মচেতনারূপ দার্শনিক চিন্তার উদয় হয়। জীবনের মূল্য বা প্রয়োজনের এই প্রশ্ন পরম তত্ত্ব অথবা সত্যের স্বরূপের সহিত নিগড়িতভাবে জড়িত; আর মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে, দর্শনের উদ্দেশ্য হইতেছে পরম মূল্যের দিক্ হইতে অন্তিম সত্যের স্বরূপ নির্ধারণ। পরম তত্ত্বের মূল্যসম্পর্কিত স্বরূপের জ্ঞান দর্শনের প্রথম উদ্দেশ্য হইলেও, উহার অপর একটি উদ্দেশ্য ও আছে; এবং বহুক্ষেত্রে দার্শনিক প্রচেষ্টা প্রধানতঃ; এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়। দর্শনের এই উদ্দেশ্যটি হইতেছে বিজ্ঞতা অথবা প্রত্যক্ষ জীবনের উপযোগী একপ্রকার ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ। দার্শনিক তাহার তত্ত্ব-জ্ঞান হইতে জীবনযাপনের এমন একটি সাধারণ পদ্ধতি বাহির করিতে প্রয়াসী, যাহা দ্বারা মানবজীবনে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ যাহা কিছু পাওয়া সম্ভবপর, তাহা লাভ করা যাইতে পারে। দর্শনচিন্তার এই ব্যবহারিক উদ্দেশ্য প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় ভূ-খণ্ডেই, কম বা বেশী পরিমাণে, স্বীকার হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইহা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে, দর্শন কিংবা তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতেছে নিঃশ্রেয়স্ অথবা পরমপুরুষার্থলাভ। ইংরাজী ফিলসফি শব্দটি গ্রীক্ ভাষা হইতে গৃহীত। উহার বুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে বিজ্ঞতা কিংবা সুবিবেচনার প্রতি প্রেম ও নিষ্ঠা। কিন্তু প্রাচীন গ্রীস দেশে এই মূল অর্থ ছাড়াও, ফিলসফি বলিতে এমন একপ্রকার জীবনকলা কিংবা জীবন যাপনের কৌশল বুঝাইত, যাহা তত্ত্বজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য পাশ্চাত্ত্য দেশে ফিলসফি শব্দদ্বারা বিশ্বের সম্বন্ধে এমন একটি ব্যাপক দৃষ্টি বুঝায়, যাহা মানবজীবনকে, যতখানি সম্ভবপর ততখানি শান্তি ও সুখের দিকে লইয়া যাইতে সমর্থ। অবশ্য, আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশের বহু বুদ্ধিমান দার্শনিক পণ্ডিত এইরূপ তত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়া, দার্শনিকগণ সচরাচর যে-সকল বাক্যে দর্শনের সমস্যা ও তাহার সমাধান ব্যক্ত করেন, সেই সকল বাক্য বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের আদৌ কোন অর্থ আছে কিনা, তাহা নির্ণয় করা, এবং তজ্জন্য ভাষার স্বরূপ-বিশ্লেষণ করা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। তাই দর্শনের বর্তমান যুগকে কেহ 'বিশ্লেষণের যুগ' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই বিশ্লেষণের যুগে, দার্শনিক আলোচনার ব্যবহারিক উদ্দেশ্যটি ভুলিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যদি কেহ দর্শনের এই উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে মনে না রাখিয়া, দর্শন চর্চা করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তিনি নিজে কি করিতেছেন, তাহাই-

জানেন না, এবং এইরূপ উদ্দেশ্যহীন দর্শনচর্চায় যতই বিচার-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হউক না কেন, তাহার ফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হওয়াই স্বাভাবিক।

আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, আত্মচেতন মানুষের উক্ত মূলগামী ব্যবহারিক প্রয়োজন হইতে দর্শনের উৎপত্তি। দর্শনের এই মূলগামী প্রয়োজনদ্বারাই দর্শনেতিহাসেরও সীমারেখা নির্ধারণ করিতে হইবে। সম্ভবতঃ ললিতকলা এবং ধর্মও একই চরম উদ্দেশ্য-সাধনে তৎপর। সুতরাং উহাদের ও বিষয় বস্তু হইতেছে পদার্থসমূহের পারমার্থিক মূল্য ও প্রকৃত স্বরূপ। আবার দর্শনের ন্যায় উহাদের মধ্যেও উক্ত স্বরূপ ও মূল্য সম্বন্ধে বিবিধ দৃষ্টি ও ধারণা লক্ষিত হয়। তাই দর্শনেতিহাসের লেখক ধর্ম ও ললিতকলা হইতে ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তথাপি দর্শনেতিহাস যে ললিতকলা এবং ধর্মেরও ইতিহাস, তাহা নহে। উদ্দেশ্য এক হইলেও, উদ্দেশ্য-সাধনের প্রণালী বিভিন্ন বলিয়া, উহাদিগকে পরস্পর হইতে পৃথক্ করা সম্ভবপর। প্রথম দুইটি প্রধানতঃ সৌন্দর্য্যবোধ, কল্পনা ও হৃদয়া-বেগের অনুশীলন; আর তৃতীয়টি হইতেছে জ্ঞান-বৃত্তির অনুশীলন। হয়ত, অধিকাংশ লোকের পক্ষে, পুরুষার্থলাভের জন্য এই তিনটি উপায়ের সম্মিলনই বিশেষভাবে ফলপ্রদ। তথাপি উপায়গুলি পরস্পর হইতে পৃথক্; এবং এই পার্থক্যহেতু কলা, ধর্ম এবং দর্শন, এই গুলি ও পরস্পর হইতে পৃথক্।

কিন্তু দর্শনের ন্যায়, বিজ্ঞান-ও প্রধানতঃ জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলন; তাই দর্শনকে বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ করা তেমন সহজ নহে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উভয়েই মানবীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রভাবিত না হইয়া, শুধু জ্ঞানের আলোকে সদ্বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করিতে সচেষ্ট হন। শুধু জ্ঞানলাভের জন্যই হউক, অথবা এই জ্ঞানকে অন্য কোন কাজে লাগাইবার জন্যই হউক, সদ্বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ নির্ধারণের আদর্শ দ্বারাই সত্যানুসন্ধান-কারীর সর্বপ্রযত্ন পরিচালিত হওয়া উচিত। তথাপি দার্শনিক প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক-প্রচেষ্টা হইতে পৃথক্ করা সম্ভবপর। যদিও বহু স্থলে, কোন না কোন ব্যবহারিক প্রয়োজনই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রেরণা যোগায়, তথাপি মনে হয় যে, বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক-প্রচেষ্টার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে কেবল সত্য নির্ধারণ, অন্য কিছু নহে। এই দিক্ হইতে দর্শনের সাদৃশ্য শুদ্ধ-বিজ্ঞানের সহিত ততখানি নহে, যত খানি ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সহিত, অর্থাৎ এডিসন, মারকনি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ যে-প্রকার বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেন, তাহার সহিত। অবশ্য, এই ব্যবহারনিষ্ঠ উদ্দেশ্য সত্বেও, দর্শনের প্রথম কার্য্য হইতেছে সত্য নির্ধারণ, এবং এই কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য উহাকে, অন্যান্য জ্ঞানীয় প্রচেষ্টার

মতই, রাগদ্বেষ-বিবর্জ্জিত, পক্ষপাতহীন যুক্ত্যনুগত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়।

কিন্তু দর্শনকে ব্যবহারিক-বিজ্ঞান হইতে কি করিয়া পৃথক্ করা যাইবে? তাহা উহাদের উদ্দেশ্যগত ভেদের সাহায্যে করিতে হইবে। ব্যবহারিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হইতেছে সর্বসাধারণ মানুষ অথবা কোন বিশিষ্ট মানব সমাজ অথবা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাহা মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তাহাকে বাস্তব আকার দান করিবার উপায় নির্দেশ করা। আর দর্শনের উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্ যাহা কিছু লাভ করা সম্ভবপর, তাহার প্রণালী নির্দেশ করা।

ধর্ম্মের সহিত দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতে কেহ কেহ মনে করেন যে, দর্শনের কোন স্বতন্ত্র ও স্বাধীনসত্তা নাই, শুধু ধর্মের অনুচর রূপেই উহার সার্থকতা, এবং উহার একমাত্র যোগ্য কার্য্য হইতেছে যুক্তি দ্বারা ধর্মমতের সমর্থন ও তাহতে লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করা। কিন্তু এই কথা ভুল। যুক্তিদ্বারা ধর্মমত সমর্থন করা যায়, ইহা মানিয়া লইলে, ইহাও স্বীকৃত হয় যে, দর্শনের প্রণালীদ্বারা ও স্বতন্ত্রভাবে সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভবপর, কারণ ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি যেকথার সত্যতা নিজে প্রত্যক্ষভাবে না জানিয়া শুধু শাস্ত্রে কিংবা গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবশতঃ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন, দার্শনিক তাহাই যুক্তি সম্মত বিচার দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে চাহেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভেচ্ছু সচেতন মানুষের যে মূল ব্যবহারিক প্রয়োজন ইহাতে দর্শনের উৎপত্তি, তাহাদ্বারাই দর্শনেতিহাসের পরিসর সীমাবদ্ধ। এখন দর্শনেতিহাসের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। কলিংউড্ বলিয়াছেন, দার্শনিকরা যে অতীতের আলোচনা করেন, তাহা বিগতপ্রাণ অতীত নহে, কিন্তু সেই অতীত বর্ত্তমানেও কোন এক অর্থে জীবন্ত; ইতিহাস হইতেছে ঐতিহাসিকের মানস রঙ্গমঞ্চে অতীত অনুভবের পুনরাভিনয়। সকল ইতিহাস সম্বন্ধেই কলিংউডের এই মত ঠিক হউক বা না হউক, অন্ততঃ দর্শনেতিহাস সম্বন্ধে এই মতটি সমর্থনীয় বলিয়া মনে হয়। দর্শনের ইতিহাস-রচয়িতা যখন অতীত যুগের দার্শনিক চিন্তাগুলি নিজে পুনরায় চিন্তন করিতে সমর্থ হন, শুধু তখনই উহারা প্রকৃত দর্শনেতিহাস নামের যোগ্য। সব দার্শনিক চিন্তারই উদ্দেশ্য হইতেছে সত্তার মূল্য-সম্পর্কিত স্বরূপ নির্ণয়। এই সাধারণ উদ্দেশ্যবশতঃ দর্শনের ইতিহাস কখনও পরস্পর-অসম্বদ্ধ কতকগুলি মতের সংগ্রহমাত্র নহে; বরং উহা এই সাধারণ উদ্দেশ্যবশতঃ একটি ঐক্যযুক্ত বিজ্ঞান। সুতরাং যাহারা দার্শনেতিহাস প্রণয়ন করেন, তাহারা দার্শনিকের কাজই করিয়া থাকেন।

পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ ঐক্যযুক্ত বৈজ্ঞানিক দর্শনেতিহাস রচনার চেষ্টা বর্তমান যুগেই করা হইয়াছে, প্রাচীন কালে নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সময় হইতেই বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়ের মতসমূহের সংক্ষিপ্ত সংগ্রহরূপে এমন কতকগুলি পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, যেগুলি কিয়ৎপরিমাণে বৈজ্ঞানিক দর্শনেতিহাস নামের যোগ্য। অবশ্য এই সকল পুস্তকে কালের পৌর্বাপর্য রক্ষিত হয় নাই। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে পৌর্বাপর্যের এই ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাব প্রায় সর্বত্র লক্ষিত হয়। তথাপি ভারতবর্ষে যে 'সর্বদর্শনসংগ্রহ', 'দর্শনসমুচ্চয়', প্রভৃতি কিয়ৎ পরিমাণে বৈজ্ঞানিক দর্শনেতিহাস নামের যোগ্য গ্রন্থের রচনা সম্ভবপর হইয়াছিল, তাহার কারণ এই যে, প্রাচীন কাল হইতেই এই দেশে দর্শনের একটা চরম উদ্দেশ্য সকলেই স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেন। বলা বাহুল্য যে এই উদ্দেশ্য ছিল মুক্তি, কৈবল্য বা নির্বাণ।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক দর্শনেতিহাসের প্রকৃত ধারণাটি সর্বপ্রথম উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেলই আমাদের সম্মুখে স্পষ্টভাবে রাখিয়াছেন। দর্শনেতিহাস যে কেবল কয়েকজন নরনারীর বিভিন্ন মতামতের একটি আমোদজনক সংগ্রহ মাত্র নহে, এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটির দিকে হেগেলই সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে হেগেলের অপর একটি নূতন মতও অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর অর্থপূর্ণ। তিনি বলেন: মানুষ যুগে যুগে সদ্বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া যেভাবে তাহাকে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল বৌদ্ধিক ধারণায় উপনীত হইয়াছে, এবং সদ্বস্তুর সংস্পর্শে তাহার সমগ্র জীবনে যে সকল প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সকল অনুভব, ধারণা ও প্রতিক্রিয়ার অভ্যন্তরে প্রজ্ঞার (অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বোধশক্তির) কতকগুলি মূল প্রকার অথবা প্রণালী নিহিত থাকে। হেগেলের নূতন মতটি এই যে, প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত জগতের দার্শনিকগণ আমাদিগকে যে সকল চিন্তা উপহার দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রজ্ঞার এই সকল প্রণালী বা প্রকার একটির পর অন্যটি, এইরূপ নির্দিষ্ট অনুক্রমে, স্পষ্ট ও বিবিক্ত আকার ধারণ করিয়াছে। অবশ্য জগতের দার্শনিকরা সজ্ঞানে একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তত্ত্ব-বিচার করেন নাই। তথাপি হেগেলের এই মতের সাহায্যে আমরা দর্শনেতিহাসের একটি স্পষ্ট ও যোগ্য ধারণা গঠন করিতে পারি: জগতের প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং জগতে মানুষের স্থানই বা কি, সে-সম্বন্ধে যুগে যুগে মানুষ যে সকল মতে উপনীত হইয়াছে, তাহাদিগকে সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে অধিকাধিক স্পষ্ট আকার দেওয়ার যে প্রচেষ্টা তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিকগণ করিয়াছেন, তাহারাই

ধারাবাহিক শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ব্যাখ্যাযুক্ত বিবরণী হইতেছে প্রকৃত দর্শনেতিহাস। এইরূপ আদর্শানুসারে যে দর্শনেতিহাস রচিত হইবে, তাহা প্রত্যেক জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির (বিশেষতঃ দার্শনিক জ্ঞানলাভেচ্ছু ব্যক্তির) পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

অবশ্য দর্শনেতিহাসের তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্য, হেগেল যে একটি বিশিষ্ট বিচার-প্রণালী প্রয়োগ করার কথা বলিলেন, তাহা আরও দূরগামী। এই বিচারপ্রণালী হেগেলীয় দর্শনের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাই এখানে উক্ত দর্শন সম্বন্ধে অন্ততঃ দুই-চারিটি কথা বলা আবশ্যক মনে হইতেছে। আমাদের দেশে অদ্বৈত-বেদান্তীরা বলেন, যে, সদ্বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ হইতেছে চৈতন্য বা জ্ঞান, তেমনই হেগেলও বলেন যে, উহার স্বরূপ একপ্রকার জ্ঞান। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মতে এই চরম চৈতন্যের কোন জ্ঞাতা নাই, উহার জ্ঞেয় কোন বিষয়ও নাই, উহা সর্বভেদবিমুক্ত এক-রস ও নির্বিশেষ শুদ্ধচৈতন্য মাত্র ; এবং ভেদযুক্ত আমাদের দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা। অপর দিকে, হেগেলের মতে জগতের জ্ঞানরূপ চরমতত্ত্বে ভেদযুক্ত বিচিত্র বিশ্বেরও স্থান আছে। অবশ্য তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিশ্ব জড় নহে, কিন্তু চৈতন্যময়। ইহার অনুরূপ দর্শনও ভারতবর্ষে দেখা যায়। ইহার সহিত হেগেল অপর এমন একটি মতও পোষণ করেন, যাহার পূর্বাভাষ প্রাচীন গ্রীক দর্শনে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ভারতীয় দর্শনে হয়ত পাওয়া যাইবে না। আমরা এখানে এই মত সত্য কি ভ্রান্ত, সে সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজনীয়তা দেখিতেছি না। কিন্তু মতটি বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের সহিত বিশেষভাবে সম্পর্কিত। মতটি এই বিশ্বের চরম তত্ত্বরূপে নির্দিষ্ট উক্ত জ্ঞানের স্বরূপ হইতেছে এক প্রকার বিচারাত্মক যৌক্তিক বুদ্ধি, যে বুদ্ধিতে সদ্বস্তুবিষয়ক আমাদের সর্ব মৌলিক ধারণাগুলি পরস্পরের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হইয়া নিহিত থাকে যে, উহাদের যে কোন একটি হইতে অন্য সকলগুলিকে তর্কশাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে নিষ্কাশিত করা সম্ভবপর। সাধারণ মানুষের বুদ্ধিও এই যৌক্তিক বুদ্ধিরই অস্পষ্ট এবং অবিকাশিত অবস্থা। দর্শন শাস্ত্রের কাজ হইতেছে মানুষের সাধারণ বুদ্ধিকে উক্ত স্পষ্ট ও বিকশিত যৌক্তিক বুদ্ধির স্তরে উন্নীত করা। বিশুদ্ধ বিচার বা যৌক্তিক চিন্তার দ্বারা মানবীয় জ্ঞানের মূল ধারণাগুলিকে একটি নিঃসন্দিগ্ধধারণা হইতে আরম্ভ করিয়া, যৌক্তিক ধারায়, একের পর এক, এইভাবে নির্দিষ্ট ক্রমে, সুবিন্যস্ত করিতে পারিলেই, উক্ত যৌক্তিক বুদ্ধির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এখন, হেগেলের বক্তব্য এই যে, পূর্ণ দার্শনিক বিচারে, মানবীয় জ্ঞানের মূল ধারণাগুলির মধ্যে যে বিশিষ্ট যৌক্তিকক্রম দৃষ্ট হয়, মানবীয়

চিন্তার ইতিহাসেও ঐ ক্রমই অবশ্যম্ভাবী, এবং প্রকৃত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এই যুক্তি-সিদ্ধ ক্রমই পরিলক্ষিত হইবে। হেগেলের এই মত দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, এক অর্থে, দর্শনের ইতিহাস ও দর্শন পরস্পর হইতে অভিন্ন; দর্শনের ঐতিহাসিক যে কাজ করেন দার্শনিকও সেই কাজ করেন। আধুনিক কালে, কলিংউড্ আরও এক ধাপ অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন যে, কেবল দর্শনেতিহাস নহে, উপরন্তু ইতিহাস মাত্রই দর্শনের সহিত অভিন্ন; অর্থাৎ ঐতিহাসিকের কাজ এবং দার্শনিকের কাজ একই। আমি এখানে এই মত দুটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার চেষ্টা করিব না; কিন্তু এই মতগুলির মধ্যে যেটুকু সত্যাংশ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা অত্যন্ত সংক্ষেপে নির্দেশ করিব।

হেগেল তাহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, লজিকে (যুক্তিবিজ্ঞানে), স্বীয় দ্বন্দ্বমূলক যৌক্তিক প্রণালী অনুসারে মানবীয় চিন্তার মূল ধারণাগুলিকে যে বিশিষ্টক্রমে উপস্থাপিত করিয়াছেন, সেই বিশিষ্ট ক্রমেই যে দর্শনের ইতিহাসেও তাহারা অভিব্যক্ত হইয়াছে, হেগেলের এই মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমর্থন করা কঠিন। যে কোন পক্ষপাতহীন ইতিহাসজ্ঞ এই কথা বলিবেন। ইতিহাসে, মানবীয় চিন্তার বিকাশ যে বিশিষ্টক্রমে ঘটে, তাহা কিয়দংশে ন্যায়শাস্ত্রীয় বিচারদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেও, বহুলাংশে মানুষের এমন কতকগুলি প্রয়োজন ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে, যেগুলি বুদ্ধি-বিচারের কোন ধার ধারে না। বহুস্থলে, এই সকল প্রযোজন ও প্রবৃত্তি তত্তৎকালীন বিশিষ্ট অর্থনীতি ও রাজনীতি ও তদানুষঙ্গিক সংস্কৃতির স্বাভাবিক ফলমাত্র। অবশ্য দর্শনশাস্ত্রীয় মতামত যে এইরূপ যুক্তিশাস্ত্র-বহির্ভূত কারণদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, স্বয়ং হেগেলও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই মতও পোষণ করিতেন যে, দার্শনিক চিন্তার ঐতিহাসিক ক্রম এবং উহার যৌক্তিক ক্রমের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন আনুরূপ্য আছে। আরও এক কথা: দার্শনিক চিন্তার যুক্তিশাস্ত্র-বহির্ভূত কারণগুলির মধ্যে শুধু যে মানুষের সাংসারিক প্রয়োজন ও প্রবৃত্তিই গণনা করিতে হইবে, তাহা নহে। বহু সময়ে দর্শনে নূতন মতের উৎপত্তি কোন প্রতিভা-শালী ব্যক্তির জন্মজাত অভিরুচি, বিশিষ্ট শিক্ষা দীক্ষা ও নিয়মাতিগ প্রাতিভ অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। এই সকল যুক্তিবহির্ভূত ও অনিয়ত কারণদ্বারা দার্শনিক চিন্তা যে সর্বদা ঠিক পথে চালিত হয়, তাহাও নহে। সুতরাং দার্শনিক চিন্তার যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক ক্রম অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করা অসম্ভব। বস্তুতঃ, যুগে যুগে দার্শনিক চিন্তার যে বিকাশ হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা করাও কষ্টসাধ্য যে, উহা চিন্তার ভিন্ন ভিন্ন অনেক ধারার দ্বারা পরিপুষ্ট একটি প্রশস্ত

প্রবাহ। বরং ইতিহাসে চিন্তার বিকাশ যেভাবে ঘটিয়াছে তাহা দেখিয়া, উহাকে পরস্পর হইতে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত কয়েকটি নদীর সহিত তুলনা দেওয়াই অধিক সঙ্গত হইবে। যদিও এই নদীগুলি প্রায়ই পরস্পরকে ছেদ করে এবং পরস্পরের সহিত মিলিত হয়, তথাপি মোটের উপর উহারা তাহাদের স্বতন্ত্রগতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই প্রবাহিত হয়। হয়ত, তাহারা একই সমুদ্রে গিয়া পতিত হইবে; কিন্তু দর্শনেতিহাসের গবেষক আজ পর্য্যন্ত এই সমুদ্রের স্পষ্ট সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আমার কথার সূচিতার্থ এমন নয় যে, আমি দার্শনিক চিন্তার বিকাশে যুক্তি-বিচারের অস্বীকার করিতেছি। এই ব্যাপারে যুক্তি-বিচারের প্রভাব নিশ্চয়ই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রথমতঃ প্রত্যেক দর্শনেরই আদর্শ হইতেছে সদ্বস্তু সম্বন্ধে এমন একটি পূর্ণধারণায় উপনীত হওয়া, যাহার কোথাও কোন যৌক্তিক অসঙ্গতি নাই এবং যাহার প্রত্যেক অংশ অন্যান্য অংশের সহিত যৌক্তিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ, যে কোন নূতন দর্শন সম্বন্ধেই স্থূলভাবে বলা চলে যে, উহা তাহার সমকালীন অথবা অব্যবহিত পূর্ব-কালীন অন্য কোনও প্রচলিত দর্শনের সংশোধিত ও অধিক ন্যায়শাস্ত্রানুগ রূপান্তর মাত্র।

সুতরাং দর্শনেতিহাসে যেমন চিন্তার বিকাশে যুক্তি বিচারের প্রভাব নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন, তেমনই অপর দিকে, যুক্তি বিচারের বহির্ভূত যে সকল কারণ দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাও নির্দেশ করা দরকার। অবশ্য দর্শনের ঐতিহাসিকরা প্রধানতঃ প্রথমটির দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। চিন্তার বিকাশে দ্বিতীয় প্রকার কারণগুলি আবিষ্কার করার উদ্দেশ্য হইতেছে, উহাদের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক মতবাদে যে সকল মুখ্য ধারণা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাঁহাদের অর্থ ও তাৎপর্য্য নির্ণয় করা। কিন্তু এত সব করারও অন্তিম উদ্দেশ্য হইতেছে ঐ ধারণাগুলিকে বিশুদ্ধ ন্যায় শাস্ত্রের এবং মানুষের সাচ্চা অনুভূতির কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া দেখা। ইহা স্পষ্ট যে, দর্শনের ঐতিহাসিকের নিকট এই অন্তিম উদ্দেশ্যটি অধিক মূল্যবান। দর্শনেতিহাসের অধ্যয়ন শুধু তখনই সম্পূর্ণ সফল হইবে, যখন সমালোচনা ও পরীক্ষার দৃষ্টিতে আমরা উহাতে বিবৃত প্রত্যেকটি মতবাদের স্বরূপ ও মূল্য এবং উহা কতদূর গ্রহণযোগ্য, তাহা হেতুনির্দেশ পূর্বক নির্ণয় করিতে পারি। আবার এইরূপ সমালোচনামূলক মূল্যনির্দ্ধারণের জন্য এমন একটি নিজস্ব দার্শনিক মত প্রয়োজনীয়, যাহার তুলাদণ্ডে উক্ত মূল্য নিরূপণ সম্ভবপর। দর্শনেতিহাস অধ্যয়ন করিবার সময়, যদি আমরা সঙ্গে সঙ্গে উহা বুঝিবার, সমালোচনা করার এবং সঙ্গে

সঙ্গে ঐ সম্বন্ধে নিজেরও একটি মত গঠন করিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে উহা সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ হইবে। সম্ভবতঃ ইহা বলাও ঠিক হইবে যে, সমালোচনা ও নিজস্ব মত গঠনের চেষ্টা ব্যতীত দর্শনেতিহাস অধ্যয়ন করার কোন দর্শনোপযোগী সার্থকতা নাই। সুতরাং দার্শনিক বিচার ও দর্শনেতিহাস অভিন্ন না হইলেও দ্বিতীয়টির মধ্যে প্রথমটিও উহার একটি অবশ্যম্ভাবী অঙ্গরূপে অন্তর্ভুক্ত।

শুধু তাহাই নহে। ইহার বিপরীত কথাটিও সত্য। অর্থাৎ নিজের পূর্ববর্তী মতবাদের যথাযোগ্য ঐতিহাসিক চর্চা ও আলোচনা ব্যতীত খাঁটী দার্শনিক মত গঠন করাও অসম্ভব। একটু অনুধাবন করিলেই ভাবী দার্শনিক দেখিতে পাইবেন যে, তিনি যে বৌদ্ধিক পরিবেশে মানুষ হইয়াছেন, তাহাতে পূর্ব হইতেই কিছু দার্শনিক মতও ধারণা অল্লাধিক সুচিন্তিত, সুবিন্যস্ত ও ঐক্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল মত পূর্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে সমালোচনা করিবার কোন হেতু না থাকিলে, উহাদের মধ্যে কোন দোষ ত্রুটি পরিলক্ষিত না হইলে, নূতন মত গঠনের আদৌ কোন প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু যে সকল ন্যায়শাস্ত্রীয় যুক্তি এবং অন্য কারণবশতঃ উক্ত মতগুলির উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছিল, সেই সকল যুক্তি ও কারণের সাহায্যে উহাদের প্রকৃত অর্থ না জানিয়া, উহাদের যোগ্য ও ফলপ্রদ সমালোচনা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ কোন প্রাচীন দার্শনিকের মত সার্থকভাবে সমালোচনা করিতে হইলে তাহার সমকালীন ও পরবর্তী অন্যান্য দার্শনিকগণ উক্ত মত কিভাবে সমর্থন ও প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও জানা দরকার। অর্থাৎ যে কোন প্রাচীন দার্শনিক মতের যোগ্য ও সার্থক সমালোচনা দর্শনেতিহাসের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। আমার বক্তব্য শুধু ইহা নয় যে, দর্শনেতিহাসের অধ্যয়ন দার্শনিক বিচারের সহায়ক। আমি ইহাও সূচিত করিতে চাহি যে, পূর্ববর্তী দার্শনিকদের নিকট হইতে আমরা যে সকল মত ও ধারণা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি, সেইগুলি ব্যবহার না করিয়া, আমাদের পক্ষে আদৌ কোন দার্শনিক চিন্তা করা সম্ভবপর নহে। বর্তমান কালে যে ব্যক্তি দার্শনিক বিচার করিবেন, তাহার পক্ষে পূর্ববর্তী দর্শনের বিচার ও ধারণার সাহায্য গ্রহণ একেবারে অপরিহার্য্য। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, আমরা যত বেশী সচেতনভাবে এই সাহায্য গ্রহণ করিব, ততই আমাদের দার্শনিক বিচার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে। "দার্শনিক বিচারের অর্থ হইতেছে দার্শনিকের দৃষ্টিতে দর্শনেতিহাস অধ্যয়ন করা"*

*"The Political Philosophies of Ploto and Hegel"—by M. B. Foster, P. vii

অবশ্য উদ্ধৃত বাক্যটিকে দার্শনিক বিচারের তর্কশাস্ত্র-সম্মত লক্ষণ বলিয়া মনে করা ঠিক হইবে না। উহাতে শুধু দর্শন ও দর্শনেতিহাসের মধ্যে যে একটী নিয়ত ও অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ আছে, তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে।

এই সম্বন্ধটিকে নিয়ত ও অপরিহার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ দার্শনিক অন্য কিছু করুক বা না করুক, তাহাকে অন্ততঃ নিজের অনুভবটুকু বিচার করিয়া দেখিতে হয়; আর কলিংউড ঠিকই বলিয়াছেন যে, প্রত্যেকের বর্তমান অনুভবের মধ্যে তাহার অতীত অনুভব ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট; আবার তাহার অতীত অনুভবের মধ্যে তাহার পূর্বপুরুষদের অনুভব অনুপ্রবিষ্ট; নিজের চিন্তা সম্বন্ধে বিচার করার অর্থই হইতেছে পূর্ববর্তীদের চিন্তা সম্বন্ধেও বিচার করা। এই কথা সত্য হইলে, পূর্ববর্তীদের চিন্তার স্পষ্ট ও সম্যক জ্ঞানকে নিজের চিন্তাবিষয়ক জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মানিতে হইবে। আমি এইরূপ বলিতেছি না যে, সর্ব দার্শনিক সমস্যা অতীতকালেই সঠিকভাবে উপস্থাপিত করিয়া, উহাদের সন্তোষজনক সমাধানও দেওয়া হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানের দার্শনিকের একমাত্র কর্তব্য হইতেছে এই সকল সমস্যা ও সমাধান পুনরায় বুঝিয়া লওয়া। প্রকৃতপক্ষে, জীবন্ত বিচার বা চিন্তা কখনও পূর্ববর্তী চিন্তার যন্ত্রোৎপাদিত প্রতিলিপি সদৃশ নহে। এমন কি, যাহাকে মোটামুটিভাবে একই দার্শনিক সমস্যা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, তাহাও একই ব্যক্তির নিকট জীবনের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে, কিছু পৃথক্ আকারে, দেখা দেয়। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, দার্শনিকদের মধ্যে যাহারা প্রতিভাশালী ও মৌলিক চিন্তার অধিকারী, তাহাদিগকেও তদীয় পূর্ববর্তী কিংবা সমকালবর্তী অন্যান্য দার্শনিকের চিন্তার সহিত সজ্ঞানে তুলনা করিয়া ও মিলাইয়া মিশাইয়া স্বস্ব সমস্যা ও তাহার সমাধান ভাবিতে হয়—পূর্ববর্তী দার্শনিকদের দ্বারা সঞ্চিত চিন্তার পরিবেশ ব্যতীত নূতন দার্শনিক চিন্তা সম্ভবপর নহে।

সুতরাং দর্শনেতিহাস ও দর্শনের অভিন্নতা প্রতিপাদক হেগেলীয় মতে যেটুকু সত্যাংশ আছে তাহা হইতেছে উহাদের পরস্পরের মধ্যে উপরিবর্ণিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সকলদিক বিবেচনা করিয়া আমার ইহাই মনে হয় যে, একদিকে মৌলিক চিন্তা ব্যতীত দর্শনেতিহাসের প্রকৃত অধ্যয়ন অসম্ভব, আবার অপরদিকে, সজ্ঞানে দর্শনেতিহাসের সাহায্য না লইয়া মৌলিক দর্শন বিচারও সম্ভবপর নহে।

প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে যদি দর্শনেতিহাসের সহিত দর্শনের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পক্ষে দর্শনেতিহাসের জ্ঞান

অত্যাবশ্যক। তাহা ছাড়া, এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখিয়া যে দর্শনেতিহাস লিখিত হইবে, তাহাতে বর্তমান বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ধর্মে ব্যবহৃত মুখ্য মুখ্য ধারণাগুলির উৎপত্তি ও বিকাশের বর্ণনা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে; সুতরাং এইরূপ দর্শনেতিহাসের জ্ঞান স্বভাবতঃই সর্বপ্রকার সংস্কৃতি ও সাধারণ শিক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইতে বাধ্য।

বিশেষতঃ, যেহেতু আজকাল দর্শনের বড় দুর্দিন চলিতেছে এবং দার্শনিক বিচার সম্বন্ধে লোকের আস্থা প্রায় নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, অতএব দার্শনিক তত্ত্ববিচারে সভ্য মানবের অভিরুচি বাঁচাইয়া রাখিবার কাজে দর্শনেতিহাসের সম্যক অধ্যয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে বলিয়া মনে হয়। এই কথা বলা আবশ্যক যে, বর্তমান যুগে সংস্কৃতির সর্ববিধ শাখার মধ্যে বিজ্ঞানের মূল্য ও স্থান সর্বাপেক্ষা বেশী। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যাহারা দর্শন বিদ্যার চর্চা করেন ও শিক্ষা দেন, তাহাদের মধ্যেও এমন অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন যাহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে, সদ্বস্তু সম্পর্কে মানুষের বুদ্ধিতে যাহা কিছু জানা সম্ভবপর, কেবল বিজ্ঞানই আমাদিগকে তাহা দিতে পারে, এবং দার্শনিক বিচার ও চিন্তা জ্ঞানশক্তির একটি একেবারে নিষ্ফল ব্যবহার। কিন্তু দর্শনবিচারে রত আমার মত এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যাহারা এখনও দার্শনিক চিন্তার কার্য্যকারিতায় আস্থা হারায় নাই। তাহারা যদি দার্শনিক চিন্তার পবিত্র অগ্নি জ্বলন্ত রাখিতে চায়, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা সহজ ও সরল উপায় হইবে, অধিকতর উৎসাহ, আগ্রহ ও সাবধানতার সহিত দর্শনেতিহাসের চর্চা করা। অবশ্য, দর্শনেতিহাসের অধ্যয়ন কখনও সম্পূর্ণভাবে দর্শনের স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ, ইতিহাস যাহাদের ব্যবসায় নহে, যদি দর্শনে তাহাদের অভিরুচি না থাকে, তাহা হইলে দর্শনের ইতিহাসে যে তাহাদের অভিরুচি খুব বেশি দিন থাকিবে, তাহা মনে হয় না। কিন্তু এই প্রবন্ধে দর্শনেতিহাসের যে স্বরূপ নির্ধারিত হইয়াছে, তাহা ঠিক হইলে দর্শনেতিহাসের অধ্যয়ন দ্বারা দার্শনিক বিচারের কার্য্যও সম্পাদিত হইতে বাধ্য।

দর্শনকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, মৌলিক দর্শনবিচারকেও বাঁচাইয়া রাখা প্রয়োজনীয়। কিন্তু যে বিগতকালীন চিন্তার আবহাওয়াতে ভাবী দার্শনিকের জন্ম, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া, মৌলিক চিন্তা অসম্ভব। বিগতকালীন চিন্তাই নূতন দার্শনিকের প্রেরণার উৎস। এই উৎস শুকাইয়া গেলে, তত্ত্ব চিন্তার প্রবাহও অনিবার্য্য ভাবে শুকাইয়া যাইবে। বোধ হয়, প্রধানতঃ এই কারণেই আধুনিক

ভারতবর্ষে প্রথমশ্রেণীর দার্শনিকের সংখ্যা প্রায় নগণ্য। আমরা যখন ইংরাজের অধীনস্থ ছিলাম, তখন পশ্চিম হইতে নূতন মত, ধারণা আমাদের দেশে আমদানি হইয়াছে সত্য; কিন্তু ব্রিটিশ পণ্যের আমদানি বশতঃ যেমন ভারতের কতকগুলি দেশী শিল্প ও কারিগরি বিদ্যা নষ্ট প্রায় হইয়া গিয়াছিল, তেমনই এই নূতন পাশ্চাত্য ভাব আমাদের মনের যৎ সামান্য প্রসারতা সম্পাদন করিলেও, উহা আমাদের দেশীয় চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের উপর অত্যন্ত প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই প্রতিকূল প্রভাবের হাত হইতে আমরা এখনও নিস্তার পাই নাই। পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত ভারতবাসী ভারতীয় দর্শনের মূল ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক চিন্তায় ক্ষমতাও হারাইয়া ফেলিল। অবশ্য কিছুকাল যাবৎ আমাদের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে, এবং আমরা ইহা বুঝিতে পারিয়াছি যে, বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও, বর্তমান যুগের দার্শনিক চিন্তায় ভারতীয়দের তেমন কিছু দাম নাই। তথাপি ভারতীয় দর্শনে আমাদের এই নবজাত অভিরুচি এখনও হৃদয়াবেগের স্তর অতিক্রম করে নাই; তাই উহা তেমন ফলপ্রদ হইতে পারে না। এই প্রকার ভাববিগলিত জ্ঞানাভিরুচি দোষের নহে; কিন্তু উহাকে যোগ্যভাবে শিক্ষিত ও যোগ্য কার্যে ব্যবহার না করিলে, উহা মানসিক আলস্য, সঙ্কীর্ণতা ও বৃথা দাম্ভিকতায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে যাহারা দর্শনের শিক্ষক, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অন্যের সাহায্য ব্যতীত আমাদের প্রাচীন দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি বুঝিতে অসমর্থ। ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যে কয়েকটি ইংরাজী গ্রন্থ আছে, আমরা সাধারণতঃ তাহাদের উপরই নির্ভর করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইংরাজীতে কিংবা (আমি যতদূর জানি) আমাদের কোন দেশীয় ভাষায়, ভারতীয় দর্শনের এমন একটিও ইতিহাস লিখিত হয় নাই, যাহা ইউরোপীয় দর্শনের উৎকৃষ্ট ইতিহাস গ্রন্থগুলির সহিত তুলনা করার যোগ্য। ঐ সকল পাশ্চাত্য গ্রন্থ উৎকর্ষের যে উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে, তাহার দিকে সামান্য কিছু অগ্রসর হইতে হইলেও, আমাদিগকে বেশ একটু পরিশ্রম ও গবেষণা করিতে হইবে। বহু সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আজও পাওয়া যায়, সেগুলি অত্যন্ত যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিয়া তত্তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ঐ সকল গ্রন্থের দার্শনিক মতামতের সম্যক্ অর্থ আবিষ্কার করিতে হইবে। শুধু এই ভাবেই, আমরা ভারতীয় দর্শনের এমন ইতিহাস লিখিতে পারিব, যাহা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে ইউরোপীয় দর্শনের

ইতিহাস গ্রন্থগুলির সমকক্ষ হইতে পারিবে। এবং আমরা যখন এইভাবে পুনরায় স্বদেশীয় চিন্তার আবহাওয়াতে প্রতিষ্ঠিত হইব, শুধু তখনই প্রকৃত মৌলিক দর্শন-চিন্তার অনুকূল পরিবেশ নির্ম্মিত হইবে। অন্যভাবে নহে।

কিন্তু ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, মানবীয় সভ্যতার বর্তমান যুগে, যখন বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতির মানুষ পরস্পরের এত নিকটে আসিয়াছে, তখন শুধু নিজ দেশের চারি সীমানার মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়া, সুষ্ঠুভাবে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করা সম্ভবপর। ইহাও বলা নিষ্প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ব্যতীত, জ্ঞানের কোন শাখাতেই আজ সফল চিন্তা সম্ভবপর নহে। আমাদিগকে ইউরোপীয় দর্শনের অধ্যয়ন অব্যাহত রাখিতে হইবে। বস্তুতঃ উহা আমাদিগকে আরও বেশী আগ্রহ ও যত্নের সহিত করিতে হইবে। কারণ জ্ঞানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেরা আধুনিক চিন্তার নায়ক। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, বর্তমান ইউরোপীয় দর্শনে সন্দেহের সুর এত বেশী যে, উহার তেমন কিছু মূল্য নাই। অবশ্য এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকার দর্শনে সংশয়বাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। আজকাল তত্রত্য দার্শনিকগণ নিজ নিজ মত সর্বদাই কিছু সন্দেহের সহিত উপস্থাপিত করেন, এবং কেহ নিঃসন্দিগ্ধভাবে কিছু প্রতিপাদন করিলে, তাহা নিন্দনীয় বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু আসলে, যে ব্যক্তি দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সন্দেহের সম্মুখে তাহার বিচলিত ও কুণ্ঠিত হইলে চলিবে কেন? তাহা ছাড়া, সংশয়ে কখনও দর্শনের মর্য্যাদাহানি হয় না কারণ সংশয় হইতেছে দার্শনিক মনোভাবের পরিপক্কতার অনিবার্য্য ফল। যুক্তিবিচার দ্বারা পরীক্ষা ও সমর্থন না করিয়া শুধু শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া কোন কথার সত্যতা গ্রহণ না করা, ইহাই ত প্রকৃত দার্শনিকের আদর্শ। তাহা ছাড়া, কোন মত শুধু পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা এবং সর্বদাই তাহার সংশোধন সম্ভবপর, এইরূপ মনে করা—ইহার একটি অত্যন্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্য আছে; কারণ অন্তিম মূল্য সম্বন্ধে লোকে যে বিবিধ অজ্ঞানমূলক মত পোষণ করে, তাহাতে গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা, বিদ্বেষ ও কলহের সৃষ্টি হয়; কিন্তু দার্শনিকের সংশয়মূলক উন্মুক্ত মনোভাব এইরূপ অন্ধশ্রদ্ধা ও গোঁড়ামির পরিপন্থী ও সত্যনির্ণয়ের বিশেষভাবে অনুকূল।

অবশ্য, আধুনিক সংশয়বাদের এমন একটি অবাঞ্ছিত দিকও আছে যাহাতে দর্শনের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা না কমিয়া পারে না। যাহারা দার্শনিকের নিকট জীবন যাত্রার উপযোগী কিছু পরামর্শ প্রত্যাশা করে, তাহারা এবং দর্শন শাস্ত্রের

অধ্যয়নকারীরাও কেবল সংশয়বাদে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং যদিও অন্ধ-শ্রদ্ধার বিরুদ্ধে দার্শনিককে অনবরত সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে (এবং এই সংগ্রামে দার্শনিকরা কিছু সফলকামও হইয়াছে বটে), তথাপি দর্শনের ইতিহাসে যে সকল সমস্যা চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের সমাধান বাহির করিবার জন্য দার্শনিককে অবিরত চেষ্টা করিতে হইবে। এই সকল সমস্যার নিঃসন্দিগ্ধ সমাধান হয় ত পাওয়া যাইবে না; তথাপি সমাধানগুলির স্বরূপ শুধু নেতিমূলক হইলে চলিবে না; যতদূর সম্ভবপর, উহাদিগকে ভাবাত্মকরূপে নির্ধারণ করিতে হইবে। আমার বিশ্বাস এই যে, দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত যদি দার্শনিক তাহার কার্য্য করিয়া যান, তাহা হইলে, জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে বর্তমান যুগের শিক্ষিত লোকরা যে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছে, এবং যে-বিশ্বাস তাহার পরিপূর্ণ জীবনের পক্ষে অত্যা-বশ্যক, তিনি তাহা অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে, ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন।

এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে দর্শনেতিহাসের অধ্যয়ন অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য, প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকদের দ্বারা লিখিত গ্রন্থসমূহের যথাযোগ্য অধ্যয়ন ও আলোচনা শুধু প্রয়োজনীয় নহে, উপরন্তু অপরিহার্য্য।

হোয়াইটহেড

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান যুগের দর্শনের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে দুর্বোধ্য হচ্ছে আলফ্রেড নর্থ হোয়াইট্‌হেডের দর্শন। অনেকের মতে এতো বড়ো মননশীল প্রতিভা এ যুগে আর নেই। কিন্তু তাঁর দর্শন ভালোভাবে বুঝেছেন এমন লোকের সংখ্যাও নাকি খুব বেশী নয়। তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে হোয়াইটহেডের লিখন ভঙ্গী মোটেই সুন্দর নয়। রাসেল, বার্গসঁ বা আলেকজাণ্ডারের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য, হোয়াইটহেডের ভাষা তেমনি জটিল ও অস্পষ্ট। দ্বিতীয়তঃ হোয়াইটহেড প্রধাণতঃই একজন গণিত-বিজ্ঞানী, এবং তাঁর দর্শন-আলোচনার মূল প্রেরণা এসেছে আধুনিক বিজ্ঞান থেকে। ফলে তাঁর আলোচনায় আধুনিকতম বিজ্ঞানের এমন কতকগুলি অতিসূক্ষ্ম ও অভিনব তত্ত্ব মিশে গেছে যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার অর্থ উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব বললেই হয়। তবে গাণিতিক পরিভাষা ও বৈজ্ঞানিক জটিলতার মধ্যে না গিয়ে সাধারণভাবে তাঁর বক্তব্যের মূলসূত্রটি অনুসরণ করা হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়।

অধ্যাপক হোয়াইটহেডের মানসিক অভিব্যক্তির তিনটি পর্যায় দেখা যায়। প্রথম পর্যায়ে তিনি একনিষ্ঠ গণিত বিজ্ঞানের সাধক। ষাট বছর বয়স পর্যন্ত তিনি কাটিয়েছেন বিশুদ্ধ গণিত চর্চা নিয়ে। রাসেলের সঙ্গে মিলে লেখা তাঁর এই পর্যায়ের গ্রন্থ Principia Mathematica (1910) হোয়াইটহেডের প্রতিভার অপূর্ব সাক্ষর হিসেবে পণ্ডিত মহলে স্বীকৃত হ'য়ে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে হোয়াইট-হেডকে আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানের সমালোচক রূপে। আধুনিক যুগের পদার্থ বিজ্ঞান ও আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এসে যে অভিনব কথা শোনালো তার তাৎপর্য কতো দূর-প্রসারী হ'তে পারে, এবং তার একটা দার্শনিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে—এই কথাটা হোয়াইটহেড অতি গভীরভাবে অনুভব করলেন। সেই অনুসারে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলো-চনায়; এবং সেই আলোচনার মাঝ দিয়েই দেখা দিলো তাঁর চিন্তার তৃতীয় পর্যায়।

এখানে এসে হোয়াইটহেড একান্তই এক গঠনমূলক দার্শনিক। অর্থাৎ, তৃতীয় পর্যায়ে হোয়াইটহেড গ'ড়ে তুললেন এক সামগ্রিক ও সর্বাঙ্গিক দর্শন। Process and Reality (1929) নামক বিখ্যাত গ্রন্থ দার্শনিক হোয়াইটহেডের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

গণিত বিজ্ঞানী হোয়াইটহেড সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেহেতু বিজ্ঞানের সমালোচনার মধ্য দিয়েই গ'ড়ে উঠেছে তাঁর দর্শন, সেইজন্য তাঁর চিন্তার দ্বিতীয় পর্য্যায় থেকে আমরা আমাদের আলোচনা আরম্ভ করবো।

বিগত যুগের বিজ্ঞানীরা বস্তুর স্বরূপ হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন নির্দিষ্ট কতক-গুলি পরমাণু। জগতের যে-কোন বস্তু নিয়ে বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলে শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে আমরা পৌঁছব, এবং যার পর আর অগ্রসর হওয়া যায়না, সেই অবিভাজ্য উপাদানের নাম পরমাণু। তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন, স্থির, ও অপরি-বর্তনীয়; এবং জগতের বিভিন্ন বস্তু হচ্ছে সেই পরমাণু সমূহের বিভিন্ন সমবায় মাত্র। কিন্তু বর্তমান যুগের গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান একথা আর স্বীকার করতে পারছেনা। জগতের মূল উপাদান পদার্থ—কোন স্থির, অচল জড় পদার্থ নয়। তার একমাত্র রূপ ও সংজ্ঞা হচ্ছে নিয়ত চঞ্চল এক শক্তিপ্রবাহ। অন্যান্য যে কোন জড় পদার্থের মতো পরমাণু যেমন সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট পরিমাণ একটি স্থান অধিকার ক'রে থাকে, নিয়ত চঞ্চল এই শক্তিপ্রবাহ সেরকম খণ্ডিত সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং বস্তু জগতের ব্যাখ্যা করতে হবে এই অখণ্ড শক্তি প্রবাহের দ্বারা। অর্থাৎ, এই জগৎ মূলতঃ হচ্ছে নিয়তপ্রবহমান এক সক্রিয় শক্তিলীলা। অবশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে হয়তো বস্তুর নিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন অবস্থিতির উল্লেখ করা প্রয়োজন হ'তে পারে। গত যুগের বিজ্ঞানেও হয়তো সে প্রয়োজন হয়েছিলো। সেটা খুব অন্যায় নয়। কিন্তু মারাত্মক ভুল হচ্ছে সেই নিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন অবস্থিতিকে প্রকৃত ও সম্পূর্ণাঙ্গ সত্য ব'লে মনে করা। হোয়াইটহেড এই ভুলের নাম দিয়েছেন fallacy of misplaced concreteness.

শুধু বিজ্ঞান নয়, দর্শনের ক্ষেত্রেও এই ভুলটি কীভাবে সংক্রামিত হ'য়েছে তার অন্যতম দৃষ্টান্ত হ'চ্ছে হিউমের (Hume) সংবেদনাবাদ (Sensationalism), আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে হিউম সংবেদনা বা ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের উল্লেখ করেছিলেন। পরস্পর বিচ্ছিন্ন একাধিক কতকগুলি সংবেদনা বা ইন্দ্রিয় প্রত্যয় একত্র সংযুক্ত হ'য়ে আমাদের মনে বস্তু জগতের জ্ঞান এনে দেয়। যেকোন

জ্ঞানের মূল উপাদান তারাই। কিন্তু হোয়াইটহেড বললেন যে, এই মৌলিক উপাদানগুলি কাল্পনিক। কেননা, ঐ প্রকার পরস্পর বিচ্ছিন্ন সংবেদনা বা ইন্দ্রিয় প্রত্যয় কখনই পাওয়া যায়না। কিন্তু হিউম বর্ণিত বিশুদ্ধ সংবেদনাগুলির পরস্পরের মধ্যে স্থানিক বা অন্য কোন সম্বন্ধই নেই: ভাবসাহচর্যনীতি (laws of association of ideas) দ্বারা তাদের মধ্যে হিউম যে সম্বন্ধের উল্লেখ করেছিলেন তা' নিতান্তই বাহ্যিক; ও সংবেদনাগুলির পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর। ঐ 'বিশুদ্ধ সংবেদনা' (pure sensation) দার্শনিক abstraction ভিন্ন আর কিছুই নয়। সুতরাং সংবেদনাগুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সেই বিচ্ছিন্ন সংবেদনাকে সত্য ব'লে মনে করায় এখানে fullacy of misplaced concreteness দেখা দিয়েছে।

এ বাদে, হোয়াইটহেড আমাদের সাধারণ চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার আর একটা মস্ত বড়ো বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। সে বৈশিষ্ট্য হ'চ্ছে 'প্রকৃতির দ্বিখণ্ডীকরণ (bifurcation of nature) নীতি। বিজ্ঞান স্বভাবতঃই তার সুবিধের জন্য প্রকৃতিকে দু'টি ভিন্ন অংশে বিভক্ত ক'রে থাকে। একটি অংশ হ'চ্ছে আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ জগৎ। আর অন্যটি হ'চ্ছে বিজ্ঞানে আলোচিত অতি সূক্ষ্ম অনুপরমাণুর জগৎ। সেই জগৎ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে। যেমন তাপ (heat)। যে-তাপ আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিষয় সে হ'চ্ছে একপ্রকার অনুভূতি; আর যে-তাপ বিজ্ঞানের আলোচ্য সে হ'চ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র অনুপরমাণুর গতি। কেননা, 'তাপ' জিনিষটির বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাই হ'লো এই। আবার ধরা যাক্ 'রং'। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে-জগৎ তা বহুবিচিত্র বর্ণময়; কিন্তু বিজ্ঞানের জগৎ বর্ণহীন। বিভিন্ন কতকগুলি আলোক তরঙ্গ বস্তুর উপর প্রতিফলিত হ'য়ে যখন আমাদের চোখে এসে লাগে তখনই আমাদের চেতনার মধ্যে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন বর্ণ। এই যে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার জগৎ, ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বাইরে অতি সূক্ষ্ম জগৎ—এই দু'য়ের পার্থক্যটি নিউটনও সমর্থন করেছিলেন। যে দেশ ও কাল আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে পাই, বিজ্ঞানে আলোচিত দেশ ও কাল তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, একথাটা তিনি স্বীকার করেছিলেন। লক্ (Locke) প্রভৃতি দার্শনিকেরা এবং আধুনিক কোন কোন জ্ঞানতত্ত্ববিদও প্রকৃতির এই দ্বিখণ্ডিত সত্তা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তাঁদের মতে মনের বাইরে মন-অতিরিক্ত প্রকৃতিতে আছে মাত্র কয়েকটি প্রাথমিক ধর্ম (primary qualities)। যেমন, গতি, ব্যপ্তি, সংখ্যা আকার। কিন্তু বর্ণ, রস গন্ধ ইত্যাদি হ'চ্ছে মানসিক ধর্ম; বস্তু জগতের মধ্যে কোথাও তাদের পাওয়া যাবে না। এই মানসিক গুণগুলিকে মনের বাইরে আমরা

প্রক্ষেপ করি বলেই বস্তুজগতটি আমাদের কাছে দেখা দেয় বর্ণ রস গন্ধময় রূপে।

তারপর বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের গবেষণাও আধুনিক বিজ্ঞানে এক যুগান্তর এনে দিয়েছে। বিশেষভাবে এইটেই প্রমাণিত হয়েছে যে, দেশ ও কাল সম্বন্ধে বিগত যুগের যে ধারণা তাকে নতুন ক'রে বিচার করার প্রয়োজন আছে। এতোদিন পর্যন্ত, দেশ ও কাল সম্বন্ধে বিজ্ঞানের যা ধারণা তার সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধির ধারণার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলো না। নিজের স্বকীয় প্রকৃতি ও অস্তিত্ব নিয়ে 'দেশ' নামক একটি পদার্থ আছে; আর ঠিক তেমনই নিজের স্বকীয় প্রকৃতি ও অস্তিত্ব নিয়ে আছে 'কাল' নামক আর একটি পদার্থ। দু'টিই বিশিষ্ট অস্তিত্ব, এবং একটির সঙ্গে অন্যটির তেমন কোন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নেই এবং যে-কোন একটির পরিমাপ অন্যটিকে বাদ দিয়েই সম্ভব। এই ছিলো নিউটন থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের সকলের ধারণা। কিন্তু বর্তমান যুগে আইনষ্টাইন ও অন্যান্য কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণায় দেখা গেলো যে, 'দেশ' ও 'কাল' নামে দুইটি আলাদা বস্তু নেই। দেশ ও কাল-য়ের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য সম্বন্ধ বিদ্যমান র'য়েছে। সুতরাং দূরত্ব ইত্যাদি 'দেশ'য়ের পরিমাপ করার সময়ে কালের গণনা বাদ দিয়ে তা করা যায় না। এবং কালের পরিমাপ নির্ণয় করার সময়ে অপরিহার্য হচ্ছে দেশের পরিমাণ। অর্থাৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বললেন যে, দৈর্ঘ, প্রস্থ ও গভীরতা—এই তিনটি অবয়ব নিয়ে যে সাধারণ বুদ্ধির 'দেশ' তার সঙ্গে, 'পারম্পর্য' রূপ একমাত্র অবয়ব নিয়ে স্বতন্ত্র যে কাল তার সম্বন্ধ অত্যন্ত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। ফলে দেশ ও কালকে আলাদা করে বিচার না ক'রে তাঁরা বললেন যে, প্রকৃত সত্য হচ্ছে, দৈর্ঘ, প্রস্থ, গভীরতা ও পারম্পর্য—এই চার অবয়ব বিশিষ্ট একটিই বস্তু, যার নাম 'দেশ-কাল' (space-time)। এই দিক থেকে আর একটু অগ্রসর হ'য়ে আইনষ্টাইন বললেন যে, নিউটন কল্পিত 'পরম দেশ' ও 'পরম কাল'-য়ের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। নিউটন তার বিজ্ঞানে পরম দেশ ও পরম কাল স্বীকার করেছিলেন। যে-কোন বস্তুর অতিরিক্ত অস্তনিরপেক্ষ যে নির্বিশেষ সাধারণ দেশ তারই নাম 'পরম দেশ'। নিউটন বাস্তব পদার্থের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—এই পরম দেশের উল্লেখ ক'রে। 'পরম দেশের বিশেষ কোন একটি অবস্থিতি আছে, বাস্তব পদার্থের এ একটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ব'লে তিনি মনে করতেন। আইনষ্টাইন যখন এই পরম দেশকে অস্বীকার করলেন তখন স্বভাবতঃই বাস্তব পদার্থেরও একটা নতুন সংজ্ঞা দেখার প্রয়োজন হ'য়ে পড়লো কিন্তু আইনষ্টাইন তা দিলেন না। হোয়াইটহেড এই দিক থেকে আইন-

ষ্টাইনকে সমালোচনা ক'রে বললেন যে, পরম দেশকে যদি অস্বীকার করতে হয় তা'হলে বিজ্ঞানে আলোচিত ও স্বীকৃত বাস্তব পদার্থকে স্বীকার করা চলে না। কেননা, সেই পদার্থের অস্তিত্ব নির্ভর করে নিউটন কল্পিত পরম দেশের উপর। আর বিজ্ঞানে আলোচিত ও স্বীকৃত বাস্তব পদার্থ হ'চ্ছে প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতার বাইরের জিনিষ। ফলে, যাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি সে হ'চ্ছে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ কতকগুলি ঘটনা (event) মাত্র—কোন বস্তু নয়। সুতরাং বিজ্ঞানে আলোচিত বস্তুকেও ব্যাখ্যা করতে হবে প্রত্যক্ষলব্ধ এই ঘটনার সাহায্যে। 'ঘটনার ধারণাটি হোয়াইটহেডের দর্শনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রে রয়েছে। কেননা, হোয়াইটহেডের মতে এই ঘটনাই হ'চ্ছে প্রকৃতির মৌলিক উপাদান। তার মানে এই যে, প্রকৃতিতে যেখানে যা আছে তার সকলেরই মূলে রয়েছে এই 'ঘটনা'; এবং এই ঘটনা থেকেই উদ্ভূত হ'য়েছে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তু। যা কিছু ঘটে তাকেই ঘটনা বলা যায়। এদিক থেকে দেখলে প্রত্যেক ঘটনার একটা স্থানও কালগত রূপ আছে। যে-কোন ঘটনাই হোক না কেন, তার অস্তিত্ব অভিব্যক্ত হয় বিশেষ একটি কাল ও বিশেষ একটি স্থানের মধ্যে। অর্থাৎ, প্রত্যেক ঘটনার স্থানগত ও কালগত এই দুইটি দিক আছে। কিন্তু ওরা' যে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র তা নয়। স্থান ও কাল যেহেতু পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, সেইজন্যই বরং বলা উচিত যে, প্রত্যেক ঘটনার স্থান-কালগত একটি ঐক্যমূলক রূপ আছে। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি ঘটনাই আবার স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সসীম। কাজেই যে কোন একটি ঘটনা থেকে অন্য যে কোন আর একটি ঘটনার পার্থক্য সহজেই চিনে নেওয়া যায়। অবশ্য এই বৈশিষ্ট্যের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকটি ঘটনা, অন্য যে কোন ঘটনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও নিরপেক্ষ। বরং প্রকৃত সত্য হ'চ্ছে এই যে, প্রত্যেকটি ঘটনা অন্য যে কোন এবং সমস্ত ঘটনার সঙ্গেই অতি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে সংযুক্ত হ'য়ে রয়েছে; এবং সেইভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগের মধ্য দিয়ে সমগ্র জগতের সঙ্গেই তারা জড়িত হ'য়ে রয়েছে। এই পারস্পরিক সম্বন্ধের দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে, প্রত্যেকটি ঘটনা যেন অন্যান্য সমস্ত ঘটনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে রয়েছে। এই যে অনুপ্রবিষ্ট থাকা ঘটনার এই বৈশিষ্ট্যের নাম ব্যাপ্তি (extension).

প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তির ধারণা বাদ দিয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা কোন ঘটনাই যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, তা হ'লে তাদের মধ্যে একটি সংযোগসূত্র থাকবেই। সেই সংযোগসূত্র হ'চ্ছে ব্যাপ্তি। অর্থাৎ ব্যাপ্তি হ'লো বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে একপ্রকার সম্বন্ধ। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এই সম্বন্ধের ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠেছে

পরিদৃশ্যমান এই বস্তু জগৎ। কী ভাবে তা সম্ভব হ'য়েছে তা হোয়াইটহেড তার extensive abstraction নামক অতিশয় জটিল এক পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে বিশদভাবে দেখিয়েছেন। প্রত্যেকটি ঘটনার এক দেশকালগত ঐক্যমূলক সত্বা আছে—একথা আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, দেশ অথবা কাল কেউই ঘটনার সারধর্ম (essence) নয়। নিজস্বরূপে 'ঘটনা' দেশকা পূর্ব অস্তিত্ব। আর, প্রকৃতি যেহেতু ঘটনার জাল ভিন্ন কিছু নয়, তখন প্রকৃতির অস্তিত্ব যে দেশ ও কালের মধ্যে বিধৃত হ'য়ে আছে একথা আমরা বলতে পারিনা। বরং বলা উচিত যে, দেশ ও কালই বিধৃত হ'য়ে আছে প্রকৃতির মধ্যে। ঘটনা ঘটে বলেই দেশ ও কালের অস্তিত্ব আছে; এবং ঘটনাই হ'লো প্রকৃতির মূল উপাদান। আর, আধুনিক বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা আগেই দেখেছি যে, প্রকৃতির মূল উপাদান হিসেবে কোন অচল স্থির জড়পদার্থকে স্বীকার করা যায় না। সুতরাং হোয়াইটহেড বললেন যে তিনি যে ঘটনাকে প্রকৃতির মূল উপাদান বলছেন তাও অচল স্থির নয়। গতিশীলতা ও প্রবাহ তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিরন্তর এক প্রবাহের মাঝ দিয়ে সে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। কিন্তু সেই অগ্রগতির ফলে তার প্রকৃতিগত সারধর্মের কোন পরিবর্তন হয়না। শুধুমাত্র বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের পরিবর্তন হ'তে থাকে। হোয়াইটহেড এই পরিবর্তনের নাম দিয়েছেন passage। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ঘটনা যেন সব সময়েই অন্য ঘটনার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, ও তার মধ্যে নিজেকে বিলীন ক'রে দিচ্ছে। কাজেই বলা যায় যে, ঘটনা যতোক্ষণ স্বরূপ আছে ততোক্ষণই সে আছে; তার পরিবর্তন হওয়া মানেই অন্য ঘটনার মধ্যে তার বিলীন হয়ে যাওয়া। এখন 'ঘটনা' যদি হয় চিরচঞ্চল গতিশীল তাহলে জগত ও নিশ্চয়ই অচলায়তন (block univetse) হ'তে পারেনা। সেও অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এই এগিয়ে চলাকে হোয়াইটহেড বলেছেন সৃজনশীল প্রগতি (creative advance). কেননা, এগিয়ে চলার পথে কোন স্তরেই পুরনো স্তরের পুনরাবৃত্তি হয়না। প্রত্যেকটি মুহূর্তই সেখানে অভিনব।

প্রকৃতির দ্বিখণ্ডীকরণ নীতির বিরুদ্ধে হোয়াইটহেড যে সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন তারই ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠেছে তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব। প্রকৃতির দ্বৈত সত্তা যদি অমূলক ও অসত্য হয় তাহলে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই দু'টি বিষয়কেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মনে করা চলে না। জ্ঞাতা নিজেই জ্ঞেয় জগতেরই অন্তর্গত একটি অংশ। সুতরাং বলা যায় যে, জ্ঞাতার মনের মধ্যে বস্তুজগতের যে-জ্ঞান সে হ'চ্ছে নিজের

বিশেষ একটি অংশের মধ্যে বস্তুজগতের নিজেরই প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ, জ্ঞান হ'চ্ছে প্রকৃতির নির্দিষ্ট একটি অংশের সঙ্গে বাকি সমগ্র অংশের একটি সক্রিয় সম্বন্ধ। জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে যে পার্থক্য সাধারণতঃ আমরা কল্পনা করে থাকি হোয়াইট হেডের এই মত অনুসারে সে রকম কোন পার্থক্য বাস্তবিকই নেই। কেননা, জ্ঞান যদি হয় অংশের সঙ্গে সমগ্রের সক্রিয় সম্বন্ধ তাহলে বলা যায় যে, জ্ঞান হ'লো কর্মেরই অন্য দিক মাত্র। এই কথাটা আমরা সব সময়ে উপলব্ধি করিনা বলেই জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা গুরুতর একটা ভুল করে থাকি। সে হ'চ্ছে এই যে, জ্ঞান যে শুধুমাত্র বহির্মুখীন নয়. জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতাকেও যে সে প্রকাশ করে এই সত্যটি আমরা লক্ষ্য করি না। প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়প্রত্যয়ের মধ্যে একটা দ্বিমুখিনতা আছে। তার একদিকে রয়েছে জ্ঞেয় বস্তু আর অন্য দিকে রয়েছে জ্ঞাতার শরীর। জ্ঞান ক্রিয়ার দ্বারা এই উভয়ই প্রকাশিত হয়। যেমন আমি হয়তো একটি টেবিল স্পর্শ করছি। এই স্পর্শের ফলে যেমম আমি সচেতন হচ্ছি টেবিলটির বৈশিষ্ট্য (যেমন ঠাণ্ডা, মসৃণ ইত্যাদি) সম্বন্ধে তেমনই আবার সচেতন হচ্ছি নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে। কেননা ঐ টেবিলটির অনুভূতি আমারই অনুভূতি. এবং আমারই স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে সেই অনুভূতি আসছে। সুতরাং, ঐ টেবিলটির জ্ঞানের মাঝ দিয়ে যেন আমার আত্মজ্ঞান ঘটছে। অর্থাৎ মন ও বস্তুকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনে বিভিন্ন দিক থেকে ঠিক সেই চেষ্টাই করা হ'য়েছে। কাণ্টতো স্পষ্টই বলেছিলেন যে, বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ মনের অতীত ; তাকে জানা জায়না। যে জগৎ আমরা জ্ঞানের মধ্যে পাই সে হচ্ছে মনের সৃষ্টি। কাণ্টের দর্শনে তাই মনের প্রধান্য বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হ'য়েছে। কিন্তু মনের উপর এই গুরুত্ব আরোপ করা হোয়াইটহেড পছন্দ করেন না। তিনি বললেন যে বস্তু জগৎ তো মনের সৃষ্টি নয়ই, বরং মনই হ'চ্ছে বস্তু জগতের সৃষ্টি। কেননা, বস্তু জগতের পটভূমি বাদ দিয়ে মনের কোন অর্থই হয়না। এই দিক থেকে হোয়াইটহেড স্পষ্টতঃই বস্তুবাদের সমর্থক। জ্ঞেয় বস্তুজগৎ যে জ্ঞাতার উপর নির্ভরশীল এই আত্মভিত্তিক মতবাদের বিরুদ্ধে হোয়াইটহেড উপস্থিত করলেন তার আত্মনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তুজগৎ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘোষণা করলেন যে, সেই স্বতন্ত্র বস্তুজগতকে জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মধ্যে যাকে পাওয়া যায় না, কোন দর্শন অথবা বিজ্ঞানে তার স্থান নেই। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বাইরে আর কিছু নেই, কিছু নেই, কিছু নেই'—এই হ'লো হোয়াইটহেডের উক্তি। এই দিক থেকে তিনি হিউমের সমর্থক।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের এই যে সমালোচনা, এরই ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠেছে হোয়াইট্‌হেডের দর্শন। এবং একেই আমরা উল্লেখ করেছি হোয়াইট্‌হেডের চিন্তার তৃতীয় পর্যায় বলে। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রথম কথা হ'লো এই যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্ন স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্থির কোন জড় পদার্থকে হোয়াইট্‌হেড প্রকৃতির মূল উপাদান বলে স্বীকার করেন নি; এবং তাঁর দর্শনেও সেই একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন তিনি। কোন কিছুই স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অন্যনিরপেক্ষ বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকটি বস্তু অন্য বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে রয়েছে। এবং এই অনুপ্রবেশ সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত রয়েছে বস্তুর অর্থ ও তাৎপর্য। এই তৃতীয় পর্যায়ে দর্শনের ক্ষেত্রে এসে হোয়াইট্‌হেড এই সম্বন্ধের ভিত্তিতে জগৎকে বর্ণনা করলেন অবয়বী সমগ্র (organic whole) বলে। একটি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির প্রত্যেকটির একটি বিশিষ্ট রূপ ও কার্য আছে; কিন্তু সমগ্র শরীরের অংশ হিসেবেই তাদের মূল্য ও সার্থকতা। তেমনি আবার ঐ অংশগুলির পরস্পর সম্বন্ধ ও ঐক্য নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে সমগ্র শরীরটি। অংশ ও সমগ্রের মধ্যে ঐ পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতা, এবং একের মধ্য দিয়ে অন্যের সার্থকতা—এই হ'লো শারীরির বৈশিষ্ট্য। হোয়াইট্‌হেড যখন বললেন যে এই জগতটা একটা শরীরি, তখন তিনি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইলেন। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠেছে এই জগৎ। হেগেলও এই কথা বলেছিলেন। অংশকে বাদ দিয়ে সমগ্রের অর্থ হয় না; আর সমগ্রের আলোকেই পাওয়া যায় অংশের অর্থ ও তাৎপর্য। অংশের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক (ও অংশের সঙ্গে সমগ্রের বিভিন্ন সম্পর্ক—এর দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন হেগেল। অর্থাৎ, হেগেলের জগৎও অবয়বী সমগ্র। কিন্তু সে জগতে গতি নেই, নেই নব নব সৃষ্টি প্রবাহ। হেগেল সে জগৎ কল্পনা করেছিলেন একটি পরিপূর্ণ সমগ্র (completed whole) রূপে। আর, হোয়াইট্‌হেডের সমগ্র ক্রমপ্রবাহমান ও সৃজনশীল। হেগেলের দর্শনে বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও অংশের সঙ্গে সমগ্রের সম্পর্ক নিষ্ক্রিয়। সম্পর্কটি 'আছে'। কিন্তু হোয়াইট্‌হেডের দর্শনে সমগ্রটি সক্রিয়। অর্থাৎ ঐ সম্পর্কটি শুধুই 'আছে' নয়। বিভিন্ন অংশগুলি সেই সম্পর্ক ক্রমাগত গ'ড়ে তুলতে তুলতে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। হেগেলের দর্শনে এর নাম আভ্যন্তরীন সম্পর্ক (internal relation); আর হোয়াইটহেডের দর্শনে এর নাম 'নিজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করা' (prehension)। এ জিনিষটি আবার দু'প্রকার—স্বীকৃতি

সূচক ও অস্বীকৃতি সূচক। প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গে অন্য যে-কোন বস্তুর সম্বন্ধ আছে। যেমন, কোন একটি কবিতার অন্তর্গত একটি শব্দ। ঐ শব্দটির সঙ্গে কবিতার অন্তর্গত অন্য সমস্ত শব্দগুলির একটি সম্বন্ধ আছে; এবং তারই ভিত্তিতে গ'ড়ে উঠেছে ঐ কবিতাটি। ঐ শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য নিজের মধ্যে নেই, আছে সমগ্রভাবে ঐ কবিতাটির মধ্যে। এখানে ঐ শব্দটি এবং কবিতাটির মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা স্বীকৃতিসূচক। ঠিক এই প্রকার স্বীকৃতিসূচক সম্বন্ধ দেখা যাবে বস্তুজগতের যে-কোন বস্তুর সঙ্গে অন্য যে-কোন বস্তুর। কিন্তু যদি বলি টেবিলটি গোল নয়, তাহলে তার অর্থ হবে এই যে, গোলত্ব নামক সম্ভাবনাটির সঙ্গে টেবিলটি যে সম্পর্ক তা স্বীকৃতিসূচক নয়। অর্থাৎ, টেবিলটির সঙ্গে অনন্ত সম্ভাবনা বা শাশ্বত বিষয়ের সম্পর্ক নির্বাচনমূলক। অন্যান্য সম্ভাবনাকে বর্জন করে মাত্র একটি বিশেষ সম্ভাবনা সেখানে অভিব্যক্ত হ'য়েছে। এই নির্বাচনমূলক বর্জন করা হ'লো অস্বীকৃতিসূচক ভাবে নিজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করা (negative prehension), কোন একটি বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করতে হ'লে সে বস্তুর ইতি-লক্ষণ-গুলি জানাও যেমন প্রয়োজন, তার নেতি-লক্ষণগুলি জানাও তেমনি প্রয়োজন। আর, নেতি-লক্ষণগুলিই হ'লো অস্বীকৃতি সূচক ভাবে নিজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করা।

এখন, এই যে অন্য বস্তুকে নিজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করা (স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি উভয় দিক থেকে) এ একটা ক্রিয়া। হোয়াইটহেড একে বর্ণনা করেছেন অনুভূতি (feeling) বলে। কেননা, মানুষের ক্ষেত্রে যে মানসিক ক্রিয়াকে অনুভূতি বলা হয়, তার সঙ্গে এই ক্রিয়ার কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃতির দ্বিখণ্ডিকরণনীতির বিরুদ্ধে হোয়াইটহেড যে-প্রতিবাদ ক'রেছেন এ কথাটা তারই থেকে এসেছে। প্রাণ ও জড়ের মধ্যে কোথাও যদি ঐক্য না থাকে তাহ'লে তাদের পরস্পরের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। ফরাসী দার্শনিক দেকার্টে জড় (matter) ও প্রাণ (life)-য়ের মধ্যে দেখেছিলেন অনতিক্রম্য এক ব্যবধান। এ দু'য়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে জড় ও প্রাণের মধ্যে ঐক্য পেতে হ'লে এমন একটি সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেতে হবে যা এই দুই ক্ষেত্রেই বর্তমান আছে। হোয়াইটহেড বললেন সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হ'লো অনুভূতি ক্রিয়া। মনের এই ক্রিয়াটিই আদি ও সাধারণ, এবং অচেতন (unconciousness)। এখন, অনুভূতি যদি হয় জড় ও প্রাণের সাধারণ লক্ষণ তাহ'লে বলা যায় যে, সমগ্রভাবে জগতের মৌলিক রূপ অচেতনা, চেতনা হ'লো তার এক অভিব্যক্তি মাত্র।

আমরা দেখেছি যে, হোয়াইটহেডের মতে প্রকৃতির মৌলিক উপাদান হ'চ্ছে

ঘটনা, এবং এই ঘটনা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গম্য বস্তু। এখন তৃতীয় পর্যায়ে এসে সেই ঘটনাকে হোয়াইটহেড উল্লেখ করলেন বাস্তব সত্বা (actual entity) বলে ; এবং তার সঙ্গে যোগ করলেন আর একটি ধারণা—শাশ্বত বিষয় (eternal object). সবচেয়ে মৌলিক ও পরম যে বস্তু সমূহ দ্বারা এই জগৎ গঠিত তাদেরই নাম বাস্তব সত্বা। জগতের মৌলিক উপাদান হিসেবে তাদের বাইরে আর কিছু নেই। অতি তুচ্ছতম অস্তিত্ব থেকে যাবতীয় অস্তিত্ব সেই বাস্তব সত্বার অন্তর্গত। অর্থাৎ যে-কোন বস্তু আসলে হ'চ্ছে অনেকগুলি বাস্তব সত্বার সমবায়। যেমন একটি টেবিল। আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সামনে ঐ টেবিলটি বেশ কিছু পরিমাণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এ দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে টেবিলটির অস্তিত্ব একই সময়ে অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, টেবিলটিকে অসংখ্য ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করাও যেতে পারে। এবং যে ক্ষুদ্রতম অংশের পর আমাদের অভিজ্ঞতা আর অগ্রসর হ'তে পারে না সেই ক্ষুদ্রতম পরমানবিক সত্বাটির নাম বাস্তব সত্বা। অভিজ্ঞতার মধ্যে এইটেই সব চেয়ে ক্ষুদ্র বস্তু বলে হোয়াইটহেড একে আবার বলেছেন 'অভিজ্ঞতা কণিকা' (drops of experience)। যেকোন বস্তু হোক না কেন, তা' একাধিক কতকগুলি অভিজ্ঞতা কণিকার সমবায় ভিন্ন আর কিছু নয়। এই অভিজ্ঞতা কণিকা বা বাস্তব সত্বাগুলি আবার কখনই স্থির ও সীমায়িত নয়। একটির পর আর একটি সর্বদাই অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু তাদের আভ্যন্তরীন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কখনই কোন পরিবর্তন নেই ; কেননা সংজ্ঞা অনুসারে এগুলি হ'চ্ছে পরমাণবিক সত্বা। সুতরাং অবিভাজ্য। সেই জন্যই বলা হয় যে এদের আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে, কিন্তু পরিবর্তন নেই। সৃজনশীলতা নীতির এই হ'চ্ছে আদি সৃষ্টি।

এখন, এই বাস্তব সত্বাকে যদি জগতের মূল উপাদান ব'লে স্বীকার করা যায়, তাহলে বলতে হয় যে, জগতের মধ্যে দেশ কালের লক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ বা গুণ থাকা সম্ভব নয়। কেননা, বস্তু সত্তার মধ্যে দেশকালের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন অন্য কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জগতের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য আছে। তার কারণ হ'লো শাশ্বত বিষয়। শুধুমাত্র দেশকালের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ও অনন্ত প্রবহমান বাস্তব সত্বার সঙ্গে যখন এই শাশ্বত বিষয় মিলিত হয় তখনই দেখা দেয় রূপরস গন্ধময় বিচিত্র এই জগৎ। এই শাশ্বত বিষয়ের বাস্তব কোন অস্তিত্ব নেই ; এ কাল নিরপেক্ষ ও সম্ভাবনা মাত্র। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একদিকে রয়েছে শাশ্বত বিষয়, ও অন্যদিকে রয়েছে বাস্তব সত্তা। এই দু'য়ের সংযোগে গ'ড়ে উঠেছে পরি-

দৃশ্যমান এই বস্তু জগৎ। সুতরাং শুধু অনন্ত প্রবহমান বাস্তব সত্তাকে যদি আমরা পরম সত্য বলে মনে করি তাহলে ভুল করা হবে। অনেকটা এই ধরণের ভুল করেছিলেন ফরাসী দার্শনিক বার্গস । আবার যদি শুধুমাত্র শাশ্বত বিষয়কে আমরা পরম সত্য ব'লে মনে করি তাহলেও ভুল হবে। প্লেটো যখন তার কল্পিত রূপের জগতকে পরম সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন তখন এই ভুলই তিনি করেছিলেন। কিন্তু হোয়াইটহেডের দর্শনে এই দু'য়ের কোনটিই একান্ত সত্য নয়। এখন, শাশ্বত বিষয় যদি হয় সম্ভাবনা মাত্র, তাহলে বলা যায় যে কোন একটি সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হওয়াই হ'চ্ছে বস্তু জগতের ঘটনার আবির্ভাব। এবং সেই বিভিন্ন ঘটনার সমষ্টি নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে এই জগৎ। সুতরাং এই বস্তুজগৎ হ'চ্ছে অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য থেকে একটিমাত্র নির্ধারিত বস্তুরূপ। এখন, প্রশ্ন হতে পারে যে, অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য থেকে আর সকলকে বাদ দিয়ে বিশেষ একটি সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয় তার কারণ কি? হোয়াইটহেড বলেন সেই কারণ হ'লো আদি সৃজনশীলতা (primal creativity)। এর কোন আকার নেই, সীমা নেই; এ সম্পূর্ণ অমূর্ত ও সার্বিক; এবং সমস্ত সৃষ্টির মূলেই রয়েছে রয়েছে এই সৃজনশীলতা। যে বাস্তব সত্তার সমবায়কে আমরা বস্তুজগতের মূল বলে উল্লেখ করেছি সেই বাস্তব সত্বারও উৎস হ'চ্ছে এই সৃজনশীলতা। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে, যে-কোন সৃষ্টির পূর্বে রয়েছে দু'টি বিরোধী সত্য—শাশ্বত বিষয়ও সৃজনশীলতা। কিন্তু ব্যাপার, হ'চ্ছে এই যে শাশ্বত বিষয়ও যেমন অনন্ত, সৃজনশীলতারও তেমনি শেষ নেই। অথচ প্রত্যেকটি বাস্তবের অস্তিত্ব ও রূপ সীমায়িত। সুতরাং শাশ্বত বিষয়ের অনন্ত সম্ভাবনা ও নির্বিশেষ সৃজনশীলতার সীমাহীনতাকে কিছু পরিমাণে খর্ব করে কোন একটি বিশেষের মধ্যে অভিব্যক্ত করার জন্য আর একটি নীতির প্রয়োজন দেখা দিলো। 'ঈশ্বর' হলেন হোয়াইট্টহেডের সেই প্রয়োজনীয় নীতি।

প্রত্যেকটি বাস্তব সত্বার সৃষ্টির পিছনে রয়েছেন ঈশ্বর। কোন বাস্তব সত্বা কখন কোথায় ও কীভাবে দেখা দেবে তার একমাত্র নিয়ন্তা হ'লো এই নীতি। অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য থেকে কোন্ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হবে, বর্তমানের কোন্ বাস্তব সত্বা ভবিষ্যতের কোন্ রূপ নিয়ে হ'য়ে উঠবে—তা একান্তই নির্ভর করছে ঈশ্বরের উপর। সেই জন্যই ঈশ্বর হ'লেন সসীমতার নীতি (Principle of limitation)। অন্য দিক থেকে বিচার ক'রেও বিষয়টিকে বোঝা যেতে পারে। অনন্ত সম্ভাবনা বা শাশ্বত বিষয় যখন কোন একটি নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে কোন একটি বিশেষের মধ্যে অভিব্যক্ত হয় তখনই দেখা দেয় এই বস্তু জগৎ। অর্থাৎ শাশ্বত

বিষয়ের অস্তিত্ব হচ্ছে জগৎ-পূর্ব অস্তিত্ব। কিন্তু হোয়াইটহেড মনে করেন যে ব্যক্তিগত কোন একটি অনুভূতি কেন্দ্র নেই অথচ একটি বিষয় আছে—এমন মনে করা সঙ্গত নয়। কোন একটি বিষয় মানেই কোন একটি ব্যক্তিগত অনুভূতির বিষয়। সুতরাং জগৎ-অস্তিত্বের পূর্বে শাশ্বত বিষয়ের অস্তিত্ব ছিলো, একথা যদি আমরা স্বীকার করি, তাহলে এ-ও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে ঐ শাশ্বত বিষয়ের উপযুক্ত একটি অনুভূতি কেন্দ্রও ছিলো। হোয়াইটহেড বললেন সেই অনুভূতি কেন্দ্র হ'লো ঈশ্বর। কেন না, জগৎ-অস্তিত্বের পূর্বে অন্য কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই দিক থেকে দেখলে ঈশ্বর হ'লেন জগতের স্রষ্টা ও মূল কারণ। জগৎ-অতিরিক্ত ও জগৎ-বহির্ভূত তাঁর অস্তিত্ব। কিন্তু কেন যে তিনি অনন্ত সম্ভাবনার মধ্য থেকে বিশেষ একটিকে বেছে নিয়ে বাস্তবে রূপ দিলেন তার কোন যুক্তি নেই। অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে সে প্রশ্নের বিচার সম্ভব নয়। এই জন্য ঈশ্বর হলেন পরম যুক্তিনিরপেক্ষ (ultimate irrationality)।

তবে ঈশ্বর যে শুধুই জগৎ-অতিরিক্ত বা জগৎ-বহির্ভূত তা নয়। এ হ'লো তাঁর একটি দিক মাত্র। হোয়াইটহেড একে বলেছেন ঈশ্বরের আদি প্রকৃতি (Primordial nature)। অন্য আর এক দিক থেকে তিনি জগতের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত রয়েছেন। যে বাস্তব সত্তা নিয়ে জগতে প্রবাহ চলেছে তার অস্তিত্ব বিশেষ দেশকালে সীমায়িত। এবং আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে যে জগৎ প্রতিফলিত হচ্ছে তা স্বভাবতঃই তাই খণ্ডিত ও সসীম। আর বহুধা খণ্ডিত সসীম বাস্তব অস্তিত্বকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে অখণ্ড রূপে এই জগৎকে অভিজ্ঞতার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে রয়েছেন ঈশ্বর। এ হ'লো তাঁর পরিণামগত রূপ (consequential nature)। বহুধা খণ্ডিত সসীম জগৎ দেশকালগত। সুতরাং অখণ্ড অসীম যে জগৎ ঈশ্বরের অভিজ্ঞতার বিষয় তা দেশকাল-অতীত। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ঈশ্বর দ্বি-কোটিক (bi-polar)। এক দিকে তিনি সৃষ্টির বহির্ভূত আর অন্য দিকে সৃষ্টির অন্তর্গত। জগৎ সম্পর্কেও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। একদিকে সে খণ্ডিত সসীম ও মরণশীল; আর অন্য দিকে সে অখণ্ড অসীম ও অমর।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] মাঘ [১৩৬৬ সাল

সূচীপত্র

কারণত্ব ও সমবায়

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এম.এ.

প্রাচীন ন্যায় হইতে নব্য ন্যায়ে বিকাশ ধারায় একটি মাত্র যে তত্ত্ব উভয় প্রবাহকে আমূল গ্রন্থিসূত্রে আবদ্ধ রাখিয়াছে তাহা হইতেছে বৈশেষিকের অন্যতম পদার্থ এবং প্রাচীন ন্যায়ের বাৎস্যায়ন ভাষ্যোক্ত প্রত্যক্ষমূলীভূত ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজ ৪র্থ বিভাগ "সমবায়"। অনুমান-খণ্ডের প্রোজ্জ্বল ছটা এবং মীমাংসক ভাট্টমতের সমবায়বিরোধী তাদাত্ম্যের প্রভাব অর্বাচীন নৈয়ায়িকগণকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত সত্য এতাবৎ ধরা পড়ে নাই; কিন্তু বৈশেষিক নয়ে অনুমানমূলীভূত সমবায়কে ক্রমপরিণতিতে ন্যায়নয়ে প্রত্যক্ষমূলীভূত সমবায়ের সহিত শেষ পর্যন্ত রফা নিষ্পত্তিতে আসিতে হইয়াছে এবং এই পরিণতির ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। একথা একান্ত সত্য যে বৈশেষিক দর্শনে আদৌ প্রমাণ-চতুর্বিভাগের স্থান ছিল না। গুণ পদার্থের "বুদ্ধি" মাত্র অবলম্বনে "প্রশস্ত পাদ-ভাষ্যে" স্বীকৃত "প্রত্যক্ষ" ও "অনুমান" আশ্রয় করিয়াই এই প্রমাণ বিভাগ বিকাশ লাভ করিতে এবং পরে নব্যগণকে আশ্রয় করিয়া প্রাচীন ন্যায়ের প্রতিযোগিরূপে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে; কিন্তু এই বিকাশের সূত্রপাত জন্যই "কিরণাবলী"-কার উদয়ন প্রাচীন ন্যায়ের দুইখানি টীকা (১) ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য পরিশুদ্ধি এবং (২) ন্যায় পরিশিষ্ট বা প্রবোধ সিদ্ধি লিখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বিকাশ ধারায় নিশ্চয়ই প্রাচীন ন্যায় একমাত্র প্রমাণ অংশটুকুর গুরুত্ব স্বীকার করাইয়া অবশিষ্ট পঞ্চদশ পদার্থের অনেকগুলিকে [ন্যায়শাস্ত্রে পদার্থ ও প্রমেয় আলোচনা দ্রষ্টব্য] পরিত্যাগ করিবার অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু প্রত্যক্ষের উল্লিখিত সন্নিকর্ষ বিভাগের "সমবায় ও সংযোগ" বিষয়ই শেষ পর্য্যন্ত জের টানিয়া চলিতে বাধ্য রাখিয়াছে। মীমাংসক গুরুসম্মত এই সমবায়ের বিকাশ ধারার আলোচনা বর্ত্তমান

সময়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই কিন্তু অসুবিধা হইতেছে যে নব্যন্যায়ের বিকাশে যে ত্রিধারা কার্য করিয়াছে অর্থাৎ (১) বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্য পরিণতি (২) প্রাচীন ন্যায়ের ভাষ্য পরিণতি এবং (৩) উভয়মিশ্রণে উৎপন্ন নব্যন্যায়ের ক্রমপরিণতি, ইহাদের সমূহ ইতিহাস উদ্ধারের বহু মূল্যবান উপাদান আজিও লোকচক্ষুর আড়ালে রহিয়াছে, তথাপি এই ত্রিধারা ধরিয়াই উক্ত ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন।

কিন্তু উল্লিখিত ত্রিধারাকে আলোচনার জন্য সঙ্গত কারণে দুইবিভাগে ভাগ করা যায়। একটী হইতেছে (ক) বৈশেষিক দর্শন বিভাগ, অন্যটী হইতেছে (খ) ন্যায় শাস্ত্রীয় বিভাগ, অবশ্য প্রথমটী (i) শুদ্ধ বৈশেষিক সূত্র সম্মত ও (ii) বৈশেষিক ও ন্যায় মিলন সঞ্জাত "পদার্থ" ধারাধৃত বিভাগের এবং শেষোক্তটী (i) প্রাচীন ও (ii) নব্য দুই ভাগে বিন্যাস পায়। "সমবায়ের" সম্যক আলোচনার জন্য প্রথমেই বৈশেষিকসূত্রসম্মত বিভাগ বিবেচনা করা যাইতেছে। এদিকে আদৌ যাহা লক্ষ্য করিবার তাহা এই যে উদয়নের "কিরণাবলী" বৈশেষিক সূত্রোপরি টীকা বা ভাষ্য নহে; ইহার আশ্রয় প্রশস্তপাদের "পদার্থধর্ম সংগ্রহ ভাষ্য", যাহা উক্ত কণাদ-দর্শনের সূত্রপ্রস্থান ভিত্তিতে লিখিত নহে। কাজেই আমাদের আলোচনায় উহা পরিত্যজ্য কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে বৈশেষিক সূত্রপ্রস্থান আশ্রয়ী প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা গ্রন্থ অত্যন্ত দুর্লভ। যে তিনখানি মাত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহাদের নাম হইতেছে (১) শঙ্কর মিশ্রের—'উপস্কার' (২) বেণী দত্ত লিখিত—'পদার্থ খণ্ডন' এবং (৩) গৌরীকান্ত সার্বভৌম রচিত—'বৈশেষিক ভাষ্য বিবরণ।' শেষোক্ত গ্রন্থের নাম মাত্র জানা গিয়াছে কিন্তু ইহা অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত। বেণী দত্তের গ্রন্থে "সমবায়" পদার্থ অনুমান সিদ্ধ—এই কথা ছাড়া নতুন কিছুই নাই। কাজেই শঙ্কর মিশ্রের "উপস্কার" গ্রন্থ আমাদের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৈশেষিক সূত্রের সপ্তম অধ্যায় ২য় আহ্নিক ২৬ সূত্রে সমবায় সিদ্ধির নির্দেশে বলা হইয়াছে—"ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণ-য়োঃ স সমবায়ঃ"। ইহার উপস্কারে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে—"কার্যকারণয়োরিত্যুপলক্ষণম্, অকার্যকারণয়োরিত্যপি দ্রষ্টব্যম্"। এই উক্তি সূত্রাতিরিক্ত সন্দেহ নাই। তৎসত্বেও উপস্কার-কার উক্ত আহ্নিকের শেষে ২৮ সূত্রের টীকান্তে বলিয়াছেন—"প্রত্যক্ষ সমবায় ইতি নৈয়ায়িকাঃ। তদপ্যনুপপন্নম্ ..." ইত্যাদি। কিন্তু নিজে নৈয়ায়িক ছিলেন বলিয়াই হউক অথবা নিজ লিখিত তত্ত্বচিন্তামণির ময়ূখ-টীকাকার বলিয়া গৌরব বোধ করিতেন বলিয়াই হউক, উল্লিখিত ২৬ সূত্রের টীকান্তে এই বৈশেষিক পদার্থ যে ন্যায়ের প্রত্যক্ষ খণ্ড

বিষয় তাহা স্বীকার করিয়াই বলিয়াছেন -"সমবায়ি প্রতিবন্ধিঃ প্রত্যক্ষ মনুখে, মোচিত (পরিহৃত) এবেত্যাস্তাম্ ।"

সমবায়ের কারণত্ব ভিত্তি, ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ সম্পূর্ণরূপে এবং উপস্কার কার শঙ্কর মিশ্র আংশিকভাবে অস্বীকার করিলেও "ন্যায়সূত্র বিবরণ"-কার রাধামোহন গোস্বামী ৪।১।৪২ ন্যায় সূত্র মাধ্যমে—"ন সংখ্যৈ কান্তা সিদ্ধিঃ কারণস্য প্রমাণস্যাবয়বভাবাদ্ধক্ত সৈ্যকত্বাদবয়বায়বিনোশ্চ ভেদাভাবাদিতিভাবঃ'—সূত্র মাধ্যমে কারণত্বভিত্তিতেই সমবায়ের তত্ত্ববিন্যাস করিয়াছেন, ফলে প্রাচীন ন্যায়ের সমবায় শুধু যে সন্নিকর্ষের অবশিষ্ট পঞ্চ বিভাগ-সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়াছে তাহা নহে, তাহার বন্ধ্যাত্বও বিমুক্ত হইয়াছে। অবশ্য এই বিকাশ ধারায় উল্লিখিত পরিত্যক্ত পঞ্চ বিভাগের অন্যতম "সংযোগ" (Colligation of facts) পূর্বেই কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে এবং সেজন্য ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও ১।১।৫ সূত্রাশ্রিত "অনু-মানস্য প্রত্যক্ষবৈলক্ষণম্" প্রকরণে বলিয়া রাখিয়াছেন যে—"সংযোগে প্রাপ্তিত্বস্য ন বৃত্ত্যা স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধঃ।" এই বন্ধ্যাত্ব মোচনের এবং "সংযোগ" আলোচনার বিকাশধারা পরবর্তী অংশে আলোচনার জন্য রাখিয়া আপাততঃ এই কারণত্বের প্রভাব নৈয়ায়িক সমবায়ে কিভাবে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা বলা যাইবে।

এই কারণত্বকে নৈয়ায়িকেরা প্রথমতঃ—(ক) সমবায়ি কারণ (Relation of co-existence), (খ) অসমবায়ি কারণ (Relation of similarity), (গ) নিমিত্ত কারণ (Condition or relation of succession) এই ত্রিবিধ বিভাগে ভাগ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে "ভাষাপরিচ্ছেদে"-র কারিকা এই যে—

তস্য ত্রৈবিধ্যম্ পরিকীর্তিতম্॥ ১৬

সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মথাপ্যসমবায়ি-হেতুত্বম্।

এবং ন্যায় নয়জ্ঞৈস্তৃতীয়মুক্তং নিমিত্তহেতুত্বম্॥ ১৭

ভাষ্যকারের—"অযুতসিদ্ধানামা ধার্যাধারভূতানাং যঃ সম্বন্ধ ইহেতি প্রত্যয় হেতুঃ স সমবায়ঃ" সূত্র হইতেই সমবায়ি কারণ সিদ্ধ হয়, কারণ উপস্কার উদ্ধৃতি হইতে—"অসম্বন্ধয়োরবিদ্যমানত্বমযুতসিদ্ধিঃ" ব্যাখ্যা পাইতেছি। অন্য দুইটির বিস্তৃত আলোচনা ছাড়িয়া এই ত্রিবিধ কারণত্বের লক্ষণ সম্বন্ধে কৃষ্ণদাসের ঐ "ভাষা পরিচ্ছেদ" গ্রন্থে পাইতেছি যে—

সমবায়ি কারণত্বম্ দ্রব্যস্যৈবেতি বিজ্ঞেয়ম্।

গুণ কর্ম মাত্র বৃত্তিজ্ঞেয়মথাপ্য সমবায়ি হেতুত্বম॥ ২৩

অন্যত্র নিত্য দ্রব্যেভ্য আশ্রিতত্বমিহোচ্যতে। ২৪½

অর্থাৎ দ্রব্যের সমবায়ি কারণ এবং গুণ ও কর্মের অসমবায়ি কারণ স্বীকৃত। দ্রব্য গুণও কর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার এবং ভারতীয় নৈয়ায়িক মতে প্রত্যক্ষ খণ্ডের অন্তর্গত। অতএব এই আলোচনা মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণদাস তাঁহার আলোচনায় প্রত্যক্ষ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছেন। কারণত্বের আরও যাহা বিকাশ হইয়াছে তাহা পদার্থধারায় লিখিত গ্রন্থগুলিতে দেখা যাইতেছে।

কিন্তু এই ধারা আলোচনার পূর্বে একটি অতি মূল্যবান সমবায় বিষয়ক তথ্য আলোচনা প্রয়োজন এবং এই তথ্যটি "ন্যায়বার্ত্তিক" গ্রন্থেই মিলিতেছে। আচার্য উদ্যোতকর ১।১।৫ অনুমান সূত্রের প্রথমাংশ "এবং তাবদ" ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন —"সমবায়শ্চ কার্যকারণোবর্ত্তত ইতি বৃত্তিরস্য বাচ্যা" উক্ত সূত্রটিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল সূত্র বলিয়া ধরা যাইতে পারে। সমবায়ের এই সূত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা-রূপে "ন্যায় পরিশুদ্ধি"-র প্রমেয় অধ্যায়ে উল্লিখিত—"সম্বন্ধাসম্বন্ধাভ্যাং নিয়মাদি-চেৎ ন সম্বন্ধস্যাপি সমবায় নাম্নঃ সার্বত্রিকত্বাভ্যুপনমাৎ তত্রাপ্যভিব্যক্তি নিয়মস্য দ্রষ্টব্যত্বাৎ (পৃঃ—৫০০।৫০১)"—সূত্রটি বিশেষভাবে বিবেচ্য; কেন না ইহা সম-বায়েরই পরিপূরক অংশ। উক্ত সূত্র দ্বারা আচার্য বেঙ্কট নাথ বেদান্তাচার্য সম্বন্ধ অসম্বন্ধের ভিত্তিতে নিয়ম স্বীকৃত হয় কিনা সন্দেহ করিয়া এবং সম্বন্ধ ভিত্ত্যুৎপন্ন সমবায় দ্বারা সার্বত্রিকত্ব অস্বীকার করিয়াও সেই সমবায় আশ্রয়েই অভিব্যক্তি (Evolutionism) নিয়মসিদ্ধি স্বীকার করিয়াছেন। "ন্যায় পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে অনুমান ভিত্তিতে ব্রহ্মের (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রন্থকার বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্তসিদ্ধ ব্রহ্মেতর জড় ও প্রাণীজগতের বিকাশকে তাঁহার প্রমেয় পদার্থের আলোচ্য ধরিয়াই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে সমবায়ের দ্বারা কোনও সার্বত্রিক নিয়ম সিদ্ধ হয় কিনা? ইহার উত্তর উপস্কার-কারের ৭।২।২৬ সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে—"স্বভাব শক্তিরেব সর্বত্র নিয়ামিকা" উক্তি হইতে পাওয়া যায়। একথা সত্য যে—বিজ্ঞানের নিয়মগুলি হইতেছে মানুষের ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে, প্রকৃতিতে বা সমাজে যে বাস্তব প্রক্রিয়াগুলি ঘটিতেছে তাহার প্রতিফলন মাত্র। মানুষ এই সকল নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে, অবগত হইতে পারে, অনুধাবন করিতে পারে, নিজের কার্যের সময়ে সেগুলিকে হিসাবের মধ্যে ধরিতে এবং সমাজের স্বার্থে সেগুলিকে ব্যবহার করিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া সে নিয়ম-গুলিকে বদলাইতে বা বিলোপ করিতে পারে না—বিজ্ঞানের নূতন নিয়ম গড়া কিংবা সৃষ্টি করা তাহার পক্ষে দূরের কথা। উল্লিখিত তিনটি সূত্রের একত্র বিবেচনা হইতে ইহা ধরা পড়ে এবং ইহা একান্তভাবে সমবায়গ্রাহ্য।

উক্ত প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এইবার পদার্থ ধারায় লিখিত গ্রন্থগুলির পরীক্ষা আবশ্যক উল্লিখিত ধারায় লিখিত গ্রন্থের প্রথম হইতেছে শিবাদিত্যের "সপ্ত পদার্থী"— ইহা প্রায় সূত্রাকারে রচিত। ইহার পরের গ্রন্থ নৈয়ায়িক জগতে সুপরিচিত "ন্যায় লীলাবতী"। তৎপরবর্তী গ্রন্থ হইতেছে শিরোমণি রঘুনাথের "পদার্থ তত্ত্ব নিরূপণ" বা "পদার্থ খণ্ডন" এবং চতুর্থ গ্রন্থ হইতেছে শিরোমণি-সতীর্থ কনাদ তর্ক বাগীশের "ভাষারত্ন"। তৎপরবর্তী গ্রন্থ লৌগাক্ষী ভাস্করের "তর্ক কৌমুদী" এবং পরবর্তী গ্রন্থ বৈয়াকরণ কৌণ্ডভট্টের "পদার্থ দীপিকা" উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ ছয় খানির প্রত্যেকেরই একটী বৈশিষ্ট্য এই যে "তর্ক কৌমুদী" ছাড়া ইহারা কেহই প্রত্যক্ষ সন্নিকর্ষের বিভাগরূপে প্রাচীন ন্যায়দর্শে সমবায়কে স্বীকার করেন নাই এবং কেহই বৈশেষিক মূলসূত্রানুসারে সমবায়ের লক্ষণরূপে কারণত্ব আলোচনা করেন নাই। এতদ্ব্যতীত সকলেরই বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে ন্যায়, বৈশেষিক বা মীমাংসা এবং তদনুযায়ী পদার্থতত্ত্ব বা অন্য সর্বপ্রকার প্রকরণে পরমাণুর কারণত্ব স্বীকার করা হয় নাই। ইহা অত্যাধুনিক চিন্তাধারা সঙ্গত; কারণ কোয়ান্টাম থিয়োরি (Quantum Theory)-র অবদানে কারণবাদ বা হেতুবাদ বর্জনের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান কালের বিজ্ঞানীরা বোধ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতের সকল শ্রেণীর নৈয়ায়িকেরা "পারিমাণ্ডল্য (পরমাণু) ভিন্নাণাং কারণত্বং উদাহৃতম্ (ভাষা-পরিচ্ছেদ কারিকা—১৫ ইত্যাদি)"—বহু আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত সাধারণ আলোচনা রাখিয়া আমরা প্রত্যেক গ্রন্থ পরীক্ষা করিতে পারি।

শিবাদিত্যের "সপ্তপদার্থী" গ্রন্থের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে ইহার প্রকৃতি, কনোদিক। ইহা বলিবার কারণ এই যে ইহাতে শুধু যে সপ্তপদার্থের প্রথম দুই পদার্থ বিভাগের প্রত্যেকেরই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব বিচার করা হইয়াছে তাহা নহে, দ্রব্য বিভাগের প্রায় প্রত্যেকেরই মধ্যে পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার এবং তাহার নিত্যত্ব বিচার করা হইয়াছে; ফলে পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু এই চারিটির পিছনে পরমাণুর ক্রিয়া এবং সেই পরমাণু নিত্য কিন্তু তাহার ক্রিয়া অনিত্য ইহা কল্পিত হইয়াছে। দ্রব্য বিভাগে পৃথিবী, আকাশ প্রকৃতি পাঁচটির নিত্যত্ব এবং অন্য চারিটির নিত্যানিত্যত্ব কল্পিত এবং অনুরূপ গুণপদার্থের বিভাগে গন্ধ, সংযোগ প্রভৃতি দশটির অনিত্যত্ব ও অন্য চৌদ্দটির নিত্যানিত্যত্ব গণ্য করিয়া দ্রব্য বিভাগের নিত্যত্বে কারণত্ব এবং দ্রব্য ও গুণ বিভাগের নিত্যানিত্যত্বে কারণত্ব ও কার্যত্ব উভয়ই স্বীকৃত হইয়াছে। সমবায়ের একত্ব ব্যতীত অন্য কোনও লক্ষণ উদ্দেশ্য প্রকরণে (১-৫৫ সূত্র পর্যন্ত) বলা হয় নাই। পরবর্তী অংশে "নিত্য সম্বন্ধ সমবায়" বলা হইলেও সম্বন্ধের নিত্যত্ব

হেতু এই সম্বন্ধ বা সমবায় কারণত্ব যুক্ত কিনা বলা নাই। পরমাণু সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কিছু না বলায় মনে হয় নিত্যত্ব হেতু ইহারও কারণ স্বীকৃত। তবে মিতভাষিণী টীকায়—"সোঽপি চেৎ অনিত্যঃ স্যাৎ, তস্যাপি হেতু পরম্পরানুসারেন অনবস্থা স্যাৎ বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে [সূত্র ১০ টীকা দ্রষ্টব্য]। কারণের বিভাগ রূপে—সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ও নিমিত্ত কারণ পাইতেছি। সুস্পষ্ট বলা না হইলেও দ্রব্য মাত্রেরই সমবায়িকারণ স্বীকার করা হইয়াছে ধরা যায়। কর্মেরই অসমবায়িকারণ স্বীকৃত। যুতসিদ্ধ এবং অযুতসিদ্ধ লক্ষণ ধরা হইলেও সংযোগ বা সমবায়ের সহিত নিমিত্ত কারণের কোনও সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই।

"ন্যায় লীলাবতী"তে বৈশেষিকসিদ্ধ অনুমান নয়ে এবং ন্যায়সিদ্ধ প্রত্যক্ষ নয়ে উভয় ভাবেই সমবায়ের লক্ষণ বিবেচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার আলোচনারম্ভে এই পদার্থের প্রত্যক্ষত্ব অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিলেও পরে "ইহেদমিতি" সূত্রক্রমে (পৃঃ-৭০৬) ন্যায় সঙ্গত প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণে ঝোঁক দেখাইয়াছেন। সমবায়ের সহিত কারণত্বের সম্বন্ধ নির্দেশ করা না হইলেও এই বিভাগ আলোচনায় কেবল মাত্র সমবায়ি কারণের-তন্দ্রাদে-ষট-পদার্থবাদী এবং ইহার অভাব-পদার্থ গুণ-পদার্থের অন্তর্গত। গুণ বিভাগের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যকে স্বতন্ত্র ভাবে সমবায় প্রকরণের পর আলোচনা করা হইয়াছে এবং ঐ সাধর্ম্য সূত্রে অবশিষ্ট দুইটি কারণ অর্থাৎ অসমবায়ী কারণ ও নিমিত্ত কারণ প্রসঙ্গ রহিয়াছে। সমবায়ের সুস্পষ্ট কোনও সংজ্ঞা নাই, তবে "তৎপ্রতীতেশ্চ পূর্বমযুতসিদ্ধি সাদৃশ্যাদ সম্বন্ধানুপলম্ভ নিবন্ধনঃ (পৃঃ—৭১৬)" একটি বৈশেষিক স্বতন্ত্র সূত্র দেখা যায়। প্রত্যক্ষসিদ্ধ ন্যায়সঙ্গত সমবায়ের লক্ষণরূপে আচার্য বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য টীকা" এবং আচার্য উদয়নের "তাৎপর্য পরিশুদ্ধি" অনুসরণে সমানাধিকরণ সংশ্রব প্রকারান্তরে (পৃঃ—৭১৮) স্বীকৃত হইয়াছে। সাধর্ম্য প্রকরণে সমবায়ের আশ্রিতত্ব বিচার করিয়া (পৃঃ—৭৮৩) দিক কাল প্রভৃতির সর্বথা নিমিত্ত-কারণ স্বীকৃত নহে বলিয়াছেন (পৃঃ—৭৮৭) এবং অসমবায়ি কারণ প্রসঙ্গে "স্পর্শস্ত্বশীতঃ, কম্পস্য-কারণম্" দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এই অধ্যায়ে আরও একটি কথা পাইতেছি যে—ব্যক্ত্যুপাদানেনাঽন্যথাসিদ্ধেঃ (পৃঃ—৮০০) এবং পূর্ব অধ্যায়ে প্রাপ্ত "ন্যায়নয়েতু প্রত্যক্ষঃ এব সমবায়ঃ জাতি ব্যক্তিভ্যাং সহস্বরূপেনানুভূয়তে" সূত্র সহ মিলাইলে সমবায়ের সহিত অন্যথাসিদ্ধির (Probability) সম্পর্ক ধরা পড়ে। এইখানে পূর্বালোচিত সপ্ত পদার্থীর মিতভাষিণী সূত্র—"উভয়োঃ সামানাধিকরণ্যাং সহচারঃ (সপ্তপদার্থী—কলিকাতা সংস্করণ; পৃঃ—৭) বিবেচনা করিলে সহচার (Relation of co-

existence) সূত্র মাধ্যমে অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ উভয়কেই সমবায় অঙ্গীভূত ধরা হয়। সমবায় প্রসঙ্গে লীলাবতী "সংযোগ" লক্ষণ স্বরূপ বলিয়াছেন যে—"সংযোগ এবারোপ্যতামিতি চেন্ন" অর্থাৎ কোন বিশেষ লক্ষণ সমবায়ে আরোপ সম্ভব (সর্বত্র চারোপে আরোপানুপপত্তেঃ পৃঃ-৭১৯) কিন্তু সংযোগে তাহা চলেনা।

সমবায়ের কোনও সংজ্ঞা নির্দেশ না করিলেও শূলপানি দৌহিত্র রঘুনাথ তাঁহার "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে ইহাকে কারণত্ব সংশ্রব শূন্যরূপেই আলোচনা করিয়াছেন। তবে ইহার লক্ষণ সম্বন্ধে সমবায় যে অখণ্ডোপাধি তাহা স্বীকার করিয়া ইহার বিভাগরূপে নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমরা সপ্তপদার্থীর "পদার্থচন্দ্রিকা" (শেষানন্ত কৃত) ৬৪ সূত্রের টীকায় সমবায়ের যে সকল বিভাগ পাইতেছি তাহা রঘুনাথের নানাত্ব প্রসঙ্গ এবং গুরু মতানুযায়ী নিত্য ও অনিত্য বিভাগের সহিত মিলাইলে সমবায় মধ্যে পাশ্চাত্য Inductive Logic এর বিভাগ পাই। এই গ্রন্থমতে "কারণত্ব" একটী স্বতন্ত্র পদার্থ এবং তাহা "সমবায়" সংশ্রব বর্জিত। ইহার বিভাগ বিষয়ে সকল পূর্বাচার্যের মত উপেক্ষা করিয়া (১) কার্যভেদাৎ ও (২) অবচ্ছেদকভেদাৎ এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন এবং ইহার গ্রাহকরূপে (ক) প্রত্যক্ষ (খ) অনুমান ও (গ) আগম (তন্ত্র না বেদ ?) কে স্বীকার করিয়াছেন। গ্রন্থখানির উপলভ্যমান টীকাদ্বয়ের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরিরাম তর্কবাগীশ ছাত্র এবং গদাধর ভট্টাচার্য সতীর্থ রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার এই কারণত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অন্যথাসিদ্ধি (Probability)র প্রকার ভেদ আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভাষাপরিচ্ছেদের বিভাগানুরূপ এবং পঞ্চ বিভাগকে পাশ্চাত্য Inductive Logic সিদ্ধ Rules for estimation of probabilityর চতুর্বিধ বিভাগানুযায়ী ধরা যায়; কারণ উক্ত গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস তৎনির্দেশিত প্রথম চারিটীকে পঞ্চমের অন্তর্গত করিয়া [এতেষু পঞ্চস্বন্যথাসিদ্ধেষু মধ্যে পঞ্চ মোহন্যথাসিদ্ধ আবশ্যকস্তেনৈব পরেষাং চরিতার্থত্বাৎ-সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী; ১৯-২১ কারিকা] শুধু যে নব্য মতের সমর্থন করিয়াছেন তাহা নহে প্রকরণানুযায়ী আলোচনার সুবিধা করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে অন্যথা-সিদ্ধির অন্যতম সহালোচ্য বিষয় আকস্মিকতা (chance) র আলোচনা স্থগিত রাখিয়া কানভট্ট রঘুনাথের সতীর্থ কনাদতর্কবাগীশের "ভাষারত্ন" গ্রন্থ আলোচনা করা যাইতেছে।

"ভাষারত্ন" গ্রন্থে প্রত্যক্ষের কারণীভূত সন্নিকর্ষের দ্বিবিধ বিভাগরূপে (ক) লৌকিক সন্নিকর্ষ ও (খ) অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকৃত। ন্যায়সূত্রের বাৎস্যায়ন ভাষ্যের অনুরূপ লৌকিক সন্নিকর্ষের ষড়্‌বিধ বিভাগ এবং তাহাদের অন্যতম রূপে "সমবায়"

স্বীকৃত রহিয়াছে কিন্তু এই সমবায়ের সহিত কারণত্বের কোনও সম্বন্ধ নির্ণীত হয় নাই। এইবার ভাট্ট ও প্রভাকর এই দ্বিবিধ মীমাংসক মতাবলম্বী ন্যায়ের আলোচনা করা যাইবে।

ভাট্ট মতাবলম্বী "তর্ককৌমুদী" গ্রন্থে লৌগাক্ষিভাস্কর মূলতঃ ন্যায়তথ্যই আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে মীমাংসা মতানুযায়ী পাঁচ বা আট প্রকার পদার্থ স্বীকার করা হয় নাই বরং বৈশেষিক মতানুযায়ী সপ্ত পদার্থভেদ এবং প্রত্যেক পদার্থের অনুরূপ ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে; তবে বুদ্ধির অংশরূপে দ্বিবিধ প্রমাণও স্বীকার করা হয় নাই। প্রত্যক্ষের লৌকিক ও অলৌকিক ভেদ স্বীকার এবং লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রাচীন ন্যায়ানুযায়ী ষড়্‌বিধ বিভাগ স্বীকার দেখা যায়। হেতুত্বকে প্রমেয়ত্ব বলা হইয়াছে (প্রমেয়ত্বং হেতুত্বম্—পৃং।১০)। লৌকিক প্রত্যক্ষ হেতু সন্নিকর্ষের ষড়্‌বিধ বিভাগের মধ্যে সংযোগ ও সমবায়কে অন্যতমরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। "যুতসিদ্ধয়ো সংযোগঃ (পৃঃ-১৯)"—এই সংযোগ সূত্র দ্বারা ইহাকে সমবায়ের প্রতিযোগীরূপে স্বীকারও করা হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য পূর্ণ আলোচনা ইহাতে এই যে কারণত্বের ন্যায় অন্যথাসিদ্ধিরও ত্রিবিধ বিভাগ দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের অন্যথাসিদ্ধির পঞ্চবিধি বিভাগ স্বতন্ত্র লক্ষণ দেখা যায়। গ্রন্থে সমবায় ছাড়া তাদাত্ম্যও স্বীকৃত এবং অনুপসংহারীর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা (বস্তুমাত্র পক্ষকোঽনুপসংহারী; পৃষ্ঠা-১২) মিলে। বুদ্ধির বিভাগরূপে কারণত্বের স্বীকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

প্রভাকর মতাবলম্বী "পদার্থ দীপিকা" গ্রন্থ প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কৌন্তভট্টের রচিত। ইহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে গুণপদার্থের সংখ্যা বিভাগাশ্রয়ে ত্রিবিধ বিভাগসহ কারণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যক্ষের আলোচনায় সমবায় প্রসঙ্গ এড়াইয়া সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক প্রমাণ প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখা যায়। সমবায়ের সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দিয়া সংযোগের সহিত পার্থক্য সবিশেষ আলোচিত। ভাষাপরিচ্ছেদের "অন্যথাসিদ্ধি শূন্যস্য নিয়তা পূর্ববর্তিতা কারণত্বং ভবেৎ"—সূত্রের পরিবর্তে এই গ্রন্থে অনুরূপার্থ—কারণত্বও স্বীকৃত। গ্রন্থখানির সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বৈশিষ্ট্য এইযে ইহাতে "অভিব্যক্তি বিষয়ক একটী তথ্য পরিবেশিত রহিয়াছে; এতদ্ব্যতীত অন্যথা-সিদ্ধি'রও সূত্র উল্লেখিত।

"তর্কামৃত" জগৎগুরু জগদীশ তর্কালঙ্কার রচিত একটী ক্ষুদ্র অথচ নিপুণ ভাবে গ্রথিত নিবন্ধ। অনেকে গ্রন্থখানি জগদীশের রচনা নাও হইতে পারে—মনে

করেন। বস্তুতঃ পাঠ দেখিয়া মনে হয় একই নামে দুইখানি গ্রন্থ রচিত হওয়াও সম্ভব এবং অর্বাচীন গ্রন্থটী (চৌখাম্বা প্রকাশিত) তর্কালঙ্কার মহাশয়ের না হওয়াই সম্ভব; তবে প্রবীণ গ্রন্থে নিমিত্ত কারণের দ্বিবিধ বিভাগরূপে (১) ফলোপহিত নিমিত্তকারণ (Positive Condition) ও (২) উপধায়ক নিমিত্তকারণ (Negative condition) দৃষ্ট হয়। শুধু এই তথ্যটুকুর জন্য ইহা মূল্যবান গ্রন্থরূপে গ্রহণীয়।

এক্ষণে দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ আলোচনা করিতে গিয়া আমরা যে অসুবিধা লক্ষ্য করিতেছি তাহা এই যে এই শ্রেণীর (১) বাচস্পতি মিশ্রের—ন্যায়সূচী (২) শ্রীকণ্ঠ রচিত—ন্যায়ালঙ্কার (৩) দিবাকরোপাধ্যায়ের—ন্যায় নিবন্ধোদ্যত (৪) প্রভাকরোপাধ্যায়ের—ন্যায় নিবন্ধের টীকা (৫) বর্ধমানোপাধ্যায়ের—অন্বীক্ষানয়তত্ত্ব-বোধ (৬) দ্বিতীয় বাচস্পতির—ন্যায় (নয়) তত্ত্বালোক ও প্রত্যক্ষ মণিপ্রকাশ (৭) কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবিরিঞ্চির—নিবন্ধকৃষ্ণ প্রভৃতি গ্রন্থ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে বা রহিয়াছে। যদি তাহাদের মুদ্রিত রূপ কালপ্রবাহে প্রকাশিত হয় তবে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। তৎপূর্বে মাত্র যে কয়েকখানি গ্রন্থ পরীক্ষা করা যাইতে পারে তাহাদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইতেছে (ক) উদ্দ্যোতকরের "ন্যায়বার্ত্তিক" ও তদুপরি (খ) সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রের—"ঐ তাৎপর্য্য টীকা"। ন্যায়শাস্ত্রে কারণত্ব প্রসঙ্গ প্রথমতঃ ১।১।৪ সূত্রভাষ্য মাধ্যমে বার্তিক-কার উদ্দ্যোতকর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে—'সোঽপি দৃষ্ট সামর্থানাং কারণানাং সর্বত্র কার্যানুৎপত্ত্যা প্রত্যবস্থেয়ঃ (ন্যায়বার্ত্তিক ; পৃঃ-৩৬)। ইহাদ্বারা কারণত্বকে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজ বলায় প্রত্যক্ষ বিভাগজ সমবায় সংশ্লিষ্ট ধরিবার সঙ্কেত পাওয়া যায়। "ন্যায়বার্ত্তিক" গ্রন্থে সমবায় ও সংযোগের পার্থক্য নির্ণয়ে 'ব্যাধিকরণে'র উল্লেখ দেখা যায় (পৃঃ-৩১)। সমবায়ের লক্ষণরূপে — "বৃত্তিস্তু সমবায়ঃ" এবং "সমবায়েচাভাবে চ বিশেষণ বিশেষ্য ভাবাদিতি"—সূত্রদ্বয় উল্লিখিত (পৃঃ-ঐ)। সমবায়ের বৃত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী ১,১।৫ সূত্র বার্ত্তিকে বলা হইয়াছে যে—"সমবায়শ্চ কার্যকারণয়োবর্ত্তত ইতি বৃত্তিরস্য বাচ্যা (পৃঃ-৫৩) অর্থাৎ সমবায় বিবেচনায় কারণত্ব বিবেচনাও অবশ্য কর্তব্য।

আচার্য বাচস্পতি মিশ্রের ',তাৎপর্য টীকা" গ্রন্থের গুরুত্ব বিবেচনা করিলে প্রথমেই লক্ষণীয় যে বার্ত্তিকোল্লিখিত প্রথম সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি (ক) সহকারি সাফল্য ও (খ) স্বরূপযোগ্যতা কারণ বিভাগদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। তাৎপর্য টীকার ইঙ্গিত কতকটা অস্পষ্ট হইলেও বার্তিক-কার পুনরায় ১।১।৪১ সূত্রে 'নির্ণয়'

আলোচনা প্রসঙ্গে পক্ষতা সংশ্রবে কার্যও কারণ বিষয়ক (পৃঃ-১৪৫) যে স্বতন্ত্র ইঙ্গিত করিয়াছেন তাহাতে ন্যায়শাস্ত্রে ইহার গুরুত্ব প্রমাণিত হয়। এই সঙ্গে বলিতে হয় যে আচার্য উদয়ন এই মূল্যবান টীকার উপর "পরিশুদ্ধি" রচনা করিলেও, কিরণাবলী গ্রন্থে সমবায়ি-কারণ ঘটিত যুক্তি অতি কঠোর ভাষায় খণ্ডনাদি না করিলে (কাশী সংস্করণ ; পৃঃ-২৩৪) সম্ভবতঃ ভারতের ন্যায়শাস্ত্র আচার্য স্যার প্রফুল্ল রায় কল্পিত আমাদের মস্তিষ্কের অপব্যবহার শাস্ত্রে পরিণত হইতনা। বোধহয় সুবিখ্যাত পক্ষধর (জয়দেব) মিশ্রের জ্ঞাতি খুল্লতাত শঙ্কর মিশ্র ও শূলপানি দৌহিত্র রঘুনাথের আবির্ভাব না হইলে মিথিলা ও নবদ্বীপের নৈয়ায়িকেরা এই শাস্ত্রখানিকে আরও কতদূর নিমজ্জনমুখী করিতেন তাহার কল্পনায় শরীরে রোমাঞ্চ আইসে। 'তাৎপর্য-টীকা' গ্রন্থখানিতেই আমরা এই দর্শনখানিকে বিজ্ঞানমুখী করিবার বিশেষ প্রচেষ্টা দেখিতে পাই। সমবায়ের চক্ষুসন্নিকর্ষজনিত ভিত্তি আলোচনা করিতে গিয়া আচার্যদেব ব্যধিকরণ ও সামানাধিকরণের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পূর্ববর্তী ১।১।৫ সূত্র টীকা প্রসঙ্গে সমবায়ের কারণত্ব ও স্বাভাবিক নিয়ত নিয়ম সম্পর্ক বিবেচনা করিতে গিয়া—"কার্যকারণ-ভাবাদ্বা স্বভাবাদ্বানিয়ামকাৎ (পৃঃ-১৫৮)"—বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রে গুরুত্ব আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত ১।১।৫ সূত্রস্থিত "চ" শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বার্ত্তিককারের কারণত্ব সংশ্লিষ্ট পঞ্চবিধ সামানাধিকরণ) প্রণালীর মধ্যে দুইটির বিশেষ উল্লেখ করিতে গিয়া বাচস্পতি বলিয়াছেন—"বার্ত্তিকস্তু 'চ' শব্দেনা রূপদ্বয়ং সমুচ্চিতমিত্যুক্তং ভবতি (পৃঃ-১৭৪)"। এ সমস্তই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত তাঁহার "বিশিষ্ট জ্ঞানম্ বিজ্ঞানম্" উক্তি যুগোপযোগী এবং ১।১।৩৫ সূত্রের বার্ত্তিক তাৎপর্য প্রসঙ্গে সমবায়ী কারণের স্বীকৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

'ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য" টীকার উপর নব্য ন্যায় প্রবর্তক আচার্য উদয়নের "তাৎপরিশুদ্ধি" এবং ইহার উপরে লিখিত উপায়কারক বর্ধমানোপাধ্যায়ের "প্রকাশ" টীকা গ্রন্থে "সমানাধিরণ" ও "ব্যধিকরণ" সূত্রকে অনুমান প্রসঙ্গে আলোচিত দেখা গেলেও উদয়ন তাঁহার "পরিশুদ্ধি" গ্রন্থে উল্লিখিত উভয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ মূলীভূত "সমবায়" প্রসঙ্গে গৌতম দর্শনের ১।১।৪ সূত্রক্রমে আলোচনা করিয়াছেন। উল্লিখিত বিষয়দ্বয় সম্বন্ধে এ গ্রন্থের উক্তি এই যে—"তত্র সমানাধিকরণং ব্যবচ্ছেদকং বিশেষণম্। ব্যধিকরণংতুপলক্ষণম্ (পৃঃ-৫৩৭)" এই সমানাধিকরণ ভিত্তিতে হেতুত্ব স্বীকার করিয়া পরিশুদ্ধি-কার বলিয়াছেন যে—"সামানাধি-করণ্যাদিতি চ হেতুর্যথা ভেদ সম্বন্ধাভ্যাং ব্যবর্ততে তথাহভেদ সম্বন্ধামিত্যপীত্য

সাধারণঃ (পৃঃ-৪৭৪)"। হেতুর অর্থাৎ কারণত্বের বিভাগকে সাধর্ম্য বা বৈধর্ম্যের আলোচনার মাধ্যমে না আনিয়া সমবায়ী কারণ আলোচনা প্রসঙ্গে ৫০৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে—প্রত্যক্ষ লক্ষণতয়া তৎকারণমুক্তং নতুকারণত্বৈব"। এতদ্ব্যতীত অসমবায়ীকারণ ও "আকস্মিকতা" সম্বন্ধে ও (পৃঃ-৫১৬) সমবায় প্রসঙ্গে উক্তি দেখা যায়। গ্রন্থকার "স্বাভাবিক নিয়তনিয়ম" প্রভৃতি একেবারে এড়াইয়া গিয়াছেন। কেবল "স্বাভাবিক" শব্দ ব্যাখ্যায় ইহাকে নিরূপাধিক [স্বাভাবিকো নিরূপাধিকিত্যর্থঃ, পৃঃ-১৭১] বলিয়াছেন। "তাৎপর্য" টীকায় "ইহবুদ্ধি নিমিত্তত্বং কারণত্বম্ (পৃঃ ১৮৪)" ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "পরিশুদ্ধি"—কার বলিয়াছেন—"নিমিত্তত্বং যদি বিষয়ত্বং তথাত্মনি দৃষ্টান্তে, অথোপাদনত্বং ন তৎসাধ্যে সমবায় ইত্যত আহনিমিত্তত্বং কারণত্বমিতি ;" ইহারই 'প্রকাশে' উপায়কারক "বর্ধমানোপাধ্যায়" বলিয়াছেন—বিশেষ বাচকস্য সামান্য পরত্বে হেতুমাহ নিমিত্তত্বমিতি। এই ত্রিবিধ আলোচনা হইতে কারণত্বের গুরুত্ব ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রাপ্ত লক্ষিত হয়।

ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য টীকা ও উহার উপর লিখিত পরিশুদ্ধিরচনার মধ্যবর্ত্তী কালে গৌড় নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট লিখিত "ন্যায় মঞ্জরী" গ্রন্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়ক "স্বমতেন জ্ঞানস্য সুখরূপতা খণ্ডনম্" প্রবন্ধে কার্য-কারণ প্রসঙ্গকে সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ও নিমিত্ত কারণ বিভাগে আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অনুমান প্রমাণ বিভাগের পূর্ববৎ ও শেষবৎ সংজ্ঞায় আলোচনা (পৃঃ—১০৬) করিতে দেখা যায়। ইহা লক্ষণীয় যে ইহাতে সমবায়কে অনুমানমূলীভূত বলা হয় নাই বরং বিবিধ আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যক্ষমূলীভূত নিয়মসংশ্লিষ্ট বলা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ডে অন্যান্য পদার্থের মধ্যে প্রমেয় প্রকরণের ১।১।৩৪ সূত্র ব্যাখ্যাক্রমেও অনুরূপ আলোচনা করিতে দেখা যায়।

'পরিশুদ্ধি' রচনার পূর্বে সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র পৌত্র কেশবমিশ্র রচিত "তর্কভাষ্য" গ্রন্থের প্রথমেই "প্রমাত্ব" বিবেচনা প্রসঙ্গে "কারণ" বিষয়ক আলোচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থকার ত্রিবিধ কারণই স্বীকার করিয়াছেন এবং যে সম্বন্ধ ভিত্তিতে ইহাদের বিবেচনা হইতে পারে তাহাদিগকে সমবায় বা সংযোগ উভয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইতে পারে স্বীকারও করিয়াছেন ; সঠিক নির্দেশ দেন নাই, তবে কারণত্ব ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"যস্য কার্যাৎ পূর্বভাবো নিয়তোঽনন্য যা সিদ্ধিশ্চ তৎ কারণম্"।

আর অধিক অগ্রসর না হইয়া নব্যন্যায়ের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের আলোচনা বিবেচনা করিয়া প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিব। তত্ত্বচিন্তামণি অনুমান খণ্ডের অন্বয় ব্যতিরেকী

প্রকরণে (কেবল ব্যতিরেকী ও অর্থাপত্তির মধ্যবর্তী অংশে) সমবায়ি কারণ, অসমবায়ি কারণ ও নিমিত্ত কারণ স্বীকৃত। আচার্য গঙ্গেশ, উদ্যোতকর ও বাচস্পতি স্বীকৃত অন্বয় ও ব্যতিরেক ভিত্তি অস্বীকার করিয়া উক্ত বাচস্পতি সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ সূত্র অবলম্বনেই তাঁহার সমূহ প্রকরণ গ্রথিত করিয়াছেন। সেজন্য বহুভাষ্য মণ্ডিত হইলেও 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থ ন্যায়ালোচনার শেষ নহে বরং মীমাংসা ও বৈশেষিক দর্শন বিষয়ক সংশ্লিষ্ট এই গ্রন্থসূত্র অভিব্যক্তি নিয়মে যে বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহা রূপায়িত করিবার আশু প্রয়োজন রহিয়াছে। অবশ্য তদুদ্দেশ্যে ন্যায়বার্ত্তিক সূত্র—"সমবায়শ্চ কার্যকারণয়োর্বর্তত ইতি বৃত্তিরস্য বাচ্যা (পৃঃ—৫৩) ভিত্তি করিতে হইবে কিন্তু তর্কভাষ্য সূত্র—"যো হেতুরন্বয়ব্যতিরেকী স পঞ্চরূপোপপন্ন এব স্বসাধ্যং সাধয়িতুং ক্ষমতে, ন কেনাপি রূপেন হীনঃ (পৃঃ—৪২) প্রভৃতিও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

"ইহেদমিতি যতঃ কার্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ (৭।২।২৭)"—বৈশেষিক সূত্রস্থিত "ইদম্" শব্দ দ্বারা বিভ্রম বিবেকের ইঙ্গিত আসিলেও সমবায়ের কার্য-কারণ ভিত্তি মাত্র পাওয়া যায়, নিয়মের স্থান ইহাতে গৌণ কিন্তু আধুনিক পারমাণবিকযুগে Causal sense এবং Induction মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে তীব্র মতভেদ[১] থাকিলেও নৈয়ায়িক সমবায়ে সর্বত্র নিয়ামিকা স্বভাবশক্তি নিয়ম (Law of the uniformity of nature) প্রভৃতি, উক্ত কার্য-কারণ বিধির সমসূত্ররূপে পাশাপাশি থাকিতে পারে এবং এরূপ নির্দেশ উক্ত ন্যায় বার্ত্তিক গ্রন্থের "নৈষদোষো বিজ্ঞানস্যাধিকৃতত্বাৎ (পৃঃ—৪৫) উক্তি হইতে অবধারিত হয়। *

১ Of the two Newtonian classes of events (a) those that happen according to Law, (b) those that happen as the effects of causes ; class (a) has expanded to such an extent as to swallow up (b)—Collingwood's An Essay on Metaphysics.

* সম্পাদকীয় মন্তব্য :—এই প্রবন্ধের বহুস্থলে লেখক কোনও কোনও সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দের যে সকল ইংরাজী অনুবাদ (যথা সমবায়ি কারণ=Relation of co-existence, নিমিত্ত কারণ=Condition or relation of succession) ব্যবহার করিয়াছেন এবং যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি অনেকে গ্রহণ নাও করিতে পারেন। এ সম্বন্ধে কেহ কোনও আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার বক্তব্য আমরা 'দর্শন' পত্রিকায় ছাপিতে চেষ্টা করিব।

সৃষ্টির উদ্দেশ্য

(সত্যদর্শনানুমত)

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

এস্থলে প্রথমে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংক্ষেপে লিখিত হইতেছে। ইহার প্রমাণ পরে লিখিত হইবে। এই তিনটী উক্তিই পরমর্ষি গুরুনাথের।

"পরমাত্মার বিবংহয়িষা বা পরীচিক্ষিষা হইল। অর্থাৎ প্রেমগুণ প্রভাবে তিনি আপনাকে বহু করিতে অর্থাৎ বহুভাবে ভাসমান করিতে ইচ্ছা করিলেন অথবা বলা যাইতে পারে যে তিনি স্বীয় অনন্তগুণের পরীক্ষার্থ অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে কোন গুণ প্রধান, ইহা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। তদীয় উল্লিখিত অবিনাশিনী ইচ্ছাই তাঁহার সৃষ্টির প্রকৃতি হইল।" (ক)

"এই বিষয়টী পরিস্কৃতরূপে প্রকাশ করা যাইতেছে। পরমপিতার প্রেম, জ্ঞান প্রভৃতি যে অনন্ত গুণ আছে, তন্মধ্যে প্রেম প্রধান, কি জ্ঞান প্রধান, ইহা পরীক্ষা করাই সৃষ্টি ব্যাপার। এজন্য তিনি প্রত্যেক জীবাত্মাকে এক একটী প্রধান গুণ প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রত্যেককে কোন একটী গুণ অত্যধিক পরিমাণে (ক) দান করিয়া অপক্ষপাতিতা নিবন্ধন গড়ে সকলকেই তুল্য গুণ-বিশিষ্ট করিয়াছেন।" (খ)

"পরমপুরুষের বিবংহয়িষা বা অনন্তগুণের পরীচিক্ষিষা হইল। আমার যে অনন্ত গুণ আছে, যাদের মধ্যে কোনটীর কিরূপ শক্তি, ইহা পরীক্ষা করাই সৃষ্টি। এ কারণ সমস্ত অংশেই (ঘ) অনন্ত গুণ অত্যল্প পরিমাণে এবং কেবল কোনও

(ক) এই পরিমাণ তুলনামূলক (comparative)। অর্থাৎ অন্যান্য গুণের তুলনায় সেই বিশেষ গুণটীর পরিমাণ অধিকতর। নতুবা আদি জন্মে প্রত্যেকের গুণই ব্রহ্মের পূর্ণ গুণরাশির তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। এইরূপ গুণবিধান দেহের গঠন দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।

(খ) তত্ত্বজ্ঞান সাধনা।

(গ) তত্ত্বজ্ঞান-উপাসনা

(ঘ) অংশের অর্থ অংশভাবে ভাসমান, অবিচ্যুত হইয়াও বিচ্যুত ভাবে ভাসমান।

একটী গুণ অধিক পরিমাণে প্রদান করা হইয়াছে। যেমন কাহাকেও প্রেমগুণ কাহাকেও নির্ভরতা এবং কাহাকেও জ্ঞান ইত্যাদি অধিকরূপে দেওয়া হইয়াছে। ঐরূপ গুণসম্পন্ন ঐ সকল অংশের মধ্যে কে কিরূপে তাঁহাতে তন্ময় হইতে পারে, ইহাই পরীক্ষা এবং এই জন্যই সৃষ্টি। মূল কথা, এই পরীক্ষা বা সৃষ্টি ব্যাপার লীলাময়ের লীলা মাত্র। যে স্থানে সাধক এই মহতী লীলার মর্মবোধ করিয়া প্রযত্ন সহকারে তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন, সেই মহিষ্ঠ মহাত্মাই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনন্ত প্রেমানন্দ পারাবারে ও অনন্ত জ্ঞানানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়া চরিতার্থ হইতে পারেন।" (গ)

সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংক্ষেপে লিখিত হইল। ইহা যে সত্য, তাহা এখন প্রদর্শিত হইতেছে। এই তত্ত্বটী কেহই "তত্ত্বজ্ঞান" গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে জগতে প্রচার করেন নাই। কিন্তু শ্রুতিতে ইহা নিহিত আছে। কিন্তু ভাষ্যকারগণ শ্রুতির সেই উক্তির সেই রূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাই এই তত্ত্ব জগতে প্রচারিত হয় নাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র বর্তমান।

"স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত যদিদং কিঞ্চ।" (২।৬)

পরমর্ষি গুরুনাথের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"তিনি তপ করিলেন অর্থাৎ আত্ম গুণ সমূহের কোনটীর ঐশ্বর্য অধিক ইহা ইচ্ছা করিলেন। *এই যাহা কিছু, তৎসমুদায় তিনি পূর্বোক্ত ইচ্ছা করিয়াই সৃষ্টি করিলেন। (তত্ত্বজ্ঞান—সাধনা)

* তপ্ ধাতুর যে ঐশ্বর্য্য আছে, তাহার প্রমাণ এই :—

তপ ঐশ্বর্য্যে বা। বৃতুবরণে ইতি পাণিনিঃ।
অয়ং ধাতুরৈশ্বর্য্যে বা তঙ্ শ্যানৌ লভতে।
অন্যদাতু সাধ্বি করণঃ পরস্মৈপদীত্যর্থঃ।
কেচিত্তু বা গ্রহণং বৃতুধাতো রাস্তবয়বমিচ্ছন্তি।
ইতি ভট্টোজি দীক্ষিতঃ।

অর্থাৎ পাণিনির গণ পাঠে লিখিত আছে যে তপ ঐশ্বর্যে বা বৃতুবরণে। ইহার অর্থ পরবর্ত্তিগণ দুই প্রকার করেন। দৃষ্ট হইবে যে উভয় প্রকারেই দিবাদিগণীয় আত্মনেপদী তপ্ ধাতুর ঐশ্বর্য্যার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকার এই—

এই ধাতু ঐশ্বর্য্যার্থে বিকল্পে তঙ্ শ্যন্ লাভ করে। তঙ্=আত্মনেপদ। অন্য সময়ে শপ্ বিকরণ ও পরস্মৈপদ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় প্রকার এই :—

কেহ কেহ কিন্তু বৃতু বা গ্রহণ ধাতুর আদি অবয়ব (অর্থাৎ বা বৃত ধাতু) ইচ্ছা করেন।

প্রশ্নোপনিষদের ১।৪ মন্ত্রে অবিকল ঐরূপ উক্তিই বর্তমান। মুণ্ডক উপনিষদের ১।১।৮ মন্ত্রে আছে "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম।" সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে ঔপনিষদিক ঋষিগণের জ্ঞানোজ্জ্বল হৃদয়ে এই তত্ত্বও প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু ভাষ্যকারগণ উক্ত মন্ত্রের ঐ রূপ ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়াই উক্ত তত্ত্ব জগতে এ পর্যন্ত প্রচারিত হয় নাই। জগতে যে অতি বিচিত্রতা বর্তমান, ইহা সর্ববাদি সম্মত। ইহার মূল কারণও ঐরূপ বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন প্রকার গুণের বিধান। জড় জগৎ জীবের জন্যই। এই গুণবিধান বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন গঠন দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ এক একটী দেহে এক একটী গুণ বিরোধী আবরণ অল্পতর করা হইয়াছে, অন্যান্য গুণবিরোধী আবরণ অধিকতর করা হইয়াছে। এইরূপ ভাবেই জীবে জীবে এমনকি এক জাতীয় জীবের মধ্যেও পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে। কেহ জ্ঞানের পক্ষপাতী, কেহ প্রেমের সাধক, কেহ দয়াকেই সর্বস্ব মনে করেন, কাহারও শান্তভাবে আনন্দ, কাহারও বা ভীষণ ভাবে আনন্দ। সুতরাং গুণ-বিধান, সুতরাং স্বগুণ পরীক্ষা যে বিচিত্রতার মূলে, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে এক একজন এক একটী গুণ দ্বারা বিশেষ ভাবে পরিচালিত। যাহারা জ্ঞান পন্থাবলম্বী সাধক অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানকেই একমাত্র মুক্তির পথ বলিয়া মনে করেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রেমপন্থাবলম্বী-দিগকে বিদ্রূপ করেন এবং প্রেমের পথ অবলম্বনীয়ই নহে বলিয়া থাকেন। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদিগণ জ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্মের যে প্রেম গুণও আছে অর্থাৎ তিনিই যে একাধারে জ্ঞান স্বরূপ ও প্রেম স্বরূপ, ইহা পর্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাহারা প্রেমকে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ মাত্র বলিয়া থাকেন; আবার এমনও মহা-প্রেমিক সাধক দেখা যায় যে যিনি জ্ঞানের নাম মাত্র শুনিতে পারেন না। জ্ঞানকে তাহারা শুষ্ক তর্কের বিচার মাত্র বলিয়া থাকেন; এমনকি, তাহারা জ্ঞানকে প্রেম সাধনার বিরোধী বলিয়া থাকেন।

কেহ কেহ দয়ার পন্থা অবলম্বন করেন, অর্থাৎ তাহারা পরোপকারই একমাত্র ধর্ম বলিয়া মনে করেন। বর্তমানে যাহারা দরিদ্রদিগকে অন্নবস্ত্র দান করেন, রোগী-দিগের চিকিৎসা, সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন এবং আর্ত্ত ও দুস্থদিগকে নানাভাবে সাহায্য দান করেন, তাহারা দয়ামার্গাবলম্বী। কেহ কেহ একাগ্রতাকেই পরমধন

তেষাং মতে ঐশ্বর্য্যে তপ্যতে ইত্যেব প্রয়োগো ন তু তপতীতি। ইতি তত্ত্ববোধিনী।

অর্থাৎ তাহাদিগের মতে ঐশ্বর্য্য অর্থে "তপ্যতে" এই প্রকারই প্রয়োগ হয়; কিন্তু তপতি এই প্রকার হয় না। আর পূর্ব্ব মতে তপ্যতে ও তপতি উভয় প্রকারই হয়।

মনে করেন এবং তাহা লাভ করিবার জন্য নানাবিধ সাধন করেন। আবার কেহ কেহ পবিত্রতাকে পরমবস্তু মনে করিয়া সুনীতির একান্তভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সাধন ভজন দ্বারা নিজেকে সর্বদা সুপবিত্র রাখিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ সত্যই একমাত্র পালনীয় মনে করিয়া সর্বদা কায়মনোবাক্যে সত্যরক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। কেহ বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করেন। আবার অন্যজন সংসারে থাকিয়া স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া পরম পিতার উদ্দেশ্যে সাধন ভজন করেন। শ্রেয় সাধক বলেন "তূর্ণং গৃহাদ্ গম্যতাম্" অর্থাৎ শীঘ্রই গৃহ হইতে বাহির হও। আবার প্রেয় সাধক বলেন "গৃহ হইতে নির্গত হইয়া কি ফল লাভ হইবে? যখন যেখানে থাকিব, তখন তাহাই গৃহস্বরূপ হইয়া কার্যের ব্যঘাত ঘটাইবে, অতএব ঘরে বসিয়াই কার্য করি। আরও তিনি বলেন যখন গৃহের কর্ত্রীকে দেখিতে পাওয়া যায় না এবং ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবারও এক্ষণে সামর্থ নাই, তখন সেই কর্ত্রীর সন্তানদিগকে বাহিরে পাইয়া তাহাদিগকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিলে যেমন যথা সময়ে তিনিও আমাকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইবেন তদ্রূপ জগদীশ্বরের পুত্রকন্যাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিলে সেই পরাৎপর প্রেমময় জগদীশ্বর অবশ্যই আমাকে দর্শন দিবেন।"

কেহ কেহ সরলতার পথ অবলম্বন করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইতেছেন, কেহবা বুদ্ধির অপব্যবহার করিয়া কুটিল বক্র পথই কাম্য মনে করেন এবং সেই অনুযায়ী তাহার কর্ম পন্থা নির্দেশ করেন। কেহ কেহ শান্ত নিরাবিল জীবন যাত্রাই কামনা করেন, আবার কেহ কেহ নানারূপ ব্যস্ততা, গোলমালের ভিতর দিয়াই চলিতেছেন, যেন কিছু একটা বিপরীত ঘটনা না ঘটিলে তাহ্যর দিন ভাল যায়না, তাহাতেই যেন তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। অর্থাৎ কাহারও শান্তভাবে আনন্দ, কাহারও ভীষণ ভাবে আনন্দ। কেহ কেহ work is worship অর্থাৎ কর্মই শ্রীভগবানের পূজা বলিয়া মনে করিয়া কর্মযোগ অবলম্বন করেন, আবার কেহ বা ভক্তিযোগ, কেহবা জ্ঞানযোগ অবলম্বনে নিজ নিজ জীবনের গতি নির্দেশ করেন। কেহ বা অত্যন্ত দুর্ব্বল হৃদয় এবং সর্ব্বদা ভীত ও সশঙ্কিত, আবার কেহ কেহ সাহসের এবং সময়ে দুঃসাহসের উপর নির্ভরশীল। কাহারও মধ্যে ইচ্ছাশক্তি যেন লয়প্রাপ্ত, তিনি পাপ ও দোষকে মুষ্ট্যাঘাতে দূরে রাখিতে পারেন না, আবার কেহ ইচ্ছাশক্তি দ্বারাই সকল জয় করিয়া নিঃশঙ্ক সংসারে বিচরণ করেন। এইরূপ শত সহস্র ভাবে চিন্তা করিলে আমাদের এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে যে এক একজন এক একটি গুণকে বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়া পথ চলিতেছেন। "ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ",

No two men fully agree প্রভৃতি বাক্য দ্বারা এবং আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা বহু ভাবে এক হইলেও আমাদের প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেকেই সকলের সাথে মিল রাখিয়াও এক একটা বিশেষ পন্থা ধরিয়াই জীবন পথে অগ্রসর হইতেছেন। যমজ ভ্রাতা ও ভগ্নিদ্বয়ের মধ্যেও সম্পূর্ণ মিল থাকে না। একই গুরুদেবের দুইটী প্রিয়তম সাক্ষাৎ শিষ্যের সাধনার পন্থাই যে কেবল বিভিন্ন থাকে তাহা নহে, কিন্তু সময় সময় মতেরও বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং আমরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে জীবাত্মা মাত্রেরই সকল গুণ থাকিলেও তাহাদের প্রথম অবস্থায় এক একটি গুণের বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার জন্যই জনে জনে এত পার্থক্য। অতএব ইহা প্রমাণিত হইল যে প্রত্যেক জীবের মধ্যে জন্মাবধি এক একটী বিশেষ গুণের বিকাশ সম্ভব হয়। এইরূপে বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন বিকাশ দেহের গঠণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই সম্বন্ধে "তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা" গ্রন্থের "গুণ বিধান" অংশে বিস্তারিত ভাবে লিখিত হইয়াছে। এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে কাহারও দেহ অন্য কাহারও দেহের সহিত মিলেনা। "No two clocks can go together" বাক্যটিও এস্থলে উপমা স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। জড়-জগৎ ও তদুৎপন্ন জীবদেহ আমাদের বাধা স্বরূপ সৃষ্ট হইয়াছে।* যেস্থলে পরীক্ষা, সেই স্থলেই বাধার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে। এক একজনের দেহ এমনি ভাবে গঠিত হইয়াছে যে সেইরূপ গঠণের জন্য উহা এক একটী বিশেষ গুণের সম্বন্ধে অন্যান্য গুণ অপেক্ষা অল্পতর বাধা উৎপাদন করে। এইরূপ ভাবেই বিভিন্ন দেহ বিভিন্ন গুণের অধিকতর বিকাশের সুযোগ দান করে।

এতক্ষণ আমরা দেখিলাম যে প্রত্যেকের মধ্যে এক একটী গুণের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। অন্যান্য গুণেরও বিকাশ আছে বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত অল্পতর। এখন আমরা গুণের পরীক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। সাধক মাত্রই জানেন যে এক একটী গুণ সাধনার পথে কতই পরীক্ষা উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে কতই কঠোর তপস্যার প্রয়োজন হয়। সাধকদিগের মধ্যে অনেকেই জানেন এবং কাহারও কাহারও বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে যে শত চেষ্টায়, শত আকুল প্রার্থনায়ও যেন গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়া যায় না। কত সাধকের কত হৃদয় বিদারক ক্রন্দনধ্বনি আকাশে বাতাসে উত্থিত হইতেছে, তথাপিও তিনি যেন কুল পাইতেছেন না।

---

* এই জড় জগৎ ও দেহও বাধা নিরসনের সাহায্য করে। "কণ্টকেনাবিদ্ধ কণ্টকম্"।

এক অর্থে আমরা সকলেই সাধক। সকলেই আমরা অনন্ত করুণাময়ের করুণায় তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছি, যদিও আমরা সকলে জানিতেছি না যে আমরা কোন প্রকার সাধনা করিতেছি। আমরা যদি নিজেদের জীবন বিশেষ ভাবে পর্য্যালোচনা করি, তবেই দেখিতে পাইব যে কত অধিক পরীক্ষা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কখনও কখনও তাহা হইতে আমরা উত্তীর্ণ হইয়াছি, আবার কখনও কখনও অকৃতকার্য্যও হইয়াছি। এক কথায় বলিলে বলিতে হয় যে আমাদের জীবন সংগ্রামে পূর্ণ। এস্থলে পরীক্ষার আগুনে বহুবার দগ্ধ হইতে হয়। এস্থলে পরীক্ষার কঠিন আঘাত সহ্য করিতে হয়, এস্থলে বারংবার পতনের নির্ম্মম যাতনা শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হয়, এস্থলে লজ্জা, অপমান, দুঃখ, জ্বালা বরণ করিয়া লইতে হয়। কিন্তু ধন্য অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমের বিধান, যাহাতে এই সকল দুঃখ দুর্দ্দশা মহার্ঘ বলেই পরিণত হয়।

সাধারণতঃ পার্থিব কার্য্য সমাধা করিতেও আমাদের পরীক্ষায় পতিত হইতে হয় এবং তাহা হইতে উদ্ধার পাইতে অত্যধিক বেগ পাইতে হয়। এখন আধ্যাত্মিক গুণ-সাধনায়ও যে পরীক্ষার সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়, সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইতেছে।

যাহারা প্রেম সাধনা করেন তাঁহারা জানেন যে তাহাদের পথে বহু বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগকে সময় সময় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, লজ্জা, অপমান ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যদি তাহাদের প্রেমগুণ প্রবল হয়, তবে পরিশেষে তিনি জয়লাভ করেন। পরমর্ষি গুরুনাথ গাহিয়াছেন :—

প্রেমপুরে পশিবারে চাহিছ অবল মন,
সে পুরে গমন, আদি-অন্তে সুখের সদন।
মধ্যে তার বধ্য হয় জন, কিম্বা দগ্ধ অনুক্ষণ,
শুনি তার বিবরণ, যে হয় কর বিধান।
মুখ ভাগে সুখ তার, পরে পথ দুঃখগার,
কণ্টকিত প্রায় তার, পরে বহু দূর—
পরে সংশয় শেখর, শেখর তার উচ্চতর,
অতিক্রম করা ভার, বলহীন যেইজন।
যার আছে একাগ্রতা, করুণরস, মমতা,
অভিমান বিহীনতা, নিঃস্বার্থতা আর—
পশিতে পারে সে তথা, ঘুচে তার মনোব্যথা,
দেখে অপরূপ, সেই বিবেকাঞ্জন লোচন।

প্রেমগুণ প্রবল থাকিলে সাধনার পথে আগত সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন সুদূরে সংস্থাপন করিতে পারা যায়। দুর্দ্দান্ত দস্যু জগাই মাধাইর উদ্ধার কাহিনী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রেমের পথে ভীষণ পরীক্ষা হইতেও উত্তীর্ণ যওয়া যায়। প্রকৃত প্রেমিক প্রবর মহাপুরুষ নিত্যানন্দ বলিয়াছিলেন :—

"মেরেছিস্ মেরেছিস্ কলসীর কাণা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না॥"

অবশেষে নিত্যানন্দের প্রেমের জয়ই হইল। মহাপাপী জগাই মাধাইর শুভ পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। জগাই বলিতে বাধ্য হইয়াছিল :—

"নিতাইরে আর মারিস না মাধা ভাই,
মা'র খেয়ে প্রেম যাঁচে এমন প্রেমিক দেখি নাই।"

প্রেম সাধনার পথে যে কত বিঘ্ন কত বাধা তাহা কে নির্ণয় করিবে? তাই যাহার প্রেমগুণ প্রবল না থাকে, যাহার নিঃস্বার্থতা, অভিমান বিহীনতা, সহিষ্ণুতা,, একাগ্রতা, পবিত্রতা প্রভৃতি গুণ না থাকে, তাহার পক্ষে প্রেম-গুণ-সাধনা সুকঠিন হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, তাহার প্রেম সাধনার পথের বিঘ্নরাশি দূরীকরণের জন্য উক্ত গুণ সমূহের একান্ত প্রয়োজন।

জ্ঞান সাধনার সম্বন্ধে কি বলিব? ইহার পথে পরীক্ষার বোধ হয় শেষ নাই। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণতাই জ্ঞান সাধনার শেষ, অনন্ত মুক্তিরও শেষ বা পূর্ণামুক্তি।

প্রেম-ভক্তি-রেকাগ্রত্বং সরলতা পবিত্রতা;
বিশ্বাসশ্চেতি ষড়্জ্ঞেয়া গুণাঃ পরম সংজ্ঞকাঃ॥
"জ্ঞানান্মোক্ষ" বাচ্যমেতদ্ বহূক্তং সাধুসত্তমৈঃ।
তজ্জ্ঞানঞ্চ ফলং জ্ঞেয়ং ষণ্ণামেষাং মনোরমম্॥

(সত্যামৃত)

বঙ্গানুবাদ :—প্রেম, ভক্তি, একাগ্রতা, সরলতা, পবিত্রতা, এবং বিশ্বাস এই ছয়টী পরম গুণ। "জ্ঞান হইতে মোক্ষ লাভ হয়" ইহা উত্তম সাধুগণ বলেন। এই ছয়টী পরম গুণের মনোরম ফলই সেই জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ উক্ত ছয়টি পরমগুণে পরমোন্নতি লাভ হইলে উহার ফল স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং উহা যে কত উচ্চস্তরে অবস্থিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। পরমর্ষি গুরুনাথ সুখ সম্বন্ধে লিখিতে যাইয়া অন্যত্র বলিয়াছেন :—

"আত্মা বিমল সুখের (শান্তি বা আনন্দের) নিত্য নিকেতন। নিরন্তরই আত্মায় সুখরাশি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু যেমন সূর্য্যোদয় প্রতিদিন হইলেও মেঘাচ্ছন্ন

দিবসে সূর্য্যতেজঃ অনুভূত হয় না, তদ্রূপ আত্মায় নিত্য সুখ বর্ত্তমান থাকিলেও জড়াত্মবোধ নিবন্ধন উৎকট দুস্ত্যজ মোহে উহা সুখানুভবে সমর্থ হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান লাভই সুখলাভের উৎকৃষ্ট উপায়।

অপর, সূর্য্য নিরন্তর বর্ত্তমান থাকিলেও পৃথিবী স্বকীয় আবর্ত্তন দ্বারা আপনার যে অংশকে সূর্য্যকিরণ লাভে বঞ্চিত করে, তথায় সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত সুবিমল চন্দ্র কিরণ পতিত হইয়া যেমন ঐ অংশকে প্রদীপ্ত করে,—তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব সময়েও প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি কোমল গুণনিচয় দ্বারা মানবগণ সুখী হইতে পারে।"

এই উদ্ধৃত অংশ সম্বন্ধেও উপরোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের স্থান অতি উচ্চে। সুতরাং উহার সাধনার পথে পরীক্ষাও অসংখ্য এবং সুকঠিন। "দুঃখ বিনা সুখলাভ হয় না মহীতে"। যাহাতে অত্যন্ত সুখ লাভ হয়, তাহার মূল্যও অত্যধিক। তাহা লাভ করিতে সেইরূপ অধিকতর ও কঠিনতর পরীক্ষা দিতে হয়, সুতরাং অসীম দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

অপর দিকে অতি নিম্ন স্তরের অপরা বিদ্যালাভেও যে কত পরীক্ষা, তাহা আমাদের সকলেরই জানা আছে। গুণলাভের জন্য শিক্ষাগুরুর, জ্ঞানী, ভক্ত, মহাজনদিগের এবং দীক্ষাগুরুর শরণাপন্ন হইতে হয়। প্রকৃতি-গ্রন্থ হইতে যে আমরা অসীম জ্ঞান লাভ করিতে পারি, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃতি হইতে জ্ঞান লাভ করা অত্যন্ত কঠিন এবং ইহার জন্য বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয় এবং সেইজন্য যথেষ্ট সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। কিন্তু মানব সাধারণের সেই একান্ত বাঞ্ছনীয়া সহিষ্ণুতা কোথায়?

জ্ঞানলাভের প্রথম অবস্থায় শুষ্কতাই আমাদের সর্ব্ব প্রধান বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। সংশয়রূপ মহাদোষও যে জ্ঞান লাভের পক্ষে কত বিঘ্ন উৎপাদন করে, তাহা কে বর্ণনা করিবে?* জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষাদাতার প্রতি শ্রদ্ধা থাকাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

বঙ্গানুবাদ:—জ্ঞাননিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরম শান্তি লাভ করে। (গৌরগোবিন্দ রায়)

এস্থলে ভক্তিজ্ঞান স্বর্গগত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নিকট হইতে শ্রুত

---

* আবার সংশয় উপস্থিত না হইলে জ্ঞান-লাভের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। ধন্য অনন্ত মঙ্গলময়! ধন্য তোমার অনন্ত মঙ্গল বিধান। এই অপূর্ব্ব বিধানের কে বর্ণনা করিবে?

তাঁহার জ্ঞানসাধনার অতি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত হইতেছে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর প্রথমে ভাব ও উচ্ছ্বাসের সহিত উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি সম্পাদন করিতেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই তাঁহার শুষ্কতা, সংশয় ও জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছিল। তদানীন্তন একাধিক ব্রহ্ম সাধকের নিকট তিনি জিজ্ঞাসু হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মীমাংসায় তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তাঁহার হৃদয়ের শুষ্কতা অপসারিত হইয়াছিল না, তাঁহার সংশয়ান্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল না। তৎপর তাঁহার প্রশ্নের সুমীমাংসা লাভের জন্য তিনি পাশ্চাত্য দর্শন, বিশেষতঃ Neo-Hegalian Philosophy পর্য্যালোচনা করিলেন এবং অবশেষে তিনি উপনিষদ, বেদান্তদর্শন প্রভৃতি বহু আর্য্যশাস্ত্র পাঠ করিয়া সংশয়ের অতীত হইয়াছিলেন। তিনি শেষে প্রকাশ্যেই বলিতেন যে কেহই তাঁহাকে আর অন্ধকারে টানিয়া নিতে পারিবে না, তিনি ধ্রুব জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং জ্ঞানসূত্র ধরিয়াই তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সরল ও প্রাঞ্জলভাবে প্রমাণ করিতে পারেন। তিনি যে সত্য-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত বহু দার্শনিক গ্রন্থ বিশেষতঃ "ব্রহ্ম প্রেম সুধাসিন্ধু" নামক নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিতেছে।

তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের জীবন গ্রন্থ পাঠে আমরা যাহা লাভ করি, তাহা অন্যত্র প্রায় দেখা যায়না। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে প্রথম ভাবোচ্ছ্বাসের পর অনেকেরই শুষ্কতা উপস্থিত হয়। তাহাই তাহার জীবনের উন্নতি শেষ করিয়া দেয়। সেই শুষ্কতার দূরাপসরণে যে চেষ্টা, যে অধ্যবসায়, যে সংগ্রাম একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা হইতে অনেকেই নিরস্ত থাকেন। সুতরাং পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়া তাহাদের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞান উপার্জ্জনে আমাদের অত্যধিক সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য্য, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণও একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সাধারণে হাল্‌কা ভাবেই থাকিতে চায়। এই পাতলা রসপ্রিয়তা জ্ঞান লাভের একটী প্রধান অন্তরায়। ইহা প্রত্যক্ষীভূত সত্য যে বহুকাল যাহারা উপন্যাস জাতীয় হালকা পুস্তক পাঠ করেন, তাহারা অপরা বিদ্যার গভীর জ্ঞান-গর্ভ গ্রন্থ পাঠ করিতেও অসমর্থ হন; তাহাদের পক্ষে কঠিন তত্ত্ব সমূহ সম্বন্ধে সুগভীর চিন্তা করা অসম্ভব হয়। জ্ঞান লাভের জন্য অত্যধিক একাগ্রতাও প্রয়োজনীয়। ইহা পরা ও অপরা উভয়বিধ বিদ্যা সম্বন্ধেই প্রয়োজ্য; জ্ঞানার্জ্জনে স্থির চিত্ত ও ধ্যানশীল না হইতে পারিলে উহার লাভ সুকঠিন ও বহু কাল সাপেক্ষ। কিন্তু মানব সুলভ বিক্ষিপ্ত চিত্ততা যে জ্ঞান সাধনার পথে পরিপন্থী তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। বহুব্যক্তি জ্ঞানলাভের জন্য ইচ্ছুক এবং ইচ্ছা

প্রণোদিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে জ্ঞানলাভের পথে নানাপ্রকার কাঠিন্য দর্শন করিয়া আরম্ভেই পাঠ বন্ধ করেন।

যাহারা দয়াগুণের সাধনা করিতেছেন, তাহারা জানেন যে তাহাদের সম্মুখে স্বার্থত্যাগ রূপ বাধা, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হয়, কিন্তু দয়াকে যাহারা ব্রত রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা ক্রমশঃ সকল বাধা অতিক্রম করেন। কাহারও কাহারও পক্ষে বাধা আসিয়া সাময়িকভাবে বিব্রত করিয়া তুলে, কিন্তু তাঁহার দয়া বলবতী হইলে তিনি পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন এবং অবশেষে দয়া গুণেরই জয় হয়। এস্থলে আমরা প্রাতঃস্মরণীয় দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারি। তিনি দয়া পরবশ হইয়া কত অর্থ যে অকাতরে দান করিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে? তিনি কেবল সঞ্চিত অর্থ দান করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহার দানেব জের মিটাইতে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছিল। বহু বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত থাকায় নারীদিগের এবং বাল-বিধবাদিগের মহাদুঃখে তাঁহার মর্ম্মস্থল হইতে করুণ ক্রন্দন উত্থিত হইয়াছিল। তাই তিনি তাঁহাদের দুর্দশা মোচনার্থ জীবন পণ করিয়াছিলেন। এত যে দয়ার কার্য্য, তাহাতে কি তাঁহার পথে বিঘ্ন আসিয়া ছিল না? যাহারা তাঁহার জীবন চরিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহারাই জানেন যে তাঁহার পথে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহাকে হত্যা করিতেও লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। উপকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার গুণকীর্ত্তন না করিয়া তাঁহার নিন্দা করিতেন। কিন্তু তিনি সকল পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দয়ার জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত এবং আরও শত শত প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার শক্তি যাহাদের না থাকে, তাহারা বহু কষ্টসাধ্য দয়া গুণে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না। উত্থান ও পতন মানব জীবনের একটী বিশেষ লক্ষণ। সুতরাং সকলের পক্ষে প্রথম পতনই শেষ পতন নহে। কিন্তু প্রত্যেক প্রকার সাধকেরই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যাহাদের এই দুইটী গুণ উন্নত নহে, তাহাদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ সুকঠিন। "Failures are but the pillars of success." এই মহাবাক্যও জীবনে যে পরীক্ষা বর্ত্তমান, তাহা প্রমাণ করে।

একাগ্রতা সম্বন্ধেও যদি আমরা চিন্তা করি, তবে সেই স্থলেও পরীক্ষার বর্ত্তমানতা দেখিতে পাওয়া যায়। একাগ্রতা সাধনায় অতি চঞ্চল মনকে বারংবার

লক্ষ্যস্থলে ফিরাইয়া আনিতে হয়। এই গুণ সাধনার আরও অনেক প্রণালী বর্ত্তমান। কিন্তু পৃথিবীতে আমাদিগকে যেন সহস্র দিক হইতে আকর্ষণ করিতেছে। চিত্ত বিক্ষেপের শত শত কারণ আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান। তাই এই সাধনায়ও বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং একাগ্রতার বল না থাকিলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতে হয়। কিন্তু যাহার একাগ্রতা বলবতী, তিনি পরিশেষে লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইতে পারেন। ভারতবর্ষে যোগ সাধনার ফল স্বরূপ যোগ সাধকে আমরা একাগ্রতা ও ইচ্ছা-শক্তির প্রাবল্য দেখিতে পাই। সেইরূপ একাগ্রতা সাধন যে কতদূর দুঃসাধ্য, যোগিগণ সবিস্তারে বলিতে পারিবেন। সাধারণেরও যে এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা নাই, তাহা নহে। এই একাগ্রতা সাধন পথে আরও বহু পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তাই কেহ কেহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় যোগ ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য স্বরূপ। সত্যের অনন্ত মহিমা, তাহার আভাস দিবার শক্তিও যে আমার নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। জগতের সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছেন। রামায়ণ, মহাভারত, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, মনুসংহিতা, বিষ্ণুপুরাণ, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ বিশেষ ভাবে সত্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেই সকল গ্রন্থ পাঠে তাহা জানিতে পারিবেন। সত্যের সাধনা অতি কঠোর সাধনা। সত্য কথন দ্বারাই এই সাধনার আরম্ভ হয়। 'সদা সত্য কথা বলিবে' এই মহাবাক্য বর্ণ পরিচয়ে লিখিত আছে বটে, কিন্তু এই মহদুপদেশ জীবনে সম্পূর্ণভাবে পালন করা যে কত কঠিন, কত দুরূহ ব্যাপার, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

পৃথিবী যে জটিল কুটিলতাময় সংসারে পরিণত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে আমাদের বিন্দুমাত্রও চিন্তার প্রয়োজন হয় না। জগতে যে সংসার কত প্রকারে তাহার কুটিল জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, তাহা সহজবোধ্য। পৃথিবীতে এমন বিভাগ নাই যেস্থলে অসত্য রাজত্ব করিতেছেনা। বর্তমান জগতে রাজনীতির এত অধিক প্রাবল্য যে ধর্ম্মের সাধনা যেন ইহা দ্বারা একান্তভাবে আবৃত। রাজ-নীতি কুটনীতি। ইহা যে অসত্যে পরিপূর্ণ তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। Language of diplomacy কখনই সত্যে পূর্ণ হইতে পারে না। উক্ত নানা কারণে সাধারণ জনগণের ইচ্ছা থাকিলেও তাহারা সত্য রক্ষা করিতে পারেন না। আবার সত্যময়তা লাভের জন্য কেবল সত্য কথনই একমাত্র কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু কায়মনোবাক্যে সর্বদা সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে সত্য রক্ষা করিতে হইবে। এই পথে যে কত অসংখ্য বিঘ্ন, তাহা সেই পথের সাধক মাত্রই জানেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিও

সেই বিঘ্নের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন। স্থূল, এই জটিলতাপূর্ণ—মিথ্যাপূর্ণ জগতে আমরা মিথ্যা দ্বারা এতদূর আকৃষ্ট হইতেছি এবং মিথ্যার অন্ধকারে এতদূর আচ্ছন্ন যে সর্বাবস্থায়ই মিথ্যা যে মহাপাপ, সেই জ্ঞানই আমাদের নিকট হইতে দূরীভূত হইয়াছে। সুতরাং সহজেই বুঝিতে পারি যে সত্য সাধন পথে অসংখ্য পরীক্ষা উপস্থিত হয়। যাহার সাধন বল আছে, তিনিই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। সাধারণ সাধকের পক্ষে বহু উত্থান ও পতনের জন্য বহু কঠিন আঘাত সহ্য করিতে হয়।

আর্য্য শাস্ত্রে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের উল্লেখ আছে। পূর্ণা মুক্তিই জীবের পরিণতি। কিন্তু উহার আরম্ভ ধর্ম্মেই। বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্ম বলিতে ধর্ম্ম ও মোক্ষ উভয়কেই বুঝায়। ইহা বোধ হয় Religion শব্দের ভাব হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং গুণ সাধনাও যাহা ধর্ম্ম সাধনাও তাহা। উহাতে যে অসংখ্য বিঘ্ন বর্ত্তমান, তাহা নানভাবে এস্থলে লিখিত হইতেছে। ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ নিয়মানুবর্ত্তিতা অর্থাৎ গুরুদেব এবং মহাজনদিগের উপদেশ অনুযায়ী মোক্ষ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় যে জীবনকে নিয়মিত করা, তাহাকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। শারীরিক ধর্ম্ম, মানসিক ধর্ম্ম, সামাজিক ধর্ম্ম, রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি আছে। অর্থাৎ সেই সেই ক্ষেত্রে সাধু, সজ্জন ও অভিজ্ঞব্যক্তি দ্বারা অনুমোদিত ও বিধিবদ্ধ বিধান সমূহের অনুবর্ত্তনকে সেই সেই ক্ষেত্রের ধর্ম্মসাধন বলা যাইতে পারে। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসাধনেও যে কত অধিক পরীক্ষা, তাহাও সর্ব্বজন বিদিত। নিয়মভঙ্গ করিতেই যেন আমাদের অত্যাগ্রহ, কিন্তু উহা রক্ষা করিতে আমাদের উৎসাহ উদ্যম নাই। সুতরাং বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী রূপে উপস্থিত হয়। অনেকেই অত্যল্প কালও নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। ব্রত গ্রহণ করিয়া বিনা কারণে বা তুচ্ছ কারণে উহা ভঙ্গ করা হয়। আমাদের এমনই দুর্দ্দশা। সুতরাং এ পথে সামান্য পরীক্ষা আসিলেও আমাদের পতন হয়। ধর্ম্মই মোক্ষের মূল বা ভিত্তি। সুতরাং ভিত্তি পাকা করিতে গেলেই সেই সেই পথে সাধকের বহু পরীক্ষার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অনিবার্য্য। ইহা সহজবোধ্যও বটে।

এইরূপ ভাবে অন্যান্য গুনরাশি সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাইব যে গুণ সাধনা মাত্রেই অবশ্যম্ভাবিরূপে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং সাধনীয় গুণের তৎকালীন শক্তি অনুযায়ী সাধকের কৃতকার্য্যতা ও অকৃতকার্য্যতা লাভ হয়। সকলেই যে সকল সময় তাহাদের সাধনীয় বিশেষ গুণের জয় দেখিতে পাইবেন, তাহা সম্ভব নহে। প্রারম্ভ ও মধ্যভাগে প্রায়শঃ জয় পরাজয়, উত্থান পতন অবশ্যই

থাকিবে। কিন্তু একাগ্র সাধনা করিতে থাকিলে আজ না হয় কাল, এ জন্মে না হয় অন্য জন্মে, এ লোকে না হয় পরলোকে সেই সাধনার ফল যে অবশ্যই ফলিবে, তাহা সুনিশ্চিত।

এস্থলে ভক্ত সমাজে প্রচলিত নিম্নলিখিত উক্তিটীর প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীশ্রীভগবান সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে—

যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ,
তবু যদি না ছাড়ে আশ, তবে হই তার দাসানুদাস।

এই উক্তির শাব্দিক অর্থ যদিও আমাদের সম্পূর্ণরূপে অনুমোদিত নহে, কিন্তু উহার ভাবার্থ যে আমাদের মত সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে অর্থাৎ সাধনার পথে বহু পরীক্ষা উপস্থিত হয়, উহা সুনিশ্চিত। খ্রীষ্টদেব শিষ্যগণকে পরম পিতার নিকট যে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত উক্তি আছে :—

Lead us not unto temptation out deliver us from evil.

এই প্রার্থনায়ও দেখা যায় যে আমাদের জীবনে পরীক্ষা আসে। স্বয়ং খ্রীষ্টদেব সম্বন্ধে লিখিত আছে যে তিনি পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অনন্ত কৃপাময় পরম পিতার অপার কৃপায় সেই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ রাত্রি সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার নিকট ভীষণতম পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি পরদিনের সকল অবস্থাই দিব্য চক্ষে সন্দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই নিজ জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি দৈহিক মৃত্যুকেই বরণ করিলেন এবং "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই মহামন্ত্র সাধনে সিদ্ধ হইলেন। মৃত্যুতে তাঁহার নির্ভরতা নামক পরম গুণের জয় সংসাধিত হইল এবং তাহারই ফলে জগতে তাঁহার একমাত্র প্রাণের ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিল। ধন্য মহাপুরুষের অপূর্ব্ব-নির্ভরতা, ধন্য তাঁহার অতি মূল্যবান জীবন-উৎসর্গ। তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে যাবচ্চন্দ্র দিবাকর বিঘোষিত হইবে।

কঠোপনিষদ্ বলেন :—

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্যবরান্নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। (৩।১৪)

বঙ্গানুবাদ :—(হে জীবগণ, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে) উত্থান কর, জাগ্রত হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণের নিকট যাইয়া (পরমাত্মাকে) জ্ঞাত হও। ক্ষুরের শাণিত ধার

যেমন দুরতিক্রমণীয়, তেমনি সেই (তত্ত্বজ্ঞানরূপ) পথকেও পণ্ডিতগণ দুর্গম বলিয়াছেন। (তত্ত্বভূষণ)

ইহাতেও দেখা যায় যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ কত সুকঠিন। এই পথকে ক্ষুরধারের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সুতরাং পথ যে কত বিঘ্নসঙ্কুল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

কঠোপনিষদেও দেখা যায় যে যম নচিকেতাকে বহু প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সকল প্রলোভন অগ্রাহ্য করিয়া সত্যতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যায় যে জীবন মাত্রই পরীক্ষাময়।

সকল প্রকার সাধকগণই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে সাধনার পথে বহু পরীক্ষা আসে এবং উপযুক্ত সাধনা বলে তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ধর্ম্ম প্রচারই বলুন, সমাজ সংস্কারই বলুন অথবা পরপোকারই বলুন, উহাদের সকলের মূলেই প্রেম বর্ত্তমান। যিনি যত প্রেম সাধনায় উন্নত, তিনি উক্ত কার্য্য সমূহ সম্পাদনে ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু দেখা যায় যে প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক-দিগের মধ্যে খৃষ্টদেব ক্রুশ বিদ্ধ হইয়াছিলেন, মহাপুরুষ মহম্মদদেবের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, রাজা রামমোহন রায়ের জীবননাশের জন্যও চেষ্টা হইয়াছিল, অপার স্নেহময়ী মাতৃদেবীকে এবং একান্ত পতিগত প্রাণা সাধ্বী সতী ধর্ম্মপত্নীকে বাড়ীতে রাখিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কেবল যে জগৎ প্রসিদ্ধ মহাপুরুষগণই ঐরূপ ভীষণ পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন তাহা নহে। অখ্যাত কিন্তু সাধনায় উন্নত বহু ধর্ম্ম প্রচারক ও সমাজ সংস্কারকগণও নানাবিধ কঠিন পরীক্ষার আগুনে দগ্ধ হইয়াছেন। জগতের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে সেই রূপ বহু তেজস্বী সাধক সেই সকল ভীষণ ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জগতে বজ্র-গভীরস্বরে সত্য এবং প্রেমের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে যাহা লিখিত হইল তাহাতে ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে সকল জীবনই সংগ্রামময়, সকল জীবনই পরীক্ষা সমূহে পরিপূর্ণ। এমন মহা-পুরুষ নাই, যাঁহার জীবনে পরীক্ষা আসে নাই এবং যাঁহাকে সেই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই। মহাপুরুষের মহত্ত্বই থাকে না যদি তিনি কঠিন কঠিন পরীক্ষায় পতিত না হইয়া থাকেন এবং সাধনার বলে এবং ভগবৎ কৃপালাভে সেই ভীষণ ভীষণ পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারেন। সাধক যতই উন্নত হন, তাঁহার নিকট ততই ভীষণতরা পরীক্ষা উপস্থিত হয়। সাধারণ মানব এবং মহাপুরুষদিগের মধ্যে পার্থক্য এই যে উদ্যমহীন সাধারণ মানব

একবার পতনেই সর্ব্বপ্রকার যত্ন চেষ্টা বিসর্জ্জন দিয়া পতিত অবস্থাকেই বরণ করিয়া লয়, গড্ডলীকা প্রবাহের ন্যায় চিরাচরিত পন্থায়ই বিচরণ করেন। তাহারা ভুলিয়া যান যে পরীক্ষা তাহাদের শক্তি পরীক্ষার জন্যই আসিয়াছিল, বিপদ তাহাদিগকে জাগরণ করিবার জন্যই আসে। কিন্তু মহাপুরুষগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু কখন কখন যদি দৈব দোষে তাহাদের পতনও হয়, তবে তাঁহারা তাহা একান্তভাবে অগ্রাহ্য করিয়া সেই পতন ভূমির উপরই দণ্ডায়মান হইয়া উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার জন্য পুনরায় কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হন। তখনই ভগবত কৃপামৃত বারি তাঁহাদের মস্তকোপরি বর্ষিত হয় এবং তিনি গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইতে পারেন। অনন্ত কৃপাময় পরমেশ্বর যখনই তাঁহার প্রিয় সন্তানকে এক পা অগ্রসর হইতে দেখেন, তখই তাঁহাকে তিনি সহস্র পদ অগ্রসর করাইয়া দেন। ইহা তাঁহার অপার কৃপা দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ধন্য কৃপাময় পরমপিতঃ! তোমারি অপার অনন্ত কৃপা!! তোমারি কৃপায় যুগে যুগে কত অধম কত পতিত নরনারী যে উদ্ধার লাভ করিয়াছে তাহার সংখ্যা কে নির্ণয় করিবে। তোমাকে বারংবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

মহামনা স্বামী বিবেকানন্দের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটিতে পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের জীবন সংগ্রামময়। আমাদিগের অবস্থাসমূহ সর্ব্বদাই আমাদিগকে অধঃপতনের দিকে নিবার জন্য ব্যস্ত। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আমরা আমাদের ক্রমবিকাশ সাধন্ করিয়া আমাদের অনন্তপ্রায় জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে।

Life is the tendency of unfolding and developing of a being under circumstances tending to press it down.

অর্থাৎ অধোগামী করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত আমাদের বিরুদ্ধ অবস্থা-সমূহের মধ্যে জীবের ক্রমবিকাশ সম্পাদনই জীবন।

প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই সাক্ষ্য দিবেন যে, জীবন পরীক্ষাময়। ইহা সকলেরই জানা আছে যে আকরে প্রাপ্ত স্বর্ণকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনিতে হইলে কত প্রকার প্রক্রিয়া করিতে হয়, কত প্রবল অগ্নি দহনে উহাকে দহন করিতে হয়। কেবল সুবর্ণই যে অগ্নি দহনে দগ্ধ হইলে বিশুদ্ধ হয়, তাহা নহে। কিন্তু সকল খনিজ পদার্থকেই বহু প্রণালী দ্বারা বিশুদ্ধ হইতে হয়। চন্দন কাষ্ঠখণ্ড বারংবার ঘর্ষিত হইলেই সুবাসযুক্ত চন্দন প্রলেপের অবস্থায় উপনীত হয়। তিল, সরিষা, বাদাম প্রভৃতি পদার্থ অত্যন্তভাবে নিষ্পেষিত হইয়া আমাদের ব্যবহারোপযোগী

নানাবিধ তৈল প্রদান করে। কুসুমরাশি নানা প্রক্রিয়া দ্বারা পুষ্পসারে পরিণত হয়। নিষ্পেশন ও অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়াই ধান্য আমাদের দেহ রক্ষার সর্বপ্রধান খাদ্যরূপে পরিণত হয়। গমেরও ঐ একই পরিণতি। দুগ্ধের ঘৃতে ও নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য দ্রব্যে পরিণতির বিষয় চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ঐ একই বিষয় জগতে সর্বত্র কার্য্য করিতেছে।

এইত গেল জাগতিক খণ্ড খণ্ড পদার্থের কথা। এখন যদি আমরা আমাদের সকলেরই জন্মভূমি মাতৃভূমি পৃথিবীমণ্ডল সম্বন্ধে একটু চিন্তা করি, তবে কি দেখিতে পাইব? আমরা দেখিতে পাই যে কোন এক সুদূর অতীতে কতক উত্তপ্ত বায়বীয় পদার্থ (Some hot gaseus matter) সূর্য্য হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তাহাই ক্রমশঃ এই পৃথিবী মণ্ডলে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে হইা যে কত ঝড়-ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যাও কেহ নির্ণয় করিতে পারে না এবং সেই সকল দুর্ঘটনার ভীষণত্ব সম্বন্ধেও কেহ ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এখন ইহা জীব কুলের বাসের উপযোগী হইয়াছে। সেই উত্তপ্ত বাষ্পরাশিই নানা vicissitudes এর মধ্য দিয়া এখন সুন্দরী সুষমাময়ী বসুন্ধরায় পরিণত হইয়াছে। এখন আমরা কেহই এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহি না। ঠিক একই রূপে গ্রহ, উপগ্রহগুলিও সৃষ্ট ও বর্তমান অবস্থায় আনীত হইয়াছে। সূর্য মণ্ডলেরও যে ঐ একই অবস্থা ছিল, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। উহাতে যদি কোন দুর্ঘটনাই না থাকিত, তবে উহা হইতে গ্রহ পরিমাণ উহার (সূর্য্যের) বৃহৎ বৃহৎ অংশ সমূহ উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সজোড়ে সুদূরে ভীষণ বেগে নিক্ষিপ্ত হইতে পারিত না। সেই সকল ভীষণ ভীষণ দুর্ঘটণা আমাদিগের ধারণাতীত বলিলেও কিছুই বলা হইল না। এই রূপেই অন্যান্য অসংখ্য নক্ষত্র মণ্ডলের বর্তমান অবস্থায় আসিতে হইয়াছে। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টির আদি মুহূর্ত হইতে বর্তমান অবস্থায় আসিতে অসংখ্য অসংখ্য দুর্ঘটণার মধ্য দিয়াই আসিতে হইয়াছে। এই সমস্তই সৃষ্টির সুমহান্ উদ্দেশ্য সাধন জন্যই সম্পাদিত হইতেছে। উহাদের অন্য কোনও কারণ নাই। সুতরাং দেখা যায় যে জীবনের সফলতা লাভ করিতে জড় জগতেরও অংসখ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়া আগমন করিতে হইয়াছে ও হইবে। এই পরীক্ষা সৃষ্টির আদি মুহূর্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত বর্তমান থাকিবে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে জড় পদার্থের আবার পরীক্ষা কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে জীবনের সার্থকতা লাভ করিতে হইলেই পরীক্ষার মধ্য দিয়া

আসিতে হইবে। One God, one Law, one Universe (এক ঈশ্বর, এক বিধান, এক বিশ্ব)। অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান জীবে ও জগতে একই ভাবে কার্য্য করিতেছে। জীবে এক বিধান এবং জগতে অন্য বিধান নহে। সর্বত্রই মূল বিধান একই। জড় জগতেও যেরূপ দেখা যায়, মানবেরও সেইরূপ ভীষণ পরীক্ষার আগুনে দগ্ধ হইতে হয়। ইহা ভিন্ন বিশুদ্ধ হইবার, সুন্দর হইবার, জীবনের সার্থকতা লাভ করিবার অন্য কোনও পন্থা নাই।

আমরা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধনার্থই জগতে আসিয়াছি। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবেই। জীবগণ জীবজগতের নিম্নতমস্তরে প্রারম্ভে দেহাবদ্ধ হয় এবং অনন্ত মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধানে ক্রমশঃ উচ্চতর দেহ ধারণ করিয়া করিয়া মানব দেহ এবং তদনন্তর দেবদেহ লাভ করেন। আবার নিম্নতম স্তরে শরীরের গঠনের জন্য গুণরাশির বিশেষ বিকাশ সম্পাদিত হয় না এবং জীব উত্তরোত্তর উন্নত হইতে উন্নততর দেহ ধারণ করিয়া জীবনের সফলতা লাভ করিবেন। এইরূপ উন্নত হইতে উন্নততর হইতে প্রত্যেক জীবের বহু বাধা বিঘ্ন ও পরীক্ষার সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং সেই সকল বাধা উত্তীর্ণ হইতেই হইবে, এবং সেই সকল বাধা অতিক্রম করিবার শক্তি দ্বারাই গুণরাশির শক্তি পরীক্ষিত হইবে। যে উদ্দেশ্য জীবকে ক্রমশঃ উন্নততর দেহ দান করিয়া মানব ও পরিশেষে দেব দেহ দান করিয়াছে, অর্থাৎ হৃদয়কে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বলশালী করিয়া ব্রহ্মের গুণরাশি লাভের উপযোগী করে অর্থাৎ প্রতি হৃদয়ে ব্রহ্মের অনন্তগুণের বিকাশ সাধন করে, তাহা যে ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা, আত্মদানের অভিনয় বা প্রেমলীলা, তাহা সহজ জ্ঞানেও বুঝিতে পারা যায়।

ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষাই সৃষ্টির মূল মন্ত্র। সুতরাং উহা যে জীবের জীবনে জীবনে সংসাধিত হইবেই, ইহা সুনিশ্চিত। আবার এই সুমহান্ উদ্দেশ্য যখন প্রত্যেক জীবনেই পূর্ণ হইবে, তখন জীব ও জগৎ সম্বন্ধীয় সকল বিধানেই আমরা এই মহামন্ত্র লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইব। জীব ও জগতে প্রত্যেক কার্য্য বিশ্লেষণ করিলেই ঐ মন্ত্রের অর্থ পরিস্ফুটাকারে প্রকাশিত হইবে। সাধকগণ যদি গভীর ভাবে নিজ নিজ জীবন-বেদ অধ্যয়ন করেন, তবেই যে তাঁহারা এই সত্য তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইবেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয়ের কারণ নাই। স্থূল, কেবল মনুষ্য-জীবন নহে, কিন্তু সকল জীবের জীবনই সংগ্রামে পরিপূর্ণ। সংগ্রাম ভিন্ন একটি জীবনও সংসারে নাই। আবার যদি আমরা ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করি, তবে দেখিতে পাইব যে জীবনে বহু পরীক্ষা, বহু সংগ্রাম বর্ত্তমান

ইহা সত্য। কিন্তু ইহাও সত্য যে সেই সকল সংগ্রামের ফলই সর্ব্বদা মঙ্গলে পরিণত। সংগ্রাম, পরীক্ষা ভিন্ন জীবন নাই; আবার কোন কার্য্যই মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলে পরিণত হয় না। এই সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞান-প্রবেশিকা গ্রন্থের ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব অংশ বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য। উহা পাঠে ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা সম্বন্ধে আরও সমর্থন পাওয়া যাইবে।

ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা সম্বন্ধে বর্ণনার শেষ হয় না। পাঠক যদি গুণ পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন, তবে মানস-রথে আরোহণ করুন, সর্ব্ব ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করুন, দেখিতে পাইবেন যে আপনার চতুর্দ্দিকে, দশ দিকে, সর্ব্ব দিকে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদাই পরীক্ষা কার্য্য চলিতেছে। আকাশই বলুন, অনল অনিলই বলুন, ভূমি জলই বলুন, সকলই আমাদের পরীক্ষার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। কে না জানেন যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ বিষয় দ্বারা আমরা সর্ব্বদাই বিপরীত দিকে আকৃষ্ট হইতেছি। কে না জানেন যে উহারা আমাদিগকে মোহমুগ্ধ করিয়া আমাদিগের সর্ব্ব দিকে সুগভীর ও সুবিস্তার প্রাচীর সৃজন করে এবং ভ্রান্ত মার্গে আমাদিগকে পরিচালনা করে? কে না জানেন যে উহাদের হস্ত হইতে চিরমুক্ত হইবার জন্য জীবনে জীবনে, সজ্ঞানে অজ্ঞানে কত সাধনার স্রোত প্রবাহিত হয়? কে না জানেন যে কত সময় কত শত সহস্র মানব যুদ্ধে বারংবার পরাজিত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে পরম পরিত্রাতাকে ডাকিতে থাকেন? আবার কে না জানেন যে কত সাধক পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বজ্রগভীর রবে বলেন, "Get thee behind me, Satan", এবং পরম করুণাময় পিতাকে হৃদয়েরর অন্তঃস্থল হইতে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

প্রকৃতিতে পর্য্যবেক্ষণ করুন, দেখিতে পাইবেন যে সেস্থলেও পরীক্ষা কার্য্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে। বৃক্ষ ও লতার জন্ম ও বৃদ্ধি লক্ষ্য করুন, দেখিতে পাইবেন যে—বৃক্ষ ও লতার জীবনে কত বাধা, কত বিঘ্ন আসিয়াছিল। কত বৃক্ষ লতা অঙ্কুরেই শেষ হইয়া গিয়াছে, কত বৃক্ষ লতা বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, আবার কত বৃক্ষ লতা সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জগতকে ফল ফুল ও নানাবিধ মিষ্টমধুর রসদান করিয়া উহাদের জীবন সার্থক করিয়াছে। আমরা দেখি যে খর্জ্জুর বৃক্ষ নিজের বক্ষ বিদারণ করিয়া আমাদিগকে সুমিষ্ট রস দান করে, ইক্ষু দণ্ড ভীষণ ভাবে নিষ্পেপিত হইয়া জগৎকে সুমধুর রস প্রদান করে, কুসুমরাশি মধুমক্ষিকা দ্বারা দষ্ট হইয়া কি অপূর্ব্ব মধুর রসই না দান করিতেছে। ফলগুলি চর্ব্বিত হইয়া আমাদিগের রসনাকে সুরসে ভরপুর করিয়া তুলে। আর

কত বস্তুর বর্ণনা করিব ? পাঠক যে-দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, যে বিষয়ের চিন্তা করিবেন, যে কার্য্যেরই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন, সর্ব্বত্রই যে একই বিধান লক্ষ্য করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সর্ব্বত্রই পরীক্ষা এবং পরিণতিতে জীবনের সার্থকতা। পাঠক মানবজীবনে পরীক্ষা দেখিতে ইচ্ছা করেন ? তবে দেখিতে পাইবেন যে :—

সূতিকা গৃহে পরীক্ষা, মৃত্যুশয্যায় পরীক্ষা, গর্ভবাসে পরীক্ষা, ভূমিষ্ঠ হওয়াতেও পরীক্ষা, ইহজীবনে পরীক্ষা, পরজীবনে পরীক্ষা, ইহলোকে পরীক্ষা, পরলোকে পরীক্ষা, স্বর্গে পরীক্ষা, নরকে পরীক্ষা, বর্ত্তমান জন্মে পরীক্ষা, ভবিষ্যৎ জন্মে পরীক্ষা, গত জন্ম সমূহেও পরীক্ষা বর্ত্তমান ছিল ; পিতাতে পরীক্ষা, পুত্রে পরীক্ষা, মাতায় পরীক্ষা, কন্যায় পরীক্ষা, ভ্রাতায় পরীক্ষা, ভগ্নীতে পরীক্ষা, পতিতে পরীক্ষা, পত্নীতে পরীক্ষা ইত্যাদি।

সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে উহা ব্রহ্মের স্বগুণ পরীক্ষা ; অর্থাৎ কোন গুণের কিরূপ শক্তি, ইহাই পরীক্ষা। এখন প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্ম অনন্ত জ্ঞানময়। তিনি তাঁহার অনন্ত গুণের প্রত্যেকটির শক্তি অবশ্যই জানিতেন। তবে কেন আবার এই পরীক্ষা ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে ব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত গুণের শক্তি জানিতেন। ইহাতে কাহারও কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রেমলীলার জন্য এই সৃষ্টি ব্যাপার সংঘটন করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অনন্ত গুণের শক্তির Practical Demonostration মাত্র। তাই বেদান্ত দর্শন বলিয়াছেন "লোকবত্তু লীলা কৈবল্যম্"। জগতে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহাই practical। আমরাও practical (বাস্তব) অবস্থাতেই বর্ত্তমান আছি এবং practical ভাবেই জীবন যাপন করিতেছি।

আবারও প্রশ্ন—তিনি কেন এই বিষম আপদ-বিপদময় সংসার সৃষ্টি করিলেন ? সৃষ্টি না হইলে ত জীবকুলের এইরূপ নানা বিঘ্ন-বাধার মধ্য দিয়া চলিতে হইত না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে পরম পিতা একাধারে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত মঙ্গল। সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিতে কোনও প্রকারের কোনও ভুল ত্রুটী বা অমঙ্গল নাই বা থাকিতে পারে না। আমরা অত্যন্ত অজ্ঞান, আমাদের দৃষ্টি অতি সীমাবদ্ধ। তাই আমরা ইহাতে ভুল, ত্রুটী, দোষ, অমঙ্গল দেখি, কিন্তু উহাতে (সৃষ্টিতে) উহাদের কিছুই নাই বা থাকিতে পারে না। এই সম্বন্ধে প্রোক্ত "ব্রহ্মের মঙ্গলময়ত্ব" অংশে বিস্তারিত আলোচনা বর্ত্তমান। লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধেও

"তত্ত্বজ্ঞান প্রবেশিকা" গ্রন্থে সুবিস্তার আলোচনা বর্ত্তমান। এই যে অনন্ত মঙ্গলে পরিপূর্ণ বিশ্বে আমরা অমঙ্গল দর্শন করি, এই যে ভ্রমশূন্য জগতে অসংখ্য ভুল ক্রটী দর্শন করি, ইহাও আমাদের পরীক্ষার জন্যই। ইহাকেই সাধারণতঃ মায়া বলা হয়। অর্থাৎ আমাদের অজ্ঞান আবরণ উন্মোচন করিতে হইবে, জাগতিক জটিল সমস্যা সমূহের সত্য মীমাংসা লাভ করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা দেখিতে পাইব যে বিশ্ব জ্ঞান, প্রেম ও মঙ্গলে পরিপূর্ণ—ইহাতে ভুল ক্রটী মাত্রও নাই, ইহা কেবল অনন্ত প্রেমময়ের প্রেমলীলা মাত্র।

ওঁ অনন্তং জ্ঞান-প্রেমময়ং শিবং ওঁ

জ্ঞান ও বিশ্বাস : নিশ্চয়তা অনুভূতি

শ্রীমৃণালকান্তি ভদ্র

অধ্যাপক এয়ার তাঁর "জ্ঞানের সমস্যা" গ্রন্থে বলেছেন, জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে নিশ্চয়তার অনুভূতির দিক দিয়ে কোন তফাৎ নেই। জ্ঞানের প্রধান মাপ-কাঠি হোল নিশ্চিত হবার দাবী। পর্য্যাপ্ত-পরিমাণ সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকলেই আমরা নিশ্চয়তার দৃঢ়তা লাভ করি। নিশ্চয়তার অনুভূতি এই দৃঢ়তা বা দাবীর সঙ্গে থাকতে পারে। অধ্যাপক এয়ারের উক্তি থেকেই এ কথা বোঝা যায়। তিনি বলেন, "......the necessary and sufficient conditions for knowing that something is the case are first that what one is said to know to be true, secondly, that one be sure of it and thirdly, that one should have the right to be sure." কিন্তু বিশ্বাসে নিশ্চয়তার দাবী অনুপস্থিত। জ্ঞানের মতই বিশ্বাসেও নিশ্চয়তার অনুভূতি সমানভাবে প্রবল থাকতে পারে। সুতরাং নিশ্চয়তার অনুভূতির মাপ কাঠিতে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। জ্ঞানের এমন কোন বিশেষ অভুমুতি নেই যার সাহায্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্ঞানকে সত্য বলে জানা যায়। অনেকে একটা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতিকে জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। তাদের মতে, জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না। পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার বিশেষ অনুভূতি থাকার জন্য জ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি হয়। কিন্তু অধ্যাপক এয়ার বলতে চান, জ্ঞানের বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। বিশ্বাস থেকে উচ্চতর কোন অনুভব জ্ঞানের বেলায় হয় না। সুতরাং জ্ঞান ও বিশ্বাসের প্রকৃতি জানতে গেলে সাক্ষ্য প্রমাণের নজীর হাজির করতে হবে। নিশ্চয়তার প্রতীতি উভয় ক্ষেত্রেই সমান। এয়ার আরও বলেন, নিশ্চয়তার অনুভূতিও এমন কিছু আবশ্যকীয় নয়, কারণ এই অনুভূতি বাদ দিয়েই জ্ঞান সম্ভব হতে পারে। অধ্যাপক এয়ারের বক্তব্য থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি টানা যায় :—

(ক) জ্ঞান কোন বিশেষ নিশ্চয়তার অনুভূতি সমন্বিত নয়। জ্ঞানের প্রকাশ

স্বতঃস্ফূর্ত নয়। সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই আমরা একটা মানসিক অবস্থাকে জ্ঞান বলে বুঝতে পারি।

(খ) জ্ঞান ও বিশ্বাসে নিশ্চয়তার অনুভূতি একই রকম হোতে পারে। ব্যক্তি মানসের দিক থেকে এদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। জ্ঞান ও বিশ্বাসের পার্থক্য বস্তুগত।

(গ) নিশ্চয়তার অনুভূতি জ্ঞানের পক্ষে খুব বেশী প্রয়োজনীয় নয়। এরকম কোন অনুভূতি ছাড়াই জ্ঞান সম্ভব হোতে পারে।

এই প্রবন্ধে আমি দেখাতে চেষ্টা করব, জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্বন্ধে ব্যক্তিমানসের অবস্থাকে কেন্দ্র করে অধ্যাপক এয়ারের মতামতগুলি ঠিক নয়। আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করব, জ্ঞানে একটা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি আছে, যা বিশ্বাসে মেলে না। জ্ঞানে সাক্ষ্য-প্রমাণকে পর্যাপ্ত পরিমাণ হতে হবে এবং এই পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমান পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতিকে সৃষ্টি করে। বিশ্বাসে সাক্ষ্য-প্রমান যথেষ্ট থাকে না, ফলে বিশ্বাসে সকল সময়ই নিশ্চয়তার অনুভূতি অনেক কম। বিশ্বাসে সর্বত্রই খানিকটা পরিমাণ সন্দেহ থাকে এবং সেই কারণেই, বিশ্বাসে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার উপলব্ধি থাকে না। কিন্তু আমার এই বক্তব্যে অনেক প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। জ্ঞান ও বিশ্বাসে ব্যক্তিমানসের দিক থেকে একটা বড় তফাৎ আছে, এমত প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। জ্ঞানে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি যে অত্যাবশ্যক, এও আমি দেখাবার চেষ্টা করব। আমি মনে করি, এই অনুভূতি ছাড়া জ্ঞান অসম্ভব। সুতরাং প্রথমে উদাহরণ সহযোগে আমার মতকে স্থাপিত করব, তারপরে যে সমস্ত প্রশ্ন বা আপত্তি আমার মতের বিরুদ্ধে উঠতে পারে সেগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ, আগেই বলেছি জ্ঞান ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আমার মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গেলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর অবশ্যই দিতে হবে।

প্রথমে জ্ঞানের একটা বিশ্লেষণ করা যাক। জ্ঞানে, আমরা যা জানি তার যাথার্থ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমান পাই। সুতরাং আমরা যা জানি তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। "আমার ঘরে টেবিলটি রয়েছে" এটি একটি জ্ঞানের উদাহরণ। যে সমস্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে আমি এর অস্তিত্বকে জেনেছি, সেগুলি যথেষ্ট মেনে নেওয়া যায়। অথবা, আমার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়। টেবিলটির একটি বিশেষ স্থানে ও বিশেষ কালে অবস্থিতি আমার ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে জানতে পারি। এর রঙ, আকার ও আয়তন আমি ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়ার সাহায্যে জানতে

পারি। সাক্ষ্য-প্রমাণের এই বিবরণকে যথেষ্ট বলে মনে হয়। এই পর্য্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ আমার মনে এক পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার উপলব্ধি সৃষ্টি করে। আমার জ্ঞানকে নিঃসন্দেহ বলে মনে হয়। এই নিঃসন্দেহ-প্রতীতি জ্ঞানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক জ্ঞানেই এই নিঃসন্দেহ-প্রতীতি বা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি বর্তমান। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এই অনুভূতি সাক্ষ্য-প্রমাণের পর্যাপ্ত হওয়ার উপর নির্ভর করে। সাক্ষ্য-প্রমাণকে যথেষ্ট হিসাবে গ্রহণ করার ভিত্তিতেই আমরা কোন বস্তুকে জানি। টেবিলটির অস্তিত্বের বেলায় আমরা সাক্ষ্য-প্রমাণকে যথেষ্ট বলে মনে করি। অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রেও আমরা অনুরূপভাবে চিন্তা করি। কিন্তু শুধু পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারাই জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন মানসিক অবস্থা জ্ঞান কি না, তা আমরা সেই মানসিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারি। পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি সমস্ত জ্ঞানের সঙ্গেই যুক্ত থাকে। সুতরাং অধ্যাপক এয়ারের বিরুদ্ধে আমরা এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, যে, বিশ্বাস বা সন্দেহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে একটি বিশিষ্টতা জ্ঞানের ক্ষেত্রে আছে। মনে যখন এই পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি উদয় হয়, তখনই আমরা জানি, মানসিক অবস্থাটি জ্ঞানের। কিন্তু এই বিশেষ মানসিক অবস্থাটি আপনা-আপনি আসে না। সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল এই মানসিক অবস্থাটি জ্ঞানের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। শুধু সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির থাকলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে এই বিশিষ্ট অনুভূতিটি থাকা দরকার। অধ্যাপক এয়ার জ্ঞানের বিশ্লেষণের বেলায় একবার এই অনুভূতির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু পরক্ষণেই বলেছেন এটা জ্ঞানের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় কিছু নয়। আমার মনে হয়, জ্ঞানের পক্ষে দুটি বিশিষ্টতাই সমানভাবে প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ (১) পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি। অধ্যাপক এয়ার প্রথমটিকে যতটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, দ্বিতীয়টিকে ততটা মনে করেন না, বা একেবারেই মনে করেন না। আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি, টেবিলটির অস্তিত্বের পক্ষে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ মনে একটা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতির সৃষ্টি করে। ফলে আমাদের মানসলোকে একটা পরিবর্তন সাধিত হয়। টেবিলকে জানার আগে ও টেবিলকে জানার পরে, মানসিক অবস্থার মধ্যে এক আকাশ-পাতাল ব্যবধান বর্তমান। যার ফলে, এখন, এই বিশেষ মানসিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই আমরা উপলব্ধি করি, যে, এটি একটি জ্ঞানের ক্ষেত্র। জ্ঞানের এই বিশেষ মানসিক অবস্থা, অর্থাৎ পরিপূর্ণ-নিশ্চয়তার অনুভূতি বা নিঃসন্দেহ-প্রতীতি জ্ঞানের

অন্য অনেক উদাহরণে আমরা দেখাতে পারি॥ যেমন, "আমার সামনের এই লোকটির অস্তিত্ব আছে" "এটি একটি পাখী", অথবা "এ একজন বালক" ইত্যাদি। জ্ঞানের প্রত্যেকটি উদাহরণেই আমরা পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি পাই। তবে স্বতঃস্ফূর্ত-বাদীদের মত আমরা বলতে চাই না, যে, এই অনুভূতির একমাত্র পরিচয় স্বচ্ছতা ও স্বকীয়তা (clearness and distinctness)। পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রসূত এই নিঃসন্দেহ-প্রতীতি জ্ঞানের প্রধান বিশিষ্টতা।

কিন্তু এখানে একটা আপত্তি উঠতে পারে। আমরা জ্ঞানের সর্ত হিসাবে (১) পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ ও (২) পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতিকে তুলে ধরেছি। দ্বিতীয় সর্তটি প্রথম সর্তের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এও আমরা বলেছি, যে দ্বিতীয় বিশিষ্টতা সৃষ্ট হবার পর নিজেই একটা স্বাধীন বিশিষ্টতা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও প্রথম বিশিষ্টতা দ্বিতীয় বিশিষ্টতার কারণ তবুও দ্বিতীয় বিশিষ্টতার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম বিশিষ্টতার লয় হয় না। সূর্যও সূর্য-কিরণের মতই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশিষ্টতা একই সঙ্গে বিরাজ করে। তবে এখন মনের দৃষ্টি দ্বিতীয় বিশিষ্টতার উপর পড়ে বলেই পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতিকেই অনেকে জ্ঞানের একমাত্র বিশিষ্টতা বলে মনে করেন। এই ভুল স্বতঃস্ফূর্তবাদীরা করে থাকেন, তারা শুধু মানসিক অবস্থাটিকেই লক্ষ্য করেন, কিন্তু যা মানসিক অবস্থার বিশেষ পর্যায়ের কারণ এবং তার সঙ্গে সহাবস্থিত, তাকে লক্ষ্য করেন না। কিন্তু পর্যাপ্ত-সাক্ষ্য-প্রমাণের ফলে এই যে মানসিক অবস্থা তার সাহায্যেই আমরা জ্ঞানকে জ্ঞান বলে জানি। এই মানসিক বিশিষ্টতা জ্ঞানকে একটা বিশেষ পদ-মর্যাদা দেয়। সুতরাং এখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমরা জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারি। পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি আমাদের জানিয়ে দেয় যে মানসিক অবস্থাটি জ্ঞান। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের সামনে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত আছে, তাকেই যদি আমরা যথেষ্ট বলে মনে করি, তাহলে কি জ্ঞানে ভ্রান্তির সন্দেহ নেই ? এমনও ত হোতে পারে যে অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমান আমাদের কাছে পর্য্যাপ্ত বলে মনে হয়েছে, এবং তার ফলে এই নিশ্চয়তার অনুভূতি সৃষ্ট হয়েছে। তাহলে জ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের ভুল হবে। মিথ্যা জ্ঞানকে জ্ঞান বলে গ্রহণ করা হবে। আমরা একটি ভ্রান্ত জ্ঞানের উদাহরণ নিচ্ছি, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। আমাদের সামনে উপস্থিত তথ্যকে আমরা যথেষ্ট বলে মনে করি এবং যা দেখি তার সম্বন্ধে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা অনুভব করি। অতএব, নিশ্চয়তার অনুভূতিকে যদি জ্ঞানের মাপকাঠি বলে ধরা হয়, তাহলে জ্ঞান ও মিথ্যা জ্ঞানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকেনা। কিন্তু

ভ্রান্ত জ্ঞানের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আমাদের বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। মিথ্যা জ্ঞানে, আমরা পারিপার্শ্বিক ঘটনার দ্বারা এমন নিয়ন্ত্রিত হই, যে অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমানকে পর্যাপ্ত বলে গ্রহণ করি। চাঁদের আলোতে যখন আমরা সাদা চেহারার কিছু দেখি, তখন আমাদের সামনে উপস্থিত ঘটনাবলীর দ্বারা কতকগুলি তথ্যকে যথেষ্ট বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি, বুঝতে হবে। চাঁদের আলো, আলো-ছায়ার খেলা, এবং হয়ত কোন সাদা কাপড়, সব মিলিয়ে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমানের অবস্থা সৃষ্টি করে, যদিও আমরা জানি এই সমস্ত ঘটনাই যথেষ্ট নয়। ঐ সময়ের জন্য উপস্থিত ঘটনাবলী আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করে এবং আমরা যা দেখি, তার সম্বন্ধে সমস্ত সন্দেহকে দমন করে রাখি। ঘটনাবলীই এমন যে, যা আমরা দেখি তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ উত্থাপন করা চলে না। সুতরাং মিথ্যা জ্ঞানে দুটি উপাদান প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে। প্রথমতঃ পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করে যে অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমান পর্যাপ্ত বলে গৃহীত হয়। দ্বিতীয়তঃ আমাদের ইচ্ছার শক্তিতেই আমরা কোন সন্দেহকে আমল দিতে চাইনা। এই ইচ্ছা সচেতন ভাবে কাজ নাও করতে পারে। অচেতন থেকে এর প্রভাব বশতঃ আমরা সন্দেহকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি। ইচ্ছার অবচেতন ক্রিয়ার জন্য আমরা ফ্রয়েড-পন্থীদের মতের উল্লেখ করতে পারি। এইভাবে, আমরা যা দেখি তাই গ্রহণ করি এবং বস্তু সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হই। এইবার প্রশ্ন উঠতে পারে, যদি মিথ্যা জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা অনুভূত হয়, তাহলে জ্ঞান থেকে কি করে একে পৃথক করা যাবে? একটা কথা মনে রাখতে হবে, জ্ঞানে যে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি আছে, তা কখনও নষ্ট হয় না। টেবিল সম্বন্ধে আমার জ্ঞান এমন যে আমি কখনও এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করি না। কিন্তু ভ্রান্ত জ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন দেখি, পরে তার সম্বন্ধে সন্দেহ করা হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে, যে, সেক্ষেত্রে সন্দেহ বর্তমান ছিল। কিন্তু সে সন্দেহ অবচেতন বা সচেতন ইচ্ছার দ্বারা দমন করে হয়েছিল। অবশ্য তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীও ছিল। সেইজন্য, পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতির সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তি ঘটেছিল। প্রত্যেক মিথ্যা জ্ঞানের ক্ষেত্রেই সন্দেহ থাকে। কিন্তু কোন না কোন কারণে সে সন্দেহ আমাদের চোখে পড়ে না, আমাদের বিশ্লেষণে তা আমরা দেখিয়েছি। এই সন্দেহকে আমরা অনেক সময় অবচেতন ইচ্ছার দ্বারা দমন করি বলে এবং যেহেতু সেই সন্দেহ সম্বন্ধে আমাদের চেতন মনে কোন ধারণা থাকে না, সেই হেতু এই সন্দেহকে আমরা অবচেতন বলতে পারি। যে জ্ঞান পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়, তার প্রকৃতি

একটু অদ্ভুত। এই ধরণের জ্ঞানের উপাদানগুলি অস্বাভাবিক। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আলো-আবছা হইতে পারে, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর উপর পরিবেশের একটা প্রভাব পড়তে পারে, অথবা জ্ঞাতার শরীর অসুস্থ থাকতে পারে। স্বাভাবিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এগুলি উপস্থিত থাকে না। সুতরাং ভ্রমজ্ঞানে সকল সময়ই সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিন্তু সন্দেহ দমন করা হয়ে থাকে, কারণ পরিবেশের অস্বাভাবিকতাকে স্বীকার করা হয় না এবং সন্দেহ নিরসন করতে আমাদের ইচ্ছাশক্তি সচেতন ও অবচেতন ভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। বিশেষ পরিবেশের জ্ঞান যখন পরে সংশোধিত হয়, তখনই সন্দেহের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়। কিন্তু টেবিল সম্বন্ধে আমার জ্ঞানের সংশোধনের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ এক্ষেত্রে এরকম কোন অবচেতন সন্দেহ নেই। যে জ্ঞান পরে মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তা যখন ঘটে, তখন তার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ওঠে না। কিন্তু পরিবেশের অস্বাভাবিকতা নিশ্চয়ই কোন সন্দেহ উৎপাদন করে, যদিও তা তখন সার্থকভাবে দমিত হয়ে থাকে। সতর্ক অন্তর্সমীক্ষা (introspection) হয়ত এ সন্দেহকে প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তাহলে আবার মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ সমস্যা উঠবে না। আবার, প্রথম মিথ্যা জ্ঞান যখন পরে সংশোধিত হয়, দ্বিতীয় জ্ঞানকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতির ভিত্তিতে আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হয়। চাঁদের আলোতে সাদা চেহারার মানুষের অস্তিত্ব যখন অপ্রমাণিত হয়, তখন আবার আমাদের নিঃসন্দেহ-প্রতীতি হয়। দ্বিতীয় জ্ঞান প্রথম জ্ঞানকে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার ভিত্তিতে অপসারণ করে। সুতরাং বলা যেতে পারে, অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্য্যাপ্ত বলে গৃহীত হওয়ার ফলে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি সম্বন্ধে আমাদের ভুল হতে পারে, অর্থাৎ পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি না থাকা সত্ত্বেও আছে বলে মনে হতে পারে। এর কারণ হিসাবে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী, আমাদের ইচ্ছাশক্তির অবচেতনা বা সচেতন ক্রিয়াকে দায়ী করা যেতে পারে। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি সব সময় বর্তমান থাকে এবং তা কখনও সংশোধনের প্রয়োজনের অপেক্ষা রাখে না।

এবার, আমাদের বিশ্বাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে, যার ফলে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতির মানদণ্ডে জ্ঞান ও বিশ্বাসের পার্থক্য আমরা ধরতে পারব। আমরা মনে করি, বিশ্বাস অপর্যাপ্ত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই কারণে, বিশ্বাসে সব সময়ই সন্দেহের উপাদান বর্তমান। সুতরাং বিশ্বাসে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি উপস্থিত থাকে না। যেমন, আমি বিশ্বাস করি আজ সন্ধ্যায় বৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে যে তথ্যের উপর নির্ভর করে এ বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছে, তা

যথেষ্ট নয়। এই জন্যই বলা যাচ্ছে, আমি বিশ্বাস করি বৃষ্টি হবে। তথ্য বা সাক্ষ্য-প্রমাণ যদি পর্যাপ্ত বলে মনে হয়, তাহলে, 'বিশ্বাস করি' না বলে 'জানি' বলা হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা আপত্তি উঠতে পারে। বিশ্বাসে অনেক সময় পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি উপস্থিত থাকে, যেমন ভগবদ্-বিশ্বাসে। আরও একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। এক যুগের জ্ঞান অন্য যুগের বিশ্বাস বলে পরিগণিত হয়। প্রথম যুগে জনসাধারণ বিশ্বাসকেই জ্ঞান বলে মনে করেছিল। পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতিকে জ্ঞানের মাপকাঠি বলে ধরলে এরকম গোলমাল হতে পারে না। এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে, তারপর দেখাতে হবে সত্যই জ্ঞান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানসের দিক থেকে কোন প্রভেদ আছে কি না। প্রথম আপত্তির উত্তর দিতে হলে আমাদের একটি উদাহরণের সাহায্য নিতে হবে। কেউ যখন বলে, সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তখন সত্যই এই বিশ্বাসের স্বরূপ কি? এই বিশ্বাসে নিশ্চয়তার অনুভূতি আছে, কিন্তু আবার সন্দেহও আছে। ভগবদ্ বিশ্বাসী ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য এমন কোন তথ্য হাজির করতে পারে না, যা সন্তোষজনক বলে মনে হতে পারে। যদি ভগবদ্-বিশ্বাসী সজোরে বলতে থাকেন যে তার ঈশ্বরে অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি আছে, তাহলে বলতে হয় তিনি নিজের ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সন্দেহকে দমন করছেন। মিথ্যা জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, যে, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সন্দেহকে রুদ্ধ করেছে এবং ব্যক্তির ইচ্ছা জোর করে নিঃসন্দেহ মনোভাব টিঁকিয়ে রেখেছে। কিন্তু, এক্ষেত্রে, সন্দেহ যদিও উপস্থিত রয়েছে, তবু তা অগ্রাহ্য করা হচ্ছে, এবং এক আবেগপ্রবণ মনোভাবের দ্বারা এই সন্দেহকে নষ্ট করা হচ্ছে। আবেগ ব্যক্তির ইচ্ছার সাহায্যে প্রবল আকার ধারণ করে, এবং সেই কারণে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সন্দেহ ওঠে না। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি তাই আবেগ ও ইচ্ছাশক্তি সঞ্জাত। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নিঃসন্দেহ প্রতীতি আছে, তা থেকে বিশ্বাসের পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতিকে সহজে পৃথক করা যেতে পারে, কারণ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যে অবেগ ও ইচ্ছা-শক্তির ক্রিয়া উপস্থিত আছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তা নেই। বলা যেতে পারে অতীত যুগে মানুষ যখন বিশ্বাসকে জ্ঞান বলে মনে করেছে, তখন নিশ্চয়ই তার মনে নিশ্চয়তার অনুভূতি পরিপূর্ণ ভাবেই ছিল। অতএব, জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি মানুষ তখন অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করেছিল। কিন্তু সেই সাক্ষ্য-প্রমাণ তার কাছে যথেষ্ট বলে মনে হয়েছিল, যদিও সে জানত, যা সে জ্ঞান বলে মনে করেছে,

তার সম্বন্ধে যে কোন মুহূর্তে সন্দেহ উঠতে পারে। পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা তার কাছে জ্ঞান বলেই প্রতিভাত হয়েছিল, কেননা এ সম্বন্ধে যে তথ্য তৎকালীন যুগে গৃহীত হয়েছিল, তা পর্যাপ্ত বলে মনে করা হোত। কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে, এই ধারণা একটি বিশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে পুরাতন ধারণার ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ সম্বন্ধে পুরাতন যুগের মানুষের কোন সংশয় ছিল না। কিন্তু তবু যদি তার এ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি থেকে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, সমস্ত সন্দেহ ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে দমন করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের বক্তব্যে আমরা স্থির থাকতে পারি, এই বলে, যে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি সৃষ্টি করার ব্যাপারে ইচ্ছাশক্তির একটা বড় ভূমিকা আছে। যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করলে হয়ত একে ধরা যেতে পারে, কিন্তু যেহেতু, সাধারণতঃ এই ইচ্ছাশক্তির ভূমিকাটিকে আমরা স্বীকার করি না, সেই হেতু জ্ঞান ও বিশ্বাসের পার্থক্য সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তি ঘটে। অর্থাৎ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে জ্ঞানের আরোপ করে থাকি।

সবশেষে আমরা বলব, পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি জ্ঞানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক এয়ার বলতে চান, জ্ঞানে এই অনুভূতি সচেতন নাও হতে পারে। জ্ঞান হলেও জ্ঞাতার মনে এরকম কোন অনুভূতি নাও থাকতে পারে, যদিও যা সে জানছে তার যাথার্থ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ ধারণা ঠিক নয়। আমরা যখনই কোন কিছু জানি, জানার সঙ্গে সঙ্গেই পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতিকে বর্তমান দেখা যায়। 'আমার ঘরে টেবিলটি আছে' জানা মানেই টেবিলটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার একটা নিঃসন্দেহ উপলব্ধি আছে। এই উপলব্ধি বা অনুভূতি ছাড়া আমাদের জ্ঞান সম্ভব হয় না। কোন বস্তু যখন আমরা দেখি এবং তার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি, আমরা এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত যে এটি একটি বস্তু। এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নেই। বস্তুটি আমাদের সামনে আছে কিনা, এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলি না। জ্ঞান লাভ করাও পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি না থাকাকে আমরা পরস্পর বিরোধী বলে মনে করি। জ্ঞান, বিশ্বাস এবং সন্দেহের ক্ষেত্রে আমাদের মনোভাব বিভিন্ন এবং এই বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে আমরা একভাবে অনুভব করি না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা এক অন্যের থেকে আলাদা। কিন্তু শুধু তাই নয়। জ্ঞান ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণে তফাৎ আছে। তার ফলে মানসিক অনুভূতিতে যে তারতম্য তা অবহেলা করা যায় না। অন্তর্সমীক্ষার

সাহায্যে আমরা ঘটনাটি বুঝতে পারি। তিনটি বিভিন্ন মানসিক অবস্থা নেওয়া যাক, যথা আমি একটি টেবিল আছে বলে জানি, অথবা একটি টেবিল আছে বলে বিশ্বাস করি অথবা টেবিল আছে কিনা সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। একই বস্তু সম্বন্ধে এই তিন ধরণের মনোভাবে, পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতির ক্ষেত্রে একটা ক্রম অবণতি লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞানে এই অনুভূতির সর্বোচ্চ পর্যায়, বিশ্বাসে এই অনুভূতির কিছুটা কম এবং সন্দেহে এই অনুভূতি সর্বনিম্ন। সুতরাং বেশ পরিষ্কার ভাবেই দেখা যাচ্ছে, পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি ছাড়া জ্ঞান সম্ভব হোতে পারে না। জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই অনুভূতি উপস্থিত আছে। কিন্তু আমরা কখনও সন্দেহ করি না যে, এই অনুভূতি পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে। পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্বন্ধেও আমাদের ভ্রান্তি হতে পারে। সুতরাং, এমন জ্ঞান যেখানে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্বন্ধে আমাদের এতটুকু সন্দেহ নেই, হয়ত খুব কমই পাওয়া যেতে পারে। হয়ত যা আমরা জ্ঞান বলে মনে করছি, তা বিশ্বাস। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের বক্তব্যের দিক থেকে কোন অসুবিধা হচ্ছে না। পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি হয়ত দুষ্প্রাপ্য হতে পারে, কিন্তু এই অনুভূতি ছাড়া কোন জ্ঞান সম্ভব হবে না। জ্ঞানের সঙ্গে এই অনুভূতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি, যে অধ্যাপক এয়ারের মতের বিরুদ্ধে আমাদের মত হোল নিম্নরূপ :—

(ক) জ্ঞান শুধু নিশ্চিত হওয়ার দাবী অর্থাৎ পর্যাপ্ত সাক্ষ-প্রমাণের উপস্থিতি নয়।

(খ) জ্ঞানে পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার অনুভূতি সচেতনভাবে থাকা প্রয়োজন।

(গ) জ্ঞান ও বিশ্বাস শুধু সাক্ষ্য-প্রমাণের দিক থেকে পৃথক নয়, নিশ্চয়তার অনুভূতির দিক দিয়েও পৃথক্।

(ঘ) বিশ্বাস অপর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সেক্ষেত্রে, জ্ঞানের অনুরূপ নিশ্চয়তার অনুভূতি থাকতে পারে না।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা] **বৈশাখ** [১৩৬৭ সাল

সূচীপত্র

কথার কথা

পোষাকী ও আটপৌরে

শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব (পূর্বপক্ষ)

কথা আর আগুন, বশে থাকে, বেশ থাকে, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে 'অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়'। কিন্তু বশ যায় কি লুপ্ত হয় সম্মুখের সৃষ্টি, পশ্চাতের নিবারণ, থাকে শুধু নিম্নে নিদারুণ নিপাতের ঘোর আকর্ষণ—একেবারে 'পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে'। বশ-না-মানা আগুন যা পায়, তাই ছারখার করে। খুবই ভয়ঙ্কর। কিন্তু বশ-না-মানা কথা আরও ভয়ঙ্কর। এ যায় পায় তা ত' ছারখার করেই যা পায় না তাও। আসলে এ কি যে পাচ্ছে, আর কি যে পাচ্ছে না, বশে আছে কি নেই, তা অনেক সময়ই বুঝতে পারা যায় না। তাই 'আপনি কি হারাইতেছেন, তাহা জানেন না', কখন হীরে ফেলে জিরে নিলেন, সোনা বাইরে রেখে আঁচলে গিরে দিলেন, হিংটিং ছট্ নিয়েই মেতে রইলেন কি না, তাই টের পাবেন না। বশ না মানা কথার মত ভয়ঙ্কর কিছু নাই। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তিই শুধু নয়, শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ু হওয়াই নয়—আরও গুরুতর ক্ষতির ফল ফলে কথা যখন বশের বাইরে যায়। মনন হয় অবশ, বিচার বিবশ, সত্য মিথ্যার ভেদ ঘুচে গিয়ে সত্য হয় উৎখাত বাস। উচ্ছিন্ন বস্তু অপ্রতিষ্ঠিত, অপ্রতিষ্ঠেয়, ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ তত্ত্বই পরাবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য। তাই একথা সঙ্গত বলেই মনে হয় যে ভাষা যখন বশের বাইরে যায়, বিচার যখন ছুটি নেয়, মননের রাশ হয় আল্‌গা, তর্কবিধি শাসিত অনুসন্ধানী জাগ্রত চৈতন্য হয় অবসন্ন এবং সময় বুঝে চুপিসারে মোহমদির বিশৃঙ্খল স্বাপ্ন চৈতন্য আসর জুড়ে বসে, তখনই জন্মলাভ করে

পরাবিজ্ঞান। পরাবিজ্ঞান বিজ্ঞান নয় বৈজ্ঞানিকও নয়। আচারে, বিচারে, রীতিতে নীতিতে বিজ্ঞান হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের।

পরাবিজ্ঞান সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য বর্তমানে অনেকেই করে থাকেন। পরাবিজ্ঞানে অবিশ্বাস যদিও কোন আন্‌কোরা নূতন ঘটনা নয়, যদিও পরাবিজ্ঞানের মতই প্রাচীন, তবু আজকের দিনে এই অবিশ্বাসের তীব্রতা ও ব্যাপকতা বিশেষ করে ইংরাজী ভাষাভাষী দার্শনিক মহলে এত অল্প আয়াসেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে একে একটি নূতন ঘটনাও বলা যায়। বলা বাহুল্য, এমন ব্যাপক একটি ঘটনার উদ্ভবের পিছনে একটি মাত্র কারণই নাই। অনেক কারণই রয়েছে। এবং এদের কোনটি সাধারণ ঐতিহাসিকের আলোচ্য, কোনটি অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের, কোনটি বা রাষ্ট্রিক ঐতিহাসিকের এবং কোনটি দর্শনের ইতিহাসের সংকীর্ণ অর্থে দর্শনের ঐতিহাসিকের। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী নিলে দেখা যায় যে বিজ্ঞানের চোখ ধাঁধানো উন্নতি, নিত্য সীমা ছাড়ানো বিস্তৃতি, দর্শনকে, দার্শনিককে বিচলিত করেছে। এক সময় সব কিছুই ছিল দর্শনের অন্তর্গত। 'নিরখিব বিরাট স্বরূপ যুগ যুগান্তের', 'পূর্ণের পূর্ণজ্ঞান করব আহরণ', এই ছিল দার্শনিকের প্রতিজ্ঞা। জড়, প্রাণ, মন সব কিছুরই রহস্য ভেদ করার আকাঙ্খা ছিল দর্শনের। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসার এই আকাঙ্খাকে ধূলিসাৎ করেছে। জড় প্রাণ, মন, এমন কি প্রেত্যভাব পর্যন্ত বিজ্ঞানের—বিশেষ বিজ্ঞানের আলোচ্য হয়েছে। দর্শনের অধিকার খর্ব হতে হতে, সঙ্কুচিত হতে হতে শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে বসেছে। একথা গ্রাহ্য যে জড়, অথবা প্রাণ অথবা মনের সকল রহস্যই বিজ্ঞান ভেদ করতে পারে নাই। বিজ্ঞান বেলা ভূমিতে উপল খণ্ডই সংগ্রহ করছে এবং জ্ঞান মহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুন্ন রয়েছে। কিন্তু দর্শনের মহিমা একজন্য বিন্দুমাত্র খর্ব হয় নাই, এ তার অর্থ নয়। এর তাৎপর্য, বিজ্ঞানের জয়রথ আজও তার অধিকারের শেষ সীমায় পৌছায় নাই, হয়ত কোন দিনই পৌছাবে না। তবু যে রহস্য আজও অজ্ঞাত, যে তথ্য আজও অজ্ঞান-অবগুণ্ঠিত হয়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টি সীমার বাইরে রয়েছে, সেই রহস্য ভেদ করতে হলে সেই অবগুণ্ঠন লুণ্ঠন করতে হলে বিজ্ঞানেরই আরও অধিক চর্চা করতে হবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরই ব্যবহার করতে হবে, নিরীক্ষণ-পরীক্ষণ-সম্পর্ক-রহিত বিশুদ্ধ দার্শনিক মনন একাজে কোন সাহায্যই করতে পারবে না। আসল কথা, তথ্য সংক্রান্ত জিজ্ঞাসার উত্তর নিরীক্ষণ পরীক্ষণের সাহায্যেই অথবা যে পদ্ধতির মূলে রয়েছে নিরীক্ষণ পরীক্ষণ সেই পদ্ধতির সাহায্যেই দেওয়া যায়। বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসা তথ্য জিজ্ঞাসা, তথ্য নিয়ামক

নিয়ম জিজ্ঞাসা, এবং বিজ্ঞানের পদ্ধতিও নিরীক্ষণ মূলক। তাই বিজ্ঞান অর্জন করেছে বিস্ময়প্রফুল্ললোচননিরীক্ষ্য সাফল্য, তার বিজয়-স্বেদ-আর্দ্র-মর্দলে ধ্বনিত হয়েছে বিজ্ঞানদ্বেষকত্রাস গর্বগুরু ধ্বনি। দর্শন, বিশেষ করে পরাবিজ্ঞান, এত দিন ধরে ভেবেছে তার জিজ্ঞাসাও তথ্য জিজ্ঞাসা; কিন্তু ব্যবহার করে নাই নিরীক্ষণাদি নির্ভর পদ্ধতি। পরাবিজ্ঞানী তাঁর জিজ্ঞাসাকে তৃপ্তি দেবার জন্য, তাঁর প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য তর্কের পর তর্ক করেছেন, বয়ন করেছেন সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিচার জাল, একান্ত ভাবে নির্ভর করেছেন মননের উপর। ফল যা হবার তাই হয়েছে। নিজের অজ্ঞাতসারে দার্শনিক নিজেরই বশ-না-মানা কথার জালে পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছেন, আবেগকে দিয়েছেন যুক্তির মর্যাদা, কথার জাল ছিন্ন করবার জন্য নির্মাণ করেছেন আরও সূক্ষ্ম, আরও শ্বাসরোধী আরও বিভীষণ কথার জাল, সৃষ্টি করেছেন নব নব অচলায়তনের।

বিজ্ঞান যেন মুক্ত অঙ্গন, আর দর্শন যেন অচলায়তন। এদের তুলনা করলেই বোঝা যায় যে দার্শনিক পদ্ধতি, নিরীক্ষণে অপ্রতিষ্ঠিত মনন সর্বস্ব, বিচার-সর্বস্ব পদ্ধতি তথ্য সংক্রান্ত কোন জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে না। দর্শন যদি দাবী করে যে মনন-সর্বস্ব পদ্ধতি প্রযোগ করে, বিজ্ঞান যে তথ্য আবিষ্কার করতে পারে নাই, অথবা যে তথ্য নিয়ামক নিয়ম নির্ণয় করতে সক্ষম হয় নাই, সেরূপ কোন তথ্য অথবা নিয়ম আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে, তাহলে সে দাবী অগ্রাহ্য হবে, উদ্ভব হবে বিশুদ্ধ বিরক্তি অথবা বঙ্কিম হাস্যেরই। দার্শনিক জিজ্ঞাসা তথ্য জিজ্ঞাসা নয়, বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা নয়, বিজাতীয় জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ জিজ্ঞাসা দুরকমের:- তথ্য জিজ্ঞাসা এবং বাক্য জিজ্ঞাসা, পদার্থ জিজ্ঞাসা এবং পদ জিজ্ঞাসা, ভাষিত জিজ্ঞাসা এবং ভাষা জিজ্ঞাসা, অর্থ জিজ্ঞাসা এবং সংকেত জিজ্ঞাসা। প্রথম প্রকারের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হবে না যদি না নিরীক্ষণ পরীক্ষণ নির্ভর পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার জিজ্ঞাসার জন্য এরূপ পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। অবশ্য ভাষা জিজ্ঞাসা বলতে যদি সাধারণ বৈয়াকরণ জিজ্ঞাসা বোঝা হয় তাহলে সেই ঐতিহাসিক, অনুভব-সাপেক্ষ তথ্যবিশেষ জিজ্ঞাসার জন্য পরীক্ষণ প্রয়োজনীয় না হলেও নিরীক্ষণ প্রয়োজন। কিন্তু ভাষা জিজ্ঞাসা বলতে যদি গণিত জিজ্ঞাসার মত কোন জিজ্ঞাসা বোঝা হয় তা হলে একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন হয় যে এরূপ কোন পদ্ধতি অপেক্ষিত নয়। বর্তমানে বাক্য জিজ্ঞাসা, ভাষা জিজ্ঞাসা প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তাই বোঝা হচ্ছে। ভাষার বৈয়াকরণ, শব্দতাত্ত্বিক প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক আলোচনা হতে দার্শনিক বৈশ্লেষিক আলোচনা পৃথক।

ভাষার দার্শনিক আলোচনা এক প্রকার গাণিতিক আলোচনা। ভাষা দর্শন সামান্যীকৃত, অধিক বিমূর্ত গণিত। কথাটিকে এভাবেও বলা যায়। গণিত এক প্রকার ভাষাই। তবে এই ভাষার syntax আছে, আকার আছে, কিন্তু semantics নাই, বস্তু-সংকেতক সংকেত নাই। আমাদের স্বাভাবিক ভাষার দুইই আছে। তবু দার্শনিকের চোখে, দর্শনের নিরিখে ভাষা সামান্যীকৃত গণিতই। কারণ ভাষা 'ক' 'খ' প্রভৃতি অসংখ্য বাক্যের সমূহ মাত্রই নয়। তার অন্তর্গত বাক্যগুলির মধ্যে প্রসক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধ বিদ্যমান। তার একটি গঠন পারিপাট্য আছে। 'ক' এবং 'খ'—এই দুটি বাক্যই যদি সত্য হয় তাহলে 'ক' এবং 'খ', 'যদি ক তাহলে খ' 'হয় ক অথবা খ' 'হয় ক অথবা না-খ প্রভৃতি বাক্যগুলি সত্য হয়। এই কথা ভাষার গঠন পারিপাট্যেরই কথা, যদিও বৈয়াকরণ পারিপাট্যের অন্তর্গত কথা নয়, ব্যাকরণ অনুশীলন সাপেক্ষ কথা নয়। একথা নৈয়ায়িক পরিপাট্যের কথা—এবং এই ন্যায় আকার-মাত্র-ধর্মী, সম্পূর্ণ বিমূর্ত, সামান্যীকৃত গণিত। দার্শনিকের বাক্য জিজ্ঞাসা বিজাতীয় জিজ্ঞাসা, বৈয়াকরণ বাক্য জিজ্ঞাসা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনুভব নির্ভর নিরীক্ষণাদি সাপেক্ষ পদ্ধতি এ জিজ্ঞাসায় অপেক্ষিত নয়। তাই মনন-সর্বস্ব-পদ্ধতি-নির্ভর দর্শনেরও বিষয় তথ্য নয়, বাক্য; পদার্থ নয়, পদ; ভাষিত নয়, ভাষা; অর্থ নয়, সংকেত; বস্তু নয়, কথা। দর্শন, সংক্ষেপে, কথার কথা।

দর্শনের এই নবরূপের কল্পনা করেন লর্ড রাসেল। গণিত, তার ভিত্তি, গাণিতিক ন্যায় প্রভৃতির আলোচনা তাঁকে উৎসাহিত করেছে এইরূপ কল্পনায় এবং দার্শনিক অচলায়তনের কলুষিত বায়ুমণ্ডল এই কল্পনাকে পাইয়ে দিয়েছে, তাঁর এবং বিপরীত-মূল-বিচার-খিন্ন দার্শনিক সমাজের সহজ স্বীকৃতি। গণিত-বিৎ লর্ড রাসেলের চোখে উনবিংশ শতাব্দীর গণিত শাস্ত্রবেত্তারা কেবল গণিত শাস্ত্রেই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন নাই, সার্থক দার্শনিক চিন্তার, দর্শনের নব রূপায়নের পথও তাঁরাই খুলে দিয়ে গেছেন। অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নির্মাণ করে তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে কাণ্টের দেশ বিষয়ক তত্ত্ব মূল হীন। অন্তর কলন ও সমাকলন শাস্ত্রে চমকপ্রদ অগ্রগতির সূচনা করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এতদিন পর্যন্ত দার্শনিকরা যে সব কথা গতি এবং দেশের অবিচ্ছিন্নতা, সীমাহীনতা ও বিশ্রামহীন বিভজনতা সম্পর্কে বলেছেন তা নির্ভেজাল ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। ফ্রেগের সংখ্যাতত্ত্বও তেমনি কাণ্টের পাটীগণিত বিষয়ক মত যে নিষ্প্রমাণ তাই দেখায় নাই, মধ্য যুগীয় পণ্ডিতদের অনেক পরাবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যেমন অদ্বয় সত্তা বিষয়ক তত্ত্ব

যে ভ্রান্ত তাও দেখিয়েছে। উপরন্তু ফ্রেগে এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন যার সাহায্যে অবাস্তব, বিমূর্ত, কায়ানিরপেক্ষ ছায়াবৎ অনেক কিছুই, যারা দর্শনকে ভূশণ্ডীর মাঠ বিশেষে পরিণত করে তাদের, সহজেই অপনীত করতে পারা যায়।

অর্থাৎ গণিতের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গেই গণিতবিদদের এমন অনেক সংখ্যার কথা বলতে হয় যাদের আমরা সচরাচর সংখ্যা বলতে যা বুঝি, যেরূপ ধর্ম-বিশিষ্ট বলে বুঝি, তা বোঝা যায় না, সেরূপ-ধর্ম বিশিষ্ট বলে বোঝা যায় না। ১, ২ এবং এদের সদৃশদেরই আমরা সংখ্যা বলে বুঝে থাকি। কিন্তু –১, –২. প্রভৃতি বিয়োগ চিহ্ন অঙ্কিত সংখ্যাকে কি আমরা ঠিক সংখ্যা বলে বুঝি? তেমনি √২ একে কি আমরা সংখ্যা বলে বুঝি? এর বাচ্য যে কি তা কি আমরা ঠিক বুদ্ধিস্থ করতে পারি? √–১ এর সম্পর্কে একথা আরও প্রযোজ্য। যাই হ'ক, সংখ্যা বলতে গণিতজ্ঞেরা ১, ২ এবং এদের সদৃশদেরই বোঝেন না। তাঁরা √২, √–১ এদেরও বোঝেন। কিন্তু এই সব সংকেতের দ্বারা কি সংকেতিত হয়? একটি আম, দুটি জাম, প্রভৃতি যেমন বলা যায় √২, অথবা √–১ আম কি জাম কি অন্য কিছু বলা যায় কি? প্রথম প্রকার শব্দ ব্যবহারে সংখ্যা বাচক শব্দগুলি বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় এবং আমরাও এক অথবা একত্ব প্রভৃতিকে কোন ধর্মীর ধর্ম বলে, গুণ বলে বুঝি। দ্বিতীয় প্রকার ব্যবহারেও সংখ্যাবাচক শব্দগুলি বৈয়াকরণ অনুশাসনে বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাদের দ্বারা সংকতিত হয় যে সব সংখ্যা, সেই সব সংখ্যাকে কোন ধর্মীর ধর্ম বলে বুঝব কি? যদি বুঝি তাহলে সেই ধর্মীরা আবার কেমন? এই সংকেতগুলি যে নিরর্থক, কোন কিছুই সংকেতিত করে না, তা বলা যায় না। গণিতের স্বার্থে এদের আমরা অলীক-সংকেতক-সংকেত বলে মনে করতে পারি না। ১, ২ এবং তাদের মত সংখ্যাকে শাসন করে যে সব মহাব্যাপক নিয়ম তারা √২, √–১ প্রভৃতিকেও শাসন করে। অথচ এদের আমরা বস্তুর ধর্ম, অনুভবে ভাসমান হয় যেরূপ পদার্থ সেরূপ পদার্থ কিংবা সেরূপ পদার্থের ধর্ম বলেও মেনে নিতে পারি না। তাই গণিত দর্শনে একটি অতি অনুপাদেয় অবস্থার উদ্ভব হয়। ফ্রেগের পদ্ধতি এই অবস্থার অবসান ঘটাতে সমর্থ। এই পদ্ধতি প্রয়োগ পূর্ব্বক √২, √–১ প্রভৃতির স্বরূপ, সকল সংখ্যারই স্বরূপ, বোঝা যায়—এবং দেখতে পাওয়া যায় যে এই সংকেতগুলি অসংকেতকও নয়, অথচ কোন কায়াশূন্যছায়াবৎ অশরীরি বস্তুকেও সংকেতিত করে না। এই পদ্ধতির সাহায্যে দেখান যায় যে অমূলদ (Irrational) সংখ্যাগুলি মূলদ সংখ্যার ন্যায়-নির্মিতি, মূলদ সংখ্যারা স্বাভাবিক (natural) সংখ্যারা ন্যায়নির্মিতি, অঙ্কবাচক

(cardinal) সংখ্যারা শ্রেণীর (class), এবং শ্রেণীরা (যৌক্তিক) বাক্য প্রসবকারী বাক্য-প্রকৃতির (propositional function)। সহজ ভাষায়, তিলোত্তমা নাই, কিন্তু যে তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে আমাদের সৌন্দর্যাস্বাদী কল্পনা তাকে নির্মাণ করে, সেই সৌন্দর্যকণাগুলি প্রসিদ্ধ বস্তু, এবং অপ্রসিদ্ধ তিলোত্তমা আমাদের রসানুগ কল্পনার, সৌন্দর্যাস্বাদী কল্পনার নির্মাণ। তেমনি আমাদের বৈজ্ঞানিক কল্পনা, বিচারানুগ কল্পনা, নৈয়ায়িক কল্পনা, বাক্য প্রকৃতি হতে শ্রেণী, শ্রেণী হতে সংখ্যা প্রভৃতি নির্মাণ করেছে। যে সব বাক্যে √২, √−১ প্রভৃতি সংকেত রয়েছে তাদের শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করতে হবে বাক্য প্রকৃতি ঘটিত বাক্যে। তাহলেই তাদের প্রকৃত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হবে এবং অশরীরী বস্তু অঙ্গীকারের অনুপাদেয় কর্তব্য আর আমাদের দার্শনিক সত্তাকে পীড়িত করবে না।

এই বৈশ্লেষিক পদ্ধতি লর্ড রাসেলকে দর্শমের নবরূপ কল্পনায় উৎসাহিত করল। দর্শনের রাজ্যে আমরা প্রায়ই অশরীরি বস্তুর আমদানি করি। নিঃস্বরূপ বস্তু অনেক দর্শনেই স্বীকৃত হয়। অথচ এদের অস্বীকার করতে পারলে আমরা সকলেই, যাঁরা স্বীকার করেন তাঁরাও, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। ফ্রেগের পদ্ধতি প্রয়োগ করলে এই কাজটি সহজেই সম্পন্ন করা যায়। দৃষ্টান্তরূপে 'হৈম-গিরি'কেই নেওয়া যেতে পারে। কোন বাস্তব গিরিই হৈমগিরি নয়—কোন ভূগোলের গ্রন্থে এরূপ গিরির অবস্থিতির কথা বলা নাই, এবং কোন ভূতাত্ত্বিকও এরূপ গিরি নিয়ে মাথা ঘামান না। 'হৈমগিরি' শব্দের শক্তি কোন বাস্তব গিরিতে নাই। অথচ শব্দটি শক্তিশূন্য নয়, নিরর্থক নয়। তাই অনেক দার্শনিক অবাস্তব বস্তুরূপে, নিঃস্বরূপ বস্তুরূপে, বিজাতীয়সত্তাক বস্তুরূপে হৈমগিরিকে স্বীকার করে থাকেন। তাঁদের অভিপ্রায় এই যে বাস্তব জগতে হৈমগিরি না থাক, কল্পনার জগতে আছে, প্রসিদ্ধ সত্তায় হৈমগিরি সত্তাবান্ না হোক, অপ্রসিদ্ধ, বিজাতীয় সত্তায় সত্তাবান্ হৈমগিরি বটে। সত্তা এক প্রকার নয়, বস্তুও এক প্রকার নয়। প্রসিদ্ধ বস্তু-আছে, অপ্রসিদ্ধ বস্তুও আছে। প্রসিদ্ধ সত্তায় সত্তাবান্ পদার্থ আছে, আবার আবার অপ্রসিদ্ধ বিজাতীয় সত্তায় সত্তাবান্ পদার্থও আছে। Existent বস্তুও আছে, subsistent বস্তুও আছে। 'আছা' অনেক রকমের হয়। এই মতটিকে খণ্ডন করা খুব সহজ নয়, আবার মেনে নেওয়া আরও অসহজ। এখন, ফ্রেগের পদ্ধতি যদি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে এই মতের গ্রাহ্য অংশকে রেখে আমাদের সহজ বুদ্ধি সিদ্ধ মতকে প্রতিষ্ঠা করা খুবই সহজ হয়।

এই পদ্ধতির মূল কথা হল সংকেত মাত্রই অসংকুচিত সংকেত নয়। অসংকুচিত সংকেত, সুশক্ত সংকেত, অখণ্ড সংকেত, বস্তুসংকেতক সংকেত। কিন্তু সংকুচিত (in-complete) সংকেত,কুশক্ত সংকেত, অপূর্ণ সংকেত, খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ কিন্তু অখণ্ড প্রসিদ্ধি শূন্য পদার্থ সংকেতক সংকেত। আমাদের দৈনন্দিন ভাষায়, আটপৌরে কথায়, এমন কি বিজ্ঞানের ভাষাতেও উভয় প্রকার সংকেতই বিদ্যমান থাকে, এবং আমরা সংকেত রহস্য অনেক সময়ই অনুধাবন করি না বলে, দু প্রকার সংকেতই যে বস্তু সংকেতিত করে না, বস্তুর চিত্র অঙ্কনে সমর্থ নয়, একথা খেয়াল করি না বলে, উদ্ভট সত্তায় সত্তাবান বহু পদার্থকে অঙ্গীকার করি, জন্ম দিই শ্বাসবোধী পরাবিজ্ঞানের। যেমন দৈনন্দিন জীবনে দ্রব্যবাচক বহু শব্দ ব্যবহার করা হয়। আমরা 'আম', 'জাম' প্রভৃতি সংকেত ব্যবহার করি। এই সংকেতগুলি নিরর্থক নয়। 'আম জাম অপেক্ষা আকারে বড়', এই বাক্যে আম এবং জামের স্থান শূন্য রেখে, অথবা '—' কিম্বা 'ঞোঙৢঁ'র মতন শব্দ দিয়ে ভরাট করে বলতে পারি না যে বাক্যটির যথার্থ অনুবাদ করলাম। শব্দগুলি নিরর্থক নয়। অথচ নীল পীতাদি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি অতিরিক্ত অথচ তাদের আশ্রয়রূপ কোন দ্রব্য স্বীকার করা অনুভব বিরোধী কথা বলা। সেইজন্য এই সংকেতগুলি যে ঐরূপ কোন পদার্থকে সংকেতিত করে তাও বলা যায় না। বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে নীল পীতাদি অতিরিক্ত দ্রব্য, তা সে আমই হক, আর জামই হক, আমিই হই, আর তুমিই হও, অনুভবে ভাসমান তত্ত্ব নয়, সাক্ষাৎকার হয় যেরূপ তত্ত্বের সেরূপ কোন তত্ত্ব নয় প্রত্যক্ষবেদ্য নয়। এরা অনুমিত পদার্থ। আর, মনন ন্যায়ের প্রধান নীতিই হল লাঘব ন্যায়। সুতরাং এইরূপ অনুমিত পদার্থ যে ন্যায়-নির্মিতি, অথবা কল্পনা জন্য. অথবা বস্তুশূন্য বিকল্প মাত্র, এ যদি দেখান যায়, এবং তাতে যদি কোন তথ্যের অপলাপ না হয় তাহলে অনুমিত পদার্থের পরিবর্তে ন্যায়-নির্মিতিকেই গ্রহণ করতে হবে। আসলে, 'অনুমিত পদার্থেরই উপযুক্ত বিশ্লেষণ প্রয়োজন। প্রত্যক্ষে পাই না, বিকল্পমাত্র বহু পদার্থকে আমরা অনুমিত পদার্থের মর্যাদা দিয়ে থাকি। খেয়াল রাখি না যে আমাদের তথ্য সংক্রান্ত সকল বিবেচনা প্রত্যক্ষেই আরম্ভ হয় এবং প্রত্যক্ষেই শেষ হয়। তাই এমন কোন পদার্থ যদি আমরা অনুমান করি, যা কদাচ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই, যা প্রত্যক্ষের একান্ত অবিষয়, ত' সেই পদার্থকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে হবে। শুধু তাই নয়, তাকে বস্তু বলে অঙ্গীকার করা চলবে না। কারণ, ঐরূপ বস্তু সংকেতক সংকেত ফাঁকা সংকেত মাত্র হবে। কোন কিছুই, অনুভূত কোন কিছুই, সংকেতিত করতে পারবে না। এরূপ সংকেত পদার্থ বিজ্ঞানও আমদানি করে। 'ইথর' এর প্রকৃষ্ট

দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাতে তার বস্তুত্ব সিদ্ধ হয় না। তারা যে এক প্রকার ন্যায়-নির্মিতি এই কথাই সিদ্ধ হয়। আম-দ্রব্য, জাম-দ্রব্য প্রভৃতি দ্রব্য ন্যায়-নির্মিতি মাত্র। ঈশ্বরও তাই। দ্রব্যবাচক সংকেতগুলি বস্তু সংকেতক সংকেত নয়, নিরর্থকও তারা নয়। তারা কুণ্ঠিত সংকেত, সংকুচিত সংকেত। যে বাক্যে 'আম', 'জাম' প্রভৃতি সংকেত ব্যবহৃত হয়, সেই বাক্যের অর্থ নির্ণয়ের জন্য পুনর্লিখন প্রয়োজন। পুনর্লিখিত বাক্যে 'আম', 'জাম' প্রভৃতি দ্রব্য-সংকেতক সংকুচিত সংকেত থাকবে না, থাকবে নীল পীতাদি সংকেতক অসংকুচিত সংকেত। যাই হোক, আটপৌরে ভাষায়, বিজ্ঞানের ভাষায় সংকুচিত এবং অসংকুচিত দু রকমের সংকেত থাকে। তাই এই ভাষাকে বস্তুর যথার্থ চিত্র বলে মনে করা যায় না। সুতরাং এ প্রশ্ন থেকেই যায়, যে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানে, আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, তার বিশ্লেষণ কি হবে? কোন সংকেত দৈনন্দিন জীবনে অথবা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয় বলেই কি তাকে বস্তু সংকেতক বলে মনে করতে হবে? এই প্রশ্নই দর্শনের। আটপৌরে ভাষার, বৈজ্ঞানিক ভাষার, সংক্ষেপে ভাষার, তাৎপর্য কি, এই প্রশ্নই বিবেচনা করে দর্শন। দর্শন কথার কথা, ভাষার শাস্ত্র, বাক্যের বিশ্লেষণ।

বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষ্য কিছু থাকে। তারই বিশ্লেষণ করা হয় এবং বীজ-গণিতের সমীকরণ লিখন রীতিতে বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণকে লেখা যায়। আমরা বাঁ দিকে বিশ্লেষ্যটিকে লিখে = চিহ্ন দিয়ে ডান দিকে বিশ্লেষণকে, বিশ্লেষণ বাক্যকে লিখতে পারি। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বিশ্লেষণকে লক্ষণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। লক্ষণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও লক্ষণ থাকে, এবং বীজগণিতের সমীকরণ লেখার রীতিতে আমরা বাঁ দিকে লক্ষ্যকে লিখে = চিহ্ন দিয়ে ডান দিকে লক্ষণ বাক্যকে লিখে থাকি। বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তাই। তবে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিশ্লেষ্য এবং বিশ্লেষণ বাক্যের সংকেতগুলি যে এক তলের হবে, অসমতল হবে না এমন কোন কথা নাই। বস্তুতঃ সুসংকুচিত সংকেত ঘটিত বাক্যের বিশ্লেষণের অর্থই হল কল্পনাজন্য, ন্যায়নির্মিত, বস্তু অ-সংকেতক বাক্যকে সহজ অনুভবে উদ্ভাসিত বস্তু সংকেতক বাক্যে, অসংকুচিত সংকেত ঘটিত বাক্যে বিশ্লেষণ করা। তা যদি না করা হয়, অর্থাৎ বিশ্লেষণ বাক্যেও যদি সংকুচিত সংকেত রাখা হয়, তাহলে কোন দার্শনিক সাফল্য লাভ করা যাবে না। বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণ বাক্যের সংকেতগুলি সমতাল হলে অযত্ন রচনা প্রসূত বাক্যের বোধ অথবা অন্য কোন অস্পষ্ট বোধ, বাক্যের নৈয়ায়িক প্রসক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধ নির্ণয় সহজ সাধ্য হতে পারে। কিন্তু কোন দার্শনিক সাফল্য

লাভ করা যায় না। দার্শনিক সাফল্যের অর্থই হল বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণ বাক্যের সংকেতের অসমতলতা। অর্থাৎ বিশ্লেষণ দু রকমের : অনপৈত, সমতাল বিশ্লেষণ, (same-level analysis) এবং অভিমৌল (directional), পর্যবসানী (reductive), নবতাল (new level) বিশ্লেষণ। 'বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনীর লেখক' এই বাক্যটিকে বিশ্লেষণ করে যখন বলি, 'দুর্গেশ-নন্দিনী একজন লিখেছিলেন; একজনের অধিক লেখেন নাই; এবং তাঁতে আশ্রিত এই লেখকত্ব ধর্মের সামানাধিকরণ্য রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রত্বতে', তখন বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণ সমতলেই থাকে, দেখা যায় বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণের সম্বন্ধ তম্পাদনপেতম। এই প্রকারের বিশ্লেষণকে অনপৈত বিশ্লেষণ অথবা সমতাল বিশ্লেষণ বলা হয়। কিন্তু যখন কোন দ্রব্যবাচক সংকেত বিশ্লেষ্য বাক্যের ঘটক হয় এবং বিশ্লেষণে এই সংকেতটি বা তার সমতাল কোন সংকেত থাকে না, থাকে নূতন তলের অধিক মৌলিক, 'নীল পীতাদি' সংকেত তখন বিশ্লেষণটি হয় অভিমৌল বিশ্লেষণ অথবা পর্যবসানী বিশ্লেষণ, অথবা নবতাল বিশ্লেষণ। ফ্রেগের যে বিশ্লেষণের কথা উপরে বলা হয়েছে, তা এই অভিমৌল বিশ্লেষণই এবং দার্শনিক বিশ্লেষণও এই বিশ্লেষণ।

কথাটিকে এভাবে খুলে বলা যায়। অনাদি কাল হতে দার্শনিক জিজ্ঞাসা তত্ত্বজিজ্ঞাসা বলে অভিহিত হয়ে আসছে। কিন্তু এই তত্ত্ব (reality) সম্পর্কে, তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার কোন বোধ না থাকার জন্য পরিচ্ছন্ন, পরিচ্ছিন্ন আলোচনা না করার জন্য তত্ত্ব হতে তথ্যের, তত্ত্বজিজ্ঞাসা হতে তথ্য জিজ্ঞাসার, দর্শন হতে বিজ্ঞানের ভেদ অনুধাবন করা হয় নাই; এবং দর্শনকে এক প্রকার বিজ্ঞান বলে, খণ্ড বিজ্ঞানের সমন্বয়াত্মক বিজ্ঞান বলে মনে করা হয়েছে। এর ফল যে কি হয়েছে তা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দর্শনকে বাঁচাতে হলে তাকে নতুন ভাবে গঠন করতে হবে। তত্ত্বজিজ্ঞাসা বলতে ঊর্ধ্বমূল অধঃশাখ গুহায় নিহিত, রহস্যময়, অতীন্দ্রিয় প্রভৃতি বলতে আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু বুঝতে নাকাল হতে হয় এমন কোন কিছুর জিজ্ঞাসা বোঝা চলবে না। বুঝতে হবে আদর্শ ভাষা জিজ্ঞাসা। অর্থাৎ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, বিজ্ঞানে বহু সংকেতই ব্যবহৃত হয় যা অনুভূত, প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কল্পনাদিমুক্ত সহজ অনুভবে উদ্ভাসিত পদার্থকে সংকেতিত করে না। এরা অসংকুচিত সংকেত নয়, তবু আমরা অনেক সময়ই এদের অসংকুচিত সংকেত বলে মনে করি। ফলে অনেক উদ্ভট পদার্থ অঙ্গীকারে বাধ্য হই। উপরন্তু ভাষার, লৌকিক, স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ভাষার—গঠন প্রণালী, পদের অন্বয় ও বাক্যের রচনা প্রণালী, বৈয়াকরণ প্রণালী, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনই হয়ে আছে যে

সংকেতিতদের অন্বয়, পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে অনুভব বিরুদ্ধ দার্শনিক মতের হাত এড়ান যায় না। আর্য দার্শনিক মহলে অদ্বয়বাদের প্রভাব এবং আর্য-ভাষা সমূহের পদান্বয় প্রণালীর তুলনা করলে, এই মন্তব্যের গূঢ়ার্থ বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে না। এই সব ভাষায় সম্বন্ধজ্ঞাপক বাক্যগুলিকে বিনা পরিশ্রমে বিশেষ্য বিশেষণ ভাবাপন্ন বাক্যে রূপান্তরিত করা যায়; এবং তা হ'তে এই সিদ্ধান্ত করা সহজ হয় যে সম্বন্ধ কোন অতিরিক্ত পদার্থ নয়, গুণপদার্থেরই অন্তর্গত। সুতরাং আরও সিদ্ধান্ত করতে হয় যে সম্বন্ধী হওয়া আর সাপেক্ষ হওয়া একই কথা, সসীম মানেই সাপেক্ষ, এবং অদ্বয় অসীম ব্রহ্মই একমাত্র নিরপেক্ষ বস্তু। এই সব কথা সম্পূর্ণ অনুভব বিরোধী কথা। তবু ভাষার কুহকজালে আবদ্ধ হয়ে এদের আমরা ফেলতে পারি না, গলাধঃকরণ করি, এমন কি সহজ অনুভবকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিই। তাই প্রয়োজন হয় ভাষার বিশ্লেষণের। আসলে ভাষা যে ছলনাময়ী, এ কোন নব আবিষ্কৃত তথ্য নয়। এর আগেও অনেকে এমন কথা বলেছেন যে ভাষার আকার নির্ণয় পূর্বক যথার্থ জ্ঞানের আকার, তত্ত্বের আকার নির্ণয় করা যায় না। তারপর তাঁরা আবার বলেছেন তত্ত্ব প্রপঞ্চেরপ্রপঞ্চিত, বাক্ ও মনের অতীত। বলা বাহুল্য, যে এরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত। ভাষা যে অযোগ্য তাও ভাষাকেই বলতে হয়, এবং কেন অযোগ্য তাও বলতে হয়। তত্ত্বনির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভাষাকে ত্যাগ করতে হবে, একথা গ্রাহ্য নয়। তেমনি একথাও গ্রাহ্য নয় যে ভাষাই তত্ত্ব। কারণ ভাষাই তত্ত্ব এই ভাষাখণ্ডটি যে স্বপর নয়, স্বভিন্নপর তা সকলকেই স্বীকার করতে হয়। তাই ভাষা ও তত্ত্ব সম্পর্কে এই মতই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় যে ভাষা বিষয় নিরূপ্য, ভাষার আকারই তত্ত্বের আকার, ভাষাতেই তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, ভাষাতত্ত্বের চিত্র, ভাষামুকুরে তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এই ভাষা স্বাভাবিক ভাষা নয়, ঐতিহাসিক ভাষা নয়, আটপৌরে ভাষা নয়। এ ভাষা পোষাকী ভাষা, কৃত্রিম ভাষা, আদর্শ ভাষা। এই ভাষার সব সংকেতই অসংকুচিত সংকেত, এবং এর ব্যাকরণ গাণিতিক ন্যায়। দার্শনিকের কর্তব্য এইরূপ ভাষা নির্মাণ, অথবা এইরূপ ভাষায় পৌঁছান, এবং সাধারণ আটপৌরে ভাষার বৈশ্লেষিক অনুবাদ।

যে ভাষার ব্যাকরণ গাণিতিক ন্যায়, সে আবার কেমন ভাষা? এবং ঐ ভাষায় যে বস্তুর স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তাই বা কেমন করে বুঝব?—এই দুটি আপত্তির কথা বিচার করে দেখতে হয়। প্রথম আপত্তিটি দু ভাবে দেওয়া যেতে পারে। যদি কেউ মনে করেন যে ভাষার ব্যাকরণ ব্যাকরণই, ন্যায় নয়, তাহলে

তিনি এই আপত্তিটি দিতে পারেন। আবার যদি কেউ মনে করেন যে ভাষার ব্যাকরণ সহজ স্বাভাবিক ন্যায়, গাণিতিক ন্যায় নয়, তাহলেও তিনি এই আপত্তিটি দিতে পারেন। এই দুটি আপত্তির মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে প্রথম আপত্তিটিকেই অধিক প্রতিকূল মনে হতে পারে। কিন্তু বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে দ্বিতীয় আপত্তিটিই অধিক প্রতিকূল। প্রথম আপত্তির উদ্ধার সহজেই হয়; কিন্তু দ্বিতীয় আপত্তির উদ্ধার তত সহজ নয়। যাই হ'ক প্রথম আপত্তিটির উদ্ধার এই ভাবে করা যায়। ভাষার ব্যাকরণ ন্যায়ই, কারণ ভাষা এক প্রকার ক্যাল্‌কুলাস্‌। অর্থাৎ, ভাষা বলতে যদি আমরা লৌকিক ভাষাও বুঝি, তাহলেও দেখা যাবে যে ভাষা ক্যাল্‌কুলাস্‌ বিশেষ। যেমন, সব মানুষই নশ্বর, সব দার্শনিকই তার্কিক, সব কবিই কল্পনাবিলাসী প্রভৃতি কয়েকটি এই ধরণের বাক্য নেওয়া যাক্‌। তারপর প্রশ্ন করা যাক্‌ যে ব্যাকরণ এই সব বাক্যকে শাসন করছে সেই ব্যাকরণটি কি? প্রথমে মনে হতে পারে যে এই প্রশ্নটি আবার একটি প্রশ্ন নাকি, বাক্যগুলি যে ভাষায়, যেমন আলোচ্যস্থলে বাংলা ভাষায় লিখিত সেই ভাষার অর্থাৎ বাংলা ভাষার ব্যাকরণই এই সব বাক্যকে শাসন করছে। কিন্তু তা নয়। বাক্যগুলির দুটি করে দিক আছে, একটি নিছক ভাষার দিক, আর একটি প্রমাণের দিক; এবং এই দুটি দিকের মধ্যে দ্বিতীয়টিই মৌলিক, অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বৈয়াকরণ ঔচিত্য অনৌচিত্য, অনেক সময় প্রামাণিকত্ব, অপ্রামাণিকত্বের ব্যভিচারী হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। অথবা আসে অনেক কিছুই, কিন্তু যায় না কোন কিছুই। ভাষার বৈয়াকরণ ব্যাকরণ যে নৈয়ায়িক ব্যাকরণ সাপেক্ষ এবং দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাকরণেই দর্শনের সূত্র রয়েছে এই প্রতিজ্ঞার কোন হানি হয় না। কারণ, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে লৌকিক ভাষা, নৈয়ায়িক ভাষা নয়; এই ভাষায় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না, তত্ত্বের আকার আকারিত হয় না। তাই কোন একটি বিশেষ বৈয়াকরণ ব্যাকরণ পূর্বোক্ত বাক্যগুলিকে শাসন করছে, একথা যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে তার উত্তরে বলা চলবে না। এদের শাসন করছে কোন্‌ নৈয়ায়িক ব্যাকরণ বা কোন ন্যায় তা দেখতে হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এরিষ্টটলের ন্যায়ই এই বাক্যগুলিকে শাসন করছে। আমরা 'মানুষ', 'নশ্বর' প্রভৃতি অব্যভিচারী (constant) নামকে ত্যাগ করে 'S' এবং 'P' এই ব্যভিচারী (variable) সংকেত দুটির ব্যবহার করতে পারি; এবং তখন দেখতে পাই এদের নৈয়ায়িক কাঠামো, ন্যায়সিদ্ধ আকার। আমরা সব কটি বাক্যকেই সব S-ই P, Sa P এই ভাবে লিখতে পারি; তারপর যদি আবার

PQ বাক্য, অথবা বাক্য-প্রকৃতি নিয়ে আসি, তাহলে সিদ্ধান্তও করতে পারি SQ। এই ভাবেই আমরা এই সব বাক্যের প্রকৃত রূপ, তাৎপর্য অন্য বাক্যের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রসক্তি প্রভৃতি টের পাই। সুতরাং ভাষার ব্যাকরণ ব্যাকরণ মাত্রই, একথা যুক্তিযুক্ত নয়। ভাষার ব্যাকরণ ন্যায়, এবং আমাদের ঘরোয়া ভাষার ন্যায় মোটামুটি এরিষ্টটলের ন্যায়। প্রথম ভাবে যদি প্রথম আপত্তিটি দেওয়া হয়, তাহলে তার উদ্ধার মোটেই অসহজ নয়।

দ্বিতীয় ভাবে আপত্তিটি দিলে তার উদ্ধার কিছু বেশী অসহজ। কারণ, এই ভাবে আপত্তি দেওয়ার মূলে রয়েছে সাধারণ ভাষার ন্যায় ও গাণিতিক ন্যায়ের সম্পর্ক বিষয়ক তত্ত্ব। অনেকেই এই দুই প্রকারের ন্যায়কে একই অর্থে ন্যায় বলতে চান না, এবং না চাওয়াটিই রয়েছে এইভাবে আপত্তি দেওয়ার মূলে। অবশ্যই এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে বিস্তৃত আলোচনার, সূক্ষ্ম বিচারের প্রয়োজন। তবে এক্ষেত্রে তা করার অবসর নাই। সংক্ষেপে কেবল এইটুকুই বলা যায় যে এরিষ্টটলীয় ন্যায়কে নানাভাবে বোঝা হয়েছে। আগের দিনে দার্শনিকরা একভাবে বুঝেছেন এবং বর্তমানে গাণিতিক ন্যায়বিদ্গণ আর এক ভাবে বোঝেন। তাঁদের মতে দার্শনিকরা এরিষ্টটলের অভিপ্রায়, তাঁর ন্যায়ের গূঢ়, রহস্য ঠিক অনুধাবন করতে পারেন নাই। এরিষ্টটলের ন্যায়ও আকার সর্বস্ব ন্যায়, গাণিতিক ন্যায়ের বিজাতীয় ন্যায় নয়। গাণিতিক ন্যায় এরিষ্টটলের ন্যায়েরই পূর্ণাঙ্গ রূপ, বিস্তৃত তন্ত্রবদ্ধ রূপ। এরিষ্টলের ন্যায় গাণিতিক ন্যায়ে ব্যাখ্যাত হয়। উপরন্তু, দৈনন্দিন ভাষার যে 'না', 'উভয়', 'যদি-তাহলে', 'হয়-অথবা' প্রভৃতি নৈয়ায়িক করণগুলি (logical operation) ব্যবহৃত হয়, তাদের PM এর '~', '.', '⊃' এবং 'v'তে অনূদিত করা যায়। দৈননন্দিন সহজ ভাষার ন্যায় এবং গাণিতিক ন্যায় বিজাতীয় নয়। এদের প্রভেদ কেবল এই খানেই যে একটি অসম্পূর্ণ, অন্যটি সম্পূর্ণ, একটি অঙ্কুর, অন্যটি ঐ অঙ্কুরের বিবৃদ্ধিরূপ মহীরুহ; একটি প্রথম, অন্যটি শেষ; একটি অস্বতঃপ্রমাণ, অন্যটি প্রথমটিকেও প্রমাণ করে, এবং নিজেও প্রমাণ করে। এই দৈনন্দিন ভাষার ন্যায়, এরিষ্টটলের ন্যায় একথা স্বীকার করলে আরও স্বীকার করতে হয় যে আদর্শ ভাষার ন্যায় গাণিতিক ন্যায়ই।

দ্বিতীয় আপত্তিটির উদ্ধারের চেষ্টা আমরা এখন করতে পারি। এই আপত্তিটির মূল কথা হল এই ভাষায় যে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হবে এ কথার প্রমাণ কি? বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই বাক্যের সপক্ষে কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই। কিন্তু সেইজন্য যে বাক্যটিকে নিষ্প্রমাণ বলতে হবে তা নয়। বাক্যটিকে অস্বীকার করলে যে মহৎ

অনিষ্ট হয় তাই এর প্রমাণ। অর্থাৎ কোন ভাষাতেই যে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না, তাও আমাদের স্বীকার করতে হয়। সুতরাং আমাদের আরও স্বীকার করতে হয় যে সুগঠিত, সুরচিত ন্যায় যে ভাষার ব্যাকরণ এবং যে ভাষায় কোন সংকুচিত সংকেতই স্থান পায় না, সেই আদর্শ ভাষায় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। সংক্ষেপ, গাণিতিক ন্যায় হতে গণিতকে লাভ করা যায়। সাধারণ আকারৈকধর্মী ন্যায়কেও, সহজ ভাষার ন্যায়কেও এই ন্যায় হতে লাভ করা যায়। এবং ভাষার মূল ব্যাকরণ যেহেতু ন্যায় সেই হেতু এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসঙ্গত হয় যে আদর্শ ভাষার ব্যাকরণ গাণিতিক ন্যায়ই। আদর্শ ভাষায় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না, একথা অর্থ, কোন ভাষাতেই তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় না, তত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে বাক্‌ ও মনের অতীত। এরূপ সিদ্ধান্ত কারও ইষ্ট নয়।

আদর্শ ভাষার ব্যাকরণ গাণিতিক ন্যায়। অথবা, যে ভাষার ব্যাকরণ গাণিতিক ন্যায় সেই ভাষাই আদর্শ ভাষা। এই ভাষাই যা কিছু প্রকাশযোগ্য, তাই প্রকাশে সমর্থ। ভাষা ক্যাল্‌কুলাস্‌ বিশেষ। সাধারণ ক্যাল্‌কুলাস্‌ হতে আদর্শ ভাষার পার্থক্য কেবল এইখানে যে ওতে বস্তু সংকেতক সংকেত আছে, এর একটা vocubulary, শব্দ সম্ভার আছে। গণিত দর্শনে যেমন ভাষাকে সত্যতা-অপেক্ষক truth-functional বলে মনে করে, দর্শনেও তাই করবে। দার্শনিকের আদর্শ ভাষা হবে আণবিক এবং পরমাণবিক, molecular এবং atomic বাক্যের একটি অশেষ সমাহার। এই ভাষার পরমাণবিক বাক্যগুলির সত্যতা অনুভবের সাহায্যে, অনৈয়ায়িক পদ্ধতির সাহায্যে, নিরীক্ষণের সাহায্যে নির্ণয় করতে হবে, এবং অন্য প্রকার বাক্যের সত্যতা নির্ণীত হবে নৈয়ায়িক পদ্ধতি প্রয়োগের সাহায্যেই। সুতরাং দার্শনিক কাজও হবে বিশ্লেষণ, প্রথমতঃ স্বাভাবিক ভাষাকে আদর্শ ভাষায় অনুদিত করার জন্য, এবং দ্বিতীয়তঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করার জন্য।

যা বলা হল তা থেকে বোঝা যাবে যে দর্শনের নবরূপ কল্পনার মূলে রয়েছে একটি বিশ্বাস এবং একটি অবিশ্বাস। গণিত-দর্শনে অভিমৌল বিশ্লেষণের ক্রিয়া সাধকত্ব লক্ষ্য করে এই বিশ্বাস এসেছে যে দর্শনেও এই অভিমৌল বিশ্লেষণ পদ্ধতি ক্রিয়াসাধক হবে। সুতরাং আরও একটি বিশ্বাস জন্মলাভ করেছে যে এমন আদর্শ ভাষা আছে, বা নির্মাণ করা সম্ভব, যাতে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, যা হতে এক নজরে তত্ত্বের আকার বুঝে নেওয়া যায়। অবিশ্বাসটি হল মননধর্মী পরাবিজ্ঞানে, অনুভবে অপ্রতিষ্ঠিত অনুমিত সত্তায় বিশ্বাসী পরাবিজ্ঞানে, অবিশ্বাস। এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাস হাত ধরাধরি করে চলেছে; একে অপরকে লালন করেছে, পালন

করেছে, পুষ্ট করেছে। অন্ততঃ পক্ষে বিশ্লেষণী দর্শনের প্রথম পর্বে তাই মনে করা হ'ত। ভাবা হত যে এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাস এমনই গাঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ যে এদের একটিকে ত্যাগ করলে অন্যটিকেও ত্যাগ করতে হয়, অথবা একটি একটিকে ত্যাগ না করলে, অন্যটিকে ত্যাগ করা যায় না।

(ক্রমশঃ)

কার্য-কারণ সাদৃশ্য

অধ্যাপক মিহিরবিকাশ চক্রবর্তী

কার্য ও কারণ সর্বক্ষেত্রেই পরস্পর সদৃশ, অথবা সদৃশবস্তুর মধ্যেই কার্য-কারণ সম্বন্ধ সম্ভব, এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের এই প্রয়াসের সার্থকতা বুঝতে হলে পাশ্চাত্য দর্শনে সিদ্ধান্তটির বিশেষ যে একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে তা বোঝা দরকার।

॥ এক ॥

সিদ্ধান্তটির সত্যমিথ্যা আধুনিক দর্শনে দেকার্তে প্রবর্তিত জড় ও মনের দ্বৈতবাদের সত্যমিথ্যার অন্যতম নির্ধারক; তার ফলে দেকার্তোত্তর দর্শনের মূল্যায়নেও এর আংশিক ভূমিকা আছে। সংক্ষেপে, এইখানেই সিদ্ধান্তটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

যে-সব কারণে দেকার্তেকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের পথিকৃৎ বলা হয় তার মধ্যে জড় ও মন সম্বন্ধে তাঁর দ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত প্রধানতম। কারণ, এক অর্থে এই সিদ্ধান্ত দেকার্তের পরবর্তীকালীন দর্শনের গতিপ্রকৃতির নিয়ামক। বস্তুতঃ দেকার্তের পরবর্তী দর্শনের ইতিহাস তাঁর দ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ প্রতিক্রিয়ারই ইতিহাস। দেকার্তের পরবর্তীকালীন দার্শনিক প্রয়াস প্রধানতঃ তাঁর এই দ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তেরই কোন একটি উপযুক্ত বিকল্প সন্ধানের অনবচ্ছিন্ন প্রয়াস। এরই ফলে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে কখনও জড়কে মনের অধীন, কখনও মনকে জড়ের অধীন করা হয়েছে। আবার কখনও বা জড় ও মন উভয়কে কোন অসজ সত্তার দ্বৈতরূপ বলে গণ্য করা হয়েছে।

কিন্তু কার্তেজীয় দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে এই যে দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া, তার উপযুক্ত বিকল্পের জন্য এই যে নিরবচ্ছিন্ন সন্ধিৎসা, এর কারণ কি? কারণ একাধিক। কিন্তু সুবিদিত ও সর্বপ্রধান যে কারণ তা হচ্ছে কার্যকলাপের দিক থেকে দেহ ও মনের মধ্যে যে পারস্পরিক অনুগামিতার সম্পর্ক আছে তার সঙ্গে তাদের দ্বৈতধর্মের সুসঙ্গত সমন্বয় সাধনে দেকার্তে ও তাঁর দ্বৈতবাদী উত্তরসূরীদের ব্যর্থতা।

দেহ ও মনের এই কার্যকলাপগত পরস্পরানুসারিতার ব্যাখ্যা হিসেবে দেকার্তে তাদের মধ্যে মিথঃক্রিয়া বা interaction-এর প্রকল্পনা করেছিলেন। দেহমনের মিথঃক্রিয়া বলতে দেকার্তে অবশ্য তাদের পারস্পরিক কার্যকারণ সম্পর্কই বোঝাতে চেয়েছেন। অর্থাৎ কার্তেজীয় মতে দেহ ও মনের কার্যকারণ সম্পর্ক এমন যে, কোন একটি মানসিক সংঘটনের কারণ যে জড়সংঘটন তা হয়ত আর একটি মানসিক সংঘটনেরই ফল হতে পারে ; ঠিক তেমনিভাবে যে মানসিক সংঘটন একটি জড়-সংঘটনের কারণ তার উৎপত্তি হতে পারে আর একটি জড়সংঘটন থেকে।

কিন্তু দেহমানসিক পরস্পরানুগামিতার এই কার্তেজীয় ব্যাখ্যা দেকার্তের দ্বৈতবাদী-উত্তর দার্শনিকদেরও মনঃপূত হয়নি। কেননা, দেহ ও মনের মিথঃক্রিয়া বা কার্য-কারণ সম্পর্ক তাদের দ্বৈতধর্মবিরোধী মনে করা হয়েছে। অর্থাৎ দেহ ও মনের মধ্যে আমূল বৈপরীত্য স্বীকারের অর্থই তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের সমস্ত সম্ভাবনা অস্বীকার। কার্তেজীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে এই আপত্তি কিন্তু একটি অনতিপ্রচ্ছন্ন অভ্যুপগম-ভিত্তিক এবং সে অভ্যুপগমটি হচ্ছে : পরস্পর সদৃশবস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক সম্ভব।

আশ্চর্য লাগে যে এই অভ্যুপগমটি দেকার্তের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত স্বতঃ-সিদ্ধের মত একটা প্রশ্নাতীত সত্য হিসেবে চলে আসছে। তাই যাঁরা এই অভ্যুপগমেরই ভিত্তিতে কার্তেজীয় দ্বৈতবাদকে আক্রমণ করেছেন তাঁরাও একে যুক্তিপ্রতিষ্ঠ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ইউইং[১], ষ্টেস্[২] এবং লাভজয়[৩] প্রমুখ দার্শনিকের মধ্যে একদা-অবলুপ্ত কার্তেজীয় দ্বৈতবাদের একটা পরিশোধিত পুনঃপ্রবর্তনার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। দেহমনের অন্যোন্যানুসারিতার ব্যাখ্যা হিসেবে স্পিনোজার যে সমান্তরালবাদ তাকে তাঁরা সুস্পষ্ট তাচ্ছিল্যে উপেক্ষা করেছেন। পরমকারুণিক কোন অধিপুরুষের সাহায্যে লাইবনিজ বা অকেসনা-লিষ্টরা অন্যোন্যানুসারিতার যে আজব একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাকেও তাঁরা প্রশ্রয় দেবার বিরোধী। দেহ-মানসিক পরস্পরানুগামিতার বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হিসেবে

১. 'Are Mental Attributes the Attributes of the Body ?', 'Is there Mind-Body Interaction ?' এবং 'Prof. Ryle's Attack on Dualism'—যথাক্রমে Proceedings of the Aristotelian Society (New Series) এর Vols XIV, XXXI এবং LIII-তে প্রকাশিত। Fundamental Questions of Philosophy'—ও দ্রষ্টব্য।

২. 'Russell's Neutral Monism ; Philosophy of Bertrand Russell (Schillip কর্তৃক সম্পাদিত)।

৩. 'Revolt Against Dualism'.

এই নব্য দ্বৈতবাদীরা দেকার্তের সেই মিথঃক্রিয়ার প্রকল্পকেই পুনর্গ্রহণ করেছেন। তাত্ত্বিক প্রয়োজনে এই সব দার্শনিকরা তাই এই নিরপক্রত অভ্যুপগমটির সত্যতা অবশেষে অস্বীকার করেছেন। এই অভ্যুপগম তাঁদের মতে একটি মধ্যযুগীয় ধারণা বা একটি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়। এখন এই অভ্যুপগমের সত্যতার অস্বীকৃতি যদি যথার্থই সিদ্ধ হয় তবে দেকার্তের দেহমানসিক দ্বৈতবাদের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় এই সব দার্শনিকেরা যে আংশিক সাফল্য অর্জ্জন করেছেন তা স্বীকার করতেই হবে। এবং কার্তেজীয়-দ্বৈতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এই সাফল্যকে স্বীকারের অর্থই দেকার্তোত্তর দর্শনচিন্তার তাৎপর্য ও মূল্যের অস্বীকার। কেননা, আগেই বলা হয়েছে দেকার্তোত্তর পরবর্তী যুগের দর্শনচিন্তা এই দ্বৈতবাদেরই বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এবং এরই একটি উপযুক্ত বিকল্প সন্ধানের প্রচেষ্টা। সুতরাং দেকার্তোত্তর দর্শনকে তার স্বমূল্যে ও স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন কার্যকারণ সাদৃশ্যের প্রতিষ্ঠা।

॥ দুই ॥

নব্য দ্বৈতবাদী মতে কার্যকারণের মধ্যে আবশ্যিক সাদৃশ্যের সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতা-অসমর্থিত। অভিজ্ঞতাভিত্তিক সত্য হিসেবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিসদৃশ বস্তুর মধ্যেও কখনো কখনো কার্যকারণ সম্পর্কের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যথা, 'বিদ্যুৎ বজ্রের কারণ, তবু উভয়ের পার্থক্য আমূল ......;' আবার, 'শৈত্য জলের মধ্যে কঠিনতার সৃষ্টি করে, কিন্তু শৈত্য ও কঠিনতা সম্পূর্ণ সাদৃশ্যহীন'।[৪]

এখন এই যুক্তির যা কিছু মূল্য আছে তা দুটি ধারণার সত্যতা-সাপেক্ষ। প্রথম ধারণা হচ্ছে : বিদ্যুৎ-বজ্র অথবা শৈত্যকঠিনতার সম্পর্ক যথার্থই কার্যকারণ সম্পর্ক ; এবং দ্বিতীয় ধারণা : বিদ্যুৎ ও বজ্র অথবা শৈত্য ও কঠিনতা সম্পূর্ণ বিসদৃশ। কিন্তু এই দুটি ধারণার কোনটিই সন্দেহের অবকাশমুক্ত নয়। বিদ্যুৎ বজ্রের মধ্যে অথবা শৈত্য ও কঠিনতার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের আরোপ বোধ করি একটি অতি সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রমাদ। কেননা, এদের মধ্যে যথার্থ আরোপিত হতে পারে যে সম্পর্ক তা হচ্ছে সমকারণক কার্যের সম্পর্ক। আবার বজ্র ও বিদ্যুৎ অথবা শৈত্য ও কঠিনতা যে বিসদৃশ এই ধারণারই বা উৎস কি? উৎস সম্ভবত চিরাচরিত এই ধারণা যে সাদৃশ্য সমদ্রব্য বা সমগুণাশ্রয়ী। কিন্তু

৪. 'Russell's Neutral Monism', পৃঃ ৩৮৭।

প্রবন্ধান্তরে° আমরা প্রমাণের চেষ্টা করেছি যে সাদৃশ্য সম্পর্কে এই চিরাচরিত ধারণা ভ্রান্ত এবং এই ভ্রান্তি সম্পর্কে অসচেতনতা বোধ করি দেকার্তের দেহমানসিক দ্বৈত-বাদের অন্যতম কারণ।

কার্যকারণ-সাদৃশ্য-সিদ্ধান্ত যে অভিজ্ঞতা বিরোধী বা অভিজ্ঞতা-অসমর্থিত এই যুক্তি তাহলে ভ্রান্ত। কিন্তু এই ভ্রান্তি প্রমাণ একদিক থেকে অপ্রয়োজনীয়। কেননা, এই যুক্তিকে গ্রহণ করলেও কার্যকারণের সাদৃশ্য অপ্রমাণিত হয় না। যুক্তিটির সত্যতা স্বীকারে এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্য-কারণের সাদৃশ্য প্রমাণ সম্ভব নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতাই তো সত্যের একমাত্র ভিত্তি এবং প্রমাণ নয়। অভিজ্ঞতায় যে সত্যের প্রমাণ অসম্ভব অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ উপায়েও তো তার প্রমাণ সম্ভব হতে পারে; এবং বর্তমান প্রবন্ধে কার্যকারণের আবশ্যিক সাদৃশ্যের যে প্রমাণ আমরা উপস্থাপিত করতে চলেছি তা এমনই একটা অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ প্রমাণ।

কার্যকারণের সাদৃশ্য যদি তাদের কার্যকারণত্বের কারণ হত তবে কার্যকারণ সাদৃশ্যের একটা অবরোহ প্রমাণ সম্ভব হত। কিন্তু কার্যকারণের সাদৃশ্যকে কোন-ভাবেই তাদের কার্য্যকারণত্বের কারণ মনে. করা চলে না। সাদৃশ্য কার্যকারণত্বের কারণ হলে সমস্ত সদৃশবস্তুর মধ্যেই কার্যকারণ সম্পর্ক থাকত, কিন্তু একথা কেবল-মাত্র বাস্তববিরোধীই নয় কল্পনারও অতীত। বস্তুত কারণের মাধ্যমে কার্য-কারণত্বের ব্যাখ্যা বোধ করি অসম্ভব। সকারণ ব্যাখ্যার দিক থেকে কার্যকারণের ঐক্যসম্পর্ক বোধ করি একটি চরম সম্পর্ক। কিন্তু সকারণ ব্যাখ্যার দিক থেকে চরম হলেও কার্যকারণের ঐক্য সম্পর্ককে অবরোহ ব্যাখ্যার দিক থেকেও চরম মনে করা ঠিক নয়। কারণ, তাতে কার্যকারণের ঐক্যসম্পর্ক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অতীত একটি দুর্বোধ্য রহস্যে রূপান্তরিত হয়ে দাঁড়াবে। সহজ কথায় কার্যকারণের এই ঐক্যসম্পর্কের কোন কারণ নির্দেশ সম্ভব না হলেও তার ব্যাখ্যার জন্য কোন একটি ভিত্তি বা আশ্রয়ের নির্দেশ করতেই হবে। ভাষান্তরে বলা চলে কার্যকারণের ঐক্যসম্পর্ককে বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য প্রমাণ করা প্রয়োজন যে কার্যকারণের ঐক্যসম্পর্ক একটা বৃহত্তর ও বিস্তৃততর ঐক্যের মধ্যে আশ্রিত।

৫. লেখকের 'Is the Unity of a Class Ultimate or Derivative' প্রবন্ধ, Journal of the Philosopical Association, জানুয়ারী—এপ্রিল, ১৯৫৭।

কিন্তু কোথায় সন্ধান পাওয়া যাবে এই বৃহত্তর ও বিস্তৃততর ঐক্যের ? সন্ধানের জন্যঐক্যসম্পর্কের যে বিভিন্ন রূপ আছে তাদের স্বরূপ সমীক্ষণের প্রয়োজন।* আত্মিক ঐক্য বা সামাজিক ঐক্যজাতীয় ঐক্যসম্পর্কের কথা বলা হয়। কিন্তু বলাবাহুল্য, তাদের আলোচনা কার্যকারণ সম্পর্ক প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ অবান্তর। একই বস্তুর গুণের মধ্যে অথবা বিভিন্ন জড়বস্তুর মধ্যে অথবা একই মনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যে ঐক্য তাও আমাদের উদ্দিষ্ট ঐক্য পদবাচ্য নয়। কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবার যথোপযুক্ত বিস্তার এদের কারও নেই। কার্যকারণের সম্পর্ক কেবলমাত্র জড়বস্তু বা বস্তুর গুণ বা মানসিক অবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আবার জীবদেহ বা যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সংহতি অথবা রাসায়নিক যৌগিকের মধ্যে উপাদানসমূহের যে ঐক্য কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে তা আরও অনুপযুক্ত। এই সব ঐক্যই জড়বস্তুর ঐক্যের বিভিন্নরূপ। সুতরাং কার্য-কারণ সম্পর্ককে আশ্রয় দেবার বিস্তার এদের কারও নেই। তাছাড়া এই সব ঐক্যের ভিত্তিতে কার্যকারণ সম্পর্কের সর্বপ্রকার ব্যাখাই অবৈধ। কারণ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য এই সব ঐক্যের প্রত্যেকটি কার্যকারণ-সম্পর্ক-নির্ভর। জীবদেহ, যন্ত্র বা রাসায়নিক যৌগিক প্রত্যেকেরই অংশ বা উপাদানের মধ্যে কিছুটা অন্তত কার্য-কারণের বন্ধন রয়েছে। এসব ঐক্যের কোনটাই তাহলে কার্যকারণ সম্পর্ক থেকে চরমতর নয়। সুতরাং এদের কারও ভিত্তিতেই কার্যকারণ-ঐক্যসম্পর্কের অবরোহ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

যতপ্রকার ঐক্যের কথা আমরা জানি তার মধ্যে একমাত্র বর্গীয় ঐক্যই (ইংরাজীতে যাকে বলে unity of the class) আমাদের মতে আমাদের উদ্দিষ্ট ঐক্যের লক্ষণ-সমৃদ্ধ। কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবার মত যথোপ-যুক্ত বিস্তার এই বর্গীয় ঐক্যের আছে। তাছাড়া কার্যকারণের ধারণা বা দৃষ্টান্তের সঙ্গেও বর্গীয় ঐক্যের কোন অসংগতি নেই। কিন্তু একথার সমর্থনে যুক্তি অবতারণার পূর্বে বর্গীয় ঐক্যের ধারণার সুস্পষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা করা কর্তব্য।

আমাদের মতে কারণের মাধ্যমে বর্গীয় ঐক্যের কোন প্রকার সংজ্ঞা সম্ভব নয়। এমন কি কারণাত্মক ভাষায় তার বর্ণনাও অসমীচীন। মিল ও জনসন এই বর্গীয় ঐক্যকে এমন বস্তু বা ব্যক্তির ঐক্য বলেছেন যাদের ব্যাপ্ত্যর্থ জাত্যর্থ নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু মিল-জনসনের এই সংজ্ঞা বা বর্ণনা স্বীকার করায় আমাদের বাধা আছে।

*বর্গীয় ঐক্যের শ্রেণীবিভাগে আমরা Mackenzie-র Elements of Constructive Philosophy থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

কেন না, মিল-জনসনীয় বর্ণনার মধ্যে বর্গীয় ঐক্য একটি আরব্ধ ঐক্য এমন একটি কথা অনুস্যূত রয়েছে। কিন্তু ষ্টাউটের[৭] চিন্তাধারার অনুসরণে আমরা প্রবন্ধান্তরে[৮] বিস্তৃতভাবে প্রমাণের চেষ্টা করেছি যে বর্গীয় ঐক্য আরব্ধ ঐক্য নয়,—চরম ঐক্য। সাধারণ পদনির্দেশিত ব্যক্তি বা বস্তুর ঐক্যই বর্গীয় ঐক্য—কারণ বা কারণাত্মক ভাষা পরিহার করে বর্গীয় ঐক্যের স্বরূপ সম্বন্ধে এইটুকুই বর্তমানে বলা চলতে পারে।

এখন, কার্যকারণ সমবর্গভুক্ত এবং তাদের সংহতি বর্গীয় সংহতিরই রূপ-বিশেষ, স্ববিরোধী বা বাস্তববিরোধী না হলে এই ধারণার সত্যতা অবশ্য গ্রহণীয়। কারণ, তাছাড়া কার্যকারণ সংহতি সমস্ত ব্যাখ্যার অতীত একটি রহস্য হয়ে দাঁড়ায়। বর্গীয় সংহতিভুক্ত হবার সঙ্গে কার্যকারণ সম্পর্কের কোন বিরোধই নেই। একটি ক্ষেত্রের চতুষ্কোণত্বের সঙ্গে তার যুগপৎ বৃত্তাকারত্বের স্ববিরোধ আছে। কিন্তু এ জাতীয় কোন স্ববিরোধই দুটি জিনিসের কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ হবার এবং সমবর্গভুক্ত হবার মধ্যে নেই। এখন প্রশ্ন: কার্যকারণ যে সমবর্গভুক্ত এ বিশ্বাস কি বাস্তবেও অবাধিত? অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিজাতীয় বস্তুর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্কের কি এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে যা এই বিশ্বাসের বিরোধী? আমরা জানি মিথঃক্রিয়া প্রকল্পে বিশ্বাসী দেহমানসিক দ্বৈতবাদীরা দেহ ও মনের মধ্যে এই জাতীয় কার্যকারণ সম্পর্কের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবেন।

কিন্তু এই দৃষ্টান্তের উল্লেখে কার্যকারণের সমবর্গভুক্তির সিদ্ধান্ত আমাদের মতে বাধিত হয় না; বাধিত হয় বরং দেহমানসিক দ্বৈতবাদেরই সত্যতা। দেহ ও মনের দ্বৈতবাদ 'আকাশ নীল' বা 'আগুনের দাহিকা শক্তি আছে' এই জাতীয় কোন সুনিশ্চিত সত্য নয়। 'কোন জিনিস যা তাই' এই জাতীয় কথার স্বতঃপ্রামাণ্য সত্যতাও এই দ্বৈতবাদে নেই। দর্শনের ইতিহাসে দ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত একটি বহু বিতর্কিত কল্পনামাত্র, এবং এই কল্পনার সত্যতাও সম্পূর্ণভাবে প্রমাণাপেক্ষী। সুতরাং কোন বাস্তব ঘটনার ব্যাখ্যায় অপরিহার্য ও উপযুক্ত কোন প্রকল্পনার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে দেহমনের দ্বৈতবাদী কল্পনা নিতান্তই দুর্বল। বস্তুত বাস্তব ঘটনার (যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে কার্যকারণ সম্পর্ক) ব্যাখ্যাবিরোধী হওয়া দেহ ও মনের

৭. **Studies in Philosophy and Psychology.**

৮. লেখকের **'Is the Unity of a Class Ultimate or Derivative'** প্রবন্ধ, **Journal of the Philosophical Association**, জানুয়ারী—এপ্রিল, ১৯৫৭।

দ্বৈতবাদেরই অসত্যতার অন্যতম প্রমাণ। তাছাড়া কার্যকারণের সমবর্গভুক্তি দেহ ও মনের দ্বৈতবাদবিরোধী—এই যুক্তির মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন চক্রকতা আছে। কারণ এই যুক্তির সাহায্যে কার্যকারণের সমবর্গভুক্তির খণ্ডন কোন সিদ্ধান্তের বিরোধী যুক্তিকে সেই সিদ্ধান্তেরই সাহায্যে খণ্ডন করার মত। কারণ কার্যকারণের এই সমবর্গভুক্ততা, একটু পরেই আমরা দেখতে পাব, তাদের অবশ্যিক সাদৃশ্যের ভিত্তি এবং কার্যকারণের আবশ্যিক সাদৃশ্যের সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হলে দেহমানসিক দ্বৈতবাদকে একটি অনতিক্রম্য দ্বিমুখী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যাটি হচ্ছে: দেহমানসিক পরম্পরানুগামিতার ব্যাখ্যা হিসেবে দ্বৈতবাদীরা যদি মিথঃক্রিয়ার প্রকল্পকে আশ্রয় করেন তবে (কার্যকারণের সাদৃশ্য সিদ্ধান্ত সত্য হলে) অসংগতির মধ্যে দ্বৈতবাদের সত্যতার সর্বনাশ হয়; আর যদি এই সর্বনাশকে পরিহার করবার জন্য তাঁরা মিথঃক্রিয়ার প্রকল্পকে পরিহার করেন তবে পরম্পরানুগামিতার ব্যাখ্যায় তাঁদের অসামর্থ্য ও ব্যর্থতা স্বীকার করে নিতে হয়।

কার্যকারণের ঐক্যকে অর্থপূর্ণ হতে হলে কার্য ও কারণকে তাহলে আবশ্যিক ভাবে সমবর্গভুক্ত হওয়া দরকার। এখন কার্যকারণের এই সমবর্গীয়তার মধ্যেই আছে তাদের সাদৃশ্যের প্রমাণ। কার্যকারণের সাদৃশ্যকে তাদের এই সমবর্গীয়তা থেকেই সমবর্গীয়তার ফল বা ভিত্তি হিসেবে অনুমান করা চলতে পারে। আমাদের মত যাঁরা বর্গীয় ঐক্যের চরমতায় বিশ্বাসী এবং তদনুযায়ী দুটি জিনিষের সাদৃশ্যের অর্থ যাঁদের মতে নিছকমাত্র তাদের সমবর্গীয়তা ছাড়া আর কিছুই নয়, কার্যকারণের সাদৃশ্যপ্রমাণে তাঁরা প্রথম পথ অবলম্বন করবেন। আর যাঁরা চিরাচরিত ধারণা অনুসরণ করে বর্গীয় ঐক্যকে সাদৃশ্যভিত্তিক মনে করেন কার্যকারণের সাদৃশ্য প্রমাণে তাঁরা গ্রহণ করবেন দ্বিতীয় পথ। তাহলে প্রমাণিত হল যে কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ যে কোন দুটি জিনিসই পরস্পর সদৃশ, অথবা ভাষান্তরে সদৃশ বস্তুর মধ্যেই কার্যকারণ সম্পর্ক সম্ভব। এই সাদৃশ্য সম্বন্ধে আমরা সবক্ষেত্রে সচেতন না থাকতে পারি। কিন্তু তার দ্বারা সাদৃশ্যের অনুপস্থিতি প্রমাণিত হয় না, প্রমাণিত হয় এইটুকুই যে সাদৃশ্য আবিষ্কার সাপেক্ষ।

দর্শনের সপক্ষে

জয়দেব চক্রবর্তী

সভ্যতার যখন সঙ্কটাবস্থা, বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক অভ্যুদয় যখন স্বৈরাচারী একনায়কত্বের প্রবল প্রতাপে পর্যুদস্ত, মনুষ্যত্ব যখন লাঞ্ছিত তখন 'তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল' দার্শনিকের এই কূট জিজ্ঞাসাকে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক নয়। এবং সেই বিচারেই তাঁর কল্প রাষ্ট্র (Republic) থেকে মহাকবি প্লেটো যেমন কবিদের বিতারিত করেছেন, দর্শেনিকরাও তেমনি, আধুনিক গণমানসের শ্রদ্ধার নিরিখে সমাজ থেকে ক্রমশঃ বহিষ্কৃত হতে চলেছেন। শাশ্বত অস্তিত্বের নিরপেক্ষ দর্শক (Spectator of all time and existence) দার্শনিক অলস বিচার মগ্ন বলে প্রায়শঃ উপহসিত, এবং ঐতিহ্যগত চিন্তাধারায় দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই।

দর্শনের উৎপত্তির হেতু নির্দ্ধারণ করেছেন শাস্ত্রকার :—

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ,

মত্বা চ সততং ধ্যেয়ঃ—এতে দর্শনহেতবঃ।

শ্রুতিবাক্যের সশ্রদ্ধ শ্রবণ, বিশ্লেষণাত্মক বিচারে তার মনন এবং সেই বিচারের সতত নিদিধ্যাসন হতেই নাকি দর্শনের উদ্ভব। আর, শ্রুতিতে যেহেতু অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর, সেই শ্রুতিবাক্যের নিরন্তর মননে যে দর্শন প্রসূত সে দর্শন স্পষ্টতঃ লৌকিক জীবনবিমুখী। ইহলৌকিক প্রতিকূল পরিবেশে আপন অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অহর্নিশ যে সংগ্রামে লিপ্ত আছি দর্শনে তার কোন সহায়তা পাই না। দর্শনের চিন্তা পারত্রিক ও আধ্যাত্মিক।

ভিটগেনষ্টিন (Wittgensten) প্রমুখ দার্শনিকের মাধ্যমে দর্শনের ক্ষেত্রে অধুনাতন কালে লজিক্যাল পজিটিভিজ্‌ম্ নামধেয় যে এক অভিনব আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে, সেখানে আবার দর্শন ভিন্নতর সংজ্ঞায় অভিহিত। জগৎ এবং জীবনের সামগ্রিক যে রূপ কল্পনা দর্শনের চিরন্তন অভীপ্সা এঁরা তাকে অলীক ও অর্থহীন non-sensical বিবেচনা করেন। দর্শন সম্পর্কে এঁদের সুচিন্তিত অভিমত

এই যে, বিজ্ঞানে ব্যবহৃত শব্দ এবং প্রত্যয়সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণই তার প্রধান কর্ত্তব্য (Philosophy is the Critique of Language). এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, দর্শন নিতান্তই যদি ভাষার বিশ্লেষণ হয়, দার্শনিক যদি বিজ্ঞানভাষিত শব্দ এবং প্রত্যয়সমূহের সুষ্ঠু অনুধাবনেই সমুৎসুক হন, দার্শনিক আর বৈয়াকরণের কর্ত্তব্যে তবে প্রভেদ থাকে কিসে ? দর্শন তো তাহলে ব্যাকরণেরই নামান্তর।

স্থূলকথা এই যে, দর্শন অপ্রয়োজনের আলোচনায় বিভোর। দারিদ্র্যাঙ্কিত, দুশ্চিন্তাজর্জর প্রাত্যহিক কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না দর্শন চর্চায়; দর্শন জীবন-সংক্রান্ত নয়, জীবন-অতিরিক্ত। ফিলজফি শব্দটিতেও সেই নিছক জ্ঞানপ্রীতির ইঙ্গিত (philos অর্থে প্রেম, sophia—জ্ঞান), অপ্রয়োজন আনন্দের হলকর্ষণ।

চিরাচরিত তত্ত্ববিদ্যার বিরুদ্ধে তাহলে অভিযোগ এই যে, এর কোনও ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই। বিশ্বের চরম দুরবস্থাতেও পদার্থবিদের অণু সম্বন্ধীয় গবেষণাকে স্বাগত জানানো যেতে পারে। কেন না, তাঁর আণবিক-চিন্তা হয়ত প্রকৃতির ওপর বৃহত্তর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। অতএব, প্রত্যক্ষে যদিও তেমন লক্ষ্যণীয় কোন কর্মে ক্রিয়াশীল নন পদার্থবিদ্, তবু তাঁর গবেষণা নিতান্ত অলসচিন্তা নয়। প্রয়োজনবোধে পদার্থবিদের আবিষ্কৃত সত্যকে যুদ্ধকর্মে কিংবা শান্তিকর্মে নিয়োজিত করা যেতে পারে। কিন্তু আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক চিন্তার যতই করি অনুশীলন, প্রকৃতির ওপর তার কোন প্রভাব নেই, তত্ত্ববিদ্যার কোন কার্যকারিতা নেই। তাই আজ যখন সমাজের চতুর্দিকে প্রচণ্ড এক কর্মোন্মাদনা, নিষ্কর্মা দার্শনিক তখন সমাজের সর্বস্তরে নিতান্তই উপেক্ষিত। এমন কি, যুগোচিত কর্তব্য সম্পর্কে দার্শনিককে অবহিত করে দিয়েছেন সাম্যবাদী চিন্তার জনক মার্ক্স‌ও, বলেছেন—জগৎ এবং জীবনের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাদানে লিপ্ত ছিলেন এতকালের দার্শনিক। এ যুগে দার্শনিকের দায়িত্ব অনেক; জগতের স্বরূপ নির্ণয় নয়, তার সংস্কার-সাধন করতে হবে তাঁকে। (not to interpret, but to change this world

এখন, যুক্তিসিদ্ধ হয় যদি দর্শনের বিরুদ্ধে আনীত উপর্যুক্ত অভিযোগ, দর্শনচর্চা নিঃসন্দেহে অর্থহীন, দার্শনিক সমাজের আত্যন্তিক বিনাশ তাহলে একান্তই কাম্য। অন্যথায় কিন্তু উদরসর্বস্ব, অর্থপিশাচ এই 'সভ্য' সমাজেরও সামান্য একটু অনুকূল-স্নেহ দার্শনিকেরও সঙ্গত দাবী।

প্রারম্ভেই স্মরণে রাখা ভালো, দর্শনের একটা বিশিষ্টতা আছে। অন্য সকল বিদ্যায় জ্ঞানান্বেষণ আর প্রয়োগবিধিতে (theory and practice) প্রভেদ অনেক—

কোথাও বা দুটিতে তেমন অনিবার্য্য কোন সম্বন্ধই নেই। সার্থক যিনি চিত্রশিল্পী শিল্পতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে তিনি হতেও পারেন অনবহিত, লরেল কিংবা হার্ডি কোন কৌতুকশিল্পী বের্গসঁর পরিহাসতত্ত্বে (theory of longhter) নাও হতে পারেন বিচক্ষণ এবং কীন্‌সের অর্থতত্ত্বের সামান্যতম বোধ ব্যতিরেকেও নিরক্ষর কোন শেঠজীর প্রচুর অর্থাগম হতে পারে। কিন্তু দর্শনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি অন্যরূপ—দর্শনের অনুধ্যান দর্শনেরই অংশ, দার্শনিক বিলাসচিন্তায় মগ্ন কি না এ প্রশ্নও দার্শনিক প্রশ্ন।

এখন, সত্য বটে, দর্শন আমাদের অন্ন-বস্ত্রের অভাব মোচন করে না, দুরারোগ্য ব্যাধির উপশম করে না। তবুও কিন্তু দর্শনের স্বপক্ষে কিছু বক্তব্য থাকে। প্রথমতঃ দর্শনেরও কার্যকারিতা আছে; দ্বিতীয়তঃ, সাম্প্রতিককালে কার্যকারিতার মানদণ্ডে প্রতিটি বস্তুর মূল্যনির্ণয় সম্পর্কে যে লোকায়তবিধান প্রচলিত সেই মানদণ্ডটাই সর্ববাদী-সম্মত নয়

দর্শনের অনুশীলন স্বচ্ছন্দচিন্তার কর্ষণে ও পরমতসহিষ্ণুতার মাধ্যমে চিত্তের যে সমুন্নতি বিধান করে তাকে অস্বীকার করেও বলা যায় চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করে, লোকায়ত সংস্কারকে তিরস্কার করে, অতিপরিচিত সামান্যবস্তুকে অসামান্য অপরিচিতির স্তরে উন্নীত করে দর্শন জগৎ-সম্পর্কে ক্লান্তিকর এক গতানুগতিকতার বোধ মোচন করে এবং এক সশ্রদ্ধ বিস্ময় উৎপাদন করে। সম্মুখস্থ সমকোণী চতুষ্পদ টেবিলটি এবং টেবিলের উপরিস্থ ছবিটির যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের কোন সংশয় উদ্রিক্ত হয় না বটে, কিন্তু সহজ দৃষ্টিতে টেবিলটি নানারূপে প্রতিভাত হয়। টেবিলটি বাস্তবিকই যদি সমকোণী হয়, তবে যে দিক থেকেই দেখা যাক না কেন, বোধ হবে, টেবিলের দুটি হল সূক্ষ্মকোণ, আর দুটি যেন স্থূল (রাসেল)। রেলপথের দুটি দিক যদিও যথার্থই সমান্তরাল, তবু প্রতিভাত হয় দূর কোন বিন্দুতে যেন দুটি দিক সম্মিলিত হয়েছে। প্রাতিভাসিক এই সব রূপে আমরা বিভ্রান্ত হই না তার কারণ, আশৈশব-লব্ধ শিক্ষানুকূল্যে এগুলিকে মিথ্যা-দৃষ্টি বিবেচনা করতে আমরা অভ্যস্ত। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাহলে টেবিলের বা রেলপথের যে রূপ প্রতিভাত হলো তা তার যথার্থ প্রকৃতি নয়, বিকৃতি; স্বরূপ নয় বিরূপ (not reality but appearance)। তাই স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা এতই যদি অবিশ্বাস্য টেবিলের তাহলে যথার্থ স্বরূপ কি? উত্তরে বিজ্ঞানী বলবেন, প্রান্ত গতিতে প্রবহমান বৈদ্যুতিক শক্তির সমাবেশ হলো টেবিল; দার্শনিক হয়ত বলবেন, টেবিল-বস্তুটি বিধিচিত্তের একটি ভাব (বার্কলে), বা কোন

অস্থিকগোষ্ঠী (লেব্‌নিজ), কিংবা বর্ণ, কাঠিন্য ইত্যাদি গুণ-অতিরিক্ত টেবিলের বুঝি স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বই নেই। এমনি করে, টেবিলের প্রাতিভাসিক সত্তায় সংশয় পোষণ করে, টেবিল সম্পর্কে বহুসম্ভাবনার সূত্র আবিষ্কার করে দার্শনিক প্রমাণ করলেন সামান্য বস্তু টেবিল-সম্পর্কেও অনেক আছে আমাদের অজ্ঞাত, ছবিটাও নহে শুধু ছবি। অতএব, দার্শনিকের বিচারে উপেক্ষিত ক্ষুদ্র বস্তুটাও ক্ষুদ্র রইল না আর, নানারূপে অপরূপ হলো ক্ষুদ্রের মধ্যেও আবিষ্কৃত হলো অনন্ত বিস্ময় আর তারই ফলে গতানুগতিকতার ক্লান্তিকর বোধ হতে অব্যাহতি পাওয়া গেল। তবু কি শুনতে হবে, দার্শনিক নিতান্তই নিষ্ক্রিয় ?

তা ছাড়াও, দেশে দেশে কালে কালে যে-সব সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে, তারও কি পশ্চাতে নেই বিশেষ বিশেষ দার্শনিক প্রত্যয় ? চিন্তা কি করা যায় ফরাসী বিপ্লবের অগ্ন্যুৎপাত রুশোর দার্শনিকঅবদান ব্যতিরেকে ? গান্ধী-বিনোবার সর্বোদয় সমাজ-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কি বেদান্তের পরম ঐক্যবোধ ও বৌদ্ধ দর্শনের সর্বভূতহিতের আদর্শ হতেই উদ্ভূত নয় ? সাম্যবাদী যে সামাজিক আন্দোলন দিকে দিগন্তে আজ বিস্তৃত তাও কি হেগেলীয় দর্শনের ডায়ালেক্‌টিক এবং ফয়ারব্যাকের জড়বাদের সংমিশ্রণ নয় ? এমনি করে, যার মাধ্যমে সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব হয়, মানুষের প্রাত্যহিক আচরণে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায় তাকে বলি কি করে নিতান্তই অলস এবং অলীক কল্পনা ? তবে, স্বীকার করা ভালো, অন্নবস্ত্রসংস্থানের মতো কার্য্যকর হয় না দর্শন, দর্শনের কার্য্যকারিতা কিঞ্চিৎ পরোক্ষ।

কিন্তু প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম্ আন্দোলনে যদিও অনেক খ্যাতিমান বিচক্ষণ পণ্ডিত আস্থাবান তবু কার্য্যকারিতা বা প্রয়োজন সিদ্ধির মানদণ্ডেই বা কেন বিচার করব দর্শনের মূল্য ? সাধারণতঃ যে বস্তু আমাদের প্রয়োজন মেটায় সেই বস্তুর প্রাপ্তিতে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যসুখ, অপ্রাপ্তিতে দারিদ্র্য-যন্ত্রণা। আর সুখ-দুঃখ যেহেতু অনুভূতির ব্যাপার প্রয়োজনীয় বস্তুটির মুখ্য আবেদন আমাদের অনুভূতির পর্য্যায়ে কিন্তু কেবল মাত্র অনুভূতিটাই তো মনুষ্যত্বের সারসত্য নয়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিটাও অনস্বীকার্য্য। ভালোলাগা, মন্দলাগা ব্যতিরেকেও মানুষের আর একটা দিক আছে—সে বিচার করে, বিশ্লেষণ করে। (অর্থাৎ, মানুষ শুধু sentient নয়, rationalও বটে।) আর এইখানেই প্র্যাগম্যাটিষ্ট্‌দের ত্রুটি—প্রয়োজনসিদ্ধির মানদণ্ডে যাবতীয় বস্তুর মূল্যনির্ণয় করতে গিয়ে মানুষের বুদ্ধির গৌরবকে তাঁরা অস্বীকার করেন, প্রমাণ করেন যে তাঁরা একদেশদর্শী।

দর্শনের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ, দর্শনে বিজ্ঞানসম্মত যথার্থ জ্ঞানের (accurate and definite knowledge) একান্ত অভাব। দর্শনে সঠিক কোন নিশ্চয়তা পাই না; অসম্ভবকে সম্ভব করেছে যে বিজ্ঞান সেই বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি অনুসৃত হয় না—বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের তাই অহিনকুল সম্পর্ক।

এ অভিযোগ স্পষ্টতঃ বিজ্ঞান বা দর্শনের অস্বচ্ছ ধারণাপ্রসূত। স্মরণীয় যে, উভয়ের আলোচ্য বিষয়েই কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে। বস্তুর ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা এবং তার বিচার নিয়েই বৈজ্ঞানিক গবেষণা আর দর্শন ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাতেই সম্পূর্ণ নয়. আমাদের মানসরাজ্যের ন্যায়-অন্যায়ের নৈতিকবোধ, আদর্শ-আকাঙ্ক্ষার সুতীব্র অনুভূতি এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এমন কি বিশ্বের অতীত কোন বিশ্বেশ্বরের বাস্তব অস্তিত্ব যদি বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় তারও সঙ্গে মানবজীবনের সম্ভাব্য সম্পর্ক, ইত্যাদি দর্শনের বিচার্য্য বিষয়। বিষয়বস্তুর এই অস্বাভাবিক বিশালতা দর্শনের লক্ষ্যস্থল বলেই দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনধারিত এবং অনিশ্চিত।

আর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তও কি সর্ব্বদাই সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত? বিজ্ঞানী বলেন, বিভিন্ন বর্ণাভাস বিভিন্ন বিদ্যুত্তরঙ্গ প্রকম্পনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (Different shades of colour are associated with vibration of different electro-magnetic waves) কিন্তু বিবিধ বর্ণ এবং বর্ণের বহুবিধ আভাসের যথাযথ নির্ভুল পরিমাপ বিজ্ঞানও কি অসম্ভব মনে করে না? আমাদের আরও একটা প্রচলিত ধারণা, সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের যোগ আছে, বৈজ্ঞানিক-সিদ্ধান্ত অনায়াস-বোধ্য আর দার্শনিক সিদ্ধান্ত নিতান্তই রহস্যময়, দর্শনেই যত দুর্বোধ্য চিন্তার আড়ম্বর। তর্কের প্রয়োজনে যদি স্বীকারও করি যে, দর্শন নিতান্তই দুর্বোধ্য—বিজ্ঞানে বোধই বা সহজ কিসে? উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাভাবিক বোধে পাই বস্তুর তিনটি আয়তন (dimension) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর উচ্চতা। আইনষ্টাইন বললেন, বস্তুর চতুর্থ আয়তন আছে (fourth dimension)—তা কাল (time); কেন না, কোন বিশেষ কালের সঙ্গে সংযুক্ত না করে বস্তুর বোধই সম্ভব নয়। এও না হয় বোঝা যায়, কিন্তু শুনতে পাই, বৈজ্ঞানিকদের কঠোর গবেষণায় নাকি বস্তুর অনন্ত আয়তনের (x dimension) সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু এই x dimension বা অনন্ত আয়তনের বোধ কি অনায়াসলভ্য? সহজ কল্পনায় কি পাওয়া যায় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা ব্যতিরেকেও আরও সহস্র আয়তনের অস্তিত্ব?

বস্তুতঃ, গত কয়েক শতাব্দীতে অভূতপূর্ব্ব-সাফল্য লাভ করেছে বলে বিজ্ঞান দৈবীশক্তির দুর্লভ মর্য্যাদা পাচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি যথার্থজ্ঞানের অবিসংবাদী,

অভ্রান্ত মাধ্যম বলে পরিগণিত হচ্ছে। তাই সাহিত্যসমালোচনা থেকে শুরু করে আধ্যাত্মতত্ত্বালোচনাতেও সবাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কৌলীন্য-লাভের অভিলাষ পোষণ করছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সর্বত্র অনুপ্রবেশ আদৌ সম্ভব কিনা এই সরল প্রশ্নটিই অনালোচিত থেকে যাচ্ছে। স্বীকার করতেই হবে যে, আলেকজাণ্ডার প্রমুখ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক দর্শনের যতই সংজ্ঞা দিন, ইন্দ্রিয়বোধে অতীন্দ্রিয়ের বিচার (empirical study of the non-empirical) দর্শনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা বিশেষ সার্থক নয়। কেননা, বিজ্ঞান আলোচনা করে বাস্তব ঘটনা, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বস্তুর স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। আর ঘটনাকেই একমাত্র সত্য না মেনে ঔচিত্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবের বিচার দর্শনের গুরুদায়িত্ব। কোন আসামী অপরাধ যা করে সেগুলো ঘটনা (fact)। সে অপরাধের প্রবর্ত্তনা কি, পরিপার্শ্ব কি তা নিয়ে রচিত হয় অপরাধবিজ্ঞান, কিন্তু আসামীর পক্ষে মৃত্যুদণ্ডাদেশ বিধেয় কিনা তা বিজ্ঞান নয় দর্শনের আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞান বিবৃত করে ঘটনা, দর্শনে সেই ঘটনার মূল্যায়ন। ঘটনা সম্পর্কে সবাই ঐক্যমত্য পোষণ করতে বাধ্য, ঘটনার অভিমতে অনৈক্য হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতএব বাস্তববোধ নয় ঔচিত্যবোধই যেহেতু দর্শনের প্রাণকেন্দ্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দর্শনের ক্ষেত্রে তাই অপ্রযোজ্য।

দর্শনে বিজ্ঞানসুলভ যথার্থজ্ঞানের অভাব তাহলে তার অগৌরব নয়, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গৃহীত হয় নি বলেই দর্শন অকুলীন নয়। কিন্তু সেজন্য বিজ্ঞান ও দর্শনে বিষম বৈপরীত্যও নেই; দর্শন বরং বিজ্ঞানেরই পরিপূরক। বিজ্ঞানের পরিধিতে যার আলোচনা অপ্রশস্ত অথচ যার জ্ঞান বিজ্ঞানবোধে বিশেষ সহায়ক, দর্শনে তারই বিস্তৃত আলোচনা। উদাহরণস্বরূপ, জড়বিজ্ঞান জড়ের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করেছে—যে 'দ্রব্য' বাহ্যজগৎকে সংরচন করে (the substance of which the physical universe is composed.)। কিন্তু এই 'দ্রব্য' বস্তুটা বিজ্ঞানে অনালোচিত, আর দ্রব্যের যথার্থবোধ না হলে জড়ের সংজ্ঞাটাই দুর্ব্বোধ্য থাকে। অতএব, দর্শন সেই দ্রব্যের আলোচনা করে। আসল কথা, দর্শন যেন সেই হতভাগ্য গৃহস্থ যার সন্তান-সন্ততি কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠা পেয়েই পৃথগান্ন হয়। অধুনা যে বিদ্যাসমূহ স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের স্থায়ী মর্যাদা লাভ করেছে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্তও সবাই তো তারা দর্শনেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। (প্রাচীন গ্রীকদর্শনে ডেমোক্রিটাস ও ভারতবর্ষের ঋষি কণাদের পরমাণুচিন্তা দার্শনিক প্রয়াস না বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাভিলাষ ?) তারপর কালক্রমে, বিষয়বস্তুকে গণ্ডীবদ্ধ করে, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে দর্শনের সন্তান

বিজ্ঞান হলো। তখন তার আত্মম্ভরিতার অন্ত নেই—সেই করেছে বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। বৃদ্ধ দর্শন কিন্তু তখনও বলে, ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশাল ও নির্ব্বিশেষের স্বরূপ উন্মোচিত হয় না। তাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সত্যের সঙ্গে নীতিবাদী ও অধ্যাত্মবাদী, কবি ও শিল্পীর অনুভূতিকে সংযুক্ত করে বিশ্বব্যাপারের সামগ্রিক রূপসন্ধান দার্শনিকের ঐকান্তিক সাধনা।

দর্শনে বস্তুচিন্তা নেই ; সমাগতকে নিয়ে পরিতৃপ্ত নয় দর্শন, অনাগতে অভি-লাষী—এ অভিযোগ সম্পর্কে বলতে বাধ্য হব যে, আদর্শ সমাজ-সংগঠন যার লক্ষ্য বর্ত্তমানকে নিয়ে পরিতুষ্ট থাকলে চলে না। তার, প্রগতি শব্দের মধ্যেই সে পায় গতির সংকেত। সমাগত বর্ত্তমানকে নিয়েই যদি সন্তোষবোধ করা যেত তাহলে পুরাতন-সমাজব্যবস্থার অচলায়তনটাই কণ্ঠরোধ করত, সম্ভব হতো না অগ্রগতি। বাস্তব ব্যাপার সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাহলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিত না মোহ-মুদ্গরের কবি-কণ্ঠে—

যাবৎ বিত্তম্ নিজকর্ম্মোপাত্তম
তেন বিনোদয় চিত্তম্।

অথবা, অগ্নিবর্ষণ করত না বিদ্রোহী-বীর মার্ক্সের লেখনী। অতএব, মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মই যদি হয় বর্ত্তমানকে উল্লঙ্ঘন তাহলে বর্ত্তমানের চতুস্প্রাচীরে নাই বা আবদ্ধ হলো দর্শন, ক্রান্তদর্শী বলে তবে কেনই বা উপহসিত হবেন দার্শনিক ?

তবু একথা সত্য যে, দর্শন সম্পর্কে যে লোকাপবাদ, সাম্প্রতিক সমাজের যে অনীহা ও ঔদাসীন্য তার জন্য দায়ী স্বয়ং দার্শনিকরাই দার্শনিকদের বিষয়-নির্ব্বাচন। এযাবৎ, দার্শনিকরা তত্ত্বদর্শনেই ('Speculative philosophy'—Broad) আত্ম-মগ্ন ছিলেন ; বিভিন্ন বিজ্ঞান, ধর্ম্ম এবং নীতিশাস্ত্রের সহায়তায় বিশ্ববীক্ষণে প্রয়াসী ছিলেন, কিন্তু উপলব্ধি করেন নি যে বিজ্ঞান এবং ধর্ম্মেও অনেক অর্থহীন, অমূলক শব্দ এবং প্রত্যয়ের প্রচলন হয়েছে ; তাঁদের অজ্ঞাতসারে তাই ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানের সেই অর্থহীন, অস্পষ্টতর সংক্রমণ ঘটেছে দর্শনেও। শব্দ এবং বাক্যের মাধ্যমেই যখন বিশ্বরূপদর্শন করতে হয় তখন শব্দ-বাক্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তো একান্ত প্রয়োজন। অতএব দর্শনের সাফল্য নির্ভর করছে বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের (Critical Philosophy—Broad) উপর। বর্ত্তমানে, তত্ত্বদর্শন অসার প্রতিপন্ন হ'য়েছে কেননা বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের পরমতসহিষ্ণুতা এযাবৎ দুর্লভ ছিল। দর্শনকে অর্থবহ হতে হলে তাত্ত্বিকতার পথে নয়, ভাষা-বিশ্লেষণের পথেই অগ্রসর হতে হবে। সর্বাগ্রে

শব্দের লৌহমল সংস্কার হোক, প্রত্যয়সমূহ শাণিত হোক, স্পষ্ট হোক তারপর তত্ত্ব দর্শনে অভিলাষী হবেন দার্শনিক।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, বিশেষ বিশেষ যুগে দর্শনে বিশেষ ধরণের মানবিক সমস্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে কিংবা মধ্য-যুগীয় ইউরোপীয় দর্শনে ধর্মচিন্তার (religion) প্রাধান্য। নব্যন্যায় ও কাণ্ট্ এবং তৎপরবর্তী দার্শনিক চিন্তা জ্ঞানতত্ত্বের (epistemology) নিপুণ বিশ্লেষণ; চাণক্য রুশো-গ্রীণে রাষ্ট্রচিন্তার (politics) উৎকর্ষ, কৌটিল্য বা মার্ক্স অর্থনীতিতে (economics) ঐকান্তিক অভিনিবেশ। বিশেষ যুগে বিশেষ সমস্যাই প্রকট হয়েছে। আজ বলিষ্ঠ সেই আশা পোষণ করতে ক্ষতি কি যে, বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের সহায়তায় অনাগতকালের তত্ত্বদর্শন মনস্তত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব, রাষ্ট্রচিন্তা ও অর্থনীতির, বিজ্ঞান ও ধর্মের শোভন সমন্বয় সাধন করে সার্থক ও সর্ব্বার্থসাধক হবে, জীবনের বহুবিধ সমস্যার এক-একটি দিগ্‌দর্শন নয় মানবজীবনের সামগ্রিক এক অর্থপূর্ণ ভাষ্য হবে ?

অদ্বৈতাচার্য

শ্রীসীতানাথ গোস্বামী

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক, ভারতীয় দর্শনের মর্মবিৎ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্দ্র নাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ ডি. লিট মহাশয় দেহত্যাগ করার ফলের সমগ্র দেশ যে পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার পূরণ কোন দিন হবে কিনা জানি না। বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান অনুসারে মানুষ মাত্রেরই যে এই শেষ পরিণতি তা বুঝতে কারও বাকি থাকে না সত্য কিন্তু অতি নিকট আত্মীয়ের সম্বন্ধে যখন এ কথা খাটে তখন বিধাতাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বোধ হয় কেউই ছাড়ে না। তাই প্রিয়জনের মৃত্যুর প্রসঙ্গটি মানুষের মনের চৌকাঠ থেকেই বিদায় নিয়ে থাকে। আমরাও তাই মহামহোপাধ্যায়ের একটি কথাকে কখনই মনে স্থান দিতে চাইতাম না। কতবার বলেছেন—দেখ, যা পার শিখে নাও, আমি কিন্তু পাকা ফলের মত টুস্ টুস্ করছি, যে-কোন মুহূর্তেই এই পাকা ফলটি পড়ে যেতে পারে। কথাটা শোনার পর তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছি। কিন্তু দুঃসহ বাস্তব একদিন এসেছে। খ্যাতনামা জ্যোতিষী বিজয়বাবুর কথায় ভরসা রেখেছিলাম, আশা করেছিলাম, আরও দু'টি বছর অন্ততঃ মহামহোপাধ্যায়কে পাব। কিন্তু দুর্দম যম ৭৮ বছরেই তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

সরস্বতীর যে বরপুত্রটিকে গত বছরের মে মাসের ৫ই তারিখে সমগ্র দেশ হারিয়েছে তাঁর পাণ্ডিত্যের, গভীরতার পরিমাপ করতে গেলে "গামিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্। প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ।" ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্, এ, পি এইচ, ডি মহোদয় তাঁর দেহাবসানের পর যে মন্তব্য করেছিলেন তাই বলছি —"মধুসূদন সরস্বতীর পর এ জাতীয় পণ্ডিত আর জন্মগ্রহণ করেন নি। আমরা মহামহোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যের পরিধি কত বিশাল ছিল তার পরিচয় বহুবার পেয়েছি। যে কোন বিষয় নিয়ে যে কেউ যখন গিয়েছে তারই উত্তর তৎক্ষণাৎ পেয়েছে। তাঁর উত্তরের মধ্যে সব সময়েই থাকৃত অনুভূতির প্রাণস্পর্শ। কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ—কোন্ শাস্ত্রেই বা তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল না। তাই তিনি ছিলেন আমাদের জীবন্ত Encyclopaedia

বাংলা প্রদেশের এমন কোন মধ্য বয়স্ক, কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত, পণ্ডিত দেখি না যিনি তাঁর কাছে জিজ্ঞাসু হয়ে যান নি। আর বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে তো একথা নিরপরাদ সত্য যে আজ বেদান্তের সকল মধ্য বয়স্ক অধ্যাপকই তাঁর ছাত্র। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কালে সেই দিনগুলি ও দৃশ্যাগুলির কথা চিন্তা কর্‌লেও রোমাঞ্চ হয় যে, ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোপীনাথ ভট্টাচার্য, ডাঃ সদানন্দ ভাদুড়ী, ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, ডাঃ সুধেন্দু কুমার দাশ ইত্যাদি মনীষীবৃন্দ তাঁর কাছে অদ্বৈতসিদ্ধি, বিবরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করছেন।

এই অগাধ পাণ্ডিত্যের আগার মহামহোপাধ্যায়ই আবার অতি সামান্য গ্রন্থ, যেমন বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা ইত্যাদি, অধ্যাপন কর্‌ছেন এম্, এ ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সহায়তার জন্য, তাও দেখেছি। সাগ্রহে তাদেরকে পড়াতে দেখে অনেকেই অবাক্ হতেন। অনেকেই দুঃখিত হয়েছেন তাঁর সময়ের এইরূপ অপচয় দেখে। ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনেকবার বলতে শুনেছি —"আজ আমাদের দেশ তাঁর পাণ্ডিত্য বুঝল না, অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা সম্পূর্ণ হ'ল না, বেদান্তসার পড়ানতেই তাঁর দিন অতিবাহিত হচ্ছে। দেশের দুর্ভাগ্য যে শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাট্‌না বাঁটা হচ্ছে!" কিন্তু তাঁর মনে কোন বিকার নেই। তিনি কাউকেই বিমুখ করেন না।

বহুশাস্ত্রদর্শী ও শাস্ত্ররহস্যবেত্তা হয়েও তিনি তাঁর শিক্ষার পথ বন্ধ ক'রে রাখেন নি। অতি সাহারণ ঘটনা থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ কর্‌তে হয় এ কথা বহুবার প্রকাশ করেছেন। এখানে দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। একবার হরিদ্বার গুরুকুলে অধ্যাপনা কালে একজন মেথরানী তাঁকে বলেছিল—পণ্ডিতজী, আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, সকলেই বল্‌ছে আবার বিয়ে কর্‌তে। আপনার কি মত?" তাতে মহামহোপাধ্যায় ভাবলেন যে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে তো বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছেই আর তা ছাড়া এই প্রৌঢ়ার পক্ষে স্বামিব্যতিরেকে জীবনযাপন হয়ত সম্ভবপর হবে না। তাই উত্তর দিলেন—"তা, দোষ কি?" তাতে সেই মেথরানী তেজস্বিতার সঙ্গে উত্তর দিল—"পণ্ডিতজী, আপনি এ কি বল্‌ছেন? যার কাছে এই হৃদয় সমর্পন করেছিলাম আজ আবার তাকে ছেড়ে অন্যের সঙ্গে মিলিত হব? আমার এই হৃদয়কে একমাত্র মৃত স্বামীই পেতে পারে, সংসারে আর কেউ নয়।" মহামহোপাধ্যায় এই ঘটনার উল্লেখ ক'রে আমাকে বলেছিলেন— "তখন বুঝলাম, এই ভারতবর্ষ বড় বিচিত্র! এর একজন মেথরানীও যে কি ভাবে চিন্তা করতে পারে তা আমার ধারণার অতীত। কতই শিক্ষনীয় রয়েছে!"

গুরুকুলেরই অপর একটি ঘটনা। একবার তাঁর কাজকর্ম ক'রে দেওয়ার জন্য একটি রাজপুতবংশীয় দ্বারবান্ ভৃত্যের নিয়োগ করা হয়েছিল। তাকে কোন একটি কাজ বল্‌লেই সে জুতা পর্‌ত এবং লাঠি হাতে নিত ও তারপর কাজটি কর্‌ত। এমন কি সামান্য দরজা বন্ধ কর্‌তে হলেও তার এই জুতো পরা ও লাঠি হাতে নেওয়া বাদ যেত না। একবার তাই বিরক্ত হয়ে মহামহোপাধ্যায় তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"তুমি সব সময়েই, এমন কি দরজা বন্ধ কর্‌তেও এত কর কেন? এখনই তো তোমাকে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না যে, জুতো পায়ে দিয়ে, লাঠি হাতে নিয়ে তৈরী হয়েই তারপর দরজা বন্ধ কর্‌তে হবে?" তাতে সেই দ্বারবান্‌টি উত্তর দিয়েছিল—"আপনি এ'কথা কেমন করে বলেন? আমি না রাজপুতবংশীয়? সর্বদা অস্ত্র নিয়ে তৈরী থাকাই আমার ধর্ম, তা কাজে আসুক্ অথবা নাই আসুক্। আপনি যে পৈতা পরে আছেন এটা কি আপনার সব সময়ে কাজে লাগে, পড়াবার সময়ে আপনার পৈতার তো কোন প্রয়োজন নেই, তাই বলে কি খুলে রেখে দিয়েছেন? সেই রকম আমারও ক্ষেত্রে"। মহামহোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন যে, সত্যই সেদিন ঐ দ্বারবানের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বেদ, উপনিষৎ, দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, উদ্ভট শ্লোক, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি থেকে তিনি এতই উদ্ধৃত ক'রে কথা বল্‌তেন যে, অবাক্ হয়ে ভাবতাম—কেমন ক'রে এত মুখস্থ থাকে? কতবার করেই বা এগুলো পড়েছেন? এত পড়েনই বা কি করে? তাই একবার সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—একটা বড় শ্লোক কতবার পড়্‌লে আপনার মুখস্থ হয়? তাতে বলেছিলেন- ২।৩ বার পড়াই যথেষ্ট!

কথা প্রসঙ্গে একবার বুঝলাম যে, গুরুভক্তি তার মনে কি নিদারুণ বল এনে দিয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের কথা মিলিয়ে নিলাম—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতাঃ কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।" আমাকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কি কি পড়াতে হয় এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি জানালাম এবং বললাম যে, একখানি বই আমার ভাল করে পড়া নেই, তাই কেমন করে পড়াব চিন্তা হচ্ছে। তাতে মহামহোপাধ্যায় আমাকে উৎসাহিত ক'রে বললেন—"তোমার বয়স অল্প, পড়ার উৎসাহ আছে, বুদ্ধি আছে, কোন বই পড়ানতে পশ্চাৎপদ হবে না। পড়া না থাকে পড়ে নিয়ে পড়াবে।" তাই নিজের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে বললেন—"আমি যখন গুরুকুলে ছিলাম তখন

আমার ওপর একখানা বই পড়ানর ভার পড়ল অথচ সে বই আমি আগে কোনদিন পড়িনি। আমি পিছিয়ে যাই নি, অত্যন্ত যত্ন সহকারে বইখানি পড়তাম আর যখনই কোন সমস্যার সমাধান আমার বুদ্ধির দ্বারা হত না তখনই অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে শাস্ত্রীজীর (মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণশাস্ত্রী) কথা চিন্তা করতাম আর তার পরেই উত্তরও পেয়ে যেতাম।" কথা প্রসঙ্গে তিনি যে রহস্য উদঘাটন ক'রে দিলেন তা আমার কাছে চিরদিন অমূল্য হয়ে থাক্‌বে।

এ ছাড়া, তাঁর "ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের সমন্বয়" নামক গ্রন্থের ভূমিকাটি যখন তিনি আমাকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন তখন তাঁর গুরু শাস্ত্রীজীর উল্লেখ কালে তাঁকে যেরূপ বিগলিত হৃদয় ও অশ্রু পরিপ্লুত দেখেছিলাম তা ভারতের প্রাচীন পন্থী শিষ্যদের মধ্যেই সম্ভব। যেখানে আধুনিক কালের ছাত্রেরা গুরুর দোষাবরণরূপ ছত্র ধারণের পরিবর্তে গুরুর দোষরূপ ছত্রকে সর্বদা উন্মীলিত কর্‌তে ব্যগ্র এবং তার দ্বারা গুরু অপেক্ষা নিজের পাণ্ডিত্য অধিক এ কথা প্রখ্যাপনের চিন্তায় মগ্ন, সেখানে এ রকম গুরুভক্তি সহজেই হৃদয়কে আকর্ষণ করে। তাই সে দৃশ্য আমার স্মৃতিপটকে চির উজ্জ্বল রাখবে।

ছাত্রই ছিল মহামহোপাধ্যায়ের জীবনের অর্জিত সম্পদ। এ কথা তিনি দু'একবার প্রকাশও করেছেন। তিনি বলেছেন—"দেখ, টাকা উপার্জনের দিকে লক্ষ্য করি নি, বাড়ী ঘর করিনি, চিরদিন ভাড়া বাড়ীতেই কাটালাম, আমার সম্বল এই কয়েকখানি বই আর তোমরা।" সত্যই তিনি যে বাড়ীখানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এবং জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করেছেন তার অসুবিধাগুলি চিন্তা কর্‌লে বোঝা যায় যে, তা বৃদ্ধের বাসযোগ্য গৃহ নয়। মা-ঠাকুরুন যে ভাবে সিড়িতে আহত হয়ে রক্তাপ্লুত অবস্থায় অচেতন ভাবে দু'তিনবার প'ড়ে ছিলেন সেই কথা চিন্তা করলেও বিভীষিকা হয়। কিন্তু তাতে বৈদান্তিক মহামহোপাধ্যায়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিরতি ঘটে নি।

অর্থের লোভ থেকে ছিলেন তিনি চিরমুক্ত। কারও দান পর্যন্ত তিনি গ্রহণ কর্‌তেন না। এ বিষয়ে একটা ঘটনা মনে পড়ে। একবার এক মাড়োয়ারীর বাড়ীতে কোন একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে পণ্ডিত সমাজকে অর্থাদির দ্বারা অভ্যর্থনা করা হয়। মহামহোপাধ্যায়ের উপস্থিতির জন্য সেই মাড়োয়ারীর বিশেষ আগ্রহ থাকায় তিনিও যান, কিন্তু প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করেন নি। তারপর সেই মাড়োয়ারী লোকচক্ষুর অন্তরালে মহামহোপাধ্যায়ের অপরিগ্রহ ব্রত ভঙ্গের উদ্দেশ্যে অধিকতর লোভনীয় দ্রব্য নিয়ে আসে তাঁর বাড়ীতে। মহামহোপাধ্যায় তার বুদ্ধির নিন্দা

করে বলে ছিলেন—আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছেন? আতে সে লজ্জা পায় ও ক্ষমা ভিক্ষা করে।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা যাতে অব্যাহত ভাবে চলতে পারে তার জন্য তিনি শুধু অর্থ কেন সকল প্রকার সুখ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই তিনি ছাত্রদের সুবিধা অনুসারে অধ্যাপনার সময় স্থির করতেন। ছাত্র-প্রীতির জন্য তিনি রাত ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্তও মীমাংসার দুরূহ গ্রন্থ অধ্যাপন করেছেন। এতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন, রক্তের চাপ বৃদ্ধি পেল এবং তা তাঁর আমৃত্যু সহচর হয়ে রইল।

শুধু রাত্রিতে কেন, ছাত্রদের জন্য তিনি অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করতেও প্রস্তুত। আমার মনে আছে যে ১৯৫৮-৫৯ সালের শীতেও তিনি ভোর ৫টায় শয্যাত্যাগ করতেন শুধু আমি পৌছানর আগে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য। আমি বার বার বলেছি—"আমি কি দেরী করে আসব"? তিনি উত্তর দিয়েছেন—ভোরের দিকে পড়া ভাল হয়। তখন না পড়ালে চল্‌বে কি করে? ওতে আমার কোন কষ্ট হয় না। তিন দিনে তিনি সমগ্র চণ্ডীপাঠ করতেন। তার মধ্যে তৃতীয় দিনের পাঠ্য অংশ ছিল বেশী এবং সেদিন তাঁকে আরও আগে উঠতে হত পাছে আমাকে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়।

ছাত্রদেরকে কোন নতুন কথা শোনাবার জন্য তিনি থাকতেন সর্বদা উদ্‌গ্রীব। তাই অনেক সময়ে বইয়ের মধ্যে কাগজ দিয়ে রাখতেন যাতে অনায়াসে সেই জায়গাটা খুলে আমাদেরকে দেখাতে পারেন। নিদারুণ অসুস্থতার সময়েও তার সর্বদাই লক্ষ্য থাকত ছাত্রদের শিক্ষার দিকে। তার যেন একটা পণ ছিল যে, কোন সময়ে ছাত্র কিছু না শিখে চলে যাবে না। তাই যখন ক্যান্‌সার রোগ পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেনি, কেবলমাত্র গলায় ব্যথা অনুভব হয়েছে এবং তার জন্য আদা বাটার প্রলেপ দিচ্ছেন আর গোলমরিচ, আদা, দারুচিনি ইত্যাদির ক্বাথ সেবন করছেন তখনও প্রতিটি ছাত্রের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছেন এবং তখনও তাঁর ইচ্ছা যে, আমি অদ্বৈতসিদ্ধির অবিদ্যার আশ্রয় ও বিষয় সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তা শেষ করি। নিয়মিত পড়িয়ে যাচ্ছেন এবং তাঁর অদ্বিতীয় গ্রন্থ "অদ্বৈতবাদে অবিদ্যা" থেকে পড়ে শোনাচ্ছেন। শরীর দুর্বল, কাজে উৎসাহ পান না কিন্তু অধ্যাপনা অবিরাম ভাবে চলেছে।

মহামহোপাধ্যায় ছিলেন প্রকৃত বৈদান্তিক। সকলেই ছিল তার অতি আদরের; ছাত্র বা জিজ্ঞাসু হলেই হল, তাকেই তিনি অকাতরে দান করেন।

লোক দিয়ে ডাকিয়ে আনেন তার ছাত্রদের। প্রয়োজন কি? না, কোন ছাত্র এখনও ডক্টরেট ডিগ্রী পায় নি; তার কিসে অসুবিধা হচ্ছে তাই তার জিজ্ঞাস্য। তিনি ছাত্রটিকে বলেন, তুমি আস না কেন? আসবে, পড়বে। এ কথাগুলো আজকের জগতে বিশ্বাসের যোগ্য নয়। যখন লিখছি তখনই মনে হচ্ছে যেন শব্দগুলো আজকের জগতের সঙ্গে অসামঞ্জস্যে ভরা। কিন্তু লিখতে পারছি এই জন্য যে, আবার মনের মুকুরে মহামহোপাধ্যায় রয়েছেন উজ্জ্বল ভাবে প্রতিবিম্বিত। আমি জানি যে, যে ব্যক্তি মহামহোপাধ্যায়ের নিন্দাও করে থাকে ব'লে সকলে জানেন এবং তা তারও অপরিজ্ঞাত নয় তাকেই তিনি সকল সন্দেহের অবসান করে সন্তুষ্ট করেছেন।

বেদান্তীর কাছে দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু। তাই তিনি নির্ভয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এই জন্য সংস্কৃত কলেজ তারকেশ্বরের মোহান্ত পদের ব্যাপারে যখন চিত্তরঞ্জন দাসের উপস্থিতিতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভার এক সভা চলেছিল তখন তিনি অল্প বয়স্ক হলেও সোজাসুজি চিত্তরঞ্জনের কাজের ও কথার অসামঞ্জস্য ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

এ কথাও আমরা শুনেছি যে, মুর্শিদাবাদে আন্নাকালী টোলে পড়ার সময়ে সরকারী অফিসে বৃত্তি আনতে গিয়ে যখন তিনি তার এক সহপাঠী বন্ধু অপমানিত হয়েছিলেন তখন তিনি সেই সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে প্রহার করতে দ্বিধা করেন নি।

উত্তালতরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়তে তার ভয় হয়নি। তাই যখন পুরীতে থাকা কালে একদিন অনেকক্ষন ধরে স্নান করার পর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে উঠে আস্‌ছিলেন তখন বন্ধুদের আহ্বান এল আবার কি তিনি সমুদ্রে স্নানে যেতে প্রস্তুত? মহামহোপাধ্যায় একটু ইতস্তত: করেছিলেন সেই পরিশ্রান্ত অবস্থায় আবার সমুদ্রে স্নান করতে। কিন্তু সঙ্গীরা যখন তাকে বললেন—আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি? তখন তিনি আবার বহুদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন এবং তার পক্ষে ফিরে আসা অসম্ভব হয়েছিল। সমুদ্র গর্ভে বিলীন হওয়াও কিছু অসম্ভব ছিল না কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বর সাহায্যের জন্য তার হস্ত প্রসারিত করলেন একটি নুলিয়ার মাধ্যমে। তাই এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণের সৌভাগ্য আমরা পেলাম।

এই সাহসী ও তেজঃপূর্ণ হৃদয়ও ছিল কোমলতায় ভরা। সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্রাবাসটি ১৯৪৬ সালের দাংগায় ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় তার নাম ছিল নিস্তারিনী ছাত্রাবাস। মহামহোপাধ্যায় একাদিক্রমে অনেক বৎসর সেই ছাত্রাবাসের

পর্যবেক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের সর্ববিধ দুঃখকষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। এই কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল বিশেষ বিশেষ কারণে দরিদ্র ছাত্রদের অর্থ সাহায্য করা। তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে, পর্যবেক্ষক হিসাবে তিনি যে ১০।১১ টাকা পেয়ে থাকেন তার সম্পূর্ণ অর্থ সংগৃহীত করতে হবে এবং সেই ফাণ্ড থেকেই প্রয়োজন মত অর্থ ব্যয় করা হবে। ছাত্রদের জন্য নানা কারণে বহু অর্থ ব্যয় করেও তিনি অবসর গ্রহণ কালে প্রায় ৭০০৲।৮০০৲ টাকা গচ্ছিত রেখে যান। আমরা শুনেছি যে, পরবর্তী কালের পর্যবেক্ষক ও সংস্কৃত কলেজের দু'একজন অধ্যক্ষ পর্য্যন্ত টাকার প্রয়োজন হলে ছাত্রদেরকে ঐ ফাণ্ড থেকে টাকা নেবার জন্য বল্‌তেন। একটি ছাত্রের মৃত্যু হওয়ায় তার সংকারের জন্য অর্থও নাকি ঐ ফাণ্ড থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল!

দেশ ও ধর্মের প্রতি যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরাগ জন্মায় তার জন্য তিনি রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি করে দেখাতেন যে, দেশের কল্যাণের জন্য যে দেহত্যাগ করে তার যে লোক প্রাপ্তি ঘটে তা ভীষ্মেরও কাম্য। তাই ভীষ্মও বল্‌ছেন।

তেভ্যো নমশ্চ ভদ্রঞ্চ যে শরীরাণি জুহ্বতে।
ব্রহ্মদ্বিষো নিযচ্ছন্তস্তেষাং নোঽস্ত সলোকতা॥

এই দেশরক্ষা ও শাসনের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে তা দীর্ঘকাল পরাধীনতারই ফল। ভারতের স্বাধীনতার যুগে আমরা কতখানি এ বিষয়ে সচেতন ছিলাম তা' তিনি তাঁর "প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি" গ্রন্থে প্রদর্শন করেছেন।

মহামহোপাধ্যায়ের ধর্মানুরাগিতার চূড়ান্ত নিদর্শন আমরা পেয়েছি তাঁর মৃত্যুকালে। তখন তাঁর একটি মাত্র কামনা—গঙ্গা ধ্যান, গঙ্গা জপ, গঙ্গা নাম এবং আকণ্ঠ গঙ্গাজল পান। কি পরিমাণ ধর্মভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকলে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর মানুষ কেবল গঙ্গা জলেরই কামনা করতে পারে তা চিন্তা করলে হতবাক্ হতে হয়।

মহামহোপাধ্যায়ের সঙ্গ দীর্ঘকাল লাভ করেছিলাম, তার স্নেহ, কৃপা ও ভালবাসা লাভ করেছিলাম—এর জন্য নিজেকে ধন্য মনে করি। দিনের পর দিন কত কথা হয়েছে, তার জীবনের কত ঘটনার কথা বলেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কতবার ভেবেছি—এ রকম এতগুলি গুণের সমাবেশ কি করে হয়? উত্তর এই পেয়েছি যে, সমন্বয়বাদী অদ্বৈতাচার্যের জীবনে যদি এত গুণের সমন্বয় না হবে তবে কোথায় তার স্থান?

সম্পাদকীয়

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যোগেন্দ্র নাথ তর্কবেদান্ততীর্থ মহাশয় পরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনের প্রত্যেক বিভাগেই তাহার জ্ঞান ছিল অনন্য সাধারণ। যিনি স্বল্পকালের জন্যও তাহার সংস্পর্শে আসিতেন তিনি তাহার অগাধ ও সুদূর প্রসারী পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইতেন। প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের বহু দুরূহ বিষয় ব্যাখা করিয়া বক্তৃতা দিবার তাহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ধর্ম্ম ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে মূলতঃ প্রাচীনপন্থী হইলেও আধুনিক বিদ্বান ও দার্শনিকদের নানা বিষয়ে মতামত শুনিতে তিনি ভাল বাসিতেন এবং ঔদার্য্যের সহিত সেগুলির বিচার করিতেন। এই অনাড়ম্বর ঋষিকল্প মনীষীর মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিদ্বৎ সমাজে যে স্থান শূন্য হইল তাহা অপূরণীয় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না।

পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ১৩৫৬ সালে বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তাহার কয়েকটি প্রবন্ধ 'দর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

* * * * *

সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সরকারী ডাক বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় সময় কাটাইতেন। তাহাকে পরিষদের প্রত্যেকটি সভায় নিয়মিত ভাবে উপস্থিত থাকিতে এবং আলোচনাদিতে যোগ দিতে দেখা যাইত। তাহার কয়েকটী প্রবন্ধ 'দর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে পরিষদ এক অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়াছে।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা] শ্রাবণ [১৩৬৭ সাল

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	জি. ই. মূরের দার্শনিকতা	শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী	১
২।	ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রয়োজনীয়তা	শ্রীসতীমোহন মুখোপাধ্যায়	১৩
৩।	কাণ্টের শিক্ষাতত্ত্ব	ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	২৪
৪।	কথার কথা	শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫

জি. ই. মূরের দার্শনিকতা

শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

(১)

ডাঃ জি. ই মূর, ও, এম, জীবদ্দশাতেই একজন বিশ্রুতকীর্ত্তি দার্শনিকরূপে সম্মানিত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ মূরের সমসাময়িক ইঙ্গ আমেরিকান দার্শনিকদিগের উপর তাঁহার প্রভাব বাস্তব ও প্রচণ্ড। এই কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে দার্শনিক-প্রবর আখ্যা দিতে কোন বাধা থাকিবার কথা নহে। কোন বিশেষ অস্তিবাচক দার্শনিক মতবাদের উদ্ভাবক বা প্রচারক না হইয়াও তিনি লব্ধকীর্ত্তি দার্শনিক। প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্র ও অধ্যাপক মণ্ডলী তাঁহার সুকথিত চিন্তাবলী সমন্বিত, তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ পুস্তক ও প্রবন্ধাবলী সাতিশয় যত্ন সহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। এই সকল প্রবন্ধ ও পুস্তক হইতে আমরা সুনিশ্চতরূপে আলোক প্রাপ্ত হইতে পারি; সময় সময় ওই আলোকের তীব্র দ্যুতিতে আমাদের চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়। মূরের সুতীক্ষ্ণ বিচারপ্রবণ মানসিকতার দীপ্তদাহে দর্শন জগতের বহু আবর্জনা রাশি পুড়িয়া ঝুরিয়া নিঃশেষ হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন; বিশেষতঃ ভাববাদী দর্শনের ভাবালুতা অনেকটা নিস্প্রভ হইয়াছে। প্রাক্‌মূরীয় যুগে যাহাই হউক না কেন, দর্শন জগতে অন্ততঃ মূরের উত্তরসাধকগণ বক্তব্য উপস্থিত করিতে অত্যন্ত সংযমী ও সাবধান হইয়াছেন—অনাবশ্যক বাগ্‌বিস্তার ও আলংকারিক বাচনভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনাকে, দার্শনিক বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ধারে মূরের সন্ধানী দৃষ্টির ভীতিরই ফল বলিয়া গণ্য করা যায়। বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া ডাঃ মূর কোন বিড়ম্বিত সমস্যা হইতে সযত্নে খাদটুকু অপসারণ করিয়া খাঁটি সুবর্ণ টুকু বাহির করিয়াছেন; মানুষের তাত্ত্বিক চিন্তা যে সকল চোরাগলিতে স্বভাবতঃই বিভ্রান্ত হইয়া থাকে তাহাদের নির্দেশ করিতে তাঁহার নিপুণতার তুলনা নাই। একই আপাতঃ সাধারণ সমস্যা বা প্রশ্নের মধ্যে কত বিভিন্ন সমস্যাবলী ও প্রশ্ন-রাজি লুকায়িত থাকিতে পারে তাহা চিড়িয়া চিড়িয়া বিশ্লেষণ করিতে মূর যত্ন করিয়া

ছেন ; আর বলিয়াছেন যে, কোন্ সমস্যার সমাধান করতে হইবে তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি না করিবার জন্যই দার্শনিকগণ বিভ্রান্ত হইয়াছেন ও তাহাদের সমাধান কার্য্যকরী হয় নাই (প্রিন্সিপিয়া এথিকা)। মানব জীবন ও তাহার অভিজ্ঞতার কিছু কিছু সমস্যা এই ভাবে বিশ্লেষণ মুখে শোধিত হইতে হইতে ডাঃ মূরের হস্তে এতই ক্ষীণ কলেবর ধারণ করিয়াছে যে হঠাৎ মনে হইতে পারে যে বাস্তবিকই কোন সমস্যা নাই। ডাঃ মূরের এবম্প্রকার সূচীমুখ বিশ্লেষণের ফলে তিন প্রকার বিকল্প অবস্থা সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমতঃ স্থূলত্বের আবর্জনা অপসারিত হইতে হইতে সমস্যার বস্তুটি এতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়া আসে যে উহা একটি বিলীয়মান ছায়া বলিয়া প্রতিভাত হয় ; আর আমরা কোন সমস্যা নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হই। দ্বিতীয়তঃ শোধিত সমস্যাটি অবাস্তব মনে না হইলেও উহা এতই অদ্ভূত ও কাণ্ডজ্ঞান বিরোধী মনে হইতে পারে যে ওই সমস্যার যে কি ভাবে উদ্ভব হইয়াছিল তাহা যেন আমরা ভাবিয়া পাই না। অথবা, তৃতীয়তঃ এমনও হইতে পারে যে বিশ্লেষণ মুখে আমরা এমন এক মূলীভূত সূক্ষ্ম সমস্যার সম্মুখীন হইলাম যে সেই সমস্যার আর কোন সমাধান নাই বলিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু কোন সমস্যা নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলে অথবা কোন মূল সমস্যা অদভূত বা সমাধানহীন বলিতে পারিলেই আমরা খুব বিজ্ঞ হইলাম মনে করা সমীচীন হইবে কিনা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। তাই দর্শন জগতে ডাঃ মূরের এই যে বিরাট অভ্যুদয়, তাঁহার প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্বের এই যে অপ্রতিরোধ্য প্রভাব তাহা আমার নিকট এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকা বলিয়া মনে হয়। আমি এই প্রবন্ধে এইরূপ প্রতিক্রিয়ার কিছু কারণ নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। এইরূপ প্রতিক্রিয়া সর্বথা অযৌক্তিক বলিয়া যদি কেহ নির্দেশ করেন তবে আমিই সর্বাপেক্ষা লাভবান হইব।

(২)

আমরা জানি যে ডাঃ মূর ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন সাহিত্য পড়িতে আসিয়া লর্ড রাসেল ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রভাবে দর্শন আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। মূর নিজেই বলিয়াছেন যে বিশ্বসংসারে বা মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে তিনি কোন দার্শনিক সমস্যা খুঁজিয়া পান নাই। অর্থাৎ আমাদের সাধারণ বা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা হইতে উদ্‌ভূত কোন দার্শনিক প্রশ্ন তাঁহার মনে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে উদিত হয় নাই। এমন মনে করা হয়তো অসঙ্গত নহে যে মানব জীবন বা তাহার অভিজ্ঞতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সমস্যা থাকিতে পারে ; সামাজিক, অর্থ-

নৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এমন কি নিছক নৈতিক সমস্যাও থাকা সম্ভব; কিন্তু বিশেষ রূপে 'দার্শনিক' বলিয়া কোন সমস্যা আছে বলিয়া ডাঃ মূরের মনে হয় নাই। তবে খ্যাতকীর্ত্তি দার্শনিকগণ যে সকল সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, আর উহাদের সমাধানে যাহা বলিয়াছেন তাহাই ডাঃ মূরকে ভাবাইয়াছে। ডাঃ মূরের নিকট দার্শনিক ও তাহার বক্তব্যই সমস্যা। ডাঃ মূরের পরিণত বয়সের এই উক্তিটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে উহা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করিতেছি।" আমার মনে হয় না যে, বিশ্বসংসার বা বিজ্ঞানগুলি কখনই কোন দার্শনিক সমস্যা আমার নিকট উপস্থিত করিতে পারিত। অপর দার্শনিকগণ জগৎ ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমার নিকট দার্শনিক সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে "(আত্মচরিত, ফিলসফি অব জি. ই. মূর, পৃঃ ১৪)। * এই কারণেই ডাঃ মূরকে "দার্শনিকগণের দার্শনিক" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

ডাঃ মূর যাহাকে দার্শনিক সমস্যা বলিয়া মনে করেন তাহার উদাহরণ দেওয়া এই স্থলে প্রয়োজন। তৎকালীন দার্শনিক-অধ্যাপক ম্যাক্‌টেগার্ট মহোদয়ের একটি দার্শনিক উক্তি মূরকে ভাবাইয়াছে। উক্তিটি হইল "কাল অবাস্তব (Time is unreal)"। এই উক্তিটি লইয়া তৎকালীন ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিকগণের মধ্যে খুবই বিতণ্ডা চলিতেছিল। ডাঃ মূরের সুসংস্কৃত কাণ্ডজ্ঞান তাঁহাকে বলিয়াছে যে দার্শনিক ম্যাক্‌টেগার্টও নিশ্চয় ঐ বাক্যটিকে সর্বথা মিথ্যা বলিয়া জানেন; কারণ, দার্শনিক নিশ্চয়ই জানেন যে তিনি অদ্য প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়াছেন ও পরে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও যে দার্শনিক কেন "কাল অবাস্তব" এইরূপ অদ্ভুত কাণ্ডজ্ঞানবিরোধী বাক্য প্রয়োগ করেন ও বিশ্বাস করেন, ইহাই মূরের সমস্যা। "মানস নিরপেক্ষ বহির্বস্তু নাই" এমন বাক্য ভাববাদী দার্শনিকেরা প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু তাঁহারা অতি সুনিশ্চিতরূপে জানেন যে "ইহা আমার দক্ষিন হস্ত, ইহা আমার বাম হস্ত, কাজে কাজেই দুইটি বহির্বস্তু বিদ্যমান" এই বাক্যটি সর্বথা সত্য। এখন যে বাক্য শুধু সত্যই নহে, যে বাক্যকে দার্শনিকগণ সুনিশ্চিতরূপে সত্য বলিয়া জানেন বা স্বীকার করেন, সেই বাক্যেরই বিরোধী বাক্যকে কেন যে তাঁহারা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, ইহাই ডাঃ মূরের সমস্যা।

* 'I do not think that the world or sciences would ever have suggested to me any philosophical problems. What has suggested philosophical problems to me is things which other philosophers have said about the world and the sciences."

এখন এই "দার্শনিকের দার্শনিক" ঠিক কি অর্থে দার্শনিক তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ইনি দার্শনিক হইলে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের দার্শনিক হইবেন, প্রাথমিক পর্য্যায়ের নহে। কিন্তু প্রাথমিক পর্য্যায়ের দর্শনকে দর্শন আখ্যা দিলে ইহা মানিতে হইবে যে দর্শনেতিহাসে খ্যাতকীর্ত্তি দার্শনিকগণ যে সমস্যা গুলির সম্মুখীন হইয়াছেন সেগুলি দার্শনিক সমস্যা আর সেইগুলি মানবের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই জাগিয়াছিল। কিন্তু মূর জীবন ও জগতের মধ্যে এই প্রকার দার্শনিক সমস্যা খুঁজিয়া পান নাই বলিয়া বলিয়াছেন। মূরের এই মত যদি তাঁহার সনিষ্ঠ মত হয় তবে দুইটি বিকল্প থাকিতে পারে। প্রথমতঃ মূর হয়তো বলিতে পারেন যে দর্শনেতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত দার্শনিকগণ যে তথাকথিত দার্শনিক সমস্যা লইয়া বিব্রত হইয়াছেন, ঐগুলি দার্শনিক সমস্যাই নহে; দার্শনিক সমস্যা হইতেছে দার্শনিকগণ কি কারণে নিজ নিজ জ্ঞান বিশ্বাস বিরোধী বাক্য স্থাপন করিতে চাহেন এইরূপ মূরবর্ণিত সমস্যা। দ্বিতীয় বিকল্প হইতেছে যে জীবন ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উত্থিত সমস্যাগুলি বাস্তবিকই 'দার্শনিক' সমস্যা, কারণ দর্শনেতিহাসের পূর্বাচার্য্যগণকে দার্শনিক আখ্যা দিতে মূরের আপত্তি নাই; তাহা হইলে মূরের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমস্যা ও তাহার সমাধান অ-দার্শনিক সমস্যার অদার্শনিক সমাধান হইয়া পড়ে। পরন্তু ডাঃ মূর তাঁহার নিজস্ব 'দার্শনিক' সমস্যাটির সমাধান কুত্রাপি দেন নাই; তাঁহার আলোচনায় কোন স্থানেই ঐ দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমস্যার সবিস্তার আলোচনা ও সমাধান নাই। ডাঃ মূরকে এক "বিরাট প্রশ্ন উত্থাপক কিন্তু সীমিত উত্তরদাতা" বলা হয়; আর এই দিক হইতে তাঁহাকে সক্রেতিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বোধ হয় তিনি ভাবিতেন যে তাঁহার নিজস্ব দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সমস্যাটির অদভূতত্বই উহাকে কবরস্থ করার পক্ষে যথেষ্ট। তথাপি নৈতিক বাক্য সম্বন্ধে বাক্য যদি নৈতিক বাক্য না হয়, তবে দার্শনিকের বাক্য সম্বন্ধে বাক্যও দার্শনিক বাক্য হইবে না। অথচ দার্শনিক বাক্য সম্বন্ধে আলোচনা ও মতগুলি দার্শনিক আলোচনা বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। এই স্বীকৃতি আমরা বর্ত্তমানের বিশ্লেষণমুখী দার্শনিকদের গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রিকাদিতে পাইয়া থাকি। কিন্তু এই অর্থে 'দর্শন' কথাটির অর্থ এতই ব্যাপক হয় যে কি বস্তু যে দর্শন আলোচনার বাহিরে তাহা বুঝা দুঃসাধ্য।

মূরের উপরিউক্ত সমস্যাটি যদি দার্শনিক সমস্যা হয় তবে আমরা সাধারণতঃ যাহাকে দার্শনিক সমস্যা বলিয়া বুঝি তাহার সহিত উহার সম্পর্ক নাই। দর্শনেতিহাসের লব্ধ প্রতিষ্ঠ রথীগণ যে সমস্যা লইয়া জর্জ্জরিত হইয়াছেন তাহা

তত্ত্বের সমস্যা, জ্ঞান বিশ্বাসের সমস্যা, মূলীভূত প্রত্যয়রাজির সমস্যা ও মানবজীবনের অন্তিম মূল্যের সমস্যা বলিয়াই আমরা জানি। মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিমূলে যে সকল তত্ত্ব ও প্রত্যয়রাজি নিহিত থাকে, তাহার ইন্দ্রিয়জন্য অনুভব, সৌন্দর্য্য বোধ, ধর্মবোধ বা নীতি জীবনে যে মৌলিক প্রত্যয় রাজি লক্ষিত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া বিচার বিশ্লেষণের নামই যদি দর্শন হয় তবে দর্শনালোচনা দূরকল্পনেয় (speculative) বা আধিবিদ্যক হইতে পারে। ডাঃ মূরের নিজস্ব সমস্যাটি কিন্তু এই অর্থে দার্শনিক সমস্যা হইতে পারে না। মূরকে কেহই দূরকাল্পনিক দার্শনিক বলিবেন না। মানবের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবলীর এক সুসমঞ্জস, অদ্বয় প্রণালীবদ্ধ ব্যাখ্যা আমরা তাঁহার দর্শনে পাই না। অবশ্য ডাঃ মূর কোন অতিকল্পনা করিতে চেষ্টাও করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে বিচার মূলক দার্শনিক (critical philosopher) বলাও বোধ ঠিক নহে। কারণ সাধারণ বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের মূলীভূত প্রত্যয় রাজির বিচার মূলক আলোচনার সহিত দূরকাল্পনিক দর্শনের ভেদ অতি সঙ্কীর্ণ। "দর্শনের কতিপয় প্রধান সমস্যা" (Some Main Problems of Philosophy) নামক গ্রন্থে ডাঃ মূর এইরূপ কতকগুলি মূল প্রত্যয়ের বিচারমুখী আলোচনা করিয়াছেন বটে। বহির্জগতের অস্তিত্ব, সামান্য ধারণার স্বরূপ, ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও বাহ্যবস্তুর সম্পর্ক প্রভৃতি বিচার মূলক সমস্যা এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু ডাঃ মূর পরে এই পুস্তকের কিছুমত যুক্তিসহ মনে করিলেও, অনেক কথাই অপরিষ্কার, হতবুদ্ধি প্রণোদক বলিয়া প্রত্যাহার করিয়াছেন। উত্তরোত্তর মার্জিত ও সংস্কৃত বিশ্লেষণ মুখে তাঁহার পূর্ব পূর্ব মতবাদ আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। ডাঃ মূরের আলোচনাগুলি শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ব্যর্থ মনোরথ করিয়া ছাড়ে।

(৩)

ডাঃ মূরকে সাধারণ বুদ্ধির (common sense) বস্তুবাদী দার্শনিক বলা হয়। ভাববাদী দার্শনিকগণ যে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন তাহা মূরের নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হয়। মূর বিশেষ করিয়া ব্রাডলির ভাববাদী দর্শনের ঘোরতর বিরোধী। ব্রাডলি দেশ, কালকে স্ববিরোধী অবভাস বলিয়াছেন ; কাজে কাজেই কোন ভৌতিক পদার্থ ই তাঁহার নিকট পরমসৎ নহে। মূরের সুস্থ ও সদাজাগ্রত জগদ্‌বুদ্ধি উক্ত ভাববাদী দর্শনকে একেবারে অলীক না বলিলেও, অসাধারণ ও অদ্‌ভুত বলিয়া থাকে। মূর তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "সাধারণ বুদ্ধির পক্ষ সমর্থন" (A Defence of Common Sense) প্রবন্ধে উপরিউক্ত

সমস্যার সহিত সম্পৃক্ত এক নূতন প্রকার দার্শনিক সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্যা হইতেছে "সাধারণ বুদ্ধির" মূল বা মৌলিক সত্যগুলির বিশ্লেষণের সমস্যা। মূর এই প্রবন্ধে সর্বসাধারণের জগদ্‌বুদ্ধির মূলে নিহিত কতকগুলি সত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে ইহারা কোন যুক্তিতেই সংশয়াচ্ছন্ন হইতে পারে না। সর্বসাধারণের জগদ্‌বুদ্ধির কোন পরিবর্ত্তন বা পরিশোধন হয় না এমন হয়তো বলা যাইবে না। ভূকেন্দ্রবাদ হইতে সাধারণ বুদ্ধির সৌরকেন্দ্রবাদে উত্তরণ হইয়াছে। কিন্তু সর্বসাধারণের জগদ্‌বুদ্ধির ভিত্তিমূলে কতকগুলি ধ্রুব সত্য নিহিত থাকে যাহা দার্শনিক-অদার্শনিক, প্রাচীন-নবীন সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সত্যগুলির উদাহরণ যথা:—"আমি কিছুকাল ধরিয়া এই পৃথিবীতে আছি", "আমার দেহ আছে", "আমা হইতে ভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তি আছে", ' অপর ব্যক্তিরাও কিছুকাল ধরিয়া পৃথিবীতে আছে আর তাহাদেরও দেহ আছে", "ইহা আমার দক্ষিণ হস্ত", "ইহা একটি মস্যাধার" ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বাক্যগুলি ধ্রুব, অক্ষয় সত্যজ্ঞান বোধক—কম বেশী দৃঢ় বিশ্বাস মাত্র নহে। আপাতঃ দৃষ্টিতে যে সকল দার্শনিক ইহাদের প্রতি সংশয় উৎপন্ন করেন তাঁহাদের বক্তব্য পড়িলে বুঝা যায় যে তাঁহারা ঐ সকল সত্য স্বীকার করিয়াই নিজ বক্তব্য উপস্থিত করিতেছেন। এই কারণে ডাঃ মূরের মতে উক্ত দার্শনিকগণের সংশয় স্ববিরোধী হইয়া থাকে। তাই কেন যে দার্শনিকগণ সাধারণ বুদ্ধির এই মূলগত সত্যগুলির বিরোধী বাক্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন তাহা মূর ভাবিয়া পান না। উপরিউক্ত বাক্যগুলির অর্থবোধে কোন অসুবিধা নাই। যে কেহ ভাষা ও তাহার সঙ্কেত বুঝে সেই ঐ সকল বাক্যের অর্থ পরিষ্কার, পরিপূর্ণ ভাবে, নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অর্থ গ্রহণ ও সত্য স্বীকারের সার্বজনীনতা, সর্ববেদ্যতা ও নিত্যতা বর্ত্তমান। এগুলি শুধু সত্যই নহে এগুলি আমরা সত্য বলিয়া জানি ও মানি। ইহারা ডাঃ মূরের দুর্ভেদ্য অচলায়তন। এই সকল বাক্যের অর্থবোধ, সংশয় বা সত্য প্রতিষ্ঠা মূরের মতে দার্শনিক সমস্যা নহে। দার্শনিক সমস্যা হইতেছে এই সকল বাক্যের অর্থ বিশ্লেষণ। অর্থ বোঝা এক ব্যাপার আর ঐ অর্থকে বিশ্লেষিতরূপে বলা আর এক ব্যাপার। কোন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করিতে আমাদের ভুল না হইলেও, ঐ ভাষা কি নিয়মে বা কি নিরিখে ব্যবহার হয় তাহা হয়তো আমরা বলিতে পারিব না। কোন ভাষা প্রতীককে শুদ্ধভাবে ব্যবহার করিতে পারা আর উহার ঠিক ঠিক অর্থ বোধ হওয়া একই কথা। কিন্তু ঐ ব্যবহার কি নিয়মে শাসিত তাহা বিশদ করিয়া বলাই হইতেছে অর্থ বিশ্লেষণ,

আর উহা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কোন শব্দ প্রতীক ব্যবহার করা আর ঐ ব্যবহারের নিয়ম স্পষ্ট করা একত্রে সম্ভব নাও হইতে পারে।

শব্দার্থ বা বা বাক্যার্থের বিশ্লেষণ এক জিনিষ, বস্তু, বা ঘটনার বিশ্লেষণ অন্য জিনিষ। প্রথমটি দার্শনিকের সমস্যা, দ্বিতীয়টি বৈজ্ঞানিকের। বিশ্লেষণ কথাটি কোন জটিল বিষয়কে মৌলিক বা সরল উপাদানগুলিতে বিশ্লিষ্ট করা বুঝায়; এই দিক হইতে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রভেদ নাই; প্রভেদ বিশ্লেষণের বিষয়ের মধ্যে। এখন 'ইহা একটি মস্যাধার' এই বাক্যের অর্থবোধে কোন জটিলতা নাই; ইহা সকলেরই অত্যন্ত সহজে হয়। তবে "এই মস্যাধার" রূপ ধারণাটি কি জটিল? ডাঃ মূরের মত হইল যে কোন ভৌতিক পদার্থের ধারণাটি, নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণ বিশেষের ধারণার মত সরল বা মৌলিক নহে। ঐ ধারণা জটিল আর উহার মৌলিক উপাদান হইতেছে ইন্দ্রিয়োপাত্ত (sensa)। মূরের এই মত আমাদিগকে স্কচ্ প্রত্যক্ষবাদী ডেভিড হিউমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, আর হিউম বর্ণিত সাক্ষাৎ সংবেদ্য (impressions) ও স্মৃত্যাত্মক ধারণার (idea) অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের কথা মনে জাগরিত করে। এই ইন্দ্রিয়োপাত্ত গুলিই সাক্ষাৎ সংবিতের বিষয়, ভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন একই ব্যক্তির নিকট ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন, নিঃসংশয়ে খানিকটা ব্যক্তিগত; কিন্তু সর্বলোকপ্রত্যক্ষ গম্য ভৌতিক পদার্থ নহে। ঘটমান সংবিতের বিষয়, আর সম্ভাব্য সংবিতের বিষয় বা সংবেদ্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত ধারার ন্যায় অন্তিম উপাদান এবং মস্যাধারের ন্যায় সর্ব প্রত্যক্ষগম্য ভৌতিক বাহ্য পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা লইয়া মূর অনেক গবেষণা করিয়াছেন আর এইরূপ অর্থ বিশ্লেষণরূপ সমস্যাকেই দার্শনিক সমস্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষগম্য ভৌতিক বস্তুর উপাদান কি ভাবে হইতে পারে, ঐ বস্তুর উপরিভাগের সহিত সংবেদ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধই বা কি ইত্যাদি বহুতর সমস্যা দার্শনিকের হইতে পারে। অর্থ বিশ্লেষণের এই সমস্যার কোন সর্ববাদীসম্মত সমাধান করিতে ডাঃ মূর তাঁহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন; কারণ তিনি নিজে সন্তোষজনক বিশ্লেষণের যে দুর্নিরিক্ষ মান সৃষ্টি করিয়াছেন সেই নিরিখে অর্থ বিশ্লেষণ এক দুঃসাধ্য ব্রত বলিয়াই মনে হয়। অবশ্য যে হেতু ঐ দার্শনিক সমস্যার সমাধান করা যাইতেছে না সেই হেতু সর্বসাধারণের জগদবুদ্ধির সত্যতা অস্বীকার করিবার কোন যুক্তি আছে বলিয়া ডাঃ মূর মনে করেন না। অর্থ বিশ্লেষণ সন্তোষ জনক না হওয়া আর সর্বলোকগম্য ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করার মধ্যে কোন বিরোধ নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে বাহ্যবস্তু

নির্দেশী বাক্যের তাৎপর্য্যবোধ এক কথা, আর ঐ তাৎপর্য্যবিশ্লেষণ আর এক কথা। কোন প্রকার যুক্তি দ্বারা সর্বসাধারণের অনুভবে প্রতিষ্ঠিত সাধারণ সত্যগুলি অস্বীকার করা যায় না।

সংক্ষেপে ইহাই মূরের "সাধারণবুদ্ধির পক্ষ সমর্থন" (A Defence of Common Sense)। আমি ডাঃ মূরের common sense-কে 'সাধারণ বুদ্ধি' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছি, 'কাণ্ডজ্ঞান' বলিয়া নহে। ইহার কারণ এই যে—কাণ্ডজ্ঞান কথাটির মধ্যে আমি ব্যবহারিক জ্ঞানের সংকেত পাই। জাগতিক বস্তুনিচয়ের যে রূপ স্বাভাবিক, সন্তোষজনক জ্ঞান থাকিলে মানুষ তাহার দৈনন্দিন ব্যবহার জীবনে পূর্ণ স্বার্থকতা লাভ করিতে পারে তাহাকেই কাণ্ডজ্ঞান বা সুস্থ ব্যবহারিক বোধ বলে (practical good sense) ; ইহা কেবলমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান বা থিয়োরী নহে। ডাঃ মূরের common sense কিন্তু কতকগুলি বিশেষ তাত্ত্বিক জ্ঞান ; তাই উহাকে সাধারণবুদ্ধি বা সাধারণ জ্ঞান বলাই ভাল। সমগ্র বিশ্বসংসারে কি কি বস্তু সুনিশ্চিতরূপে আছে তাহার সম্বন্ধে মানুষের সাধারণ বুদ্ধি কিছু নির্দিষ্ট মত গঠন করে। ডাঃ মূর এই সকল বস্তুর এক তালিকা প্রণয়ন করিয়াছে—জড়-পদার্থ, মানুষ ও প্রাণীদেহ, লক্ষ লক্ষ উদ্‌ভিদ্‌, পাথর, জলবিন্দু, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকাদি, মানসিক অবস্থাসমূহ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই তালিকাই সাধারণ বুদ্ধির দর্শন বা common sense philosophy নহে। যখন আমরা দাবী করি যে এই বস্তু-গুলিই জগতে আছে এবং এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই তখন সমগ্র বিশ্বসংসার সম্বন্ধে এক মত প্রতিষ্ঠিত হয় ; ইহাকেই সাধারণবুদ্ধির দর্শন বলা যায়। মূর তাঁহার "দর্শনের কতিপয় প্রধান সমস্যা" নামক পুস্তকে ব্রাড্‌লির মতই মনে করেন যে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে একটি মতবাদই দর্শন। কিন্তু তিনি সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী দর্শন স্বীকার করেন নাই। কিন্তু মূর বাক্যার্থ বা শব্দার্থের বিশ্লেষণরূপ যে দার্শনিক সমস্যা উত্থাপিত করিয়াছে, তাহার সমাধানে যে ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি ভিড় করিয়া আইসে, তাহারা কি সাধারণ বুদ্ধিজাত, সর্বলোকস্বীকৃত তথ্য? ভৌতিক পদার্থ নির্দেশী বাক্যের বিশ্লেষণে যদি আমরা ইন্দ্রিয়োপাত্তরূপ উপাদান মানিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে কি আমাদের বিশ্লেষণ সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী হইবে না? সাধারণ লোক কি ইন্দ্রিয়োপাত্তরূপ অদ্ভূত উপাদান তার জগদবুদ্ধির অন্তর্গত বলিয়া ভাবে? সাধারণ জ্ঞানের দিক হইতে আমার সম্মুখস্থ টেবিলের উপরি-ভাগে যে সকল বস্তু আছে তাহাদের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করার সময়, অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তকেও ঐ তালিকাভুক্ত করিব কি? ইন্দ্রিয়োপাত্ত তো সাধারণের

সম্পত্তি নহে, উহা দার্শনিকের সৃষ্টি। যে হেতু ডাঃ মূরের বিশ্লেষণও সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী না হউক, অন্ততঃ ঐ বুদ্ধিতে অজ্ঞাত উপাদান স্বীকার করে, সেই হেতু মূরকে সাধারণ বুদ্ধির দার্শনিকও বলা যায় না। পরন্তু মূর যদি সাধারণ বুদ্ধির অগম্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার করিতে পারেন তবে ব্রাড্‌লিই বা সাধারণ বুদ্ধির পদার্থ সমূহকে অবভাস বলিয়া, অন্য এক প্রকার আত্মিক পরমসৎবস্তু স্বীকার করিয়া কি দোষ করিয়াছেন? ব্রাড্‌লি সাধারণ সত্যের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন কি? কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান বর্জিত মানুষ তাহার সীমিত ব্যবহার জীবনে সাফল্য লাভ করিতে পারে না। ব্যবহার ক্ষেত্রে তাই কাণ্ডজ্ঞান অবশ্যই ঠিক। কিন্তু তাহাই যে তাত্ত্বিক পরমার্থ সত্য ইহা দার্শনিক স্বীকার করিতে পারেন কি? পরন্তু মূর তাঁহার নিজস্ব বিশ্লেষণের দার্শনিক সমস্যা সমাধান করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায়, মূরের নিকট দার্শনিক মতবাদ পাওয়া যায় না। ডাঃ মূরের বিশেষত্ব এই যে তিনি সর্বসাধারণের জগদ্ বুদ্ধির মূলবাক্য গুলিকে সত্য বলিয়া পুনঃপুনঃ সর্বশক্তি দিয়া কীর্তন করিয়াছেন মাত্র।

ডাঃ মূর নৈতিক বোধের মূলপ্রত্যয় 'কল্যাণ' বা 'ভালপনা' বিশ্লেষণ করিয়া যে পরানৈতিক দার্শনিক মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাও সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী। Goodness বা কল্যাণ শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার মতে বিশ্লেষণের অযোগ্য মৌলিক প্রত্যয়; সুখ, সাফল্য, পূর্ণতা, আনন্দ প্রভৃতি ভিন্ন জাতীয় প্রত্যয়ের মাধ্যমে ইহার সংজ্ঞা করিলে প্রকৃতিবাদোদ্ভূত দোষ (naturalistic fallacy) হয়। 'কল্যাণের' যে কোন সংজ্ঞাই দুষ্ট। ইহা 'নীল' 'পীত' প্রভৃতি প্রত্যয়ের মত মৌলিক—ইহার লক্ষণ বাক্য হয় না। তথাপি 'নীল' 'পীত' প্রভৃতি ধর্মের সহিত সাদৃশ্য বিধায় ডাঃ মূর ঐ 'ভালপনাকে' এক অলৌকিক ধর্ম (non-natural property) বলিয়াছেন কারণ নীলপীতাদির মত 'ভালপনা' প্রত্যক্ষ গম্য নহে। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি কি কখনও 'ভালপনাকে কোন বস্তু বা ঘটনার অলৌকিক ধর্ম বলিয়া মানিবে? মূরের এই মতও তাই সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী।

(৪)

বিশুদ্ধ ব্যবহারিক কাণ্ডজ্ঞান যদি মানুষকে সন্তুষ্ট করিতে পারিত তবে দর্শনের স্থান থাকিত না। মানুষ কখনও কখনও এক চিত্তচমৎকারী, আশ্চর্য্য এমন কি অলৌকিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বিশ্ব সংসারের দিকে তাকাইতে চেষ্টা করে আর কোন সার্বিক প্রত্যয়মুখে জগদ ব্যাপারকে অনুধাবন করে। সে তখন কাণ্ডজ্ঞানের ব্যবহারিক স্তর অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন এক স্তরে উপনীত হয়।

তাহার সেই ভিন্নস্তরীয় অনুভূতির আলোকে কাণ্ডজ্ঞানের জগৎ একটা বিলীয়মান ছায়ারূপেও প্রতিভাত হইতে পারে। লাইব্‌নিজ্‌ অবিভাজ্য আত্মিক পরমাণুর (মনাদ) আলোকে জগৎকে দেখিয়াছেন; এই দৃষ্টিতে দেশ ও জড়পদার্থ সমূল অবভাস রূপে দেখা দিয়াছে। স্পিনোজার দর্শন তেমনি ঈশ্বরকেন্দ্রিক আর ব্রহ্মের আলোকে জগৎ ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। স্যামুয়েল আলেক্‌জাণ্ডারের সার্বিক প্রত্যয়টি "দেশ-কাল"; এমনই বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, মীমাংসক, বৈদান্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী আছে; আর ঐ দৃষ্টি ভঙ্গীর আলোকে তাঁহারা কাণ্ড জ্ঞানের জগৎকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন সাজ পরাইয়াছেন। ডাঃ মূরও তাঁহার দার্শনিক সমস্যা সমাধানে ওইরূপ ভিন্নস্তরীয় বা নবস্তরীয় বিশ্লেষণই করিয়াছেন। ভৌতিক পদার্থকে ইন্দ্রিয়োপাত্ত ধারায় পর্য্যবসান করা ভিন্নস্তরীয় বিশ্লেষণ, সমস্তরীয় নহে। ইহার কারণ এই যে সর্বসাধারণের জগদবুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্থান নাই বলিয়াই আমরা দেখিয়াছি। ডাঃ মূরও তাহা হইলে এমন ভিন্নস্তরীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবেন না। তাঁহার বিশেষত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁহার ভিন্নস্তরীয় দৃষ্টির আলোকে সাধারণ বুদ্ধির জগৎকে ব্যাখ্যা করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন—যদিও ঐ জগৎকে তিনি স্বীকার করিবেনই। তাই তিনি লব্ধকীর্ত্তি দার্শনিকগণকে অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াও, বিশেষ সংস্কার বশতঃ, দার্শনিক হইতে পারেন নাই।

প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন প্রস্থানের একটি কেন্দ্রস্থল আছে যাহা যুগ যুগ ধরিয়া অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে। এই কারণে অনেকে ভারতীয় দর্শনকে দ্বিধাগ্রস্ত, স্থাণু, অনগ্রসর বলিয়াছেন। কিন্তু যে কোন ভারতীয় দর্শনের শাখা প্রশাখা, যুক্তি বিচারের বিস্তার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়, যদিও মূল মর্মস্থলটি অনাহত থাকে। ইহার কারণ এই যে প্রত্যেক ভারতীয় দর্শন প্রস্থানের একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে, যাহার আলোকে সমগ্র বিশ্বসংসারকে বুঝিতে হয়। বৌদ্ধ দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন বিলাসী, বৈদান্তিকের দৃষ্টিভঙ্গী উপনিষদ বর্ণিত কূটস্থ চৈতন্যের দৃষ্টিকোণ, নৈয়ায়িক বস্তুস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী বহু পদার্থবাদী। ভারতীয় পরিবেশে যুগ যুগ ধরিয়া এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পরস্পরের সহিত যুঝিয়াছে, কিন্তু নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে নাই। তাই মর্মস্থল অনাহত থাকিয়াও সপক্ষ ও বিপক্ষ যুক্তির বিরাট বিস্তার হইয়াছে। দর্শন যদি এবম্প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর স্থাপন হয়, তবে ডাঃ মূরের দর্শন নাই। তাঁহার দর্শনালোচনায় কোন অব্যাহত ধ্বনি নাই; ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হইয়াছে। আজ যাহা বলিয়াছেন কাল তাহা

হতবুদ্ধি প্রণোদিত বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে যে এরূপ এক অব্যাহত, নবস্তরীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে সমগ্র জগত সংসারকে বুঝিয়া লাভ কি? এইরূপ দর্শনের ব্যবহারিক কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় না। কিন্তু মানুষ চিন্তাশীল বলিয়াই সে উহা করিবে—ইহা রোধ করা যাইবে না। বিংশশতাব্দীর ইউরোপে ডাঃ মূরের উত্তর সাধকগণের হাতে আধিবিত্তক দর্শন প্রচুর মার খাইয়া আবার স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। দর্শনের শত্রুগণ তাঁহাদের নখদন্ত সংবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এক পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নুতন স্তরে উন্নীত না হইলে দর্শন হয় না! ইহার ব্যবহারিক প্রয়োজন না থাকিলেও ইহা অর্থহীন নহে। ইহাকে একপ্রকার তাত্ত্বিক পরীক্ষা, এমনকি "জ্ঞান-জ্ঞান" খেলা বলিতেও আমার আপত্তি নাই। দৈহিক সুস্থতার জন্য যেমন ভ্রমণাদি প্রয়োজন, তেমনি চিন্তার সংবৃদ্ধির জন্য ঐরূপ তাত্ত্বিক পরীক্ষাও প্রয়োজন। নুতন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে জগদ ব্যাপারকে অনুধাবন করিতে গিয়া সময় সময় অনেক আশ্চর্য্য তথ্যাদি বুদ্ধিগোচর হয়, আর ইহার একটি নিজস্ব মূল্য আছে।

অবশ্য ডাঃ মূরের তীক্ষ্ণ বিচার প্রবণতা, তাঁর স্থির বুদ্ধির অনমনীয় দার্ঢ্য, নিজ ভ্রম স্বীকার করার মত তাত্ত্বিক নিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ নিঃসংশয়ে প্রশংসার্হ। এই সকল গুণাবলীর মূল্য কম করিয়া দেখান আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। একরোখা মতবাদ আশ্রয় করিবার দৃঢ়তা অনেক সময় অনর্থ সৃষ্টি করে। কিন্তু মূরের নিকট আমরা দর্শন পিপাসার শান্তিবারি পাই নাই। ভৌতিক পদার্থ কেন নাই ইহার বহুযুক্তি ভাববাদী ার্শনিক দিয়া থাকেন। কিন্তু "ইহা আমার এক হস্ত আর ইহা আমার অপর হস্ত, কাজে কাজেই দুইটি বহির্বস্তু আছে" এই বাক্য নিঃসন্দিগ্ধ হইলেও ইহাতে জ্ঞান নিরপেক্ষ বহির্বস্তু "প্রমাণ" হয় কিনা ভাবিতে হয়। ভাববাদী দার্শনিকগণ কিন্তু আমার হাতটি বহির্বস্তু কিনা এই ভাবে সংশয় উৎপন্ন করিয়াছেন; কিন্তু মূর উহা যে বহির্বস্তু এইরূপ পূর্ব স্বীকার লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন, আর বলিয়াছেন যে হাতটি যে বহির্বস্তু তাহা প্রমাণ করার কোন যুক্তি নাই। মূরের দর্শন তাই অতি সারল্যের দর্শন। এই কারণে সমসাময়িক বিশ্লেষণমুখী দার্শনিকদের উপর মূরের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব আমার নিকট দুর্জ্ঞেয় রহস্য রহিয়া গিয়াছে। যদি আমরা ঐ দার্শনিকগণকে সত্যকারের দার্শনিক না বলি তবেই এই প্রভাবের ব্যাখ্যা হয়। দর্শন যে কি বস্তু তাহা আজও ঠিক হইল না। তবে আমি যে অর্থে দর্শনকে বুঝিয়াছি সেই অর্থে সমসাময়িক বিশ্লেষণ দর্শন নহে। এই বিশ্লেষকগণ অমুক দার্শনিকের এই দোষ, অমুক

দার্শনিকের ওই দোষ দেখাইয়া "দর্শন" নামক রোগের চিকিৎসা করিতেছেন। রোগী যখন আরোগ্যলাভ করিবে (অথবা মরিবে) তখন চিকিৎসকের আর কিছু করিবার থাকিবে না। যখন দাবানলে বনস্থলী উজাড় হইয়া যায় তখন এখানে ওখানে জলসিঞ্চন করিয়া সর্বনাশ বোধ হয় না। ডাঃ মূরের উত্তরাধিকার লইয়া বর্ত্তমান দার্শনিকগণ এখানে ওখানে বিশ্লেষণ আরম্ভ করিয়াছেন—জীবন ও জগতের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থিত করিতে অপারগ হইয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমস্যা, এমনকি অতিতুচ্ছ সমস্যা লইয়া তাঁহারা বিব্রত হইয়াছেন—আর সাধারণের দুর্বোধ্য ভাষাতে দর্শন আলোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞ সাজিয়াছেন। আর কতদিন এইরূপ চেষ্টা টিকিয়া থাকিবে কে জানে!

ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীসতীমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বচক্ষে দেখেছি, স্বকর্ণে শুনেছি, আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তবুও যদি কেহ বলে যা দেখেছি বা যা শুনেছি তা সত্য নাও হতে পারে তবে একটু অবাক হতে হয় বৈকি। যদি প্রশ্ন হয় কী দেখেছি? সাধারণ ভাবে স্বাভাবিক উত্তর হবে কেন? অদূরবর্ত্তী টেবিলটিই দেখেছি—যার রঙ বাদামী, আকৃতি গোল। কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন হতে পারে সত্যই কি টেবিল দেখেছি? টেবিল নামধারী জড়বস্তুটির চরিত্র প্রকৃত পক্ষে কী যা আমার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয় হিসেবে এখানে এখন উপস্থিত? বাদামী রঙের টেবিলই আমার প্রত্যক্ষের বিষয় এই সাধারণ ও সহজ উত্তরে সন্দেহের অবকাশ আছে। আমাদের তো মধ্যে মাঝে ভ্রম প্রত্যক্ষ হয়। রজ্জুতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রম ত ঘটে থাকে; সাধারণ ভাবে বলা যায় যে ভ্রম প্রমাদের বাস্তব কারণ বর্ত্তমান। কিন্তু কারণের কথা হচ্ছে না। সব কিছুরই কারণ আছে। ভ্রম প্রত্যক্ষকালীন ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে নিঃসন্দিগ্ধভাবে উপস্থিত সর্পকে একেবারে অস্বীকার করি কী করে? তাছাড়া নিরালম্বন প্রত্যক্ষেত (hallucination) কোন বস্তুরই সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই যদি কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে যে প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ বিষয় উপস্থিত জড়বস্তুটী নাও হতে পারে তাহাকে ত একেবারে অযৌক্তিক বলা যায়না। ভ্রম বা নিরালম্বন প্রত্যক্ষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। গোলাকার তাম্রখণ্ডটীকে ত' ভিন্নদৃষ্টিকোণ থেকে ডিম্বাকৃতি দেখায়। তাহলে বস্তুটির প্রকৃত আকার কী? যিনি ডিম্বাকৃতি দেখেছেন তিনি যেমন একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন; আর যিনি গোলাকৃতি দেখছেন তিনিও একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছেন। কার প্রত্যক্ষ সত্য? উভয়ই কি সত্য? কিন্তু একই বস্তু কি একই সঙ্গে গোলাকার ও ডিম্বাকার হবে? তারপর যে বাদামী রঙের টেবিলটিকে প্রত্যক্ষ করছি, আলোক ব্যবস্থা একটু ভিন্ন প্রকারের হলেই ত' আর পূর্ব্বেকার বাদামী রঙ থাকবে না। বর্ণান্ধ ফুলটিকে লাল না দেখে ধূসর দেখছে; জলমগ্ন কাষ্ঠখণ্ডটীকে ভগ্ন দেখায়। তাই এ সন্দেহ

স্বাভাবিক যে প্রত্যক্ষের বিষয় বলে যাকে মনে করি তা জড়বস্তু নাও হতে পারে। একই টেবিল কি একই সঙ্গে বৃত্তাকার ও ডিম্বাকার হয়? একই ফুল কি একই সঙ্গে লাল ও ধূসর হয়? তবে বস্তুর প্রকৃত রূপ যাই হ'ক না কেন প্রত্যক্ষের বিষয় হিসেবে যে কোন কিছু বর্ত্তমান এবং সেই কোন কিছু যে বহির্বস্তুর নির্দ্দেশ করে তাতে যেন কোন সন্দেহই নেই। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে সাক্ষাৎ ভাবে যা উপস্থিত এবং যার উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না এমন যে প্রত্যক্ষের বিষয় তাকেই বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়োপাত্ত (sense-data). জড়বস্তু আমার নয়ন গোচর কিনা জানিনা; কিন্তু কিছুটা রঙের বিস্তার ও একটা বিশেষ অবয়ব যে আমার নয়ন সম্মুখে উপস্থিত তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার ইচ্ছায় এর উপস্থিতি ঘটে নি বা আমার ইচ্ছায় এ অন্তর্হিত হবে না। একমাত্র আমিই এ প্রত্যক্ষ করছি না; আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ অন্য পাঁচজনেরও প্রত্যক্ষের বিষয়। ব্যক্তিগত মানসিক ব্যাপার মাত্র নয়। প্রত্যক্ষের বস্তুজগৎকে তাই যেন বর্জনও করা যায় না আবার সম্পূর্ণ গ্রহণও করা যায় না। এই রকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হয়েই পাশ্চাত্যের কোন কোন বস্তুবাদী দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তের অবতারণা করে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পেয়েছেন। তারা মনে করেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত মানস সৃষ্ট কিছু নয়; বহির্বিশ্বের জড়বস্তুর নির্দ্দেশক। প্রত্যক্ষে জড়বস্তুকে পাই না, পাই এই ইন্দ্রিয়োপাত্ত। বহির্বস্তুর জ্ঞান যদিও বা হয় তা অনুমানলব্ধ। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাহায্যে প্রত্যক্ষ গোচর জড়বস্তুর জগতকে কতটা সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তাহাই বিচার্য্য।

একই বস্তু একই সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট কিম্বা বিভিন্ন অবস্থায় একই ব্যক্তির নিকট যখন বিভিন্ন দেখায় তখন বলতেই হয় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আমরা জড়বস্তুকে পাইনা; পাই বস্তু হতে ভিন্ন কিছু যাকে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়োপাত্ত। এই ইন্দ্রিয়োপাত্তের কারণ হিসেবে জড়বস্তুকে অনুমান করা যেতে পারে মাত্র। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভাবে পাই ইন্দ্রিয়োপাত্ত আর বস্তুকে পাই (যদি নিতান্তই পাই বলা যায়) পরোক্ষভাবে। যতক্ষণ ইন্দ্রিয়োপাত্তকেই প্রত্যক্ষের বিষয় মনে করি—ততক্ষণ ভুলের সম্ভাবনা নাই। ভুল হয় যখন নিজের অজ্ঞাতেই ইন্দ্রিয়োপাত্তকে ছাড়িয়ে বস্তুকেই প্রত্যক্ষের বিষয় মনে করি। প্রত্যক্ষ মূলতঃই আপেক্ষিক। দ্রষ্টার দৃষ্টিকোণ, তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, বস্তু হতে দূরত্ব ইত্যাদি নানা অবস্থার উপর দৃষ্ট বস্তুর রূপ, অবয়ব প্রভৃতি নির্ভর করে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপাত্তের চরিত্র একান্তভাবেই প্রত্যক্ষকারীর উপর নির্ভরশীল। সবুজ

পর্ব্বতমালাকে দূর হ'তে নীল দেখায়। সমান্তরাল দুটী রেখাকে দূরে মিশে যেতে দেখা যায়। লাল ফুলকে কেহবা ধূসর দেখে। বিশেষ অবস্থায় কেউ বা একটি মোমবাতিকে দুটি দেখে। তাছাড়া মনঃসংযোগের তারতম্যের উপরও বস্তুরূপ নির্ভর করে, তাই অনেকে বলে থাকেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত নিতান্তই ব্যক্তিমনের প্রতিক্রিয়া—এবং এই ইন্দ্রিয়োপাত্তই প্রত্যক্ষের বিষয়। জড়বস্তু নহে। ইন্দ্রিয়োপাত্ত ছাড়া বস্তু সম্বন্ধে আর কিছুই আমরা প্রত্যক্ষে পাইনা; জড়বস্তু, এরা বলে থাকেন, সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষের অতীত। আর জড়বস্তুর প্রকৃত চরিত্রই বা কী? বস্তুর সন্ধানে ব্যর্থ হ'য়ে তাই কোন কোন দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টিকেই জড়বস্তু আখ্যা দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়োপাত্ত-পরিবারই জড়বস্তু (family of sense-data). তাই সাধারণ বুদ্ধির বাদামীরঙে-র টেবিল বা লাল ফুলটাকে আর বাইরের জগতের স্বাধীন বস্তু বলা যায় না। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ সকল ইন্দ্রিয়োপাত্তই হয়ত প্রত্যক্ষকারীর ব্যক্তিগত মানসিক প্রতিক্রিয়া। জটিলতা আরও বৃদ্ধি পায় যদি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রত্যক্ষের কথা বিবেচনা করা যায়। শুধু চোখে যে রক্তকে দেখায় লাল তাকেই অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখায় হলুদ। সূক্ষ্মতর যন্ত্রের সাহায্যে হয়ত সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ দেখাবে। সুতরাং কোথায় বস্তুর প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা? তারপর পদার্থবিদ্যা জড়বস্তুর যে চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাতে ত' বাদামী রঙের কঠিন টেবিলটার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত টেবিলটি দ্রুত সঞ্চরণশীল অনুপরমাণুর সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই প্রত্যক্ষে যা পাই তাকে জড়বস্তু কী করে বলা যায়? লক্ষ যোজন দূরের যে তারকাটী প্রত্যক্ষ করি বলে মনে হয় তার হয়ত এখন কোন অস্তিত্বই নেই; বহুপূর্ব্বেই ধ্বংসপ্রাপ্তি হয়েছে। বস্তু হতে আলোর রশ্মি এসে চোখের পর্দায় আঘাত করতে সময় লাগে। তাই প্রত্যক্ষের ব্যাপারে সময়ের ব্যবধানকে স্বীকার করতে হয়। নক্ষত্রের বেলায় এই ব্যবধান স্পষ্ট; কিন্তু সকল প্রত্যক্ষেই এই ব্যবধান সামান্য হলেও বর্তমান। তাই যাঁরা বলে থাকেন যে প্রত্যক্ষে বস্তুকে সাক্ষাৎ ভাবে পাই না, পাই—শুধু ইন্দ্রিয়োপাত্ত তাঁদের কথা যেন একেবারে অস্বীকার করা যায় না। প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার কতগুলি পর্যায় ও স্তর আছে। এই বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। সামান্য গোলাপ ফুলটিও যখন দেখি তখনও গোলাপ থেকে আলোর রশ্মি এসে চোখের পর্দায় বিশেষ ধরণের উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং অপটিক্ নার্ভের মাধ্যমে বহু জটিলতা অতিক্রম করে চলে যায় মস্তিষ্কে যার ফলে

হয় গোলাপের প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষকারীর দেহাভ্যন্তরস্থ কোন স্তরে যদি কোন গোলযোগ হয় তবে আর লাল ফুলটির প্রত্যক্ষ হবে না। তাই যাঁরা বলে থাকেন যে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত জগতে বাস করছি; বস্তুজগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের কখনই হয় না; তাঁদের যুক্তিকে অসার প্রতিপন্ন করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু তাই বলে আমরা সবাই স্বরচিত বিশ্বেই বাস করি, বস্তুজগতের সঙ্গে কোন সাক্ষাৎ পরিচয়ই আমাদের হয়না তাই বা কি করে বলা যায়? প্রত্যক্ষে যা পাই তা'ত আমার কল্পনা প্রসূত নয়। আমি ত' ইচ্ছা করলেই যা খুসী প্রত্যক্ষ করতে পারি না। সাধারণ বুদ্ধির জ্ঞান ক্রমশঃই যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। ভ্রম প্রত্যক্ষ, নিরালম্বন প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষের আপেক্ষিকতা, জড়বস্তুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, প্রত্যক্ষে সময়ের ব্যবধান, প্রত্যক্ষকারীর শারীরবৃত্তীয় অবস্থা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করলে সাধারণ বুদ্ধির জড়বস্তুর জগত স্বীকার করা কঠিন হয়ে পরে। তাই সমকালীন অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তারা বলেন, জড়বস্তু অপ্রত্যক্ষ; ইন্দ্রিয়োপাত্তই একমাত্র প্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু বস্তুটা কী? এবং এই ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কই বা কী? এই সকল প্রশ্ন বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সাহায্যে প্রত্যক্ষের জগতকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা যে খুব সফল হয়েছে এমন বলা যায় না।

ইন্দ্রিয়োপাত্তের সঙ্গে বস্তুর সম্পর্ক আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুর প্রায় পরস্পর বিরোধী কথা বলে থাকেন। প্রত্যক্ষকারীর মন ও জড়বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্ত কিভাবে সম্পর্কিত বা এই দুই পদার্থের মধ্যে ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্থান কোথায়? অধ্যাপক মুর বলেন, প্রথমতঃ প্রত্যক্ষক্রিয়া ও প্রত্যক্ষের বিষয় ইন্দ্রিয়োপাত্তের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য করতে হবে। নীল ও নীল উপলব্ধি নিশ্চয়ই আলাদা। ইন্দ্রিয়োপাত্তকে ত' আমরা আর ইচ্ছামত সৃষ্টি করতে পারিনা। তাই মুর বলেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তুরই অংশ বিশেষ। তা না হলে একই বস্তুকে একাধিকবার দেখি বা দেখতে পারি বলে মনে হয় কেন? মুর আরও বলেন যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত প্রত্যক্ষক্রিয়ার উপর নির্ভর না করেই অবস্থান করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত যদি বস্তুরই অংশ (কিম্বা বহিরঙ্গ) হয়—আর প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ হয় তবে একই বস্তুকে একই সঙ্গে গোলাকৃতি ও ডিম্বাকৃতি দেখা যায় কেন? মুর বলেন ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলির মধ্যে কিছু আসল আর কিছু "মনে হওয়া" গোত্রের। যেমন থালাটি আসলে গোলাকার কিন্তু কখনও কখনও মনে হয় ডিম্বাকার কিন্তু এই "মনে হওয়া" ইন্দ্রিয়োপাত্তই বা আবার কী রকম? কোনটা প্রকৃত আর

কোনটাই বা "মনে হওয়া" কী করে ঠিক করতে হবে? তাছাড়া অবস্থা বিশেষে মানুষ এক বস্তু দুই দেখে, (seeing double)—তারই বা ব্যাখ্যা কী হবে? কাজেই ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তুরই অংশবিশেষ বা বহিরঙ্গ একথা বলা যায় না। তাই মুর আবার বলেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তুর অবভাস্ মাত্র এবং শেষপর্য্যন্ত স্বীকার করেন যে বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্তের যে সম্বন্ধ তা বিশ্লেষণের অতীত। কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্ত যদি বস্তুর অবভাসই হয় বস্তুকে বলতে হয় প্রত্যক্ষের অতীত; তাহলে কী করে বলা যাবে যে বিভিন্ন অবভাস একই জড়বস্তুর সঙ্গে যুক্ত? কাজেই মুরকে অনেকটা মিলের মত বলতে হয় যে জড়বস্তু হচ্ছে সম্ভাব্য সংবেদন সমূহের স্থায়ী উৎস, (permanent possibilities of sensations) ইন্দ্রিয়োপাত্তকে বলতে হয় সম্ভাব্য ঘটনা (hypothetical fact). বলতে হয় বিশেষ অবস্থায় বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষ ধরণের ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রত্যক্ষ হবে। আর ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তুরই বহিরঙ্গ। কিন্তু বস্তু হয়ে যায় রহস্যময় একটা কিছু যাকে স্বীকার করা কঠিন। আবার অস্বীকার করা আরও কঠিন। কারণ ইন্দ্রিয়োপাত্ত একান্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের মানসিক ব্যাপার নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সর্ব্বজনগোচর। আমি যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত প্রত্যক্ষ করি, যে রঙের বিস্তার দেখি তুমিও তাই দেখ বলে উভয়েরই বিশ্বাস। দুজনেই ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্থান নির্দ্দেশ করতে পারি। কিন্তু তাই বা কি করে বলা যায়? আমি যে ফুলকে লাল দেখি বর্ণান্ধ দেখে ধূসর। তাছাড়া কোন ব্যক্তিকে বর্ণান্ধ বলার যুক্তিই বা কোথায়? সেও ত' বলতে পারে ধূসরকেই আমরা লাল দেখছি। আমি যে গাছটাকে দূর থেকে ছোট দেখি তুমি দেখ বড়। আর এইটাই ত' স্বাভাবিক। সামনে থেকেও যেমন দেখবে দূর থেকেও ঠিক তেমনই দেখবে এটাই বা কি কথা? বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় রঙ্‌ বা শব্দ সর্ব্বগত নয়, সর্ব্বগত হচ্ছে আলোর বা বায়ুর তরঙ্গ যা আমাদের ইন্দ্রিয়কে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে এবং ফলে আমরা রঙ বা শব্দ প্রত্যক্ষ করি। তাই ইন্দ্রিয়োপাত্তকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বলা যায় না। বস্তুর অংশও বলা কঠিন। আর ইন্দ্রিয়োপাত্ত যদি সম্ভাবনার জগতেই থাকে তাহলে তার চরিত্র বোঝা আরও কঠিন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও কিছুই বোঝা যায় না। তাই অধ্যাপক মুর বলেন জড়বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। রাসেল কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তকে জড়বস্তুর অংশ বা ধর্ম্ম বলতে চাননি। তিনিও বলেন যে জড়বস্তুই ইন্দ্রিয়োপাত্তের একমাত্র কারণ নয়, প্রত্যক্ষকারীর শরীর ও মন তার অবস্থান ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিকও ইন্দ্রিয়োপাত্তের জন্য দায়ী। প্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়োপাত্তের

সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় (knowledge by acquaintance). ইন্দ্রিয়োপাত্তের কারণ হিসেবে জড়বস্তুর জ্ঞান পরোক্ষ এবং বর্ণনা-মূলক (by description). সাক্ষাৎ জ্ঞান না হইলেও জড়বস্তুর অস্তিত্বে আমরা, রাসেল বলেন, কোনমতেই অবিশ্বাস করতে পারি না; জড়বস্তুর অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস যেন তর্কাতীত। কিন্তু জড়বস্তুর চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে জড়বস্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্তব ও সম্ভাব্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টিই বস্তু। কিন্তু এই সম্ভাব্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত কী পদার্থ? ইন্দ্রিয় সংযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্ভবই বা কী ভাবে হয়? ইন্দ্রিয়োপাত্ত অতিরিক্ত কোন বস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযোগ ভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি কল্পনাই বা কী প্রকারে সম্ভব বোঝা কঠিন। আমার মনে হয় প্রত্যক্ষকারীকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়োপাত্তের কল্পনাই সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়োপাত্তকে তাই ব্যক্তিগত ও বলা যায় না, আবার সর্ব্বগত বলাও কঠিন। ইন্দ্রিয়োপাত্ত বহির্বস্তুকে নির্দ্দেশ করে বটে—কিন্তু ইহাকে বহির্বস্তুর অংশ বলা যায় না; আবার ইহা সম্পূর্ণ আন্তরপদার্থ ও নয়। এক কথায় আমরা এক অসম্ভব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়ছি।

সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে Price প্রত্যক্ষ ও ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে জড়বস্তুর প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, জড়বস্তুর দুই মৌল পদার্থের সংমিশ্রণ (১) মূল জড়সত্তা, (physical occupant) (২) ইন্দ্রিয়োপাত্তের পরিবার (family of sense-data) একই পরিবার ভুক্ত হওয়ায় জড়বস্তুর অংশহিসেবে ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি ব্যক্তিগত বা অলীক হ'ল না। পরিবার ভুক্ত ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলির মধ্যে কিছু বাস্তব আর কিছু সম্ভাব্য। অর্থাৎ কিছু প্রত্যক্ষের বিষয় হয়েছে আর কিছু প্রত্যক্ষের বিষয় হয়ে ওঠেনি কিন্তু অনুকূল পরিবেশে বাস্তব হয়ে উঠবে। এই ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক কেন্দ্রগত ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যার সাহায্যে জড়বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা হয়। এই কেন্দ্রগত ইন্দ্রিয়োপাত্ত সমূহকে ঘিরে অগণিত বিকৃত ইন্দ্রিয়োপাত্তের ধারা। (infinite series of perverted sense-data) বৃত্তাকৃতি ইন্দ্রিয়োপাত্তটী থালার কেন্দ্রগত এবং সর্বগত আর ডিম্বাকৃতি ও বৃত্তাকার ভিন্ন অন্যান্য আকারের ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি বিকৃত। অর্থাৎ থালাটি আসলে গোল তবে কখনও কখনও দেখায় ডিম্বাকার। এইরূপ রঙের বেলায়; মূল রঙের ইন্দ্রিয়োপাত্তটাকে ঘিরে বিকৃত রঙের মিছিল। ইন্দ্রিয়োপাত্তের পরিবার ছাড়াও জড়বস্তুর কূটস্থ জড়সত্তা Price স্বীকার করেছেন ইন্দ্রিয়োপাত্তের কারণ হিসেবে। কিন্তু তার চরিত্র যে প্রকৃত কি তা তিনি নিজেই

নির্ধারণ করে উঠতে পারেননি। এই জড়সত্তার নিজস্বরূপ যে কি তা যেন কিছুতেই বোঝা যায় না। এ যেন অশরীরী রহস্যময় একটা কিছু যা অলক্ষ্যে থেকে ইন্দ্রিয়োপাত্তকে ঘটায়। অনেকটা যেন Locke'র অজ্ঞাত দ্রব্যের মত ব্যাপার। জড়বস্তুর ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্তাকে Priceও অস্বীকার করতে পারেন নি। জড়বস্তুকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমষ্টি বলে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। একই বস্তুর যে বিভিন্ন এমনকি পরস্পর বিরোধী ইন্দ্রিয়োপাত্ত থাকে তার ব্যাখ্যা তিনি করেছেন এই বলে যে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি একই পরিবার ভুক্ত; এক পরিবারে বিভিন্ন এমন কি পরস্পর বিরোধী ইন্দ্রিয়োপাত্ত থাকার কোনও বাধা নেই। ইন্দ্রিয়োপাত্তের কিছু কেন্দ্রগত ও প্রকৃত; অন্যান্য সব বিকৃত। Price'র এই ব্যাখ্যা খুব সন্তোষজনক বলে মনে করি না। সমস্যার সমাধান হলো বলে মনে হয় না। একই পরিবার ভুক্ত হোক আর নাই হোক প্রত্যক্ষকারী ও অন্যান্য পরিপার্শ্বিক বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়োপাত্তের কল্পনা অসম্ভব। প্রত্যক্ষের বিষয় না হয়েই ইন্দ্রিয়োপাত্তের পক্ষে বস্তুতে অধিষ্ঠান হওয়া কী করে সম্ভব তা বোঝা কঠিন। তারপর পরিবারের মধ্যে কিছু কেন্দ্রগত ও গুরুত্বপুর্ণ আর বাকি সব বিকৃত এই শ্রেণী ভাগ করার মাপকাঠিই বা কী? ইন্দ্রিয়োপাত্তের কিছু আসল আর কিছু বিকৃত বলার যুক্তিও কিছু খুজে পাওয়া যায়না। একমাত্র বলা যায় কোনও বস্তুকে বিশেষ ভাবে বিশেষ পরিবেশে দেখতেই আমরা অভ্যস্ত এবং ব্যবহারিক দিক থেকে সুবিধাজনক এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না; ইন্দ্রিয়োপাত্তের চরিত্র বিশ্লেষণের সুরাহা হয় না।

সমস্ত অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়—ইন্দ্রিয়োপাত্ত প্রত্যক্ষকারীর মানসিক ব্যাপারও বটে আবার বস্তুগত ও বটে। স্বীকার করতে হয় ইন্দ্রিয়োপাত্ত এমন কিছু যা বস্তুকে নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করে কিন্তু সম্পুর্ণ বস্তুগত নয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত বস্তু থেকে আলাদা কিন্তু বস্তু প্রকাশক। ইন্দ্রিয়োপাত্ত জড়বস্তুর ন্যায় সর্ব্বগত নয়, কিছুটা যেন গোপনীয়। আমার ইন্দ্রিয়োপাত্ত অপরের ইন্দ্রিয়োপাত্ত থেকে ভিন্ন। ইন্দ্রিয়োপাত্তের কার্য উৎপাদনের ক্ষমতা নেই যা জড়বস্তুর আছে। ইন্দ্রিয়োপাত্ত জড়বস্তুর তুলনায় ক্ষণস্থায়ী। ইন্দ্রিয়োপাত্ত বিশেষ, সামান্য নয়। আমরা বিশেষ লাল রঙ্ই প্রত্যক্ষ করি ইন্দ্রিয়োপাত্ত দ্রব্য নয় তবে দ্রব্যকে অবলম্বন করাই এর স্বভাব। ইন্দ্রিয়োপাত্তের চরিত্র তাই সব দিক থেকেই দুর্বোধ্য। এরা যেন কিছুটা ভৌতিক প্রকৃতির। কোন রহস্য লোক থেকে এরা আসে আর অবস্থার সামান্য তারতম্যেই কোথায় মিলিয়ে যায়। এরা বস্তুর কোন প্রকৃত অবস্থাই যেন নয়। কোন কোন ইন্দ্রিয়োপাত্ত আবার নিতান্তই বন্য প্রকৃতির। (wild sense-data)

[যেমন নিরালম্বন প্রত্যক্ষের বেলায়] বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন। ইন্দ্রিয়োপাত্তকে শুধু মানসিক ব্যাপার মাত্র বলা যায় না, জড়বস্তুকে সে অনিবার্যভাবেই নির্দেশ করে ; আবার মস্তিষ্ককে বাদ দিয়েও ইন্দ্রিয়োপাত্তকে কল্পনা করা যায় না। ইন্দ্রিয়োপাত্তের চরিত্র যেন ক্রমশঃই ঘোলাটে হয়ে আসছে। কোথা থেকে এরা আসে ; কিছুক্ষণের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করে ; আবার কোথায় মিলিয়ে যায় কিছুই যেন বোঝা যায় না। অথচ 'কিছুনা' বলে এদের উড়িয়েও দেয়া যায় না। আছে বলে স্বীকারও করা যায় না। এযেন অনির্ব্বচনীয় ; সত্যও নয় মিথ্যাও নয়।

ভাষাবিশ্লেষণকারী সমকালীন দার্শনিকদের মধ্যে কেহ কেহ জড়বস্তুও ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্পর্ককে ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য অনেক দার্শনিক সমস্যার ন্যায় ইন্দ্রিয়োপাত্তের সমস্যাও ভাষার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেই সমাধান করা যাবে বলে এরা মনে করেন। এরা বলে থাকেন ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও জড়বস্তু আলাদা কিছু নয়, ভিন্ন জাতীয় পদার্থ নয়। প্রত্যক্ষের বিষয় ইন্দ্রিয়োপাত্ত না জড়বস্তু এই প্রশ্নই এদের মতে অবান্তর। তবে প্রত্যক্ষের বিষয়কে দুই ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা যায় এবং করা হয়ে থাকে—জড়বস্তুর ভাষা আর ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষা। জড়বস্তুর ভাষা এদের মতে সহজেই ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষায় অনুবাদ করা যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষায় জড়বস্তুর ভাষাকে নিঃশেষে অনুবাদ করলেই জড়বস্তু ও ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্বন্ধ যে খুব বোধগম্য হল মনে হয় না। এরাই আবার বলে থাকেন যে বস্তুর দিকে লক্ষ্য না রেখে ইন্দ্রিয়োপাত্তকে বোঝাই যায় না এবং বস্তুহীন শুধু ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষা সৃষ্টি কেউ এখন পর্য্যন্ত করে উঠতে পারেননি। প্রথমতঃ একই জড়বস্তুকে কেন্দ্র করে—[বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ও পারিপার্শ্বিকের কথা বিবেচনা করে] অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রকাশের জন্য অসংখ্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত সূচক বিবৃতির প্রয়োজন। এ এক অসম্ভব পরিকল্পনা। তারপর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এই বিবৃতি সমষ্টি সম্ভব তবুও স্বীকার করতে হবে যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত সূচক ও জড়বস্তু সূচক বিবৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করা যায় না। এমন হতেই পারে যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত সূচক বিবৃতিগুলি সত্য;কিন্তু জড়বস্তু সূচক বিবৃতিগুলি মিথ্যা। কারণ নিশ্চয় করে কখনও বলা যাবে না যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত ভ্রমাত্মক বা অমূলপ্রত্যক্ষ জনিত কিনা। আবার জড়বস্তু সূচক বিবৃতিগুলি সত্য হয়ে, ইন্দ্রিয়োপাত্ত সূচক বিবৃতগুলি মিথ্যা হতে পারে। 'ঘরেতে টেবিল আছে' হয়ত সত্য কিন্তু ঘরে ঢুকে টেবিল জাতীয় ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রত্যক্ষ নাও হতে পারে।

হয়ত ঘরে যথেষ্ট আলো ছিলনা বা ঘর ধোয়ায় ভর্তি ছিল ইত্যাদি নানা কারণে টেবিল প্রত্যক্ষই হল না। উপযুক্ত পরিবেশে দেখলে ঠিকই দেখা যাবে বলা নিরর্থক; (circularity) তাই জড়বস্তুর ভাষা ও ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষার মধ্যে সঙ্গতিরক্ষা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া প্রত্যক্ষজ্ঞানের সমস্যা ভাষা বিশ্লেষণেই দূর হয়ে যাবে এটা সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ারই নামান্তর। ভাষা বিশ্লেষণকারী দার্শনিকগণ নিজেরাই এই সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছেন ও ভিন্ন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন।

সমস্ত অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ইন্দ্রিয়োপাত্তের অবতারণা করে যাঁরা প্রত্যক্ষের বিষয়ের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন তারা হয়ত কোথাও মস্ত ভুল করেছেন; সমাধানের চেয়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছেন অনেক বেশী। তাই আমার মনে হয়—ইন্দ্রিয়োপাত্তকে প্রত্যক্ষের বিষয় হিসেবে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নেই। জড়বস্তুই প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ বিষয়। প্রত্যক্ষে আমরা জড়বস্তুকেই পাই। টেবিলই আমার প্রত্যক্ষের বিষয়। কিছুটা রঙের বিস্তার ও বিশেষ অবয়ব মাত্র নয়! বিশেষ রঙ্ ও আবরণ বিশিষ্ট টেবিলই আমার প্রত্যক্ষের বিষয়। তবে প্রত্যক্ষের বিষয়কে প্রত্যক্ষকারী থেকে আলাদা করে দেখতে চাওয়াটাই নিরর্থক। প্রত্যক্ষ ও তার বিষয় মিলেই সমগ্র অবস্থা, এই সমগ্র অবস্থাটার কথা খেয়াল না রাখলেই সমস্যার সৃষ্টি হবে। আমরা অনেক সময় মনে করি বিশ্বপ্রকৃতি থেকে জ্ঞাতা মানুষ বুঝি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব যে প্রত্যক্ষকারী মানুষ এই নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বপ্রকৃতিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে বস্তুজগতকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করছে, প্রত্যক্ষকারী ও প্রত্যক্ষের বিষয় প্রতিমুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এই দুইয়ের যোগাযোগেই বস্তুর রূপ ও চরিত্র নির্ধারিত হচ্ছে। প্রত্যকারীকে বাদ দিয়ে বস্তুর কোন স্বতন্ত্র রূপ নেই। বস্তুর যে রূপ আমি প্রত্যক্ষ করেছি সেটাই তার আসল রূপ কিনা এসব প্রশ্ন অবান্তর। প্রত্যক্ষের জগত বা জড়বস্তু অলীকও নয় অজ্ঞেয়ও নয়। বস্তুর যে রূপ আমি প্রত্যক্ষ করি সেটা বস্তুরই রূপ তবে সেটাই বস্তুর একমাত্র রূপ নয়। বস্তুর আসল বা চরম রূপ সন্ধান করা অর্থহীন প্রয়াসমাত্র। বস্তুর যেরূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমি পরিচিত হয়ে থাকি তাকে বাদ দিয়ে বস্তুর চরম রূপ বলে কিছু নেই। বস্তুর অনন্ত রূপ। সেই অনন্তরূপের সম্যক প্রত্যক্ষ আমার কখনও হতে পারেনা। যখনই প্রত্যক্ষ হয় তখনই বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর এক বিশেষ রূপের সঙ্গেই মাত্র আমি পরিচিত হই। ফুলটাকে যখন লাল দেখছি তখন লাল ফুলই আমার প্রত্যক্ষের বিষয়; সেই ফুলকেই যখন কেউ ধূসর দেখছে তখন ধূসর ফুলই তার প্রত্যক্ষের বিষয়। একই

বস্তুকে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে দেখা যায় বলে মনে করার কারণ নেই যে জড় বস্তুর প্রত্যক্ষ আমার হয় না। শুধু ইন্দ্রিয়োপাত্তই প্রত্যক্ষ হয়। সমগ্র বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না বটে কিন্তু যা প্রত্যক্ষ হয় তা বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু মনে করা ভুল। জড়বস্তুর বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন অবস্থায় আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। জলে ডুবিয়ে রাখলে কাঠিটিকে বাঁকা দেখায়। এটা ভুলও নয়, অস্বাভাবিকও নয়। শুধু বায়ুমণ্ডলে বস্তুর যা রূপ জলমগ্ন অবস্থায় তার ভিন্নরূপ। কাঠিটি সোজাও বটে আবার বাঁকাও বটে। পরিবেশের কথা মনে রাখলে এর স্ববিরোধীতার কোনও লক্ষণ নেই। পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন বস্তুর কল্পনা অলীক। যখনই আমরা কিছু প্রত্যক্ষ করি তখনই একটা বিশেষ পরিবেশে তাকে প্রত্যক্ষ করি। তবে সাধারণত: যে বিশেষ পরিবেশে কোনও বস্তুকে বিশেষরূপে আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করে থাকি সেটাই তার আসল রূপ বলে মনে করে থাকি, এই পর্যন্ত। ব্যবহারিক দিক থেকে সেটাই তার সত্য রূপ বলে গণ্য করি। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে সেই বিশেষ রূপকেই বস্তুর একমাত্র সত্যরূপ বলে মনে করা ভুল। অর্থাৎ এটা বলা ঠিক হবে না যে থালাটি আসলে গোল কিন্তু কখনও কখনও দেখায় অন্য রকম। কিম্বা ফুলটি আসলে লাল—বর্ণান্ধ দেখে ধূসর বা নীল। পরিবেশের তারতম্যের কথা ভুলে যাই বলেই এই রকম বলে থাকি। মনে রাখতে হবে যে বস্তু পরিবেশ অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি প্রতিনিয়তই পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। শুধু বহির্বিশ্বই নয়—প্রত্যক্ষকারীর দৃষ্টিকোণ, তার দেহমনের অবস্থা; তার মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র তার ইন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট ও আভ্যন্তরীণ অসংখ্য খুটিনাটি ব্যাপার, তার মানসিক প্রবণতা, তার দৃষ্টিভঙ্গি, তার আগ্রহ কৌতুহল, তার মনঃসংযোগ সব কিছু নিয়ে এই পরিবেশ। এই বিরাট ও সুগভীর পরিবেশ-সমুদ্রে আমরা সকলে ডুবে আছি। এই অনন্ত পরিবেশে বস্তুর অনন্ত রূপ প্রত্যক্ষ হতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের পরিবেশই অন্য সকলের পরিবেশের চাইতে ভিন্ন। আমি যে পরিবেশে বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি অন্য কেহই ঠিক সেই পরিবেশে প্রত্যক্ষ করে না। তবে পার্থক্য খুব সামান্য বলে ব্যবহারিক জীবনে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সবাই বলি বাদামী রঙের গোল টেবিলটিই সবাই দেখি। একই ফুলের একই গন্ধ সবাই পাই, কিন্তু ঠিক এক নয়। বিভিন্ন পরিবেশে বস্তুর বিভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ হয়। বাদামী রঙের শক্ত কাঠের গোল টেবিলটির হয়ত এমন রূপ আছে যা এ যাবৎ আমরা কেউ প্রত্যক্ষ করিনি। বহু সহস্র বৎসর পরে জীবজগতে এমন প্রাণীর উদ্ভব হতে পারে যা হয়ত আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত কোন ইন্দ্রিয়ের অধিকারী যার

ফলে সেই বিশেষ প্রাণীর নিকট বস্তুর এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ ধরা পরবে। তাই জন্য এটা বলা ঠিক হবে না যে বস্তুর সেটাই হল আসল রূপ ; আমরা আজকে যা প্রত্যক্ষ করছি সেটা প্রকৃত রূপ নয়। আজও বস্তুর প্রকৃত রূপই জানছি সেদিনও বস্তুর প্রকৃত রূপেরই প্রত্যক্ষ হবে। তবে পরিবর্তিত পরিবেশের কথা স্মরণ রেখে এর ব্যাখ্যা করব। ভ্রমপ্রত্যক্ষের বেলাতেও এই পরিবেশের কথা মনে রেখেই এর ব্যাখ্যা করতে হবে। পরিবেশের গভীরতা ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করতে হবে। বুঝতে হবে লক্ষ কোটি ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনা প্রতিনিয়ত এই পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। এই বিরাট পরিবেশের অংশ হিসেবে মানুষ বস্তুজগতকে প্রত্যক্ষ করছে।

ভুল ভ্রান্তি মাঝে মাঝে হয় বটে, তার ব্যাখ্যাও এই পরিবেশ সংক্রান্তই। প্রত্যক্ষকারী ও প্রত্যক্ষের বিষয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় ; বিচ্ছিন্ন ভাবলেই নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষ ও তার বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে হয়েছে এবং অনেক দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন দর্শনে কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্তের উল্লেখ বড় একটা পাওয়া যায় না। ভ্রম প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা প্রাচীনরা নানাভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ইন্দ্রিয়োপাত্তের অবতারণা করে তারা সমস্যা জটিলতর করেন নি। দর্শনের কোন সমস্যাই তর্কাতীত নয়। তবুও আমার মনে হয় ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার করে সমস্যা জটিলতর না করাই শ্রেয়। ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা যেমন আমি স্বীকার করি না আবার সাধারণ বুদ্ধির জগতকেও আমি সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে অসমর্থ। প্রত্যক্ষের সাক্ষাৎ বিষয় জড়বস্তু কিন্তু এই জড়বস্তু অনন্ত পরিবেশে অনন্তরূপে আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হয়ে থাকে। সাধারণ বুদ্ধি এতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হতে পারে। কিন্তু জগৎ ও জীবনের সব কিছুই সত্যিই এক পরম বিস্ময়।

কাণ্টের শিক্ষাতত্ত্ব

ডঃ শ্রীপ্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

(এক)

দার্শনিকপ্রবর ইমানুয়েল কাণ্টের দর্শনের মূলসূত্রগুলি দর্শনানুরাগী ব্যক্তিবর্গের নিকট সুপরিচিত; কিন্তু শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। এই প্রবন্ধে আমরা শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কাণ্টীয় মতবাদ আলোচনা করিব।

কাণ্ট ছিলেন কোয়েনিগস্‌বের্গ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল যে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা দর্শনের কোন অধ্যাপক শিক্ষাতত্ত্ব (Pedagogy) সম্বন্ধে ছাত্রদের নিকট বক্তৃতা দান করিবেন। এই নিয়ম অনুসারে কাণ্ট ১৭৭৬-৭৭ এবং ১৭৮৬-৮৭ সালের মধ্যে চারিটী অধিবেশনে (Semester) শিক্ষাবিদ্যা সম্বন্ধে ছাত্রদের সমক্ষে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন। কোন একটী বিশেষ পুস্তককে পাঠ্যপুস্তকরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যাকরণ ছিল কাণ্টের অন্যতম শিক্ষা-পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে তিনি প্রথমে Basedow এবং F. S. Bock-এর শিক্ষাসম্বন্ধে পুস্তক[১] লইয়া ছাত্রদের নিকট আলোচনা করিতেন।

দুঃখের বিষয় শিক্ষাবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার মতবাদ কাণ্ট কোন পুস্তকের আকারে প্রকাশ করেন নাই। বক্তৃতাদানের পূর্ব্বে কাণ্ট তাঁহার ব্যক্তব্য বিষয় ছোট ছোট কাগজে লিখিয়া খসড়া প্রস্তুত করিতেন। এইগুলি লইয়া ১৮০৩ খৃঃ অব্দে থিওডর রিঙ্ক্ (Theodor Rink) কাণ্টের শিক্ষাতত্ত্ব পুস্তকের আকারে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকের আখ্যা হইল *Immanuel Kant, Über Pädagogik*। রিঙ্ক্ ১৭৮৬ হইতে ১৭৮৯ পর্য্যন্ত কোয়েনিগস্‌বের্গ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কাণ্টের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কয়েক বৎসর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ম্মতত্ত্বের (Theology) অধ্যাপক ছিলেন। পরে তিনি ডানৎসিগে (Danzig) ধর্ম্মযাজকের

---

১ **Basedow:** *Methodenbuch.*

F. S. Bock: *Lehrbuch der Erziehungskunst.*

কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, রিঙ্ক-সম্পাদিত শিক্ষাতত্ত্ব কাণ্ট কতদূর সংশোধিত ও পরিবর্তিত করিয়াছিলেন তাহার সঠিক বিবরণ জানা নাই। তবে দেখা যায় যে, ১৮০১-০২ সালেও কাণ্ট শিক্ষাতত্ত্বের উপর তাঁহার বক্তৃতার খসড়ার কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছিলেন।[২]

অধ্যাপকের কর্তব্যসম্পাদনের জন্যই যে কাণ্ট শিক্ষাতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু শিক্ষক ও দার্শনিক হিসাবে তিনি স্বতঃই শিক্ষাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দার্শনিক যখন বাস্তবজীবনের সমস্যা লইয়া আলোচনা করেন, তখন তিনি মানবের চারিত্রিক উন্নতি ও শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। কাণ্টের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই।[৩] আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তিনি মনে করিতেন যে, শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য কয়েকটী বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা নহে—ঐ জ্ঞানের মাধ্যমে ছাত্রের মনে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার ক্ষমতা জন্মাইয়া দিতে হইবে এবং এই ভাবে তাহাকে প্রকৃত বিদ্বান্ করিয়া তুলিতে হইবে।[৪]

(দুই)

এখন শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কাণ্টের বক্তৃতা আলোচনা করা যাউক্।

কাণ্ট তাঁহার বক্তৃতামালার প্রথমে মানুষের সহিত অন্যান্য জীবের তুলনা করিয়াছেন। মানুষই একমাত্র জীব যাহার শিক্ষার প্রয়োজন হয়। পশু নিজের সহজাত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু মানুষ নিজের যুক্তি শক্তি দ্বারা নিজেকে পরিচালিত করে। মানুষ যখন জগতে আসে তখন তাহার কোন অভিজ্ঞতা থাকে না, এইজন্য সে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

শিক্ষার দুইটী দিক্ আছে—একটি নঙর্থক আর একটী সদর্থক। নিয়ন্ত্রণ বা শৃঙ্খলা (Discipline) নঙর্থক—ইহার দ্বারা মানুষকে পশুর আচরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়। শিক্ষার সদর্থক দিক্ হইল উপদেশদান (Training)।

২ এই সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি über Pädagogik-এর E. F. Buchner-কৃত ইংরাজী অনুবাদ *Kant's Lecture-notes on Pedagogy* হইতে গৃহীত হইয়াছে।

৩ আধুনিক কালের একজন প্রখ্যাতনামা দার্শনিক জন ডিউই (John Dewey) মনে করেন যে, শিক্ষাই দর্শনের চরম আদর্শ এবং ইহার মাধ্যমেই দর্শন মানবজীবনের প্রকৃত সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারে। তাঁহার ভাষায় "Education offers a vantage ground from which to penetrate to the human, as distinct from the technical, significance of philosophical discussion" (*Democracy and Education*, p. 383)।

৪ কাণ্টের ভাষায়, "......a teacher is expected to make of his hearer first an *intelligent*, then a *reasonable*, and finally a *learned* man"

মোট কথা, নিষেধ ও বিধি এই দুই-এর সমন্বয়ই হইল প্রকৃত শিক্ষা। কাণ্ট শৃঙ্খলা-শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছিলেন, কারণ ইহার অভাবে মানুষ বন্য পশুর তুল্য হইয়া পড়ে। কৃষ্টির অভাবে মানুষ অপক্ক-বুদ্ধি হইয়া থাকে—কিন্তু চেষ্টা করিলে পরিণতবয়সেও কৃষ্টি-শিক্ষা হইতে পারে; অপরপক্ষে যদি শৈশব হইতে শৃঙ্খলা-শিক্ষা না হয়, তাহা হইলে যৌবনে মানুষ নিজেকে সংযত রাখিতে পারিবে না।* স্বাধীনতা সকল মানুষই স্বভাবতঃ চায়; কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা স্বৈরাচারেরই প্রকার ভেদ মাত্র। স্বাধীনতার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে যুক্তির প্রয়োজন।

যেহেতু শিক্ষালাভের জন্য একজনকে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়, সেইজন্য শিক্ষকের নিজের শিক্ষা অর্থাৎ তাঁহার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এবং কৃষ্টির ঔৎকর্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। এইজন্যই শিক্ষাকার্য্যগ্রহণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষাকার্য্যের জন্য এক বিশেষ প্রকারের দক্ষতা বা কৌশল আবশ্যক। কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে এই কার্য্যে সম্পূর্ণতা লাভ করা সম্ভব নহে। মানুষের সভ্যতার বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ শিক্ষণকার্য্যের এবং শিক্ষার আদর্শের পরিবর্ত্তন হইতেছে। শিক্ষণকার্য্য সহজাত ক্ষমতা-বিশেষ নহে; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সকল মানুষই আদর্শ শিক্ষক হইতে পারিত।

শিক্ষা মানুষের পক্ষে একটী কঠিন ও দুরূহ সমস্যা। মানুষ যেমন আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই, সেইরূপ সে আজও আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা নিরূপণ করিতে পারেন নাই। মানুষের মধ্যে কতকগুলি ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল এই সমস্ত সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগরিত করা এবং ন্যায়ের আলোকে পরিচালিত করা। এই কার্য্যের জন্য এক বিশেষ প্রকারের অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন।

কাণ্ট শিক্ষার পাঁচটী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন - প্রয়োজনীয়তা, সম্ভাব্যতা, মূল্য, প্রধান সূত্র এবং দক্ষতা।

* "Discipline or training changes animal nature into human nature......"

"Discipline prevents man from being turned aside by his animal impulses from his destiny, which is humanity...... Training, therefore, is merely negative; it is the action by which one rids man of his wildness; instruction, on the contrary, is the positive part of education.

"...... He who is not cultivated is raw; he who is not disciplined is wild. The omission of discipline is a greater evil than the neglect of culture; for the latter can be recovered in later years but wildness cannot be removed and a blunder in discipline cannot be retrieved." (*Lecture-Notes on Pedagogy*, S. 3, 4, 7).

কাণ্ট বলেন যে, শিক্ষার মধ্যে একটা বাধ্যবাধকতা আছে—ইহা একটী সামাজিক বিলাস নহে। ইহা একটী ব্যক্তিগত ও জাতীয় প্রয়োজন। ইতরজীবেরা সাধারণতঃ সহজাত সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু মানুষ এই বিষয়ে কতকটা অসহায়। ইতরজীবেরা সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে পারে, কিন্তু মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে পারে না ; মানুষের এই অভাব তাহাকে নিজেকেই দূর করিতে হইবে এবং নিজেকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্যই মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

শিক্ষা মানুষের পক্ষে সম্ভব এবং এই কারণেই কাণ্ট বলিয়াছেন যে সম্ভাব্যতা শিক্ষার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। মানুষই একমাত্র জীব যে স্বীয় সুপ্ত ক্ষমতাকে পরিস্ফুট করিতে পারে। সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগ্রত করিবার এই বাসনা কল্পনা মাত্র নহে; ইহা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা সম্ভাব্যতার সীমার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষার মূল্য আপেক্ষিক, কারণ ইহা উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ। ক্যাণ্ট শিক্ষা বলিতে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যান্ত্রিক সম্বন্ধ বুঝিতেন না। বিশ্বজনীনতা ও মানবিকতাই শিক্ষার চরম লক্ষ্য ; সুতরাং শিক্ষা বলিতে কাণ্ট মনে করিতেন সমগ্র মানবসমাজের সহিত ছাত্রদের নিবিড় সম্বন্ধের ক্রমবিবর্ত্তন। অতএব শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবের নৈতিক জীবনের উদ্ভাবন। কাণ্টের পক্ষে শিক্ষাতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব সমানার্থক।

শিক্ষাতত্ত্বের এইজন্য কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সূত্র অনুধাবন করিয়া চলা উচিত। প্রকৃতির আদর্শেই শিক্ষাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। মানসিক ক্ষমতা ও দৈহিক উৎকর্ষের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। শৈশব হইতেই শিশুর সম্মুখের একটা বিশ্বজনীন আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে।

তাহা ছাড়া কাণ্ট মনে করিতেন যে, শিক্ষণকার্য্য একটা আর্ট বা কলা-বিশেষ। বিদ্যালয়ে শিক্ষণ কার্য্যের মাধ্যমেই শিক্ষার আদর্শের সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা হয়*।

(তিন)

শিক্ষাতত্ত্বের বক্তৃতামালার প্রথমেই কাণ্ট শিশুর পরিচর্য্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শৈশবের শিক্ষা স্বভাবতঃই দেহ-কেন্দ্রিক। সেইজন্য কাণ্ট প্রথমেই

* কাণ্ট শিক্ষার এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য যে শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেগুলি হইল Notwendingkeit (Necessity), Mӧglichkeit (possibility), Wert (value), Principien (Principles), এবং Kunst (Art).

নবজাত শিশুর পরিচর্য্যা (nursing) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। কাণ্ট বলেন যে, নবজাত শিশুর পক্ষে মাতার স্তন্যদুগ্ধই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মনুষ্যদুগ্ধ নিরামিষাশী যে কোন পশুর দুগ্ধ হইতে পৃথক—শেষোক্ত প্রকার দুগ্ধ শিশুর পরিপাক যন্ত্রের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কারণ ইহা সহজেই জমাট বাঁধিয়া যায় এবং সেইজন্য উহা পরিপাক করা কষ্টকর। মাতৃদুগ্ধ পরিত্যাগ করিবার পর শিশু যখন আহার করিতে শিখিবে, তখন তাহাকে অত্যধিক কটু, অম্ল এবং লবণাক্ত কোন খাদ্য বা কোন উত্তেজক পানীয় দেওয়া উচিত নহে। শিশুর দেহের রক্তের উত্তাপ পরিণত-বয়স্কদের সাধারণ দেহ-তাপ অপেক্ষা অধিক। এইজন্য শিশুকে অত্যন্ত গরম ঘরে বা গরম জলে স্নান করান উচিত নহে। শিশুর শরীরের পক্ষে সুশীতল বায়ু, সুশীতল জল এবং সুশীতল গৃহ উপকারী।

শিশুর শরীরের পক্ষে দোলনা উপযুক্ত নহে; কারণ ইহার দ্বারা শিশুর শরীরকে অকারণ ঝাঁকুনি দেওয়া হয়। পরিণতবয়স্ক লোকেরাও যদি অতিরিক্ত দুলিতে থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও মস্তক-ঘূর্ণন, বমনেচ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়; সুতরাং শিশুদের পক্ষে ইহা আরও ক্ষতিকর। এই প্রসঙ্গে কাণ্ট আরও বলিয়াছেন যে, সাধারণতঃ শিশুর ক্রন্দন থামাইবার জন্য তাহাকে দোলা দেওয়া হয়; কিন্তু শিশুর মা ভুলিয়া যান যে শিশুর পক্ষে ক্রন্দনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে[৭]। তাহা ছাড়া শিশু কাঁদিতে আরম্ভ করিলেই সর্ব্বদা তাহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ শিশু তাহার সকল ইচ্ছা সহজেই কাঁদিয়া কাটিয়া পূরণ করাইয়া লইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু এইরূপ অভ্যাস করিলে ভবিষ্যতে জীবন সংগ্রামে তাহাকে অনেকক্ষেত্রেই নিরাশ হইতে হইবে।

শিশু যাহাতে অন্যের সাহায্য ব্যতীত আত্ম-শিক্ষা করিতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শৈশবে শিশু যদি নিজেই বিভিন্ন কার্য্য করিতে শিক্ষা করে, যদি সেই জন্য কৃত্রিম যন্ত্রাদি ব্যবহার না করে, তাহা হইলে তাহার কার্য্য-ক্ষমতা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হইবে।

---

৭ নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই কেন কাঁদিতে থাকে, কাণ্ট বিভিন্ন স্থানে তাহার বিভিন্ন কারণ দেখাইয়াছেন:

(১) জননীর জঠরে অবস্থান কালে শিশু নিঃশ্বাস লয় না; কিন্তু জন্মের অব্যবহিত পরেই নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য তাহার রক্ত-প্রবাহের গতি হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া শিশুর দেহে বেদনার সৃষ্টি করে। (Lecture-notes on Education, S. 40).

(২) শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই যেন বুঝিতে পারে যে, সে আর তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবে না. এবং তখন যেন তাহার স্বাধীনতার দাবী জানাইবার জন্যই চীৎকার করে। (Anthropology, Ed. by Hartenstein, vii, P. 589)

(৩) শিশুর ক্রন্দন ক্রোধের প্রকাশক নহে, বরং উহা বিরক্তির প্রকাশক। (Anthropology, p. 652)

শিশুর অভিভাবকরা অনেক সময় শিশুকে নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন অভ্যাসের দাস করিয়া তুলেন। অভ্যাস করানর অর্থ হইল শিশুর জীবনকে যন্ত্রের ন্যায় স্বাধীনতা-বিহীন করিয়া তুলা[৮]। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।

শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা এই দুইটার কিরূপে সমন্বয় সাধন করা যাইবে সে সম্বন্ধে কাণ্ট বলিয়াছেন যে সকল ক্ষেত্রেই শিশুকে শাস্তির ভয় দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে—শিশুর ক্ষেত্রে "লাঠ্যৌষধি" প্রয়োগ করিলে সুফল অপেক্ষা কুফল পাইবারই সম্ভাবনা বেশী; কারণ এরূপ ক্ষেত্রে শিশু শাস্তির ভয়ে সত্যগোপন করিতে শিখিবে এবং তাহার সরলতা নষ্ট হইয়া যাইবে।[৯] তাহা ছাড়া, শিশুকে 'সভ্য-ভদ্র' করিয়া তুলিবার জন্য শিশুকে লজ্জা দেওয়া উচিত নহে। শিশু যাহাতে সরলভাবে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শিশুর সরল আত্ম-প্রকাশের পথে অযথা বাধা সৃষ্টি না করিয়া ধীরে ধীরে তাহাকে নিয়মানুগ করিয়া তুলিতে হইবে। আবার শিশুকে সর্বদাই অতিরিক্ত আদর দেওয়া উচিত নহে। ইহার ফলে শিশু পিতামাতা বা অন্য গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া ফেলিবে এবং সব কিছুই 'চোখের জলের' দ্বারা জয় করিবার চেষ্টা করিবে।[১০] এ কথা সত্য শিশুর মনে নৈতিক জ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, কিন্তু সর্বদাই শিশুর সকল আব্দার সহ্য করিলে ভবিষ্যৎ জীবনে কঠোর শাস্তির দ্বারাও তাহাকে আর সুপথে আনা যাইবে না। শিশুকে যখন ভবিষ্যতে কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হইতে হইবে, তখন সকল ক্ষেত্রেই সে সাফল্য লাভ করিবে

---

৮ কাণ্টের ভাষায়: "The more habits a man has, the less is he free and independent. It is the same with all other animals. He always retains a certain inclination for that to which he was early accustomed. The child must be prevented from habituating himself to anything, and he must not be allowed to form any habits". (*Lecture-notes on Education*, p. 44). কাণ্ট আবার নিজেই এই মতের কিছুটা বিরোধিতা করিয়া বলিয়াছেন: "The human being should also accustom himself to sleep certain hours..... it is very salutory to man if he *always* eats at a certain hour." (*Ibid*., S. 45).

৯ কাণ্ট বলেন: "It is very strange, for example, that parents should desire children to kiss their hands after having been punished with the rod. Children thus become trained to dissimulation and falsehood." (*Ibid*., S. 48).

১০ কাণ্টের ভাষায়: "Concession to all their fancies in early youth ruins their heart and manner." (*Ibid*., S. 51). চলতি ভাষায় আমরা যাহাকে 'আদর দিয়ে মাথা খাওয়া' বলি সে ব্যাপারে কাণ্টের মতে পিতা অপেক্ষা মাতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে দায়ী। তিনি বলেন: "Mothers usually spoil their children ... and pamper them generally ... The father, on the contrary, scolds and even whips them.". (*Ibid*., S. 52).

এমন আশা করা যায় না এবং ফলে ঐরূপ শিশু কখনও বা ক্রোধোন্মত্ত, কখনও বা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া পড়িবে।

শিশুর আবদার-রক্ষার ব্যাপারে যখন মধ্যে মধ্যে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইবে, তখন দেখিতে হইবে যেন অকারণ শিশুর ইচ্ছাশক্তি ব্যাহত না হয়।

শিশুকে শাসন করিবার জন্য অনেক সময় উদ্ভট বা বীভৎস জিনিষের ভয় দেখান হয়; যেমন, মাকড়সা, জুজু, ভূত ইত্যাদি। এরূপ করিলে শিশুর মনের সুগম প্রকাশের পথ বন্ধ হইয়া যায়।

সুখ ও দুঃখ, এই দুই অনুভূতির সাহায্যে শিশুর মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। শিশুকে এমন কতকগুলি খেলায় প্ররোচিত করিতে হইবে যাহাতে সে আনন্দলাভ করিতে পারে, আবার অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা দেহেরও পুষ্টি সাধিত হয়।[১১] সুতরাং খেলার নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খেলার অন্যতম উপকারিতা হইল যে, খেলার মাধ্যমে শিশু যেন নিজেকে কর্ম্মে নিয়োজিত করিতে শিক্ষালাভ করে এবং শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ক্রমশঃ তাহার শ্রদ্ধা জন্মে। কাণ্টের সমসাময়িক লেখক লিক্টেনবের্গ (Lichtenberg) ক্রীড়াচ্ছলে শিশুকে শিক্ষা দিবার প্রথাকে নিন্দা করেন—প্রকৃত কাজ না করিলে শিশুর শিক্ষালাভ হয় না। কাণ্ট এই মতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, শিশুকে কাজ করিতে শিক্ষা করিতে হইবে এবং খেলিতেও হইবে, অর্থাৎ ধীরে ধীরে সুষ্ঠুভাবে অবসর বিনোদনের অভ্যাস তাহাকে করিতে হইবে। মানুষ সহজেই কর্মবিমুখ ও অলস হইয়া পড়ে, সুতরাং খেলার মাধ্যমে শিশুকে প্রথম হইতেই কর্মক্ষম থাকিবার শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(চার)

বিদ্যালয়ে পাঠের উপকারিতার উল্লেখ করিয়া কাণ্ট বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয়ের সুশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে শিশু সংযম শিক্ষা করিতে পারিবে এবং তাহাদের মানসিক ক্ষমতার উন্মেষ হইবে। তাহা ছাড়া, অমনোযোগিতা ও কুঅভ্যাস গঠনের সম্ভাবনা তিরোহিত হইবে।

মানসিক শক্তির উন্মেষ প্রসঙ্গে কাণ্ট বলিয়াছেন যে, মানসিক ক্ষমতাগুলি পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন নহে; আবার সকল ক্ষমতা বা প্রবৃত্তিই সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে, সেজন্য সকল প্রবৃত্তির উন্মেষ বাঞ্ছনীয় নহে। স্মৃতি ও বিচারশক্তি সমপর্য্যায়ভুক্ত

---

১১ দেহের গঠনের সহায়তা করে এমন কতকগুলি ক্রীড়া সম্বন্ধে কাণ্ট বলেন: "Running is a healthier movement ... Leaping, lifting, carrying, hurling, throwing at a mark, racing and all such exercises are excellent (*Ibid.*, পৃ. 59).

নহে ; বিচার ও বুদ্ধিশক্তির যদি উন্নয়ন না হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র স্মৃতির প্রাখর্য্য লইয়া কী হইবে ? উপন্যাস পাঠ বালকবালিকাদের মনের পক্ষে ক্ষতিকারক—কারণ উপন্যাস পাঠে তাহারা নিজেদের পরিকল্পিত মনোরাজ্যে বিচরণ করে এবং দিবাস্বপ্নে কাল অতিবাহিত করে।[১২]

বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে কাণ্ট বলিয়াছেন যে, প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, খনিজবিদ্যা এবং সাধারণ প্রকৃতি-পরিচয় শিক্ষা করা উচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কবিদ্যা ও গণিত শিক্ষা করা কর্তব্য। জ্ঞান ও শক্তির সমন্বয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং এই কার্য্যের জন্য গণিত সমধিক উপযুক্ত।[১৩] ইহার সঙ্গে আবার ভাষাও শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে কাণ্ট বলিয়াছেন যে অমনোযোগিতাই শিক্ষার প্রধান শত্রু ; কারণ মনোযোগিতা না থাকিলে স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয় না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল মনের কৃষ্টিসাধন ; এইজন্য দৈহিক (physical) এবং নৈতিক দুইটী পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন মনোযোগ, শিক্ষণ ও অভ্যাস। যুক্তিশক্তি পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য সক্রেটিসের পন্থা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

নৈতিক শিক্ষাদান নৈতিক উপদেশ ও প্রবচনের মাধ্যমে হওয়া উচিত—শাস্তির সাহায্যে নৈতিক শিক্ষা দান করা যায় না। নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন গুরুজনকে মান্য করা, সত্যবাদিতা (veracity) এবং সামাজিকতাবোধ (sociability)। তাঁহার নীতিবিদ্যায় তিনি নৈতিক আদর্শের কঠোর অনুশাসন অনুসারে চলিবার উপদেশ দিয়াছেন এবং এই কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বে। মিথ্যাবাদিকে কোন প্রকারেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে এবং অনেক বালক-বালিকারই কৌশলে মিথ্যা বলিয়া বাহবা পাইবার যে ইচ্ছা আছে তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ করিতে হইবে।[১৪] সামাজিকতাবোধ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহা দেখিতে

১২ কাণ্টের ভাষায়: "Novel-reading is most injurious to children. ... Such reading weakens the memory ... all novels should be taken out of the hands of children" (*Ibid.*, S. 69 .

১৩ কাণ্ট বলেন : "...... we must try to effect a gradual union of knowledge and power. Among all the sciences, mathematics appears to be the one which best accomplishes this purpose." (*Ibid.*, S 70).

১৪ কাণ্ট এই প্রসঙ্গে মাতৃত্বের একটি দুর্ব্বলতার ইঙ্গিত করিয়াছেন : "It is the father's affair to see to it that they break off this habit (of lying), for mothers usually consider it a

হইবে, কারণ শৈশবে পরস্পরের মধ্যে সৌখ্যভাব না থাকিলে ঈর্ষ্যা, ঘৃণা ইত্যাদি মনোভাবের সৃষ্টি হইবে। শিশুরা যাহাতে সহজ, সরল অন্তঃকরণে সকলের সহিত মেলামেশা করিতে পারে তাহাই বাঞ্ছনীয়। প্রকৃত নৈতিক শিক্ষা লাভ করিলে শিশু ক্রমশঃ স্বেচ্ছায় নৈতিক কার্য্য করিবে এবং তখন এ বিষয়ে আর বাধ্যবাধকতার বোধ (sense of compulsion) থাকিবে না।

শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ চরিত্র গঠন। মানুষ স্বভাবতঃ ভালও নয় মন্দও নয় এবং এইজন্য প্রয়োজন নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে তাহার চারিত্রিক উন্নতিসাধন; উপযুক্ত সময়ে নৈতিক শিক্ষা না হইলে শিশুর মন্দপথে যাইবার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। নৈতিক শিক্ষার সম্পূর্ণতার জন্য ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন। তবে কান্টের মতে কেবলমাত্র ধর্মের গোঁড়ামি সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয় নহে; ধর্ম বলিতে বাহ্য আচারের অনুশাসন মনে করা উচিত নহে। নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা হয়।[১৫] যেমন, নৈতিক শিক্ষা বলিতে ধর্মের বাহ্য আচার নহে, সেইরূপ নৈতিক শিক্ষার সহিত তত্ত্ববিদ্যাসম্বন্ধীয় শিক্ষাকেও মিশাইয়া ফেলা উচিত নহে।[১৬]

(পাঁচ)

আমরা উপরে শিক্ষা সম্বন্ধে কান্টের বক্তৃতামালা হইতে তাঁহার মতের ইঙ্গিত করিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি, কাণ্ট শিক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করেন নাই; সেইজন্য তাঁহার মতের কোন সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নহে।

তবে আমরা তাঁহার যে সমস্ত মতবাদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে দেখিতে পাই যে অনেক আধুনিক মতবাদের পূর্বসূচনা তাঁহার বক্তৃতায় পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ফ্রোয়েবেল, মণ্টেসরি, ডিউই ইত্যাদি আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ববিশারদগণের সহিত তাঁহার মতের অনেকাংশে মিল আছে।

thing of no, or at least very small importance; they even look upon it as a flattering proof of the superior talents and capacities of their children." (*Ibid*, S. 87).

১৫ কাণ্টের ভাষায়: "The religion which is founded merely upon theology can never contain anything moral ... Morality must precede, theology follow, and then we have religion." (*Ibid.*, S. 105).

১৬ কাণ্ট বলিয়াছেন: "All instruction in morals in lecture-halls, from the pulpit, and in popular books becomes ridiculous when it is dressed out with metaphysical odds and ends."

আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ববিশারদগণের ন্যায় কাণ্ট মনে করেন যে, শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিবার কোন বিশেষ বয়ঃক্রম নাই। এক হিসাবে শিশুর জন্মের সহিত তাহার পরিচর্য্যার মাধ্যমেই তাহার শিক্ষা সুরু হয়, ইহা কাণ্ট বলিয়াছেন। আবার ক্রীড়াচ্ছলে শিক্ষাদান, শিক্ষাদানকালে প্রহার ও তিরস্কার পরিবর্জন, সহজ প্রবৃত্তি-গুলির সুষ্ঠু প্রকাশের ব্যবস্থায়, নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক আধুনিক মতবাদের ইঙ্গিত আমরা কাণ্টের আলোচনার মধ্যে পাই।

(ছয়)

কাণ্টের নিজস্ব মতবাদ গঠনে যে সমস্ত দার্শনিকের রচনা কাণ্টকে প্রভাবিত করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে জঁা জাক রুশোর (Jean Jacque Rousseau) নাম সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।[১৭] সাধারণতঃ রুশোকে 'স্বভাববাদী' (naturalist) বলিয়া অভিহিত করা হয় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, রুশোর দৃষ্টিভঙ্গী কাণ্টের বিপরীত। কিন্তু রুশো যে অর্থে 'স্বভাব' বা 'প্রকৃতি' (nature)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা কেবলমাত্র কৃত্রিম সামাজিক পরিবেশের কঠোর বন্ধনের বিরুদ্ধতার ইঙ্গিত করে। রুশো যখন আদিম প্রাকৃতিক অবস্থার জয়গান করিলেন, তখন তাহার অর্থ নহে যে তিনি উচ্ছৃঙ্খল, নীতি-বিহীন কোন অবস্থাকে সমর্থন করিলেন। রুশো নৈতিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা এবং তৎসহ যুক্তি ও বিবেকের অবদান অস্বীকার করেন নাই।[১৮] বাস্তবিক তিনি এমিল্ (Emile)-এর যে শিক্ষা-ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছেন, তাহাতে নৈতিক সংযম শিক্ষার উপর প্রাধান্য অর্পণ করিয়াছেন।

কাণ্ট ও রুশোর মতবাদ তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাণ্ট যেমন নৈতিক কার্য্যের সার্বিকতা বা বিশ্বজনীনতা (universality)-এর উপর গুরুত্ব আরোপ

---

১৭ এইরূপ শুনা যায় যে কাণ্ট তাঁহার জীবনে মাত্র একদিন তাঁহার দৈনন্দিন ভ্রমণের জন্য বাহির হন নাই, এবং সেই দিনটি হইল যেদিন তিনি রুশোর 'Emile' শীর্ষক পুস্তকটি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন—পুস্তকটি পাইয়া কাণ্ট এমনই তন্ময় হইয়া পড়িতে সুরু করেন যে উহা শেষ না করিয়া তিনি উঠিতে পারেন নাই!

রুশোর নিকট তাঁহার ঋণ স্বীকার করিয়া কাণ্ট বলেন: "There was a time when ...... I despised the common people who knew nothing. Rousseau has set me right".

১৮ তুলনীয়: ... "Rousseau's doctrine is not in the philosophical sense naturalistic. Nature for him is not opposed to reason or spirit but to convention, typified by society as he conceived it." (Rusk, *Philosophical Bases of Education*, p. 188). আবার: "Of Rousseau, indeed, ... it might be said that he made morality the end of education" (*Ibid*., p. 119).

করিতেন, রুশোও সেইরূপ বলিতেন যে, যিনি ধার্মিক তাঁহার ব্যক্তিগত বিশেষ ইচ্ছা (particular will)-এর সহিত সাধারণ ইচ্ছা (general will)-এর মিল থাকিবে। কাণ্ট যেমন বাসনা, কামনা, আবেগ ইত্যাদির প্রভাব হইতে 'শুদ্ধ ইচ্ছা' (pure will)-কে মুক্ত রাখিতে চাহিতেন, সেইরূপ রুশোও বাসনা-কামনার দাসত্বকে নিন্দা করিয়াছেন।[১৯] আবার কাণ্ট যেরূপ মনে করিতেন যে, ধর্মের 'পুরস্কার' উচ্চতর পবিত্র সুখ বা তৃপ্তি (happiness), সেইরূপ রুশোও বলিতেন যে, আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়সুখের (pleasure) অন্বেষণ করিলে প্রকৃত সুখ (happiness) পাইব না।

(সাত)

যাহা হউক, শিক্ষা সম্বন্ধে কাণ্টের মতবাদের সুসংবদ্ধ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কাণ্টের মতবাদের মধ্যে এমন অনেক মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে যাহা শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীকে মার্জিত করিতে পারে।

১৯ রুশোর ভাষায়: "The mere impulse of appetite is slavery, while obedience to law which we prescribe to ourselves is liberty" (*Social Contract*, p. 19).

কথার কথা

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে দেখা গেল যে ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। পরবর্তী পর্বে পরাবিজ্ঞানে অবিশ্বাস ঠিকই রহিল, বরং আরও প্রবল হল, যদিও আদর্শ ভাষার বিশ্বাস, তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত করে এমন কোন ভাষায় বিশ্বাস, ক্ষীণ হতে হতে ক্রমে লুপ্ত হয়ে গেল। এই দ্বিতীয় পর্বের রূপান্তরের কথা বলতে হলে আদর্শ ভাষা সম্পর্কে কিছু বলতে হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে লৌকিক ভাষার দুটি দোষের, অনুপযুক্ত ব্যাকরণ শাসিত হওয়া এবং সংকুচিত সংকেত বহুল হওয়া নামক দোষ, দুটির কোনটিই আদর্শ ভাষায় থাকবে না। আদর্শ ভাষার ব্যাকরণ গণিতিক ন্যায়, এবং এতে কোন সংকুচিত সংকেতও নাই। এই ভাষায় তেমন সংকেতই আছে যা সংকেতিত করে কল্পনাদি মুক্ত সহজ অনুভবে উদ্ভাসিত পদার্থকে। সুতরাং দ্রব্য বাচক সংকেত এ ভাষায় স্থান পাবে না তেমনি জাত্যাদিবাচক সংকেতও পাবে না। জাতি অভাব প্রভৃতি পদার্থ সম্পর্কে, সকল বিশ্লেষণ পন্থী দার্শনিক অবশ্য একমত নন। লর্ড রাসেল জাতি এবং আরও অনেক প্রকার পদার্থ অঙ্গীকার করেন। তারা যে সাক্ষাৎকৃত হয় এ কথাও বলেন। জাতি, অভাব (negative facts) প্রভৃতির সংকেত ঘটিত বাক্যকে যে কোন অধিক মৌলিক বাক্যে বিশ্লেষিত করা যায় না এমন কথাও বলেন। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্লেষণপন্থী দার্শনিক ভিন্ন মত পোষণ করেন। আসলে, বিশ্লেষণী দর্শনের মূলে রয়েছে প্রত্যক্ষবাদ, (empiricism)। লর্ড রাসেলে এই প্রত্যক্ষবাদ উপস্থিত থাকলেও, তাঁর মনে গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছে গাণিতিক ন্যায়। আদর্শ ভাষা নির্মাণ করে তিনি প্রথমে সাহায্য নিয়েছেন গাণিতিক ন্যায়ের, ভাষার ব্যাকরণ স্থির করেছেন প্রথমে। তারপর শব্দ সম্ভারের অনুসন্ধানে উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যক্ষবাদের দ্বারে। কিন্তু ভিৎগেনষ্টাইন প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের অন্যান্য দার্শনিকদের কথা একটু আলাদা। তাঁদের মনে গভীরতর প্রভাব বিস্তার করেছে প্রত্যক্ষবাদ। তাঁরা প্রথমে প্রত্যক্ষবাদী পরে গাণিতিক নৈয়ায়িক, বিশ্লেষণপন্থী দার্শনিক। গাণিতিক ন্যায় হতে ভাষার শব্দ সম্ভার সংগ্রহের জন্য তাঁরা প্রত্যক্ষবাদে আসেন নাই। প্রত্যক্ষবাদকেই আরও দৃঢ় করিবার জন্য যে জাতীয় পদার্থ প্রত্যক্ষবাদে বহির্ভূত

অনুপপত্তির সৃষ্টি করে সেই সব পদার্থকে অপনীত করবার জন্য, তাদের প্রত্যক্ষবাদ অনুকূল উপপত্তি দেবার জন্য আশ্রয় নিয়েছেন গাণিতিক ন্যায়ের। এঁদের কাছে ভাষার শব্দ সম্ভার এসেছে আগে, এবং এই শব্দ রাশির মধ্যে জাত্যাদির সংকেত নাই—তার পরে এসেছে ব্যাকরণ, যার সাহায্যে এই সব সংকেত ব্যবহারের একটি সহজ উপপত্তি দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং আদর্শ ভাষা প্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে যে এই ভাষায় জাত্যাদির সংকেত থাকবে না। জাত্যাদির সংকেত বলতে কেবল নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতিকে বুঝলেই হবে না। নীল, পীতাদিকেও বুঝতে হবে। নীল পীতাদি শব্দের শক্তি ব্যক্তিতে নাই, আছে জাতিতে, নীলত্ব, পীতত্ব প্রভৃতিতে। এরাও ব্যক্তি বাচক নয়। ইংরাজী ব্যাকরণ অনুযায়ী এরা জাতিবাচক বিশেষ্য common-noun। 'নীল' কে ব্যক্তিবাচক করতে হ'লে 'এই' 'ওই' প্রভৃতি নির্দেশমূলক অঙ্গ-ভঙ্গী সহকৃত হলেই সার্থক হয় এমন সংকেত ব্যবহার করতে হবে। তারপর লেখ্য ভাষায় 'এই নীল' না লিখে নীল কালিতে 'এই' লিখলেই চলে যাবে, 'নীল' শব্দের ব্যবহারের কোন প্রয়োজন অনুভূত হবে না। কথ্য ভাষায় অবশ্যই নীল কালি ব্যবহার করা চলবে না। এবং আঙুলে নীল রং মাখিয়ে নির্দেশ করেও তেমন কিছু লাভ হবে না। অনুভূত তথ্যের রং যদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হতে থাকে, অথবা বিভিন্ন রূপ যদি অবিচ্ছেদে অনুভবে উদ্ভাসিত হতে থাকে তাহলে কত রং আঙুলে মাখব ? রূপ ভিন্ন তথ্যের ক্ষেত্রেই বা কি কৌশল অবলম্বন করব? তাই 'নীল' শব্দটি রাখতে হয়। কিন্তু এর দ্বারা বুঝতে হবে কোন জাতিকে নয়। শব্দটি প্রথমে সংকে-তিত করবে অনুভবে উদ্ভাসিত কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে, তারপর অবশ্য বিধেয় রূপে ব্যবহৃত হয় বলে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে সংকেতিত না করে করবে যে কোন ব্যক্তিকে। আসলে, আমরা অনেকেই একই সংকেত ব্যবহার করি, এবং মনে করি একই পদার্থকেই সংকেতিত করে বুঝি। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অনুভূত পদার্থকেই সংকেতিত করতে হবে। আমার অনুভূত পদার্থ আমার অনুভবে ভাসমান পদার্থ, ঠিক অপর কারও অনুভবে ভাসমান পদার্থ নয়, হতে পারে না অনুভবের এই অত্যাজ্য স্বকেন্দ্রিকতা সর্ববাদিসিদ্ধ। তাই আমার চেতনায় উপস্থিত নীলাদি পদার্থ অপরের চেতনাতে উপস্থিত নীলাদি পদার্থ এক নয়। আমার ব্যবহৃত 'নীল' সংকেত এবং অপরের ব্যবহৃত 'নীল' সংকেতও একই পদার্থকে সংকেতিত করে না। 'নীল' শব্দটি ব্যবহার কালে আমি যা বুঝি, বোঝাতে চাই অপরে তা বোঝে না, বোঝাতেও চায় না। "নীল পীতাদি" সংকেতও তাই আদর্শ ভাষায় স্থান লাভ করলে, বিধেয়াংশে স্থান লাভ করলে, সে কাজ করতে পারবে না, যে কাজ এরা লৌকিক ভাষায় করে থাকে।

'সক্রেটিস' প্রভৃতি লৌকিক ভাষায় ব্যক্তি বাচক, উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত সংকেত সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। সূক্ষ্ম বিচারে সক্রেটিস' কোন ব্যক্তির নাম নয়। জন্ম থেকে সুরু করে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে অসংখ্য সক্রেটিস ব্যক্তির ধারা মোটামুটি অবিচ্ছেদে প্রবাহিত হয়েছে সেই ধারাকে অথবা সেই ধারায় মধ্যে কোন ঐক্য কল্পনা করে সেই ঐক্যকে অথবা সেই অসংখ্য ধারার ঘটক ব্যক্তির সমাহারকে আমরা সক্রেটিস বলে থাকি। সক্রেটিস-আদি নামও প্রকৃত ব্যক্তিবাচক নাম নয়। ন্যায়সিদ্ধ ব্যক্তিবাচক নাম (logically proper name) 'এই', 'সেই' প্রভৃতি সংকেত। এরাই অনবিচ্ছিন্ন নির্ধর্মা, বিশুদ্ধ বিশেষকে সংকেতিত করতে পারে, এবং এরূপ বিশেষই তত্ত্ব, এরাই বস্তু। জাত্যাদি অলীক। আদর্শ ভাষায় থাকবে কেবল 'এই', 'সেই', এবং এদের মতন অন্যান্য সংকেত।' এবং যেহেতু সংকেতিতরা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অনুভবে ভাসমান বিশেষ ব্যক্তি, অন্ততঃ উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত সংকেত সংকেতিতরা তাই, এবং অনুভব স্বকেন্দ্রিক, সেই হেতু এই ভাষারও স্বকেন্দ্রিকতা অত্যাজ্য। দৈনন্দিন জীবনে ভাষাকে আদান প্রদানের উদ্দেশ্য, নিজেকে বিস্তৃত করবার উদ্দেশ্যে, অপরের মনে প্রবেশ করবার উদ্দেশ্যে, ব্যবহার করা হয়। এই ভাষা লৌকিক ভাষা। আদর্শ ভাষায় একাজ করা যাবে না। কিন্তু সেজন্য দমলে চলবে না। খেয়াল রাখতে হবে ' the needs of logic are so extra-ordinarily different from the needs of daily life' ন্যায়ের দাবী লোক ব্যবহারের দাবী হতে সম্পূর্ণ বিজাতীয়। বস্তুতঃ এই আদর্শ ভাষার উদ্দেশ্য তত্ত্ব নির্ণয়, লৌকিক প্রয়োজন মেটানো নয়, এর ব্যবহারেও যখন তখন হয় না, হয় State-occasion এ, মনন মহোৎসব লগ্নে। এ ভাষা আটপৌরে নয়, পোষাকী।

তবু দমে যেতে হয়, আদর্শ ভাষার মহিমা সম্পর্কে, ন্যায়ের কঠোর দাবী সম্পর্কে যত কথাই বলা হ'ক না কেন, এ ভাষায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখা বেশী দিন যায় না, এ ধারণা মন থেকে যায় না, যেতে চায় না, যে আদর্শ ভাষা নির্মাণ প্রচেষ্টা এক প্রকার বাতিক। প্রকৃত পক্ষে এই ভাষাকে যে কেন ভাষা বলা হবে, তা বুঝতে পারা যায় না। ভাষার প্রাথমিক কর্তব্য আদান-প্রদানে, পারস্পরিক বোঝাবুঝির ব্যাপারে সাহায্য করা। ভাষা একটি সামাজিক জিনিষ। সমাজের বাইরে ভাষা আছে বলে শোনা যায় না। সমাজে যে ভাষা পুষ্টি পায় তাও দেখা যায়। পুষ্ট ভাষা যে সমাজকে আরও পুষ্ট হতে, সামাজিক হতে সাহায্য করে, তাও দেখা যায়। বস্তুতঃ একান্ত স্বকেন্দ্রিক ভাষাকে ভাষা বলাই অনুচিত। আদর্শ ভাষা সমাজের জিনিষ নয়। লৌকিক সমাজেরও নয়, পণ্ডিত সমাজেরও নয়। এ ভাষা বোবাকালারও নয়, সর্বজ্ঞের

নয়। এ একান্ত স্বকেন্দ্রিক জিনিষ, একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার, এই ব্যক্তিত্ব আবার অতি পরিবর্তনশীল। একে ভাষা বলা ভাষা শব্দের অপব্যবহার করা। 'ভাষা' শব্দের ব্যবহার তখনই করা যায় যখন বৃদ্ধ ব্যবহারের দ্বারা সামাজিক ব্যবহারের দ্বারা, শব্দের শক্তিগ্রহ হয়। একান্ত ব্যক্তিগত ভাষার সংকেত সমূহের শক্তিগ্রহ যে কিভাবে হবে, কোন বস্তুকে কোন সংকেত সংকেতিত করে এ যে কিভাবে বোঝা যাবে, তা বুঝতে পারা যায় না। 'ভাষা' শব্দ যা সংকেতিত করে তার সঙ্গে আদর্শ ভাষার কোন সাদৃশ্যই নাই। ভাষাত্ব বলে কোন ধর্মের ধর্মী বলে একে মনে করা যায় না। এর ব্যাকরণ, গাণিতিক স্যায় এবং সব ভাষারই ব্যাকরণ স্যায়, এই টেবিল চাপড়ানো যুক্তি উপস্থিত করলেও না। কারণ, এই যুক্তির সাহায্যে যদি আদর্শ ভাষার ভাষাত্ব সিদ্ধ হয়, তাহলে ভাষার ব্যাকরণ স্যায়ই, এই প্রতিজ্ঞার অযাথার্থ্যও সিদ্ধ হতে পারে। আদর্শ ভাষা প্রীতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এর সপক্ষে একশো এক মোক্ষম যুক্তি থাকলেও না।

আর বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে এর সপক্ষে একটিও নির্দোষ যুক্তি নাই। ভাষা শব্দের অনুভব গৃহীত অর্থে আদর্শ ভাষাকে ভাষা বলা চলে না। একে ভাষা বলা হয় মাত্র একটি মনন সর্বস্ব যুক্তির সাহায্যে। এই যুক্তির মূলে রয়েছে এই বিশ্বাস যে সাধারণ ভাষার ব্যাকরণ এরিষ্টটলের স্যায়, এবং এই স্যায়ের বিস্তার, পরিণতি ও প্রতিষ্ঠা গাণিতিক স্যায়ে। কিন্তু এই বিশ্বাসটি সত্য না হতেও পারে। বিশ্লেষণী দর্শনের তৃতীয় পর্বে এই বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে হয় নাই। আমরা এখন দ্বিতীয় পর্বের প্রারম্ভে। তাই ঐ আলোচনা এখন স্থগিত রাখতে হয়। যে কথাটি দ্বিতীয় পর্বে প্রাধান্য পেয়েছিল এবং যার জন্য দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরা ভাষায় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয় একথা অস্বীকার করেছিলেন সেই কথাটিই এখন বলতে হয়। এই দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরা নিজেদের নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদী (logical empiricist) বলতেন যেমন বলতেন প্রথম পর্বের দার্শনিকরা নিজেদের নৈয়ায়িক পরমাণুবাদী (logical atomist)। এই দুটি নামই আমরা এখন থেকে যখন ব্যবহার করলে সুবিধা হবে, তখন ব্যবহার করব। যাই হোক, নৈয়ায়িক প্রত্যক্ষবাদীদের মতেও ভাষা ক্যাল্‌কুলাস্ বিশেষ। আসলে ভাষাকে এক প্রকার ক্যালকুলাস্ বলে মনে করা এবং সমীকরণতান্ত্রিক বিশ্লেষণে বিশ্বাস করারই আর একটি দিক। প্রত্যক্ষবাদীরা বিশ্লেষণের প্রকৃতি সম্পর্কে পরমাণুবাদীদের মতই গ্রহণ করতেনই। তাঁরা বিশ্লেষণ বলতে বুঝতেন বিশ্লেষ্য ও বিশ্লেষণকে সমীকরণ ভিন্ন রীতিতে পরিবেশন

কল্প। তাই ভাষাকে ক্যাল্‌কুলাস্‌ বিশেষ বলেও তাঁরা মনে করতেন। সুতরাং ভাষার ব্যাকরণ যে ন্যায় এবং আদর্শ ভাষার ব্যাকরণ যে গাণিতিক ন্যায়, একথাও তাঁরা মানতেন। কিন্তু গাণিতিক ন্যায় সম্পর্কে তাঁরা কিছু ভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। পরমাণুবাদীরা PM গ্রন্থে যে ক্যাল্‌কুলাস ব্যবহৃত হয়েছে, যে শব্দ সত্তার বিযুক্ত বিশুদ্ধ ব্যাকরণ ব্যবহৃত হয়েছে, সেই ব্যাকরণকেই আদর্শ ভাষার ব্যাকরণ বলে মনে করতেন। তাঁরা আরও মনে করতেন বিকল্প ব্যাকরণ নাই, অন্য প্রকার ক্যালকুলাস্‌ হয় না। কিন্তু এই ধারণা যে অমূলক তা দেখা গেল। দেখা গেল বিকল্প ক্যালকুলাস নির্মাণ সম্ভব। সুতরাং, ইউক্লিডীয় ও অ-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মধ্যে কোন একটিকে যেমন অতিরিক্ত প্রমাণের অভাবে বাস্তব দেশের শাস্ত্র বলে মনে করা যায় না, ঠিক তেমনি বহুবিধ গাণিতিক ন্যায়ের মধ্যে, ক্যালকুলাসের মধ্যে কোন একটিতেই যে তত্ত্বের আকারের ইঙ্গিত বিদ্যমান, একথাও মনে করা যায় না। আদর্শ ভাষা একটি নয়, এক প্রকারও নয়—বিভিন্ন প্রকারের আদর্শ ভাষা নির্মাণ সম্ভব। এবং তাদের মধ্যে কেবল একটিই খাঁটি আদর্শ ভাষা এবং তাতেই তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, আদর্শ-ভাষা-জিজ্ঞাসা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার প্রামাণিক অর্থে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, একথা নিষ্প্রমাণ।

প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষবাদ-অনুবিদ্ধ-বিশ্লেষণী-দর্শন এবং তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, অর্থাৎ পরাবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা অহি-নকুলের সম্বন্ধের মত। নৈয়ায়িক পরমাণুবাদীরা একথা বুঝতে চান নি। তাঁরা ভেবেছিলেন মনন সর্বস্ব পরাবিজ্ঞান, অনুমানৈকগম্য সত্তায় বিশ্বাসী পরাবিজ্ঞান সম্ভব নয়। কিন্তু তাঁরা যেরূপ পরা-বিজ্ঞান করেন তা সম্ভব। এরূপ মনে করার হেতু ছিল তাঁদের আদর্শ ভাষা বিষয়ক মতটির এবং তাঁদের সকল মতের ভিত্তিরূপ প্রমাণ বিষয়ক মতটির মূলে ছিল একটি পরাবৈজ্ঞানিক মত। অর্থাৎ তাঁদের আদর্শ ভাষায় দুরকমের বাক্য, আণবিক এবং পরমাণবিক বাক্য, স্বীকৃত হয়। কিন্তু পরমাণবিক বাক্য স্বীকারে যুক্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেক সময় বলা হয়েছে যে পরমাণবিক বাক্য একান্ত সরল। এই উত্তর যে সদুত্তর নয়, প্রকৃতপক্ষে একটি জিজ্ঞাসা মাত্র, তা সামান্য বিবেচনা করলেই দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ একান্ত সরল বলতে কি বুঝব? কোনও সংকেতকে যখন সরল সংকেত বলা হয় তখন তার মানে বোঝা যায়। এই সংকেতটি অনুভূত পদার্থকেই যে সংকেতিত করে অর্থাৎ সংকেতটি যে একটি অসংকুচিত সংকেত, একথা বুঝলেই চলে। কিন্তু বাক্যকে সরল বললে তা বোঝা যাবে না। আদর্শ ভাষার কোন বাক্যই তত্ত্ব-জ্ঞাপক নয়। তাই বলে

অর্থে যদি তথ্য জ্ঞাপক, তথ্য প্রতিবিম্ব বোঝা হয়, তাহলে আণবিক পরমাণবিক সব বাক্যই সরল বাক্য হবে, এবং বৈবিধ্য স্বীকারের আর কোন হেতু থাকবে না। উপরন্তু একটি বাক্য মিথ্যা হতে পারে। সকল বাক্যই সত্য নয়। তাই বাক্যকে তথ্যের নাম বলা যায় না। সেইজন্য সংকেতের সারল্যের দৃষ্টান্তে বাক্যের সারল্য বোঝা যায় না। সরল বাক্য বলতে তথ্যের প্রতিবিম্বরূপ বাক্য বোঝা চলে না। অন্য কিছু বুঝতে হয়। বুঝতে হয় এমন বাক্য যার নৈয়ায়িক মর্যাদা অন্য কোন বাক্যের নৈয়ায়িক মর্যাদার উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এই বোঝাতেও কিছু গোল আছে। একটি বাক্য অন্য বাক্য সাপেক্ষ কিনা, এই প্রশ্নটি অবশ্য মানস বিজ্ঞান ঘটিত প্রশ্ন নয়, নৈয়ায়িক প্রশ্ন। তাই মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে পরমাণবিক বাক্য নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠেই না। ঐতিহাসিক বিচারে মনোজীবনের ইতিহাসের প্রথম পাতার প্রথম বাক্যটিকে সর্বথা প্রাথমিক বাক্য, আদিমতম বাক্য বলা যায়। কিন্তু নৈয়ায়িক বিচারে যায় না। আমাদের অভিপ্রেত অর্থে ঐ বাক্যকে সর্বথা প্রাথমিক বাক্য বলা যাবে না। প্রশ্নটিকে নৈয়ায়িক প্রশ্ন বলেই বিবেচনা করতে হবে। পরমাণবিক বাক্য বলতে এমন বাক্য বুঝতে হবে যা নৈয়ায়িক বিচারে একান্ত নিরপেক্ষ। কিন্তু এরূপ বাক্য অসম্ভব। ন্যায় এক প্রকার নয়, বহু প্রকার, অন্ততঃ বহু প্রকারের হতে পারে। সমান্তরাল রেখার প্রকৃতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বাক্য স্বীকার পূর্বক বহু প্রকার জ্যামিতি নির্মাণ সম্ভব। তেমনি, বিরোধ-বাধক নীতি, অথবা তাদাত্ম্য নীতি, অথবা এরিস্টটলীয় ন্যায়ের যে কোন মৌলিক নীতি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী বাক্য অঙ্গীকার করে বহুপ্রকার ন্যায়ও নির্মাণ করা যায়। ন্যায় যদি চিন্তার শাস্ত্র হত, তাহলে বহু প্রকার ন্যায় নির্মাণ করা সম্ভব হত না। কিন্তু ন্যায় চিন্তার শাস্ত্র নয়। গণিতের মত বিশুদ্ধ, বিমূর্ত, আকারৈকধর্মী সংকেতের শাস্ত্র—বহু প্রকার ন্যায় নির্মাণ সম্ভব। সুতরাং কোন একটি বিশেষ প্রকারের ন্যায়ে যে আকারের বাক্য প্রাথমিক বলে স্বীকৃতি পাবে, বিজাতীয় ন্যায়ে সেই আকারের বাক্য এই স্বীকৃতি নাও পেতে পারে।

আসলে নৈয়ায়িক নিরপেক্ষতা এক প্রকার মনন সর্বস্ব জিনিষ। এর নির্ণয়ে অনুভবের, মনোজীবনের ইতিহাস আলোচনার কোন স্থান নাই। এই মননের পথ অনৃজু, কুটিল, মূলক্ষয়কারী। তাই অনেক বিচারের পর কোন বাক্যকে যখন পরমাণবিক বলে স্বীকারও করা হয় তখন এ সন্দেহ থেকে যায় যে আরও কিছু বিচার করলে, কোন ভিন্ন বিচার-কৌশল প্রয়োগ করলে, উন্নত বিচার-শৈলী

অবলম্বন করলে এই বাক্যটিকেই অ-পরমাণবিক, অন্য বাক্য সাপেক্ষ বাক্য বলে দেখান যেতে পারত। সুতরাং পরমাণবিক বাক্য বলতে সর্বথা প্রাথমিক বাক্য, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বাক্যও বোঝা যায় না।

অসন্দিগ্ধ, স্বতঃসিদ্ধ বাক্যকেই যে পরমাণবিক বাক্য বলব তাও হবে না। কারণ এই অসন্দিগ্ধতাকে, স্বতঃসিদ্ধিকে নৈয়ায়িক হতে হবে, মনোবৈজ্ঞানিক হলে হবে না। অভ্যাস দশায় উৎপন্ন জ্ঞান অসন্দিগ্ধই হয়ে থাকে, কিন্তু এই জ্ঞান যে বাক্যে আকার পায় সেই বাক্যকে আমরা অসন্দিগ্ধ বলতে পারি না। এই বাক্যে সন্দেহের অভাব বাক্যটি প্রামাণিক কি না, এই জিজ্ঞাসার অভাব, অভ্যাস, সংস্কার প্রভৃতির মহিমাই প্রমাণিত করে, বাক্যের নয়। তাই অসন্দিগ্ধতাকে, স্বতঃসিদ্ধিকে নৈয়ায়িক হতে হবে। কিন্তু কিরূপ বাক্য নৈয়ায়িক অসন্দিগ্ধতাশালী, তার কোন নৈয়ায়িক নিরিখ দেওয়া সম্ভব নয়। যে বাক্যকে কোন মতেই সন্দেহ করা যায় না সেই বাক্যকেই যে এরূপ বাক্য বলব তা হবে না। কারণ 'কোন মতেই' বলতে যদি লোক ব্যবহার, লোক যাত্রাকে না বুঝি, তাহলে সকল বাক্যকেই সন্দেহ করা যায়। সন্দেহ করার ফলে যদি ব্যাঘাত হয়, অনিষ্ট হয়, তাহলে সন্দেহ বন্ধ করার কথা উঠতে পারে। কিন্তু লোক ব্যবহারাদিকে বর্জন করলে, সপক্ষ বলে কোন পক্ষ না থাকলে ব্যাঘাতাদি আশঙ্কার কথা ওঠে না। 'এটা কাক' এই বাক্যটিকে সন্দেহ করা যায়। এটি কালো রং-এর কিছু, একেও যায়। আমি কালো রং দেখছি, এখানে সন্দেহ থাকে না যদি অনুব্যবসায়ে ভ্রান্তি থাকা সম্ভব নয়, এই মত স্বীকার করা হয়। কিন্তু অনুব্যবসায়ে ভ্রান্তি থাকবে না, একথা ন্যায়সম্মত স্বতঃসিদ্ধ কথা নয়। বিশেষতঃ বাক্যাকারে প্রকাশিত হওয়ার অর্থ শ্রেণীকরণ, শব্দ-স্মরণ প্রভৃতি বিবিধ বৌদ্ধিক পাকে পক্ব হওয়া, এবং তাতে ভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই বাক্যটিকে অভিজ্ঞতালব্ধ ভূয়োদর্শনে প্রতিষ্ঠিত বাক্য বলেই মনে করতে হয়; সুতরাং অসন্দিগ্ধ বলে মনে করা যায় না। তাছাড়া, আমি কালো রং দেখছি, এই বাক্য জ্ঞানাংশে অসন্দিগ্ধ হতে পারে, কিন্তু বর্ণাংশে নয়, বিষয়াংশে নয়। তাই এই জাতীয় বাক্যকে অসন্দিগ্ধ বলেও কোন লাভ নাই। এর সাহায্যে তেমন কোন বজ্রসম তথ্য (hard data) পাওয়া যায় না, যাদের বাহ্যজগৎ সংক্রান্ত পরমাণবিক বাক্যে প্রতিবিম্বিত তথ্য বলে মনে করতে পারি। স্বতঃসিদ্ধি সম্পর্কেও এই কথা। স্বতঃসিদ্ধি সর্বদাই আপেক্ষিক। এ কারণেও পরমাণবিক বাক্যের উপপত্তি দেওয়া যায় না।

বিশ্লেষণের বিশ্রাম স্থান রূপ বাক্য বলেও যায় না। বিশ্লেষণ যে প্রকারে

নয়, তার যে কোথাও নিবৃত্তি প্রয়োজন একথা মানার পক্ষে তেমন কোন প্রবল প্রমাণ নাই। উপরে মনন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা থেকে এও বোঝা যায় যে ব্যবহারের স্বার্থে বিশ্লেষণকে নিবৃত্ত করতে হয়; কিন্তু তাত্ত্বিক অর্থে বিশ্লেষণের নিবৃত্তি আছে, এ তত্ত্ব অপ-তত্ত্ব। সুতরাং পরমাণবিক বাক্য স্বীকারের মূলে পরমাণবিক পদার্থ অ-নির্ভর কোন যুক্তি নাই। এরূপ বাক্য স্বীকার করতে হলে, পরমাণবিক পদার্থ স্বীকার করে নিতে হয়, এবং বলতে হয়, যে বাক্যে পরমাণবিক পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয় সেই বাক্যই পরমাণবিক বাক্য। আবার মজার কথা এই যে পরমাণবিক পদার্থ স্বীকারের যুক্তি কি, এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় যে পরমাণবিক বাক্য যেহেতু আছে, এবং যেহেতু ঐ প্রকার বাক্য সত্য, অর্থাৎ কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব, সেই হেতু পরমাণবিক পদার্থও আছে। পরিষ্কার অন্যোন্যাশ্রয়। কিন্তু নৈয়ায়িক পরমাণুবাদীরা তা দেখেন নাই, কিম্বা হয়ত একে দোষ না বলে প্রামাণিক বলে মনে করেছিলেন। তাতে অবশ্য এই দোষের স্খালন হয় না, যদিও এই দোষের উল্লেখ করে মাতামাতিরও তেমন সার্থকতা নাই—কারণ চেষ্টা করলে সম্ভবতঃ সকল দর্শনেই কোথাও না কোথাও অন্যোন্যাশ্রয় দেখান যায়। তবে একথা বলতেই হবে যে পরমাণবিক বাক্য সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং পরমাণবিক তথ্য সংক্রান্ত তত্ত্ব যেন দুটি পৃথক তত্ত্ব নয়, একই তত্ত্বের দুটি দিক। পরমাণবিক তথ্য অঙ্গীকার না করলে পরমাণবিক বাক্য অঙ্গীকারের কোন অর্থ থাকে না।

এখন পরমাণবিক বাক্য যদি পরমাণবিক তথ্য সাপেক্ষ হয়, তাহলে পরমাণুবাদীদের প্রমাণ তত্ত্বও তাঁদের পরাবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সাপেক্ষ হয়। এই জন্যই অর্থাৎ পরমাণুবাদীদের প্রমাণতত্ত্ব পরাবিজ্ঞান নির্ভর বলেই পরমাণুবাদীরা তাঁদের প্রমাণশাস্ত্রকে, সুতরাং বিশ্লেষণী দর্শনকে পরাবিজ্ঞান মাত্রেরই বিরোধী বলে মনে করেন নাই। কিন্তু এই দর্শন পরাবিজ্ঞান মাত্রেরই বিরোধী। এই দর্শন অনুযায়ী লৌকিক প্রত্যয় নীল পীতাদির প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। এই দর্শন প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদী। অনুমান এ দর্শনে প্রমাণরূপে অঙ্গীকৃত হয় বটে, কিন্তু তাতে এই সিদ্ধান্তের কোন হানি হয় না। কারণ অনুমানকে যে প্রত্যক্ষের গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে হয়, প্রত্যক্ষে সীমানা ছাড়িয়ে যে অনুমানের যাবার শক্তি নাই, এই কথাই এই দর্শনে বলা হয়। এই মতে অনুমিত বিষয় যদি কদাচ কোন প্রত্যক্ষের বিষয় না হয়, এমন কি খণ্ডশঃ প্রসিদ্ধ প্রত্যক্ষ বিষয়ের সমাহারও না হয়, তাহলে তা অবাস্তব; তাকে সংকেতিত করবে যে সংকেত তা অর্থহীন। যেমন ধূম হতে আমরা বহ্নির অনুমান করে থাকি। অনুমিতি বাক্যে 'বহ্নি' সংকেতটি

থাকে। এই সংকেত বহ্নি অর্থকে সংকেতিত করে। এখন, কোন সংকেত কি সংকেতিত করে তা শেষ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎকার স্বরূপ জ্ঞানেই গৃহীত হবে। তাই বহ্নি অর্থটি যদি কোন দিনই অনুভূত না হয়, তাহলে বহ্নি সংকেতটি কি যে সংকেতিত করছে তাই টের পাওয়া যাবে না। সংকেতটি অশক্ত সংকেত হবে, সংকেত হবে না। ধূম হতে বহ্নি অনুমান সম্ভব, কারণ যে বিশেষ বহ্নিটি, অথবা বহ্নিত্ব-বিশিষ্টটি অনুমিত হচ্ছে তা প্রত্যক্ষের বিষয় না হতে পারে, কিন্তু বহ্নি মাত্রই তা নয়। 'বহ্নি' সংকেতটি অনুভবে অপ্রতিষ্ঠিত সংকেত নয়। কিন্তু এমন কোন পদার্থ যদি অনুমান করতে যাই যা কদাচ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না, অনুভবে ভাসমান হয় না, তাহলে অনুমিতি বাক্যের বিষয় রূপ সংকেতটি সংকেতরূপেই কাজ করতে পারবে না। প্রত্যক্ষে কদাচ গৃহীত হয় না, কেবল অনুমিতিরই বিষয় হয়, এরূপ পদার্থের অনুমান অনুমান নয়। অনুমান কেবল প্রত্যক্ষ উপজীব্যই নয়, প্রত্যক্ষ অনতিক্রমী। এই অনুমান তত্ত্বই বিশ্লেষণী দর্শনের অনুমান তত্ত্ব। আদর্শ ভাষা তত্ত্বের মূলেও রয়েছে এই অনুমান তত্ত্ব। সুতরাং আদর্শ ভাষায় প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বাক্য এবং যে সব বাক্য এইরূপ বাক্যের উপর গাণিতিক ন্যায় প্রয়োগ পূর্বক রচনা করা যায়, সেই সব বাক্যই স্থান পাবে। অতএব কোন পরাবিজ্ঞানই সম্ভব সম্ভব নয়। ভিৎগেনষ্টাইন-এ এই কথা স্বীকৃতি পেল। তাঁর যে বাক্য বিবক্ষা তত্ত্ব, কোন বাক্যের বিবক্ষা যে তার পরীক্ষণ পদ্ধতিই এই তত্ত্ব, পরমাণুবাদীদের আদর্শ ভাষা বিশ্বাসী দার্শনিকদের প্রমাণ তত্ত্বেরই যৌক্তিক পরিণতি। বিশ্লেষণী দর্শন কেবল সাবেকী পরাবিজ্ঞানেরই বিরোধী নয়, সকল পরাবিজ্ঞানেরই বিরোধী।

প্রকৃতপক্ষে পরমাণবিক তথ্য অঙ্গীকার না করে আদর্শ ভাষার গঠন কল্পনা করবার চেষ্টা করলেই দেখা যাবে যে পরাবিজ্ঞান, কোন প্রকার পরাবিজ্ঞানই সম্ভব নয়, অর্থাৎ পরমাণবিক তথ্য যদি অঙ্গীকার না করা যায় তাহলে সর্বথা পরমাণবিক বাক্য বলে কোন বাক্য থাকবে না। কিন্তু আদর্শ ভাষা নির্মাণের জন্য অন্ততঃ আপেক্ষিক পরমাণবিক বাক্য প্রয়োজন। কারণ ভাষা প্রস্থান রচনা করতে হলে প্রস্থান-ভূমি স্বরূপ কিছু বাক্য চাই। ইউক্লিডের জ্যামিতির কথাই ধরা যাক। এ একটি আকারৈকধর্মী ভাষা প্রস্থান। এই ভাষা প্রস্থানে কিছু বাক্যকে আদিমতম বাক্য, মূল-বাক্য, অপর বাক্য অনপেক্ষ বাক্য বলে মনে করা হয়। তাদের বলা হয় স্বতঃসিদ্ধ বাক্য (axioms)। এই স্বতঃসিদ্ধ বাক্য পরিত্যাগ পূর্বক ইউক্লিডীয় ভাষা প্রস্থান রচনা করা সম্ভব হয় না। তবে কিনা, এই স্বতঃ-সিদ্ধি আপেক্ষিক। যে বাক্যকে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে স্বতঃসিদ্ধ বাক্য বলে ধরা

হয়, তাকে সাপেক্ষ বাক্য বলে মনে করে অন্য ভাষা প্রস্থান রচনা করা যায়। ঠিক তেমনি যে বাক্য কোন প্রস্থানে সাপেক্ষ বাক্য বলে স্বীকৃত হয়, তাকেই আবার অন্য কোন প্রস্থানে অনপেক্ষ বাক্যের মর্যাদা দিয়ে, ভিন্ন প্রস্থানের আদিমতম বাক্যকে সাপেক্ষ বাক্য, বিকৃতি (অর্থাৎ অ-প্রকৃতি) বাক্যরূপে প্রমাণও করা যায়। স্বতঃসিদ্ধি আপেক্ষিক, একটি প্রস্থান সম্পর্কে আপেক্ষিক। কোন বাক্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলার অর্থ, কোন একটি বিশেষ প্রস্থানে ঐ বাক্যটি আদিম বাক্যরূপে, প্রাথমিক বাক্যরূপে অঙ্গীকৃত হয়। 'দিল্লী বহু দূর' এই বাক্যটি একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়, সংক্ষিপ্ত উক্তি মাত্র। দিল্লী দিল্লী হতে বহু দূর অবশ্যই নয়, অন্য স্থান হতে, আজাদ হিন্দ ফৌজের বাক্য রচনা কালীন শিবির হতে। তেমনি 'ক বাক্যটি স্বতঃসিদ্ধ', এই বাক্যটিও একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য নয়, সকল প্রস্থানেই বাক্যটি স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের মর্যাদা পায় না, অন্ততঃ এমন প্রস্থান তর্কের খাতিরেও রচনা করা যায় যেখানে বাক্যটি প্রাথমিক নয়। তাই ইউক্লিড যে যে বাক্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করেছিলেন, তাদের সর্বতোভাবে স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় না। তাদের স্বতঃসিদ্ধিকে আপেক্ষিক বলেই মনে করতে হয়। তবে এইরূপ স্বতঃসিদ্ধ বাক্যও স্বীকার না করলে কোন আকারৈক ধর্মী ভাষা প্রস্থান রচনা করা যায় না। যাই হক, ইউক্লিডীয় ভাষা প্রস্থানে স্বতঃসিদ্ধ বাক্য, আপেক্ষিত স্বতঃসিদ্ধ বাক্য আছে। ঐরূপ বাক্য না থাকলে ঐ-ভাষা প্রস্থান নির্মিত হতে পারে না। কোনও প্রস্থানের একটি বাক্য অপর বাক্য সাপেক্ষ, একথা সকল বাক্য সম্পর্কে প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রস্থানে এমন বাক্য থাকতেই হবে, যা নিরপেক্ষ, যা ঐ প্রস্থানের অন্য কোনও বাক্য সাপেক্ষ নয়। 'ক' বাক্যটি 'খ' বাক্য নির্ভর হতে পারে, 'খ' বাক্যও নির্ভর করুক 'গ' বাক্যের উপর, এই ভাবে চলতে চলতে অন্ততঃ অনুস্বার কি বিসর্গে এসে চলা থামাতেই হবে ; নচেৎ চিন্তা বিশ্রাম পাবে না। পক্ষান্তরে, শিয়ালের পিঠে শিয়াল চেপে কাঁঠাল সংগ্রহ করুক, কিন্তু সকল শিয়ালই শিয়ালের পিঠে চাপলে কোন শিয়ালই কোন শিয়ালের পিঠে চাপবে না। কোন না কোন শিয়ালকে অপর কোন শিয়ালের পিঠে চাপার সুখের আশা ত্যাগ করতে হবে ; নচেৎ কাঁঠাল খাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে। তেমনি ভাষা প্রস্থান রচনা করতে চাইলে, প্রাথমিক বাক্য, অপর বাক্য অনির্ভর নিরপেক্ষ বাক্য স্বীকার করতে হবে। ভাষা প্রস্থানে আপেক্ষিক প্রাথমিক বাক্য অবশ্য স্বীকার্য।

তাই পরমাণবিক বাক্যের মত এক প্রকার বাক্যও স্বীকার্য। সর্বতোভাবে প্রাথমিক না হক, আপেক্ষিক প্রাথমিক বাক্য ভাষা প্রস্থানে স্বীকার করতেই হবে।

কিন্তু এই বাক্য যে 'নীল' 'পীতাদি' সংকেত সাধিত বাক্য হবেই এমন কোন কথা নাই। দ্রব্য-সংকেত 'ঘট' 'পটাদি' সংকেত ঘটিত বাক্যও হতে পারে। আমরা যখন স্নায়ু বিজ্ঞান গঠন করি, তখন স্নায়ু প্রভৃতি দ্রব্য-সংকেত ব্যবহার করে সুফল পাই। 'নীল' 'পীতা'দির ভাষা এবং দ্রব্য-ভাষা, দুই প্রকার ভাষাই কাজ দিতে পারে। কোন ভাষা বেশী কাজের, এ এক প্রকার পরাবৈজ্ঞানিক প্রশ্ন। সুতরাং বাক্যে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, এরূপ কথা বলার সপক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

উপরন্তু বাক্যে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, একথা যখনই বলা হয় তখনই স্বীকার করা হয় যে বাক্য ও তত্ত্ব ভিন্ন। সুতরাং প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে বাক্য ও তত্ত্বের প্রতিবিম্ব রূপ সম্বন্ধ কোনও বাক্যে প্রতিবিম্বিত হয় কি না। মনে করা যাক $ক_1$ এবং সেই বাক্যে $খ_1$ তত্ত্বটি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এখন, এই $ক_1$ ও $খ_1$ এর সম্বন্ধটি; প্রতিবিম্বরূপ সম্বন্ধটি বাক্যে প্রকাশ যোগ্য কি? ভিৎগেনষ্টাইন এই প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলিয়াছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল মূলক্ষয়কারী অনবস্থা রোধ করা। এই প্রতিবিম্ব যদি $ক_2$ বাক্যে প্রতিবিম্বিত হয় বলে মনে করি, তাহলে আবার এই নূতন প্রতিবিম্ব প্রকাশের জন্য $ক_3$ বাক্যের প্রয়োজন হবে—সুতরাং $ক_4$, $ক_5$ প্রভৃতি বাক্যেরও প্রয়োজন হইবে, উদ্ভব হবে অনবস্থা নামক দুরবস্থার। তাই ভিয়েৎগেনষ্টাইন বাক্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ যে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না, এই কথা বলেছিলেন। কিন্তু তার ফলে সমগ্র ভাষার নৈয়ায়িক ব্যাকরণ নির্ণয় প্রচেষ্টা অর্থহীন হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ তত্ত্বের আকারই বাক্যের আকার। এই আকার যদি অব্যক্ত হয়, তাহলে ভাষা বিজ্ঞানে আমরা যা নিয়ে আলোচনা করব (অন্ততঃ প্রাথমিক বাক্যের আকারগুলি) তা অব্যক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তত্ত্ব ও ভাষার বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করাই উচিত। স্বীকার করা উচিত আমাদের কারবার ভাষা নিয়েই; তত্ত্ব কোন আলোচনার বিষয় নয়।

অন্ততঃ ভাষা ও তত্ত্বের দ্বৈতভাব স্বীকার করলে স্বমাত্রবাদের (solipsism) হাত এড়ান সম্ভব হয় না। আমরা আগেই দেখেছি যে আদর্শ ভাষা পরমাণবিক এবং আণবিক বাক্যের একটি অশেষ সমাহার। আণবিক বাক্যের অর্থ নির্ভর করে পরমাণবিক বাক্যের উপর। আবার পরমাণবিক বাক্য স্বায়সিদ্ধ ব্যক্তিবাচক নামে গঠিত। এই নামগুলির বাক্যের বাইরে কোন অর্থ নাই। তাদের কোন লক্ষণই দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আদর্শ ভাষা তত্ত্বের পরিণাম স্বমাত্রবাদ, যদিও স্বরূপে কোন আত্মা নাই। এই স্বমাত্রবাদের হাত এড়াতে হলে ভাষা এবং তত্ত্বের দ্বৈতভাব অস্বীকার করতে হয়। মনে রাখতে হয় যে বৈজ্ঞানিক সমাজের একটি

সমাজসিদ্ধ ভাষা আছে। এই ভাষা অবশ্যই যুগে যুগে বদলায় কিন্তু সে আলোচনা ঐতিহাসিকের, দার্শনিকের নয়। দার্শনিকের একটি সামাজিক, বৈজ্ঞানিক সমাজ-সিদ্ধ ভাষা আছে। পক্ষান্তরে, দর্শনে প্রথমেই সার্বজনীন ভাষা বলে একটি ভাষা অঙ্গীকার করে নিতে হয়। সার্বজনীন ভাষা বলতে বুঝতে হয় এমন ভাষা যাতে যা কিছু প্রকাশযোগ্য প্রকাশিত হতে পারে, অথবা সকল বক্তব্যই যাতে উক্ত হতে পারে। বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষাই এইরূপ ভাষা। জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির নজীরে একথা অস্বীকার করতে চাইলে হবে না। কারণ, জড়জাগতিক নিয়ম হতে জীব বিজ্ঞানের সব নিয়ম লাভ করা যায় না, একথা যদি স্বীকারও করা যায়, তাহলেও এই প্রতিজ্ঞার হানি হয় না। এই প্রতিজ্ঞা ঐ বিচারের ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হয় যদি কেবল এইটুকুই স্বীকার করা যায় যে জৈব-ঘটনার পদার্থবৈজ্ঞানিক ভাষায় বিবরণ দেওয়া সম্ভব, জীববিজ্ঞানে ব্যবহৃত মূল প্রত্যয়গুলিকে অভিমৌল বিশ্লেষণের সাহায্যে পদার্থ-বৈজ্ঞানিক ভাষায় অনুদিত করা যায়। মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কেও এই কথা। তাই পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষাকে সার্বজনীন ভাষা বলা যায়। একে ব্যক্তির অনুভবের, সরল অনুভবের প্রকাশ রূপ ভাষাও বলা যায়। তবে এ ভাবে এই ভাষার প্রকৃতি বর্ণনা করলে, অনুভবকে ভাষার লক্ষণ ঘটক করলে, স্বমাত্রবাদের হাত এড়ান শক্ত হয়। কারণাপ সরল অনুভব হতে আহার্য-বিশ্লেষণ (quasi-analysis) প্রভৃতির সাহায্যে সার্বজনীন জগৎ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক আদান-প্রদানের উপপত্তি দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে খুব কৃতকার্য হতে পারেন নাই বলেও বটে, এবং অনুভবের আমদানি করলে ভাষা এবং তত্ত্বের দ্বৈতভাব স্বীকার করতে হয় বলেও বটে, এ পথ ত্যাগ করেছেন। তবে প্রোটোকল ভাষা স্বীকার করতেই হয়। এই ভাষা অন্য ভাষার উপর সাক্ষাৎ ভাবে নির্ভর করে না। কিন্তু পরোক্ষ ভাবে করে। সার্বজনীন পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় একে অনুদিত করা যায়। এই ভাষাও সার্বজনীন ভাষার অন্তর্ভুক্ত। এই অন্তভুক্তির প্রকৃতি বর্ণনা দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। সংক্ষেপে এইটুকু বলা যায়। পদার্থ-বিজ্ঞানের ভাষা ঠিক প্রোটোকল ভাষা হতে লব্ধ নয়, তবে তার সঙ্গে এর একটি অতি কুটিল পথে সংযোগ স্থাপন করতে হয়। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় দুরকম বাক্য থাকে, সামান্য-লক্ষণ বাক্য এবং স্বলক্ষণ বাক্য। সামান্য-লক্ষণ বাক্য, নিয়ম বাক্য, সার্বিক বাক্য, এবং স্বলক্ষণ বাক্য ব্যক্তিবাচক বাক্য। সামান্য-লক্ষণ বাক্য অগণনামূলক সামান্য বাক্য, এবং স্বলক্ষণ বাক্যের সঙ্গে তুলনা করলে একে অনপেক্ষ

বাক্য না বলে প্রকল্প স্বরূপ বলতে হয়। তবে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বলক্ষণ বাক্যে একে প্রকাশ করা যায় না। আমরা আশা করতে পারি না যে কোন সামান্য লক্ষণ বাক্যকে বিশ্লেষণরূপে গ্রহণ করতে সমীকরণ লিখন রীতিতে একে বাঁ দিকে স্থাপন করে = চিহ্ন দিয়ে ডান দিকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বলক্ষণ বাক্য লিখে, এর যথার্থ অনুবাদ করতে পারব। সামান্য লক্ষণ বাক্য নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বলক্ষণ বাক্যের নৈয়ায়িক যোগফল (logical sum) অথবা নৈয়ায়িক গুণফল (logical product) নয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বলক্ষণ বাক্যে সামান্য লক্ষণ বাক্যকে নিঃশেষে প্রকাশ করা যায় না। তবু সামান্য লক্ষণ যাচাই স্বলক্ষণ বাক্যের সাহায্যেই হয়ে থাকে। এবং কোনও বাক্যের পরীক্ষণ তত্ত্ব এবং তাৎপর্য তত্ত্ব ভিন্ন নয় বলে, সামান্য লক্ষণ বাক্যের তাৎপর্যও স্বলক্ষণ বাক্যেরই। সামান্য লক্ষণ বাক্যের সঙ্গে স্বলক্ষণ বাক্যের যেরূপ সম্বন্ধ, স্বলক্ষণ বাক্যের সঙ্গে প্রোটোকল বাক্যেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। সুতরাং বেশ কিছু সংখ্যক, পর্যাপ্ত সংখ্যক স্বলক্ষণ পদার্থ-বৈজ্ঞানিক বক্যে হতে, প্রোটোকল বাক্য লাভ করা যায়। এই পথকেই কারণাপ স্বমাত্রবাদের আক্রমণ হতে প্রত্যক্ষবাদী দর্শনকে বাঁচাইবার একমাত্র পথ বলে মনে করেন। সুতরাং 'ক' বলে কোন পদার্থ-বৈজ্ঞানিক বাক্যকে আ বলে কোন ব্যক্তি যদি বাক্য পরিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী প্রোটোকল বাক্যে রূপান্তরিত করতে পারেন, তাহলেই তিনি যে বাক্যটি বোঝেন, তার তাৎপর্য্য টের পান, তার পরীক্ষা সাপেক্ষ অনুভাবিক ফলাফল উপলব্ধি করেন, একথা বলা যায়। এবং যখন এমন নিয়মাবলী প্রণীত হয় যার সাহায্যে এক ব্যক্তি অপরের প্রোটোকলে কোন বাক্যকে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন, তখন পরস্পরের আদান-প্রদান লোক ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

যাই হক, বাক্যে তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, বাক্যকার বিশ্লেষণ পূর্বক তত্ত্বের আকার নির্ণয় করা, ইত্যাদি কথা নিষ্প্রমাণ। বাক্যজিজ্ঞাসা তত্ত্বজিজ্ঞাসা নয়। এমন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে বাক্যজিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? এ কি বৃথা পরিশ্রম মাত্র নয়? বলা বাহুল্য এই প্রশ্নের পিছনে একটি মনোভাব কাজ করছে। প্রশ্নকর্তা ভাবছেন যে তত্ত্বজিজ্ঞাসাই যদি না হল, তাহলে বাক্যজিজ্ঞাসা অসার পণ্ডশ্রম মাত্র। এই মনোভাবই অশ্রদ্ধেয়। এ একেবারে সাবেকী পরা-বৈজ্ঞানিক মনোভাব। তাই বাক্যজিজ্ঞাসা সুরু করার সময়েই আমাদের অবহিত হতে হবে। আমাদের সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যে কোন জিজ্ঞাসা তত্ত্বজিজ্ঞাসা না হলেও অসার প্রয়োজনহীন হয়ে যায় না। তারপর বাক্যজিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি তা জিজ্ঞাসা করতে হবে। এইরূপ সংস্কৃত মন নিয়ে যখন প্রশ্নটি উত্থাপন করা

হয় তখন এর সদুত্তর পেতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কারণ প্রথমেই দেখতে পাওয়া যায় যে বিজ্ঞানেই বিজ্ঞানের শেষ নয়। এক একটি বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে এক একটি ভাষা প্রস্থান। এই ভাষায় বহু বাক্য থাকে, এবং একটি বিশিষ্ট সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়ে থাকে। এই বাক্যগুলি সকলেই এক জাতীয় কি না, তাদের সকলের নৈয়ায়িক মর্যাদা সমান কি না, লৌকিক ভাষায় বাক্যসমূহের সহিত তাদের সম্বন্ধ কি প্রকার, বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভাষা কি বিভিন্ন, ইত্যাদি প্রশ্ন বিজ্ঞান আলোচনা কালেই উত্থাপিত হয়। এদের উত্থাপনের মূলে মননশীল সত্তাই কেবল নাই, বিজ্ঞানের স্বার্থও জড়িত হয়ে রয়েছে। এই সব প্রশ্ন আমরা তুলি, কিন্তু আমরা কেবল আমরা বলে, মননশীল ব্যক্তি বলে তুলি তা নয়। তা যদি হত, তাহলে ভাষা বশের বাইরে যাওয়ার জন্য যে সব উদ্ভট পরাবৈজ্ঞানিক প্রশ্ন জন্ম লাভ করে তারাও আমাদের মননশীল সত্তাকে নাড়া দেয় বলে, প্রকৃত প্রশ্নের মর্যাদা পেয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা মননশীল না হলেই ঐ সব প্রশ্ন উঠত না, বিজ্ঞানও হত হত না, বিজ্ঞান বিষয়ক বিবেচনাও হত না। কিন্তু কেবল আমাদের মননশীল সত্তার উপরই ঐ সব প্রশ্ন নির্ভর করে না। ঐ সব প্রশ্নের সঙ্গে বিজ্ঞানের স্বার্থও জড়িত হয়ে রয়েছে। যেমন দেশ কাল প্রভৃতি সম্পর্কে উপযুক্ত বিশ্লেষণের অভাবে, গাণিতিক বাক্যের প্রকৃতি সম্পর্কে নৈয়ায়িক বিশ্লেষণের অভাবে পদার্থ বিজ্ঞানে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল; আইনষ্টাইন পদার্থ বিজ্ঞানে যে নবযুগ এনেছেন, তা কেবল পদার্থ-বৈজ্ঞানিক সাফল্যের সূচনাই করে না, দার্শনিক সাফল্যেরও করে। তারপর বিভিন্ন জিজ্ঞাসা, বিভিন্ন ভাষা প্রস্থান রচনা করে। এই ভাষা-প্রস্থানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ও বিজ্ঞানের স্বার্থেই প্রয়োজন। দর্শনকে অবহেলা করে প্রাচীন পদার্থ বিজ্ঞানে অনেক অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল এবং জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান যতদিন না পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, ততদিন স্বপ্ন জীবনই করেছিল; কোন বৈজ্ঞানিক সাফল্য লাভ করতে পারে নাই। প্রচীনকালের দার্শনিকরা 'নিরখিব বিরাট স্বরূপ যুগ যুগান্তের', এই প্রতিজ্ঞা করতেন; কিন্তু পালন করতে পারতেন না। কারণ দর্শন সম্পর্কে তথা বিজ্ঞান সম্পর্কে কোন সুবিচারী দৃষ্টিভঙ্গী তাঁদের ছিল না। এখনও যে এই প্রতিজ্ঞা পালন করা যায় তা নয়। তবে এই প্রতিজ্ঞা পালনের পথে চলা যায় কি করলে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে তা বলা যায়। আমরা বিজ্ঞানের ঐক্য রচনা করবার জন্য এক বিজ্ঞানের নিয়মাবলী হতে, সুতরাং এক প্রকার পদার্থের নিয়ম নিয়ম হতে অন্যান্য বিজ্ঞানের স্বীকৃত নিয়মগুলিকে, সুতরাং সর্ব প্রকার পদার্থের

নিয়মকে অবরোহ প্রণালীতে লাভ করবার চেষ্টা করতে পারি। আগের দিনের জড়বাদীরা তাই করতেন। তাঁদের ব্যর্থতাই এই জাতীয় ব্যর্থতাই প্রমাণিত করে। মনের নিয়মকে প্রাণের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার, এবং প্রাণের নিয়মকে জড়ের নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা অর্থহীন। এ পথে বিজ্ঞানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই কাজ করতে হলে সার্বজনীন ভাষা নির্মাণ করতে হবে। এই সার্বজনীন ভাষায় অভিমৌল বিশ্লেষণের সাহায্যে সকল বিজ্ঞানের বাক্যকেই অনূদিত করা যাবে। তেমনি, লৌকিক অনুভব এবং বিজ্ঞানের মধ্যেও কোন বিরোধ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এই লৌকিক ভাষাকেও অনূদিত করতে হবে সার্বজনীন ভাষায়। বাক্য বিশ্লেষণ অসার পণ্ডশ্রম মাত্র নয়। উপরন্তু যদি একবার ভেবে দেখা যায় যে বাক্য বিশ্লেষণের অভাবেই আমরা কথার জালে পাকে পাকে জড়িয়ে পড়ি এবং বহু যত্নে, বহু পরিশ্রমে নির্মাণ করি দর্শনের অচলায়তন, তখন এই বাক্য বিশ্লেষণের উপযোগিতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না। সংক্ষেপে বাক্য জিজ্ঞাসা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা নয়, কিন্তু সেই জন্য নিষ্ফল নয়। এর প্রথমতঃ একটি প্রতিষেধাত্মক মূল্য আছে—পরাবিজ্ঞান নামক মহামারী প্রতিষেধাত্মক মূল্য এর আছে। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন বিজ্ঞানের সঙ্গে সহজ অনুভবের এক বিজ্ঞানের সঙ্গে অপর বিজ্ঞানের, ব্যক্তি ভাষার সঙ্গে সার্বজনীন ভাষার সম্বন্ধ প্রদর্শক রূপেও এর অসাধারণ মূল্য রয়েছে।

এই হল বিশ্লেষণী দর্শনের দ্বিতীয় পর্ব। এই পর্বের দার্শনিকরা যে অনেক বিষয়ে প্রথম পর্বের দার্শনিকদের হতে ভিন্ন মত পোষণ করতেন, তা আমরা দেখলাম। এখন, এই ভেদ থাকা সত্ত্বেও, এই দুই পর্বের দার্শনিকদের মধ্যে একটি গভীর ঐক্য ছিল। উভয় পর্বের দার্শনিকরাই আটপৌরে ভাষাকে কোন আমল দিতে চাইতেন না। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকদের আটপৌরে ভাষার বিরাগ আরও তীব্র ছিল। পরমাণুবাদীরা আটপৌরে ভাষা সম্পর্কে কেবল এই বলতেন যে এই ভাষা সংকুচিত সংকেত বহুল এবং এর ব্যাকরণ বিপথগামী। দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরা একথা বলতেনই, তাঁরা এর আরও তীব্র সমালোচনা করতেন। প্রকৃত পক্ষে আরও তীব্র সমালোচনা না করে পরমাণুবাদীদের 'ওঁ স্বস্তি' বলে সম্মতি দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, তাঁরা পরমাণুবাদীদের মত ভাষার তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত করবার যোগ্যতায় বিশ্বাস করতেন না। এই পরমাণু-বাদীরা যে বিবক্ষা নিয়ে উপরোক্ত অভিযোগ আনতেন, সেই বিবক্ষা তাঁদের হতে পারে না। তাঁরা ঐ অভিযোগের দ্বারা কেবল এই বুঝতে পারেন যে পরাবিজ্ঞান নামক অপ-বিজ্ঞান আটপৌরে ভাষার দোষে জন্ম গ্রহণ করেছে। আটপৌরে

ভাষাই পরাবিজ্ঞান নামক মনুষ্য জাতির অবৈধ সন্তানের জননী। কিন্তু আটপৌরে ভাষা যে দুষ্ট, পরাবিজ্ঞান যে অবৈধ বিজ্ঞান, অন্ত্যজবিশেষ, এ কথার প্রমাণ কি? অবশ্য, পরাবিজ্ঞানের বিফলতা, অচলায়তন তুল্য অবস্থা, একটি প্রমাণ বটে। কিন্তু এই প্রমাণই যথেষ্ট নয়। কারণ যাকে আমরা অচলায়তন বলছি তা সত্যিই অচলায়তন কি না, এবং অচলায়তন হওয়াই দোষের কি না এই প্রশ্নের উত্তর কি? পরমাণুবাদীরা সাবেকী পরাবিজ্ঞান হেয়, এই কথা বলে ক্ষান্ত হন নাই। আটপৌরে ভাষা এর জননী, একথা বলেও হন নাই। তাঁরা আদর্শ ভাষা নির্মাণ করেছিলেন, দেখাতে চেয়েছিলেন যে এই ভাষায় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়, এবং আটপৌরে ভাষা এই ভাষা হতে যেখানে ভিন্ন সেখানে অনির্ভরযোগ্য। তাই পরমাণুবাদীরা যখন বলেছিলেন যে আটপৌরে ভাষা পরাবিজ্ঞানের জননী, তখন তাঁদের কথার মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। প্রত্যক্ষবাদীরা পরমাণুবাদীদের মত তত্ত্বের কাঠামোর যুক্ত আদর্শ ভাষায় বিশ্বাস করতেন না। তাই পরমাণুবাদীদের মত আটপৌরে ভাষাকে তারা নিন্দাও করতে পারেন না। এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পরাবিজ্ঞানের অনুপাদেয়ত্ব অনির্ভর অন্তর হেতুর সাহায্যে, আটপৌরে ভাষার অনুপাদেয়ত্ব তাঁরা সাধন করতে পারছেন, ততক্ষণ তাঁদের আটপৌরে ভাষা সমালোচনায় কিছু ফাঁক থেকে যাবেই।

প্রত্যক্ষবাদীরা এ বিষয়ে সচেতন। তাই আটপৌরে ভাষার তাঁরা আরও তীব্র সমালোচনা করে থাকেন। তাঁরা দেখাতে চান যে আটপৌরে ভাষা একটি অক্ষর বিশেষ। এই ভাষায় বৈষয়িক ভাষা (object language) এবং বৈয়াকরণ ভাষার (syntax language) এর মধ্যে কোন ভেদ লক্ষ্য করা হয় না। বিষয়ভঙ্গী রচনা শৈলী (material mode of expression) এবং আকারভঙ্গী রচনা শৈলী (formal mode of expression) মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা হয় না। সুতরাং ভাষার নৈয়ায়িক পারিপাট্যের আলোচনায়, এই ভাষা কোন সাহায্যই করতে পারে না। একটি বাক্যকে অপর বাক্যে পুনর্লিখনের ন্যায় নির্মাণে, সার্বজনীন ভাষা হতে একের প্রোটোকল বাক্যের অনূদনে, অথবা পরস্পরের প্রোটোকল বাক্যের অনূদনে, এই ভাষার উপর নির্ভর করা যায় না। তেমনি পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় জীববিজ্ঞানাদির পুনর্লিখনের স্থলেও এই ভাষা প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করে, অবশ্য সাহায্য করে না। বস্তুতঃ একটি বাক্য সত্য এই বাক্যের তাৎপর্য্য, সত্যতার লক্ষণ, আটপৌরে ভাষায় বলা যায় না। এমন কি আটপৌরে ভাষার ব্যাকরণ, নৈয়ায়িক ব্যাকরণ যদি আটপৌরে ভাষাতেই লেখার চেষ্টা করা

হয়, তাহলে বহুবিধ অনুপপত্তির উদ্ভব হয়। আটপৌরে ভাষার বাণীর মন্দিরে কোন স্থানই নাই, এ ভাষা অনুশীলনই নয়, অস্পৃশ্য, অশুচি।

দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরাও যে আটপৌরে ভাষাকে হেয় জ্ঞান করতেন তা দেখা গেল। তাই প্রথম পর্বের দার্শনিকদের সঙ্গে তাঁদের যে কিছু মিলও আছে তা বোঝা গেল। এই মিল হতে আর একটি মিল চোখে পড়ে। স্বাভাবিক ভাষায় বিশ্বাসের ঐক্যও সূচিত করে। সুতরাং গাণিতিক স্যায়, গণিতমূলক ব্যাকরণ শাসিত ভাষায় যে দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরাও প্রথম পর্বের দার্শনিকদের মত বিশ্বাস করতেন, তাও বোঝা যায়। বস্তুতঃ দ্বিতীয় পর্বের দার্শনিকরাও প্রথম পর্বের দার্শনিকদের মত ভাষা যে ক্যালকুলাস বিশেষ এই মত স্বীকার করতেন। এইজন্য ভাষা যে বহু আণবিক এবং পরমাণবিক বাক্যের অশেষ সমাহার, এই মতও তাঁরা মানতেন, যদিও পরমাণবিক বাক্য বলতে পরমাণুবাদীরা যা বুঝতেন, তা তাঁরা বুঝতেন না। এমন কি 'পরমাণবিক বাক্য' শব্দটির ব্যবহারও তাঁরা সব সময় করতেন না, অনেক সময় এই শব্দটির ব্যবহারের বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলতেন। তাঁদের প্রিয় শব্দ ছিল আদিম বাক্য (primitive statement), প্রোটোকল বাক্য, প্রভৃতি শব্দ। তবু একথা বলা যায় যে পরমাণবিক বাক্যে তাঁরা বিশ্বাস করতেন, যদিও পরমাণবিক বাক্য বলতে পরমাণুবাদীরা যা বুঝতেন তাঁরা ঠিক তা বুঝতেন না। তারপর যে জাতীয় বাক্য প্রথম পর্বে পরমাণবিক বাক্যের মর্যাদা লাভ করত, ঠিক সেই জাতীয় বাক্যই দ্বিতীয় পর্বেও প্রোটোকল বাক্যের মর্যাদা পেত। অবশ্য প্রথম পর্বে যেমন সাক্ষাৎকৃত হয় কিরূপ পদার্থ, এ নিয়ে, সুতরাং পরমাণবিক বাক্যের বৈচিত্র্য ও আকার নিয়ে মতভেদ ছিল, দ্বিতীয় পর্বেও ঠিক তেমনই প্রাথমিক বাক্য নিয়ে মতভেদ ছিল। ইংরাজ দার্শনিক মহলে হিউমের প্রত্যক্ষবাদ সম্মত কথাই অধিক স্বীকৃতি পেয়েছিল, এবং সেইজন্য 'এই রক্ত' 'ওই পীত' আকারের বাক্যই অস্বীকৃত হয়েছিল প্রাথমিক বাক্যরূপে। কারণাপ ও এক সময় প্রোটোকল বাক্য বলতে এই জাতীয় বাক্যই বুঝতেন, এবং প্রোটোকল বাক্যের লক্ষণ নির্ণয় করতেন প্রাথমিক অনুভবের প্রকাশরূপ বাক্যরূপে। পরে, অনুভব, তত্ত্ব ও বাক্য, এই ভেদতত্ত্ব অস্বীকার করার পরে, তিনি প্রোটোকল বাক্যের লক্ষণকে আর অনুভব ঘটিত করেন নাই এবং প্রোটোকল বাক্য বলতে বুঝেছিলেন ব্যক্তির মৌহর্তিক ভাষা। তবে, এই ভাষায় ঠিক আকারটি কেমন, এই আলোচনায় তেমন উৎসাহ দেখান নাই। বলেছিলেন যে ম্যাকের মতন যদি মানস পরমাণুবাদ (doctrine of elements) স্বীকার করি, তাহলে 'এই রক্ত',

'ওই পীত' ইত্যাদি আকারের বাক্যকেই প্রোটোকল বাক্য বলে মনে করতে হবে। কিন্তু যদি গেস্টাল্ট সম্প্রদায়ের কথা অস্বীকার করি, তাহলে, 'এমন একটি রক্তাকার বৃত্ত', 'ওই একটি ত্রিভুজাকার পীত' ইত্যাদি আকারের বাক্যকেই অঙ্গীকার করতে হবে প্রোটোকল বাক্যরূপে। এবং এই আলোচনা যে ভাষার ন্যায় রচনা নিপুণ দার্শনিকের আলোচনা নয়, মনোবিজ্ঞানীর আলোচনা, একথাও বলেছিলেন। যাই হোক, পরমাণবিক বাক্যে বিশ্বাস দ্বিতীয় পর্বে লুপ্ত হয় নাই। নূতন নামে থেকে গিয়েছিল।

প্রকৃত পক্ষে ভাষা ক্যালকুলাস বিশেষ সত্যতা-অপেক্ষক ন্যায় শাসিত, প্রভৃতি কথায় বিশ্বাস করলে প্রাথমিক বাক্য অঙ্গীকার করতেই হবে, যদিও প্রাথমিক বাক্যের প্রাথমিকত্বকে আপেক্ষিক মাত্র বলা যেতে পারে। ভাষা সত্যতা-অপেক্ষক ন্যায় শাসিত একথার অর্থ, একটি বাক্যের অপর বাক্য নির্ভরতা কেবল মাত্র তার আকার নির্ভর (বিষয় নির্ভর নয়)। যাই হক, প্রত্যক্ষবাদীরাও পোষাকী কৃত্রিম ভাষায়, সত্যতা-অপেক্ষক নীতিতে, প্রাথমিক এবং বিকৃত বাক্য দ্বৈবিধ্য, এবং অভিমৌল বিশ্লেষণে বিশ্বাস করতেন। তাই প্রত্যক্ষবাদ ও পরমাণুবাদের মধ্যে, দ্বিতীয় এবং প্রথম পর্বের দার্শনিকদের মধ্যে, তেমন কোন সুগভীর পার্থক্য ছিল না।

বিশ্লেষণী দর্শনে আরও কিছুদিন পরে এই পার্থক্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠল। গাণিতিক ন্যায় শাসিত ভাষায় অবিশ্বাস, অভিমৌল বিশ্লেষণে অবিশ্বাস, সুতরাং সত্যতা-অপেক্ষক নীতিতে, তথা সমীকরণ ভঙ্গিক বিশ্লেষণে অবিশ্বাস প্রবল হয়ে উঠল। গাণিতিক ন্যায়ে অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে দুটি দিক হতে এবং একটি সাধারণ ভাষার ন্যায়ের দিক হতে। প্রথম দিক হতে গোডেল কিছু অনুপত্তি দিয়েছেন, ব্রাউবের এক প্রকার অনুভববাদ প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, এবং হিলবার্ট কান্টের মতবাদকে নূতন করে পরিবেশন করেছেন। এই আলোচনা গণিত শাস্ত্রের স্বার্থেই করা হয়েছে, এবং তার স্থানও গণিত দর্শনের আলোচনায়। বিশেষ করে তৃতীয় পর্বের বিশ্লেষণী দর্শনের উদ্ভবে এই সব আলোচনার কোন সাক্ষাৎ প্রভাব ছিল না। তাই আমরা এদের উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হই ; এবং সাধারণ ভাষার ন্যায়ের দিক হতে যে আপত্তি দেওয়া হয়েছে তারই কথা বলবার চেষ্টা করি।

আটপৌরে ভাষাকে পোষাকী ভাষায় অনূদন প্রচেষ্টার মূলে ছিল এই বিশ্বাস যে আটপৌরে ভাষায় যে নৈয়ায়িক কারণগুলি আছে, তারা পোষাকী

ভাষার করণগুলির অনুরূপ পোষাকী ভাষার করণগুলি যে কাজ করে, তারাও সেই কাজই করে, অন্ততঃ পক্ষে করতে চায়। সুতরাং এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে পোষাকী ভাষা যে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে সেই কাজই স্থূল ভাবে, আংশিক ভাবে সম্পন্ন করে আটপৌরে ভাষা। এই দুইটি ভাষার পার্থক্য বিজাতীয় নয়, অঙ্কুর ও মহীরুহের, অপরিণত ও পরিণতের। কিন্তু বর্তমানে আটপৌরে ভাষা ন্যায়ের বহু আলোচনা হয়েছে, এবং দেখতে পাওয়া গেছে যে এই বিশ্বাস মূলহীন। সংক্ষেপে এই আলোচনার দু একটি কথা এখানে বলছি। আটপৌরে ভাষার 'এবং' এবং গাণিতিক ন্যায়ের '.', একই বলা যায় না। 'এবং' এমনও কাজ করে যা '.' করতে পারে না। যেমন 'এবং' এর সাহায্যে দুটি বিশেষ্যকে, অথবা দুটি বিশেষণকেও সংযুক্ত করা যায়; কিন্তু '.' এর দ্বারা কেবল মাত্র বাক্যকেই, অন্ততঃ পক্ষে বাক্যের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে এমন ভাষা খণ্ডকে সংযুক্ত করা যায়। 'যদু এবং মধু এসেছে', — বাক্যটি 'এবং' এর প্রথম প্রকার কার্যের দৃষ্টান্ত। 'যদু ধীরে ধীরে এবং ক্লান্ত ভাবে চলে গেল'—বাক্যটি দ্বিতীয় প্রকার কার্যের দৃষ্টান্ত। এই বাক্য দুটিকে যদি আমরা '.' এর সাহায্যে অনুবাদ করতে চাই তাহলে কি ভাবে অগ্রসর হব? অবশ্যই প্রথম বাক্যটিকে দুটি বাক্যের যোগফল বলে মনে করব, বলব, এই বাক্যটির প্রকৃত তাৎপর্য হল, ' "যদু এসেছে", "মধু এসেছে" .' তেমনি দ্বিতীয় বাক্যটির সম্পর্কে বলব, ' "যদু ধীরে ধীরে চলে গেল", "যদু ক্লান্তভাবে চলে গেল" '। এই অনুবাদে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় না তা নয়, যদিও যৌগিক বিধেয় দেওয়াকে, এবং একই বিশেষ্যকে যৌগিক বিধেয় দেওয়াকে ভেঙে দুটি দুটি বাক্য করায় মন খুঁত খুঁত করে। এই খুঁত খুঁত ভাব আরও বেড়ে যায় যখন 'যদু এবং মধু প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হল' জাতীয় বাক্য নেওয়া হয়। এই বাক্যটিকে 'যদু প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হল', 'মধু প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হল', এই দুটি বাক্যে অনুবাদ করে '.' এর সাহায্যে সংযুক্ত করলে মন খুবই খুঁত খুঁত করতে থাকে। এই খুঁত খুঁতানি আপত্তিতে পরিণত হয়, যখন 'তাদের বিয়ে হল এবং একটি ছেলে হল' জাতীয় বাক্য নেওয়া হয়। '.' পৌর্বাপর্য সম্পর্কে উদাসীন, অনেক দার্শনিকের যেমন উত্তর পূর্ব জ্ঞান থাকে না, তেমনই। 'ক.খ' বাক্য এবং 'খ.ক' বাক্য, একই বাক্য, একটিকে অপরে অনূদিত করা যায়। কিন্তু 'তাদের বিয়ে হল এবং একটি ছেলে হল' জাতীয় বাক্যের 'এবং'কে এরূপ মনে করলে চলে না, হুঁকা বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। 'এবং'কে '.'এ অনূদিত করা যায় না।

'যদি—তাহলে', 'অথবা' সম্পর্কে একথা আরও বেশী করে খাটে। ষ্ট্রসন

প্রভৃতি লেখক এ নিয়ে এত বেশী আলোচনা করেছেন বিশেষ করে সাংকেতিক ন্যায়ের 'যদি-তাহলে'র অসম্ভব উদ্ভট সিদ্ধান্ত-জনকত্ব এমনই প্রসিদ্ধ, যে এই আলোচনা থেকে বিরত হচ্ছি। কেবল 'না' সম্পর্কে আটপৌরে ভাষার সাম্প্রতিক নৈয়ায়িকরা কোন আলোচনা করেন না বলে, অথবা 'না'কে যে '—' এ প্রায় সাফল্যের সঙ্গে অনুবাদ করা যায়, এমন মন্তব্য করেন বলে, দু এক কথা 'না' সম্পর্কে বলছি। আটপৌরে ভাষার 'না'-র তাৎপর্য পাশ্চাত্য ন্যায়ে—কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোন ন্যায়েই ধরা পড়ে নাই; অন্ততঃ 'না'-র যে অন্য প্রকার তাৎপর্য থাকতে পারে তা পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকরা লক্ষ্য করেন নাই। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার অবসর নাই। সংক্ষেপেই দু একটি কথা বলতে হবে। পাশ্চাত্য ন্যায়ে 'না'র আলোচনা দুটি প্রকরণে পাই, একটি নঞর্থক পদ (negative term) প্রকরণে, এবং আর একটি নঞর্থক বাক্য প্রকরণে। সাংকেতিক ন্যায়েও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এখানেও শ্রেণী ক্যালকুলাসে এবং বাক্য ক্যালকুলাসেই না-র আলোচনা করা হয়। এই আলোচনা 'না'-র প্রকৃতি কতদূর ঠিক মত বুঝতে পারে, তা নিয়ে কোন বিচার করব না। কেবল এইটুকুই বলব যে 'না'-র অন্যরূপ আলোচনারও প্রয়োজন। অর্থাৎ বাক্যকে বাক্যরূপে না নিয়ে, কোনও বুদ্ধির প্রকাশ রূপেও নেওয়া যায়। এই দিক হতে বিবেচনা করলে, 'না', 'নাই' প্রভৃতি ঘটিত বাক্যকে এক প্রকার বুদ্ধির প্রকাশক বলেই বুঝতে হয়। ভারতীয় দর্শনে এই বুদ্ধিকে অভাব বুদ্ধি, নাস্তি বুদ্ধি বলে। এই বুদ্ধি অধিকরণ বুদ্ধি সাপেক্ষ। তাই পদ প্রকরণে আলোচিত 'না' এই বুদ্ধির বিষয়ের আলোচনা হতে পারে না। ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি শব্দের একটি সাদৃশ্য না-ঘট, না-পট, সংক্ষেপে পাশ্চাত্য ন্যায়ের not-Aর সঙ্গে আছে। কিন্তু এই সাদৃশ্য কৃত্রিম, একান্ত বাহ্য। ভারতীয় দর্শনে ঘটাভাব বলতে নিরালম্ব কোন কিছুকে বোঝা হয় না। বোঝা হয় ভূতলে ঘটাভাব, অথবা, ঘটাভাববান্ ভূতলকে। তারপর not-A সহজ বাক্যে উদ্দেশ্য হয় না, বিধেয়ই হয়ে থাকে, কিন্তু ভারতীয় দর্শনে,—ইংরাজী বাক্য, There is not pot in the ground, এই বাক্যটিকেই যদি সহজবাক্য বলা হয়, এবং The ground possesses absence of pot, এই বাক্যটিকেই যদি একটু অসহজ বলে মনে করা হয়, এবং তারপর তাদের অনুবাদ করা হয়, ভূতলে ঘটনাস্তি, ঘটাভাব বিদ্যতে বা, এবং ঘটাভাববদ্ ভূতল, এই বাক্য দুটিতে,—ঘটাভাবই সহজ বাক্যস্থলে জ্ঞানীয় বিশেষ্য রূপে কাজ করে, এবং অসহজ বাক্যস্থলে কাজ করে প্রকাররূপে। যাই হোক ভারতীয় দর্শনে যে অভাবের কথা বলা হয়, এবং আটপৌরে ভাষার 'না',

'নাই' যে অভাববুদ্ধি অন্ততঃ অনেক সময় প্রকাশ করে, সেই অভাববুদ্ধি অধিকরণ বুদ্ধি সাপেক্ষ। পদ প্রকরণে আলোচিত 'না', শ্রেণী ক্যাল্‌কুলাসের 'না', আর ভারতীয় দর্শনের সুতরাং আটপৌর ভাষায় সময় সময় ব্যবহৃত 'না', এক 'না' নয়। বাক্য প্রকরণের 'না' সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রযোজ্য। 'S is not P', 'ক খ নহে' বাক্যটি ভারতীয় নৈয়ায়িকের চোখে এক প্রকার অভাব-বুদ্ধি প্রকাশক বাক্য। এই অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে। এই বাক্যের বিশ্লেষণ যে হেতু ক খ ভেদবান অথবা খ ক ভেদবান্, অথবা ক ভেদ খয়ে আছে অথবা খ ভেদ কয়ে আছে, সেই হেতু অধিকরণ বুদ্ধিও এখানে কাজ করছে। উপরন্তু ধর্মীয় অন্যোন্যাভাব এবং ধর্মের অত্যন্তাভাব সমনিয়ত হয়, সুতরাং এদের এক বলে মনে করা যায়। তাই অন্যোন্যাভাব বুদ্ধি প্রসঙ্গেও অধিকরণ বুদ্ধি অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকগণ 'ক খ নহে' বাক্যের বিশ্লেষণে এ সম্পর্কে অবহিত থাকেন না। তারপর অন্যোন্যাভাব ভিন্ন অভাবও অভাব। ভূতলে ঘট নাই, প্রভৃতি বাক্যকে অনুরূপ অভাববুদ্ধি প্রকাশক বাক্যরূপে নিতে হয়। উপরে যে অন্যোন্যাভাব এবং অত্যন্তাভাবের সমনিয়তত্বের কথা বলা হয়েছে, তার সাহায্যে এই অভাবকে অন্যোন্যাভাবে পর্যবসিত করা যাবে না। কারণ বাক্যের বিবক্ষা এই নয় যে ভূতল ও ঘটত্ব ধর্মের ধর্মী ভিন্ন। এই বাক্যের বিবক্ষা, ঘটত্ব ধর্মের ধর্মী ভূতলে নাই। যাই হক 'ভূতলে ঘট নাই', জাতীয় বাক্যের 'নাই' পাশ্চাত্য ন্যায়ে আলোচিত হয় নাই। পাশ্চাত্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে যাঁরা proposition অথবা statement-এর ন্যায় নির্মাণ করেছেন, এবং যাদের ন্যায়ে হওয়ার কথা ছিল, তাদের ন্যায়েও হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে এ কথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে পাশ্চাত্য বীজগণিতের বিয়োগ চিহ্ন সংক্রান্ত পূর্ব স্বীকৃতিই, অর্থাৎ একটি বিয়োগ চিহ্ন যুক্ত সংখ্যার সঙ্গে আর একটি বিয়োগ চিহ্ন সংখ্যার গুণ করলে, একটি যোগ চিহ্ন সংখ্যা গুণফল হিসাবে লাভ করা যায়, এই পূর্ব স্বীকৃতিই, পাশ্চাত্য ন্যায়ে বিনা বিশ্লেষণে গৃহীত হয়েছে। তাই অভাবের অভাব যে সর্বদাই ভাব পদার্থ, 'না' ঘটিত বাক্যের নিষেধ করলে সবই ঠিক থাকে, কেবল 'না'-টি খসে যায়—প্রভৃতি তত্ত্ব প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে গৃহীত হয়েছে। এতে বিচারসহ কোন কাজ করা হয়েছে কি না, এ আলোচনা এখানে করা যেতে পারে না। এখানে কেবল এইটুকুই বলা হয় যে ভারতীয় দর্শনে এই তত্ত্ব সর্ববাদিসিদ্ধ তত্ত্ব নয়। ভারতীয় দর্শনের অনেকে অভাবের অভাব যে প্রতিযোগী স্বরূপ, (যদি অভাবের অভাব, অভাবের অভাবের অভাব না হয়) একথা অস্বীকার করেছেন। অনেকে অভাবের অভাবকে প্রতিযোগী স্বরূপ বলে

মনে করলেও অব্যাপ্যবৃত্তি প্রতিযোগিক অভাবের অভাব, যেমন কপি সংযোগা-ভাবের অভাব যে প্রতিযোগী স্বরূপ, একথা স্বীকার করেন নাই। তারপর অনেকে কোন কোন অভাব যে অধিকরণ ভেদে ভিন্ন হয় একথা স্বীকার করেছেন। ব্যধি-করণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবও অনেকে মেনেছেন। তারপর, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাবও তাঁরা অনেকেই অঙ্গীকার করেছেন, এবং অভাবীয় প্রতিযোগিতা যে ধর্মবিধায় এবং সম্বন্ধ বিধায় অবচ্ছেদকের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হয় এই মন্তব্য করেছেন। এখন, এই সব কথাই যে গ্রাহ্য তা নয়—কিন্তু তারা কেউই অনুভব সম্বন্ধ রহিত কথা নয়। সব কথার পশ্চাতেই যে অনুভব রয়েছে, একথা যারা এই কথাগুলি মানেন তাঁরা মনে করে থাকেন। আবার এই অনুভব যেহেতু কোন অলৌকিক অনুভব নয়, এই অনুভবের প্রকাশ যে আটপৌরে ভাষার 'না', 'নাই' প্রকৃতিতে হয়ে থাকে, একথাও তাঁরা ভাবতে পারেন। পক্ষান্তরে, আটপৌরে ভাষার 'না' এর এমনও বিশ্লেষণ সম্ভব, যার সাহায্যে এই সব কথায় পৌছানো যায়। পাশ্চাত্য ন্যায়, কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কেউই এই বিশ্লেষণ করে নাই। তাই, পাশ্চাত্যের সাধারণ ন্যায়ের 'না' এবং সাংকেতিক ন্যায়ের '—', এর কেউই আটপৌরে ভাষার 'না' নয়, অন্ততঃ পক্ষে তার যোগ্য পূর্ণ প্রতিনিধি নয়। অতএব, এই মন্তব্য এখানে করা যায় যে গাণিতিক ন্যায়ের '—' আটপৌরে ভাষার 'না' অনুবাদনে অসমর্থ।

(ক্রমশঃ)

Statement about ownership and other particulars about the newspaper* Darsan *to be published in the first Issue every year after the last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1.	Place of Publication	Calcutta
2.	Periodicity of its Publication	Quarterly.
3.	Printer's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20/2, Halder Bagan Lane, Cal.-4
4.	Publisher's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
	Nationality	Indian
	Address	20/2, Halder Bagan Lane, Cal.-4
5.	Editor's Name	Sri Kali Krishna Bannerjee
	Nationality	Indian
	Address	Flat No. 16, Block K, C. I. T. Buildings, Cristopher Road, Cal-14
6.	Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent. of the total Capital.	Bangiya Darsan Parisad 20/2, Halder Bagan Lane, Calcutta-4

I, Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that the particular given above are true to the best of my knowledge and behalf.

Dated 14th September, 1961

K. C. Gupta
Signature of Publisher
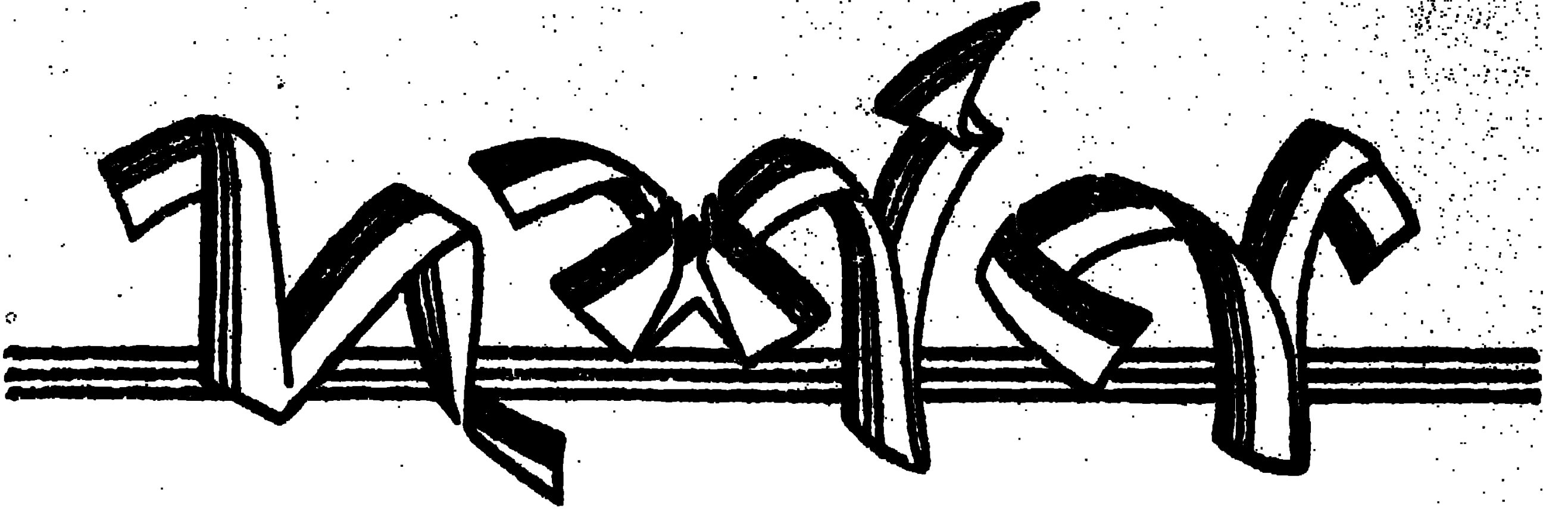
দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] কার্ত্তিক [১৩৬৭ সন

সম্পাদকীয় সমিতি

অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রধান সম্পাদক)

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

মূল্য ১'২৫ বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪।

দর্শন ও বিজ্ঞান

শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ব্যাপকতাভেদে তিন প্রকার জ্ঞানের কথা বলা যাইতে পারে, যথা প্রাকৃত বা সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান (Common seuse), বৈজ্ঞানিক পর্যায়ের জ্ঞান (Science) এবং দার্শনিক পর্যায়ের জ্ঞান (Philosophy)। ইহাদের মধ্যে প্রাকৃত জ্ঞান (commonseuse knowledge) সর্বনিম্ন স্তরের। ইহা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জাত, অসম্বদ্ধ ও অব্যাপক জ্ঞান। আমাদের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে জীবজগৎ যেরূপ প্রতিভাত হয় আমরা কোনো বিচার বিশ্লেষণ না করিয়া তাহা সেইরূপ বুঝি এবং তাহাই তাহার তাত্ত্বিক বা যথার্থ রূপ বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা সাধারণতঃ বলি 'সূর্য্য পূর্ব দিকে উঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়'। এই বাক্যটি প্রাকৃত জ্ঞানের উদাহরণ। আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের নিকট সূর্য গতিশীল, এবং উহার গতি পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে দেখা যায়। কিন্তু এ প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি সত্য হইলে বিভিন্ন দেশে দিবা রাত্রের ক্রম ও স্থিতিকাল অন্যরূপ হইত। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে প্রাকৃত জ্ঞানগুলি সুসম্বদ্ধ নহে, একটির সহিত অন্যগুলির মিল নাই, সম্বন্ধও ঠিকভাবে অবধারিত নহে। এগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকে এবং কখন কখন পরস্পর বিরুদ্ধও দেখা যায়। এজন্য এগুলির ব্যাপকতাও খুব কম। ইহারা সর্ব দেশে, সর্ব কালে ও সর্ব লোকের নিকট সত্য নাও হইতে পারে। কাজেই ইহাদিগকে লোক বিশেষের, দেশ বা কাল বিশেষের জন্য সত্য বলিতে হয়, ইহাদিগকে সর্বব্যাপী বা সার্বত্রিক বলা যায় না। প্রাকৃত-জ্ঞান-মূলক দর্শনে (Philosophy of commonsense) জীবজগৎকে

অসংখ্য স্বতন্ত্র পদার্থের সমষ্টিমাত্র বলিয়া গ্রহণ ও বিশ্বাস করা হয়। জীবজগৎ বহুধা বিভক্ত, ইহাদের মধ্যে কোন ব্যাপক মিলনসূত্র নাই। এজন্য জীব জগতের সমুদয় পদার্থ এক কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলিয়া প্রাকৃত দার্শনিক বিশ্বাস করেন না, অথবা কোন একটি দ্রব্য বা ঘটনা হইতে অন্যান্য সব দ্রব্য বা ঘটনা যে বুঝা বা অনুমান করা যাইতে পারে তাহা স্বীকার করেন না। প্রাকৃত বা সাধারণ জ্ঞান এবং দর্শন কোন ব্যক্তি বিশেষের আবিষ্কৃত জ্ঞান ও দর্শন নহে। উহা যুগ যুগ ধরিয়া ব্যক্তি বিশেষের অজ্ঞাতসারে কোন এক সমাজে বা দেশে গড়িয়া উঠে এবং বংশপরম্পরাগত সম্পত্তিরূপে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা প্রাপ্ত হয়েন।

অপরপক্ষে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান (scientific knowledge) ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের বিচার-বিশ্লেষণ হইতে প্রাপ্ত, সুসম্বদ্ধ ও ব্যাপকতর জ্ঞান। প্রাকৃত জ্ঞানের ন্যায় ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মূলেই আমরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করি এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞানের বিশেষ পরীক্ষা বা বিচার বিশ্লেষণ করা হয় না। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান (observation or experience) নিপুণ ও নিখুঁতভাবে পাইবার চেষ্টা করেন এবং যান্ত্রিক পরীক্ষার (experiment) সাহায্যে তাহাদের এবং নিজ অনুমান ও সিদ্ধান্তগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এ জন্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আমরা জগতের বা প্রকৃতির (nature) বস্তু নিচয় ও ঘটনাবলী সঠিকভাবে দেখিবার এবং নির্ভুলভাবে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করি। তারপর প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের আলোকে এ সব বস্তুর ও ঘটনার একটি যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা অর্থাৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি এবং এ ব্যাখ্যা (explanation) সঠিক কিনা তাহাও নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখি। প্রাকৃতিক পদার্থের (natural things and events) ব্যাখ্যা করিবার জন্য বৈজ্ঞানিক তাহাদের কার্যকারণ সম্বন্ধ ও অন্যান্য সাধারণ নিয়মগুলি (causal laws etc) আবিষ্কার করেন এবং এ সব নিয়মানুসারে প্রাকৃতিক পদার্থগুলির উৎপত্তি-স্থিতি লয় হয় কিনা তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এজন্য আমরা ব্যাপ্তিগ্রহ ও ব্যাপ্তি প্রয়োগ অনুমানের (induction and deduction) সাহায্য গ্রহণ করি। মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে যে কারণ বা নিয়ম মানিলে প্রাকৃতিক বস্তুগুলির ব্যাখ্যা হয় তাহার কল্পনাও করিতে হয়। কারণ কোন বস্তুর সম্ভাব্য হেতু বা কারণ অন্য অমুক দ্রব্য বা ঘটনা হইবে এরূপ একটি আন্দাজ বা কল্পনা না করিলে আমরা কোন্ দিকে তার কারণ অনুসন্ধান করিব তার হদিস অর্থাৎ নির্দেশ নাই। এরূপ কল্পনাকে উপপাদক কল্পনা (hypothesis) বলা যায়। তারপর সেই কল্পিত উপপাদক যে যথার্থ কারণ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে; ইহাকে উপপাদক

কল্পনা পরীক্ষা (Proof of an hypothesis) বলা যায়। যদি এইরূপ সতর্কতার সহিত আমরা প্রাকৃতিক জগতের বিভিন্ন রকম বা শ্রেণীর পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারি তবে তাহা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আর একটি লক্ষণ হইতেছে যে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞানকে সম্বন্ধযুক্ত বা সুসম্বদ্ধ করিতে হইবে, যেন তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ না হয় এবং একটি জ্ঞান বা প্রাকৃতিক নিয়ম হইতে অন্য জ্ঞান বা নিয়মগুলি পাওয়া যায়। এরূপ করিতে পারিলে আমরা বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানগুলিকে সুসম্বদ্ধ জ্ঞান বলিব। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এই অর্থে সুসম্বদ্ধ জ্ঞান এবং এই কারণে প্রাকৃত জ্ঞান অপেক্ষা ব্যাপকতর জ্ঞান। অর্থাৎ উহা প্রায় সব দেশ কাল ও লোকে সত্য হইবে। দৃষ্টান্তরূপ টোলেমির ভূকেন্দ্রবাদ ও কাপোর্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রবাদের কথা বলিতে পারি। প্রথম মত হইতেছে পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া আদিত্যাদি গ্রহ ঘুরিতেছে, দ্বিতীয় মত হইতেছে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিব্যাদি গ্রহ ঘুরিতেছে। প্রথম মত গ্রহণ করিলে আমরা পৃথিবীর সব দেশের ও সব অবস্থার ও সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিতে পারি না, এক বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে অন্য বিষয়ের জ্ঞানের বিরোধ হয় এবং অন্যান্য ব্যাঘাতও ঘটে। কোপোর্ণিকাসের মতে এরূপ ব্যাঘাত ঘটে না, পক্ষান্তরে পার্থিব ব্যাপারের একটা সুসমঞ্জস ব্যাখ্যা করা যায়। এ জন্য তাঁহার মতই এখন লোকে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। ইহা হইতে আরও বুঝা যায় যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিবর্তনশীল, সব সময়েই উহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হইতে পারে। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি (scientific truths) শাশ্বত, অলঙ্ঘ্য ও অপরিবর্তনীয় নহে। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে একপ্রকার দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে। উহাকে বৈজ্ঞানিক দর্শন (Scientific Philosophy) বলা হয়। ইহাতে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পদ্ধতির (Scientific Method) প্রয়োগ করা হয়। অধুনা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে দর্শনে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পদ্ধতির (Scientific method in philosophy) বহুল প্রচার ও সমাদর দেখা যায়। তাঁহারা মনে করেন যে ইহার দ্বারা দর্শন শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের মত সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুনিশ্চিত করা যাইতে পারিবে।

পার্থিব বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। এ সব বিজ্ঞানকে দুইভাবে বিভক্ত করা যায়, যথা বিষয়বস্তু হিসাবে আর উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন হিসাবে। বিষয়বস্তু হিসাবে বিজ্ঞানগুলিকে চারিভাগে ভাগ করা যায়: (১) জড় বিজ্ঞান (Physical science)। ইহার মধ্যে পদার্থ বিদ্যা (Physics), রসায়ন (Chemistry), ভূবিদ্যা (Geology), জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি

বিজ্ঞান পড়িবে। (২) প্রাণ-বিজ্ঞান (Biological sciences), যথা উদ্ভিদ বিদ্যা (Botany), প্রাণীবিদ্যা (Zoology) ইত্যাদি। (৩) সমাজ বিজ্ঞান,—যথা মনোবিজ্ঞান, (Psychology), নীতি বিজ্ঞান (Ethics), অর্থশাস্ত্র (Economics) রাজনীতি (Politics) সৌন্দর্য বিজ্ঞান (Aesthetics) ইত্যাদি। (৪) চিন্তার-আকার-বিষয়ক বিজ্ঞান (Formal sciences), যথা—ন্যায়শাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি। এগুলিতে আমরা বাহ্য বা আন্তর দ্রব্য বা বিষয়ের কথা ভাবি না, কিন্তু ঐ বিষয়গুলি জানিবার বা অনুমান করিবার সময় আমাদের চিন্তার কি রূপ বা আকার হওয়া উচিত, অর্থাৎ কি প্রকার হইলে তাহা সত্য ও যথার্থ হইবে তাহাই নির্ণয় করিবার চেষ্টা করি।

প্রয়োজন হিসাবে বিজ্ঞানগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা বর্ণনা-মূলক ও আদর্শ মূলক (Descriptive and Normative sciences)। উপরি লিখিত প্রায় সকল বিজ্ঞানই বর্ণনামূলক; কারণ উহারা জ্ঞানের বিষয়গুলির বিবরণ মাত্র দেয়। পক্ষান্তরে ন্যায়শাস্ত্র (Logic), নীতিশাস্ত্র (Ethics), সৌন্দর্য বিজ্ঞান (Aesthetics), ইত্যাদি আদর্শমূলক, কারণ উহারা একটি না একটি আদর্শ (Ideal) স্বীকার করিয়া তদ্দ্বারা নিজ নিজ বিষয়ের মূল্য (values) নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করে।

এই সব বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে উহারা বস্তু সত্তার বাহ্য রূপ (Phenomena) লইয়া আলোচনা করে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে এক একটি বিজ্ঞান প্রকৃতির এক এক বিভাগের বা এক এক জাতীয় বস্তুর আলোচনায় বা জ্ঞানার্জনে নিবদ্ধ এবং কেহ অন্য কাহারও বিষয় লইয়া বিচার করে না। তাহা হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আছে এবং কোন কোন বিষয়ে মতেরও মিল আছে।

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত বলেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি হইতেছে দর্শন। বিজ্ঞানগুলির কয়েকটি লক্ষণ আছে যাহা হইতে স্বভাবতঃই দার্শনিক চিন্তা ও গবেষণার উন্মেষ হইবে। প্রথমে দেখা যায় বিজ্ঞানগুলি কয়েকটি তথ্য অবিচারিতভাবে মানিয়া বা স্বীকার করিয়া লয়। আমাদের বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা যে জীবজগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভে সমর্থ ইহা বৈজ্ঞানিক মানিয়া লন। কোনও প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপাদিত করেন না। বৈজ্ঞানিক আরও মানিয়া লন যে প্রাকৃতিক বস্তু নিচয় কার্যকারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ, কারণ বিনা কোন কার্য্য হয় না, সব বস্তুরই কারণ আছে এবং সব বস্তুই পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ ও তদ্দারা নিয়ন্ত্রিত।

এ সব তথ্য না মানিলে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান চর্চা চলে না, এগুলি অবশ্য স্বীকার্য্য কিন্তু অপ্রমাণিত বিশ্বাসমাত্র (unproved assumptions)। দর্শনশাস্ত্রে এগুলির যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ করিতে হয়, কারণ মানুষের প্রজ্ঞা প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত কোন মত বা প্রত্যয় গ্রহণ করিতে রাজী নয় এবং তাহা করিতে হইলে ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হয়।

তারপর দেখা যায় বিজ্ঞানগুলির সব সময়েই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিতেছে। কোন বিজ্ঞানই চিরকাল একভাবে থাকে না। উহারা নিত্য নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতেছে এবং প্রাকৃতিক বস্তু ও ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রকৃতির যে সব সাধারণ নিয়মানুসারে সেগুলি হইতেছে তাহা নির্ণয় করে। এইভাবে প্রত্যেক বিজ্ঞান ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছে। এস্থলে দার্শনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির একটা সমন্বয় সাধন করিবার জন্য কোন সর্বব্যাপক বা ব্যাপকতম সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন। এসব সর্বব্যাপক সিদ্ধান্তকেই দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা দার্শনিক সত্য বলা হয়।

আর একটা কথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান খণ্ড জ্ঞান (selective)। এক একটি বিজ্ঞান প্রকৃতির এক এক ভাগ বা অংশ লইয়া আলোচনা করে। আবার যে বিজ্ঞান যে ভাগের আলোচনা করে তাহারও সব বিষয়ের ও ব্যাপারের অনুসন্ধান করে না। যেমন জড় বিজ্ঞান (physical science) জড় পদার্থ এবং উহার গঠন ও শক্তির পরিণামাদি লইয়া বিচার করে। জড় জগতের অন্যান্য বিষয় যথা রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি আলোচনা করে না। তারপর প্রাণ বিজ্ঞান প্রাণ সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির আলোচনা করে, জড় বা মন সম্বন্ধে কোন গবেষণা করে না। অবশ্য প্রকৃতিকে ভাগ করিয়া তাহার কোন বিশেষ ভাগের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার উপযোগিতা ও উপকারিতা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীবজগৎ কোনরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর-দ্বারা বিভক্ত নহে। ইহার একাংশ অন্য সব অংশের সহিত জড়িত এবং একটিকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে হইলে অন্যগুলিকেও জানিতে হয়। কাজেই বলিতে হয় বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞান জীবজগৎ সম্বন্ধে অপূর্ণ বা খণ্ড জ্ঞান। মানব মন এরূপ খণ্ড জ্ঞানে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। আমাদের বিচার বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা বিশ্বের সব কিছু জানিতে চায়, সব কিছু বুঝিতে চায়। আমরা বিশ্বের পূর্ণ জ্ঞান লাভের প্রয়াসী। অতএব বিশ্বের পূর্ণ জ্ঞান পাইতে হইলে আমাদিগকে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানগুলির সমাবেশ ও সমন্বয় সাধন করিতে হইবে, আর সেই সামগ্রিক জ্ঞানের নামই দর্শন।

দর্শনকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্বাভাবিক পরিণতি বা রূপান্তর বলিলে উহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। এই মত অনুসারে কোন কোন দার্শনিক দর্শনকে

বিজ্ঞান সমূহের সমন্বয় শাস্ত্র (synthesis of the sciences) বলিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে ভুণ্ট (Wnndt) প্রদত্ত দর্শনের লক্ষণের উল্লেখ করিতে পারি। তিনি বলিয়াছেন 'দর্শন সেই সর্বব্যাপী বিজ্ঞান (universal science) যাহাতে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের জ্ঞান সমূহের মিলনে একটি সুসংগত মতবাদ স্থাপন করা হয় (Philosophy is the universal science which has to unite the cognitions attainted by the particular sciences into a consistent system)। হার্বার্ট স্পেনসারের মতেও 'দর্শন সম্পূর্ণরূপে সুসম্বদ্ধ জ্ঞান (completely unified knowledge), দর্শনের ব্যাপক সিদ্ধান্তে বিজ্ঞান সমূহের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তগুলি অন্তর্ভুক্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয় (the generalisation of philosophy comprehend and consolidate the widest generalisations of science)। কিন্তু এ মত গ্রহণীয় নহে। এরূপ হইলে দর্শন বিজ্ঞান সমূহের সত্য বা সিদ্ধান্তগুলির সমষ্টি বা যোগফলমাত্র হইয়া পড়িবে। এবং তাহার কোনো বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র সত্তা থাকিবে না। তারপর সর্ব বিজ্ঞানের সব সিদ্ধান্ত জানা যে কোন মানুষের পক্ষে অসম্ভব, কেন না অতীত ও বর্তমান বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি জানা সম্ভব হইলেও ভবিষ্যত কালে যে সব বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইবে তাহাদের সম্বন্ধে আমরা এমন কিছু জানিতে পারি না। শেষ কথা দর্শন যদি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির সমষ্টিমাত্র হয়, তবে বিজ্ঞানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক সত্য ও তত্ত্বগুলিরও পরিবর্তন ও বর্জন হইতে পারে। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্বগুলি নিত্য ও শাশ্বত বলিয়াই আমরা স্বীকার করি।

আধুনিক কালে নব্য-বস্তুতন্ত্রবাদী (neo-realist) কোন কোন দার্শনিক বলেন দর্শন বিজ্ঞান সমূহের সমষ্টি নহে, কিন্তু বিজ্ঞানের মূল তত্ত্বগুলির বিচার মূলক জ্ঞান (critical study of the fundamental categories of science)। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে প্রত্যেক বিজ্ঞান কতকগুলি তত্ত্ব বিচার না করিয়া মানিয়া লয়, কারণ এগুলি স্বীকার না করিলে বৈজ্ঞানিক আলোচনাই চলে না। এই তত্ত্বগুলি সর্বগত এবং জাগতিক সকল বস্তুরই সাধারণ ও সর্ব্বব্যাপী ধর্ম (pervasive characters)। এরূপ তত্ত্ব হইল দ্রব্যত্ব, একত্ব, দেশ, কাল, কার্য-কারণ-সম্বন্ধ ইত্যাদি। যে কোন বস্তুর কথা বলা যাক না কেন তাহা দেশ ও কালে অবস্থিত এবং তাহা একটি দ্রব্য বা দ্রব্যনিষ্ঠ ধর্ম এবং তাহার সহিত অন্য বস্তুর কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। বিজ্ঞান এইগুলির তত্ত্ব বা স্বরূপ নির্ধারণ করে না। দর্শনে এগুলির বিচার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়। দেশ, কাল প্রভৃতি তত্ত্বগুলি

স্বরূপতঃ কি তাহা সাধারণ লোকে বিচার করিয়া দেখে না। বৈজ্ঞানিকগণ সেগুলির বাহ্যরূপ বা বৃত্তি বিশেষের (specific functions) আলোচনা করিলেও সাধারণতঃ তাহাদের স্বরূপ (ultimate nature) সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হন না। দর্শন শাস্ত্রেই আমরা বিচার করিয়া দেখি দেশ, কাল প্রভৃতির স্বতন্ত্র বিষয়গত সত্তা (independent objective reality) আছে, না উহারা কেবল জ্ঞানগত ভাব বা আকার মাত্র subjective ideas or forms)। ন্যায়সঙ্গত যুক্তিতর্ক ও বিচার দ্বারা (Logical analysis and criticism) এসব তত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয় করাই দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

দর্শনের পূর্বোক্ত লক্ষণটিও দোষমুক্ত বলিয়া মনে হয় না। আর তাহার মূলে বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের সে সম্বন্ধ নির্ণয় করা হইয়াছে তাহাও বোধ হয় ঠিক নয়। দর্শন বলিতে যদি বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির বিচারমাত্র বুঝায় তবে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য থাকে না এবং দর্শনকে একটি পৃথক শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিবারও আবশ্যকতা থাকে না। বিজ্ঞান মাত্রই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি যুক্তি-দ্বারা সমর্থন করে। ন্যায়সঙ্গত বিচার প্রণালীর সাহায্যেই বৈজ্ঞানিক সত্য বা তত্ত্ব-গুলি সমর্থিত হয়। বিজ্ঞানের দুইটি দিক আছে। একদিকে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক দ্রব্য নিচয়ের জ্ঞান লাভ করিতে এবং প্রাকৃতিক নিয়মগুলি (natural laws) আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। এটাকে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক (practical) দিক বলা যাইতে পারে এবং সে সব বিজ্ঞানে শুধু এই দিকটিই আছে তাহাদিগকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান (applied science) বলে। অপরদিকে বিজ্ঞান তাহার তত্ত্বগুলি সমর্থন যোগ্য কিনা তাহা বিচার করিয়া দেখে। অবশ্য এই বিচার ন্যায়সঙ্গত প্রণালীতেই করিতে হয়। এটিকে বিজ্ঞানের প্রামাণ্যের (theoretical or logical) দিক বলা যাইতে পারে। এখন, বিজ্ঞান যদি প্রামাণ্যের দিক দিয়া তাহার অপর তত্ত্বগুলির ন্যায় মূল-তত্ত্বগুলিও বিচার দ্বারা সমর্থন করে তবে আর দর্শনের প্রয়োজন কি? বস্তুতপক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানে জড়তত্ত্ব (matter), দেশ, কাল (space, time) প্রভৃতির স্বরূপ নির্ণয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহা কতকটা ফলবতীও হইতেছে। এরূপ স্থলে দর্শনের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন থাকে না। এইজন্যই বোধহয় কোন কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বর্তমান কালে দর্শন নাম পরিত্যাগ করিয়া ন্যায় সম্মত দৃষ্টবাদের (logical positivism) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরবর্তীকালে দর্শন বলিয়া কোন শাস্ত্র থাকিবে না এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও (predication) করিয়াছেন। অপর পক্ষে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলির সত্যাসত্য বা স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য যদি দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয়, তবে বিজ্ঞানের অপর তত্ত্বগুলিও দর্শনশাস্ত্র দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে

এবং বিজ্ঞানের পৃথক সত্তা স্বীকার করার পক্ষে কোন হেতু থাকে না। ফলকথা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার করা ও যুক্তিদ্বারা সমর্থন করা বৈজ্ঞানেরই কাজ, সে জন্য দর্শন নামে পৃথক শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। বিজ্ঞান সে প্রণালীতে তাহার অপ্রধান বা বিশেষ তত্ত্বগুলি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়, সেই প্রণালী দ্বারা তাহার প্রধান বা মূল ও সাধারণ তত্ত্বগুলি কেন নির্ণয় করিতে পারিবে না তাহা বুঝা যায় না। আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বিজ্ঞানের দ্বারা নিরূপিত না হইলে দর্শন তাহা কি প্রকারে নির্ণয় করিবে তাহাও সহজবোধ্য নহে। অন্যক্ষেত্রে দার্শনিক মত গ্রহণযোগ্য হইলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মত গ্রহণ করা দার্শনিকের পক্ষে সমীচীন ও অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে দেশ কাল ও জড়তত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ে যে মত পোষণ করা হয় তাহা আধুনিক বিজ্ঞান হইতেই লওয়া হইয়াছে মনে হয়। অতএব দর্শনকে বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের বিচার শাস্ত্র (critical study of the foundations of seience) বলিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বলা সুকঠিন হইয়া পড়ে।

দর্শন ও বিজ্ঞানের লক্ষণ নির্দেশ করিতে গিয়া যে সব দার্শনিক দর্শনকে বিজ্ঞানের রূপান্তর বা নামান্তর বলিয়াছেল তাঁহাদের মত যে গ্রহণীয় নহে তাহা আমরা দেখিয়াছি। কারণ এরূপ বলিলে দর্শন বিজ্ঞানেই পর্যবসিত হয় এবং উহাদের কোন পার্থক্যও থাকে না, আর যাহাদের পার্থক্য নাই তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধের কথা ঠিক ভাবে বলা চলে না। বরং বিজ্ঞানকেই দর্শনের আসনে বসাইয়া দর্শনকে নির্বাসিত করা বা চিরতরে বিদায় দেওয়া দার্শনিকের পক্ষে সমীচীন হইবে। কিন্তু আমরা এর কোনটাই করিতে প্রস্তুত নয়। বিজ্ঞানকে দর্শনের স্থান দেওয়া যায় না, আর দর্শণকে পরিত্যাগ করাও যায় না। অতএব আমাদিগকে অন্যভাবে উহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে।

দর্শনের লক্ষণ নির্দেশ করিতে আমরা বলিতে পারি যে দর্শন সকল বিষয়ের বা জীব-জগতের তত্ত্ব ও অবভাস, স্বরূপ ও আপেক্ষিক রূপ, বাহ্য ও আন্তর সত্ত্বা (phenomena and noumena) এতদুভয়ের আলোচনা করে এবং বিচারপূর্বক তাহাদের জ্ঞান লাভ করিবার ও সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে। এরূপ হইলে দর্শন ও বিজ্ঞানকে পরস্পর নির্ভরশীল (interdependent), সহযোগী ও পরস্পরেরর পরিপূরক (complimentary) শাস্ত্র বলিতে হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি বিজ্ঞান আমাদের যে জ্ঞান দেয় তাহা বস্তুনিচয়ের বাহ্যরূপ (phenomana) বিষয়ক, অর্থাৎ উহা প্রাকৃতিক জগতের এবং আমাদের মন বা আত্মার প্রত্যক্ষযোগ্য গুণ ধর্ম ক্রিয়া

ও অবস্থার (perceptible experiencible or empirical states and processes) পরিচয় দেয়। এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দর্শন ও দর্শনকে বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। কারণ দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ (sensible word) সম্বন্ধে বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানই দার্শনিকের জ্ঞান অপেক্ষা ঠিক, সুসম্বন্ধ ও বিশ্বাসযোগ্য। এদিক দিয়া বলিতে হয় দর্শনকে বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হইবে।

কিন্তু বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহাতেই সীমাবদ্ধ বলিয়া আমাদেরও প্রাকৃতিক জীব-জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের (reality or noumena) এবং উহাদের তাৎপর্য (rsignificance), উদ্দেশ্য (purpose), স্বাভাবিক কর্ম ও চরম লক্ষ্য (function and destiny) প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ আলোক বা জ্ঞান দিতে পারে না। তারপর বিজ্ঞান খণ্ডজ্ঞান, ইহাদ্বারা আমরা বিশেষ বিভিন্ন বিভাগের (different departments of the world) পৃথকভাবে জ্ঞান লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক জ্ঞান বা ধারণায় (conception of the world as a whole) উপনীত হইতে পারি না। এসব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য লইতে হইবে। দর্শনেই এসব বিষয়ের যথাযোগ্য বিচার করা হয় এবং নির্ভরযোগ্য জ্ঞান পাওয়া যায়। এদিক দিয়া বলা যায় বিজ্ঞানকে দর্শনের সহায়তা লইতে হইবে এবং উহা দর্শনের উপর নির্ভর করে।

একটি দৃষ্টান্তদ্বার বিষয়টি বুঝান যায়। কোন লোকের আভ্যন্তরিক বা মানসিক অবস্থা জানিতে হইলে আমরা তাহার দৈহিক অবস্থা কথাবার্তা, আচরণ ইত্যাদি (অর্থাৎ বাহ্য প্রকাশগুলি) দেখি এবং তাহা হইতেই বিচাববুদ্ধি বা প্রজ্ঞার (intellect or reason) সাহায্যে তাহার মানসিক অবস্থা জানি। তেমনি জীব-জগৎ সম্বন্ধে তত্ত্ব জানিতে হইলে তত্ত্ব প্রকাশক পরিদৃশ্যমান বস্তু নিচয়ের (phenomena) যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং তাহা হইলে প্রজ্ঞার সাহায্যে তত্ত্ব ও তত্ত্বার্থ জানিতে হইবে। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে (sense experience) প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হইতেই পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যাইবে।

আবার পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের তত্ত্ব ও তাৎপর্য এবং সে সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা পাইতে হইলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও তথ্যগুলির দার্শনিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা আবশ্যক। দর্শনশাস্ত্রে আমরা তত্ত্বার্থ এবং জীব-জগতের সামগ্রিক রূপের জ্ঞান লাভ করি। অতএব দেখা যাইতেছে যে দর্শন ও বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক, দর্শনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান (পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের জ্ঞান) বিজ্ঞানে পাওয়া যায়, অবার বিজ্ঞানে যে জ্ঞানের (অর্থাৎ তত্ত্বার্থ জ্ঞানের) অভাব আছে তাহা দর্শনেই পাওয়া যায়।

একটি অন্যটির অভাব পূরণ করিলে পূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যাইবে এবং তাহাতে আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিব। এজন্য কখন কখন দর্শনকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের এবং তন্মূলক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমালোচনা ও তাৎপর্য—ব্যাখ্যা বলা হয় (Philosophy is the criticism of experience, or rational interpretation of scientific knowledge)।

সাধারণ দৃষ্টিতে চেতন মনের চিত্র

শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়

[এই প্রবন্ধটি ওয়াল্টিয়ারে ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে অধিষ্ঠিত ভারতীয় দর্শন মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে A commonsense view of eonsciousness নামক পঠিত প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।]

মানুষ চেতনশীল প্রাণী। তাহার মন হইতেছে তাহার চেতনার আধার বা উৎস। চেতনযুক্ত মনের সাহায্যে মানুষ তাহার জ্ঞানকে অর্জন ও ধারণ করে। মানুষের চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট হইতেছে এই যে সে ইহার সাহায্যে শুধু যে বহুবিধ বিষয় ও বস্তুকে জানে তাহা নয়, উপরন্তু সে জানে যে সে জানে। অর্থাৎ মানুষের শুধু জ্ঞান হয় তাহা নয়, তাহার জ্ঞানের জ্ঞানও হয়। ইহা অস্বীকার করা যায় না। জ্ঞানের জ্ঞান যদি সম্ভব না হইত তবে আমরা এরকম কথা বলিতেই পারিতাম না যে "রামকে সংবাদ আমিই দিয়াছি" বা "বহু চেষ্টা সত্বেও শ্যামের সঙ্গে আমি দেখা করিতে পারি নাই।" এই রকম দৃষ্টান্তের দ্বারা এ কথা সহজেই বুঝান যায় যে অনেক সময় আমরা আমাদের নিজের নিজের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার দ্রষ্টা হই এবং আমরা যে জানিতেছি তাহা জানিতে পারি। আমাদের এই ক্ষমতা আছে বলিয়াই আমরা যাহা ঘটিতে দেখিয়াছি সে সম্বন্ধে অনেক সময় সাক্ষ্য দিতে পারি। ভিন্ন ভাষায়, নিজের মনের দর্শক হইবার মত ক্ষমতা কম বেশি সকল মানুষেরই আছে এবং এই ক্ষমতার সাহায্যে আমরা আমাদের "মনের দিকে" তাকাই এবং সেখানে যে ভাবের স্রোত বা মনশ্চিত্রের আনাগোনা চলিতেছে তাহা জানিতে পারি।

আমাদের প্রত্যেকের মনে যাহা ঘটে বা ঘটিতেছে তাহাকে অপরের জ্ঞানের গোচরে আনিতে হইলে আমরা ভাষার সাহায্য লই। ভাষাই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে ভাব বা জ্ঞানের আদানপ্রদানের অন্যতম যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। প্রত্যেকে কেবল মাত্র নিজের মনের খবর প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারে। আমরা যেভাবে নিজের "মনের দিকে" তাকাই সেভাবে অপরের মনের দিকে তাকাইতে পারি না। ভিন্ন ভাষায় আমরা অন্যের মনে "প্রবেশ" করিতে পারি না। ইহার অর্থ এই নয় যে আমাদের ভাব বা জ্ঞান অপর কেহ জানিতে পারে না, বা অপরকে তার অংশ দেওয়া

যায় না। বহুবিধ উপায়ে আমরা আমাদের ভাব বা জ্ঞানকে প্রকাশ করি এবং অপরকে সে জ্ঞানের অংশীদার করি। যদিও জ্ঞান মনজাত, ইহা আমাদের মস্তিষ্ক, শিরা, স্নায়ু ও অন্যান্য দেহাংশের ক্রিয়াকে আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হয়। ফলে জ্ঞানের সূচনায় তাহা সম্পূর্ণভাবে আমাদের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং অপর কেহ তাহাতে কোন অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেহ বাহিরের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত নয়। দেহের সঙ্গে তাহার নিকট পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ও সেই পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বৃহত্তর জগতের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে, এবং দেহাশ্রিত মনজাত জ্ঞান, বহুবিধ উপায়ে অতি সহজেই বহির্জগতে প্রকাশ লাভ করে। সূচনায় যাহা আমার নিজস্ব, পরিশেষে তাহা অনেক সময় অন্যের হয়। কিন্তু সকল সময় তাহা হয় না।

কেন হয় না? যেহেতু আমার জ্ঞানকে প্রকাশ করা বা না করা কিছু পরিমাণে অন্ততঃ আমার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রয়োজন হইলে এবং ইচ্ছা থাকিলে আমার জ্ঞানকে আমি নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারি। এরকম ক্ষমতা কম বেশি আমাদের প্রত্যেকের আছে। অবশ্য কেহই অন্তহীনভাবে এই ক্ষমতার অধিকারী নয় এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই ক্ষমতার তারতম্য ঘটে। যে শিশু বা পাগল বা অন্যভাবে অপারগ তার এই ক্ষমতা অতি কম—প্রায় নাই বলিলেই চলে। অপরে অনায়াসে তার মনে "প্রবেশ" করিতে পারে, যদি না অন্য কোন বাধা থাকে। এখানে বাধা বলিতে আমরা এই জাতীয় বিষয় বুঝি যেমন ভাষা-ব্যবহারে শিশুর স্বাভাবিক অপারগতা, অশিক্ষিতের শব্দের পুঁজির অভাব, ইত্যাদি। অপরদিকে, যারা লেখক, বৈজ্ঞানিক বা চিন্তাবীর, তাহাদের এই ক্ষমতা সাধারণ লোকের ক্ষমতা হইতে অনেক অধিক। রাজনীতিজ্ঞ বা কূটনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা শেষের দলে পড়েন। ইহাদের অনেক সময় এই ক্ষমতায় এত বেশি দখল জন্মে যে একই কথাকে একই সময় ইহারা বলেন অথচ বলেন না। সাধারণ লোকেরা একদিকে শিশু প্রভৃতি ও অপরদিকে লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি এই দুই দলের মধ্যে পড়ে। তাহাদের জ্ঞানকে প্রকাশ বা গোপন করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুদক্ষ উকিলের জেরায় পড়িলে ইহারা কদাচিৎ মনের কথা গোপন রাখিতে পারে। কিন্তু এই রকম লোকেরাও ইচ্ছা করিলে উকিল মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হইতে না পারে এবং মনের কথা গোপন করিয়া রাখিলেও রাখিতে পারে। ইহাতে বুঝা যায় যে মনের ভাবকে প্রকাশ করা বা না করা, অথবা সে ভাবকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার ক্ষমতা মানুষের আছে।

কিন্তু একটু আগেই বলিয়াছি যে কোন মানুষই অন্তহীনভাবে এই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। এমন কি সুদক্ষ রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক ব্যক্তিদেরও নিজেদের ভাবের উপর সম্পূর্ণ অধিকার নাই। অতি দক্ষ লেখকেরা বা চিন্তাবীরেরাও জানেন যে কিভাবে তাহাদের ভাবগুলি তাহাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে। অভিজ্ঞ চিন্তাবীরও অতিকষ্টে এবং ধীরে ধীরে তাহার ভাবগুলিকে নিজের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনেন। কিন্তু তাহাও অতি অল্প সময়ের জন্য। কয়েকটি ভাবকে আয়ত্বে আনিয়া তাহাদের যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিতে না করিতে আরও অনেক ভাব তাহার মনের "কোণে ও মোড়ে" উঁকি মারিতে থাকে এবং তাহাদের ধরিতে না ধরিতে আরও আরও অনেক ভাব মনের মধ্যে আসিয়া ভীড় করে। ইহাদের সবগুলিকে সকল সময় ধরা যায় না। কতকগুলি ভাবের ভীড়ে হারাইয়া যায়, আবার কতকগুলিকে ধরিতে পারিলেও প্রকাশের উপযোগী করিয়া তুলা যায় না। গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই আমাদের বক্তব্যের সত্যতা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সে যাহা হউক, এখন যে কথা বলিতে চাই তাহা হইতেছে এই যে, আমাদের মনে যে ভাবের আনাগোনা হয় তাহাদের সকল সময় ধরা বা প্রকাশ করা যায় না, এবং ফলে তাহাদের মারফৎ যদি আমরা আমাদের চেতন মনের কোন মানচিত্র পাইবার চেষ্টা করি, তবে সে চেষ্টা সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভাষা হইতেছে আমাদের মনের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ উপায় বা অবলম্বন। কিন্তু ভাব ও ভাষা জাতিগতভাবে পৃথক। সেজন্য ভাষা সম্বন্ধে যাহা সত্য তাহা সকল সময় ভাষাশ্রিত ভাবের সম্বন্ধে সত্য নাও হইতে পারে। এই সহজ কথাটার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ার জন্য অনেক গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিও মনে করেন যে ভাষা ও ভাষাশ্রিত ভাবের মধ্যে আবয়িক সাদৃশ্য আছে। যেমন, আমরা কোন বিষয়ে মনোযোগ "দেই" এবং ভিখারীকে ভিক্ষা "দেই"। এখানে এই দুই "দেই"তে ভাষাগত সাদৃশ্য থাকিলেও অর্থগত সাদৃশ্য আদৌ নাই। এজন্য ভাষা বিশ্লেষণের দ্বারা মনের সম্পূর্ণ মানচিত্র পাইবার চেষ্টা করিলে বহু অসুবিধা আছে। কয়েকটি অসুবিধার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

ভাষা এক নয়, বহু। ইহার ফলে, একই ভাব ভিন্ন ভাষার মারফতে প্রকাশ করার জন্য ভিন্ন বিষয়কে বুঝাইতে পারে; অপরদিকে বিভিন্নভাব বিভিন্ন ভাষার মারফৎ প্রকাশের জন্য একই ভাবকে বুঝাইতে পারে। যেমন "গম্ভীর" কথাটি; ইহা বাংলার যে অর্থে ব্যবহৃত হয় হিন্দীতে সকল সময় সে অর্থে ব্যবহৃত হয় না। আমরা যাহাকে বলি "গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা" হিন্দীতে তাহাকে অনেক সময় বলা হয়

"গম্ভীর আলোচনা"। এখানে "গুরুত্বপূর্ণ" ও "গম্ভীর"এর ভাবগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু ভাষাগত সাদৃশ্য নাই। অপরদিকে "গম্ভীর প্রকৃতি"র গম্ভীর ও "গম্ভীর আলোচনা"র গম্ভীরে এ ভাষাগত ঐক্য আছে কিন্তু ভাবগত ঐক্য নাই। ইহা ছাড়া, অনুবাদক ও দোভাষীগণ জানেন যে অনেক সময় একভাষার ভাব ঠিক যথাযথভাবে অপর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই অবস্থায়, এক ভাষার মারফৎ আমরা মনের যে চিত্র পাইব, অপর ভাষার সেই মনের ঠিক সেই রকম চিত্র পাইব না।

ভাষা সম্বন্ধে আর একটি অসুবিধা হইতেছে এই যে এমন অনেক বিষয় আছে যে যাহারা ভাবের বিষয়বস্তু হিসাবে এক ও অখণ্ড, কিন্তু ভাষা মারফৎ প্রকাশিত হইবার খণ্ডিত হইয়া যায়। যেমন একটি লাল বল দেখিয়া আমি বলিলাম 'বলটি লাল'। এখানে ভাবের বিষয়বস্তু হিসাবে বল ও তাহার বর্ণের মধ্যে কোন পৃথকত্ব নাই। আমার মনে বলের যে চিত্র পড়িয়াছে তাহাকে বল ও তাহার বর্ণ এক ও অখণ্ড ভাবে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু ভাষাতে বল ও বর্ণ পৃথক; কথ্য ভাষায় একটির পরে একটি আসিতেছে; লিখিয়া প্রকাশ করিতে গেলে দুইটি পৃথক স্থানে অবস্থান করিবে। অথচ মনোজগতে বল ও তাহার বর্ণের মধ্যে এইরূপ স্থান-কালের ব্যবধান নাই। সুতরাং ভাষা-বিশ্লেষণের মারফৎ মনের যে মানচিত্র আমরা পাইতে পারি, তাহা স্বভাবতই হইবে আংশিক, অপূর্ণ ও খণ্ডিত।

অবশ্য ভাষা ও ভাবের জাতিগত পার্থক্য স্বীকার করিয়া লওয়ার জন্য আমরা ইহাদের মধ্যে যে ঘনিষ্ট সংযোগ আছে, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। বস্তুতঃ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভাষাই ভাব প্রকাশের সর্ব শ্রেষ্ঠ উপায়। এজন্য আমাদের ভাষাকে ভাবোপযোগী করিবার জন্য আমার ভাষার সংশোধন ও সংস্কার করি, নূতন শব্দ ও বাক্যাংশ গঠন করি, বিদেশী ভাষা হইতে শব্দ ধার করি এবং অন্যান্য বহু প্রকারের চিহ্ন ও সংকেত সংগ্রহ করি। এইভাবে আমরা আমাদের ভাষাকে যতদূর সম্ভব ভাবের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করি। অপরদিকে, ভাবকেও আমরা ভাষানুরূপ করিবার চেষ্টা করি। এইভাবে ভাব ও ভাষা পরস্পরকে শোধন ও সংশোধন করিয়া নিজেদের অগ্রগতি অব্যহত রাখিয়াছে এবং পরস্পরকে সমৃদ্ধশালী করিতেছে।

ভাষা সম্বন্ধে যাহা সত্য ভাব প্রকাশের অন্যান্য উপায় সম্বন্ধেও তাহা সত্য। চিত্র, আলেখ্য, দৈহিক ভাবভঙ্গি ও নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক নিদর্শন ও আমাদের ভাব প্রকাশের উপায়। ইহা সকল সময় ভাষাগত বা ভাষাজাত নয় এবং সর্ব্বদা ভাষার বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। অনেক সময় ভাষায় যাহা প্রকাশ করা যায় না, তাহা ইহাদের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। আবার অনেক সময় কোন বিষয় ভাষার

সাহায্যে যতটুকু ও যেভাবে প্রকাশ করা যায়, ইহাদের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অধিক ও অনেক সুষ্ঠুভাবে তাহা প্রকাশ করা যায়। এইভাবে এই সকল নির্ভাষিক ভাব প্রকাশের উপায়গুলি ভাষার কার্যকেও সম্পূরণ করে। যে কোন ছবির কথা ধরা যাউক। কোন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দেখিয়া আমরা সে দৃশ্য সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারি তাহা বহু বিস্তারিত ভাষাবিবরণীর সাহায্যে কখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায় না। অতএব ভাষাই আমাদের চিন্তার একমাত্র বাহন নয় এবং আমাদের চিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশও করিতে পারে না। মনের সম্পূর্ণ মানচিত্র সেজন্য আমরা ভাষা-বিশ্লেষণের দ্বারা পাইতে পারি না। বরং ভাবপ্রকাশের বিভিন্ন উপায় মারফৎ আমরা মনের সম্বন্ধে যে সকল বিষয় জানিতে পারি তাহাদের মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্য আবিষ্কারের দ্বারা আমরা মনের আরও ব্যাপক ও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাইতে পারি। কিন্তু সে চিত্রও মনের সম্পূর্ণ মানচিত্র হইবে না, কারণ মনজাত বিষয়গুলিও তাহাদের প্রকাশের উপায়গুলি পরস্পর হইতে পৃথক এবং তাহাদের এই পার্থক্য বিজাতীয় পার্থক্য।

মঙ্গলময় এবং অমঙ্গল

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাগিণীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিতবাণী—
শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"

বিংশশতাব্দীর বিশ্বকবির কণ্ঠেই শুধু নহে, যুগে যুগে বিশ্বপ্রেমিক, পরমধার্মিক, আস্তিক, নাস্তিক সকলের কণ্ঠেই এ ক্ষোভ, এ আর্তিধ্বনিত হইয়া উঠে। অনাচারীর অত্যাচার লাঞ্ছিত প্রেমপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গের অশ্রু আমাদের কাতর করিয়া তুলে; মৃত্যুমুখী জোয়ানের মর্মন্তুদ ক্রন্দনে আমরা উচ্চকিত হই—'হে ঈশ্বর কতদিনে তোমার সন্তানেরা তোমার প্রতিনিধিকে স্বীকার করিয়া লইবে।...ক্রুশবিদ্ধ যীশুখৃষ্টের চরম পরিণতিকে আমরা ব্যথিত বিস্ময়ে হতবাক হই। মানবের জরা ব্যধি মৃত্যুতে ভারাক্রান্ত হইয়া রাজার দুলাল সংসার ত্যাগ করেন। এই অত্যাচার, এই অনাচার, এই অন্যায়, এই অজ্ঞান, মৃত্যুজরা ইহাই অমঙ্গল। ইহা মঙ্গলের অভাবমাত্র নহে—আরও কিছু—ইহা দুঃখের, ব্যথার, অনুতাপের পুঞ্জীভূত প্রকাশ। মঙ্গল যদি সত্য হয়—তবে অমঙ্গলও সত্য—একের স্বীকৃতিতেই অন্যের স্বীকৃতি। আর এই অমঙ্গলকে অস্বীকার করা বাস্তব বহুজনগ্রাহ্য অভিজ্ঞতা বিরোধী। বস্তুতঃ আমরা সকলেই জীবনে অমঙ্গল বা অকল্যাণকে স্বীকার করিয়া লই—আমরা জানি সুখ থাকিলে দুঃখও আছে, হাসি থাকিলে অশ্রুও আছে, পুষ্প থাকিলে কীটও আছে। সাধারণ জ্ঞানে ইহা কোনও সমস্যাও সৃষ্টি করে না। স্বভাববাদীর পক্ষে (Naturalist) ইহা ঘটনা বা বস্তু নিচয়ের মধ্যে একটী—ইহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—স্বীকার করায় কোনও দ্বন্দ্বও নাই। জড়বাদীর প্রকৃতি মঙ্গল-অমঙ্গল স্বীকার করে না—কারণ জড়ের প্রতি এরূপ বিশেষণ প্রয়োগ অবান্তর, মার্কসীয় দার্শনিকের জগতে মঙ্গল অমঙ্গলের সহিত ঈশ্বরও শ্রেণী বিশেষের কপোলপ্রসূত উদ্দেশ্য শোষকের শোষণে ইহা অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা। সকলপ্রকার ধর্মমতেও ইহা সমস্যা সৃষ্টি করে না।

আমরা সাধারণভাবে বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করি—আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করি যে বিশেষ বিশেষ কল্যাণ বা অকল্যাণের সহিত বিশেষ দেবদেবী জড়িত। তাই আমরা বসন্তের প্রাদুর্ভাবে শীতলাদেবীর আরাধনা করি, কলেরা মহামারীতে মাতা রক্ষাকালীর শরণাপন্ন হই, দুর্ভাগ্যপীড়িত হইয়া গ্রহরাজের স্তব করি। বহু ঈশ্বরবাদে অমঙ্গল সমস্যা নাই। এইরূপ মতবাদের দোষগুণ অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। দ্বিদেববাদেও অকল্যাণ সমস্যা আকারে দেখা দেয় না। প্রাচীন পারসিক মতে কল্যাণ এবং অকল্যাণের জন্য দুইটী পৃথক্ দেবের কল্পনা করা হয়—তাঁহারা সর্বদা যুধ্যমান—একের সাময়িক জয় বা পরাজয় কল্যাণের প্রাচুর্য বা অকল্যাণের প্রাদুর্ভাবের কারণ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এইরূপ ধর্ম মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ থাকিলেও আমরা প্রত্যক্ষভাবে তাহার সহিত জড়িত নাই।

অমঙ্গল সমস্যা বিশেষ গুরুতরভাবে দেখা দেয় একপ্রকার একেশ্বরবাদে—যেখানে ধর্মের আরাধ্য ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্, মঙ্গলময়, প্রেমময় সৃষ্টিত্রাণ-সংহারকর্তা পরমপুরুষ হিসাবে কল্পনা করা হয়। কারণ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ মঙ্গলময় স্রষ্টা হইলে তাঁহার রাজত্বে অমঙ্গল কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা এক সমস্যা। তখন এক প্রায় দুরতিক্রম্য উভয় সঙ্কটের সৃষ্টি হয়—ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান্, স্রষ্টা হন এবং তাঁহার সৃষ্টিতে অমঙ্গল থাকে, তবে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলা যায় না; আবার যদি তিনি মঙ্গলময় স্রষ্টা হ'ন এবং তাঁহার সৃষ্টিতে অমঙ্গল থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্বশক্তিমান্ স্রষ্টা বলা যায় না। এই বিশেষ দৃষ্টিতেই আমরা এই সমস্যার আলোচনা করিব এবং বিচার করিয়া দেখিব কোনও সমাধান আছে কিনা।

এই সমস্যার উদ্ভব বা তাহার সমাধানের বিষয়ে আমাদের দুইটী বিষয় অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ যে ধর্মমতে ঈশ্বর স্বীকার করা হয় না বা একাতীত ঈশ্বর স্বীকার করা হয় বা এক ঈশ্বর স্বীকার করিয়া তাহার এক বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, সেখানে এ সমস্যা নাই। দ্বিতীয়তঃ অমঙ্গলকে অস্বীকার করিয়া কোনও সমাধান দেওয়া চলে না—কারণ সেখানে সমস্যার উদ্ভব হয় না। আমাদের মতে ইহাকে সমস্যা বলিয়া ধরিতে হইবে এবং ইহাকে সমস্যা হিসাবে স্বীকার করিলে ইহার অস্তিত্ব নস্যাৎ করা চলিবে না। কারণ অমঙ্গল কে অস্বীকার করিলে মঙ্গল কথার কোনও অর্থ থাকে না—আর ঈশ্বরকেও মঙ্গলময় বলা নিরর্থক হইয়া পড়ে। বুঝা যাইতেছে এখানে আমি ধর্ম কথাটী একটু বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতেছি। ধর্ম কথাটীর প্রত্যয়গত অর্থ যাহা ধারণ করে (ধৃ+মন্)। ইহা অত্যন্ত

ব্যাপক এবং হিন্দুধর্মে এই অর্থে ধর্মকথাটীর ব্যবহারও করা হইয়াছে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে ধর্ম কথাটীর সম্যক্ সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার এবং শেষ পর্যন্ত তাহা সম্ভব কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। (এ বিষয়ে দর্শন—১৩৬৬ সাল—৩য় সংখ্যায় সুধীজন কিছু আলোচনা করিয়াছেন—এপ্রসঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিতে প্রয়োজন বোধ করি না। তবে একথাও অবশ্য গ্রাহ্য যে ধর্মের মধ্যে মানবমন এক (বা একাধিক) অতীন্দ্রিয় শক্তির সন্ধান করে—এই শক্তিকে সে তাহার সকল আদর্শ-দ্বারা ভূষিত করে—তাহার মধ্যে নিজের অসহায়তা ঘুচাইয়া পরম নির্ভরতার আশ্বাস চায়। এই শক্তির উদ্দেশ্যেই তাহার যাগ, যজ্ঞ, পূজা, সেবা ইত্যাদি। মানবমন এই অতীন্দ্রিয় শক্তিকে তাঁহার প্রতি উদাসীন বলিয়া ভাবিতে পারে না—এই শক্তি চিৎশক্তি এবং এই শক্তির অধিকারী পুরুষোত্তম ভগবান্ বা ঈশ্বর যিনি মানুষের প্রেম, ভক্তি, প্রার্থনা ইত্যাদির প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টি রাখেন। একেশ্বরবাদ ধর্মে এই ঈশ্বরই আমাদের আরাধ্য—তাঁহাকে মঙ্গলময়, প্রেমময়, সর্বশক্তিমান্ শ্রষ্টা, ত্রাতা সংহারকর্তা বলিয়া না কল্পনা করিলে ধর্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই সর্বগুণসম্পন্ন মঙ্গলময় ঈশ্বরে বিশ্বাসই একেশ্বরবাদী ধর্মের মূল ভিত্তি। আর অমঙ্গলের সমস্যাও এখানে।

এইভাবে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের পরিধি স্থির করিলে দেখা যায় যে অনেক বিশেষ ধরণের একেশ্বরবাদের সমাধান এ সমস্যার যথাযথ সমাধান নহে। উদাহরণ স্বরূপ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্রবর স্পিনোজার দর্শনের কথা বলা যায়। স্পিনোজার দর্শনকে সর্বেশ্বরবাদ বলা হইয়া থাকে (Pantheism) যদিও আমার মনে হয় স্পিনোজার দর্শনের এইরূপ পরিচয় সঙ্গত নহে। যাহা হউক, স্পিনোজার দর্শনে বলা হয় যে মূল সত্তা এক এবং অদ্বিতীয়। ইহাই ঈশ্বর—ইহাই স্রষ্টা—ইহাই সৃষ্টি। স্রষ্টা এবং সৃষ্টির (সৃষ্ট বিশ্বাদি) মধ্যে পার্থক্য অযৌক্তিক। কারণ সৃষ্টির পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিলে স্রষ্টা সীমিত হ'ন—তাহাকে আর অদ্বিতীয়, অসীম মূল সত্তা বলা যায় না। কাজেই ঈশ্বরই বিশ্ব—বিশ্ব ঈশ্বরময়। বিচিত্র বস্তুসজ্জিত এ বিশ্বের পৃথক্ স্বীকৃতি যুক্তি বিরুদ্ধ। একই বহু—বহু একমাত্র। ইহা যেন জ্যামিতির একটী স্বতঃসিদ্ধ এবং তাহা হইতে উদ্ভূত সিদ্ধান্ত অনুসিদ্ধান্ত। সেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ ভিন্ন ভাবিতে পারা যায় না—তাহারা স্বতঃসিদ্ধেরই বিকাশ মাত্র—তাহাদিগকে পৃথক করা যায় না—অথচ শুধু স্বতঃসিদ্ধে যে বিস্তৃতি সিদ্ধান্ত অনুসিদ্ধান্তের মধ্যমে যেন তদপেক্ষা অধিক বিস্তৃতির ঘোষণা হয়। বহুত্ব সম্বন্ধে স্পিনোজার এই মত দার্শনিকগণের বিশেষ মতভেদের আকর। একদিকে স্পিনোজা অদ্বৈত বেদান্তের মত সরাসরি বহুত্বকে ভ্রম

মাত্র বলেন না আবার রামানুজ দর্শনের মত বা হেগেলীয় দর্শনের মত এককে বহুর সমন্বয়ে গঠিত এক পরম সত্তাও বলেন না। সে যাহাই হউক, স্পিনোজার এই অদ্বিতীয় নির্গুণ সত্তাকে (Reality) ধর্ম্মের আরাধ্য ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন করা যায় না। স্পিনোজার দর্শনকে সর্বেশ্বরবাদ না বলিয়া পরব্রহ্মবাদ বলাটা অধিক সঙ্গত। কারণ ধর্মের জন্য স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, ভক্ত এবং ভগবানের পার্থক্য অবশ্য স্বীকার্য্য। কাজেই স্পিনোজার দর্শনে অমঙ্গল ভাব পদার্থ নহে—ইহা জ্ঞানের অভাবের দ্যোতক মাত্র—কারণ এক সত্তার মধ্যে মঙ্গল—অমঙ্গল বিভাগ অর্থহীন; এইরূপ সমাধান আমাদের মতে গ্রহণ যোগ্য নহে। কারণ ধর্ম্মের আরাধ্য মঙ্গলময় পুরুষোত্তম ঈশ্বরের অস্বীকৃতির সহিত অমঙ্গল সমস্যাও উপেক্ষা করা হইয়াছে। আরও বলা যায় যে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অস্বীকৃতি ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে যদিও এরূপ মতবাদ হয়তো দার্শনিক যুক্তির বিরোধী নহে। তবে এখানেও প্রশ্ন তোলা যায় যে জ্ঞানের অভাব বা অজ্ঞানের কারণ কি? ইহার সদুত্তর পাওয়া দুষ্কর। ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমরা যথাযথ আলোচনা করিব।

দার্শনিক লাএব্‌নিৎস অমঙ্গল বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে তাঁহার এবং স্পিনোজার দর্শনের মধ্যে গভীর পার্থক্য বিদ্যমান বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে লাএবনিৎসের মত বিচার করিলে দেখা যায় যে একদিক দিয়া তিনিও একবাদী বা একেশ্বরবাদী। এ দিক দিয়া বিচার করিলে ঈশ্বর মোনাড্ সমূহের স্রষ্টা। আবার অন্যদিক হইতে ঈশ্বর মোনাড্ সমূহের মধ্যে একটী মাত্র—এবং ইহা শ্রেষ্ঠ মোনাড্। ইহা কোনও রকমেই অন্যান্য মোনাডের স্রষ্টা নহে। এই মত পার্থক্যই লাএব্‌নিৎসের দর্শনের প্রধান দুর্বলতা। "God's relation to the system of Monads is not entirely clear. He is both the creator of the whole system of Monads and the chief Monad........" L. Shaw—Leibniz—P. 90). যাহা হউক, লাএব্‌নিৎসকে একেশ্বরবাদী হিসাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে তাঁহার পক্ষে অমঙ্গল সমস্যা একটী বিশেষ সমস্যা। তিনিও ঈশ্বরকে বিশ্বনিদান এবং মঙ্গলময় বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে এই বিশ্বই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কারণ এখানে অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গলের সর্ব্বাধিক প্রাচুর্য্য। কিন্তু অমঙ্গল আছেই এবং তাহার প্রয়োজনও আছে। যেমন একটি নাটকে নায়কের চরিত্র সম্যকরূপে বর্ণনা করার জন্য দুর্ব্বল বা দুর্বৃত্তের চরিত্রের সৃষ্টি প্রয়োজন হয়—তেমনই উৎকৃষ্ট বিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজনে অমঙ্গল প্রয়োজন। পাপ বা

নৈতিক অকল্যাণ মানবের ঐহিক স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের ফল। লাএব্‌নিৎস বস্তু বা জীবের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও স্বীকার করেন না আবার পূর্ণ নির্ভরতাও সমর্থন করেন না। এ বিষয়ে তাঁহার মত বিশেষ অস্পষ্ট। যাহা হউক, পূর্ণ ঐহিক স্বাধীনতা স্বীকার করিলে নৈতিক অমঙ্গলের কারণ ব্যাখ্যা সহজ হয়, কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বরকে আর সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান বলা যায় না।

হেগেলীয় দর্শনে অমঙ্গলকে বিশ্বের বিবর্ত্তনের এক প্রয়োজনীয় অধ্যায়রূপে ধরা হয়। নৈতিক অকল্যাণ বা পাপের মাধ্যমে মানব ক্রমশঃ উচ্চতর আদর্শের দিকে নীত হয়। পরব্রহ্মে অবশ্য এই সব অসামঞ্জস্য নাই—ইহা সুসমন্বিত পরমসত্তা—ইহাতে ব্যক্তিসত্তা ও এক বিশেষরূপে অবস্থান করে। এখানে প্রথমতঃ বলা যায় যে পাপ যে সর্ব সময়ে মানবকে উচ্চতর মানবতার আদর্শে চালিত করে ইহা সত্য নহে। বাস্তব ঘটনার দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপ অকল্যাণ মাত্র—তাহাতে কল্যাণের শুভ ইঙ্গিত নাই। দ্বিতীয়তঃ হেগেলের পরব্রহ্মকে আমাদের সংজ্ঞানুযায়ী ধর্মীয় ঈশ্বর বলা যায় না। কারণ ইহাতে ব্যক্তিসত্তার পরব্রহ্মের সহিত মিলনের যে আদর্শের কথাই ঘোষণা করা হউক না কেন, এরূপ মিলনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি আর ব্যক্তি থাকে না। সে নিজেকে অতিক্রম করিয়া নিজত্বকে বিসর্জ্জন দিয়াই এই মিলন লাভ করে। ধর্মের ভাষায় বলিতে গেলে এখানে ভক্ত নিঃশেষিত হইয়া যায় কাজেই ভগবানের পূজা আর সম্ভব হয় না। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিনাশে কোনও ঈশ্বরবাদী ধর্ম গড়িয়া উঠিতে পারে না। তৃতীয়তঃ এখানে অমঙ্গলকে যথাযথভাবে স্বীকার করা হয় নাই। ইহাকে বৃহত্তর কল্যাণের সোপানরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু অকল্যাণকে অস্বীকার করিয়া কল্যাণের সত্যতা স্থাপন করা চলে না। বোসাঙ্কে এবং ব্র্যাড্‌লিও অকল্যাণ সম্বন্ধে অনুরূপ মত পোষণ করেন। বোসাঙ্কে ত অকল্যাণকে স্বীকারই করিতে চান না। ইহা মঙ্গলেরই নামান্তর—স্বস্থানচ্যুত মঙ্গল, (Evil is good in the wrong place)—The value and Destiny of the Individal. পরমসত্তায়—পরমকল্যাণে অমঙ্গলের চিহ্ন মাত্র নাই। ব্র্যাড্‌লি এ বিষয়ে আলোচনায় তিন প্রকার অকল্যাণের কথা বলেন: (ক) দুঃখ, যন্ত্রণা ইত্যাদি, (খ) হতাশা, ব্যর্থতা, (গ) অনাচার, ব্যাভিচার—পাপ। (ক) প্রসঙ্গে তাঁহার বক্তব্য এই যে দুঃখ কষ্ট আছে বটে তবে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহা আর দু খ কষ্ট থাকে না। আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও নাকি ইহার সাক্ষ্য দেয়। এখানে ব্র্যাড্‌লে যুক্তি অপেক্ষা বিশ্বাসের উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন। ("I should still believe that in the universe there is prepouderence of pleasure."

It depends on general nature of reality). "Appearance and peatity. P. 175-176. আর তিনি যে সত্তায় অকল্যাণের অনস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন তাহা ধর্মীয় ঈশ্বর কিনা আমরা শীঘ্রই বিচার করিব। (খ) সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে হতাশা অবিশ্বাসজ্জাত। যথার্থ নির্দ্ধারণের অভাবেই ব্যর্থতা আসে—কাজেই ইহা ভাব পদার্থ নহে। (গ) সম্পর্কে তিনি কিছু অসুবিধা স্বীকার করিলেও বলেন যে পাপ নৈতিক চেতনা উদ্ভূত এবং নৈতিকবোধই স্ববিরোধী। (Moral eivl exists only in moral experience and that experience in its essence full of inconsistency Ibid. P. 178) পরমসত্তার সকল বিরোধের অবসান হয়—কাজেই সেখানে নৈতিক বিচ্যুতির প্রশ্ন নাই। এইভাবে অমঙ্গলকে অস্বীকার করিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। আর বস্তুতঃ ব্র্যাড্‌লির পরব্রহ্ম ঈশ্বর নহেন—কারণ তাঁহাকে নৈতিক প্রেমময় পুরুষ হিসাবে বর্ণনা করিতে তিনি স্বীকৃত নন—কারণ তাহাতে বিরোধ দেখা দেয়। (The trouble [problem of evil] has come from the idea that the Absolute is a moral person. And if you start from that basis, then the relation of evil to the Absolute presents at once an irreducible dilemnaa. The problem then becomes insoluble........" P. 174). অতএব দেখা যাইতেছে ব্রাড্‌লি অমঙ্গলকেও স্বীকার করেন না আর ঈশ্বরকেও স্বীকার করেন না। কাজেই তাঁহার কোনও সমস্যাই নাই।

অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ (Deism) সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী। কোনও এক বিশেষ মুহূর্ত্তে ঈশ্বর অসৎ হইতে সতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বরকে জাগতিক অকল্যাণের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিবার জন্য এখানে বলা হয় বিশ্ব সৃষ্টির ঈশ্বর ইহাকে গৌণ কারণ সমূহের নির্ভরশীল করাইয়াছেন, ঈশ্বর ঠিক যন্ত্রীর মত—অতি বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন যন্ত্রের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এ বিষয়ে প্রথমতঃ বলা যায় যে বিশেষ মুহূর্ত্তে সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক জটিলতা আছে। দ্বিতীয়তঃ এরূপ মতবাদে মানবের পূর্ণ ঐচ্ছিক স্বাধীনতা স্বাকার করায় মানবই অকল্যাণের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহাতে ঈশ্বর মুক্তি লাভ করেন বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার ভক্ত প্রাণের পরম ভক্তির আসনও দাবী করিতে পারেন না। বিশ্বনিরপেক্ষ ঈশ্বর ধর্মের প্রয়োজন সাধন করিতে পারেন না। অতএব অতিবর্তী ঈশ্বরবাদের এ সমাধান গ্রহণযোগ্য নহে।

এই সকল আলোচনা হইতে এ কথা পারিষ্কার বুঝা যায় যে ঈশ্বরকে এবং ধর্মকে স্বীকার করিলে, অমঙ্গল সমস্যা সহজে সমাধান করা যায় না—

একান্তই যায় কিনা তাহাই বিচার্য। আর ঈশ্বরকে দর্শনের পরব্রহ্মোর সহিত অভিন্ন কল্পনা করিলে এ সমস্যাই থাকে না। আমরা একদিকে ঈশ্বরকে স্বীকার, অন্যদিকে অমঙ্গলকে অস্বীকার করিতে পারি না। অমঙ্গল সমূহকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; (১) প্রাকৃতিক— যথা বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি। (২) অতি-প্রাকৃত— মানবের সীসমতা, খর্বশক্তি ইত্যাদি। (৩) নৈতিক— অনাচার, পাপ ইত্যাদি। (১) প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের কারণ হয়ত প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত এবং ইহা হয়ত সর্বদা অকল্যাণ জ্ঞাতকও নহে। অকল্যাণের পশ্চাতে কল্যাণ থাকে যেমন থাকে শীতের অবসানে বসন্তের আশ্বাস, বন্যার তাণ্ডবের অন্তে পলিমাটি সাঞ্চিত উর্বর ভূমিতে সজীব শস্য প্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা। কিন্তু তাহাতে অমঙ্গল মঙ্গল হইয়া যায় না। এবং প্রাকৃতিক অকল্যাণের শেষ কারণ ঈশ্বর ইহা অস্বীকার করিলে প্রকৃতিকে স্বভাববাদীর মত স্বয়ংক্রিয় একটা সত্তা বলিয়া স্থির করিতে হয়। ইহাতে আর ঈশ্বরের প্রয়োজন থাকে না। আস্তিক ধর্মে সাধারণতঃই প্রাকৃতিক কার্য্যাবলীর জন্য মানবের অদৃষ্ট বা কর্মফলকে কারণ বলিয়া স্বীকার করা হয়। ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদে সাধারণভাবে বলা হয়—অদৃষ্ট অনুযায়ী ফল লাভ করার উপযোগী বিশেষ সৃষ্টি সর্বদাই করা থাকে— কাজেই হয় এই সকল অকল্যাণ প্রকৃত অকল্যাণ নহে— অজ্ঞান সঞ্জাত মাত্র অথবা তাহারা কৃতকর্মেরই ফল স্বরূপ। এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে আমাদের আরও একটি বাস্তব সাধারণ জ্ঞান বিরোধী কথা স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই যে তথাকথিত জড় এবং অজড় প্রকৃতির মধ্যে ভিন্নতা নাই। জড় প্রকৃতির জড় মাত্র নহে—ইহা মানবের নৈতিক জগতের পটভূমিকা— নীতিবোধ ইহাকে সর্বথা পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে। এভাবে দেখিলে (১) নং অকল্যাণ আর (৩) নং অকল্যাণ পৃথক্ থাকে না। (২) নং সম্বন্ধেও বলা চলে যে আমাদের ক্ষুদ্রতা, খণ্ডতা আমাদেরই অজ্ঞান জন্য। অজ্ঞান দূরীভূত হইলে আমাদের খণ্ডতাও দূরীভূত হয়। এরূপ সমাধানে শেষ পর্য্যন্ত নৈতিক অকল্যাণকে সর্ব অকল্যাণের কারণস্থল বলিয়া ধরা হয়। তাহাতে প্রশ্নের অবকাশ আছে। কিন্তু এরূপ মতবাদের আরও ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত এই যে অজ্ঞান—বিহীন আমরা অসীম, অখণ্ড—ইহাতে ঈশ্বরের সত্তা ব্যাহত হয়। কাজেই লাএবনিৎসের মত বলিতেই হইবে যে আমরা খণ্ড— এবং ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ঈশ্বরকে অনন্ত, অসীম পূর্ণ হইতে হইলে আমাদিগকে শান্ত, সসীম, খণ্ড হইতেই হইবে। ধর্মের দিক্ হইতে এ বিভেদ স্বীকার একান্ত

প্রয়োজন। অতএব এই অকল্যাণকে অকল্যাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এখন প্রশ্ন নৈতিক অকল্যাণের। তাহার জন্য ভারতীয় দর্শনে সাধারণভাবে অজ্ঞান বা অবিদ্যাকে দায়ী করা হয়। এই অবিদ্যা আবার স্বকর্মফলজাত। ভারতীয় দর্শনে সৃষ্টি তত্ত্বকে অনাদি বলা হয়— সেজন্য প্রথম অবিদ্যার জন্ম সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফল অনুসারে ফল-ভোগ করিতেই হয়—তাহাতে নিস্তার নাই। এইভাবে সকল অকল্যাণকে মানবের কর্মফল সঞ্জাত বলার সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে—(ক) মানবের সম্পুর্ণ ঐচ্ছিক স্বাধীনতা আছে এবং (খ) ঈশ্বরের কর্মফলকে বিনষ্ট করার শক্তি নাই। বলা যায় যে ইহা তাঁহার ঈপ্সিত অপূর্ণতা—কিন্তু তাহাতে তাঁহার অপূর্ণতা দূর হয় না। ভারতীয় ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরকে স্রষ্টা, নিয়ন্তা, মঙ্গলময়, সর্বশক্তি ও গুণের আকর অদৃষ্টের চালক বলা হইলেও অদৃষ্টের বা কর্মের একান্ত স্রষ্টা বলা হয় না। অদৃষ্টের বিধান অমোঘ—তাহাতে ঈশ্বরেরও হস্তক্ষেপ সম্ভব নহে। ঈশ্বরে এই অপূর্ণতা ভক্তপ্রাণে বিক্ষোভ জাগায়। "সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরনং ব্রজ, অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িস্যামি মা শুচ"—যুক্তির দৃষ্টিতে ইহা বৃথা স্তোক-বাক্য বলিয়া মনে হয়। যুক্তিতে ঈশ্বরকে পূর্ণ শক্তির আকর বলিলে অমঙ্গলের দায়িত্ব ও তাঁহার উপর ন্যস্ত করিতে হয়—তখন ঈশ্বর আর মঙ্গলময় থাকেন না—মঙ্গল—অমঙ্গল নিরপেক্ষ হইয়া যান। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক র‍্যাসডল্ ও এইরূপ অসামঞ্জস্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বলিয়াছেন যে শেষ পর্যন্ত ভগবানকে অকল্যাণের কারণ (অন্ততঃ আংশিক) না বলিয়া পারা যায় না—যদিও এইরূপ না বলিতে পারিলেই ভাল হয়। শঙ্কর বেদান্তেও একথা স্বীকার করা হয়—যে ঈশ্বর ও অমঙ্গল সমস্যার যুক্তিপূর্ণ সমাধান নাই—এই জন্যই ঈশ্বরকেও শুধু ব্যবহারিক সত্তা মাত্র বলিতে হয়—ইহাকে পরম সত্তা বলা যায় না। পরমার্থিক দৃষ্টিতে পরব্রহ্মই এক অদ্বিতীয়, সর্বগুণাতীত সত্তা—সেখানে মঙ্গল অমঙ্গল নাই, স্রষ্টা, সৃষ্টি নাই, ভক্ত-ভগবান নাই—কাজেই ধর্মও নাই, নীতিওও নাই। ইহা যুক্তির শেষ কথা হইতে পারে কিন্তু ধর্মবোধের, হৃদয়ানুভূতির শেষ কথা নহে—এখানে ধর্মবোধ অপরিতৃপ্ত থাকে। কাজেই দেখা যায়, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ধর্মকে স্বীকার করিলে—মঙ্গলময়ের সহিত অমঙ্গলের সম্পর্কের কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। একদিকে ন্যায়-বর্ণিত ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে হয় নতুবা তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া ধর্মকে অস্বীকার করিতে হয়। রামানুজের মত মধ্য পন্থা অবলম্বন কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। কারণ তখন ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্কের সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায়

না। দুই যদি অভিন্ন হয়—অকল্যাণ থাকে না—কিন্তু ধর্ম্মও থাকে না—দুই যদি ভিন্ন হয়—ঈশ্বর সীমিত হন। একই সঙ্গে কিরূপে ভিন্ন এবং অভিন্ন হয়—তাহার প্রাণধান করা যায় না।

কিন্তু আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ধর্মমত দার্শনিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য সে বিশ্বাস যে দার্শনিক যুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত এমন ভাবিয়া লওয়ার কারণ নাই। ধর্মমতে আমরা ঈশ্বরকে আদর্শরূপে মানি। গুপ্ত পর্বত সঙ্কুল ভয়ঙ্কর জলরাশির মধ্যে তিনি আলোক স্তম্ভ স্বরূপ—তিনি আমাদের বিপদের সঙ্কেত করেন—গন্তব্যের নির্দেশ দান করেন, দুর্গম যাত্রাকে তাঁহার আদর্শের দ্বারা মধুর করিয়া তুলার প্রয়াস পান। তিনি এই পথ সুগম করিয়া তুলিতে পারেন না—যুক্তিবিদের এ বাক্য সত্য হইলেও ধর্মবিশ্বাসে বাধা পড়ে না। ধর্মে এক বিরাট আশাবাদের ভিত্তি আছে—যাহার হয়ত দার্শনিক, যুক্তিসিদ্ধ কারণ নাই। সোপেনহাওয়ারের ক্ষোদক্তি হয়ত সত্য—কিন্তু ধার্মিকের ধর্মবুদ্ধি তাহাতে নষ্ট হয় না। কাজেই মনে হয় এ বিষয় দার্শনিক প্রবর কান্টের মতই গ্রাহ্য—ধর্ম যুক্তির বাহিরে—ইহা বিশ্বাসের বস্তু। যাহা হউক উপসংহারে আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে ধর্মের জন্য ভক্ত এবং ভগবানের বিভেদ স্বীকার করিতে হয়—এবং এরূপ স্বীকৃতিতে ঈশ্বরের পূর্ণতা ব্যাহত হয়। কাজেই ঈশ্বর মঙ্গলময় হইলেও সর্বশক্তিমান্ নহেন। ঈশ্বর ও জীবের সম্পর্কে বিষয়ে ধর্মমত গ্রাহ্য কোনও সন্তোষজনক দার্শনিক সমাধান সম্ভব হইলেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব, নতুবা নহে।

দার্শনিক মূরের মূল্য ধারণা *

[ডক্টর সুধীর কুমার নন্দী]

বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে ভাববাদী ভাব ভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করলেন ব্রিটিশ বাস্তববাদীদের অগ্রগণ্য দার্শনিক জর্জ এডওয়ার্ড মূর। তিনি তার একখানি গ্রন্থের উপসংহারে বললেন, যে কাজকে আমরা ভালো কাজ বলি তার মধ্যে এমন কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই থাকবে যা কেবল মাত্র মানুষের সমস্ত ভালো কাজেই উপস্থিত থাকতে পারে এবং মন্দ কাজ কখনই তা উপস্থিত থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যে পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কাজটা করা হয়েছে সেই অবস্থায় অনুরূপ অন্যকোন কাজ করে কৃত কর্মের চেয়ে অধিকতর শুভ ফললাভ করা যেত না। তৃতীয়তঃ কৃত কর্মের ফলকে যদি ভাল বলি তাহলে তার অনুরূপ সমস্ত কার্যকেই ভালো বলব এবং অন্যান্য মন্দ কর্ম থেকে এই ভালো কর্মটীকে পৃথক ক'রে দেখব এবং ঐ মন্দ কর্মকে এবং তার অনুরূপ বা স্বধর্মবিশিষ্ট সমস্ত কর্মকেই নিকৃষ্ট বলে মনে করব।

মূর বর্ণিত প্রথম বৈশিষ্ট্যটী নিয়ে আলোচনা করা যাক। যাকে আমরা ভালো কাজ বলছি সেই কাজের বা যে কোন কাজের তিনটী অঙ্গকে আমরা নির্দেশ করতে পারি: উদ্দেশ্যাঙ্গ (Intention বা motive) প্রক্রিয়া এবং ফল। এখন মনে করা যায় যে আলোচ্য কর্মটীর উদ্দেশ্যাঙ্গ শুভ বলে তাকে ভালো কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনায় যে দূর প্রসারী দুরূহ বিতর্কের সৃষ্টি হবে তা হ'লো কাজটীকে ভালো বলছি উদ্দেশ্যই শুভ বলে না কর্মফল কল্যাণকর ব'লে। সেটীকে এড়িয়ে গেলেও আমরা মূর প্রদর্শিত আলোচনার সরনি বেয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট সর্বগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছি না। কেননা ঐ উদ্দেশ্যটী শুভ হলেও এবং ভালো কাজের লক্ষণ হিসেবে এই শুভ উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করলেও মূর নির্দ্দিষ্ট প্রথম তত্ত্বটির সম্যক প্রতিষ্ঠা হয় না। কেননা এমন কথা বলা চলে না যে শুভ উদ্দেশ্যটীর আশ্রয় কেবল মাত্র শুভ কর্মের মধ্যেই। অশুভ কর্মের পিছনে শুভ উদ্দেশ্য থাকতে পারে না এমন কথা কেবল মাত্র তখনই বলা চলে যখন আমরা বলব যে কাজের

১। Ethics পৃঃ ১৪০

* বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশন পঠিত।

আত্যন্তিক মূল্য বিচার কেবল মাত্র উদ্দেশ্য দিয়েই সাধিত করতে হবে। শুধুমাত্র উদ্দেশ্য নির্ভর হ'লে কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা দুরূহ হ'য়ে পড়ে, কেননা উদ্দেশ্য ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং ব্যক্তি নির্ভর ; তাই মূর কর্মের মূল্যবিচারে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য বিচারকেই মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেননি ; তার এই না গ্রহণ করার ফলে উপরি বর্ণিত শুভকর্মের প্রথম লক্ষণটি কেবল মাত্র শুভ কর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারেণ। অভিজ্ঞতা বলে যে এখন বহু কর্ম নিত্য সংসারে সঙ্ঘটিত হচ্ছে যার উদ্দেশ্য সাধু এবং মহৎ হলেও তার ফল অকল্যাণকর হয়েছে। সুতরাং যদি একথা বলা হয় ভালো কর্মের মধ্যে এমন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকবে যা কেবল মাত্র ভালো কর্মের মধ্যেই থাকবে এবং যা মন্দ কর্মের মধ্যে থাকবে না তা'হলে একথা অসংসয়ে বলা চলে যে সেই গুণটি কর্মের উদ্দেশ্য আশ্রয়ী নয়। তবে সেই গুণটি কী প্রক্রিয়া আশ্রয়টি ? কর্মের শুভাশুভ প্রক্রিয়াকে আশ্রয় ক'রে যাকে এমন কথাও বলা চলে না। প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য এক থাকা সত্বেও দুটী বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ফল লাভ করি এবং একটা কর্মকে শুভ এবং অন্য আর একটি কর্মকে অশুভ বলি। বহুশ্রুত গ্রাম্য গোপিকাসকের গল্প স্মরণ করুন ; প্রথম দিনে আনীত গরুটির ফোলা গলাতে হাতুড়ির আঘাত দেওয়ায় ব্যাধিমুক্ত হইল আর দ্বিতীয় দিনে আনীত গরুটির স্ফীত গণ্ডদেশে হাতুড়ির আঘাত করায় গরুটির প্রাণবায়ু বহির্গত হ'ল। একই প্রক্রিয়া উভয় কর্মের অঙ্গ। প্রথম কাজটাকে ভালো এবং দ্বিতীয় কাজটাকে মন্দ বললে আমরা সেক্ষেত্রে ফল দ্বারাই কাজ দুটাকে বিচার করছি কেননা এই উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের উদ্দেশ্য এবং প্রতিক্রিয়া একান্তভাবে সমধর্মী। পরিবেশ ভেদে অবস্থা ভেদে একই প্রক্রিয়া দুই বিভিন্ন ধরণের ফল প্রসব করেছে। তা হ'লে মূর কথিত প্রথম সূত্রটি প্রক্রিয়ার উপরেও প্রযোজ্য হয় না। এবার ফলাফলের কথায় আসা যাক। শুভ ফলপ্রসূ হ'লে কি কর্মকে আমরা 'শুভ' আখ্যা দিই। তা আমরা সাধারণতঃ দিই না। তা হ'লে মূর কথিত প্রথম সূত্রটি ফলাশ্রয়ী হ'তে পারে। অর্থাৎ যে কাজ ভালো ফল দিল সেই কাজই 'ভালো' এবং যে কাজ মন্দ ফল দিল সেই কাজই 'মন্দ'। তবে এখানেও আর একটা বড় প্রশ্ন উঠবে। সে প্রশ্নটা হ'ল কাকে ফল দিল ? যদি কর্মকর্ত্তার ভালো মন্দটুকুই কর্মের লক্ষ্য হয় তা হ'লে আমরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক সুখবাদী হ'য়ে পড়ছি। ব্যক্তি কেন্দ্রিক সুখবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় আপত্তি এই মত বাদের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে। আবার যদি মনে করা যায় যে এই ফল বিস্তার হবে কর্মকর্ত্তার কল্যানের দিকে লক্ষ্য না রেখে, কেবল মাত্র সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এর বিচার হবে তা হলে আমরা কর্মকর্তানিরপেক্ষ সুখবাদী (Altruistic hedonist) হ'য়ে

পড়ছি। তার বিরুদ্ধে ও অনেক আপত্তি আছে। এতদুভয়ের বিরোধ মীমাংসার জন্য আমাদের কার্য বা মঙ্গলকে যুক্তিসিদ্ধ (rational) করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। শ্রস্তারবিদ কথিত Philosoplical anarchism বা দর্শনগত নৈরাজ্যবাদের ধারণা এই মানুষের শুভশুভের Rationalism এর ওপর নির্ভরশীল। এই আত্মস্বার্থ এবং পরস্বার্থের মধ্যে সীমারেখা টেনে কাজের ফলদ্বারা তার ভাল মন্দ বিচার করা কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই বিচার পুঁথিগত হয়ে পড়বে; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ নেই বলিলেই চলে। কেননা একই কাজের ফল আমার কাছে মন্দ হ'তে পারে আবার তা অনেক জনের কাছেই ভালো হতে পারে। এইক্ষেত্রে মূর কথিত প্রয়োজন সূত্রটি ফলাশ্রয়ী হ'তে পারে না। আত্মস্বার্থ এবং পরস্বার্থের সমন্বয় প্রসঙ্গে

মূর বলেছেন: "I think therefore, we must conclude that a maximum of true good, for ourselves, is by no means always secured by those actions which are necessary to secure a maximum of true good for the world as a whole; আত্মকমের সঙ্গে পর কর্মের সমন্বয় ঘটানো সহজসাধ্য নয়; যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থের কল্পনায় জগতের কল্যাণের সঙ্গে আত্মকর্মের সমন্বয় ঘটবে কী না এ সম্বন্ধে মূর সংশয় প্রকাশ করেছেন। প্রমাণশাস্ত্রের সাহায্যে আত্মস্বার্থ অথবা সামগ্রিক স্বার্থসাধনের অনুকূলে অথবা প্রতিকূলে রায় দান সম্ভব নয়। তবে কখন কী অবস্থায় আমি আত্মস্বার্থ অথবা পর-স্বার্থের কথা চিন্তা করব, এবং সেই অনুসারে কাজ করব সেটা হল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার বা প্রয়োজন সাধনের প্রশ্ন (practical importauce)। মূল্যায়নের অন্যকোন মানদণ্ডের সাহায্যে আমরা এই আত্মস্বার্থ পরস্বার্থের দ্বন্দ্ববিরোধের নিরসন করতে পারব না। মনে করা যাক সমানভাবে ধর্মপরায়ণ দুটি ব্যক্তির কথা, ক এবং খ; জগতের কল্যাণের জন্য ত্রিশ বৎসর বয়সে ক প্রাণ দিলেন; খ তাঁর পুত্রকলত্রের কথা চিন্তা ক'রে, নিজের কথা চিন্তা ক'রে দেশের কল্যাণে দশের কল্যাণে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারলেন না। কর্ত্তব্যকর্মের আহবানে দুজনেরই প্রাণ উৎসর্গ করা উচিত ছিল। প্রাণ উৎসর্গ ক'রে ক যে অত্যান্তিক মূল্য আপনার জীবন দিয়ে অর্জন করলেন খ কী আরো ত্রিশ বৎসর বেঁচে থেকে নানান সৎকর্ম ক'রেও তা অর্জন করতে পারবেন? যাঁরা আত্মস্বার্থের সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ স্বার্থের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব মনে করেন তাঁরা বলবেন যে খ যতই ভালো কাজ করুন না কেন কোন দিনই তিনি অত্যান্তিক মূল্যের বিচারে ক এর সমকক্ষ হ'তে পারবেন না। এমন কথা সাধারণ যুক্তিবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে গ্রহণ করা শক্ত।

সুখবাদীরা সুখের পরিমাপে কর্মের আত্যন্তিক মূল্য বিচারের পক্ষপাতী। মূর বলছেন যে বোধ হয় কাজের ভালো মন্দের বিচার সুখবাদীদের দেওয়া সুখ-লক্ষণের দ্বারা সম্পন্ন হ'তে পারে। কিন্তু আত্যন্তিক মূল্যের পরিমাপ সুখের পরিমাণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা যায় না : "If may therfore possibly be the case that quantity of pleasure is, as a matter of fact, a correct critenion of right and wrong, even if intrinsic value is not always in proportion to quantity of pleasure contained." যদি আমরা এই সত্যটীকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই যে আত্যন্তিক মূল্য হল সুখের পরিমাণের সঙ্গে আনুপাতিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ তবেই এ কথা বলা যাবে যে সুখের পরিমাণের দ্বারা কর্মের আত্যন্তিক মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। মূর বলছেন যে সুখ-আত্যন্তিক মূল্য নিশ্চিত সম্পর্কের প্রবর্তনার এই Postulate টীকে জ্ঞাতসরে অথবা অজ্ঞাতসরে গ্রহণ করে তবেই না সুখের দ্বারা আত্যন্তিক মূল্যের পরিমাপ করতে অগ্রসর হন। এই মূল্যায়ন চক্রকদোষদুষ্ট।

সুখ যেমন কোন কর্মের আত্যন্তিক মূল্যের যথাযথ নির্দ্ধারণে অপারগ তেমনি ভাবে কোন একটি উপাদান (Factor) এই আত্যন্তিক মূল্য নিরূপণে অক্ষম। মূরের নিজের কথাতেই বলি :

"We may, I think say, first of all, that for the same reason for which we have rejected the view that intrnsic value is always in proportion to quantity of pleasure, we must also reject the view that it is always in proportion to the quantity of any other single factor whatever". জ্ঞান, পুণ্য, পরজ্ঞান, প্রেম এরা কেউই এককভাবে কর্মের আত্যন্তিক মূল্য নির্ণয়ের উপযোগী নয়। কেননা একক ভাবে এদের পরিমাণগত ভেদ অথবা এক গুণের সঙ্গে অন্য আর একটী গুণের সংযুক্তি বিষয়ের আত্যন্তিক মূল্যভেদ ঘটায়। আমরা অভ্রান্তভাবে বলতে পারিনা যে, যে বিষয়ের আত্যন্তিক মূল্য বেশী, তার মূল্য কেন বেশী হল আর যার আত্যন্তিক মূল্য কম তার মূল্যই বা কেন কম হল ? আত্যন্তিক মূল্যের স্বরূপ লক্ষণ নির্ণয় আমাদের সাধ্যাতীত। তবে এ কথাও সত্য যে যার আত্যন্তিক মূল্য বেশী বলে আমরা বুঝি সেই কর্মটুকুই আমাদের করা উচিত। আত্যন্তিক মূল্য সম্পন্ন কর্ম বা বস্তুনিচয়ের অবচ্ছেদক ধর্ম বা পরাজাতি ধর্ম নিরূপণ ও সহজসাধ্য নয়। মূর বলছেন যে আত্যন্তিক মূল্য নির্ণয়ের প্রমাণ শাস্ত্রসম্মত পন্থা পরিহার করে আমরা যদি আত্যন্তিক মূল্য সম্পন্ন কর্মের এবং আত্যন্তিক মূল্য বিহীন কর্মের দুটী তালিকা প্রস্তুত করি এবং

কর্মগুলিকে মূল্যবান অথবা মূল্যহীন কেন মনে করছি তার কারণ নির্দেশ করি তা হলে আমাদের সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটা অগ্রসব হতে পারব। সমাধানের এই পথের ইঙ্গিত দিয়ে মূর এই পথে অগ্রসর হননি। স্থানাভাবের দোহাই দিয়ে যেন দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। এমন কথা 'ও' আমরা স্বভাবতঃই বলতে পারি যে আত্যন্তিক মুল্যের লক্ষণ নিরুপণ না করে কেমন করে আমরা আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যবান এবং আত্যন্তিক মূল্যে মূল্যহীন কার্যাবলীর ক্রমান্বিত শ্রেণীবিভাগ করব ? আর যদিও করি তবে তা আমাদের প্রয়োজন এবং খেয়ালখুসির দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হবে। এই শ্রেণী বিভজন কর্মটুকু বৈজ্ঞানিক বিভাজন হবে না।

আত্যন্তিক মূল্য ধারণার আলোচনার উপসংহারে মূর বলছেন যে আত্যন্তিক মূল্যের অঙ্গ হিসেবে রয়েছে আমাদের অনুভূতি (Feeling) এবং চেতনমনের অন্য কোন প্রক্রিয়া। এই অনুভূতি-অঙ্গের মধ্যেই সুখানুভূতি বিধৃত। এবং আত্যন্তিক মূল্য ধারণাটুকু যৌগিক এবং মিশ্র (compound); অবশ্য মূর এ কথাও বলেছেন যে উপরোক্ত দুটী লক্ষণের কোনটাই আত্যন্তিক মূল্যের বিশেষ ধর্ম বা স্বরূপ লক্ষণ নয়, কেননা এরা মন্দ অথবা 'ভালোও না মন্দও না' এমন কর্মের়ও অঙ্গ হিসাবে বিরাজ করতে পারে। সুতরাং দেখা গেল মূরের আত্যন্তিক মূল্য ধারণার কোন স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়নি। তিনি এ ক্ষেত্রে অনির্বাচনীয় বস্তুবাদী।

[E thics গ্রন্থে স্থানভাবের দোহাই দিলেও

মূর তাঁর Principia Ethica গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অবশ্য আত্যন্তিক শুভ এবং আত্যন্তিক অশুভকর্মের ব্যাখ্যা এবং শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রায় সমস্ত শুভ-কর্মই জটিল এবং যৌগিক। এই শুভকর্মের অধিকাংশ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেরই কোন আত্যন্তিক মূল্য নেই। কর্মের বিষয় সম্বন্ধে কর্তার অনুভূতি প্রবণতার কথার উল্লেখও মূর করেছেন। মূর আরো বলেছেন যে, যে কাজগুলিকে আত্যন্তিক মূল্য-সম্পন্ন বলছি তাদের মধ্যে মিল যে খুব বেশী তা নয়; যে যে বিষয়ে তাদের অমিল রয়েছে সেই সেই বিষয়এ মূল্যবান কর্মাবলীর আত্যন্তিক মূল্যকে বৃদ্ধি করেছে। তাদের পরজাতিধর্ম এবং অবচ্ছেদক ধর্ম কেউই নিরঙ্কুশ ভাব ভালো নয় অথবা মন্দ নয়; কর্মের গুণাগুণ এতদুভয়ের সমন্বয়ের ফল মাত্র। মূর ত্রিবিধ কর্মের কথা বলছেন: (১) অবিমিশ্র শুভ (২) অবিমিশ্র অশুভ এবং (৩) মিশ্র শুভ। সুন্দর বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসা হ'ল এই অবিমিশ্র শুভের উদাহরণ। সুন্দর এবং ভালো বস্তুর প্রতি ঘৃণা পোষণ করা অবিমিশ্র মন্দের উদাহরণ হিসেবে মূর নিয়েছেন এবং মিশ্র শুভের উদাহরণ হিসেবে বলেছেন কুৎসিতকে ঘৃণা করার কথা। মূরের এই

ব্যাখ্যা যে সর্বগ্রাহ্য হতে পারে না তার স্বীকৃতি তিনি আপন গ্রন্থেই রেখে গেছেন। তিনি লিখছেন :

"Many of the judgments, which I have made in this chapter, will no doubt, seem unduly arbitrary: it must be confessed that some of the attributions of intrinic value, which have seemed to me to be true, do not display that symmetry and system which is wont to be required of philosophers'.

প্রথমত দার্শনিক আলোচনার সুমিতি এবং মতবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না থাকলেও মূরের আলোচনা সার্থক আলোচনা। বহু বিদগ্ধ মনের আলোকসম্মত ঘটেছে উত্তরকালে এই মনস্ব মানুষটির আলোচনায় এবং তার কালে নীতিশাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত বহু বিষয়ের স্বচ্ছ ধারণা আমরা করতে পেরেছি।

১। Ethics। পৃ: ১৫২

২। ঐ পৃ: ১০৩ দ্রষ্টব্য।

Principia Ethica p.2 22

সমার্থতা ও লক্ষণবাক্য

শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

যে বাক্যে কোন পদের অর্থ সুনির্দ্দিষ্টভাবে ব্যক্ত হয় তাহাকেই লক্ষণবাক্য বা সংজ্ঞার্থ বলে। ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের মতে কোন সাধারণ পদের (General Term) বাচ্যার্থ নির্দেশিত বস্তু বা ঘটনা সমূহের মধ্যে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব, এই ত্রিদোষরহিত যে সমানধর্ম থাকে, সেই অসাধারণ ধর্মকেই "লক্ষণ" বলা হইয়াছে। কিন্তু সংজ্ঞার্থের অন্তর্ভুক্ত ধর্মটিকে কেবল ত্রিদোষরহিত হইলেই হয় না, উহাকে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মও হইতে হইবে। অর্থাৎ যে গুণ না থাকিলে কোন বস্তু কোন বিশেষ নামে অভিহিত হইতে পারে না, তাহাই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু না কিছু পোষাক পরিহিত হওয়া মনুষ্যের হয়তো ত্রিদোষরহিত ধর্ম, কিন্তু উহা গুরুত্বপূর্ণ নহে বলিয়া মনুষ্যপদের লক্ষণ নহে। লক্ষিত পদকে উদ্দেশ্য করিয়া ও লক্ষণের উল্লেখকে বিধেয় করিয়া যে নির্ণয়বাক্য রচিত হয় তাহাকেই সংজ্ঞার্থ বলা যায়। **পদ বা শব্দেরই সংজ্ঞার্থ হয়, বস্তু বা ঘটনাবলীর সংজ্ঞার্থ হইতে পারে না।** ইহার কারণ এই যে জাগতিক বস্তু বা ঘটনাবলীর কোন 'অর্থ' নাই যেহেতু উহারা মনুষ্যসৃষ্ট কোন প্রতীক বা সিম্বল্ নহে। যে অর্থে "মেঘের অর্থ বৃষ্টি" সেই ভূয়োদর্শনমূলক, বস্তু হইতে বস্ত্বন্তরের অনুমিতিরূপ 'অর্থের' কথা এইখানে উঠিতেছে না। বস্তুর এই স্বাভাবিক অর্থ, প্রতীকধর্মী অর্থ হইতে ভিন্ন। "মেঘ" শব্দের অর্থ কখনও বৃষ্টি হইতে পারে না, জলধর হইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা শব্দ, নাম বা প্রতীকের অর্থকেই 'অর্থ' বলিয়া বুঝিব আর ইহা যে 'অর্থ' শব্দের এক মুখ্য এবং সার্থক প্রয়োগ তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। অর্থাৎ আমরা ধরিয়া লইব যে আমার সম্মুখস্থ নদীটির কোন লক্ষণবাক্য হয় না; 'নদী' শব্দের সংজ্ঞার্থ হইতে পারে। অবশ্য সর্ব-সধারণে প্রচলিত অর্থবলে 'নদী' শব্দটির সামাজিক রীত্যানুযায়ী লক্ষণবাক্য দিতে হইলে ঐ শব্দের দ্বারা লক্ষিত বস্তুগুলির অসাধারণ ধর্ম অবশ্যই আবিষ্কার করিতে হয়। তাই কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে প্রচলিত শব্দসম্ভারের সংজ্ঞার্থরচনা, জাগতিক বস্তুনিচয়ের পর্যবেক্ষণমূলক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিবে। কেবলমাত্র কোন লেখকের নিজসৃষ্ট

কোন শব্দের এক প্রস্তাবমূলক লক্ষণবাক্যই (stipulative definition) লেখকের মনগড়া হইতে পারে। "এই শব্দ এই অর্থে ব্যবহার করা হউক"—এই প্রকার প্রস্তাব সত্য বা মিথ্যা হইতে পারে না, গৃহীত বর্জিত হইতে পারে মাত্র। বর্ণনামূলক লক্ষণবাক্য বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় বলিয়া সত্য বা মিথ্যা হইতে পারে। শব্দের বাচ্যার্থ নির্দেশিত বস্তু বা ঘটনাবলীর অসাধারণ ধর্ম আবিস্কার করিতে পারিলে ঐ বর্ণনামূলক লক্ষণবাক্য সত্য হয়, অন্যথায় উহা মিথ্যা হয়। ভাষার সহিত জাগতিক বস্তুনিচয়ের কোন সম্পর্ক নাই, এইরূপ একদেশদর্শী মতবাদ আশ্রয় না করিয়া, এই প্রবন্ধে বর্ণনামূলক লক্ষণ-বাক্যের স্বরূপ আলোচিত হইবে। অর্থাৎ কোন ভাষাপ্রতীক বা শব্দেরই লক্ষণবাক্য হয় ইহা স্বীকার করিয়াও মানিতে চাহি যে, লক্ষণবাক্য নিছক ভাষাগত (verbal) নহে। প্রকৃত লক্ষণবাক্য বস্তু ও শব্দের সম্পর্কে গড়িয়া উঠে। প্রতিশব্দমূলক, সমার্থক লক্ষণবাক্যকে (Syonymons Definition) এক বিশেষ অর্থে ভাষাগত বলা যায়। এই সমার্থক লক্ষণবাক্য যদি বিশুদ্ধ ভাষাগত হয় তবে উহা প্রকৃত লক্ষণবাক্যের মর্যাদা পাইতে পারে না।

কোন পদের অর্থ বুঝা এক জিনিষ আর ঐ অর্থকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলা অন্য জিনিষ। কোন শব্দকে যখন আমরা মোটামুটি নির্ভুল-ভাবে ব্যবহার করিতে পারি তখন উহার অর্থ বুঝিয়াছি বলিয়া মানিতে হয়। কথা বলিবার সময় যদি "মনুষ্য" পদটিকে উহার বাচ্যার্থের অন্তর্গত ব্যক্তিগুলিতেই আরোপ করি, এবং ঐ বাচ্যার্থ বহির্ভূত বস্তুতে অর্থাৎ বৃক্ষলতাদিতে প্রয়োগ না করি, তবে ঐ নির্ভুল শব্দ প্রয়োগই নির্দেশ করিবে যে ঐ পদের অর্থ আমরা জানি। শিশু তাহার মুখে ভাষা লইয়া জন্মায় না। নিজের মাতৃভাষা সে সর্বপ্রথম গুরুজনদের শব্দব্যবহারের রীতি লক্ষ্য করিয়া ও বড়দের অনুকরণ করিয়া শিখিয়া থাকে। সজ্ঞানে এই শিক্ষা হয় না। বালিকা যেমন মায়ের রান্না বা ঘরকন্না দেখিয়া উহাকে খেলাচ্ছলে অনুকরণ করে এবং পরে ঐ অনুকরণের দ্বারাই পাকাগিন্নী ও রাঁধুনী হইয়া উঠিতে পারে, সেইরূপ শব্দপ্রতীকের ব্যবহারও অনুকরণের দ্বারা শিখিতে হয়। এইরূপ স্বাভাবিক ভাষা শিক্ষার অর্থ হইল শব্দগুলিকে ঠিক ঠিক প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করা। কিন্তু কোন শব্দকে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করিতে পারিলেও, ঐ ব্যবহারটি কোন্ নিয়মে বা রীতিতে শাসিত হয় তাহা, শিশুতো নয়ই, অনেকেই হয়ত বলিতে পারিবেন না। চিরাচরিত পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানে কোন পদের ব্যক্তিগত লক্ষণার্থ ও বস্তুগত লক্ষণার্থ হইতে ভিন্ন যৌক্তিক লক্ষণার্থই (Logical on Conventional Connotation) ঐ পদ ব্যবহারের সামাজিক প্রথানুযায়ী, সর্বসম্মত নিয়ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই জন্য যুক্তিসম্মত

লক্ষণবাক্যে কোন পদের পূর্ণ যৌক্তিক লক্ষণার্থ বিবৃত হয় যথা, "মানুষ হইল বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীব।" "মানুষ" পদটির ব্যবহারের রীতিসম্মত নিয়ম হইল, যে বস্তুতেই বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন প্রাণীধর্ম থাকিবে তাহাই 'মনুষ্য' নামে অভিহিত হইবে, আর যাহাতে ঐ ধর্ম থাকিবে না তাহা ঐ নামে অভিহিত হইতে পারিবে না। ইহাই যেন প্রথা। কোন পদের এইরূপ জাতি-বিভেদক-ঘটিত লক্ষণবাক্যই (per Genus et Differentiam) যে একমাত্র লক্ষণবাক্য তাহা না বলিতে পারিলেও, ইহাই যে লক্ষণবাক্যের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বরূপ তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। অন্য যে কোন প্রকারের লক্ষণবাক্যের কিছু না কিছু দোষ থাকে। এখন কোন পদকে নির্ভুলভাবে ব্যবহার করা কঠিন নহে। পরের শব্দ ব্যবহার দেখিয়া ও অনুকরণ করিয়াই ঐ ব্যবহার আমরা শিখিতে পারি। কিন্তু কোন পদকে ব্যবহার করিতে পারিলেও এই ব্যবহারের নিয়ম বা প্রথাটিকে জানা কঠিন হইতে পারে। "কলম" শব্দের ব্যবহারে আমাদের ভুল না হইলেও "কলমের" যৌক্তিক লক্ষণার্থ বা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ধর্মগুলি হয়তো আমরা নাও জানিতে পারি। কোন পদের প্রয়োগনিয়ম বা লক্ষণার্থ বিশদভাবে ব্যক্ত করাকেই লক্ষণবাক্য বলা যাইবে।

সহজেই বুঝা যায় যে, সাধারণ জীবনে নির্ভুল শব্দ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রত্যেকটি পদের অর্থ সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া লক্ষণবাক্য রচনার প্রয়োজন হয় না। বড়দের রীতি পর্যবেক্ষন ও অনুকরণ করিয়া সার্থক শব্দব্যবহার করিতে শিখিলে দৈনন্দিন কাজকর্ম, সামাজিক ব্যবহার ও ভাব বিনিময় সম্ভব হইতে পারে। মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী ব্যতীত, পদের সঠিক লক্ষণবাক্য রচনা করিতে সাধারণ মানুষ কখনও ব্যগ্র হয় না। কিন্তু সময় সময় সঠিক লক্ষণবাক্য রচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। প্রথমতঃ কোন সাধারণ পদের সীমান্তবর্তী কোন বস্তু (border-line case) যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করে তখন ঐ পদের লক্ষণবাক্য রচনা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিজ্ঞানীরা এমন অনেক জীবাণুর কথা জানেন যাহারা প্রাণবান না প্রানহীন তাহা বুঝা দুষ্কর। এমতাবস্থায় "প্রাণ" শব্দের সঠিক লক্ষণবাক্য পাইলে, বিভ্রান্তির হাত হইতে পরিত্রান পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, কোন দ্ব্যর্থকপদের অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত ব্যবহারের নিমিত্ত যুক্তি তর্কে বহুপ্রকার দোষ হইতে পারে। এই দ্ব্যর্থকপদজনিত হেত্বাভাস লক্ষণবাক্য রচনা করিয়া দূরীভূত হয়। তৃতীয়তঃ, অনেক সময় আমাদের মতভেদ, শব্দার্থের অস্পষ্টতা ও নানারূপ ব্যক্তিগত ধারণা হইতে উদ্ভূত হয়। যেমন অনেকে রুশিয়ার রাজনৈতিক গঠনতন্ত্রকে "গণতন্ত্র" বলিয়া বর্ণনা করিতে চাহেন না; আবার অন্য কেহ রুশিয়ার গঠনতন্ত্রকেই একমাত্র নির্ভেজাল "গণতন্ত্র" বলিতে চাহেন। এমতা-

বস্থায় "গণতন্ত্রের" সুনির্দিষ্ট অর্থব্যাখ্যাতা লক্ষণবাক্য ঐ মতভেদ দূর করিতে সক্ষম। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাইবে যে বিরোধটি একেবারেই ভাষাগত (verbal); দুইদল "গণতন্ত্র" শব্দটিকে দুই অর্থে ব্যবহার করিতেছে। চতুর্থতঃ বাক্যালাপে বা পুস্তকপাঠের সময় কোন অপরিচিত পদের সম্মুখীন হইলে উহার অর্থ যদি প্রসঙ্গক্রমেও পরিষ্কার না হয়, তবে উহার অর্থ সজ্ঞানে বুঝিতে হইবে। তাই লক্ষণবাক্যের সহায়তায় কোন ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য শব্দসম্ভারের উপচিতি বা বৃদ্ধি সম্ভব। পঞ্চমতঃ, আইনের কোন ধারা প্রয়োগ করিতে গিয়া বিচারকের অনেক সময় বিভ্রান্তি হইতে পারে। কোন আইনের বিবরণে হয়তো কোন শব্দের লক্ষণবাক্য দেওয়া আছে; ইহা মনুষ্যসৃষ্ট বলিয়াই হয়তো সকলক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতে পারিতেছে না। এমতাবস্থায় বিচারককে আইনের নূতন ব্যাখ্যা করিতে হয় ও নূতন লক্ষণবাক্য দিতে হয়। ষষ্ঠতঃ, বিজ্ঞানীকে অনেক সময় বস্তুজগতের সঠিক জ্ঞানলাভের নিমিত্ত সাধারণ ভাষায় ব্যবহৃত পদের লক্ষণবাক্য তৈয়ার করিতে হয়; এইগুলি সর্বদাই জ্ঞানদায়ী (Theoretical) লক্ষণবাক্য। যে বস্তুনিচয়ের উপর ঐ পদের প্রয়োগ হয় তদন্তর্গত লক্ষণার্থ এইরূপ লক্ষণবাক্যে পরিষ্কার হয়। "যে রাসায়নিক বস্তুতে হাইড্রোজেন উপাদানরূপে থাকে তাহাই অ্যাসিড্" এই লক্ষণবাক্য সকল অ্যাসিডের এক গুরুত্বপূর্ণ গুণের জ্ঞান দিয়া থাকে। সপ্তমতঃ, গুরুজনদের শব্দব্যবহার লক্ষ করিয়া ও অনুকরণের দ্বারা মাতৃভাষা শিক্ষার পর যদি কেহ অন্য বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিতে চাহে, তবে বিদেশী শব্দের সমার্থক মাতৃভাষার শব্দ দিয়া লক্ষণবাক্য তৈয়ার করিতে হয়। যথা "Mother অর্থ মা", "Brother অর্থ ভাই" এইরূপ প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য (Synonymous definition) গঠন করিয়াই বাঙালী ছেলেকে ইংরাজী শিখিতে হয়।

অবশ্য প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য যে এক ভাষা হইতে ভাষান্তরেই গঠন করিতে হইবে এমন নিয়ম করা চলে না। একই ভাষাগোষ্ঠীর দুইটি সমার্থক শব্দ দিয়াও ঐরূপ লক্ষণবাক্য গঠন করা যায় যেমন, "পিতার অর্থ বাবা", "ভগ্নীর অর্থ বোন্" ইত্যাদি। এইরূপ প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যের প্রয়োজনীয়তা আর সমার্থতার নিয়মের উপর কিছু আলোকপাত করা এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা সকলেই জানি যে জাতিধর্ম ও বিভেদক ঘটিত লক্ষণবাক্য রচনার একটি নেতিমূলক নিয়ম আছে যে, যৌক্তিক লক্ষণবাক্য সমার্থক শব্দ ব্যবহার করিয়া দিতে নাই। যে পদের লক্ষণ রচিত হইতেছে সেই পদ বা উহার সমার্থক শব্দ যদি লক্ষণ উল্লেখ করিবার কালে ব্যবহৃত হয় তবে চক্রকদোষ বা সমার্থতা দোষ হয়। সমার্থতা কাহাকে বলে হইা লইয়া যুক্তিবিজ্ঞানীদের মতভেদের অন্ত নাই আর বর্তমান

প্রবন্ধ লেখকের কাছে বিষয়টি আদৌ স্পষ্ট নহে।

প্রথমতঃ, চিরাচরিত যুক্তিবিজ্ঞানে যে আদর্শ লক্ষণবাক্য বা জাতি-বিভেদক সমন্বিত লক্ষণবাক্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য ও বিধেয় অবশ্যই সমার্থক। "মনুষ্য হইল বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব" এই জাতি-বিভেদকাক্রান্ত লক্ষণবাক্যে "মনুষ্য" ও "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" এই পদ দুইটি যদি ভিন্ন বস্তুকে নির্দেশ করিত তবে উহা লক্ষণ-বাক্যই হইত না। তাই এক অর্থে "মনুষ্য" ও "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" সমার্থক। এই কারণে সমার্থতা কখনই লক্ষণবাক্য রচনায় দোষের হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, জাতি বিভেদক সমন্বিত লক্ষণবাক্য সম্বন্ধে হয়তো বলা যাইতে পারে যে, লক্ষিতপদ (উদ্দেশ্য) ও লক্ষণনির্ণয়কারী বিধেয়ের অর্থ ভিন্ন, যদিও উহারা একই বস্তুকে নির্দেশ করে। "মনুষ্য" ও "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" একই বস্তুকে নির্দেশ করিলেও, অর্থাৎ উহাদের বাচ্যার্থ (denotation) এক হইলেও, এমন হয়তো বলা যায় যে উহারা ভিন্নভাবে আমাদিগকে অভিভাবিত করে। কিন্তু তাহা হইলে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যেও ঐরূপ ধর্ম থাকিতে আপত্তি হয় না। যথা; "সন্ধ্যাতারার অর্থ শুকতারা"। এই দুই শব্দ সমার্থক কেননা, উহারা একই বস্তু নির্দেশ করে। অথচ সন্ধ্যাতারার মানে যে সন্ধ্যায় উদিত হয় আর শুকতারার মানে যে ভোরে উদিত হয়। তাই অভিভাবনের (suggestion) দিক হইতে সন্ধ্যাতারাকে শুকতারা বলা চলে না; আর এই কারণে জাতিবিভেদকঘটিত লক্ষণবাক্যকে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য হইতে পৃথক করা যায় না। আবার "ভগ্নী মানে বোন্" এই প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় একই বস্তুকে নির্দেশ করিলেও, 'ভগ্নী' এবং 'বোনের' মধ্যে কোন তফাৎ নাই এমন বলা চলে না। যথেচ্ছভাবে এই দুই শব্দ যে কোন প্রসঙ্গে ব্যবহার হয় না ; ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন শব্দের ব্যবহারই সার্থক। অর্থাৎ সকলক্ষেত্রেই এক শব্দ অন্যের যায়গায় বসানো চলে না। যদি যাইত তবে ভাষায় এই দুই শব্দ থাকার অর্থ থাকিত না। সাধারণ বাংলা কথ্য ভাষায় "বোন্" চলিলেও 'ভগ্নী' চলে না। "আজ আমার বোন্ এসেছে" এই কথিত বাক্য ঠিক হইলেও, "আজ আমার ভগ্নী এসেছে" বেমানান। "ভগ্নী আসিয়াছেন" বলিলেই ঠিক হয়। তেমনি "Little means Small" এই প্রতি-শব্দমূলক লক্ষণে "Little" ও "Small" এর ব্যবহারও ভিন্ন। "Little girl" হইতে পারে কিন্তু "Little village" হয় না—"Small village" হইবে। তাই দুটি সমার্থক শব্দের মধ্যেও ভিন্নতা আছে; অন্ততঃ উহাদের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে করিতে

হয়, যদিও অর্থে উহারা এক। * "ত্রিভুজ হইল তিনটী সরলরেখাবেষ্টিত সমতলক্ষেত্র" এই জাতি-বিভেদকসূচক লক্ষণবাক্যেও কখন কখন লক্ষিত পদের স্থলে লক্ষণ উল্লেখকারী অংশকে বসানো চলিবে না। প্রণয়ের "ত্রিভুজ" নিশ্চয়ই স্নেহকামনার তিনটি সরলরেখা বেষ্টিত সমতলক্ষেত্র নহে! অর্থাৎ "ত্রিভুজের" আলংকারিক প্রয়োগ হইলেও উহার জাতিবিভেদক উল্লেখকারী লক্ষণের আলংকারিক প্রয়োগ হয় না। "মানুষগুলি দৌড়াইতেছে" বাক্যটি বলিলেও, ঐ অর্থ বুঝাইতে "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীগুলি দৌড়াই-তেছে" বড়ই বিসদৃশ। অন্ততঃ ঐরূপ ব্যবহারে পণ্ডিতম্মন্যতার পরিচয় আছে।

তৃতীয়তঃ, এমন বলা চলে না যে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যের কিছুই উপযোগিতা নাই। ইহাও কখন কখন অর্থ বুঝাইতে সাহায্য করে। প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে যেমন সমার্থতা আছে, যৌক্তিক লক্ষণবাক্যেও তেমনি সমার্থতা আছে বলিয়া দেখিয়াছি। যৌক্তিক লক্ষণবাক্য যদি অর্থ বুঝাইতে সক্ষম হয়, তবে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যই বা সক্ষম হইবে না কেন? প্রতিশব্দমূলক লক্ষণ, বাচ্যার্থের একটি বস্তুকে অঙ্গুলিনির্দেশে লক্ষণ, দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া লক্ষণ, জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণ, সকলেরই বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপযোগিতা থাকিতে পারে। প্রতিশব্দাত্মক লক্ষণবাক্যে কোন অপরিচিত শব্দের অর্থ, অন্য একটি মাত্র পরিচিত শব্দের সাহায্যে দেওয়া হয়। অভিধানে অনেক সময় এইরূপ প্রতিশব্দ দেওয়া হয় বলিয়া এইরূপ লক্ষণবাক্যকে অভিধানিক লক্ষণবাক্য (Lexical Definition) ও বলা যায়। যেমন, "লাফের অর্থ ঝাঁপ"। যদি 'লাফ' শব্দ কাহারও জানা না থাকে, আর 'ঝাঁপ' শব্দ জানা থাকে, তবে এই প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য 'লাফের' অর্থ বুঝাইবে। বিপরীতভাবে যখন 'ঝাঁপ' অপরিচিত ও 'লাফ' পরিচিত, তখন "ঝাঁপের অর্থ লাফ" লক্ষণবাক্য "ঝাঁপের" অর্থ বুঝাইবে। শব্দের অর্থ বুঝাইতে প্রতিশব্দ কিছুই সাহায্য করে না এমন বলা চলে না। কোন ভাষার কিছু কিছু শব্দ সম্ভারের জ্ঞান হওয়ার পর, এইরূপ প্রতিশব্দমূলক লক্ষণ-বাক্য দিয়া অপরিচিত শব্দের অর্থ বুঝা যায় এবং ব্যবহারের নিমিত্ত শব্দ সম্ভারের আয়তন বাড়িয়া যায়। পরন্তু মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা শিখিবার সময় নূতন ভাষার নূতন শব্দের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে উহার সমার্থক মাতৃভাষার শব্দের সঙ্গে ঐ নূতন

---

* "**Synonym**, n. Word identical & coextensive in sense and usage with another of the same language; word denoting the same thing(s) as another but suitable to different context or containing different suggestion." (The Concise Oxford Dictionary)

শব্দের মিলন করিতে হয়। তাই প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য যে একেবারে মূল্যহীন নহে তাহা নীচের দৃষ্টান্তগুলি প্রমাণ করিবে।

(১) কঠিন মানে শক্ত অথবা শক্ত মানে কঠিন।

(২) সন্ধ্যাতারা মানে শুকতারা অথবা শুকতারা মানে সন্ধ্যাতারা।

(৩) পিতা মানে বাবা অথবা বাবা মানে পিতা।

(৪) ফাদার (Father) মানে বাবা অথবা ....

(৫) রুজ (Rouge) মানে লাল অথবা............

(৬) রাট্ (Rut) মানে লাল অথবা............

(৭) রেড্ (Red) মানে লাল অথবা ....

আবার, জাতিধর্ম ও বিভেদক সমন্বিত লক্ষণবাক্যেও কোন শব্দের অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্তু লক্ষণপ্রকাশী শব্দগুলি যদি অপরিচিত হয়, তবে ঐ লক্ষণকাক্য দিয়া কোন লাভ হয় না। যখন লক্ষিতপদ অপরিচিত তখনই লক্ষণবাক্যের দাবী উঠে। ঐ অপরিচিত শব্দ যদি তদপেক্ষা অপরিচিত শব্দসমূহ দিয়া ব্যাখ্যাত হয়, তবে জাতিবিভেদক দিয়াও পদের অর্থ বুঝা যাইবে না।

চতুর্থতঃ, লক্ষণবাক্য কোন মানুষের জন্যই রচিত হয় ও তাহার ভাষাজ্ঞানের বর্তমান অবস্থার উপর নির্ভর করে। এদিক দিয়াও প্রতিশব্দমূলক ও জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যের মধ্যে প্রভেদ নাই। জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যকে সকল ব্যক্তিনিরপেক্ষ, জ্ঞাননিরপেক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক, সর্বগত লক্ষণবাক্য বলা যায় না। যে লক্ষণবাক্য কোন কিছুর অর্থ কাহাকেও বুঝাইবার জন্য রচিত নহে, তাহা লক্ষণবাক্যই নহে। প্রতিশব্দ পরিচিত না হইলে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য যেমন অর্থহীন, তেমনি জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যও লক্ষণবাক্য-নির্ণয়কারী অংশের সহিত পরিচয় না থাকিলে অর্থহীন হয়।

পঞ্চমতঃ, প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যের শব্দ দুটি যেমন পরস্পর পরস্পরের লক্ষণ, জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যেও উদ্দেশ্য ও বিধেয় পরস্পরের লক্ষণ হইতে পারে। প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যকে আবর্তন (conversion) করিয়া লিখিলে আবর্তনীয় ও আবর্তিত বাক্যের অর্থের তারতম্য হয় না এমন বলা চলে না। একদিক দিয়া দেখিলে "(শক্ত মানে কঠিন) = (কঠিন মানে শক্ত)" ঠিক হইলেও, অন্যদিক দিয়া দেখিলে, পরিচিত ও অপরিচিত শব্দ ভেদে, দুইব্যক্তির নিকট এই দুই লক্ষণবাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হইতে পারে। পরন্তু জাতিবিভেদকমূলক সার্বিক ভাববাচক (Universal Affirmative, A) নির্ণয়বাক্যের সরল আবর্তন নির্দোষ। এই কারণে, "মানুষ (হয়)

বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" এই লক্ষণবাক্যকে "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব (হয়) মানুষ" এই ভাবে সরল আবর্তন করা যায় এবং দ্বিতীয় বাক্যটিকে কেন যে "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের" লক্ষণ বলা যাইবে না তাহা বুঝা যায় না। যেমন আগে "মনুষ্য" নাম শুনিবার পর উহার অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব বলিয়া বুঝিতে পারি, তেমনি আগে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবের কথা শুনিয়া উহাকেই যে 'মানুষ" বলে তাহা জানিতে পারি। এরূপ অবস্থার অন্ততঃ কোন প্রত্যক্ষপূর্ব (A priori) অসম্ভাব্যতা দেখা যায় না। তাই জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্য ও তাহার সরলাবর্তিত রূপ উভয়েই সমার্থক লক্ষণবাক্য হইতে পারে। "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবকে বলে মানুষ" এই বাক্যে উদ্দেশ্যের সমার্থক সংক্ষিপ্তরূপ বিধেয়তে পাওয়া যায়, আর "মানুষ হইল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" এই বাক্যে উদ্দেশ্য পদের সমার্থক বিস্তার হয়। পদের বিস্তার বা সংক্ষেপকরণ এই দুই উদ্দেশ্যই লক্ষণবাক্যের দ্বারা সাধিত হইতে পারে বলিয়া "প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা" গ্রন্থে রাসেল্ বলিয়াছেন।

উপরের এই সকল গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য সত্বেও প্রতিশব্দমূলক ও জাতিবিভেদক-মূলক লক্ষণবাক্যকে ভেদহীন বলার মত শ্বাসরোধী সিদ্ধান্ত করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। উহাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য স্বীকার করিয়া বলিতেই হয় যে যৌক্তিক লক্ষণার্থ বর্ণনাকারী লক্ষণবাক্যই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, তাত্ত্বিক (theoretical) লক্ষণবাক্য। অন্য যে কোন প্রকারের লক্ষণবাক্যের কমবেশী তাৎপর্য থাকিলেও, উহাদের কাহাকেও জাতিবিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যের মত গুরুত্বপূর্ণ ও দোষহীন বলা চলে না। আর এই কারণে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যৌক্তিক লক্ষণবাক্যে লক্ষিত পদের সমার্থক প্রতিশব্দ ব্যবহার করিলে তাত্ত্বিক লক্ষণের দাবী পূর্ণ হয় না। অঙ্গুলি নির্দেশ বা মস্তক সঞ্চালনে বস্তুর নির্দেশ করিয়া কোন পদের লক্ষণ দিলে, প্রথম শিক্ষার্থী শিশুর নিকট তাহা উপাদেয় হইতে পারে; কিন্তু এইরূপ বস্তুনির্দেশক লক্ষণবাক্যের অনেক অসুবিধা। যথা, যে বস্তু দৃষ্টির সম্মুখে নাই তাহার এইরূপ লক্ষণ (Ostensive Definition) হয় না; অঙ্গুলি নির্দেশে "ইহা ঘট" বলিলে শিশু অঙ্গুলিকেই ঘট মনে করিতে পারে, অথবা ঘটের বর্ণ, আকৃতি, আয়তন যে কোন একটিকে ঘট ভাবিতে পারে; অথবা যে ভূমির উপর ঘট আছে সেই ভূমিকেও ঘট মনে করিতে পারে। তাই বস্তুনির্দেশক লক্ষণবাক্যের বিকল্প তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভব। কোন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া সাধারণপদের লক্ষণ দিলে, অপরিচিত দৃষ্টান্তের বেলা বিভ্রান্তি হইতে পারে। যদি বলা যায় যে "মহাকাব্য হইতেছে রামায়ণ, মহাভারতের মত কাব্য" তবে "প্যারাডাইস লষ্টের" মত কাব্য লইয়া গোলমাল বাধিতে পারে। পদের বাচ্যার্থ

(Denotation) মিল মহোদয়ের মতে উহার অর্থ (meaning) নহে; পদের লক্ষণার্থ ই (connotation) উহার প্রকৃত অর্থ। এই কারণে মিল্ কেবলমাত্র বাচ্যার্থ-সমন্বিত নিজস্ব নাম (Proper name) ও বিশিষ্ট গুণবাচক নামকে অর্থহীন বা অলক্ষণার্থক বলিয়াছেন। এই সকল পদের লক্ষণবাক্য হইতে পারে না। একখানি ছুরি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, উহার ফলায় মরিচা ধরিতে পারে, কিন্তু "ছুরি" শব্দের অর্থ ভাঙ্গেও না, উহাতে মরিচাও ধরে না। তাই "ছুরি" শব্দের বাচ্যার্থ উহার প্রকৃত অর্থ নহে। "ছুরির" বাচ্যার্থ অবলম্বন করিয়া হয়তো উহার সম্বন্ধে এক ভাসা ভাসা বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃত অর্থ পাওয়া যায় না। প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত অর্থ হইতেছে প্রথাগত যৌক্তিক লক্ষণার্থ, যাহার উল্লেখ করিতে হইলে পদের জাতিধর্ম ও বিভেদক-ধর্মের উল্লেখ করিতে হয়। প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য সময় সময় উপযোগী হইলেও, লক্ষণার্থ উল্লেখ করিয়া লক্ষণবাক্যের মত ইহা গুরুত্বপূর্ণ ও তাত্ত্বিক হয় না। "ভ্রাতা মানে ভাই" এই লক্ষণবাক্যদ্বারা, 'ভাই' শব্দের ব্যবহার জানা থাকিলে, অপরিচিত 'ভ্রাতা' শব্দ হয়তো শিশু ব্যবহার করিতে শিখিবে; কিন্তু এই ব্যবহারের নিয়ম শিখিবে না। 'ভাই'য়ের অর্থ পুরুষ সহোদর (male sibling) এই লক্ষণবাক্য 'ভাই', ভ্রাতা, brother প্রভৃতি সমার্থক শব্দের প্রয়োগনিয়ম বলিয়া দেয় ও উহাই জাতি-বিভেদক সমন্বিত যৌক্তিক লক্ষণবাক্য।

প্রথাগত পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানে জাতি-বিভেদক লক্ষণবাক্যকেই প্রকৃত লক্ষণবাক্য বলা হইয়াছে ও অন্যান্য প্রকার লক্ষণবাক্য অস্বীকার করা হইয়াছে। এই মতবাদ যে একদেশদর্শী তাহা আমরা দেখিয়াছি। পাশ্চাত্য যুক্তিবিজ্ঞানের ঐতিহ্য হয়তো গণিত ও জ্যামিতিশাস্ত্রের লক্ষণবাক্যগুলি বিচার করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। ইউক্লিডের লক্ষণবাক্যগুলি জাতি-বিভেদক ঘটিত। এই মতবাদ একদেশদর্শী হইলেও এই জাতি-বিভেদকঘটিত লক্ষণবাক্যই যে সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যের সহিত ইহার বহু সাদৃশ্য থাকিলেও, উহাদের পার্থক্য নির্দেশ করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রতিশব্দমূলক ও জাতি-বিভেদকমূলক লক্ষণবাক্যের পার্থক্য :—

প্রথমতঃ বলা যায় যে প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে এক অপরিচিত শব্দের স্থলে অন্য **একটিমাত্র** পরিচিত শব্দ বসিবে; কিন্তু জাতি-বিভেদকমূলক লক্ষণ উল্লেখকারী বিধেয়াংশে **একাধিক** শব্দ বসিবে। যথা; "লোহিত মানে লাল" প্রতিশব্দগত, "ত্রিভুজ মানে তিনবাহুবেষ্টিত সমতলক্ষেত্র" জাতি-বিভেদক ঘটিত। জাতি-বিভেদক-মূলক লক্ষণবাক্যে অন্ততঃ একটি শব্দ জাতিধর্ম উল্লেখ করিবে ও অন্য একটি শব্দ

বিভেদকধর্ম উল্লেখ করিবে। আরিষ্টটল মহোদয় লক্ষণরূপ বিধেয়কে, অন্ততঃ দুইটি শব্দের মিলন বলিয়া মানিবেন। অর্থাৎ প্রতিশব্দগত লক্ষণবাক্যের আকার হইল "ক মানে খ" এবং জাতি-বিভেদক ঘটিত লক্ষণবাক্যের আকার হইল "ক মানে খ+গ"।

দ্বিতীয়তঃ, উপরের এই ভাষাগত (verbal) পার্থক্য হইতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নির্গত হয়। জাতিধর্ম ও বিভেদক-ঘটিত লক্ষণবাক্যে লক্ষিতপদ ও লক্ষণপ্রকাশক শব্দসমূহ সমার্থক হইলেও এখানে লক্ষিত পদের অর্থটি **বিশ্লেষিত অবস্থায়** পাওয়া যায়; কিন্তু প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে এই অর্থ বিশ্লেষণের অভাব থাকে। উপরে প্রদত্ত সকল প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যের উদাহরণে এক শব্দের স্থলে অন্য এক শব্দ বসিয়াছে যথা, "ভ্রাতা মানে ভাই"; কিন্তু ভ্রাতার পক্ষে ভাই হইবার জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ গুণের প্রয়োজন তাহার বিশ্লেষণ হয় নাই। "ভ্রাতা হইলে পুরুষ সহোদর" বলিলে জাতিধর্ম ও বিভেদকের সাহায্যে ঐ গুরুত্বপূর্ণ গুণের বিশ্লেষণ হইয়া থাকে। প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে এক শব্দস্থলে অন্য একটিমাত্র প্রতিশব্দ বসে; যৌক্তিক লক্ষণে এক অর্থবান শব্দ একাধিক অর্থবান শব্দদ্বারা বিশ্লেষিত হয়। এইরূপ বিশ্লেষণ এই কারণে সম্ভব হয় যে, লক্ষণপ্রকাশী বিধেয়গত একাধিক শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। "মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব" এই লক্ষণবাক্যে "বুদ্ধিবৃত্তি" শব্দের অর্থ এক ও "জীব" শব্দের অর্থ ভিন্ন; এই দুই অর্থ মিলিত হইয়া "মনুষ্য" শব্দের সমার্থক হয়। যৌক্তিক লক্ষণবাক্যের বিধেয়গত কোন শব্দই **এককভাবে** লক্ষিত পদের সমার্থক হয় না। অর্থাৎ, "বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন" শব্দ "মনুষ্য" শব্দের সমার্থক নহে কেননা, ভগবান বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন হইতে পারেন; এবং "জীব" শব্দও "মনুষ্যের" সমার্থক নহে কেননা গরুও জীব। এই কারণে যৌক্তিক লক্ষণবাক্যে লক্ষিত পদের অর্থ বিশ্লেষিত (analysed) অবস্থায় ব্যাখ্যাত হয়। ইহা বৈশ্লেষিক লক্ষণ, প্রতিশব্দমূলক নহে।

ভাষার একটিমাত্র শব্দের একটিমাত্র অর্থ; অবশ্য এই অর্থ সরল বা জটিল হইতে পারে। "লাল" শব্দের অর্থ সরল; এই অখণ্ডার্থ সাক্ষাৎ অনুভূতি বিষয়; যৌক্তিক লক্ষণবাক্যে ইহা বিশ্লেষিত হইতে পারে না। এই কারণে "লাল" শব্দের যৌক্তিক লক্ষণবাক্য হয় না যদিও প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্য হয় যথা "লাল মানে লোহিত"। অর্থাৎ প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে কোন অর্থবিশ্লেষণ নাই। কিন্তু শব্দার্থ যদি জটিল অর্থাৎ সখণ্ডার্থক হয় তবে সেই অন্বয়, জটিল অর্থের বিশ্লেষণ করিয়া যৌক্তিক লক্ষণ বাক্য গঠিত হয়। এই কারণে যৌক্তিক লক্ষণবাক্যে প্রতিশব্দ দিতে নাই;

প্রতিশব্দ দিলে অর্থের বিশ্লেষণ হয় না। জটিল অর্থের দুই দিককে প্রকৃতপক্ষে পৃথক করিতে না পারিলেও, বিমূর্ত চিন্তায় বিশ্লেষণ করা যায়। যৌক্তিক লক্ষণবাক্যে সাধারণ পদের বিভাজনক্রিয়া উহ্য থাকে। এইরূপ লক্ষণবাক্যে লক্ষিতপদটি কি অর্থে উহার জাতির অন্তর্গত অন্যান্য উপজাতির সদৃশ তাহা যেমন বলা হয়, তেমনি ঐ উপজাতিগুলি হইতে উহার পার্থক্য কোথায় তাহাও বলা হয়। এইভাবে লক্ষিতপদের অর্থ বিশ্লেষিত হইয়া যায় ও বিশ্লেষিত উপাদান দুইটি একত্রে মিলিয়া লক্ষিত পদের সমার্থক হয়। কোনও জটিল অর্থের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন নাম ভাষায় আছে বলিয়া এই বিশ্লেষণ বা বিমূর্ত চিন্তা (abstract thought) সম্ভব হয়। বিশুদ্ধ ধর্ম বা গুণের পৃথক নাম না থাকিলে দ্রব্য হইতে গুণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিন্তা করিতে পারিতাম না। ভাষা আগে না চিন্তা আগে উৎপন্ন হইয়াছে এই ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক সমস্যা লইয়া আমরা বিব্রত নহি। ভাষা ব্যতীত চিন্তা হয় কিনা, বা চিন্তা ব্যতীত ভাষা হয় কিনা এ বিষয়ে মতভেদের অন্ত নাই। তবে ভাষা ও চিন্তা যে একেবারে একই ইহা না মানিলেও, ইহা সকলকেই মানিতে হইবে যে এক জটিল অর্থের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন নাম ভাষায় আছে বলিয়াই, সার্থক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়। পদার্থের বিশ্লেষণ যথা, শবব্যবচ্ছেদ করিতে হইলে যেমন করাত, ছুরি, স্ক্যাল্‌পেল্‌, ইত্যাদির প্রয়োজন, তেমনি সখণ্ডার্থক শব্দের অর্থ বিশ্লেষণের জন্য ভাষার অস্ত্র নিতান্তই প্রয়োজন। 'মনুষ্য' পদের জটিল অর্থের যৌক্তিক বিশ্লেষণ, মনুষ্যের জাতির একটি নাম "জীব" ও বিভেদকের অন্য নাম 'বুদ্ধি' আছে বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। প্রতিশব্দ দিলে এই বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না বলিয়া, বিশ্লেষণনিষ্ঠ লক্ষণবাক্যে লক্ষিতপদের প্রতিশব্দ বসাইতে নাই।

অনেক পাঠ্যপুস্তকে চক্রদোষযুক্ত লক্ষণবাক্য ও প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যকে একই নিয়মাধীনে একই দোষযুক্ত বলা হয়। কিন্তু চক্রকদোষ ও প্রতিশব্দাত্মক দোষ পৃথক করা প্রয়োজন। "যিনি বিচার করেন তিনিই বিচারক" এই চক্রকদোষযুক্ত "বিচারকের" লক্ষণবাক্যের লক্ষণ নির্দেশী অংশে একাধিক শব্দ আছে। "বিচারকের" প্রতিশব্দ "বিচারক" নহে। প্রতিশব্দের অর্থ হইল এক শব্দের সমার্থক অন্য একটি শব্দ। যদি বলি "সন্তরণবীর সন্তরণ করিয়া থাকেন" তবে চক্রক দোষ হয়: "ভ্রাতা মানে ভাই" প্রতিশব্দাত্মক দোষযুক্ত, চক্রকদোষযুক্ত নহে। চক্রকদোষ হইলে লক্ষিত পদ ও লক্ষণের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না বলিয়া এইরূপ দোষযুক্ত লক্ষণবাক্য একেবারেই নিরর্থক। কিন্তু প্রতিশব্দমূলক লক্ষণবাক্যে এক শব্দের ভিন্ন প্রতিশব্দ দেওয়া হয় বলিয়া, ইহার কালবিশেষে কিছু উপযোগিতা দেখা যায়। তবে ইহাতে

অর্থটি বিশ্লেষিত হয় না বলিয়া ইহাতে বিজ্ঞানসম্মত লক্ষণবাক্যের গুরুত্ব নাই।

নির্দোষ জাতিবিভেদক-ঘটিত লক্ষণবাক্য গঠন করা দুঃসাধ্য। ভারতীয় শাস্ত্রে কোন সাধারণ পদের লক্ষিত সভ্যদের অসাধারণধর্মকেই লক্ষণ বলা হইয়াছে। লক্ষণ যদি "অসাধারণ" ধর্ম হয় তবে ইহা বিভেদক মাত্র ও ইহার একমাত্র কাজ হইবে অন্যান্য বস্তু হইতে লক্ষিত পদকে ব্যাবৃত্ত করা। ভারতীয় মতে লক্ষণবাক্য জাতি-বিভেদকঘটিত নহে বলিয়া উহা বৈশ্লেষিক লক্ষণবাক্য নহে। অসাধারণধর্ম বা বিভেদকটিকে একটিমাত্র শব্দে প্রকাশ করিলেও, লক্ষণবাক্য চক্রক বা প্রতিশব্দাত্মক দোষমুক্ত থাকিতে পারে। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, বিভেদকধর্ম উল্লেখকারী শব্দটি, লক্ষিত শব্দটির সমার্থক নহে। কিন্তু এরূপ লক্ষণবাক্যে পদের তাৎপর্যের বিশ্লেষণ থাকে না বলিয়া তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইহা গুরুত্বপূর্ণ হয় না। নৈয়ায়িকগণ ঐ অসাধারণধর্মকে অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি ও অসম্ভব দোষমুক্ত করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত জাতিঘটিত লক্ষণবাক্যকেই উপাদেয় মনে করিয়াছেন। প্রথমে "জ্ঞান"কে শব্দ-ব্যবহারহেতু, এই অসাধারণধর্মযুক্ত বলিয়া পরে, নির্বিকল্পক জ্ঞানে ঐ ধর্মের অভাব-বশতঃ, অন্নমভট্ট 'জ্ঞানে'র জ্ঞানত্বজাতিমত্ত্ব লক্ষণ দিয়াছেন *। ঐরূপ জাতিঘটিত লক্ষণ, যথা, "ঘট অর্থ ঘটত্বজাতিমান" প্রতিশব্দাত্মক না হইলেও প্রায় উহার সীমান্ত স্পর্শ করে। 'ঘটত্ব' জাতি অখণ্ডোপাধি বলিয়া উহার বিশ্লেষণ হয় না। এই কারণে জাতিঘটিত লক্ষণ বৈশ্লেষিক নহে ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে উহা নিরর্থক।

---

* তর্কদীপিকা

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১'২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

কর্মাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) এবং কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ,

২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

Published by Sri K. C. GUPTA, from 20-2, Halder Bagan Lane,
Calcutta-4 and Printed by Sri C. SEN, at P. B. PRESS
32B, Lansdowne Road, Calcutta-20

December—1961—200

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] মাঘ [১৩৬৭ সন

সম্পাদকীয় সমিতি

অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রধান সম্পাদক)

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

মূল্য ১'২৫ বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

[১৪শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা]　　মাঘ　　১৩৬৭ সাল

সূচীপত্র

ঈশোপনিষৎ

শ্রীকল্যাণ চন্দ্র গুপ্ত

আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির মধ্যে ঈষোপনিষৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মাত্র আঠারটি শ্লোকে গঠিত এই উপনিষদে যে তত্ত্ব প্রচার করা হইয়াছে তাহা সমস্ত উপনিষদগুলির সারমর্ম এবং ইহতে সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্টভাবে যে জীবনাদর্শের কথা বলা হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

জগতে যাহা কিছু আছে ব্রহ্ম অথবা পরমেশ্বর তাহা সমস্তই ব্যাপিয়া আছেন এবং তিনিই সকল বস্তুর অন্তরাত্মা এই পরম সত্য আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সেই উপলব্ধি অনুসারে সকল কর্ম করিয়া যাইতে হইবে ইহাই ঈশোপনিষদের মূল শিক্ষা। যিনি নিজের অন্তরে এবং বাহিরে সর্বত্রই এক আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি পার্থিব কোনও বস্তুতেই লোভ করিতে পারেন না, তিনি কাহাকেও ঘৃণা বা দ্বেষ করিতে পারেন না। তাঁহার সমস্ত ধ্যান, ধারণা ও কর্ম ঈশ্বরাভিমুখী হইবে এবং তিনি সকল মোহ ও শোক হইতে বিমুক্ত হইয়া পরম শান্তির অধিকারী হইবেন। কিন্তু যিনি সর্বভূতের একাত্মতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং পরম শান্তির অধিকার হইয়াছেন এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম হইতে নিরত হইবেন না, পরন্তু কর্ম করিয়াই শতবৎসর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবেন। "কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ"। ২। সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া নিষ্কাম ও নির্লোভচিত্তে সকল কর্ম করিতে হইবে এবং নিজের জীবনকে সর্বত্র প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে ঈশোপনিষৎ আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দিতেছেন।

বহুকাল হইতেই এদেশে কর্ম ভীতি এবং কর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা বিপুল

সংখ্যক ব্যক্তির মনে একটি স্থায়ী স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং তাহাদের জীবন দর্শনের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। কর্ম (দুষ্কর্ম্মই হউক অথবা সুকর্ম্মই হউক) করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে এবং অনিবার্যভাবে বার বার জন্ম গ্রহণ করিয়া শরীর ধারণ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অশেষ দুঃখভোগ করিতে হইবে এই চিন্তা বহুযুগ ধরিয়া তাহাদের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। কৈবল্য-বাদী সাংখ্য, অপবর্গবাদী ন্যায়, নির্বাণ-বাদী বৌদ্ধ এবং মোক্ষ-বাদী বেদান্ত এই সকল দর্শনেই পরমপুরুষার্থরূপে জীবের এমন একটি অবস্থার কথা বলা হইয়াছে যাহাতে কর্ম্ম ও ক্রিয়ার কোনও স্থানই নাই। সংসারচক্র হইতে চিরকালের জন্য অব্যাহতি পাওয়াই যদি জীবের অধ্যাত্মিক সাধনার চরম উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে কর্ম-ত্যাগকে সেই সাধনার অপরিহার্য অঙ্গরূপে স্বীকার করিতেই হইবে। যাঁহারা দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন কেবল তাঁহাদের মধ্যেই যে কর্ম্মের প্রতি এই বিরাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নয়. এই ধরণের দার্শনিক চিন্তা আমাদের দেশে যে ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার মধ্যে বাস করিবার ফলে অতি সাধারণ ব্যক্তির মনেও অতি সহজেই জীবন ও কর্মের প্রতি বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে এবং এই বিতৃষ্ণার পরিচয় লোক-সাহিত্য এবং লোক সঙ্গীতেও প্রচুর পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি জ্ঞানী তিনি কর্মত্যাগ করিবেন, কারণ তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা তিনি ইহাই বুঝিয়াছেন যে কর্ম মোক্ষলাভের পথে অন্তরায়স্বরূপ। আবার যিনি ভক্ত তাঁহার পক্ষেও কর্মের কোনও প্রয়োজন নাই, কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যে ভগবানের নিকট তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তিনিই তাঁহার জীবনযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। তাঁহার পক্ষে কেবল মাত্র অশ্রুবিগলিতনেত্রে ভগবানের নাম কীর্তন করা এবং ভগবানের মাধুর্য্যরস উপভোগ করাই চরম কাম্য। জ্ঞান বা ভক্তির সহিত কর্মের বিরোধ যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্যে পরিণত হইয়াছে।

যাঁহারা মনে করেন যে সমস্ত উপনিষদ গ্রন্থেই মুমুক্ষু ব্যক্তিকে কর্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ঈশোপনিষৎ পাঠ করিলে তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত-ধারণা দূর হইবে। ঈশোপনিষদে নৈষ্কর্ম্যবাদের কোনও স্থান নাই। সকলকেই কর্ম্ম করিয়া শতবৎসর বাঁচিবার ইচ্ছা করিতে হইবে ঈশোপনিষৎ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইহাই প্রচার করিতেছেন। 'কর্ম' বলিতে এখানে কেবলমাত্র বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম বুঝিতে হইবে এরূপ ইঙ্গিত এই উপনিষদে কোথাও নাই। দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় পংক্তিতে বলা হইয়াছে "এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে" (এই প্রকার

তোমার পক্ষে এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই যাহাতে তোমাতে কর্ম্মলিপ্ত না হইতে পারে)। এই পংক্তিটি গীতার উক্তি "ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ" (৩।৫) কে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে 'কর্ম' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থেই লইতে হইবে অর্থাৎ পারিবারিক কর্তব্য, সামাজিক কর্তব্য প্রভৃতি সমস্তই 'কর্ম' শব্দ দ্বারা বুঝিতে হইবে।

"কর্ম করিয়া শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে" এই উপদেশ যে কেবলমাত্র অবিদ্বান্‌দের অথবা যাহারা প্রবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক তাহাদের জন্য এরূপ ব্যাখ্যা করিবারও কোনও পথ নাই। অবশ্য ঈশোপনিষদের প্রচলিত ব্যাখ্যা সাধারণতঃ শাঙ্করভাষ্যকে অনুসরণ করিয়া থাকে এবং তাহাতে প্রথম দুইটি শ্লোকের অর্থ এইরূপ করা হইয়া থাকে যে যাঁহারা মুমুক্ষু তাঁহারা পরমেশ্বরের দ্বারা জগতের সমস্ত কিছু আবৃত করিয়া নিরাসক্ত হইবেন এবং যাঁহারা সংসারী হতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা যাগযজ্ঞাদি কর্ম করিবেন। প্রথম শ্লোকে যাঁহাকে সর্বত্র ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া নিরাসক্ত হইতে উপদেশ দেওয়া হইতেছে ঠিক পরবর্তী শ্লোকেই আবার তাঁহাকেই কর্ম করিবার উপদেশ দেওয়া হইল কেন এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে একই ব্যক্তিকে এই দুই পরস্পর বিরোধী উপদেশ দেওয়া যাইতে পারেনা এবং দেওয়া হয়ও নাই। কারণ এই দুইটি উপদেশর একই ব্যক্তির জন্য এইরূপ মনে করিলে জ্ঞান ও কর্মের যে চিরন্তন বিরোধ তাহা লুপ্ত হইয়া যায়। "জ্ঞানকর্মণো বিরোধং পর্বতবদকম্প্যং ন স্মরসি কিং" (জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ যে পর্বতের ন্যায় অটল তাহা স্মরণ করিতেছ না কেন?)। সুতরাং যাঁহারা মোক্ষাভিলাষী তাঁহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিবেন এবং আত্মা বা ঈশ্বরের প্রকৃতস্বরূপ গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তি অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিবে। কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম পরস্পর বিরোধী পূর্ব হইতেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া না থাকিলে এবং ঈশোপনিষদের বিভিন্নস্থানে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিচার করিলে এই ব্যাখ্যাকে কোনও মূল্য দেওয়া যায় না। এই উপনিষদে এমন কোনও কথা নাই যাহা হইতে ইহা বুঝা যাইতে পারে যে প্রথম দুইটি শ্লোকে প্রদত্ত দুইটি উপদেশ দুই বিভিন্ন ব্যক্তিকে দেওয়া হইতেছে; পরন্তু এই উপনিষোদের সমস্ত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ইহার মূল সুরই হইতেছে সমন্বয়বাদ এবং এই সমন্বয়বাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই ঈশোপনিষদের উপদেশের অর্থ বুঝিতে হইবে। যাঁহাকে সর্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মায় সর্বভূত দর্শন করিতে বলা হইতেছে তাঁহাকেই কর্ম করিয়া

শতবৎসর বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা করিতে দেওয়া হইতেছে—ইহাই এই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য। মূল শাস্ত্রে যাহা নাই কোনও বিশেষ মতবাদকে রক্ষা করিবার জন্য সেইরূপ কোনও অর্থ উহাতে প্রক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও নাই।

সর্বভূতের ও সর্ব জীবের একাত্মতা প্রচার করিলেও ঈশোপনিষদে মায়াবাদের কোনও স্থান নাই। জগৎপ্রপঞ্চ যে অলীক বা মিথ্যা অথবা যিনি সর্বাত্মৈকত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাঁহার নিকট পরিণামী জগৎ শূন্যে বিলীন হইয়া যায় এরূপ কথা বলা হয় নাই। পরমাত্মারূপ চরম সদ্বস্তুর জ্ঞানকে যদি বিদ্যা বলা হয়, এবং পরিদৃশ্যমান জগতের জ্ঞানকে যদি অবিদ্যা বলা হয় তাহা হইলে ঈশোপনিষদ বলিতেছেন যে, যাহারা কেবলমাত্র অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা দৃষ্টি-বিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যাহারা কেবলমাত্র বিদ্যার উপাসনা করে (অর্থাৎ কেবল মাত্র ঐরূপ বিদ্যাতেই রত থাকে) তাহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ। ঈশ ৯
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে। ১১

"বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি একত্র জানেন তিনি অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।) পরমপুরুষার্থলাভ করিতে হইলে অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয়েরই প্রয়োজন। বিনাশী জগতের জ্ঞান এবং অবিনাশী অদ্বয় তত্ত্বের জ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। সুতরাং জগৎ মিথ্যা বা অসৎ হইতে পারে না।

যে জ্ঞানের বিষয় অনিত্য, পরিবর্তনশীল এবং বহুত্ব-মণ্ডিত জগৎ, অদ্বৈত ব্রহ্মনিষ্ঠ উপনিষদে যে সেই জ্ঞানকে অবিদ্যা বলা হইবে এবং যাহারা কেবলমাত্র সেইরূপ জ্ঞান লইয়াই ব্যাপৃত, অর্থাৎ অনিত্যবস্তুর চিন্তাতেই নিমগ্ন, তাহারা যে অন্ধকারে প্রবেশ করে, অর্থাৎ পরম সত্য তাহাদের নিকট প্রকাশিত হয় না এবং তাহাদের আত্মা জড়তাচ্ছন্ন হইয়া থাকে এইরূপ বলা হইবে ইহাতে অবশ্য আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। কিন্তু সেই উপনিষদেই আবার যাঁহারা কেবলমাত্র বিদ্যায় অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অথবা ব্রহ্মতত্ত্বে রত তাঁহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন ইহা কিরূপে বলা হইল তাহা উপনিষদের ব্যাখ্যাকারগণের নিকট এক প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইয়াছে। কিন্তু ঈশোপনিষদের ১৮টি শ্লোকের মধ্য দিয়া সমন্বয় বাদের যে মূল সুরটি ধ্বনিত হইতেছে তাহা ধরিতে পারিলে ইহাকে আর প্রহেলিকা

বলিয়া মনে হইবেনা। একত্ব এবং বহুত্ব, নিত্যতা এবং অনিত্যতা, অবিনাশিতা এবং বিনাশিতা ইহারা যে পরম তত্ত্বেরই বিভিন্ন প্রকাশ ইহাই ঈশোপনিষদের মূল বক্তব্য। এক, নিত্য ও অবিনাশীকে উপেক্ষা করিয়া বহু, অনিত্য ও বিনাশীর যে জ্ঞান তাহা অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্ত। সুতরাং যাহারা কেবলমাত্র এইরূপ জ্ঞানেই রত তাহারা অন্ধকারেই বাস করে আর যাহারা বহু, অনিত্য ও বিনাশীকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র এক, নিত্য এবং অবিনাশীর ধ্যান করে তাহারা গভীরতর অন্ধকারে নিমগ্ন; কারণ নানাবস্তুবিশিষ্ট এই অনিত্যজগতের অন্ততঃ প্রত্যক্ষও ত সকলেরই হইয়া থাকে, সুতরাং এরূপ জগতের জ্ঞান যতই অসম্পূর্ণ হউক না কেন তাহা অন্ততঃ কিছুপরিমাণে জ্ঞানও ত বটে; কিন্তু সর্বপ্রকার ভেদ, বহুত্ব এবং বিশেষের সংস্পর্শবর্জিত যে ঐক্য বা নিত্যতা তাহার সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে কোনও ধারণাই হয় না; সুতরাং এরূপ অদ্বয়-তত্ত্বে যাঁহারা নিরত তাঁহাদের অন্ধকার গভীরতরই বলিতে হইবে। এইজন্যই উপনিষদ বলিতেছেন যে অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয়কেই একত্র করিয়া জানিতে হইবে। অবিদ্যাদ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে হইবে। অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হওয়া যায় কিরূপে ইহাও এক সমস্যা। মৃত্যু বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, অর্থাৎ "দেহের ধ্বংস" এই স্থলেও তাহা বুঝিলেই এই সমস্যার সমাধান হইবে। ক্ষুধা, রোগ, প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় প্রভৃতির আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবের পক্ষে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান অপরিহার্য্য। কেবল খাদ্য দ্বারা মানুষ বাঁচিতে পারে না ইহা যেমন সত্য তদপেক্ষা অধিক রূঢ় হইতেছে এই যে, খাদ্য ভিন্ন মানুষ বাঁচিতেই পারেনা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কারিতে হইলে অন্ততঃ বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আবার কোনওরূপে বাঁচিয়া থাকাই শেষ কথা নয়। "ইহ চেৎ অবেদীদথ সত্যমস্তি" যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তাঁহার অস্তিত্বই সার্থক। সুতরাং আত্মা বা ব্রহ্মকে জানিতে হইবে এবং তাহার ফল অমৃতত্ব—অর্থাৎ সকল মোহ ও শোকের অতীত অবস্থা। বিদ্যা ব্যতীত অবিদ্যা অসম্পূর্ণ, আবার বিদ্যার সাধনা করিতে হইবে বলিয়া অবিদ্যাকে অবজ্ঞা করাও উচিত নয়।

শঙ্কর 'অবিদ্যা'র অর্থ করিতেছেন "বিদ্যাবিরোধী উপাসনাহীন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম" এবং বিদ্যা'র অর্থ করিতেছেন "দেবতাবিষয়ক জ্ঞান" অর্থাৎ "কর্ম্মবিহীন উপাসনা"। "অতঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ দেবতাজ্ঞানং কর্ম্ম চেত্যর্থঃ"। (শঙ্করভাষ্য) 'বিদ্যা'কে 'পরাবিদ্যা' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থে লইলে বলিতে হয় যে, যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যায় নিবিষ্ট তাঁহারা গভীর অন্ধকারময় লোকে গমন করেন। ব্রহ্মবাদী শঙ্কর একথা স্বীকার

করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি 'বিদ্যা'র অর্থ 'দেবতাজ্ঞান' করিয়াছেন। কিন্তু 'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা' কে শঙ্কর যে অর্থে লইয়াছেন ঈশোপনিষদের কোথাও তাহার কোনও ইঙ্গিত নাই। তৃতীয় হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত ছয়টি শ্লোকে আত্ম-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং সাধককে আত্মায় সর্বভূত দর্শন এবং সর্ব-ভূতে আত্ম-দর্শন করিতে বলা হইয়াছে। আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হইবে—ইহাই এই কয়টি শ্লোকের মূল বক্তব্য। কোনও দেবতাবিশেষের ধ্যান করিতে হইবে ইহা বলা হয় নাই। সুতরাং এই প্রসঙ্গে সহসা দেবতাজ্ঞানের অবতারণা যেন অসংলগ্ন বলিয়াই বোধ হয়। অপর পক্ষে তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যাহারা আত্মঘাতী (আত্মহনোজনাঃ) তাহারা মৃত্যুর পর অন্ধতমসাবৃত লোকে গমন করে। আবার নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহারা দৃষ্টিবিরোধী অন্ধকারে প্রবেশ করে। ইহা হইতে এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাহাদিগকেই আত্মঘাতী বলা হইতেছে এবং অবিদ্যার অর্থ আত্মাসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের অভাব। অবিদ্যার অর্থ 'যথার্থ আত্মজ্ঞানের অভাব' হইলে 'বিদ্যা'র অর্থ 'যথার্থ আত্ম-জ্ঞান' এরূপ মনে করা অযৌক্তিক হইবে না। অন্যান্য উপনিষদের বহুস্থলেও অবিদ্যাকে আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান অর্থাৎ জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং বিদ্যাকে আত্ম-জ্ঞান অথবা ব্রহ্ম-জ্ঞান অর্থেই লওয়া হইয়াছে। "আত্মন্য বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"। (কেন-২।৪)। অর্থাৎ, বিদ্যা দ্বারা অমৃত লাভ হয়। এখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্লোকে "ব্রহ্মণো রূপম্" জানিবার কথাই হইতেছে, সুতরাং এখানে 'বিদ্যা'কে দেবতাবিষয়ক জ্ঞান অর্থে লইবার কোনও অবকাশ নাই। "ক্ষরন্ত্ববিদ্যাহ্যমৃতং তু বিদ্যা" (শ্বেতাশ্বতর, ৫।১)। এ স্থলেও অবিদ্যার অর্থ যে অপরা বিদ্যা অর্থাৎ অনাত্ম-বিষয়ক জ্ঞান এবং বিদ্যার অর্থ পরাবিদ্যা অর্থাৎ আত্ম-বিদ্যা বা ব্রহ্ম-বিদ্যা তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। একমাত্র ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায় বৈদিক সাহিত্যের যত্রতত্র এই সত্য নানাভাবে নানাভাষায় ঘোষিত হইয়াছে। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি", "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ তত্রাপরা—ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা, কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা—যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। (মুণ্ডক—১।১।৫)। "তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথা" (প্রশ্ন-৬।৬), তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষসেতুঃ" (মুণ্ডক—২।২।৫)। শঙ্কর নিজেই শারীরক ভাষ্যে বলিতেছেন যে "পণ্ডিতাঃ বস্তুস্বরূপাবধারণং বিদ্যামাহুঃ"

অর্থাৎ, পণ্ডিতেরা বস্তুর যে স্বরূপ নির্দ্ধারণ (অর্থাৎ চরম তত্ত্বের জ্ঞান) তাহাকেই বিদ্যা বলেন। সুতরাং ঈশোপনিষদের অন্যান্য অংশের সহিত এবং অন্যান্য উপনিষদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অবিদ্যাকে অপরা বিদ্যা এবং বিদ্যাকে পরা বিদ্যা বা ব্রহ্ম-বিদ্যা অর্থে ব্যাখ্যা করাই যুক্তি সঙ্গত হইবে। কিন্তু জগতের মিথ্যাত্বে বিশ্বাসী শঙ্কর অদ্বিতীয় নির্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান আমাদিগকে অন্ধকারে লইয়া যায় ইহা স্বীকার করিতে পারেন না ; সুতরাং তাঁহাকে এই সকল শ্লোকের সহজ ব্যাখ্যা ত্যাগ করিয়া কাল্পনিক ব্যাখ্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। কিন্তু ঈশোপনিষৎ নিজেই যখন স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন যে বিদ্যা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়, এবং বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে একত্র করিয়া জানিতে হইবে তখন আমরা কোন্ যুক্তিবলে বলিব যে বিদ্যার অর্থ দেবতা-জ্ঞান এবং অমৃতত্বের অর্থ আপেক্ষিক অমৃতত্ব ?

বস্তুতঃ শঙ্করের ব্যাখ্যা যে কৃত্রিম ও কাল্পনিক তাহা অপর একটি শ্লোক লইলেই অতি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় :

"সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥" ১৪

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলিতেছেন যে এস্থলে সম্ভূতিকে অসম্ভূতি পাঠ করিতে হইবে ("সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ" ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দ্দেশো দ্রষ্টব্যঃ)। 'অসম্ভূতি'র অর্থ 'অব্যাকৃতা প্রকৃতি' এবং 'বিনাশ'-এর অর্থ হিরণ্যগর্ভ। সুতরাং শঙ্করের ব্যাখ্যানুযায়ী এই শ্লোকটির অর্থ হইবে—"যিনি অসম্ভূতি অর্থাৎ অব্যাকৃতা প্রকৃতি এবং বিনাশ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এই দুইকে একত্র জানেন তিনি হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা মৃত্যু অর্থাৎ অনৈশ্বর্য্য অতিক্রম করেন (অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন) এবং অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসনা দ্বারা অমৃত লাভ করেন" (অর্থাৎ প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যান)।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে 'সম্ভূতি'র স্থলে 'অসম্ভূতি' পাঠ করিতে হইবে কেন তাহার সপক্ষে কোনও সুযুক্তি নাই। ইহার পূর্বে দ্বাদশ শ্লোকে 'অসম্ভূতি' এবং সম্ভূতি' এই দুইটি শব্দ আছে। সেই স্থলে শঙ্কর 'অসম্ভূতি'র অর্থ 'অব্যাকৃতা প্রকৃতি' এবং সম্ভূতির অর্থ "ব্যাকৃত, উৎপত্তিশীল হিরণ্যগর্ভ" করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ শ্লোকের প্রথম পংক্তিতে 'সম্ভূতি' এবং 'বিনাশ' এই দুইটি শব্দ পাই। সম্ভূতি এবং বিনাশকে একত্র জানিতে হইবে। 'বিনাশ'-এর অর্থ অসম্ভূতি করা যায় না, কারণ তাহা হইলে 'অব্যাকৃতা প্রকৃতি'কে বিনাশ বা বিনাশী বলিতে হয়। সুতরাং 'সম্ভূতি'কেই

'অসম্ভূতি' পড়িতে হইবে,—যুক্তিটা বোধ হয় ইহাই। কিন্তু এই যুক্তির যে বিশেষ মূল্য নাই তাহা সহজেই দেখান যাইতে পারে। নবম ও দ্বাদশ শ্লোক তুলনা করিলে দেখা যায় যে দ্বিতীয়টিতে প্রথমটির প্রায় সমস্ত শব্দই ক্রমানুযায়ী বর্তমান, কেবলমাত্র 'অবিদ্যা'র স্থানে অসম্ভূতি এবং 'বিদ্যা'র স্থানে 'সম্ভূতি' এই দুই শব্দ দেখিতে পাই। ইহা হইতে 'অবিদ্যা' ও 'অসম্ভূতি' এবং 'বিদ্যা' ও 'সম্ভূতি' ইহারা একার্থক না হইলেও ইহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এরূপ মনে করা অযৌক্তিক হইবে না। দশম ও ত্রয়োদশ শ্লোক একত্র লইলেও বুঝা যায় যে বিদ্যা ও সম্ভব অর্থাৎ সম্ভূতির মধ্যে সম্বন্ধ আছে এবং অবিদ্যা ও অসম্ভব অর্থাৎ অসম্ভূতির মধ্যে সম্বন্ধ আছে। সুতরাং অবিদ্যা দ্বারা যেমন মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় সেইরূপ অসম্ভূতি দ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং বিদ্যা দ্বারা যেমন অমৃত লাভ হয় সম্ভূতি দ্বারাও তেমনই অমৃত লাভ হয় এইরূপ বলিলেই সঙ্গতি রক্ষা হয়। পরন্তু, 'সম্ভূতি'র স্থলে 'অসম্ভূতি' পাঠ করিলে 'অসম্ভূতি'র উপাসনা দ্বারা অমৃত লাভ হয় এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে এবং এই ব্যাখ্যা পূর্বেকার কয়েকটি শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্যহীন হইয়া পড়িবে। সুতরাং মূল শাস্ত্রের কোনও শ্লোকে স্পষ্টতঃ 'সম্ভূতি' শব্দ থাকিলেও তাহাকে 'অসম্ভূতি' পাঠ করিতে হইবে ইহা কষ্ট কল্পনা মাত্র।

তাহা হইলে 'সম্ভূতি'র অর্থ কি? 'সম্ভূতি' ও 'বিনাশ'কে যখন (বিদ্যা এবং অবিদ্যার ন্যায়) একত্র জানিতে বলা হইতেছে তখন স্পষ্টই বুঝা যায় যে সম্ভূতি ও বিনাশ পরস্পরবিরোধী। 'বিনাশ' এর অর্থ যদি বিনাশী অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ ধরা যায় তাহা হইলে 'সম্ভূতি'র অর্থ হইবে 'অবিনাশী' অর্থাৎ ব্রহ্ম। "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" এই পংক্তিটির সহিত "বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে" এই পংক্তির তুলনা করিলে দ্বিতীয় পংক্তির অর্থ হইবে—"বিনাশী জগতের দ্বারা (অর্থাৎ জাগতিক দ্রব্য যথা খাদ্যাদি দ্বারা) মৃত্যু উত্তীর্ণ হইলে অবিনাশী ব্রহ্মের দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়।

পরিপূর্ণ আধ্যাত্ম জীবনের জন্য জ্ঞান ও কর্মের যেরূপ প্রয়োজন ভক্তিরও সেইরূপ প্রয়োজন। ঈশোপনিষদের শেষের চারিটি শ্লোক একটি প্রার্থনা এবং ব্রহ্মের প্রতি উপাস্য উপাসকের ভাব হইতে উদ্ভূত। ঋষি ব্রহ্মকে সূর্য্য নামে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "জ্যোতির্ম্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত আছে, সেই আবরণ অপসারিত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর, তোমার পরম মঙ্গলময় রূপ দর্শন করাও"। আবার অগ্নি নামে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "আমাদিগকে সুপথে সমৃদ্ধির দিকে চালিত কর

আমাদের নিকট হইতে সকলপ্রকার কুটিল পাপ বিদূরিত কর। তোমাকে আমরা বারবার নমস্কার করিতেছি"। এই প্রার্থনার মধ্য দিয়া জীবের পরমেশ্বরের প্রতি নির্ভরতা এবং তাঁহার অনুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে পরমেশ্বরকে করুণাময় পরিত্রাতা এবং পবিত্রতার আধার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং নিষ্পাপ নিষ্কলুষ জীবনের জন্য তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী সাধকও ঈশোপনিষদের সমর্থন লাভ করিবেন। কিন্তু ঈশোপনিষদে যে ভক্তির কথা প্রচার করা হইয়াছে তাহা জ্ঞানের সহিত সম্পর্করহিত অন্ধভক্তি নয়, অথবা কোনও স্বৈরাচারী শাসকের নিকট দুর্ব্বল ব্যক্তির নতিস্বীকারও নয়। ভক্ত যখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন তখন তিনি ঈশ্বরের সহিত নিজের একাত্মতাও উপলব্ধি করিবেন, ইহাই ঈশোপনিষদের উপদেশ। জ্ঞানবর্জিত কর্ম্ম এবং কর্ম্মবর্জিত জ্ঞান যেমন উভয়েই অসম্পূর্ণ, তেমনই জ্ঞানবর্জিত ভক্তি এবং ভক্তিবর্জিত জ্ঞানও অসম্পূর্ণ।

জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে ঈশোপনিষদের দার্শনিক মতকে ভেদাভেদ বাদ বলা যাইতে পারে। ব্রহ্ম ও জগৎ ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন, আবার ব্রহ্ম ও জীবও ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন। এইভাবে দ্বৈতবাদ বা বহুবাদ এবং কেবলাদ্বৈতবাদের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। আবার, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয় সাধন করিয়া এবং তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের আপাতপ্রতীয়মান বিরোধ নিরসন করিয়া ঈশোপনিষৎ আমাদের সম্মুখে এক পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

জ্ঞানের স্বরূপ

অনাদি কুমার লাহিড়ী

ইংরেজী 'Knowledge' 'জ্ঞান' কথাটির অর্থ এতই অস্পষ্ট ও দুর্নিরীক্ষ্য যে কোন একঅর্থে ইহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়। 'জ্ঞানে'র সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও 'জ্ঞান' পদার্থকে এরূপ সহজ এবং সাধারণ আকারে তুলিয়া ধরে যে, ইহার সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা অবান্তর,—দুরূহ ও নিষ্ফল বলিয়া প্রতীত হয়। আলোচনা কালে ইহার ধারণা এমন অপসৃয়মান রূপে দেখা দেয়, ফল যাহার ফলে 'জ্ঞান' সম্পর্কে অধিবিদ্যাবিষয়ক গবেষণার অসুবিধা সুপ্রকট হইয়া পড়ে। 'জ্ঞান' পদটির অর্থ নিম্নোদ্ধৃত অন্ততঃ তিন প্রকারে সাজানো যাইতে পারে :—

(১) যে কোন সংবিদ্ (সর্ব্বব্যাপক মনস্তাত্বিক অর্থ) ;

(২) সেই সকল সংবিদ্—যাহাদিগকে হয় 'সত্য' অথবা, 'মিথ্যা' বলিয়া নির্ণীত করা যায় ;

(৩) সেই সকল সংবিদ্—যাহারা সকল সময়েই সত্য হিসাবে নির্ণীত হইবার যোগ্য ; ('জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ ও সম্ভবত: সুব্যবহৃত অর্থ)

দার্শনিক প্রবর কাণ্ট্ 'জ্ঞান'কে এমন এক অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহা উপরিউক্ত তৃতীয় অর্থ হইতে সঙ্কীর্ণতর,—এই অর্থে, সার্ব্বিক ও অপরিহার্য্য সংবিদ্ সকলই 'জ্ঞান' গঠন করে।

এখন হইতে আমরা প্রথম অর্থেই জ্ঞান' কথাটি ব্যবহার করিব—কারণ ইহাই জ্ঞানের সর্ব্বব্যাপক অর্থ, যাহা অপরাপর অর্থগুলিকে একভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে সময়ে সময়ে আমরা ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অর্থ দুইটিরও উল্লেখ করিব। ইহাতে 'জ্ঞানে'র জটিল ও সচরাচর ব্যবহৃত প্রয়োগরূপ আলোচিত হইতে পারে।

'জ্ঞান'-পদের সরাসরি কোন সংজ্ঞা প্রদান সম্ভবপর নয় ; সেই কারণে প্রচলিত পদার্থগুলির উল্লেখে এর এক বর্ণনা বা পরিচয় দাঁড় করানো যায়। ভাবরূপ সাধারণ অভিজ্ঞতাগুলিকে আমরা সচরাচর দ্রব্য, গুণ, সম্পর্ক ও ক্রিয়া-নামক পদার্থগুলির অধীনস্থ করি। এখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, 'জ্ঞান'কে কোন্ হিসাবে গ্রহণ

করা যায়—ইহা কি দ্রব্য? না গুণ? না ক্রিয়া?—না সম্পর্ক?—না কতকগুলির সংমিশ্রণ?

প্রথমতঃ দেখা যাক্, 'জ্ঞান' দ্রব্য কিনা। 'দ্রব্য' বলিতে আমরা বুঝি এমন এক পদার্থ যাহা গুণ ও ক্রিয়ার একটি বা উভয়ই ধারণ করে। সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, পুর্ণতা বা অপূর্ণতা, স্পষ্টতা বা অস্পষ্টতা, সত্য বা মিথ্যা প্রভৃতি গুণ জ্ঞানে আশ্রিত হয়। 'উল্লেখ', 'পরিচিতি' প্রভৃতি সম্পর্কও জ্ঞান ধারণ করে। এই দৃষ্টিতে দেখিলে জ্ঞানকে দ্রব্য বলিতে কোন বাধা থাকে না। কিন্তু আমরা যদি খেয়াল রাখি যে, প্রকৃত দ্রব্য স্ব-নির্ভরশীল হইবে (অন্ততঃ আপেক্ষিকভাবে) এবং স্বয়ং অন্য কোন দ্রব্যের গুণ বা ক্রিয়া হিসাবে পরিগণিত হইবে না,—তবে আমরা কোন মতেই 'জ্ঞান'কে দ্রব্য বলিতে পারি না। অনেকেই জ্ঞানকে জ্ঞাতার গুণ বা ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত করেন। আশ্রয়হীন জ্ঞানের কল্পনা করা যায় না। ইহা কোন না কোন ব্যক্তির সহিত সংস্পৃষ্ট থাকে। আবার অনেক চিন্তাশীল-ব্যক্তির মতে জ্ঞান একরূপ সম্পর্কও বটে; যদিও ইহা বাহ্য-সম্পর্ক না আন্তর সম্পর্ক—সে বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে, জ্ঞান কখনই 'দ্রব্য' রূপে সমাদৃত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাক্, 'জ্ঞান'কে কেবল গুণ বলা যায় কিনা। যেহেতু 'জ্ঞান', দেহান্তর্গত ও দেহ-বাহ্য বিষয়-সমূহের সহিত সচেতন জ্ঞাতার প্রতিক্রিয়ার ফলে সমুদ্ভূত, সেইহেতু ইহাকে বিষয়ী-আত্মার অধিকৃত এক নবোৎপন্ন ফল বলিয়া বিবেচনা করা যায়। জ্ঞাতার অতীত অভিজ্ঞতা, অভ্যাস সংস্কারাদির দ্বারা সু-নিয়ন্ত্রিত বিশেষ ধারায় প্রতিক্রিয়াশীল চেতনাত্মা সর্ব্বদাই তাহার বিশিষ্ট জ্ঞানাকারে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়া করে; আর সেইভাবে 'জ্ঞেয়' বা 'জ্ঞানে'র আকারে মানসিক বস্তু-গুলিকে সাজায়। এইভাবে সমুৎপন্ন জ্ঞান বিষয়ী-জ্ঞাতার উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলে। অতএব যুক্তি-যুক্তভাবেই জ্ঞানকে জ্ঞাতার গুণ বা ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। সর্ব্বব্যাপক অর্থে যে জ্ঞান—অর্থাৎ টেবিল-চেয়ার, বাদ্যমান ঘণ্টা, সুগন্ধিপুষ্প বা সুমিষ্ট খাদ্য—প্রভৃতির প্রত্যক্ষ-রূপ বিশেষ বিশেষ চেতনা বুঝাইতে যে জ্ঞান, তাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। এইরূপ প্রত্যক্ষ-বিষয়ীভূত সংবিদ সকল এক ধারাবাহিক প্রবাহে চেতন-মনের মধ্যে আবির্ভূত ও তিরোহিত হইতেছে। ফলে দেখা যায় যে, এই ব্যাপক অর্থে, জ্ঞান জ্ঞাতাকে খুবই স্বল্পকালের জন্য এবং নিতান্ত বাহ্য-ভাবে উপহিত করে। কিন্তু যখন সঙ্কীর্ণতর অর্থে জ্ঞান বলিতে বুঝি—"বিষয়-শৃঙ্খল-

অনুসারী এবং পারস্পরিক সঙ্গতিতে আস্থা-শীল এক ধারণা-শৃঙ্খল''—তখন জ্ঞাতাকে" সুচির-কালের জন্য প্রভাবান্বিত করায় আমরা 'জ্ঞান'কে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি। বিক্ষিপ্ত সংবিদ্ হিসাবে 'জ্ঞান' যদি জ্ঞাতার পরিবর্ত্তন-ধর্ম্মী গুণ হয়, নির্দ্দিষ্ট ধারণা সমষ্টি হিসাবে 'জ্ঞান'কে তবে জ্ঞাতার এক অ-পরিবর্ত্তনশীল গুণ বলা যাইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জ্ঞানের জটিল ও স্থায়ী আকারগুলিও জ্ঞানের সরলতমরূপ অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত সংবিৎসকল হইতেই উৎপত্তিলাভ করে।

জ্ঞানের জটিলতর স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে আমরা সহজেই দেখি যে, বিশেষ অভিজ্ঞতা সকলের নির্বাচন, বিমূর্ত্তন ও সামান্যী করণের ফলে তাহারা রূপ-পরিগ্রহ করে। উচ্চস্তরের জ্ঞানের মধ্যে স্মৃতিও বিশেষ অংশ-গ্রহণ করে। যেহেতু অর্জিত অভিজ্ঞতারাশির সহিত স্মৃতি নূতন কিছুর সংযোগ-সাধন করেনা, সেইহেতু ইহাকে 'জ্ঞান'-আখ্যা দিতে অনেকেই আপত্তি করেন। কিন্তু স্মৃতি যদি পরবর্ত্তী সাফল্য-জনক প্রতিক্রিয়া সকলের পক্ষে বিশেষ সাহায্যকারী হয় তবে স্মৃতিকে অবশ্যই জ্ঞানের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যায়। স্মৃতপদার্থগুলি যদি জ্ঞান গঠন করে, তবে সহজেই বুঝা যায় জ্ঞান এক আকারে অপেক্ষাকৃত স্থায়ীগুণ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। সযত্নে সঞ্চিত, প্রয়োজনকালে স্মৃত এবং কার্য্যকালে ব্যবহৃত ধারণা সকল জ্ঞাতার অবিচ্ছেদ্য গুণ হিসাবে রূপ-পরিগ্রহ করে। তার্কিকের দৃষ্টিতে অবশ্য জ্ঞানের কোন আকারকেই আত্মার স্বরূপান্তর্গত গুণ বলা চলেনা; কারণ কোন জ্ঞানেরই স্থায়িত্ব সচেতন আত্মার বা শুদ্ধচৈতন্যের স্থায়িত্বকালের সম-ব্যাপক নহে। উন্মাদনা, স্মৃতি-হীনতা, স্বপ্নকালীন ক্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি অ-প্রাকৃত মানসিক—ব্যাধিতে পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সকল অস্বাভাবিক অবস্থার ক্ষেত্র বিবেচনা করিলে, বলিতে হয় যে, ব্যাপক দৃষ্টিতে জ্ঞানের সকল রূপই জ্ঞাতার অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তন-সাপেক্ষ গুণমাত্র। যখন আমরা বলি 'ক-এর এইরূপ জ্ঞান আছে', 'খ একজন জ্ঞানী বা শিক্ষিত ব্যক্তি'—ইত্যাদি তখন আমরা জ্ঞানকে ব্যক্তির স্বরূপ নির্দ্দেশক ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া থাকি।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পদার্থ-সংলগ্ন বস্তু-গুণ হইতে গুণ হিসাবে 'জ্ঞান' অনেক পৃথক। 'রঙ', 'শব্দ' প্রভৃতির মত জ্ঞাতার সহিত জ্ঞানের কোন দেশগত বা কালগত সম্পর্ক নাই। জ্ঞাতার সহিত সংস্পৃষ্ট জ্ঞান-রূপ গুণ পরিবর্ত্তনশীল

বা আপেক্ষিকভাবে স্থায়ী এক প্রভাব হিসাবেই দেখা দেয়। জ্ঞাতা তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত বিষয়-সমূহ হইতে বিশেষ প্রণিধানের সাহায্যে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান-রূপগুণ উৎপন্ন করে। বস্তু-গুণের সম্পর্কে কিন্তু একথা আদৌ প্রযোজ্য নহে।

এখন দেখা যাক্‌' জ্ঞান'কে কোনরূপ সম্পর্ক রূপে স্থির করা চলে কিনা। জ্ঞানকে সম্পর্ক হিসবে স্থির করিবার পূর্ব্বে জ্ঞান ও সম্পর্কের প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ ধারণা রাখা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই দেখানো হইয়াছে যে, উপস্থাপিত বিষয়ের উপর প্রতিক্রিয়ার ফলে জ্ঞানের উদ্ভব। উজ্জ্বল রশ্মিজাল যেরূপ সম্মুখে উপস্থাপিত বিষয়গুলিকে সমুদ্ভাসিত করে, সেইরূপ চৈতন্যগুণও তাহার সম্মুখে উপস্থিত বস্তু-সমূহ হইতে স্বীয় প্রণিধানের সাহায্যে জ্ঞানের বিশেষ আকার-সকল প্রস্তুত করিয়া লয়। চৈতন্য বা জ্ঞান-রূপ ক্রিয়া সকল প্রকার জ্ঞানের এক স্থায়ী (আপেক্ষিকভাবে) সর্ত। কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্নতা জ্ঞাতার সম্মুখে প্রদত্ত বিষয়গুলির বিভিন্নতার উপরই নির্ভরশীল। বিষয়ের উপস্থিতি ও সামান্য আকারে জ্ঞানের এক অপরিহার্য্য, ও নির্দ্দিষ্ট সর্ত। তবে বিষয়-সমূহের বিভিন্নতা ধরিলে, জ্ঞানের এই সর্ত অত্যন্ত অস্থির ও অনির্দ্দিষ্ট। যাহা হউক, ইহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে জ্ঞান দুইটি সর্তের সমবায়ে উৎপন্ন হয়।

এখন 'সম্পর্কের প্রকৃতি অনুধাবণ করা যাক্‌। 'সম্পর্ক' বলিতে বুঝায় 'কোন সংযোগকারী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক ঘটনা-শৃঙ্খল'। যখন আমরা বলি যে, দুইটি বস্তু পাশাপাশি বা একটি অন্যের উপর রক্ষিত আছে, তখন আমরা বুঝি কোন এক নির্দ্দিষ্টভাবে বস্তু দুইটি এক পূর্ণ দেশের অন্তর্গত। আবার যখন 'মানুষ' ও 'মরণশীলতা' পরস্পর এক আন্তর সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে, তখন সেই সম্পর্ককে আমরা এমন এক কারণ-শৃঙ্খরূপে চিন্তা করিতে পারি যাহাতে কারণ ও কার্য্য পরস্পর সম্পৃক্ত। এখন দেখিতে হইবে যে জ্ঞান তাহার কোন আকারেই সম্পর্ক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কিনা। প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে জ্ঞান স্বয়ং—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্পর্কে উদ্ভুত এক ফল (এই সম্পর্কটি আলেক্‌জাণ্ডারের মতানুযায়ী) সহাবস্থিতির হইতে পারে ও কার্য-কারণেরও হইতে পারে। এইরূপে সমুৎপন্ন জ্ঞান আবার জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের—উভয়ের সহিত সম্পর্ক বিশিষ্ট হইতে পারে। অধিকারী জ্ঞাতার সহিত 'জ্ঞান' আঙ্গিকভাবে বা সংযোগ—প্রভাবাদিভাবে সম্পর্কিত থাকিতে পারে। কোন আকারে জ্ঞাতার সহিত জ্ঞানের সমবায় সম্পর্কও আবিষ্কার

করা যায়। অপরপক্ষে, জ্ঞেয় বস্তুর সহিত জ্ঞান উল্লেখ, ব্যাঞ্জনা বা প্রত্যক্ষ পরিচিতির সম্পর্কে যুক্ত থাকিতে পারে। সম্পর্ক হিসাবে জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে হইলে পূর্ব্বেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, জ্ঞানের ক্রিয়া (বা 'জানা')-রে জ্ঞানের ফল (বা 'জ্ঞাত') হইতে কতখানি বিবিক্ত করা যায়। ইহাও পরীক্ষা করা প্রয়োজন যে, জ্ঞানের বিভিন্ন প্রকারভেদে জ্ঞানের মানসিক রূপগুলির (contents) সহিত জ্ঞানের বস্তুগুলির (objects) কি সম্পর্ক আছে। যদি বিশ্লেষণাত্মক অনুসন্ধানের সাহায্যে স্থির করা যায় যে, জ্ঞানের কোন ফলকে (product) জ্ঞানের ক্ষেত্রে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের বন্ধনকারী এক জ্ঞানের প্রক্রিয়ায় ('process') পর্য্যবসিত করা যায়, তবে সেই জ্ঞান নিশ্চিতই কোন প্রকার সম্পর্ক হইবে। আবার যদি দেখা যায় যে, জ্ঞানের মানসিক রূপ ও বাহ্য বস্তুর সহিত সম্পর্ক পরিপূর্ণ একাত্মতা বা বিভেদের নহে, কিন্তু সেই সম্পর্ক অস্থির ও গতিশীল, তবে সেই অবস্থায় 'জ্ঞান'কে কোন এক সম্পর্করূপে দাঁড় করানো যায়। আদর্শবাদী ও বাস্তববাদী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ জ্ঞানের এই মানসিক আকার (content) ও বাহ্য বিষয়ের (object) সম্পর্ক বিষয়ে এতই ভিন্নমত পোষণ করেন যে, তাঁহারা জ্ঞানের প্রকৃতি ও মর্য্যাদা সম্পর্কে বিপরীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। ভাববাদীদের মধ্যে যাঁহারা কেবলমাত্র ব্যক্তি—আত্মায় বিশ্বাসী তাঁহারা জ্ঞানের সকল আকারেই জ্ঞানের মানসিক রূপ (content) ও বস্তুকে একীভূত করেন এবং মনের অতিরিক্ত বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেন। দার্শনিক বার্ক্‌লের মতে জ্ঞান অনেকাংশেই এক আন্তর সম্পর্ক—যাহা সম্পর্কের এক পদকে (relatum) গঠনও করে। ইহা এমন এক সম্পর্ক যাহা জ্ঞাতার এক অপরিহার্য্য ধর্ম্মও বটে। জ্ঞান একরূপ সম্পর্কই—কারণ 'জানা'র আকারে জ্ঞান এমন এক ভাব সমষ্টি গঠন করে যেখানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক শৃঙ্খলে বিধৃত। হে-গেল প্রমুখ দার্শনিকগণের ব্যাপকাত্মক ভাববাদে জ্ঞানের মানসিক বিষয় (content) ও বাহ্য-বস্তু কেবলমাত্র অবাস্তব ধর্ম্মে পৃথক—মূলতঃ তাহারা সর্ব্বব্যাপক একই আত্মা বা ভাবের ভিন্নরূপ অভিব্যক্তিমাত্র।

এই মতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সারভূত যে জ্ঞান তাহা স্বয়ং দ্রব্যস্বরূপ এবং ইহার দ্বারা সম্মিলিত দুইটি পদেরই গঠনকারী।

কাণ্টের দর্শনে জ্ঞানের বিষয় ও বস্তু (content ও objct) অভিন্ন এবং উভয়ই মনের অতিরিক্ত বাহ্যবস্তু বা স্ব-স্বরূপ বস্তুনিচয় (things-in-themselves)

হইতে পৃথক। এই মতে আমরা জ্ঞানের দুইটি ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা লক্ষ্য করি। জ্ঞান বলিতে যখন বুঝি যে সংশ্লেষাত্মক, অভিজ্ঞতাপূর্ব্ব (synthetic, apriori) এক বচন সমষ্টি—তখন জ্ঞানকে যেন ইহার প্রক্রিয়া হইতে পৃথক এক সিদ্ধ ফল রূপে গণ্য করা হয়। আর সেই আকারে জ্ঞানকে কখনই এক সম্পর্ক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু অন্যত্র জ্ঞানের উৎপত্তি বর্ণনাকালে কাণ্ট্ এ কথাও বলেন যে, উপস্থাপিত ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয় সমূহের (sense-manifold) সংস্পর্শে বোধি ও বুদ্ধি কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে (forms of sensibility ও categories of understanding) জ্ঞাতা জ্ঞান গঠন করে; এবং নির্দ্দিষ্ট ছাঁচগুলিকেও প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মাত্র পাওয়া যায়। জ্ঞানের এই রূপ ব্যাখ্যানে জ্ঞান এক আন্তর সম্পর্ক হিসাবেই আত্ম-প্রকাশ করে; কারণ এই জ্ঞানের সম্পর্কিত পদ-দ্বয়ের অন্ততঃ একটিকে জ্ঞান নিজে গঠন করে। এই মতে, জ্ঞানের মানসিক বিষয় ও জ্ঞানের বস্তুকে (content ও object) পরস্পর পৃথক করা যায় না।

সাধারণভাবে বলিতে হইলে, বাস্তববাদী সকল দর্শনেই জ্ঞানের বিষয় ও বস্তুকে—বস্তু-স্বাধীনতার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া, একাত্ম করা হইয়াছে। জ্ঞানের বস্তু সকলকে মনের অতিরিক্ত দ্রব্য হিসাবে ধরা হয়; আর 'জ্ঞান'কে বস্তুর আকস্মিক ও অবান্তর বাহ্য পদার্থ হিসাবে গণ্য করা হয়। কতিপয় নব্য-বস্তুবাদী মতে 'জ্ঞান' স্নায়ু-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বিশিষ্ট এক বস্তু বা বস্তু-সমষ্টি মাত্র। এই মতে, জ্ঞান—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগকারী এক বাহ্য-সম্পর্কবিশেষ ও একই কলে জ্ঞাতার সচল ধর্ম্মও বটে।

সাধারণভাবে প্রায় সকল সমালোচনা-মূলক বাস্তববাদীদর্শনে জ্ঞানের বিষয় (content) ও বস্তুর (object) মধ্যে এক ভেদ-রেখা টানা হয়। এই মতানুযায়ী জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-বস্তুর মধ্যবর্ত্তী 'জ্ঞানের বিষয়' বাহ্য-বস্তুর এমন এক ছায়া বা ইঙ্গিত যাহার ভিত্তিতে বস্তুর স্বরূপ জানিবার প্রয়াস করা হয়। জন লক্ প্রমুখ কতিপয় দার্শনিকের মতে 'জ্ঞানের বিষয়' এক মানসিক ধারণা। সেই হিসাবে ইহাকে জ্ঞাতার ধর্ম বলা যায়। কিন্তু অপর কয়েকজনের মতে—যেমন নয়া সমালোচনা মূলক বাস্তববাদে, 'জ্ঞানের বিষয়' সকল মানসিক বা বাহ্য কোন পদার্থ নয়—কিন্তু একরূপ ভাববস্তু। ব্যাপক অর্থে, মানসিক বিষয়গুলিকে যদি জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে এই জ্ঞান স্বয়ং কোন সম্পর্করূপে গণ্য হইতে পারে না। ব্র্যাড্লের দর্শনে,

আমরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় ও বস্তুর মধ্যে সম্পূর্ণ এক নূতন সম্পর্কের ধারণা লক্ষ্য করি। বচন বা বচনের সমষ্টি হিসাবে 'জ্ঞান' অবশ্যই সম্পর্ক-রূপী; আর এই জ্ঞান কখনই প্রকৃত বস্তু বা সত্তাকে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেনা। সংযোগ-কামী চিন্তার এবং চিন্তাও চিন্তেতরে পার্থক্যে উদ্ভূত ফল হিসাবে 'জ্ঞান'-কে এক অর্থে সম্পর্ক-রূপী বলা যায়; যদিও এই 'জ্ঞান' এক আংশিক বস্তু-সত্তার মর্য্যাদা উপভোগ করে ও পরিশেষে, পরমতত্ত্বে রূপ-পরিবর্তন করে।

নিরপেক্ষ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জ্ঞানের বিষয় ও বস্তুর মধ্যে বা জ্ঞানের ক্রিয়া ও ফলের মধ্যে সকল প্রকার জ্ঞানের সম্পর্কের রূপ এক নয়। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞানের বস্তুর সহিত মিশিয়া যায়। আর এই জ্ঞানে, ক্রিয়া ও ফলের মধ্যেও পার্থক্য ও বিশেষ সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে না। প্রত্যক্ষ--গোচরীভূত সংবিদ সকল সহজভাবে জ্ঞানের বস্তুর দিকে আগাইয়া যায়।

এই একই তথ্য 'বেদান্ত পরিভাষা'য় প্রকারান্তরে প্রকাশ করা হইয়াছে। সেখানে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষজ্ঞানে অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্যইন্দ্রিয়দ্বারের মাধ্যমে বহির্গত হইয়া বিষয়-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের সহিত মিলিয়া একীভূত হইয়া যায়। অতএব প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের স্তরে, 'জ্ঞান'কে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সংযোগকারী এক সম্পর্ক হিসাবে গণ্য করা যায়। 'স্মৃতি'তে স্পষ্টভাবেই বিষয় ও বস্তুর মধ্যে এক ভেদলক্ষ্য করা যায়। কারণ অন্ততঃ 'সজীবতা' ও 'কালে'র দিক হইতে স্মৃত বিষয়-সকল, স্মৃতির বস্তু সকলের সহিত এক হইতে পারে না। জ্ঞাতার স্বরূপের সহিত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধফল হিসাবে স্মৃতির বিষয়গুলিকে জ্ঞাতার একরূপ গুণ বলা চলে। আবার যেহেতু, স্মরণকে ক্রিয়ার আকারে ধরা যায় এবং স্মৃতি-ছায়াগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবেই সচল ও বস্তু-সূচক বলা যায়, সেহেতু স্মৃতির বিষয়কে এক ধরণের সম্পর্করূপে গণ্য করা যায়; এই সম্পর্ক জ্ঞাতা ও অতীত বস্তু সকলকে সংযুক্ত করে। চিন্তা, অনুমান, তর্ক প্রভৃতি জ্ঞানের জটিল প্রকারগুলিতে আমরা বিষয় (যাহা জ্ঞানের ফলও বটে) ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করি। অতীন্দ্রিয় বস্তু সকল, মানসিক বা তর্ক-সিদ্ধ ঘটনাকারে নির্দ্দিষ্ট বিষয়সমূহের দ্বারা সূচিত বা উল্লিখিত হয়। আর এই সকল বিষয় স্বয়ং সম্পর্ক-হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, অধ্যাস, অমূল-প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অ-প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতাসমূহে, ব্যাপক অর্থে যে জ্ঞান, তাহা সম্পর্কের এক পদ গঠনকারী আন্তর-সম্পর্ক হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অতএব আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে

পারি যে জ্ঞানের মাত্র কয়েকটি প্রকারই সম্পর্করূপে পরিগণিত হইতে পারে।

এখন আমরা জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে এক বিশেষ দার্শনিক মত আলোচনা করিব। এই মতানুসারে, জ্ঞান তাহার কুটস্থ স্বরূপে কেবলমাত্র মূল্যবান নহে, জগতের এক (বা একমাত্র) সার পদার্থ। বলা হয় যে আরও অনেক বস্তুর মত, জ্ঞানেরও দুইটি দিক্ আছে—(১) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মিলনে উদ্ভূত এবং স্বীয় ক্রিয়ার মাধ্যমে সুপ্রকাশ, একটি অভিজ্ঞতালব্ধ বাহ্য দিক ও (২) শুদ্ধ চৈতন্যরূপী, অভিজ্ঞতাতিরিক্ত অপর একটি দিক। জ্ঞানের এই বাহ্য দিক্ সম্পর্কে আমরা ইতোপূর্ব্বে সুদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছি।

বর্ত্তমানে, আমরা জ্ঞানের এই 'চৈতন্য'রূপী সার প্রকৃতির স্বরূপ পরীক্ষা করিব। 'চৈতন্য' বলিতে আমরা যদি অদ্বৈত বেদান্তের নিরাকার, অনির্দ্দেশ্য পরম সত্তা বুঝি, তবে আমরা সেইরূপ চৈতন্যকে কখনই 'জ্ঞান' আখ্যা দিতে পারি না। শুদ্ধ চৈতন্য—জ্ঞানের এক নিয়ত, অপরিহার্য সর্ত্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কখনও'জ্ঞান' গঠন করে না। সর্বব্যাপক অর্থেও আমরা যে 'জ্ঞান' কথাটি ব্যবহার করি, তাহা উৎপত্তিলাভের জন্য 'জ্ঞাতা' ও জ্ঞেয় বস্তু—উভয়েরই প্রয়োজন অপেক্ষা করে। বস্তুহীন, নিরাকার চৈতন্য আত্মপ্রকাশ করিতে পারে বটে কিন্তু তাহা **কোন কিছুকে, কোন কিছুর নিকট** প্রতিভাত করে না। কর্ম্মকর্তৃ-বিরোধের জন্য একই বস্তু, একই কালে কখনও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—উভয়রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। আর সেই কারণে, এই অনির্দেশ্য চৈতন্য নিজেকে নিজের বিষয় করিতে পারে না। স্বতঃপ্রকাশ ও স্বতঃপ্রমাণ চৈতন্য পরমতত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু সেই কারণেই, ইহা স্বাতিরিক্ত বস্তু উল্লেখকারী 'জ্ঞান' বলিয়া কখনই বিবেচ্য হইতে পারে না।। সুতরাং 'জ্ঞান' হইতে হইলে 'জ্ঞান'কে অবশ্যই ইহার সর্ব্বজনস্বীকৃত (বাহ্য) অভিজ্ঞতা-মূল স্বরূপটি ধারণ করিতে হইবে। 'জ্ঞানে'র এই অভিজ্ঞতা-পর স্বভাবের বিমূর্ত্তন করিলে আমরা 'জ্ঞানের কোন সার-স্বরূপে উপস্থিত হই না—বরং 'জ্ঞানে'র সার-ধর্মেরই বিনাশ ঘটাই। অদ্বৈত-বাদী বেদান্তীরা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন যে, শুদ্ধ চৈতন্য দ্রষ্টাহীন ও দৃশ্যহীন দৃকমাত্র। কিন্তু সাধারণভাবে স্বীকৃত যে 'জ্ঞান' তাহা 'জ্ঞাতা' ও জ্ঞেয়বস্তু'-রূপ অপরিহার্য সর্ত্ত দুইটির অপেক্ষা করে। অদ্বৈত প্রমাণশাস্ত্রে, বৃত্তিনামধেয় মানসিক প্রকার রূপ কতকগুলি স্বীকৃত সত্ত্বের সাহায্যে 'জ্ঞান-প্রক্রিয়া'র ব্যাখ্যা করা হয়। আর এই সকল মানসিক রূপ বা বৃত্তি—কেবলমাত্র চৈতন্য, জড়ধর্মী সূক্ষ্ম অন্তঃকরণ এবং বস্তুর সমবায়ে সমুৎপন্ন হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট আকারসকল বিশিষ্ট যে মন তাহাও প্রকাশ্য বা

অপ্রকাশ্যভাবে কোন না কোন জ্ঞাতার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। এমন কি চরম-পূর্ব অবস্থায় 'আমিই ব্রহ্ম'—এই প্রকার যে ব্রহ্ম-জ্ঞান হয় তাহাতেও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের এক সূক্ষ্ম ভেদ বর্ত্তমান। সুতরাং এই জ্ঞানাবস্থা—অবিভাজ্য, অনির্দ্দেশ্য নিরাকার চৈতন্য রূপ পরম-সত্তার এক নীচের স্তরের সূচনা করে। অতএব শুদ্ধ চৈতন্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে আমরা দেখি যে ইহাকে জ্ঞানোত্তর পরমার্থ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে ; কিন্তু জ্ঞানেরই প্রয়োজনীয় বা সত্তাধর্মী অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ স্বভাব হিসাবে এই চৈতন্যকে নির্দ্দেশ করা যায় না।

এখন এক আপত্তি উঠিতে পারে যে চৈতন্যকে অদ্বৈত-বেদান্তের নিরাকার, অনির্দ্দেশ্য ও শুদ্ধ চৈতন্য হিসাবে না ধরিয়া রামানুজীদের মতানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট ও সাকার চৈতন্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়। রামানুজের মতে, চৈতন্য সর্ব্বদাই সবিকল্পক এবং জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের নির্দ্দেশকারী। চৈতন্যমাত্রই কোন কাহারও কর্তৃত্বাধীন, কোন কিছু সম্পর্কীয়। রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত দর্শনে এইরূপ চৈতন্য একই কালে সার বস্তু ও গুণ—উভয়ই। নিত্য যে আত্মা বা অহং-কর্ত্তা তাহা নিজে চৈতন্যও বটে আবার চৈতন্য-গুণ-বিশিষ্টও বটে। সুতরাং রামানুজ-বর্ণিত চৈতন্যকে 'জ্ঞান' আখ্যা দিলে, 'জ্ঞান' চরম ও নিত্য অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। ফলতঃ আমাদের ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, জ্ঞান গুণ ব্যতীতও দ্রব্য বা সার-বস্তু হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু এই মতে কতকগুলি দুর্লজ্ঘ্য বাধা আসিয়া পড়ে। প্রথমতঃ ইহা বুঝা কষ্টসাধ্য যে, একই চৈতন্য সারবস্তুও বটে আবার গুণও বটে। দ্বিতীয়তঃ যে সকল অবচ্ছেদক জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদসীমা দেখায়, সেগুলি অভেদাত্মক চৈতন্যকে জ্ঞানের সাধারণ সর্ত্ত হিসাবেই মাত্র সূচিত করে, কিন্তু তাহাকে পরিপূর্ণ জ্ঞানের আখ্যা লাভ হইতে বঞ্চিত করে। তৃতীয়তঃ ব্রহ্মের জ্ঞান ও (ব্রহ্ম জ্ঞানের কর্ত্তা হিসাবে—যদি আদৌ সেকথা বলা চলে) কেবল চৈতন্যাশ্রয়ী জ্ঞান উপরি-উক্ত সমস্যাগুলির সমাধান না হইলে, আমরা চৈতন্যকে একই কালে সারবস্তু ও গুণ দুই-ই বলিতে পারি না। 'জ্ঞান' সম্পর্কে এমন মতও দেখা যায় যে 'জ্ঞান' মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ বস্তু এবং শিক্ষার কার্য হইল অজ্ঞানাবরণ উন্মোচিত বা দূরীভূত করিয়া স্বাভাবিক জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ করা। বলা বাহুল্য, ইহা অদ্বৈত-মতেরই এক ভাষ্য। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আমরা বলিতে পারি যে 'জ্ঞান'কে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নেতিবাচক ভাবে ব্যাখ্যা করিলে জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা হয়। 'ব্রহ্ম' ও 'জ্ঞান' সম্পূর্ণ সমার্থক পদ নহে। অতএব জ্ঞানের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের পূর্ব সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।—'জ্ঞান'

প্রধানতঃ গুণের পর্যায়ে পড়ে। আমরা দেখিয়াছি যে, কতকগুলি ক্ষেত্রে 'জ্ঞান' এক বিশেষ প্রকার সম্পর্কও বটে; কিন্তু যে সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানের সম্পর্ক-রূপ দেখা যায়, সেই সকল স্থলে, 'জ্ঞান' 'গুণ-হিসাবেও এক স্বতন্ত্র মর্য্যাদা বজায় রাখে। অতএব কোন রূপেই 'জ্ঞান' কেবলমাত্র সার চৈতন্য নয়।

'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়' বিভাগ অনুসারে, আমরা সম্ভাবনার দিক হইতে 'জ্ঞান'কে নিম্নলিখিত চারিটি পর্য্যায়ে বসাইতে পারি :—(১) 'জ্ঞান' সম্পূর্ণ 'নিষ্ক্রিয়' (২) 'জ্ঞান' সম্পূর্ণ 'সক্রিয়', (৩) 'জ্ঞান' 'সক্রিয়' 'নিষ্ক্রিয়' উভয়ই; (৪) 'জ্ঞান' সক্রিয়ও নহে, নিষ্ক্রিয়ও নহে—নিরপেক্ষ এক পদার্থ।

'জ্ঞান' সক্রিয় না নিষ্ক্রিয়—এই আলোচনার প্রাক্কালে আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে যে কেবলমাত্র প্রক্রিয়া হিসাবেই (process-wise) 'জ্ঞানের' সম্পর্কে এই বিতর্কের অবতারণা সম্ভবপর। কেননা, সিদ্ধ ফল হিসাবে 'জ্ঞান' সকল সময়েই নিষ্ক্রিয়। এখন উল্লিখিত চারিটি পর্য্যায়ের প্রথম তিনটি দর্শনের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে বলিয়া আমাদের আলোচ্য বিষয় হইবে।

(১) প্রসিদ্ধ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক লকের মতে, জ্ঞান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। তাঁহার নিকট মন এমন এক অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানশূন্য স্বচ্ছ পদার্থ যাহার উপর বাহ্য অভিজ্ঞতা বিশেষ রূপ বসায়। 'সংবেদন' ও 'চিন্তন'—রূপ দুই দ্বারপথে ধারণা-সকল উৎপত্তিলাভ করে। সংমিশ্রণের নিতান্ত প্রাকৃতিক (বা যান্ত্রিক) নিয়মাবলীর সাহায্যে সেই সকল ধারণার নানারূপ সংগঠন সম্ভব হয়। সরল বা মিশ্র—কোনরূপ ধারণা গঠনেই মনের সক্রিয় ভূমিকা স্বীকার হয় না। জ্ঞানের সংজ্ঞাদানকালে লক্ বলেন যে, জ্ঞান ধারণাসকলের মধ্যে সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষকারী এক পদার্থ। কিন্তু এই 'প্রত্যক্ষ' সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। লকের এই অভিজ্ঞতাবাদকে যুক্তি-সিদ্ধ পরিসমাপ্তির পথে টানিয়া আনিয়া 'হিউম' বলেন যে, 'জ্ঞান' বস্তুতঃ সংবেদন-ধারামাত্র—আর এই সকল সংবেদন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও বাহ্য উপায়ে সংযুক্ত হয়।

সমালোচন ঃ 'জ্ঞান সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়'—এই যে মত উপরে প্রকাশিত হইল, তাহা কতকগুলি সুস্পষ্ট প্রমাদের জন্য কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। প্রধানতঃ লকের মতবাদ সমালোচনা করিয়া আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতে পারি :—

(ক) কান্টের কথা স্মরণ করাইয়া আমরা বলিতে পারি যে, মনের সংশ্লেষধর্মী ক্রিয়া ব্যতীত কোন জ্ঞানই গঠিত হইতে পারে না। সংশ্লেষাত্মক মনের এই ক্রিয়া—

প্রত্যক্ষ, স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা রূপ তিন প্রধান ক্রিয়ার মাধ্যমে সুব্যক্ত হয়। কোন সংশ্লেষনকারী, অভেদাত্মক চৈতন্য ব্যতীত ইন্দ্রিয়লব্ধ সংবেদনগুলি ভিত্তিহীন এবং কোনরূপ সংঘটন-সাধনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কান্টের অনেক পরে ব্রাড্‌লে সহ-মিশ্রণ নীতি (Doctrine of Association) নামক অভিজ্ঞতাবাদী যুক্তি-শাস্ত্রের যে মনোবিজ্ঞানী ভিত্তি—তাহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। এই নীতি-অনুসারে, বিশেষ, একক পরমাণু-স্বভাব মানসিক বিষয় সকলের সংযোগ-সাধনেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে। কিন্তু ব্র্যাড্‌লে প্রশ্ন করেন যে, যে মানসিক অংশ সকল আবির্ভূত হইতে না হইতেই তিরোভূত হয়—তাহারা কি ভাবে অন্যকে বিধৃত করিবার কোন সাধারণ ভিত্তি সূচিত করে? ব্র্যাড্‌লে আরও বলেন যে, যে সহ-মিশ্রণের জন্যও মানসিক বিষয় সকলের পক্ষে প্রভেদ ও রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক নিয়ত অবিচ্ছিন্ন ধারা রক্ষা করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা বাদীদের বিপক্ষে ব্র্যাড্‌লে এই মতবাদ প্রচার করেন যে, সকল সহ-মিশ্রণই জাতি-সকলের মধ্যেই সংঘটিত হয় ('All association is between universals'). 'সহ-মিশ্রণের নীতি সমালোচনা করিয়া তিনি 'বচন' (বা 'ভাবনা') সম্পর্কীয় মতবাদে উপনীত হন। তাঁহার মতে, 'ভাবনা'—উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ঐক্য বিধানকারী এক ক্রিয়া।

(খ) অতি প্রাথমিক প্রত্যক্ষ সমূহেও মানসিক বিচার নিহিত থাকে। অতএব, ধারণা সমূহের প্রাকৃতিক সংগঠন বা সংবেদন সমূহের বহিঃ প্রকাশ এবং (লকের মতানুযায়ী) পরবর্ত্তীকালে, সেই সকলের বাহ্য প্রকৃত বস্তুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ—প্রভৃতি স্বীকৃত ভিত্তি সকল মনেবিজ্ঞান-সম্মতও নহে যুক্তি বিজ্ঞান সম্মতও নহে—অলীক কল্পনামাত্র এবং সেই কারণে অগ্রহণযোগ্য। সমালোচনা হিসাবে বলা যায়, জ্ঞান-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ ও সহজভাবেই বস্তুর নির্দ্দেশ করে।

(গ) স্বীয় অভিজ্ঞতা বাদের সহিত সঙ্গতি রক্ষা লরিয়া লক্ যদি বলেন যে ধারণা সকলের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্য বোধগ্রহী প্রত্যক্ষ স্বয়ং প্রাকৃতিকভাবে ধারণার বাহ্য সংযোগে উৎপন্ন হয়— তবে এই প্রত্যক্ষের স্বরূপ বোধের জন্য দ্বিতীয় এক প্রত্যক্ষের প্রয়োজন হয়; তজ্জন্য আবার তৃতীয় এক প্রত্যক্ষের আবশ্যক হয়—এবং এইভাবে এক অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়ে। অপরপক্ষে, উল্লিখিত প্রত্যক্ষ যদি সংশ্লেষাত্মক ও সক্রিয় প্রনিধানের আকার ধারণ করে—তবে প্রত্যক্ষ স্বয়ং এক প্রকার জ্ঞান বলিয়া, জ্ঞানের এই সক্রিয়তা অপরাপর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত না করার কোন

যৌক্তিকতা পাওয়া যায় না। তাহা হইলে, 'জ্ঞান যে নিষ্ক্রিয়'—সেই মতবাদ একেবারে বাতিল হইয়া যায়।

(২) 'জ্ঞান যে সক্রিয়'—এই মতের প্রধান ও বলিষ্ঠ পরিপোষক হইলেন দার্শনিক লাইবনিৎস্। তাঁহার মতে, প্রতি নিশ্ছদ্র চেতনাণুর ('windowless monad'-এর) অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয়ের উপর বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কোন চেতনাণু যত সক্রিয় হইবে তত বেশী পরিষ্কার ও পরিস্ফুটভাবে জ্ঞানের প্রকাশ করিবে। জ্ঞানের পরিচায়ক যে নিরন্তরক্রিয়া তাহা অস্ফুট ক্রিয়াবেগে appetition) বা অচেতন মানসিক বিষয়ের চেতনাবস্থার প্রতি নিরন্তর গতির মাধ্যমে অনুভূত হয়। লাইবনিৎস্ দর্শনে 'অন্ধ ক্রিয়াবেগ' জ্ঞানের নিয়ামক বলিয়া তাঁহার মতে জ্ঞান শতকরা শতভাগই ক্রিয়া। স্বামী বিবেকানন্দের এক নেতিবাচক মতে, 'জ্ঞান' আত্ম-সচেতনতার প্রকাশ হইলেও, সিদ্ধ বিষয় বলিয়া আদৌ ক্রিয়াত্মক নহে।

সমালোচনা: জ্ঞানের এই ক্রিয়াবাদ সম্পূর্ণ আকারে, বিশেষতঃ সকল প্রকার জ্ঞানের স্বরূপ নিয়ামক হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। যদিও আমরা স্বীকার করি যে জ্ঞানের মধ্যে মনের এক সংশ্লেষাত্মক ক্রিয়া অন্তর্নিহিত থাকে, তৎসত্ত্বেও আমরা ইহা আদৌ স্বীকার করিতে পারি না যে, **সকল প্রকার** 'জ্ঞান **সম্পূর্ণ** ক্রিয়া। অভিজ্ঞতার ফলে জানা যায় যে, ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষসমূহে আমাদের মন অতি সামান্য অংশেই ক্রিয়াধর্মী। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সুস্থ ও সজাগ থাকিলে, স্বাভাবিক-ভাবেই জ্ঞান উৎপত্তি-লাভ করে। অনুমান তর্ক প্রভৃতি জ্ঞানের উচ্চতর প্রকারেও আমরা উপাদান হিসাবে যে সকল অভিজ্ঞতাগুলিকে পাই সেইগুলিও প্রায় বিনা আয়াসে অল্পাধিক নিষ্ক্রিয়ভাবে পাই। অনেক জ্ঞানই আমরা এত শীঘ্র লাভ করি যে, সে সকলে মানসিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। আবার ইহাও সত্য যে, যে জ্ঞান লাভে মানসিক অনুশীলণের প্রয়াস তীব্রভাবে অনুভূত হয়, সেই জ্ঞানে ত্রুটি বা অস্পষ্টতা প্রায়ই দেখা যায়। অতএব জ্ঞান যে পুরাপুরি এক ক্রিয়া সেই মত একদেশদর্শী, অসংস্কৃত ও দোষযুক্ত বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

(৩) 'জ্ঞান যে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয়ই'—এই মতের বিশিষ্ট পরিপোষক হইলেন কাণ্ট। তাঁহার মতানুসারে, ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদান সমূহের উপর মানসিক প্রকারগুলির প্রয়োগের ফলে জ্ঞান উদ্ভূত হয়। দেশাকারে ও কালাকারে রূপায়িত প্রত্যক্ষগুলি বা বোধিগুলি ইন্দ্রিয় পথে উপস্থিত হয় আর চৈতন্যের ঐক্যশক্তি কল্পনাকারের মাধ্যমে, বুদ্ধির নির্দ্দিষ্ট ধরণগুলির সাহায্যে তাহাদের উপর ক্রিয়া করে।

স্বরূপাবস্থিত (সর্ত্তনধীন) বস্তুসমূহ হইতে মন নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রভাব লাভ করে এবং ইন্দ্রিয়-লব্ধ প্রভাব সকল হইতে 'জ্ঞান বা জ্ঞাত বস্তুসমূহ' (phenomena) গঠন করে। এইভাবে দেখা যায় যে, জ্ঞান নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তার এক সংমিশ্রণ।

সমালোচনা: আলোচিত মত তিনটির মধ্যে শেষোক্ত মতটিই যুক্তিযুক্ত। ইন্দ্রিয়-লব্ধ বিষয় ও সক্রিয় মনের ক্রিয়া—এই উভয়ের সংমিশ্রণে সংগঠিত জ্ঞান আংশিকভাবে সক্রিয় ও আংশিকভাবে নিষ্ক্রিয়। কিন্তু কাণ্টের মতের কিছু সংশোধন প্রয়োজন। প্রথমতঃ চিন্তার স্ব-বিরোধ না ঘটাইয়া বিজ্ঞাত বস্তু ও স্ব স্বরূপাবস্থিত বস্তুর মধ্যে আমরা সীমারেখা টানিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ কাণ্টের মতানুযায়ী আমরা ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মধ্যে কোন ভেদরেখা টানিতে পারি না। কারণ অতি প্রাথমিক পর্য্যায়ের ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মধ্যেও আমরা মনের বিচার-শক্তির অন্তর্ভুক্তি ও কতকগুলি সাধারণ (ও ব্যাপক) জাতির প্রয়োগ লক্ষ্য করি। প্রাথমিক প্রত্যক্ষ-সমূহেও মনের সংশ্লেষাত্মক ক্রিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। সংবেদন ও উপলব্ধির মধ্যে কোন অস্বাভাবিক পৃথকীকরণ (বা বিমূর্ত্তন) স্বীকার করা যায় না।

ইহা অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষরূপে কতকগুলি জ্ঞানে যেমন নিষ্ক্রিয়তার অংশটি প্রধান, সেইরূপ অনুমান, তর্কাদি অপর কতক প্রকার মানসিক অনুশীলন সম্বলিত জ্ঞানে সক্রিয়তার অংশই সুব্যক্ত। অতএব বলা যায় যে, জ্ঞানে সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার মাত্রাগত তারতম্য আছে।

প্রসঙ্গত ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যখন আমরা বলি যে, জ্ঞানের এক ক্রিয়ার দিক আছে, তখন এই ক্রিয়া বলিতে আমরা যেন দৈহিক ক্রিয়া না বুঝি। যদিও অবধারণ, পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির দিগ্‌দর্শনকারী হিসাবে, জ্ঞানে পেশী-নিয়ন্ত্রণাদি দৈহিক ক্রিয়া অল্পাধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে, তথাপি এই ক্রিয়ার উপর ভিত্তি-স্থাপিত মানসিক ক্রিয়ার সহিত এই দৈহিক ক্রিয়ার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বা সমজাতীয়তা নাই। কতকগুলি জ্ঞানে যেরূপ জ্ঞান-প্রক্রিয়ায় অত্যধিক মানসিক অনুশীলনের সহিত কিছু দৈহিক ক্রিয়া সহ-গমন করে—সেইরূপ অপর কতক জ্ঞানে, ইহার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।

যেহেতু আমরা জ্ঞানের স্বরূপ-বিশ্লেষণে দেখিয়াছি যে জ্ঞান অংশতঃ সক্রিয়

মূল সিদ্ধান্ত :—এখন আমরা এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জ্ঞান মুখ্যতঃ এক প্রকার **গুণ** ও বাহ্যতঃ এক প্রকার **সম্পর্ক**। জ্ঞান-প্রক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বলিতে পারি যে, জ্ঞান **সক্রিয়** ও বটে, **নিষ্ক্রিয়ও** বটে। নেতিবাচক ভাবে বিচার করিলে, স্মরণ থাকিতে পারে যে, আমরা বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছি যে 'জ্ঞান' তাহার আন্তর স্বরূপেও দ্রব্য বা নিছক সারতত্ত্ব হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না।

ন্যায় শাস্ত্রে অনুমানের বিভাগ

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র মাইতি এম. এ.

ন্যায় শাস্ত্রানুমোদিত অনুমানের বিভাগ বিবেচনায় প্রথমেই যাহা লক্ষ্য করিবার তাহা এই যে ১।১।৫ গৌতমসূত্রোল্লিখিত (ক) পূর্ব্ববৎ (খ) শেষবৎ ও (গ) সামান্যতোদৃষ্ট এই ত্রিবিধ বিভাগকে আদিভাষ্যকার বাৎসায়ন ভিন্ন কেহই অঙ্গীকার করেন নাই, "অথতৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমাং পূর্ব্বচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টং চ"—নির্দেশ অস্বীকার করিয়া পরবর্তী সকল নৈয়ায়িক যেভাবে অনুমানের বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে এই শাস্ত্রের পুনর্জাগরণের অনেক সুবিধা হয়।

পরবর্তী গ্রন্থ ন্যায়বার্ত্তিক-কার উদ্দ্যোতকর সূত্রনির্দিষ্ট 'ত্রিবিধ' শব্দের বার্ত্তিকে বলিয়াছেন—"ত্রিবিধমিতি। অন্বয়ী, ব্যাতরেকী, অন্বয়ীব্যতিরেকীচেতি"। তিনি "ত্রিবিধ"শব্দকে 'শেষবৎ' প্রভৃতি বিভাগের বিবেচনার শেষে (১) প্রসিদ্ধ (২) সৎ ও (৩) অসন্দিগ্ধ এই ত্রিবিভাগেরও উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ এমতে অনুমানের বিভাগ নয় প্রকার। তবে ১।১।৩৩-৫ সূত্রবার্ত্তিক আলোচনা দেখিলে মনে হয় আচার্য উদ্দ্যোতকর নিজ নির্দিষ্ট বিভাগের তৃতীয়টী অর্থাৎ "অন্বয়ব্যতিরেকী" অনুমানকেই বিশেষ গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক। "অসন্দিগ্ধে"র লক্ষণরূপে—"অসন্দিগ্ধমিতি সজাতীয়াবিনাভাবি" বলিয়া অনুমানের সহিত 'অবিনাভাবে'র সম্বন্ধ নির্দেশ দেখা যায়।

ন্যায়বার্ত্তিক—তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র মূলবার্ত্তিকাভিমত সমূহ নয়টি বিভাগই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু মূল গ্রন্থ নির্দিষ্ট পথে "অন্বয়ব্যতিরেকী" অনুমান বিভাগকে ১।১।৫ সূত্রটীকায় সুপ্রতিষ্ঠ করিয়া ১।১।৩৫ সূত্রের 'কেবল ব্যতিরেকী' বিভাগের ও সঙ্কেত করিয়াছেন, বার্ত্তিককারের সৎ' বিভাগ (বাৎসায়ন) ভাষ্য সূত্র—"সদ্বিষয়ং চ প্রত্যক্ষং সদসদ্বিষয়ং চানুমানমিতি ভাষ্যম্" —বিবেচনা প্রসঙ্গে "অনুমানস্য প্রত্যক্ষবৈলক্ষণ্যম্" প্রকরণ রূপে যে মূল্যবান আলোচনা করিয়াছেন তাহা নব্য অন্বীক্ষিকীর (Neo-logic) গুরুত্বপূর্ণ অংশসন্দেহ নাই। তিনিই ১।১।৩ সূত্রে 'শক্তি নিরূপণ' প্রসঙ্গে ব্যাপ্তি লক্ষণ সঙ্কেতিত করিয়াছেন।

মধ্যবর্তী অন্য কোনও গ্রন্থ নাম অজ্ঞাত থাকায় পরবর্তী গ্রন্থকার হিসাবে ও অংশতঃ নিষ্ক্রিয়—অতএব চতুর্থ সম্ভাবনা অর্থাৎ জ্ঞান সক্রিয় ও নহে, নিষ্ক্রিয় ও নহে —এই মত সহজেই বর্জ্জিত হয়।

গৌড়-নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টের গ্রন্থদ্বয় বিষয় আমাদের আলোচনার সহায়ক, হয়ত তিনিই বাচস্পতির পরবর্তী নৈয়ায়িক। এই জরন্নৈয়ায়িকের "ন্যায়মঞ্জরী"তে ১।১।৭ (পৃ—১৪২) এবং ।১।৩৪ (পৃঃ—২য় খণ্ড। ১৩৪ সূত্র) প্রসঙ্গে বাচস্পতির স্থাপিত "অন্বয় ব্যাতিরেকী" —ও আলোচিত "কেবল ব্যাতিরেকী" (পৃঃ—২য় খণ্ড। ১৩৭) স্থাপনার এবং "কেবলান্বয়ী"র উল্লেখ পাওয়া যায়; তৎপূর্বে ১ম সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ৯ম পৃষ্ঠায় এক কারিকা দ্বারা এই শাস্ত্রে সর্বপ্রথম "পরার্থানুমানে'র বীজ স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

ন্যায়াভিধানে অবয়বাঃ পরম্ প্রত্যুপ যোগিণঃ।
পরার্থমনুমানং চ তদাহ ন্যায় বাদিনঃ।

কিন্তু গ্রন্থকার তাঁহার "ন্যায়কলিকা" নামক ন্যায়নিবন্ধ গ্রন্থে উল্লিখিত নয়টি—বিভাগের আলোচনা ত্যাগ করিয়া উল্লিখিত একেবারে "পরার্থনুমান" বিভাগও স্বীকার করিয়াছেন, ইহার কারণ স্বরূপ "বৈশেষিকের" পদার্থ সংগ্রহভাষ্য বা বৌদ্ধাচার্য ধর্ম-কীর্ত্তির "ন্যায়বিন্দু" গ্রন্থের প্রভাব গণ্য হইতে পারে। "ন্যায়কলিকা" গ্রন্থে উদ্যোত করের বিভাগ স্বীকারে "অন্বয়ব্যাতিরেকবান প্রথমঃ। ব্যতিরেকী দ্বিতীয়ঃ। কেবলান্বয়ী-হেতুর্নাস্তেব" উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পাই। এতদ্ব্যতীত বাচস্পতির অতি মূল্যবান সর্বলোকসিদ্ধ নিয়ম অস্বীকার করিয়া নব্য ন্যায়ের বীজস্বরূপ—"অবিনাভাবো-ব্যাপ্তি নিয়ম প্রতিবন্ধঃ সাধ্যাবিনাভাবিত্বামিত্যর্থঃ—(পৃঃ—২) সূত্র মিলে। তবে "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে কার্যকারণ মূলীভূত সমবায়কে "শেষবৎ" ও "পূর্ববৎ" অনুমানের সহিত আলোচনা (পৃঃ—১০৬) করিতে দেখা যায়।

উল্লিখিত তাৎপর্যটীকা-কার মৈথিল সবিশভ গ্রামবাসী বাচস্পতি মিশ্রের পৌত্র 'কেশব মিশ্র' "তর্কভাষা" নামক গ্রন্থে অনুমানের বিভাগরূপে স্বার্থ ও পরার্থ এই দ্বিবিধ মাত্র স্বীকার করিয়াছেন'। জয়ন্ত ভট্টের সূত্র সংশ্রব বর্জ্জিত "ন্যায়কলিকা" নিবন্ধানুরূপ এই গ্রন্থে অনন্তভট্ট পুত্র কেশবই সর্ব্বপ্রধম বৌদ্ধমত সিদ্ধ অনুমান বিভাগদ্বয়ের আলোচনায় বলিয়াছেন—"তচ্চানুমানং দ্বিবিধং স্বার্থং চেতি। স্বার্থং স্বপ্রতিপত্তিহেতুঃ। এতভিন্ন পরার্থানুমানের অবয়বীভূত হেতুলক্ষণ প্রসঙ্গে "কেলান্বয়ী, কেবল ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী" বিভাগত্রয়ের আলোচনা দেখা যায়। কাজেই মিশ্র কেশবের মতে এই ত্রিবিধ বিভাগ মূল অনুমানের বিভাগ না হইয়া পরার্থনুমানের হেত্ববয়বের বিভাগ মাত্র। অর্থাৎ "তর্কভাষা"কার স্বীয় পিতামহ মত অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ ভিন্নমতের কারণ স্বীয় গ্রন্থের উপর তৎপ্রণীত টীকা "তর্কদীপিকা" গ্রন্থ (তঞ্জোর রাজদরবারে রক্ষিত হস্তালিপি হইতে) মুদ্রিত না হওয়া

পর্য্যন্ত জানা যাইবে না। এতদ্ব্যতীত নব্যন্যায়ের সম্পূর্ণ বিকাশের পরে যিনি নব্যন্যায় প্রকরণ স্রষ্টার তনয় হওয়া সত্বেও প্রাচীন সূত্র প্রস্থানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন সেই বর্ধমানোপাধ্যায় রচিত উক্ত গ্রন্থের "তর্কপ্রকাশ" নামা মূল্যবান টীকাও আলোয়ার রাজদরবারের দুর্ভেদ্য গ্রন্থাগার হইতে উদ্ধার করিয়া মুদ্রণ করা আবশ্যক।

অনুমানের প্রকৃত বিভাগরূপে পরিগণিত না হইলেও ন্যায়-বৈশেষিক গ্রন্থরূপে পরবর্তী প্রকরণ "সপ্তপদার্থী"তে কেবলান্বয়ী (কলিকাতা সংস্করণ, সূত্র ১২৮) কেবল ব্যতিরেকী (ঐ—১২৯) ও অন্বয় ব্যতিরেকী (ঐ—১৩০) স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থ ও পরার্থ বিভাগদ্বয় (ঐ—১৩২ সূত্র) স্বীকৃত ও ব্যাখ্যাত দেখিতেছি। বিভাগদ্বয় ব্যাখ্যায়—"স্বার্থত্বমর্থরূপত্বম্। পরার্থত্বম্ শব্দরূপত্বম্" পাইতেছি। এই সূত্রের পরবর্তী অংশে পরার্থ অনুমানেই যে অনুমান প্রমাণে গ্রাহ্য তাহা প্রশস্তপাদের "পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ" ভাষ্যাভিমত এক সিদ্ধান্তে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত অনুমানের পূর্ব্বাচার্য স্বীকৃত বিভাগ পরার্থের সহিত উল্লিখিত স্বার্থ বিভাগ উভয়কে উক্ত সূত্র শেষাংশ আলোচনা দ্বারা অনুমানের বিভাগ বলিয়া স্বীকারের সুবিধা আইসে।

এখন প্রশ্ন এই যে গৌতম সূত্র স্বতন্ত্র এই বিভাগদ্বয়ের স্বরূপ কি? "স্বার্থত্বম্—অর্থরূপত্বম্" সূত্র ব্যাখ্যায় জিনবর্ধন সুরি বলিয়াছেন—"যৎপরবনানপেক্ষমর্থং পদার্থনেবাবলোক্য অনুমিতিজ্ঞানমুৎপদ্যতে তৎস্বার্থম্" এবং "পরার্থত্বম্ শব্দরূপত্বম্" সূত্র ব্যাখ্যায় উক্ত ব্যাখ্যাকারের অনুরূপ উক্তি এই এই যে—"শব্দঃ পরোপদেশঃ বাক্যং তদ্রূপত্বম্ পরার্থত্বম"। গ্রন্থখানির Introduction এ সুযোগ্য সম্পাদকদ্বয় স্বার্থ ও পরার্থ শব্দদ্বয়ের অনুবাদরূপে স্বার্থ for one's self ও পরার্থ—for another বলিলেও জিনবর্ধনের ব্যাখ্যাদ্বয় হইতে স্বার্থ Immediate ও পরার্থ-mediate অনুবাদ সঙ্গত বলিয়া সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। তর্ক সংগ্রহ গ্রন্থের নিজস্বকৃত "তর্কদীপিকা" টীকায় অন্নমভট্ট স্বার্থানুমান তত্ত্ব নির্ণয়ে বলিয়াছেন—সামান্য লক্ষনা প্রত্যাসাত্তি জ্ঞান সম্ভবাৎ (পৃঃ—৩৮) এবং আচার্য Athlye মতে প্রত্যাসাত্তি is a kind of immediate inference। আমাদের এই অনুবাদ যথার্থ কিনা পরবর্তী আলোচনার দ্বারা বিবেচনা করা যাইবে।

যে সকল গ্রন্থের বিষয়বস্তু এই প্রবন্ধের উপযোগী হইতে পারে অথচ মুদ্রনাভাবে তাহারা অপ্রাপ্য তাহাদের বিবেচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া পরবর্তী গ্রন্থকাররূপে সুপ্রসিদ্ধ বল্লভাচার্যের "ন্যায় লীলাবতী" আমরা আলোচনা

করিব। গ্রন্থখানিতে পূর্বালোচিত "সপ্তপদার্থীর" মত ন্যায় বৈশেষিক প্রকরণ বলিয়া কেবল ন্যায়সূত্র নির্দিষ্ট "পূর্ববৎ, শেষবৎ" প্রভৃতি অনুমান বিভাগের আশা না রাখিয়া অন্যান্য বিভাগের আশা করা স্বাভাবিক কিন্তু ইহাতে অনুমান আলোচনা প্রসঙ্গে সেরূপ কিছুই নাই। পরন্তু "ন্যায়" শব্দের ব্যাখ্যারূপে-ন্যায় পরার্থানুমানম্" বলিয়া উক্ত বিষয়ক বিস্তৃত আলোচনা ৫৯৯—৬০৫ পর্যন্ত দেখা যায়। তবে "বৈধর্ম্য পরিচ্ছেদে"র গুণ লক্ষণ প্রকরণে—"অনুমানং স্বার্থং পরার্থং চ। স্বার্থং ব্যাপ্তি পক্ষ ধর্মতা সংবেদনম্ অনুমিতৌপয়িক সমস্তরূপপেত বস্তুবাচকং বাক্যং পরার্থম্ (পৃঃ—৭৭৩—৭৭৪)" উক্তি করিয়া অনুমান বিভাগও তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। গ্রন্থখানির 'প্রকাশ' টীকাকার বর্ধমানোপাধ্যায় মূলের অনুমানের শেষে "ব্যাপ্তি পৃঃ—৪৯৭।৮)" প্রসঙ্গ ব্যাখ্যায় "কেবলান্বয়ী" ও "ব্যাতিরেকী" প্রসঙ্গের সামান্যমাত্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত উপায় কারক ৬০০ পৃষ্ঠার প্রকাশে "স্বস্বার্থ বিশিষ্টজ্ঞানং" বলিয়া ন্যায় পরীক্ষা প্রসঙ্গে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা দ্বারা অনুমান বিভাগ বুঝায় কিনা তাহা বুঝিতে গেলে অন্যান্য উপটীকাকার না হউক অন্ততঃ রঘুনাথের "দীধিতি"র মুদ্রণ হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বাচস্পতির 'তাৎপর্যটীকা'র উপর উদয়নের "পরিশুদ্ধি" রচনার ফলে মূল গৌতমসূত্র আলোচনায় যে উপেক্ষাভাব সৃষ্টি হইয়াছিল এবং উক্ত বর্ধমানোপাধ্যায়ের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত নব্যন্যায় গঠন মূলক যে সকল প্রকরণ গ্রন্থ সৃষ্ট হইতেছিল তাহাদের মধ্যে একমাত্র "মনিকণ্ঠ মিশ্র" প্রণীত "ন্যায়রত্ন" গ্রন্থ আমরা মুদ্রিত অবস্থায় পাইতেছি। এই পুনর্গঠন যুগের অন্যতম মুদ্রিত গ্রন্থ শশধরাচার্যের "ন্যায় সিদ্ধান্তদীপ" এবং ইহা আদৌ ন্যায় গ্রন্থ নহে পরন্তু সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা প্রকরণ, কাযেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অনুপযোগী। মনিকণ্ঠের "ন্যায়রত্ন" সূত্রাত্মক নহে, সম্পূর্ণরূপে বিচার মূলক। প্রত্যক্ষ ও উপমান প্রমাণদ্বয়ের আলোচনা ইহাতে নাই এবং ইহা একেবারে বৈশেষিক সংস্রব শূন্য। কিন্তু সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্যজনক ব্যাপার এই যে, যে অনুমান প্রমাণ আলোচনায় গ্রন্থখানির অধিকাংশ অংশ ব্যবহৃত সেই অনুমানের আলোচ্য কোনও প্রকার বিভাগ লইয়া গ্রন্থকার একেবারে মাথা ঘামান নাই। কেবল গ্রন্থের প্রথমে তর্কপাদ আলোচনায় একবার (পৃঃ—১৭) এবং পরবর্তী ব্যাপ্তিবাদ আলোচনায় দুইবার (পৃঃ—৪৫।৪৬) "কেবলান্বয়িনি" শব্দটীর উল্লেখ পাইতেছি।

খণ্ডনখণ্ডখাদ্য—কার শ্রীহর্ষের পরবর্তী টীকা উপটীকা বর্জিত এই গ্রন্থখানিতে এরূপ নিরাশ হওয়ায় আমরা সত্যই বিমূঢ় সন্দেহ নাই।

এইবার আমরা নব্যন্যায়ের পরিণতির যুগে আসিয়া পড়িয়াছি। গৌতম সূত্র বর্জিত হইলেও নব্যন্যায়ের সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ গঙ্গেশের "তত্ত্বচিন্তামণি"তে আমরা চতুর্বিধ প্রমাণ বিষয়ের আলোচনা পাইতেছি। তবে চারিখণ্ডের মধ্যে 'অনুমান খণ্ডই।যে পরবর্তী যুগে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়া টীকা উপটীকা সমন্বিত বিরাট মহীরুহে পরিণত হইয়াছিল তাহা শাস্ত্রালোচক মাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু মূল অনুমান চিন্তা মণিগ্রন্থে 'পূর্ববৎ, শেষবৎ এবং সামান্যতোদৃষ্ট' বিভাগত্রয়ের আলোচনা নাই; তবে ১৭।১৮।১৯ প্রকরণে যথাক্রমে 'কেবলান্বয়ি, কেবলব্যতিরেকি ও অন্বয়ব্যতিরেকি' বিভাগত্রয় বিবেচিত হইয়াছে। ইহারা যে অনুমানের বিভাগ পরন্তু পরার্থনুমানের অবয়বের বিভাগ নহে, তাহা গণ্য করিয়া 'কেবলান্বয়ি'র প্রথমেই বলা হইয়াছে যে—"তচ্চানুমানং ত্রিবিধং কেবলান্বয়ি 'কেবলব্যতিরেক্যন্বয়ব্যতিরেকিভেদাৎ'। তবে ইহারা যে স্বার্থানুমান বিবেচনা সংশ্লিষ্ট তাহা বলিতে গিয়া অন্বয়ব্যতিরেকির প্রথমে—"তর্হি সংশয় প্রসিদ্ধং সাধ্যং তস্য চ ন ব্যতিরেক নিশ্চায়কত্বমিত্যুক্তত্বাৎ স্বার্থানুমানে তদভাবাচ্চ" এবং শেষে (অর্থাপত্তিরপূর্বে)—"অয়ঞ্চ ব্যতিরেকি প্রকার স্বার্থ এব—পরংপ্রতি সাধ্যা প্রসিদ্ধা প্রতিজ্ঞাদ্যসম্ভবাদিতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্"—উক্তি দ্বারা বুঝা যায়। অনুমান চিন্তামণি কার গঙ্গেশ যে এই প্রমাণের দ্বিবিধ বিভাগ স্বীকার করেন তাহার প্রমাণে উল্লিখিত উদ্ধৃতিদ্বয় ছাড়া ৬র্থ প্রকরণ পূর্ব্বপক্ষ পরিচ্ছেদের শেষে—"স্বার্থানুমানোপযোগি ব্যাপ্তি স্বরূপ নিরূপনং বিনা কথায়াম প্রবেশাদিতি" এবং অবয়ব প্রকরণের প্রথমে—"তচ্চানুমানং পরার্থং ন্যায় সাধ্যমিতি ন্যায়স্তদবয়বাশ্চ" উক্তিদ্বয় দ্বারা সুপরিস্ফুট। "কেবলান্বয়ী" ও কেবল—"অন্বয়ব্যতিরেকি বিশেষদ্বয় সামগ্রীচনাস্ত্বেব" উক্তিদ্বারা ইহারা অস্বীকৃত হইয়াছে। তবে অন্বয়ব্যতিরেকি বিভাগ যে মীমাংসা দর্শনের অন্যতম প্রমাণ "অর্থাপত্তি"র সম্যক বিবেচনার উপযোগী তাহা স্বীকার করিয়া এতৎ সংশ্লিষ্ট প্রকরণরূপে উক্ত প্রমাণ আলোচিত দেখা যায়: অর্থাৎ মণিকার পূর্ব্বপক্ষ প্রকরণ হইতে এই অর্থাপত্তি প্রকরণ পর্যন্ত অংশে অন্তঃশীলারূপে স্বার্থানুমানের আলোচনা চালাইয়া গিয়াছেন।

যদিও আচার্য গঙ্গেশ ব্যাপ্তি ও সামানাধিকরণ্য ভিত্তিতে তাঁহার নিজস্ব পন্থায় অনুমান প্রকরণ ও তদ্বিভাগ আলোচনা করিয়াছেন তথাপি ন্যায়সূত্র এবং বৌদ্ধন্যায় স্বতন্ত্র এই ত্রিবিধ বিভাগের গুরুত্ব পরীক্ষা জন্য "ন্যায় ভাস্কর" প্রভৃতি গ্রন্থের অভাবে

কেশব মিশ্র প্রণীত "তর্কভাষা"র অনুমান বিভাগ প্রকরণের সহিত তুলনামূলক বিবেচনা আবশ্যক। হয়তো গঙ্গেশ পুত্র বর্ধমানের "অন্বীক্ষানয়তত্ত্ববোধ" গ্রন্থমুদ্রিত অবস্থায় হাতে পাইলে আমাদের আরও সুবিধা হইত কিন্তু উক্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি, স্বর্গত গঙ্গানাথ ঝা সংগ্রহীত দুইখানি এবং বিশ্বভারতী সংগ্রহীত একখানি মিলাইয়া প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বর্তমান পন্থা ছাড়া উপায় নাই। জয়ন্ত ভট্টের "ন্যায়কলিকা" নিবন্ধেই আমরা দেখিয়াছি যে পরার্থানুমান (পঞ্চরাত্রি) অবয়ব ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং ইহা স্বার্থানুমান নিরপেক্ষ নিজস্ব ধারা চালিত। চিন্তামণি গ্রন্থেও আমরা সেই নীতি স্বীকৃত দেখিতেছি কিন্তু "তর্কভাষা" ইহা অস্বীকার করিয়া স্বার্থানুমানকে কোনও ভিত্তিতে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া পরার্থানুমানের অবয়ব বিবেচনায় উক্ত ত্রিবিধ বিভাগের প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের মূল্যবান টীকাদ্বয় উদ্ধার করিয়া তৎসাহায্যে এই প্রয়োগের কারণ নির্ধারণ আমাদের বিষয়বস্তুর সম্যক আলোচনার জন্য আবশ্যক। কারণ ইহার ফলে গঙ্গেশও বর্ধমানোপাধ্যায় এই পিতা পুত্রদ্বয়ের ন্যায় ধারণার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যের কারণ ধরা পড়িবে।

আমরা আচার্য গঙ্গেশের পরবর্তী প্রায় সকল ন্যায় রচয়িতাকে গৌতম সূত্রসিদ্ধ বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত স্বার্থ ও পরার্থ বিভাগ স্বীকার করিতে দেখিতেছি। কাযেই কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই ত্রিবিধ পদার্থকে অনুমানের বিভাগরূপে স্বীকারের কোনও সার্থকতা নাই; তবে অবয়বের পরিবর্তে ন্যায় পরীক্ষার ব্যবহার চলিতে পারে এবং অনুমান চিন্তামণি মতানুযায়ী অন্বয়ী ব্যতিরেকী সিদ্ধ অর্থাপত্তিকে পরার্থের অনুক্রমরূপে স্বীকারের আবশ্যকতা আছে; তর্কভাষা—কার প্রভৃতি মতে অর্থাপত্তির ভিত্তিমূলক অন্বয়ব্যতিরেকীকে পরার্থানুমান প্রসঙ্গেই আলোচিত দেখা যায়।

এখন বিবেচ্য এই যে স্বার্থানুমানের বিস্তৃত বিবেচন উদ্দেশ্যে কি সূত্র নির্দিষ্ট করা যায়। আচার্য গঙ্গেশের "স্বার্থানুমানোপযোগী ব্যাপ্তি স্বরূপ নিরূপনং বিনা কথায়ামপ্রবেশাদিতি"—সূত্র হইতে "কথা" এই সুনির্দিষ্ট সূত্রকে আমাদের এই বিবেচনোদ্দশ্যে পাইতেছি। ন্যায় বার্তিক তাৎপর্য টীকায় ১।২।১ সূত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—তথাচ প্রবক্তৃক বিচার বিষয় বাক্য সন্দৃব্ধিঃ কথেচি (চৌখাম্বা সংস্করণ; পৃঃ—৩:৩)। আচার্য মণিকণ্ঠের ন্যায়রত্ন মতে—"পারিভাষিকাভিধান মানহেত্বা ভাসাদি নিরাকর্তব্যতা জ্ঞান জন্যং বাক্যং কথা (পৃঃ—১৪৬)"; এই কথার উপযোগীতা সম্বন্ধে উক্ত ন্যায়রত্নকারের অন্যতম উক্তি

এই যে—"তত্ত্ববুভুৎ সুকথায়ামুপেক্ষনীয়াস্থানুদ্ভাব্যত্বাৎ প্রথমবাদো নোদ্ভাবয়তি (পৃঃ—১৪৫)" অর্থাৎ কথাদ্বারা স্বার্থানুমানে উদ্ভাবন (conversion) ক্রিয়া সম্পাদন হইতে পারে। জগৎগুরু জয়রাম ন্যায় পঞ্চানন "ন্যায় সিদ্ধান্তমালা" গ্রন্থে এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন "ন্যায়সূত্রবৃত্তি" গ্রন্থে এই উপযোগিতা সমর্থন করিয়াছেন। উদ্ভাবন ব্যতীত আরও দুইটী উপযোগীতার উল্লেখ অনুমান চিন্তামণির উল্লিখিত "অন্বয়ব্যতিরেকী" প্রকরণে এবং অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটির প্রথমটি উত্থাপনকে obversion রূপে এবং অন্যটী উপস্থাপনকে Inversion রূপে স্বার্থানুমানের গ্রাহক বলিয়া স্বীকার করার আবশ্যকতা আছে।

পরার্থানুমানের অবয়ব সংখ্যা পঞ্চবিধ বলিয়া সাধারণতঃ গ্রাহ্য করা হইয়া থাকে; কিন্তু তদ্ভিন্নরূপও যে স্বীকৃত ছিল তাহার উল্লেখ "ন্যায়রত্ন" গ্রন্থের—"প্রতিজ্ঞা হেতূদাহরণ রূপমবয়বত্রয়মিত্যন্যে (পৃঃ—১৩৫)" উক্তি হইতে পাইতেছি। কাযেই বর্ত্তমান পরার্থনুমানকে ত্র্যবয়বীরূপে সহজেই স্বীকার করা যায় এবং বর্ধমানের 'কিরনাবলীপ্রকাশ' টীকামতে ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত কথাগুলির গুণ ও ব্যাপকতার বিভিন্নতানুযায়ী ইহার অঙ্গ নির্ণীত করা যাইতে পারে। উক্ত টীকামতে—"মূর্তিবৃত্তি-তাবচ্ছেদক গুণত্বব্যাপ্যজাতিমন্ত ইত্যর্থঃ (পৃঃ—১৭)" এবং এই সূত্র হইতে অঙ্গ সমূহকে মূর্তি (Moods) বলা যাইবে। সূত্রটী হইতে আরও পাওয়া যায় যে মূর্তত্ব শব্দটীকে তিন অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে; যথা—(১) সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক অর্থে লইলে একটি ন্যায়ের তিনটি কথারই গুণ এবং ব্যাপকতা দ্বারা তাহার যে আকার নির্ণীত হয় তাহাই তাহার মূর্তি (২) তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যাপক অর্থে লইলে একটি ন্যায়ের হেতুবাক্য দুইটির গুণও ব্যাপকতার দ্বারা যে আকার নির্ণীত হয় তাহাই মূর্তি এবং (৩) সঙ্কীর্ণ অর্থে লইলে যে কথা সমষ্টিকে ন্যায়াকারে ধরিয়া একটি বৈধসিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তাহাই মূর্তি। এইখানে বলা প্রয়োজন যে আচার্য গঙ্গেশ তাঁহার অন্বয়ব্যতিরেকী প্রকরণে সংশয় কারণক অর্থাপত্তি (উত্তরপক্ষ) বিচারে সামান্যতোদৃষ্ট বিভাগের সাহায্য লইয়াছেন।

সকল ন্যায়ের বৈধতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য "ন্যায়লীলাবতী" গ্রন্থে 'পরার্থানুমান' প্রসঙ্গে একটী সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায় এবং তাহাকে মৈথিল সূত্র (Dictum-de-omni-nullo) বলা যায়; লীলাবতীর সূত্রটী এই যে—"অতএব হেতুপদমপি সাধ্যস্বরূপ মাত্রবৎ (পৃঃ—৬০৩)" এবং ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

বর্ধমানোপাধ্যায় ও ভগীরথ ঠক্কুরের যে টীকা পাওয়া যায় তাহা যথাক্রমে Whately ও Mill এর উক্ত Aristetle's dictum ব্যাখ্যানুরূপ।

স্বার্থ ও পরার্থানুমান বিভাগ গৌতম সূত্র স্বতন্ত্র হইলেও বিভিন্ন ন্যায় প্রকরণ প্রমাণে স্বীকৃত বলিয়া উল্লিখিত ১।১।৫ সূত্রের "অথতৎ (স্বার্থং তৎপরং পরার্থম্)" অংশ ব্যাখ্যারূপে সহজেই গ্রহণীয়; কিন্তু অবশিষ্ট সূত্রানুযায়ী বিভাগ ত্রয়ও যে এই শাস্ত্রের পুনর্জাগরনে সহায়ক হইতে পারে তাহা প্রবন্ধান্তরে বলা যাইবে। মোট কথা প্রাচীন ও নব্য উভয় ন্যায় প্রস্থান স্বীকার করিয়া নব্য আন্বীক্ষিকীর বিকাশ হইতে পারে।

॥ জগতে অমঙ্গল কেন ? ॥

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কার্ত্তিকের "দর্শন" পত্রিকায় শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় "মঙ্গলময় ও অমঙ্গল" নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন যে জগতে যদি এক মঙ্গলময় ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর থাকেন তাহা হইলে জগতে অমঙ্গল কেন হয়। পাশ্চাত্য দর্শনে যে ইহার সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে হিন্দু দর্শনেও এ সমস্যার সমাধান নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

শঙ্কর-বেদান্তে অর্থাৎ অদ্বৈতবাদে বলা হইয়াছে যে পারমার্থিক দৃষ্টিতে "ব্রহ্ম সত্য ও জগত মিথ্যা"; জগৎ যখন মিথ্যা তখন মঙ্গলও নাই, অমঙ্গলও নাই। কিন্তু যতক্ষণ ব্রহ্ম-উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহাও বলা হইয়াছে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগতের অমঙ্গলের সহিত মঙ্গলময় ঈশ্বরের কি ভাবে সমাধান করা হইয়াছে তাহা দেখা যাউক। অমঙ্গল প্রধানতঃ দুইপ্রকার, দুঃখ এবং পাপ। দুঃখ সম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনে বলা হইয়াছে যে প্রত্যেক ব্যক্তির দুঃখ, তাহার ইহজন্মে বা পূর্বজন্মে কৃত কাজের ফল।

বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়াত। ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৪

একব্যক্তি দুঃখী অন্যব্যক্তি (অপেক্ষাকৃত) সুখী, এজন্য যদি কেহ বলেন যে ঈশ্বরের বৈষম্য আছে, এবং লোকে দুঃখভোগ করে এজন্য যদি কেহ বলেন যে ঈশ্বর নিষ্ঠুর (ঈশ্বর মঙ্গলাময় নহেন), তাহার উত্তর এই যে "সাপেক্ষত্বাৎ"; ঈশ্বর যে কাহাকেও সুখ দেন, কাহাকেও দুঃখ দেন, তাহার কারণ এই যে পূর্বকৃত পুণ্য ও পাপ অনুসারে ঈশ্বর জীবকে সুখ ও দুঃখ দেন, পূর্বকৃত কর্মের মধ্যে ইহজন্মের কর্মও আছে পূর্বজন্মের কর্মও আছে। যদি বলা যায় যে যখন জগৎ সৃষ্টি হয় তখন যে সকল প্রাণী সৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যেও সুখ ও দুঃখ থাকে, সৃষ্টিরপূর্ব্বে তাহারা কি কর্ম্ম করিতে পারে যাহার জন্য তাহারা সুখ-দুঃখ ভোগ করে, তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্বে যে প্রলয় ছিল, তাহার পূর্বেও সৃষ্টি ছিল, এই সকল জীব পূর্বের সৃষ্টিতেও ছিল, তখন তাহারা যে সকল পাপ-পুণ্য করিয়া পূর্বের সৃষ্টিতে ফল ভোগ করে নাই, বর্ত্তমান সৃষ্টিতে সেই সকল কর্ম্মের ফলে সুখ-দুঃখ ভোগ করে।

প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্বে একটা সৃষ্টি ছিল, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় অনাদিকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই কথা ব্যাসদেব সূত্রাকারে বলিয়াছেন,

ন, কর্মাবিভাগাৎ, ইতি চেৎ, অনাদিত্বাৎ (ব্রহ্ম-সূত্র ২।১।৩৫)

ন (ঈশ্বর যে জীবকে তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ প্রদান করেন তাহা হইতে পারে না)।

কর্মাবিভাগাৎ (প্রলয়ের সময় কর্মের বিভাগ থাকে না বলিয়া), ইতি চেৎ (যদি এইরূপ আপত্তি করা যায়, তাহার উত্তর এই যে) অনাদিত্বাৎ (সৃষ্টি অনাদি, প্রত্যেক সৃষ্টির পূর্বে একটি সৃষ্টি ছিল)। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে শঙ্কর ঋগ্বেদ হইতে এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতাযথা পূর্বমকল্পয়াৎ" অর্থাৎ বিধাতা পূর্বের সৃষ্টি অনুসারে বর্ত্তমান সৃষ্টিতে সূর্য্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা-বন্দনার সময় আমাদিগকে এই মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। বোধ হয় উদ্দেশ্য এই যে আমরা চিন্তা করিব যে বর্ত্তমান জন্মের পূর্ব্বে আমরা কোটি কোটিবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সকল জন্মে আমাদের যে সকল আত্মীয়স্বজন ছিলেন তাঁহারা এখন কোথায়, সেই সকল জন্মে আমরা যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া উৎফুল্ল বা ম্রিয়মান হইয়াছিলাম এখন তাহার ক্ষীণ স্মৃতিও নাই, সেইরূপ বর্ত্তমান জন্মেও আমাদের যে সকল আত্মীয়স্বজন আছেন তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্পর্ক অতি অল্প সময়ের জন্য। মৃত্যুর পরে কে কোথায় যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই। বর্ত্তমান জন্মে আমরা যে সকল সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহারাও কিছু কাল পরে থাকিবে না, তাহাদের স্মৃতিও থাকিবে না, সুতরাং বর্ত্তমান জন্মের আত্মীয়স্বজনের জন্য বেশী চিন্তা করা উচিত নয়; বর্ত্তমান জন্মের সুখ দুঃখে বিচলিত হওয়া উচিত নয়; চিত্ত স্থির করিয়া সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তাই করা উচিত, যাহাতে মৃত্যুর পর ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারি, আর এই দুঃখময় সংসারে আসিতে না হয়।

কেহ পাপ কর্ম করিলে দুঃখ পাইবে, ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্বভাব হইলে এরূপ ব্যবস্থা হইত না, ইহাই শঙ্করীপ্রসাদবাবুর অভিমত বলিয়া বোধহয়; এজন্য তিনি বলিয়াছেন। "ঈশ্বরের কর্মফলকে বিনষ্ট করিবার শক্তি নাই।" বোধহয় তিনি মনে করেন যে ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় হইতেন এবং তিনি যদি সর্বশক্তিমান হইতেন তাহা হইলে জীব যে সকল পাপ আচরণ করিত ঈশ্বর তাহাদের কর্মফল বিনষ্ট করিয়া দিতেন; তাহা হইলে জীবকে দুঃখ ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু তাহা হইলে জগতে পাপের স্রোত বাড়িয়া যাইত, তাহা কখনও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এজন্য আমাদের মনে হয় যে কর্মফল

নষ্ট করিবার শক্তি ঈশ্বরের আছে, কিন্তু সাধারণতঃ তিনি কর্মফল নষ্ট করেন না, কারণ তিনি মনে করেন যে কর্মফল নষ্ট করা উচিত নয় ; লোকে পাপ করিলে পাপের ফল দুঃখ ভোগ করা উচিত। তাহা হইলে পাপ করিবার প্রবৃত্তি কমিয়া যাইবে, এই ভাবে তাহার মঙ্গল হইবে। মনে হয় যে ব্যাস বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষি এবং শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি আচার্য্যগণও মনে করিতেন যে পাপ করিলে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ন্যায্য ব্যবস্থা, ইহা ঈশ্বরের মঙ্গলময় স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্যহীন নহে। Dr Annie Besant এর কন্যা রুগ্ন হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিছুকাল রোগ ভোগ করিয়া মারা গিয়াছিল, খৃষ্টান ধর্মে ইহার যুক্তি সঙ্গত হেতু না পাইয়া তিনি খুব অশান্ত হইয়া ছিলেন। পরে হিন্দুধর্ম গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে ঐ বালিকা পূর্বজন্মে পাপ করিয়াছিল বলিয়া ইহজন্মে দুঃখ পাইল। এই চিন্তা তাঁহার অশান্ত চিত্তকে স্থির করিয়া ছিল। তিনি এরূপ ভাবেন নাই "ঈশ্বর কেন তাহার কর্মফল নষ্ট করিয়া তাহাকে সুখী করিলেন না?" Max Muller এরও এই ব্যবস্থা সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইয়া ছিল। তিনি লিখিয়াছেন "Why was one child born blind or brought up in a society where its moral nature must suffer shipwreck ? Why are the bad so often triumphant and the innocent trampled under foot ?" এইরূপ আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার পর বলিয়াছেন যে পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত কোনও ধর্ম বা দার্শনিক মত ইহার সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে নাই। বেদান্ত মতে ইহা পূর্বজন্মের কর্মফল। "But whatever we may think of the premises on which this theory rests its influence on human character has been marvellous. পূর্বজন্মে কি কার্য করিয়াছি তাহা মনে নাই, অথচ ইহজন্মে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে—Max Muller বলিয়াছেন, "But why should we remember our former life if we do not even remember the first two, three or four years of our present life ?" তিনি মনে করেন যে Wordsworth এর এই কবিতাতে পূর্ব-জন্মকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং আজকাল সাধারণতঃ সকলেই ইহা বিশ্বাস করেন যে আমরা পূর্বেও জন্মিয়াছিলাম।

The soul that rises with us, our life's star,
Has had elsewhere its setting
And comth from afar.
(The Vadanta Phulosophy, Chapter III)

শঙ্করীপ্রসাদ বাবু গীতার নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন "ইহা বৃথা স্তোকবাক্য বলিয়া মনে হয়:

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহংত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

গীতোক্ত ভগবানের বাক্যকে স্তোক বাক্য বলিবার সাহস প্রাচীন আচার্য্যদের ছিল না। শঙ্করীবাবু কি ইহা দেখিয়াছেন যে কোনও ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াও পাপ হইতে মুক্ত হন নাই? বলা বাহুল্য এইরূপ সম্পূর্ণরূপে ভগবানে আত্মসমর্পণ করা অতি দুরূহ। বর্ত্তমান যুগে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী ভাস্করানন্দ, তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনেই এই ভাবে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ দেখাযায়, এবং তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে বোধহয় কাহারও কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না।

এপর্য্যন্ত আমরা অমঙ্গলের একটা দিক আলোচনা করিলাম, জগতে কেন দুঃখ আছে। অতঃপর অমঙ্গলের আর একটা দিক আলোচনা করা যাইবে, লোকে পাপ করে কেন। ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হন তাহা হইলে তিনি কাহাকেও পাপ করিতে দিতেন না। এ বিষয়ে বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে যাহার যেরূপ চেষ্টা ঈশ্বর তাহাকে তদনুরূপ কর্ম করিতে প্রবৃত্তি দেন, যাহার উত্তম কর্ম করিবার চেষ্টা থাকে ঈশ্বর তাহাকে উত্তম কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন, সে উত্তম কার্য করিয়া তাহার ফলে সুখ ভোগ করে। যাহার মন্দ কর্ম করিবার চেষ্টা থাকে ঈশ্বর তাহাকে মন্দ কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দেন, সে মন্দকর্ম করিয়া তাহার ফলে দুঃখ ভোগ করে। যে পূর্বে ভাল কাজ ভাল চিন্তা করিয়াছে, সে ভাল কাজ করিতে চেষ্টা করে। যে পূর্বে মন্দ কাজ করিয়াছে সে মন্দ কাজ করিতে চেষ্টা করে। ঈশ্বর তদনুসারে ভাল বা মন্দ কাজ করিতে প্রবৃত্তি দেন। অনাদিকাল হইতে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয় নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত করা যায়:

কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্বাৎ (২।২।৩৩)

জীবই কর্ত্তা, জীব যদি কর্ত্তা না হইত তাহা হইলে শাস্ত্র যে বলিয়াছেন এই সকল কার্য্য করিবে, এই সকল কার্য্য করিবে না, শাস্ত্রের সেই সকল বাক্য নিরর্থক হইত। যাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই তাহাকে আদেশ দিয়া লাভ কি?

পরাৎ তু তচ্ছ্রুতেঃ (২।৩।৪১)

জীব পর অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে কর্তৃত্ব লাভ করে, কারণ এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। কৌষিতকী উপনিষদ (৩।৮) বলিয়াছেন,

এষ হি এব সাধুকর্ম কারয়তি তং যম্ এভ্যো।
লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ হি এব অসাধু
কর্ম কারয়তি তং যমএভ্যো লোকেভ্যঃ অধোনিনীষতে।

"ইনিই অর্থাৎ ঈশ্বর তাহাকে সাধুকর্ম করান, যাহাকে এই লোক হইতে ঊর্ধ্বে লইতে ইচ্ছা করেন, ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম করান যাহাকে এই লোক হইতে নিম্নে লইতে ইচ্ছা করেন।

কৃৎস্নপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধ অবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ (২।৩।৪২)

জীবের সমস্ত পূর্বকৃত প্রযত্ন দেখিয়াই ঈশ্বর জীবকে বিশিষ্ট কর্ম বিষয়ে কর্তৃত্ব প্রদান করেন। তাহা না হইলে শাস্ত্রের বিধান ও নিষেধ সমূহ ব্যর্থ হইত।

সুতরাং বেদান্তের মতে জীবই কর্তা, কিন্তু ঈশ্বর জীবকে জীবের পূর্বকর্ম অনুসারে কর্তৃত্ব প্রদান করেন, যাহার চিন্তা ভাল, চেষ্টা ভাল সে ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি পায় সে ভাল কাজের কর্তা হয়। যাহার চিন্তা মন্দ চেষ্টা মন্দ সে মন্দ কাজ করিবার প্রবৃত্তি পায়, সে মন্দকাজ করে। এইভাবে পূর্বের চেষ্টা অনুসারে ভাল বা মন্দ কর্মের কর্তা হয়। এই যুক্তিও সংসারের অনাদিত্বের উপর নির্ভর করে। পূর্বকৃত কর্মের দুইটি ফল, এক সুখ দুঃখ ভোগ, আর এক শুভ বা অশুভ প্রবৃত্তি লাভ। ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হইয়াও, জীবের পূর্বকৃতকর্ম অনুসারে কাহাকেও ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি দেন, কাহাকেও মন্দকাজ করিবার প্রবৃত্তি দেন, কাহাকেও সুখ দেন কাহাকেও দুঃখ দেন। ঈশ্বর যে ভাল-মন্দ কর্ম করিবার প্রবৃত্তি দিতেছেন আমরা তাহা দেখিতে পাই না। আমরা মনে করি যে জীব স্বাধীন কর্তা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব ঈশ্বরের অধীন কর্তা।

পূর্বে যে সকল যুক্তির দ্বারা দেখান হইল যে ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও জগতে সুখ দুঃখ এবং পাপ পুণ্য সঙ্গত হয় সেই সকল যুক্তি, বৈশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতবাদেও প্রয়োগ করা যায়। ব্রহ্মসূত্রের পূর্বোদ্ধৃত সূত্রগুলি সকল সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন এবং একভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এজন্য মনে হয় যে ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও কিরূপে জগতে সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য থাকিতে পারে, তাহার যুক্তি সঙ্গত কারণ পাশ্চাত্য দর্শনে নাই; কিন্তু বেদান্ত দর্শনে পুনর্জন্ম বাদ এবং জগতের অনাদিত্ববাদের দ্বারা এবিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

ইহা সত্য যে জগৎ অনাদি এই কল্পনা আমাদের পক্ষে করা দুরূহ। তাহার কারণ আমাদের মনের শক্তি ক্ষুদ্র। অপর পক্ষে ঈশ্বর একবারই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পূর্বে অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহার সৃষ্টি করিবার কখনও ইচ্ছা হয় নাই, এরূপ মতও সন্তোষজনক নহে।

পুস্তক পরিচয়

ভারতীয় দর্শনের মর্মকথা—শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ. প্রণীত। নির্মল সাহিত্য প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৸৵ +২৩২ ; মূল্য—ছয় টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাণী নিকেতন—২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ এবং বি, সরকার এণ্ড কোং—১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

এই পুস্তকখানি পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বি, এ, পরীক্ষার্থী দর্শনের ছাত্রদের জন্য লিখিত। বর্ত্তমানে ত্রৈবার্ষিক বি, এ, পাস্ পরীক্ষার্থীদিগকে বৌদ্ধ, ন্যায় ও বৈশেষিক এই তিনটি দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি অধ্যয়ন করিতে হয় এবং ইহা ছাড়া সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি বিষয় জানিতে হয়। অনার্স পরীক্ষার্থী-দিগকে চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত (অদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত)—এই দর্শনগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিতে হয়। পুরাতন ব্যবস্থার বি, এ, পরীক্ষার্থীদিগকেও ভারতীয় দর্শনের এই সকল শাখার সংক্ষিপ্তসার পাঠ করিতে হয় এবং বিশেষভাবে ন্যায় বৈশেষিক ও বেদান্ত পাঠ করিতে হয়। এই পুস্তক-খানি উভয় শ্রেণীর ছাত্রদেরই উপযোগী হইয়াছে। ইহার ভূমিকায় সাধারণভাবে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনসমূহের শ্রেণী বিভাগ, ভারতীয় দর্শনে বিচারের স্থান, ভারতীয় দর্শনে দুঃখবাদ, ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি ও ভারতীয় দর্শনসমূহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। তাহার পর একাদশটি অধ্যায়ে বেদোপনিষদের দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ, ও ছয়টি আস্তিক দর্শনের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বি, এ, পরীক্ষার্থীদের জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ই এই পুস্তকে আছে এবং তাহারা ইহা পড়িয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবে বলিয়া মনে হয়। পুস্তকের ভাষা মোটের উপর প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য। যাঁহারা কেবলমাত্র বাঙ্গলা জানেন এবং ভারতীয় দর্শনের তত্ত্বগুলির সহিত পরিচিত হইতে চাহেন তাঁহারাও এই পুস্তক পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে পুস্তকখানিতে বহু ছাপার ভুল রহিয়া গিয়াছে। যেগুলি শুদ্ধিপত্রে সংশোধিত হইয়াছে সেগুলি ছাড়াও বিস্তর ছাপার ভুল আছে। এগুলি সংশোধন করা উচিত। পৃঃ ১২২ "যখন আমাদের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ....

ইত্যাদি—এই অনুচ্ছেদটিতে লেখকের বক্তব্যটি ঠিক পরিস্ফুট হয় নাই। ইহাকে সংশোধন করিয়া লেখা আবশ্যক।

যে সকল মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে শ্লোক বা বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেগুলি উল্লেখ করিলে বুদ্ধিমান ও অনুসন্ধিৎসু ছাত্রগণের উপকার হইত।

আমরা এই পুস্তকখানির বহুলপ্রচার কামনা করি এবং আশা করি যে লেখক ইহার পরবর্তী সংস্করণে এই ত্রুটি দূর করিবার চেষ্টা করিবেন।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের ষট্‌ত্রিংশৎ অধিবেশন

"বিশ্বভারতী" বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণক্রমে, গতবৎসর অক্টোবর মাসে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের ষট্‌ত্রিংশত্তম অধিবেশন শান্তিনিকেতনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশন রবীন্দ্রশতবার্ষিকীর অঙ্গ হিসাবে ২৯শে, ৩০শে, ৩১শে অক্টোবর এবং ১লা নভেম্বর, ১৯৬১, অনুষ্ঠিত হয়। এইবারকার অধিবেশনে সভাপতির কার্য করিবার জন্য আমন্ত্রিত অন্ততঃ তিনজন অধ্যাপক শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ষট্‌ত্রিংশত্তম দর্শন মহাসভার মূল সভাপতি, বারানসী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী টি. আর. ভি. মূর্তি উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্থলে শ্রীহুমায়ুন কবীর কাজ চালাইয়া গিয়াছেন। "নীতিবিদ্যা ও সমাজবিদ্যা" শাখার মনোনীত সভাপতি, মহীশূরের মহারাজাও আসিতে পারেন নাই। তাঁহার স্থলে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅনিরুদ্ধ ঝা মহাশয় কাজ করিয়াছেন। "দর্শনের ইতিহাস" শাখার সভাপতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও পীড়িত ছিলেন বলিয়া উপস্থিত হন নাই। ঐ শাখার সমুদায় প্রবন্ধাবলী অন্যান্য শাখায় বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। মনোনীত সভাপতিদের মধ্যে কেবলমাত্র, "তত্ত্ববিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যা" শাখার সভাপতি অধ্যাপক জে. এন. মহান্তি এবং "মনোবিজ্ঞান" শাখার সভাপতি অধ্যাপক শ্রীওয়াই. মাসিহ্ (Y. Masih) উপস্থিত ছিলেন। সর্বশুদ্ধ প্রায় দেড়শতাধিক ডেলিগেট্ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন।

ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বৎসর "বুদ্ধ জয়ন্তী বক্তৃতা" দেন চীনাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীতান্‌-য়ুন-সান্‌। তিনি চীনদেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বেদান্তদর্শনের উপর "শ্রীমন্ত প্রতাপ শেঠ ভাষণ" দেন বোম্বাই এল্‌ফিনষ্টোন্‌ কলেজের অধ্যাপক শ্রী জে. এন্‌. চাব্‌। উপরন্তু এই অধিবেশনে দুইটি— আলোচনা-চক্র (সিম্‌পোসিয়া) অনুষ্ঠিত হয় ; একটির বিষয় ছিল,—"দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ" ও অপরটির বিষয় ছিল, "রাষ্ট্রব্যবস্থা দর্শন—ভিত্তিক হইবে কি না ?" খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বহু মৌলিক প্রবন্ধাদি বিভিন্ন শাখা সভাতে পঠিত ও আলোচিত হয়।

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ ও শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শান্তি-নিকেতনের আবাসিকবৃন্দ গীতিআলেখ্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের দর্শন এবং "চিত্রাঙ্গদা" নৃত্যনাট্য পরিবেশন করিয়া সমাগত সভ্যবৃন্দের পরিতোষ সম্পাদন করেন। দুইদিন বৃষ্টি হওয়াতে অভ্যর্থনা সমিতির সাদস্যবৃন্দের কিছু অসুবিধা হয়। বিশ্বভারতীর দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ডেলিগেট্‌দের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশন বর্ত্তমান বৎসরের বড়দিনের ছুটিতে চণ্ডীগড়ে (পাঞ্জাব) অনুষ্ঠিত হইবে।

শ্রীশিবপদ চক্রবর্ত্তী

অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য লেক্‌চারসিপ্‌ ফণ্ড

প্রসিদ্ধ দার্শনিক মহামনীষী অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামের সহিত বাঙ্গলা-দেশের দর্শানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পরিচয় আছে। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি বিভিন্ন কলেজে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন এবং একসময়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্জ্জ দি ফিফ্‌ত অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার অতুলনীয় মৌলিক চিন্তায় সমৃদ্ধ প্রবন্ধ ও গ্রন্থসমূহ দর্শন-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁহার বিদ্যা ও দর্শন-সাধনার খ্যাতি ভারতবর্ষের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই আদর্শ শিক্ষক ও জ্ঞানতপস্বীর সহিত যাঁহারাই সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় অভিভূত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই।

তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। সুখের বিষয় এই যে সম্প্রতি শ্রীহুমায়ুন কবীর, অধ্যাপক ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, অধ্যাপক টি, এম্, পি মহাদেবন, অধ্যাপক টি, আর, ভি, মূর্তি, অধ্যাপক জে, এন্, চাব্, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক ও শিক্ষাব্রতী এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের দ্বারা তাঁহার দর্শনসম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ধনভাণ্ডার (অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লেক্‌চারসিপ ফণ্ড) গঠন করা হইতেছে। অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্রের গুণানুরাগী ব্যক্তিমাত্রকেই (বিশেষভাবে তাঁহার প্রাক্তন ছাত্রদিগকে) এই ভাণ্ডারে সাহায্য করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। দেয় অর্থ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চটোপাধ্যায় এম্-এ, পি-এচ-ডির নিকট ৫৯ বি হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। যিনি চেক্ দিতে চাহেন তাঁহাকে "The Honorary Treasurer, K. C. Bhattacharya Lectureship Fund" —এই নামে চেক্ লিখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বঙ্গীয় দর্শন-পরিষদের মূল নিয়মাবলী

(সংশোধিত)

নাম—

১। এই পরিষদ্‌টি "বঙ্গীয় দর্শন-পরিষদ্‌" নামে অভিহিত হইবে।

উদ্দেশ্য—

২। বাঙ্‌লা ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের বিচারমূলক আলোচনা, তদ্বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ এবং এতদনুরূপ উপায়ে বাঙ্‌লা ভাষায় দার্শনিক চিন্তায় প্রসার এই পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সভ্য—

৩। এই পরিষদে সাধারণ ও ছাত্র এই দুই প্রকার সভ্য গৃহীত হইবে।

৪। সাধারণ ও ছাত্র সভ্যের বাৎসরিক চাঁদার হার যথাক্রমে ৫৲ (পাঁচ টাকা) এবং ২৲ (দুই টাকা)। ইহারা পরিষদের মুখপত্র বিনামূল্যে এবং পরিষদ্‌ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি কম মূল্যে পাইবে।

৫। সাধারণ সভ্যদের পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য ও সভাপতি ইত্যাদি নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত হইবার এবং ভোট দিবার অধিকার থাকিবে।

৬। সকল প্রকার সভ্যেরই প্রথম সভ্য হইবার সময়ে পরিষদের আবেদনপত্র স্বহস্তে যথাযথভাবে পূর্ণ করিয়া সম্পাদকের নিকট দিতে হইবে।

৭। ১লা বৈশাখ হইতে পরিষদের বৎসর গণনা করা হইবে। পরিষদের সভ্যপদ ছাড়িয়া দিতে চাহিলে বৎসর আরম্ভ হইবার অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে পরিষদ্‌-সম্পাদককে লিখিয়া জানাইতে হইবে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি—

৮। পরিষদের কার্য্যাবলী ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সদস্যগণ প্রতি বৎসর পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভ্যগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

৯। বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির কোন সদস্যপদ শূন্য হইলে উক্ত সমিতিই নূতন সদস্য নির্ব্বাচন করিবেন।

১০। এই সমিতিতে সভাপতি, পরিষদ্-সম্পাদক, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও সহ-সম্পাদক পদবলে সদস্য থাকিবেন। ইঁহারা প্রত্যেকেই এবং অন্যান্য সদস্য প্রতিবৎসর পরিষদের সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইবেন। এই সমিতি হইতেই ইহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। এই সমিতিই পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত করিবে।

১১। এই সমিতির অধিবেশনে চারিজন সদস্য উপস্থিত থাকিলেই সভার কার্য্য চলিতে পারিবে।

১২। প্রয়োজন অনুসারে এই সমিতির অতিরিক্ত সদস্য-নির্ব্বাচনের অধিকার থাকিবে।

অধিবেশন ও সভা—

১৩। প্রতিবৎসর নিয়মিতভাবে কলিকাতায় ও ইহার সহরতলীতে বিভিন্নস্থানে পরিষদের অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনসমূহে বাঙ্‌লাভাষায় দার্শনিক প্রবন্ধাদি পাঠ ও তাহার আলোচনা এবং দর্শন-সম্বন্ধীয় বক্তৃতাদি হইবে।

১৪। এতদ্ব্যতীত বৎসরের প্রথমে পরিষদের সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশন হইবে। এই বাৎসরিক অধিবেশনে একাধিক সভার অনুষ্ঠান হইবে। এই সকল সভায় সভ্যগণ-কর্ত্তৃক দার্শনিক বিচার (Symposium), প্রবন্ধ-পাঠ ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা প্রভৃতি হইবে।

১৫। সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনের স্থান ও কাল কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ঠিক করিবে। সাধারণতঃ এই অধিবেশন প্রতিবৎসর বৈশাখের প্রথমাংশে হইবে।

১৬। এতদ্ব্যতীত পরিষদের অন্যূন ১০ জন সভ্য বিশেষ কারণ দেখাইয়া লিখিয়া সম্পাদককে অনুরোধ করিলে তিনি পরিষদের সাধারণ অধিবেশন বৎসরের অন্য সময়েও আহ্বান করিতে পারেন।

১৭। বাৎসরিক অধিবেশনের একটী সভা **'পরিচালনা সভা'** (Business meeting) বলিয়া অভিহত হইবে। ঐ সভায় পরিষদের পরিচালনা-সম্বন্ধীয় বিষয়সমূহ আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইবে; যথা :—(ক) পরিষদ্-সম্পাদক-কর্ত্তৃক বিগত বৎসরের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী-পাঠ; (খ) কোষাধ্যক্ষ-কর্ত্তৃক আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব পাঠ; (গ) নূতন বৎসরের জন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি-গঠন; (ঘ) নূতন বৎসরের জন্য পরিষদের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও পত্রিকা সম্পাদক-নির্ব্বাচন; (ঙ) বিবিধ।

১৮। সম্পাদক অথবা সহ-সম্পাদক পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি যথাসময়ে এবং বাৎসরিক অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি অন্ততঃ ৭ দিন পূর্ব্বে প্রত্যেক সভ্যকে লিখিয়া জানাইবেন; এবং পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত ও সঙ্কলিত পুস্তকাদির সংবাদ সভ্যদের জানাইবেন।

১৯। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সহ-সম্পাদক পরিষদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

২০। পরিষদের গঠনতন্ত্রের নিয়মাবলীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে হইলে তৎসম্বন্ধীয় প্রস্তাব সাধারণ বাৎসরিক অধিবেশনের অন্ততঃ ছয় মাস পূর্ব্বে পরিষদ্-সম্পাদককে লিখিয়া জানাইতে হইবে; এবং পরিষদ্-সম্পাদক ঐ প্রস্তাব পরিষদের সকল প্রকার সভ্যকে অধিবেশনের অন্ততঃ এক মাস পূর্ব্বে লিখিয়া জানাইবেন। এইরূপ প্রস্তাব উপস্থিত সভ্যগণের অন্যূন ত্রিচতুর্থাংশ সংখ্যক সভ্যের সম্মতি ব্যতীত মঞ্জুর হইবে না।

মুখপত্র—

২১। **'দর্শন'** নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা পরিষদের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হইবে। এই পত্রিকায় কেবলমাত্র দর্শন-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি মুদ্রিত হইবে।

২২। পত্রিকা সম্পাদনের জন্য একজন সম্পাদক অথবা একটী সম্পাদকীয় সমিতি (Editorial Board) নিযুক্ত থাকিবে এবং এই সম্পাদক অথবা সম্পাদকীয় সমিতির সদস্যগণ প্রতিবৎসর কার্য্য নির্ব্বাহক-সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন।

২৩। এই সম্পাদকীয় সমিতি পরিষদের মুদ্রণ ও সঙ্কলন ব্যাপারে যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করিবেন।

দর্শনের নিয়মাবলী—

২৪। **'দর্শন'** প্রতিবৎসর বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, ও মাঘ এই চারি মাসে যথাক্রমে চারি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে— সাধারণতঃ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

২৫। দর্শন-পত্রিকার বৎসর পরিষদের বৎসরের ন্যায় বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে। যিনি যে বৎসরের জন্য গ্রাহক হইবেন বা পরিষদের সভ্য থাকিবেন তিনি সেই বৎসরের পত্রিকা পাইবেন।

২৬। 'দর্শনে'র বাৎসরিক মূল্য—ডাকমাশুলসহ ৫৲ (পাঁচ টাকা); প্রতি সংখ্যার মূল্য ১·২৫ টাকা।

২৭। 'দর্শনে'র বাৎসরিক গ্রাহক হইতে হইলে ইহার বাৎসরিক মূল্য (পাঁচ টাকা) অগ্রিম দিতে হইবে। কোন সংখ্যা পৃথকভাবে কিনিলে ডাকমাশুলের ব্যয় গ্রাহক বহন করিবেন। পত্রিকা-সম্পাদককে লিখিলে ভি. পি. ডাক-যোগে পত্রিকা পাঠান হইবে।

২৮। 'দর্শনে'র পুরাতন সংখ্যা সম্ভব হইলে যথামূল্যে পাওয়া যাইবে।

২৯। 'দর্শনে'র প্রবন্ধ-সমূহ যথাসম্ভব পরিষদের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ-সমূহ হইতে সংগৃহীত হইবে এবং সাধারণতঃ পরিষদের সভ্যগণ-কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধাদি দর্শনে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু পত্রিকা-সম্পাদকের ইচ্ছানুযায়ী এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে—অর্থাৎ পরিষদের সভ্য নহেন এমন ব্যক্তির প্রবন্ধও প্রকাশিত হইতে পারে।

৩০। 'দর্শনে' প্রবন্ধ ছাপাইতে হইলে লেখক পরিষ্কার হস্তাক্ষরে অথবা মুদ্রিত অক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় উহা লিখিয়া পত্রিকা-সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

৩১। প্রবন্ধ-নির্ব্বাচনে পত্রিকা-সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া মানিতে হইবে। প্রত্যাখ্যাত প্রবন্ধ ডাক টিকিট না পাইলে লেখককে ফেরত পাঠান হইবে না।

৩২। 'দর্শনে' কেবল সাম্পাদকীয়-সমিতি-কর্ত্তৃক অনুমোদিত বিজ্ঞাপন ছাপান হইবে। বিজ্ঞাপনের চাঁদার হার ঐ সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে স্থিরীকৃত হইবে।

সঙ্কলন—

৩৩। পরিষদ্ হইতে বাঙলা ভাষায় লিখিত দার্শনিক পুস্তকাদি প্রকাশিত ও সঙ্কলিত হইবে। গ্রন্থকারের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্পাদকীয়-সমিতি এই সকল সঙ্কলিত ও প্রকাশিত পুস্তকাদির মূল্য পরিষদের সভ্যদের জন্য যথারীতি ধার্য্য করিয়া দিবেন।

৩৪। আবশ্যকতা অনুসারে সম্পাদকীয়-সমিতি পরিষদের মুদ্রণ ও সঙ্কলন-সংক্রান্ত নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিবার অধিকার থাকিবে।

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্য ও 'দর্শন' পত্রিকার গ্রাহকদের তালিকা

	নাম	ঠিকানা
১।	অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম,এ,পি,এচ্-ডি,	৫৯বি, হিন্দুস্থান পার্ক, কলি-২৯
২।	,, ,, রাসবিহারী দাস, এম, এ, পি, এচ্-ডি	১৪০বি, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯
৩।	,, ,, ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম,এ,পি,এচ্-ডি,	শান্তিনিকেতন, বোলপুর
৪।	,, ,, তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, এম,এ,ডি-লিট,	টাকী গভর্ণমেন্ট কলেজ, টাকী
৫।	শ্রীমতী নলিনী দাস, এম, এ	১৭২।৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯
৬।	শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,	১১এ, চৌরঙ্গী টেরাস, কলিকাতা-২০
৭।	অধ্যাপক শ্রীশৈলজাকুমার ভট্টাচার্য্য, এম,এ,ডি-ফিল,	৫৮বি, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলি-৬
৮।	শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দাশ, এম, এ,	২০০।৩বি, রাসবিহারী এভিঃ, কলি-২৯
৯।	,, কিরণবালা মুখোপাধ্যায়, এম, এ,	ফ্লাট নং২,১৬১এ, রাসবিহারী এভিঃ, কলি-১৯
১০।	শ্রীতারকচন্দ্র রায়,	১৭, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েষ্ট, কলিকাতা-২৬
১১।	অধ্যাপক শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ,	১২, বিপিনপাল রোড, কলি-২৯
১২।	,, ,, কল্যাণচন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, ডি-লিট,	২০২, হালদার বাগান লেন, কলি-৪
১৩।	,, ,, গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ,	৬৬।২, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৪।	,, ,, পরেশনাথ ভট্টাচার্য্য, এম, এ,	৪, ময়রাডাঙ্গা রোড, বরানগর, কলি-৩৬
১৫।	,, ,, কালিদাস ভট্টাচার্য্য, এম,এ,পি,এচ্-ডি,	বিশ্বভারতী, পোঃ শান্তিনিকেতন
১৬।	,, ,, অমিয় কুমার মজুমদার, এম-এ,	হুগলি মোহসিন কলেজ, চুঁচুড়া
১৭।	,, ,, কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ,	ফ্লাট নং ১৬, ব্লক K, সি,আই, টি, বিল্ডিংস ক্রষ্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪।
১৮।	,, ,, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, এম,এ,	১৮, টাগোর টাউন, এলাহাবাদ
১৯।	শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়	১৩সি, রামময় রোড, কলি-২৫
২০।	অধ্যাপক শ্রী প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়, এম্,এ, ডি-ফিল্,	৩২, বীডন্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
২১।	" " শিবপদ চক্রবর্ত্তী, এম,এ,	১৫।১, সূর্য্যসেন ষ্ট্রীট, কলি-১২
২২।	" " সুধীরকুমার নন্দী, এম্,এ, ডি-ফিল্,	প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা

নাম	ঠিকানা
২৩। অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্,এ	প্রেসিডেন্সী কলেজ, হাওড়া
২৪। " " রণদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী, এম্,এ	নরসিং দত্ত কলেজ, হাওড়া
২৫। শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	৫৬, ষ্ট্রেইট মাইল রোড, জামসেদপুর
২৬। শ্রীননীগোপাল সেনগুপ্ত	১৩২।৩সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪
২৭। শ্রীবীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	প্লট নং ২৩৬, ব্লক্ এ, বাঙ্গুর এভিনিউ, কলি-২৮
২৮। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২০
২৯। অধ্যাপক শ্রীকাত্যায়ণী দাস ভট্টাচার্য্য, এম্,এ,	প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা
৩০। " " অজিতকুমার ভট্টাচার্য্য- এম্,এ,	টাকি কলেজ, টাকি
৩১। শ্রীপুলিনবিহারী হালদার	১৪, দীনবন্ধু মুখার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া
৩২। অধ্যাপক শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্ত্তী, এম্,এ, ডি-ফিল্	ঝাড়গ্রাম কলেজ, ঝাড়গ্রাম
৩৩। " " সুবোধকুমার দে, এম্,এ,	১৩।৩, দমদম রোড, কলি-২
৩৪। " " রমেশচন্দ্র মুন্সী, এম্,এ,	৮৭।১৯, বোসপুকুর রোড, কলি-৩১
৩৫। গ্রন্থকারিক, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা	১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলি-১২
৩৬। অধ্যক্ষ মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ	আগরতলা, ত্রিপুরা
৩৭। গ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী	বিশ্বভারতী, পোঃ শান্তিনিকেতন
৩৮। ডাঃ নন্দদুলাল গাঙ্গুলী	বীরহাটা, বি, টি রোড, বর্দ্ধমান
৩৯। অধ্যক্ষ ভিক্টোরিয়া কলেজ	কুচবিহার
৪০। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস	৪০২।১, নেতাজী সুভাষ বসু রোড, পোঃ রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৪০।
৪১। অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন, এম্,এ,	১৬, গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা-৬
৪২। " ,, রামচন্দ্র পাল, এম্,এ, ডি-ফিল্	কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর
৪৩। ,, " প্রমদানাথ চৌবে, এম্,এ	২।২, গোপাল ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলি-২৫
৪৪। গ্রন্থগারিক, স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ	৩ এবং ৪, কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার, কলিকাতা
৪৫। শ্রীমতী শেফালী ঘোষ, এম্,এ	২২এ, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-২
৪৬। অধ্যাপক শ্রীশুকদেব সেনগুপ্ত, এম্,এ	টাকী গভর্ণমেন্ট কলেজ, টাকী, (২৪ পরগণা)
৪৭। " " রোহিণীনন্দন আচার্য, এম্,এ	১৮৮।৪৮, প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, কলি-৩১
৪৮। শ্রীমতী সুজাতা সিংহ, এম্,এ,	মাঃ লেফটেনাট কর্ণেল এস্,এন্, সিংহ, সুপারিনটেণ্ডেন্ট, আর, জি কর, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ১, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা-৪

নাম	ঠিকানা
৪৯। শ্রীচন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য্য	২৭এচ্ সিমলা রোড, কলিকাতা-৭
৫০। সেক্রেটারী কুচবিহার ডিষ্ট্রিক্ট, লাইব্রেরী এশোসিয়েসন	কুচবিহার
৫১। শ্রীমতী নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্,এ,	৩৪।পি।১, সুরেন সরকার রোড, পো: বেলিয়াঘাটা রোড, কলি-১০
৫২। শ্রীমাধবেন্দ্র মিত্র	৮৮।বি, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৯
৫৩। শ্রীমতী কৃষ্ণজাহ্নবী বসু, এম্,এ,	শ্রীঅনিলকৃষ্ণ বসু, কুলিনপাড়া, পো: খড়দহ (২৪ পরগণা)
৫৪। শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায়, এম্,এ	২৪০, শিবপুর রোড, হাওড়া
৫৫। অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল মুখোপাধ্যায়, এম্,এ	৩১২।১০, রসা রোড, সাউথ, কলিকাতা-৩৩
৫৬। ” ” সতীমোহন মুখোপাধ্যায়, এম্,এ	১৫এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রিট, কলি-৯
৫৭। শ্রীমতী সুবিনীতা চৌধুরী, এম্ এ	১৮১।সি, বিবেকানন্দ রোড, কলি-৬
৫৮। অধ্যক্ষ আনন্দচন্দ্র কলেজ	জলপাইগুড়ি
৫৯। শ্রীমতী ভারতী ঘোষ, এম্,এ	মেদিনীপুর উইমেন্স কলেজ, মেদিনীপুর
৬০। অধ্যাপক শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত, এম্,এ, পি,এচ্,ডি, ডি লিট্	৩৯, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট কলিকাতা-৯
৬১। অধ্যক্ষ মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ	২০, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৩
৬২। শ্রীমতী দীপ্তি সেন	অমরাবতী, পো: সোদপুর, ২৪ পরগণা
৬৩। ” কমলা চট্টোপাধ্যায়	পাঁচতলা, পি-৫, নিউ সি, আই, টি রোড এন্টালী, কলি-১৪
৬৪। অধ্যাপক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্,এ	২৭এ, হরিতকীবাগান লেন, কলি-৬
৬৫। শ্রীমতী প্রার্থনা রায়	১০১, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
৬৬। ” কণিকা দত্ত, এম্,এ	৭, বাবুরাম ঘোষ লেন, কলিকাতা-৫
৬৭। অধ্যাপক শ্রীনন্দলাল কুণ্ডু, এম্,এ	মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ, ২০, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট, কলি-৩
৬৮। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী	পি ১১৪, লেক টেরাস, কলি-২৯
৬৯। অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার ঘোষ, এম্,এ	ব্লক E/২৩+২৪ ২৫৬, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলি-৬
৭০। শ্রীমতী শোভারাণী বসু, এম্,এ, ডি-লিট্	জি ১৭, লেডি'স কলোনী হিন্দুবিশ্বালয়, বারাণসী-৫
৭১। শ্রীহরিসাধন চট্টোপাধ্যায়	৩২, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স, কলিকাতা-১৯

নাম	ঠিকানা
৭২। অধ্যক্ষ, কান্দীরাজ কলেজ	কান্দী (মুর্শিদাবাদ)
৭৩। শ্রীমতী ইন্দিরা দত্ত, এম্,এ	১৮।৭৪, ডোভার লেন, কলি-২৯
৭৪। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র রায়	৩, আউটরাম ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৭৫। অধ্যাপক সুকুমার মুখোপাধ্যায়, এম্,এ	৮৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলি-৯
৭৬। " জীবনকৃষ্ণ পাণিগ্রাহি, এম্ এ	কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজ, পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর
৭৭। প্রমোদরঞ্জন ভড়, এম্,এ	লালবাগান, পোঃ চন্দননগর, জেঃ হুগ্লি
৭৮। শ্রীমতী বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, এম্,এ	ফ্লাট নং ২৯, ব্লক্ H, সি, আই, টি বিল্ডিংস ক্রিষ্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪
৭৯। ডাঃ তরুণচন্দ্র সিংহ, ডি-এস,সি	৬৭, যতীন দাস রোড, কলি-২৯
৮০। অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য্য, এম,এ	১৮৮।২, অশোকনগর পোঃ হাব্রা, ২৪ পরগণা
৮১। " " হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ	মহিষাদল রাজ কলেজ, মহিষাদল, মেদিনীপুর
৮২। " " শঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ	৪১।৩৫বি, চারু এভিনিউ, কলি-৩৩
৮৩। " " অনাদিকুমার লাহিড়ী, এম,এ	৯।১।১, আরপুলি লেন, কলিকাতা-১২
৮৪। অধ্যক্ষ মেদিনীপুর কলেজ	মেদিনীপুর
৮৫। অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সাহা, এম,এ	২, নীরদবিহারী মল্লিক রোড, কলি-৫
৮৬। " " প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, এম, এ	কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর, বীরভূম
৮৭। রেজিষ্ট্রার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	যাদবপুর, কলিকাতা-৩২
৮৮। শ্রীমতী গৌরীরাণী সেন, এম,এ	সাউথ ক্যালকাটা গার্লস কলেজ, ৭২, শরৎ বসু রোড, কলিকাতা-২৫
৮৯। শ্রীমতী ঊষা ভট্টাচার্য্য, এম,এ, পি-এচ্-ডি	১০৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯
৯০। শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ	২, মদনমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৬
৯১। অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল ভট্টাচার্য্য, এম,এ	১৭।১, গোপীকৃষ্ণ পাল লেন, কলি-৬
৯২। " " মণীন্দ্রকান্ত দত্ত, এম,এ	৪, মধুপাল লেন, কলিকাতা-৫
৯৩। " " নীরদবিহারী ভট্টাচার্য্য, এম,এ	পুরাতন চক্, বর্দ্ধমান
৯৪। " " মতিলাল মুখোপাধ্যায়, এম,এ	৬।১এ, প্রতাপাদিত্য রোড, কলি-২৬
৯৫। " " বিশ্বনাথ সেন, এম,এ	৮বি, মথুর সেন গার্ডেন লেন, কলি-৬
৯৬। " " বিরজাবান্ধব চট্টোপাধ্যায়, এম,এ	মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর

নাম	ঠিকানা
৯৭। অধ্যাপক শ্রীনিখিলচন্দ্র সেন, এম,এ	১৬১বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলি-২৯
৯৮। ” ” ইন্দুভূষণ মজুমদার, এম,এ	সেন্ট জোসেফ’স কলেজ, দার্জিলিং
৯৯। শ্রীমতী বন্দনা সেন, এম,এ, বি-টি	মহারাজধীরাজ উদয়চাঁদ উইমেন্স কলেজ, বর্দ্ধমান
১০০। অধ্যাপক শ্রীসদানন্দ ভাদুড়ী, এম,এ, পি,এচ,-ডি	৩বি, নবীন সরকার লেন, কলি-৩
১০১। অধ্যক্ষ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ	নৈহাটি
১০২। শ্রীমতী ঋতা দাস	দি এবোড (The Abode) ৪৫।১বি, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
১০৩। অধ্যাপক শ্রীনেপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম,এ	১৮।১, গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলি-৪
১০৪। ” ” অনিলকুমার সরকার, এম,এ, ডি-লিট	University Park Peridenya, Ceylon
১০৫। শ্রীমতী সোণালী মুখোপাধ্যায়	কালি গলি, কটক-২
১০৬। গ্রন্থাগারিক, পশ্চিম দিনাজপুর, ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী	বালুরঘাট
১০৭। অধ্যাপক শ্রীকালীপদ বক্সী, এম,এ	৪বি, নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেন, কলি-২৬
১০৮। ” ” মৃণালকান্তি ভদ্র, এম,এ	৯, সত্যেন রায় ব্রাঞ্চ রোড, কলি-৩৪
১০৯। শ্রীমতী অলকা ঘোষ	উইমেন্স কলেজ, জলপাইগুড়ি
১১০। অধ্যক্ষ গোখলে মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ	১ ১, হরিশ মুখার্জ্জী রোড, কলি-২০
১১১। শ্রীমতী রুবী মুখার্জ্জী	কাঠগড়াশাহি, কটক-১
১১২। অধ্যক্ষ গুরুচরণ কলেজ, শিলচর	শিলচর, আসাম
১১৩। অধ্যাপক শ্রীসারনাথ বসু, এম,এ	৬৯৭, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, কলি-৩৪
১১৪। শ্রীমতী অংশুরাণী মিত্র	৫,২বি, কাঁটাপুকুর লেন, কলি-৩
১১৫। ” রমা ঘোষ, এম,এ	ফ্লাট নং ৪, ১৩, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলি-৪
১১৬। ” প্রতিভা সরকার	২৮।৭, গড়িয়াহাট রোড, কলি-২৯
১১৭। ” নীলিমা দেবী	কেয়ার্ অফ্ অধ্যাপক এস্, কে, নন্দ এম্ পি, সি, কলেজ, পোঃ বারিপদা ময়ূরভঞ্জ, উড়িষ্যা
১১৮। গ্রন্থাগারিক, যোগমায়া কলেজ	৯২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী রোড, কলি-২৬
১১৯। শ্রীঅমলকুমার ঘোষ	[illegible], রাজেন্দ্র রোড, কলিকাতা-২০
১২০। অধ্যক্ষ শ্রীচৈতন্য কলেজ	পোঃ বৈগাছি, হাবড়া, ২৪ পরগণা
১২১। অধ্যাপক শ্রীচন্দ্রশেখর দেবনাথ, এম,এ	হুগলি মোহসিন কলেজ, চুঁচুড়া
১২২। শ্রীবিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য	বোসের ঘাট, কনকশালী, পোঃ চুঁচুড়া

নাম	ঠিকানা
১২৩। শ্রীকৃষ্ণকান্ত মল্লিক	৩২এ, উল্টাডাঙ্গা মেইন রোড, কলি-৪
১২৪। ,, শিবেশ্বর মুখোপাধ্যায়	৩৩, বোসপাড়া লেন, কলিকাতা-৩
১২৫। " অবনীভূষণ রায়	২০, হরচন্দ্র মল্লিক লেন, কলিকাতা-৫
১২৬। " বৈজনাথ ভিওয়ানিওয়ালা	৩, গোয়েঙ্কা লেন, কলিকাতা
১২৭। শ্রীমতী করুণা ভট্টাচার্য্য, এম,এ	২৫ নং কক্ষ. এ, আই, ডব্লিউ, সি, ওয়ার্কিং গার্লস হোষ্টেল, ক্রিষ্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪
১২৮। অধ্যক্ষ মহারাজাধিরাজ, উদয়চাঁদ উইমেন্স কলেজ	বর্দ্ধমান
১২৯। ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মহান্তি, এম,এ পি-এচ্-ডি	পি ৫১৯ বি পণ্ডিতিয়া এক্সটেশন, কলিকাতা-২৯
১৩০। শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি, এম,এ	পোঃ ব্যবত্তারহাট, মেদিনীপুর
১৩১। অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ	৫৭, বদ্রিদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলি-৪
১৩২। শ্রীমতী বেলা রায় চৌধুরী, এম,এ	৬৬এ, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলি-৬

Statement about ownership and other particulars about the newspaper **Darsan** *to be published in the first Issue every year after the last day of February.*

FORM IV

(See Rule 8)

1. Place of Publication	Calcutta
2. Periodicity of its Publication	Qnarterly.
3. Printer's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
Nationality	Indian
Address	20/2, Halder Bagan Lane, Cal.-4
4. Publlsher's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
Nationality	Indian
Address	20/2, Halder Bagan Lane,
5. Editor's Name	Sri Kali Krishna Banerjee
Nationality	Indian
Address	Flat No. 16, Block K. C. I. T. Buildings, Cristopher Rd., Cal. 14
6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent. of the total Capital.	Bangiya Darsan Parisad 20/2, Halder Bagan Lane, Calcutta-4

1. Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that the particular given above are true to the best of my knowledge and behalf.

Dated 24th March, 1962

K. C. Gupta
Signature of Publisher

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা—বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য—১·২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

কর্মাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) এবং কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ,

২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

Published by Sri K. C. GUPTA, from 20-2, Halder Bagan Lane,
Calcutta-4 and Printed by Sri C. SEN, at P. B. PRESS
32E, Lansdowne Road, Calcttta—20

April—1962—200.

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা] বৈশাখ [১৩৬৮ সন

সম্পাদকীয় সমিতি

অধ্যাপক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রধান সম্পাদক)

অধ্যাপক শ্রীশিবপদ চক্রবর্তী

মূল্য ১·২৫ বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ —৫৲

দর্শন কার্য্যালয় :—২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা] বৈশাখ [১৩৬৮ সাল

সূচীপত্র

সামান্য লক্ষণা

শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন

ন্যায়বৈশেষিক ও ভাট্ট মীমাংসা দর্শনে লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দুই প্রকার প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সন্নিকর্ষ এক প্রকার সম্বন্ধ। লৌকিক প্রত্যক্ষস্থলে লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। নৈয়ায়িকগণ ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন। দ্রব্য প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ হয় সংযোগরূপ সম্বন্ধ। এইরূপ দ্রব্যাশ্রিত গুণ বা জাতির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত সমবায়, গুণগত জাতি যথা নীলত্ব প্রভৃতির প্রত্যক্ষে সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়, শব্দ প্রত্যক্ষে সমবায়, শব্দগত জাতি অর্থাৎ শব্দত্বের প্রত্যক্ষে সমবেত-সমবায় এবং অভাব ও সমবায় পদার্থের প্রত্যক্ষে বিশেষণতা সন্নিকর্ষরূপে গণ্য হয়। ন্যায়মতে এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ ছাড়া তিন প্রকার অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বাকার করা হয়। তাহারা সামান্য লক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ এবং যোগজ সন্নিকর্ষ নামে পরিচিত। মীমাংসকগণ যোগ এবং যোগজ সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন না। কিন্তু সামান্য লক্ষণ এবং জ্ঞানলক্ষণ স্বীকার করিয়া থাকেন। সন্নিকর্ষকে প্রত্যাসত্তি-ও বলা যায়। সামান্য লক্ষণা প্রত্যাসত্তি—এই অর্থে কেবল সামান্য লক্ষণা শব্দটীর প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধে সামান্য লক্ষণা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বিচার করা যাইতেছে।

সামান্য লক্ষণা কাহাকে বলে? প্রথমে একটী উদাহরণ লওয়া যাউক। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত একটী ঘটের সংযোগ ঘটিল। ফলে ঘটটীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইল। ঐ ঘটে আবার ঘটত্ব আছে। যে সময়ে ঘটটীর প্রত্যক্ষ হয় সে সময়ে ঘটে আশ্রিত ঐ ঘটত্ব জাতিরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ঘটত্ব রূপ জাতি আবার দেশান্তরীয় এবং কালান্তরীয় সমস্ত ঘটব্যক্তির সহিত সম্বদ্ধ, অর্থাৎ একই ঘটত্ব

বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্ত ঘটকেই আশ্রয় করিয়া আছে। সুতরাং ঘটত্বের জ্ঞান হইলে উহা ঘটত্বের আশ্রয় যাবতীয় ঘটের সহিত চক্ষুর এক প্রকার সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়। ফলে নিখিল ঘটবিষয়ক অলৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। ঘটের সহিত চক্ষু-রিন্দ্রিয়ের সংযোগ যেমন ঘট প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ, ঘটত্ব জাতির জ্ঞানও সেইরূপ যাবতীয় ঘটের অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। ঘটত্ব জাতির জ্ঞানই এ স্থলে ইন্দ্রিয়ের সহিত সকল ঘটের সম্বন্ধ স্থাপন করে বলিয়া উহাকেও সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তি রূপে স্বীকার করিতে হয়।

উপরে বলা হইল যে ঘটত্বরূপ সামান্যের যে জ্ঞান তাহাই সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি। প্রশ্ন হইতে পারে সামান্য-জ্ঞানকে প্রত্যাসত্তি না বলিয়া সামান্যকেই যদি প্রত্যাসত্তি বলি তাহা হইলে দোষ কি? প্রাচীন সম্প্রদায়ের নৈয়ায়িক এবং ভাট্টমীমাংসক ঘটত্ব প্রভৃতি সামান্যকেই প্রত্যাসত্তি বলিয়াছেন। কিন্তু নব্য নৈয়ায়িক-গণ এই মত সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী গ্রন্থে বিশ্বনাথ এ সম্বন্ধে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সামান্যকে সন্নিকর্ষ না বলিয়া সামান্যের জ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ বলা উচিত। সামান্যলক্ষণ শব্দে লক্ষণ পদের অর্থ যদি স্বরূপ হয় তাহা হইলে সামান্যস্বরূপ যে সন্নিকর্ষ তাহাকেই সামান্যলক্ষণ (সন্নিকর্ষ) বলিতে হয়। কিন্তু সামান্য বলিতে সমানের ভাবও বুঝা যায়। অনেকের মধ্যে এক বলিয়া যাহার জ্ঞান হয় তাহাকেই সামান্য বলা যায়। সমস্ত ঘটে অনুগত ঘটত্ব যেমন সামান্য, স্থলবিশেষে একটীমাত্র ঘটও সেইরূপ সামান্য হইতে পারে। একটী উদাহরণের সাহায্যে কথাটী বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। যে ঘটটী সংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে থাকে তাহাই আবার সমবায় সম্বন্ধে তাহার অংশ যে কপালদ্বয় তাহাতেও থাকে। এ ক্ষেত্রে একই ঘট বিভিন্ন সম্বন্ধে বিভিন্ন আধারে থাকায় 'ঘট' 'ঘট' এই প্রকার অনুগত বুদ্ধির বিষয় হইবে; অর্থাৎ ভূতলেও যে ঘট কপালেও সেই ঘট এইরূপ সমানাকার প্রতীতির বিষয় হইবে। এ জন্য বলা যায় যে এ স্থলে ঘটটী একরূপ সামান্য। এখন এই ঘটরূপ সামান্যের জ্ঞান হইলে অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলে তাহার আশ্রয় যে ভূতল, কপাল প্রভৃতি পদার্থ তাহাদেরও অলৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হইবে। এ স্থলে সামান্যের জ্ঞানকে সন্নিকর্ষ না বলিয়া কেবল সামান্যকেই যদি সন্নিকর্ষ বলা হয় তাহা হইলে নিম্নোক্ত আপত্তির উদ্ভব হইবে। ধরা যাউক যে ঘটটী বিনষ্ট হইল এবং তাহার পরে যে ভূতলে ঘটটী ছিল তাহার স্মরণ হইল। এখন সমস্যা এই যে এরূপ স্মরণাত্মক জ্ঞানের ফলে উক্ত ঘটের আশ্রয় ভূতল, কপাল প্রভৃতির অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইবে কি না।

এ ক্ষেত্রে স্মৃতিরূপে ঘটটীর জ্ঞান থাকিলেও ঘটটী অর্থাৎ সামান্যরূপ পদার্থটী ত নাই। সামান্যই যদি সন্নিকর্ষ হয় তাহা হইলে উহার যাবতীয় আশ্রয় কপাল প্রভৃতির ভান না হইবারই কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ এরূপ স্থলেও কপালাদি যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান হইতে দেখা যায়। অতএব বলিতে হয় যে সামান্যকে সন্নিকর্ষ না বলিয়া তাহার জ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ বলা বিধেয়। অর্থাৎ সামান্য না থাকিলেও তাহার জ্ঞান থাকিলেই যখন তাহার আধার জাতীয় পদার্থ সমূহের অলৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় তখন সামান্যজ্ঞানকেই উক্ত প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ বলিতে হইবে। অপর পক্ষে ধরা যাউক অতীতে কোনও ঘট ও তাহাতে আশ্রিত ঘটত্বের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইয়াছে। উক্ত ঘট ও ঘটত্ব আজও বিদ্যমান আছে যদিও আজ তাহাদের জ্ঞান নাই। জ্ঞান না থাকিলেও ঘটত্ব রূপ সামান্য ত আছেই। সুতরাং তাহা সন্নিকর্ষরূপে যাবতীয় ঘটের অলৌকিক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করুক। কিন্তু বাস্তবে ঘটত্ব রূপ সামান্য অজ্ঞাত থাকিয়া এরূপ প্রত্যক্ষ জন্মাইতে পারে না। ইহার দ্বারাও প্রমাণ হয় যে সামান্যের জ্ঞানই অলৌকিক প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ। এই প্রকার বিচারের সাহায্যে বিশ্বনাথ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সামান্যলক্ষণ শব্দটীকে সামান্যবিষয়ক এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে এবং সামান্য বিষয়ক জ্ঞানকেই সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিতে হইবে। ১

এইরূপে সামান্যের পরিবর্ত্তে সামান্য জ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলিলে আবার একটি আপত্তি উঠিতে পারে। আমরা এ পর্য্যন্ত জ্ঞানলক্ষণা সম্বন্ধে কিছু বলি নাই। জ্ঞান লক্ষণার ক্ষেত্রে জ্ঞানই সন্নিকর্ষ স্বরূপ। যেমন দূর হইতে চক্ষুর দ্বারা চন্দন দেখিয়া সুরভি চন্দন ইত্যাকার জ্ঞান হইল। এ স্থলে সৌরভ পদার্থটী চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় না হইলেও পূর্বে যে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার জ্ঞান হইয়াছে তাহার স্মৃতি এ ক্ষেত্রে সন্নিকর্ষরূপে কাজ করে। তাহার ফলে সৌরভের অলৌকিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। এখন পূর্ব্বোক্ত আপত্তিটী এই যে সামান্য লক্ষণাও জ্ঞান স্বরূপ। আবার জ্ঞানলক্ষণাও জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোনও বাস্তব পার্থক্য নাই। অতএব দুইটী পৃথক সন্নিকর্ষ এবং দুই প্রকার অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকার করা অনাবশ্যক। বিশ্বনাথ পূর্বোক্ত গ্রন্থে ইহাদের পার্থক্য নির্দেশ করিয়া এই আপত্তিরও খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে উভয় স্থলে সন্নিকর্ষটী জ্ঞানস্বরূপ হইলেও প্রত্যক্ষ দুইটীর মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য আছে। সামান্যলক্ষণার দ্বারা প্রত্যক্ষ হইলে তাহার বিষয়

১। তস্মাৎ সামান্যবিষয়কং জ্ঞানং প্রত্যাসত্তির্ন তু সামান্যম্—সিঃ মুঃ

হয় উক্ত সামান্যের আশ্রয়রূপ যাবতীয় ব্যক্তি পদার্থ; অর্থাৎ সন্নিকর্ষরূপ জ্ঞানের বিষয় সামান্য, আর তজ্জনিত প্রত্যক্ষের বিষয় হয় উহার অধীন ব্যক্তি সমূহ। কিন্তু জ্ঞান লক্ষণার দ্বারা প্রত্যক্ষ হইলে তাহার বিষয়রূপে উক্ত জ্ঞানের বিষয়টীরই ভান হইয়া থাকে। অর্থাৎ সন্নিকর্ষের যাহা বিষয় তজ্জনিত প্রত্যক্ষেরও তাহাই বিষয়। যেমন গোত্বরূপ সামান্যলক্ষণার দ্বারা যে অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে তাহার বিষয় হইতেছে যাবতীয় গো ব্যক্তি, আর সৌরভ স্মৃতিরূপ জ্ঞানলক্ষণার দ্বারা যে সৌরভের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে সৌরভই তাহার বিষয়। এইরূপে উভয় জ্ঞানে বিষয় ভিন্ন হওয়ায় সন্নিকর্ষেরও পার্থক্য সিদ্ধ হয়।

এখন সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিবার পক্ষে নৈয়ায়িক ও মীমাংসকগণ যে সকল যুক্তি দেখাইয়া থাকেন তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান যে অনুমিতির কারণ ইহা সর্বতন্ত্রসিদ্ধ। ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের পূর্বে প্রায়শঃ ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ধূম বহ্নির দ্বারা ব্যাপ্ত এ বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইবার পূর্বে কোনও কোনও স্থলে ধূমের সহিত বহ্নির সাহচর্য্য দেখিয়া সকল ধূমই বহ্নির দ্বারা ব্যাপ্ত কি না সে বিষয়ে জ্ঞাতার মনে সংশয় উপস্থিত হয়। ন্যায়াচার্য্যগণের অভিমত এই যে সামান্য লক্ষণা স্বীকার না করিলে এ প্রকার সংশয়ের উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ এ প্রকার সংশয় কিরূপে হয় তাহা বুঝিতে পারা যায় না। যে স্থলে হেতু এবং সাধ্য একত্রে দেখা গিয়াছে সে স্থলে তাহাদের ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ত কোনও সন্দেহই নাই। আর যে হেতু দেখাই যায় নাই, যাহার সম্বন্ধে কোনও প্রকার জ্ঞানই নাই, তাহাতে সাধ্যের ব্যাপ্তি আছে কি না এরূপ সংশয়ও হইতে পারে না। কারণ কোনও পদার্থ সাধারণভাবে জ্ঞাত হইলে তাহার বিশেষ কোনও ধর্ম সম্বন্ধেই সংশয় হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে কাহারও সংশয় হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে রন্ধনশালায় যে ধূম দৃষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত বহ্নির সাহচর্য্য ত সেই স্থলেই নিশ্চিত হইয়াছে। সুতরাং সে সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। আর দেশান্তরীয় কালান্তরীয় ধূম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অর্থাৎ জ্ঞানের বহির্ভূত। তাহাতে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে কি না সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। অথচ দুই এক স্থলে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্য দেখিয়া জ্ঞাতার মনে সকল ধূম বহ্নিব্যাপ্য কিনা এরূপ সন্দেহ উদিত হয়। এ প্রকার সংশয়ের উপপত্তির জন্য নিখিল ধূমের উপস্থিতি প্রয়োজন। সুতরাং বলিতে হয় যে দৃষ্ট ধূমে যে ধূমত্ব দেখা যায় তাহার দ্বারা যাবতীয় ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষ ঘটিয়া থাকে; এইরূপে সকল ধূম জ্ঞাত

হইলে তাহারা বহ্নির দ্বারা ব্যাপ্ত কি না সে বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়। এই জন্য আচার্য্য গঙ্গেশ তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে বলিয়াছেন যে সামান্যলক্ষণা না থাকিলে ধূমাদি হেতু বহ্নি প্রভৃতি সাধ্যের ব্যভিচারী কি না এ প্রকার সন্দেহই উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ লৌকিক প্রত্যক্ষে দৃষ্ট ধূমে বহ্নির সম্বন্ধ ত নিশ্চিতই হইয়াছে ; আর কালান্তরীয় এবং দেশান্তরীয় ধূম সর্বথা অজ্ঞাত হওয়ায় সংশয়াত্মক জ্ঞানেরও বিষয় হইতে পারে না। কিন্তু সামান্য লক্ষণার দ্বারা সকল ধূম উপস্থিত হইলে ধূমান্তরে বহ্নিব্যাপ্তিরূপ বিশেষ ধর্ম না দেখায় তাহার সম্বন্ধে সংশয় জন্মিতে পারে।২

ব্যাপ্তি সংশয়ের জন্য যেরূপ সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিতে হয় সামান্যরূপে ব্যাপ্তি নির্ধারণের জন্যও তদ্রূপ সামান্যলক্ষণা স্বীকার করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যখন একটী স্থলে ধূম ও বহ্নির সাহচর্য্য দেখিয়া স্থির হয় যে ধূমমাত্রই বহ্নিব্যাপ্য তখন ধূমত্বরূপে নিশ্চয়ই সকল ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তাহা না হইলে অজ্ঞাত ধূমে বহ্নিব্যাপ্তি রূপ ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাৎ যে ধূম দেখাই যায় নাই তাহাতে বহ্নির সাহচর্য্য আছে কি নাই তাহা দেখা সম্ভব নহে। কোনও পদার্থ সামান্যতঃ প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে পরে তাহাতে কোনও বিশেষ ধর্ম্মের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়। যে বস্তুর কোনও প্রকার প্রত্যক্ষই হয় নাই তাহাতে কোনও একটি বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ হইবে এ কথা যুক্তি বিরুদ্ধ। বহ্নির ব্যাপ্তি বা নিয়ত সাহচর্য্য ধূমের একটী বৈশিষ্ট্য। যিনি ধূমমাত্রই বহ্নিব্যাপ্ত, ধূমের এইরূপ বিশেষ ধর্মকে জানিয়াছেন তিনি অবশ্যই তৎপূর্বে দেশান্তরীয় এবং কালান্তরীয় সকল ধূম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু লৌকিক উপায়ে ইহা সম্ভব হয় না। এজন্য স্বীকার করিতে হইবে যে ধূমত্বের দ্বারা নিখিল ধূমের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্যদর্শনে ব্যাপ্তি নির্ণয় (Induction) যেমন অনুমানবিশেষ ভারতীয় দর্শনের মতে ব্যাপ্তি সেরূপ অনুমেয় পদার্থ

২। যদি সামান্যলক্ষণা নাস্তি তদানুকূল তর্কাদিকং বিনা ধূমাদৌ ব্যভিচার সংশয়োন স্যাৎ, প্রসিদ্ধ ধূমে বহ্নি সম্বন্ধাবগমাৎ কালান্তরীয় দেশান্তরীয় ধূমস্য মানাভাবেনাজ্ঞানাৎ, সামান্যেন তু সকলধূমোপস্থিতৌ ধূমান্তরে বিশেষাদর্শনেন সংশয়ো যুজ্যতে ॥ তত্ত্বচিন্তামণি—সামান্য লক্ষণাসিদ্ধান্ত।

নহে। ইহা প্রত্যক্ষের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, তবে স্থলবিশেষে ভূয়োদর্শন, ব্যভিচার অদর্শন, উপাধির অভাবদর্শন প্রভৃতি জ্ঞান ব্যাপ্তি নির্ণয়ে সহকারী হইয়া থাকে .৩

কোনও কোনও নৈয়ায়িকের মতে জীবের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য যে ইচ্ছা দেখা যায় তাহার উপপত্তির জন্যও সামান্যলক্ষণা স্বীকার করা দরকার। যে সুখ সিদ্ধ অর্থাৎ অধিগত হইয়াছে তাহার জন্য কাহারও আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। আর যে সুখ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, যাহার সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানা নাই তাহাও ইচ্ছার বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞাত বিষয়েই লোকের ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। সুতরাং যখন ভাবী সুখ সম্বন্ধে লোকের ইচ্ছার উদ্রেক হয় তখন ঐ ইচ্ছার পূর্বে উক্ত সুখের জ্ঞান হইয়া থাকে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভাবী সুখ লৌকিক উপায়ে জানা সম্ভব নহে। সুতরাং ঐ বিষয়ে অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়। আর এই মানস প্রত্যক্ষে পূর্বানুভূত সুখে যে সুখত্বের জ্ঞান হইয়াছে তাহাই সন্নিকর্ষরূপে কাজ করে। অর্থাৎ সুখত্বের স্মৃতি ভূত ভবিষ্যৎ যাবতীয় সুখের সহিত মনের সম্বন্ধ ঘটাইয়া সকল সুখের মানসপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে .৪

মীমাংসক শিরোমণি গাগাভট্ট সামান্যলক্ষণার সমর্থনে আরও কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার মতে পদের শক্তিজ্ঞানের জন্য অর্থাৎ কোন পদ কোন অর্থের বাচক তাহা জানিবার জন্য সামান্যলক্ষণা স্বীকার করা প্রয়োজন। "ঘটপদ ঘটের বাচক, ঘট ঘটপদের বাচ্য,"—একটী ঘট দেখিয়া এইরূপ বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ স্থির হইতে পারে। কিন্তু সকল ঘটই যে ঘটপদের বাচ্য তাহা জানিবার জন্য যাবতীয় ঘটের উপস্থিতি আবশ্যক। ইহা অলৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। ইহা স্বীকার না করিলে অসুবিধা এই যে ঘটপদের সহিত প্রতিটী ঘটের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ স্বতন্ত্রভাবে জানিতে হয়। এবং যেহেতু ঘট অনন্ত, তাহাদের প্রত্যেকের সহিত ঘটপদের সম্বন্ধ থাকায় অনন্ত সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হয়। পক্ষান্তরে সামান্যলক্ষণার দ্বারা যাবতীয় ঘটের প্রত্যক্ষ হইলে সমস্ত ঘটই যে ঘটপদের বাচ্য তাহা একবারেই জ্ঞানগোচর হয়। এইরূপে একটী শক্তি (বাচ্য বাচক সম্বন্ধ) স্বীকার করিয়া যখন সমস্যার সমাধান

৩। তথা চ উপাধ্যভাবগ্রহণজনিত সংস্কার সহকৃতেন ভূয়োদর্শন জনিত সংস্কার সহকৃতেন সাহচর্যগ্রাহিণা প্রত্যক্ষেণৈব ধূমাগ্ন্যোব্যাপ্তিরবধার্যতে। (তর্কভাষা—কেশবমিশ্র।)

৪। তত্ত্বচিন্তামনির টীকায় মথুরানাথ ইহাকে লীলাবতীকারের মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তত্ত্বচিন্তামণি—সামান্যলক্ষণা সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য।

হয় তখন অনন্তশক্তি কল্পনা করা অনুচিত। এ প্রকার কল্পনা গৌরব দোষে দুষ্ট। ৫

গাগাভট্টের আরও যুক্তি এই যে অরণ্যস্থ দণ্ড যে ঘটোৎপত্তির অন্যতম কারণ তাহা কোনও প্রকারে প্রত্যক্ষ করিয়াই কুম্ভকার ঐ দণ্ড আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অরণ্যস্থ দণ্ড যে ঘটের কারণ ইহা কিরূপে জানা যায়? ইহার উত্তরে বলা যায় যে কোনও একটী দণ্ড ঘটের কারণ লৌকিক উপায়ে তাহা দেখিয়া দণ্ডত্বের দ্বারা সমস্ত দণ্ডের একপ্রকার অলৌকিক ভান হয়।৬ আর দণ্ডে দণ্ডত্বই কারণতার অবচ্ছেদক হওয়ায় দণ্ডমাত্রই যে ঘটের কারণ তাহা উপলব্ধ হইয়া থাকে। দণ্ডত্বই কারণতার অবচ্ছেদক এই কথাটীর একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দণ্ডে দণ্ডত্ব থাকিবার ফলেই উহা ঘটোৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। তাহাতে দীর্ঘত্ব, শ্যামত্ব প্রভৃতি আরও ধর্ম থাকিতে পারে; অর্থাৎ দণ্ডটী দীর্ঘাকার বা শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ঘটের কারণ হইবার জন্য এই সকল ধর্ম নিষ্প্রয়োজন। অথচ দণ্ডত্ব না থাকিলে উহা ঘটোৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। সুতরাং দণ্ডত্বই উহার কারণতার নিয়ামক। এইরূপ যে ধর্ম কারণের কারণতার সহিত সমনিয়ত তাহাকে উহার কারণতার অবচ্ছেদক বলে।

সামান্যলক্ষণার সপক্ষে কোনও কোনও নৈয়ায়িক আরও একটী যুক্তি দেখাইয়া থাকেন। যুক্তিটী এইরূপ, ঘট উৎপন্ন হইবার পূর্বে কপালে (ঘটের অংশ দ্বয়ে) যে ঘটের প্রাগভাবের প্রত্যক্ষ হয় তাহার উপপত্তির জন্যও সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। অভাব জ্ঞানে যে পদার্থের অভাব প্রতীত হয় তাহাকে ঐ অভাবের প্রতিযোগী বলে। যেমন ঘটের অভাব বলিলে ঘট হইবে প্রতিযোগী। প্রতিযোগীর জ্ঞান ছাড়া অভাবের প্রত্যক্ষ হয় না ইহা একটী সাধারণ নিয়ম। অর্থাৎ যাহার ঘট জ্ঞান নাই তাহার ঘটাভাবের জ্ঞানও হইতে পারে না। তাহা হইলে ঘটের প্রাগভাবের, অর্থাৎ উহার উৎপত্তির পূর্বকালীন অভাবের প্রত্যক্ষের জন্য প্রতিযোগী ঘটটির প্রত্যক্ষ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু যে ঘট উৎপন্নই হয় নাই তাহা কিরূপে প্রত্যক্ষগোচর হইতে পারে? এ জন্য অনুৎপন্ন অর্থাৎ ভাবী ঘটের প্রত্যক্ষের জন্য সামান্যলক্ষণা অঙ্গীকার করিতে হয়।

পাশ্চাত্যদর্শনে সামান্যলক্ষণার সমগোত্রীয় কোনও প্রক্রিয়ার সন্ধান পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য ন্যায় শাস্ত্রের মতে অনুমানই ব্যাপ্তি নির্ধারণের উপায়। ব্যাপ্তি নির্ধারক

৫। অন্যথা ব্যবহার বিষয়ে ঘটে শক্তিগ্রহে সর্ব ব্যক্তীনাম প্রত্যক্ষতয়া সর্বত্র শক্তিগ্রহো ন স্যাৎ। ভাট্টচিন্তামণি—২৭ পৃঃ চৌঃ সাং।

৬। অরণ্যস্থ দণ্ডাদৌ প্রবৃত্তি জনক ঘট হেতুতা গ্রহার্থং—ঐ ২৯ পৃঃ

অনুমান প্রণালীকে Induction বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের জন্য লিখা বা হেতু স্থানীয় সমস্ত পদার্থের উপস্থিতি প্রয়োজন এ কথা মানিবার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য Posterior Analytics গ্রন্থে Aristotle Induction এর যে পরিচয় দিয়াছেন তদনুসারে Induction কে এক প্রকার প্রত্যক্ষই বলিতে হয়। তিনি বলেন, যে উপায়ে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ আমাদের মনে সামান্যের (Universal) জ্ঞান উৎপন্ন করে তাহাকে Induction বলা যায়।৭ তাঁহার মতে বিজ্ঞানের প্রাথমিক সত্যগুলি এই উপায়েই নির্ধারিত হইয়া থাকে। ব্যক্তির মধ্যেই সামান্য ধর্ম অন্তর্নিহিত থাকে। পুণঃ পুণঃ এক জাতীয় বহু ব্যক্তি দেখিবার ফলে এই সামান্যধর্মের যে জ্ঞান হয় তাহাকেই উক্ত গ্রন্থে Induction আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক কালে Johnson প্রভৃতি পাশ্চাত্য ন্যায়বিদ্‌গণ ইহাকে intuitive induction নামে অভিহিত করেন। Intuitive induction এর সহিত সামান্য লক্ষণার কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ intuitive induction সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন নাই। সামান্যলক্ষণার সহিত তুলনামূলক আলোচনার পূর্বে উহার প্রকৃতি সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

তার্কিক ও মীমাংসক (ভাট্ট সম্প্রদায়) কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও সামান্যলক্ষণা অন্যান্য দর্শনে অনুমোদিত হয় নাই। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ সূক্ষ্ম যুক্তিজালের সাহায্যে ইহার খণ্ডন করিয়াছেন। এমন কি নৈয়ায়িকগণের মধ্যেও সকলে ইহা সমর্থন করেন নাই। দার্শনিকগণ ইহার বিরুদ্ধে যে সকল প্রবল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে একটী সাধারণ আপত্তির কথা উল্লেখ করিতেছি। আপত্তিটী এই যে সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিলে প্রমেয়ত্বরূপে সকল প্রমেয়ই জ্ঞানের বিষয় হইবে। আর জগতে সমস্ত পদার্থই যখন প্রমেয় অর্থাৎ জ্ঞেয় তখন সামান্যলক্ষণা বলে জীব সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়ে। ন্যায়াচার্য্যগণ অবশ্য ইহার সমুচিত উত্তরও দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে প্রমেয়রূপে কোনও বিষয় জানিলেই তাহার সম্বন্ধে সবকিছু জানা হইল এ কথা বলা চলে না। সর্বজ্ঞ হইতে হইলে সমস্ত পদার্থের বিশেষ জ্ঞান আবশ্যক। সামান্যের দ্বারা কোনও পদার্থের বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সর্বজ্ঞতার আপত্তিও অযৌক্তিক।

৭। cf. An Introduction to Logic—Cohen & Nagel. P. 275

ব্যাপ্তি সংশয়ের জন্য সামান্যলক্ষণা স্বীকার করা প্রয়োজন,—এ প্রকার যুক্তির উত্তরে দীধিতি টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি বলেন যে ধূমবিশেষে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলেও সকল ধূম বহ্নিব্যাপ্য কিনা এরূপ সংশয়ের উদয় হইতে কোনও বাধা নাই। নিশ্চিত জ্ঞান সংশয়ের প্রতিবন্ধক। কিন্তু যে বিষয়ে নিশ্চিতরূপে জ্ঞান হইয়াছে সেই বিষয়ে আর সংশয় না থাকিলেও অন্য বিষয়ে সংশয় হইতে বাধা নাই। এখন, ধূমবিশেষ অর্থাৎ মহানস প্রভৃতি স্থলে দৃষ্ট ধূমে বহ্নিব্যাপ্তি নিশ্চয় হইলে সাধারণ ধূম অর্থাৎ ধূম মাত্রই বহ্নিব্যাপ্য কিনা এরূপ সংশয় জাগিবে না কেন? নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের বিষয় মহানসীয় ধূম, সংশয়ের বিষয় সাধারণ ধূম। বিষয় পৃথক হওয়ায় এই দুইটী জ্ঞান স্বভাবতঃই পরস্পরের প্রতিবন্ধক হইবে না। এই প্রসঙ্গে টীকাকার মথুরনাথের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য। কোনও স্থলে ধূম দেখিয়া ধূমত্ব প্রকারক জ্ঞান হইলে ধূমত্বরূপে নিখিল ধূমের জ্ঞান হয় এ কথাই তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে এই প্রকার অনুভবই অসিদ্ধ। সুতরাং তাহার জন্য সামান্যলক্ষণা লইয়া বিবাদও অপ্রাসঙ্গিক।৮ মথুরানাথের বক্তব্য এই যে নিখিল ধূম বিষয়ক প্রত্যক্ষ যদি অনুভব গোচর হয় তাহা হইলে সে জন্য সামান্য লক্ষণা স্বীকার করা যায়। কিন্তু এরূপ প্রত্যক্ষই অসিদ্ধ।

সামান্যলক্ষণা স্বীকার না করিলে ভাবী সুখবিষয়ে ইচ্ছার উপপত্তি হয় না, অর্থাৎ কি করিয়া অনাগত সুখের প্রতি ইচ্ছা জন্মে তাহা বুঝিতে পারা যায় না,—পূর্বোক্ত এই যুক্তিও সকলে সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। ইচ্ছা জ্ঞান পূর্বক হয়, অর্থাৎ যে বিষয়ে ইচ্ছা হইবে তৎপূর্বে সে বিষয়ে জ্ঞান থাকিবে অথবা জ্ঞান ইচ্ছার কারণ ইহা সাধারণ নিয়ম। এ ক্ষেত্রে যদি এরূপ নিয়ম থাকিত যে উক্ত জ্ঞান এবং ইচ্ছার বিষয় সর্বাংশে সমান হইতে হইবে তাহা হইলে ভাবী সুখবিষয়ক জ্ঞানের জন্য সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করা যাইত। কিন্তু এরূপ নিয়ম মানিবার প্রয়োজন নাই। যে ইচ্ছার প্রতি যে জ্ঞান কারণ, তাহারা সমানবিষয়ক হইবে এরূপ নিয়ম নাই। তাহারা সমান প্রকারক হইলেই চলে। বিষয়টী আর একটু বিস্তার করিয়া বলা প্রয়োজন। কোনও জ্ঞানে বিষয়টী যে ধর্মবিশিষ্ট হইয়া ভাসমান হয় সেই ধর্মকে ঐ জ্ঞানের প্রকার বলা যায়। যেমন ঘটজ্ঞানে ঘটত্ববিশিষ্টরূপে ঘটের জ্ঞান হয়। এ জন্য ঘটত্বরূপ ধর্মটী ঘটজ্ঞানের প্রকার হইবে। এইরূপে ইচ্ছার ক্ষেত্রেও প্রকারতা স্বীকার্য্য। যে ধর্মবিশিষ্ট পদার্থে ইচ্ছা জন্মিবে সেই ধর্মটী উক্ত ইচ্ছার প্রকার বলিয়া গণ্য হইবে। তাহা হইলে ভাবী

৮। তাদৃশানুভবস্যৈবাসিদ্ধেঃ তাদৃশানুভবস্য প্রামাণিকত্বে বিবাদস্যৈবাপর্য্যাপ্তেঃ।—তত্ত্বচিন্তামণি, সামান্যলক্ষণা—পৃঃ ২৮৪ (Asiatic Society Ed.)

সুখেচ্ছার প্রতি যে সুখজ্ঞান কারণ তাহাতে ঐ অনাগত সুখই যে বিষয় হইবে তাহা নহে। যে কোনও একটী সুখের জ্ঞান থাকিলেই হইল। সুখের জ্ঞান মাত্রই সুখত্ব প্রকারক। ভবিষ্যৎ সুখের ইচ্ছাও সুখত্ব প্রকারক। এই রূপ সমান প্রকারক জ্ঞানই ইচ্ছার জনক। এ জন্য সামান্যলক্ষণার দ্বারা ভাবী সুখের অলৌকিক প্রত্যক্ষ না মানিলেও—ক্ষতি হয় না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে নব্যন্যায়ের প্রবর্তক আচার্য গঙ্গেশ সামান্যলক্ষণার সমর্থক হইলেও এই সুখেচ্ছা বিষয়ক যুক্তিটীকে সমীচীন মনে করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে অসিদ্ধ অর্থাৎ ভাবী সুখ অজ্ঞাত হইলেও সিদ্ধ অর্থাৎ পূর্বানুভূত সুখের জ্ঞানই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির স্বাভাবিক কারণ; এই রূপেই ভবিষ্যৎ সুখে ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তি দেখা যায়। সমান প্রকারক রূপেই জ্ঞান, ইচ্ছা এবং প্রবৃত্তির মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান; সমান বিষয়ক রূপে নহে।৯

গাগাভট্ট যে বলিয়াছেন, সন্নিহিত ঘটে ঘটপদের শক্তি অর্থাৎ বাচ্য বাচক সম্বন্ধ জানিবার পর সমস্ত ঘটেই যে ঐ রূপ শক্তি আছে তাহা জানিবার জন্য সামান্যলক্ষণার দ্বারা নিখিল ঘটের উপস্থিতি প্রয়োজন, এ যুক্তিও বিচার সহ নহে। মীমাংসকগণ জাতিশক্তিবাদী এবং জাতিশক্তিবাদ স্বীকার করিলে উপরোক্ত যুক্তি অসার বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মীমাংসকগণের মতে ঘট, পট প্রভৃতি পদ প্রধানতঃ ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি জাতিকে বুঝাইয়া থাকে। তবে যে ব্যবহার স্থলে কখনও কখনও পদের দ্বারা ব্যক্তির জ্ঞান হয় তাহা লক্ষণার দ্বারা পাওয়া যায়। যেমন কেহ যদি বলে "ঘট আন" তাহা হইলে ঘটত্বকে আনা সম্ভব নহে বলিয়া এ স্থলে কোনও বিশেষ ঘটই যে ঘটপদের লক্ষ্য তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঘটপদের মুখ্যার্থ ঘটত্ব এ ক্ষেত্রে সঙ্গত হয় না বলিয়া উহার আশ্রয় যে ঘটবিশেষ তাহাই অর্থরূপে প্রতীত হয়। মুখ্যার্থের যখন এই বাধ হয়, অর্থাৎ মুখ্যার্থ গ্রহণ করিলে বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না, তখন উহার সহিত সম্পর্কিত কোনও বস্তুকে পদটির অর্থরূপে গ্রহণ করা হয়। পদ ও পদার্থের এই প্রকার সম্বন্ধকে লক্ষণা বলে। তাহা হইলে ঘটপদের দ্বারা যে ঘটবিশেষের প্রতীতি হয় তাহা পদের শক্তির দ্বারা পাওয়া যায় না, লক্ষণার দ্বারা পাওয়া যায়। ইহা মীমাংসাদর্শনের সিদ্ধান্ত। অতএব, ব্যক্তি ঘটে যখন ঘটপদের শক্তিই স্বীকার করা হয় নাই তখন সকল ঘটে

৯। অসিদ্ধস্যাজ্ঞানে২পি সিদ্ধ গোচর জ্ঞানাদেব ইচ্ছা প্রবৃত্তি স্বাভাব্যাদ—, সিদ্ধে তয়োরুৎপত্তেঃ।...সমানপ্রকারকত্বেন জ্ঞানেচ্ছাকৃতীনাং কার্য্যকারণভাবাৎ ন তু সমানবিষয়কত্বেনাপি॥ ঐ পৃঃ ২৮৬-৮৭

ঘটপদের শক্তি গ্রহণ করিবার জন্য সামান্যলক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রশ্নও অবান্তর।

যাঁহারা বলেন প্রাগভাব প্রত্যক্ষের জন্য সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ স্বীকার করা প্রয়োজন রঘুনাথ সুকৌশলে তাঁহাদের যুক্তিও খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে "ঘটাদির প্রাগভাব" ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহার বিষয় কি? তাহার বিষয় হইতেছে উৎপত্তির প্রাগভাব। অর্থাৎ এখনও ঘটের উৎপত্তি হয় নাই এই প্রকার জ্ঞানকেই ঘটের প্রাগভাবের জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। উৎপত্তি আবার কালসম্বন্ধ বিশেষ। বর্ত্তমান কালের সহিত যাহার সম্বন্ধ ছিল না তাহার সম্বন্ধ ঘটিলেই তাহার উৎপত্তি হইল বলা যায়। কাল কিন্তু অতীন্দ্রিয়। সুতরাং প্রত্যক্ষের অযোগ্য। তাহা হইলে কাল সম্বন্ধরূপ উৎপত্তিও প্রত্যক্ষের অযোগ্য, এবং ইহার প্রাগভাবও প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইবে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে প্রতিযোগী প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে তাহার অভাবও প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। এইরূপে উৎপত্তির প্রাগভাব প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইলে তাহার জন্য সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিবার চেষ্টা অর্থহীন হইয়া পড়ে।১০

আচার্য্য মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থে—এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বিচার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে যখন প্রাগভাবের কিম্বা অন্য যে কোনও প্রকার অভাবের জ্ঞান হয় তখন অনুমান বা শব্দ প্রমাণের দ্বারাই তাহার প্রতিযোগীর জ্ঞান হইয়া থাকে। সে জন্য সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হইলে পদের দ্বারাও পদার্থের উপস্থিতি সিদ্ধ হয়।১১ এমন কি স্মৃতির দ্বারাও সাধারণরূপে ঘটাদির জ্ঞানের ব্যবস্থা হইতে পারে। দেশ ও কাল বিশেষে দৃষ্ট কোনও পদার্থের দেশ ও কালাংশ পরিত্যাগ করিয়া শুধু পদার্থের সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে কেবল পদার্থাংশের স্মরণাত্মক জ্ঞান হইবে। এইরূপে যে কোনও উপায়ে প্রতিযোগির জ্ঞান জন্মিলে তাহার দ্বারাই অভাববিষয়ক জ্ঞানের ব্যবস্থা হইতে পারে।১২

নৈয়ায়িক ও মীমাংসক আচার্য্যগণ সামান্য বা জাতি নামক স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সামান্যের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আমরা এতক্ষণ কোনও আলোচনা

১০। ভাট্টচিন্তামণি—২৮ পৃঃ (চৌখাম্বা সং)

১১। কিঞ্চানাগত জ্ঞানস্যাপেক্ষিতত্বে অনুমানাদেব তত্ত্ববিষ্যতি।...কিঞ্চ শব্দাদপি সকল ধূম পাকাদিগোচর জ্ঞান সম্ভবঃ। পৃঃ ৩৪২ (নির্ণয়সাগর সং)

১২। কদাচিদেব শব্দাদমুতস্য—প্রমুষ্ট তত্তাকস্মৃতিসম্ভাবাৎ। ঐ

করি নাই। কিন্তু সামান্যের অস্তিত্ব যদি নিষ্প্রমাণ হয় তাহা হইলে সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষও বস্তুতঃ নিষ্প্রমাণ হইয়া পড়ে। বৈদান্তিক ও বৌদ্ধাচার্য্যগণ বিভিন্ন যুক্তির সাহায্যে ন্যায়-মীমাংসা সম্মত জাতিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। সামান্যলক্ষণা প্রসঙ্গে তাহার উপযোগিতা কি সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

অতীত, অনাগত এবং দূরস্থ বস্তুর প্রত্যক্ষের জন্যই সন্নিকর্ষরূপে সামান্য বা সামান্য জ্ঞানকে কারণ বলা হইয়াছে। সামান্য যদি নিত্য হয় এবং অনেকের মধ্যে অনুগত একটি পদার্থ হয় তাহা হইলেই তদ্দ্বারা নিখিল বস্তু বিষয়ক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন ঘটত্বরূপ সামান্য সকল ঘটে অনুগত একটি নিত্যধর্ম। তাহা না হইলে ঘটত্ব রূপ সামান্যের জ্ঞান হইলে অতীত, অনাগত ও অসন্নিকৃষ্ট ঘটের জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। এখন প্রশ্ন এই যে সকল ব্যক্তিতে অনুগত এরূপ নিত্য পদার্থ কোন্ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়? বেদান্ত ও বৌদ্ধ মতে কোনও প্রমাণের দ্বারাই ইহার সিদ্ধি হয় না। প্রত্যক্ষ দ্বারা ঘটে ঘটত্ব দেখা যাইতে পারে; কিন্তু উহা যে প্রতি ঘটব্যক্তিতে এক এবং নিত্য তাহা ত ঐ প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। বরং ইহার বিরুদ্ধে প্রবলতর বাধক যুক্তি উত্থাপন করা যায়। একই সামান্য এক কালে অনেক আধারে কি করিয়া অবস্থান করিতে পারে? ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন আধারে আশ্রিত থাকে একথাও বলা চলে না; কারণ ইহা নিরংশ পদার্থ। আর ইহার অংশ স্বীকার করিলে সামান্য পদার্থ মানিবার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যায়। কারণ সকল ব্যক্তিতে অনুগত যে এক বিষয়ক প্রতীতির অনুরোধে ইহা স্বীকার করা হয় সামান্যের নানা খণ্ড বা অংশ থাকিলে তাহার কোনও সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। তাহা ছাড়া ইহাও বিচার্য্য যে যখন একটি প্রাচীন ঘট বিনষ্ট হয় তখন তাহাতে আশ্রিত সামান্য কোথায় যায়? আবার যখন একটী নূতন ঘট উৎপন্ন হয় তাহাতেই বা সামান্য কোথা হইতে আসে। সামান্যের গমনাগমন স্বীকার করিলে তাহার সামান্যত্ব ব্যাহত হয়, এবং তাহা দ্রব্যান্তরে পরিণত হয়। কারণ গমনাগমন রূপ কর্ম একমাত্র দ্রব্য পদার্থেই থাকিতে পারে। এই সমস্যার সমাধানে সামান্যের সমর্থকগণ বলিয়া থাকেন যে জাতি নিত্য এবং সর্বত্র অবস্থিত। ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া উহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র; ব্যক্তির বিনাশে সেই স্থানে উহা অনভিব্যক্ত হইয়া পড়ে আবার নূতন ব্যক্তির উৎপত্তি হইলে সেই আধারে উহা পুনরভিব্যক্ত হয়। কিন্তু এ প্রকার কল্পনার দ্বারাও সমস্যার সমাধান হয় না। যদি স্বতন্ত্র প্রমাণের দ্বারা জাতি বা

সামান্য পদার্থের নিত্যতা সিদ্ধ হইত তাহা হইলে ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া ইহার অভিব্যক্তি হয়, ব্যক্তির বিনাশে তাহার অনভিব্যক্তি ঘটে এরূপ কথা বলা যাইত। কারণ তখন এরূপ স্বীকার না করিলে জাতির প্রমাণসিদ্ধ নিত্যতা দুর্বোধ্য থাকিয়া যাইত। কিন্তু জাতির নিত্যতাই যে সন্দিগ্ধ। তাহার সপক্ষে কোনও নিশ্চয়াত্মক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাহার একত্ব ও নিত্যতা সাধনের জন্য অবস্থাবিশেষে অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তির কল্পনা একান্তই অযৌক্তিক।

প্রত্যক্ষের দ্বারা যেমন ঘটত্বাদি পদার্থের জাতিত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব ও অনেক সমবেতত্ব সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ অনুমান বলেও ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ যে জাতীয় পদার্থ পূর্বে কুত্রাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহা অনুমানের বিষয় হতে পারে না। পূর্বে কোনও আধারে ধুম ও বহ্নির সাহচর্য দৃষ্ট হইলে, পরে ধুম দেখিয়া বহ্নির অনুমিতি হইতে পারে। কিন্তু জাতিত্ব কুত্রাপি দৃষ্ট নহে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে অনুমানের অবকাশই নাই।[১৩] এইরূপে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা সামান্যের সামান্যত্ব সিদ্ধ না হইলে অপর কোনও প্রমাণের দ্বারাও উহা সিদ্ধ হয় না। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ সকল গো, ঘট প্রভৃতি পদার্থে যে একাকার প্রতীতি হয় তাহার মীমাংসার জন্য জাতি বা সামান্য স্বীকার করেন বটে—কিন্তু ইহার নিত্যত্ব, অনেক সমবেতত্ব প্রভৃতি লক্ষণ স্বীকার করেন না। এ জন্য বেদান্ত পরিভাষায় জাতিত্ব উপাধিত্ব প্রভৃতি শব্দকে পারিভাষিক অর্থাৎ আধুনিক সংকেত বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে জাতি কিম্বা উপাধি কোনও প্রমাণ সিদ্ধ তাত্বিক পদার্থ নহে ; লোক ব্যবহারের জন্য বা সমানাকার বোধের উপপত্তির জন্য এই সকল শব্দ প্রয়োগ করা হয় এই জন্যই বোধ হয় আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত সূত্রভাষ্যে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে জাতি বা সামান্য শব্দ প্রয়োগ না করিয়া আকৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতেও জাতি বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। জাতির পরিবর্ত্তে তাঁহারা অপোহ স্বীকার করেন। অপোহ শব্দের অর্থ ইতর ব্যাবৃত্তি। যেমন গোত্ব শব্দের অর্থ অশ্ব-মহিষাদি ভিন্ন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নাই। ন্যায় বৈশেষিকাদি তন্ত্রে যে সামান্য পদার্থ স্বীকার করা হয় অপরাপর দর্শনে যে যুক্তিবলে তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে অতি সংক্ষেপে তাহা প্রদর্শিত হইল। কোনও প্রমাণের দ্বারা নিত্য এবং অনেকে সমবেত সামান্য সিদ্ধ না হওয়ায় সামান্যলক্ষণা সান্নকর্ষ এবং তজ্জন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষও অযৌক্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

১৩। জাতিস্বরূপ সাধ্যাপ্রসিদ্ধৌ তৎসাধ্যকানুমানস্যাপ্যনবকাশাৎ—বেদান্ত পরিভাষা (প্রত্যক্ষ পরিচ্ছেদ)

জড় পদার্থ হইতে পৃথক ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা *

শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশুতোষ কলেজ, কলিকাতা।

জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করা সাধারণভাবে সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য 'জ্ঞান' শব্দটির বিশ্লেষণের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে ; তবুও শব্দটিকে একটু ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিলে বোঝা যায় যে জ্ঞানের অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতে হইলে জ্ঞানেরই সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। অন্যথায় নীরব সংশয়বাদের আশ্রয় লইতে হয়, তাহাতে দর্শনশাস্ত্রের কিছু যায় আসে না।

জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয়। জ্ঞানের স্বরূপ কি ?—ইহা কি শুধু মাত্র জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্পর্ক, না এই সম্পর্কযুক্ত সমগ্র অস্তিত্বটি, ইহা একটি পদার্থ না পদার্থের গুণবিশেষ—ইত্যাদি। ইদানীং অবশ্য 'আমি জানি' এই প্রকাশটির তাত্ত্বিক আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করা হয় না ; ইহার যৌক্তিক ব্যবহার গত (Logical behaviour) বিশ্লেষণে মনোযোগ দেখা যায়। সে যাহাই হউক, প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেই জ্ঞানের সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধ প্রকার হিসাবে ধরা যায় এবং ইহা হইতে বহু সমস্যার উদ্ভব হয়। এইগুলির মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা হইতেছে—আমরা প্রত্যক্ষজ্ঞানে কি (বা কাহাকে) জানি। ইহার উত্তর বিভিন্ন—তবে এগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়—(ক) জ্ঞানবিদ্যার একবাদ (Epistemological monism) এবং (খ) জ্ঞানবিদ্যার দ্বিবাদ (Epistemological dualism)। (ক) মতবাদে বলা হয় যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তু ভিন্ন আর কিছু নাই। জ্ঞাতা সরাসরি জ্ঞেয় বস্তুকেই জানে—জ্ঞেয় বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞাতার ধারণা (এরূপ ধারণা আদৌ আছে কিনা সন্দেহ) এবং জ্ঞেয় বস্তু ইহারা অভিন্ন, অদ্বয়। আমরা সাধারণভাবেও এই মতবাদে বিশ্বাসী। এ মতবাদের অবশ্য অনেক অসুবিধা আছে—তাহার মধ্যে ভ্রম বা ভ্রান্ত জ্ঞানের সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান মাত্রেই যদি আমরা জ্ঞেয় বস্তুকে

---

* বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের বাৎসরিক সভায় পঠিত।

জানি, তবে ভ্রম কিরূপে হয়? ইহার উত্তরে অনেকে জ্ঞানমাত্রকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষপাতী—ভ্রম ও প্রমার মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা যুক্তিসিদ্ধ নহে বলিয়া অনেক দার্শনিক মনে করেন। এই দার্শনিকগণের মতের বিরুদ্ধে বলা যায় যে—(১) ভ্রম এবং প্রমার মধ্যে পার্থক্য স্বীকার না করিলে জ্ঞানবিদ্যা বা যুক্তিবিদ্যা অসম্ভব হইয়া পড়ে; তাহা হইলে ত আর সমস্যাই থাকে না। (২) ভ্রম যে হয় ইহা আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার ব্যাপার—আমরা জানি যে প্রত্যক্ষে কখনও কখনও ভ্রম হয়। ইহাকে স্বীকার না করিলে প্রত্যক্ষজ্ঞান বিরোধী কথা বলা হয়; ইহাকে একটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ দার্শনিক আপত্তি বলিয়া অনেকে মনে করেন না। ভ্রমের ব্যাখ্যায় একবাদের অসুবিধার জন্যই অনেকে দ্বিবাদের আশ্রয় লন। (খ) জ্ঞানবিদ্যার দ্বিবাদে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় ভিন্ন একটি তৃতীয় সত্তার অস্তিত্ব জ্ঞানক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়। এই সত্তাকে বলা যায়—'জ্ঞেয়ের প্রতিভূ।' 'প্রতিভূ' শব্দটি কতখানি গ্রহণযোগ্য জানি না—কারণ ইহা স্বভাবতঃই দার্শনিকপ্রবর জন লকের প্রতিভূবাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'প্রতিভূ' শব্দটি আমি শুধুমাত্র দার্শনিক লকের অর্থে গ্রহণ করিতেছি না—যদিও আমার ধারণা এই যে জ্ঞানবিদ্যার দ্বিবাদ বিভিন্ননামে প্রতিভূবাদেরই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। এই হিসাবে ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদও এক প্রকার প্রতিভূবাদ। প্রতিভূর স্বরূপ সম্বন্ধে—বলা যায় যে ইহা—(১) জ্ঞাতার মনে জ্ঞেয়ের প্রতিচ্ছবি, (২) ইহা জ্ঞেয়েরই অংশবিশেষ—ইহার সাহায্যে জ্ঞাতা সম্পূর্ণ জ্ঞেয়কে জানে, অথবা, (৩) ইহা জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় হইতে পৃথক—অথচ জ্ঞেয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞানে অপরিহার্য্য—ইহা ইন্দ্রিয়োপাত্ত (Sense datum)।

ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ সম্বন্ধে আলোচনার প্রারম্ভে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। একাধিক দার্শনিক ইন্দ্রিয়োপাত্তে বিশ্বাসী—তবে ইন্দ্রিয়োপাত্তের স্বরূপ সম্বন্ধে এবং ইহার সহিত জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক সম্বন্ধে তাহারা সব সময়ে একমত নহেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত ইহা হইতে পৃথক জ্ঞেয়বস্তুরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন আমি প্রধানতঃ তাঁহাদের মতের আলোচনা করিব এবং জ্ঞেয় বস্তু হইতে পৃথক ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহার বিচার করিব। এরূপ ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদে বলা হয় যে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞেয়বস্তু অবশ্যই উপস্থিত থাকে এবং তাহার সম্বন্ধে আমাদের অপরোক্ষ জ্ঞানই হয়; তবে এই জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্যের কথা বলা যায়—প্রত্যক্ষজ্ঞানে আমরা সংবেদনের সাহায্যে ইন্দ্রিয়োপাত্তকে জানি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞেয় বস্তুকে জানি। (The modern Sense-datum Theory agrees with common sense that perception is awareness of

public external objects, but tries to distinguish an immediate awareness [sensing] within it in such a way as not to destroy its observational character. [R. J. Hirst—The Problems of Perception—p. 267). ইন্দ্রিয়োপাত্তকে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বীকার করার জন্য যে যুক্তিজাল বিস্তার করা হয় এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। এই আলোচনায় আমি প্রধানতঃ অধ্যাপক প্রাইসের (Price) মতেরই উল্লেখ করিব। অবশ্য প্রয়োজন বোধে অধ্যাপক মুর, ব্রড, রাসেল ইঁহাদের বক্তব্যের আলোচনা করা হইবে। ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকারের পক্ষে বলা হয় যে—(১) আমরা প্রত্যক্ষে যে ইন্দ্রিয়োপাত্তকেই জানি এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। প্রত্যক্ষে জ্ঞাতার চৈতন্য ছাড়াও ইন্দ্রিয়োপাত্তের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইন্দ্রিয়োপাত্তের সংবেদনের (sensing) সাহায্যে জ্ঞাতা জ্ঞেয় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে। প্রত্যক্ষজ্ঞানে প্রদত্ত ইন্দ্রিয়োপাত্ত, তাহার সংবেদন এবং জ্ঞেয় বস্তুর পূর্ণ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান (Perception) এগুলির পার্থক্য নির্দ্দেশ করা বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে অধ্যাপক মুরের মত কিছু ভিন্ন হইলেও তিনি ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার অবশ্য প্রয়োজন বলিয়া বোধ করেন। ইহা আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়োপাত্তের জ্ঞান হয় বলিয়াই—ইন্দ্রিয়জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞান। ("The reason is simply that in Hume's phrase, I have a strong propensity to believe that, e. g., the visual sensibles.... ...exist etc. Moore—Philosophical studies—P. 181)। লর্ড রাসেলও প্রাথমিক জ্ঞানের (knowledge by acquaintance) বিষয় হিসাবে ইন্দ্রিয়োপাত্তের কথা বলেন। তিনি অবশ্য অধ্যাপক Price এবং Moore এর মত জ্ঞেয় বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্বে পূর্ণ আস্থাশীল নহেন। ইন্দ্রিয়োপাত্তের জ্ঞানের সাহায্যে যৌক্তিক গঠনের মাধ্যমে (Logical construction) বস্তুকে জানা যায়—বস্তুর জ্ঞান (knowledge by description) ইন্দ্রিয়োপাত্তের জ্ঞান হইতে ভিন্ন। যাহা হউক, এই দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষের বিষয় হিসাবে ইন্দ্রিয়োপাত্তকে অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া মনে করেন। (২) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার না করিলে অনেক অসুবিধা হয়। ভ্রমের কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার না করিলে দেওয়া যায় না। আমরা প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে একেবারে সরাসরি যাহার সাক্ষাৎ পাই তাহাই 'প্রদত্ত' (Given) বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত। ইহাকে জড়বস্তুর অংশবিশেষ বলা যায় না—তাহা হইলে ভ্রমের ব্যাখ্যা করা যায় না। জ্ঞেয় বস্তুকে জানিলে ত ভ্রমই হয় না। আবার ভ্রমের বিষয়কে জ্ঞাতার মানস প্রসূতও বলা যায়

না; কারণ তাহাতে জ্ঞানমাত্রেই জ্ঞেয়কে মানস ধারণা বলিতে হয়—ইহাতে প্রমা—অপ্রমার পার্থক্য করা যায় না। ভ্রমে জ্ঞেয় বস্তুকে জানা হয় না সত্য—তবে ইহাও সত্য যে এক্ষেত্রে জ্ঞাতার স্বকাপালকল্পিত কিছুকেও জানা হয় না। এই বিষয় জ্ঞাতা নিরপেক্ষ; আবার জ্ঞেয় বস্তু হইতে ইহার পার্থক্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদীগণের মতে জ্ঞানবিষ্ঠার একবাদী কোনও মতবাদই ভ্রান্তজ্ঞানের যথাযথ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিতে পারে না—একমাত্র ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার করিলেই ইহার সুষ্ঠু সমাধান দেওয়া সম্ভব। কারণ ইন্দ্রিয়জ্ঞান মাত্রেরই জ্ঞেয় হিসাবে কিছু পদার্থ স্বীকার করা প্রয়োজন—ইহা সত্য বা মিথ্যাজ্ঞানে সমভাবে বিদ্যমান—ইহাই ইন্দ্রিয়াপাত্ত। জড় বস্তুটি জ্ঞাতা বা জ্ঞান সম্পর্ক নিরপেক্ষ—কাজেই তাহার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব দ্বারা সত্য বা মিথ্যাজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে। জ্ঞানের সত্যাসত্য নিরূপণ অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে—তাহা দার্শনিকগণের আলোচনার বিষয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞান মাত্রের বিষয় হিসাবে ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার না করিলে প্রত্যক্ষের বিশ্লেষণ করা যায় না। (The root of the problem lies in the fact that every perceptual experience contains **something** that can be made to vary indepen-dently of any of the physical things being perceived....In general, we may give the name sense-datum to anything in a perceptual experience which could thus be varied independently of the objects being percived (R. M. Chisholm—The Theory of Appear-ing. P. 103).

এখন দেখা যাউক ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা সত্যই আছে কিনা। এ বিষয়ে প্রথমেই ইন্দ্রিয়োপাত্তের সহিত (জ্ঞেয় বস্তু) জড় পদার্থের সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

যাঁহারা ইন্দ্রিয়োপাত্ত এবং জড় পদার্থ এই দুইটিকেই প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহাদের পক্ষে উভয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করা এক দুরূহ ব্যাপার। এরূপ ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদীগণ এ বিষয়ে বিশেষ বিব্রত বোধ করেন। অধ্যাপক Price জড় পদার্থকে প্রশ্নাতীত ভাবে গ্রহণ করেন। (It is a matter of perceptual acceptance—Perception[১]. তিনি বিশেষ আয়াস সহকারে জড় পদার্থের সহিত ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্পর্ক নির্দ্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ইন্দ্রিয়োপাত্তগুলি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটি গোষ্ঠী (Family) রচনা করে। এই গোষ্ঠীর একটি কেন্দ্র

থাকে এবং ইহাকে ঘিরিয়াই গোষ্ঠীটি গড়িয়া উঠে। একই গোষ্ঠীতে ভিন্ন ভিন্ন (যেমন চাক্ষুষ স্পর্শজ) ইন্দ্রিয়াপাত থাকিতে পারে। আবার শুধু যে জ্ঞাত ইন্দ্রিয়োপাত্ত থাকে তাহাই নহে—যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত কোনও জ্ঞান সম্পর্কে আসে নাই তাহাও গোষ্ঠীভুক্ত থাকে। সাধারণ জড় পদার্থের যাবতীয় দেশিক এবং কালিক গুণ এই গোষ্ঠীতে আরোপ করা যায়। কিন্তু জড় পদার্থের সহিত এত গভীর সাদৃশ্য থাকা সত্বেও সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়োপাত্ত গোষ্ঠীকে ঐ পদার্থের সহিত অভিন্ন বলা যায় না—ইহা জড় পদার্থ হইতে পৃথক। কারণ জড় পদার্থে এমন কিছু আছে যাহা গোষ্ঠীতে নাই—যেমন অভেদ্যতা চুম্বকশক্তি ইত্যাদি। জড় পদার্থের কার্য্যকারণ ভাবও গোষ্ঠীতে আরোপ করা যায় না। একদল দার্শনিক (Phenomenalist) অবশ্য উল্লিখিত গুণগুলিকেও ইন্দ্রিয়োপাত্ত গোষ্ঠীতে আরোপ করিয়া জড় পদার্থের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে চান—অন্ততঃ ইন্দ্রিয়াপাত্ত দ্বারাই তাহারা প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা করিতে চান। অধ্যাপক Price এই মত গ্রহণের পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন (১) জড় পদার্থের অস্তিত্ব এবং ঐ গোষ্ঠীর অস্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য আছে। জ্ঞাত ইন্দ্রিয়োপাত্ত একই অর্থে অস্তিত্বশীল হইলেও অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়োপাত্ত নহে—কারণ ইহা সম্ভাব্য মাত্র। আবার গোষ্ঠীতে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয় প্রকার ইন্দ্রিয়োপাত্ত থাকায় গোষ্ঠীর অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। প্রতিটি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে সম্ভাব্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত বাস্তবায়িত হয়। এইভাবে বলা যায় যে ইন্দ্রিয়োপাত্ত গোষ্ঠী একটি বিশেষ ধরণের সমন্বয়—যদিও তাহার অর্থ এই নয় যে ইহা জ্ঞাতার উপর নির্ভরশীল। (২) জড় পদার্থ হইতে গোষ্ঠীকে আরও একটি অর্থে পৃথক করা প্রয়োজন। জড় পদার্থের কারণতা এমন অংশে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব যেখানে ইন্দ্রিয়োপাত্ত সম্ভব্য মাত্র—বাস্তবায়িত হয় নাই। আবার ঐ পদার্থের সমগ্র দেশেই ইহা একই সঙ্গে হইতে পারে কিন্তু ইন্দ্রিয়োপাত্ত গোষ্ঠীতে ইহা সম্ভব নহে। (৩) জড় পদার্থ হইতে গোষ্ঠীর আরও একটি পার্থক্য লক্ষ্যনীয়। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের সূচনা হইতেই আমরা গোষ্ঠী ছাড়াও আরও একটি জিনিষ ধরিয়া লই—তাহা গোষ্ঠী হইতে পৃথক এবং গোষ্ঠী যে দেশে আছে তাহার অধিকারী। তবে উহারা একই স্থানে থাকিলেও ও উহাদের পার্থক্য ভুলিলে চলিবে না। ইন্দ্রিয়োপাত্ত গোষ্ঠী এবং জড় পদার্থ পৃথক হওয়ায় Phenomemalism অধ্যাপক Price এর নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। কিন্তু পার্থক্য থাকা সত্বেও উহারা কিভাবে সম্পর্কিত এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে উভয়ের প্রয়োজনীয়তা কি তাহা তিনি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। তাহার মত এইরূপ বিবৃত করা যায় :

(ক) যে কোনও ইন্দ্রিয়োপাত্ত একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। [S is a member of a family of sensedata.

(খ) এই গোষ্ঠিটি আর একটি দেশিক বস্তুর সহিত সর্বসম। [There is a physical occupant O, with which F is coincident.]

(গ) জড় পদার্থ—এই গোষ্ঠী এবং দেশিক বস্তুর সমষ্টি। [M consists of F & O in conjunction. We may call it the collective Delimitation Theory. Perception—P. 303.] অধ্যাপক Moore ও বিশেষ আশার বাণী শুনাইতে পারেন না। তিনি অবশ্য জড় পদার্থ বলিতে আমরা কি বুঝি তাহার আলোচনা করিতে চাহিয়াছেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে জড় পদার্থ আছে এবং তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি বাক্য সত্য যদিও তাহার স্বরূপ নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। ইন্দ্রিয়োপাত্তের—সহিত জড় পদার্থের সম্পর্ক নির্ণয়ে তিনি যে বিশেষ বিপন্ন তাহা তাঁহার স্বীকৃতিতেই বুঝা যায়। (And here....I want to say to begin with that, I feel extremly puzzled about the whole subject....[Philosophical studies—P. 185]). Lord Russell দ্বিবিধ জ্ঞানের কথা বলেন—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইন্দ্রিয়োপাত্তের জ্ঞান এবং জড় পদার্থের জ্ঞান ভিন্ন। জড় পদার্থের যৌগিক গঠনের কথা তিনি বলেন; আবার কখনও কখনও ইন্দ্রিয়োপাত্তকে তিনি জড় পদার্থের অংশ বিশেষও বলেন। এই মত দুইটির পার্থক্য আছে। একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্ত এবং জড় পদার্থ স্বীকারে যে অসুবিধা আছে Russell তাহা এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করেন।

অধ্যাপক Price এর আলোচনা গভীর এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ। অধ্যাপক Moore এবং Dr. Broad ও এই হিসাবে তাহার সহিত একই মতের সমর্থক। ইহারা সকলেই প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে দ্বিবিধ পদার্থেরউল্লেখ আবশ্যক বোধ করেন। প্রথম পাঠে ইহাদের মতের সহিত দার্শনিক প্রবর Kant এর মতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন Kant এর Thing in itself ইহাদেব জড় পদার্থে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও উভয়ই সমান রহস্যপূর্ণ। ইহারা অবশ্য জড় পদার্থের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা বলেন এবং এ বিষয়ে স্বাভাবিক বিশ্বাস ছাড়া অন্য কোনও যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন না। জড় পদার্থ স্বীকার এই দার্শনিকগণের স্বাভাবিক বস্তু স্বাতন্ত্র্যবাদের (Naive Realism) পরিণতি—এ বিষয়ে যুক্তির প্রয়োজন ইহারা মানেন না। এই রহস্যময় জড় পদার্থ স্বীকার না করিলে অধ্যাপক Price এর মতবাদ (Syngosis)

একেবারেই হেগেলীয় দর্শনের সঙ্গতিবাদের (Coherence Theory) নামান্তর হইয়া পড়ে (১) বাস্তবিক প্রশ্ন এই যে, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে যদি আমরা সরাসরি জড় পদার্থকেই প্রত্যক্ষ করি তবে ইন্দ্রিয়োপাত্তের প্রয়োজন কি। জড় পদার্থের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা যদি ইন্দ্রিয়োপাত্ত ছাড়াই প্রকাশিত হয় তবে ইহার প্রয়োজন নাই। আর যদি ইন্দ্রিয়োপাত্ত ব্যতীত তাহার প্রকাশ সম্ভব না হয় তাহা হইলে ইন্দ্রিয়োপাত্ত অতিরিক্ত জড় পদার্থ স্বীকারের প্রয়োজন থাকে না। শুধুমাত্র কার্য্যকারণ ভাব সম্বন্ধে একটি সিদ্ধ ধারণা লইলেই চলে। তাহা হইলে Phenomenalism ভিন্ন গত্যন্তর নাই। (Ref. E. E. Harris—Nature, Mind, Modern Science—P. 311). বাস্তাবিক পক্ষে একই প্রত্যক্ষে দুইটাকে গ্রহণ করা যায় না। (২) ইন্দ্রিয়োপাত্ত একটি বিশেষ ধরণের পদার্থ—ইহা বিশেষ স্থানে বা কালে নাই—অথচ 'আছে'। এইরূপ থাকা বা অস্তিত্ব সম্ভব কি না সে বিষয়ে প্রশ্নের অবকাশ আছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় ইন্দ্রিয়োপাত্তের একই সঙ্গে অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব আছে—ইহাতে যুক্তিবিদ্যার বিশেষ নিয়ম (Law of Excluded Middle) ভঙ্গ করা হয়। [W. Barnes—The myth of sense-data—Arist. Soc. Proc. XIV (1944-45) 89ff.] (৩) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রে কিছু যে 'দেওয়া' (given) থাকিবেই এ বিষয়ে অনেকে একমত নহেন। অনেকে বলেনযে জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞাতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া ধরিলে জ্ঞানের যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না; জ্ঞানের জ্ঞানাতীত নির্দেশ (Self-transceding reference) ব্যাখ্যার অতীত হইয়া পড়ে। কাজেই জ্ঞাতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার করা চলে না। আমরা অবশ্য এ বিষয়ে ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ গ্রহণ না করিয়াও ভিন্ন কথা বলিতে পারি। প্রসঙ্গান্তরে তাহা আলোচ্য বিষয়। (৪) ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ যে ভ্রমের একটি বিশেষ গ্রহণযোগ্য সমাধানের ইঙ্গিত দেয় এমন মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে করি না। কারণ জড় বস্তুর স্বরূপ এবং তাহার সহিত ইন্দ্রিয়োপাত্তের সম্পর্কের যথাযথ নির্দেশ না দিলে ভ্রান্তজ্ঞানের সমাধান অসম্ভব। এ বিষয়ে এই মতবাদ প্রতিভূবাদের (Representationism) সকল অসুবিধা ভোগ করে। অধ্যাপক A. J. Ayer বলেন যে ভ্রম ব্যাখ্যার জন্য ইন্দ্রিয়োপাত্ত অবশ্য স্বীকার্য্য এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ নাই। জ্ঞানের সত্যাসত্য নিরূপণ যদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ের উপর নির্ভর না করে তবে ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকারে ভ্রমের কোনও সমাধানই পাওয়া যায় না।

ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকারের পক্ষে যে যুক্তিগুলি দেওয়া হয় তাহার বিচার করিয়া

দেখা গেল যে—সেগুলি গ্রহণযোগ্য নহে। অতএব বলা যায় যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে জড় পদার্থ হইতে পৃথক ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকার করার প্রয়োজন নাই; ইহাতে কল্পনা গৌরব হয় মাত্র।

অধ্যাপক A. J. Ayer এ বিষয়ে নূতন ইঙ্গিত দিয়াছেন। স্বয়ং অধ্যাপক Price ও তাহা গ্রহণের পক্ষপাতী (Aris-Soc. Proc.—'Seeming')। ইন্দ্রিওপাত্ত-বাদ একটি বিশেষ ধরণের বাচনিক প্রকাশভঙ্গী মাত্র—আমরা জড় পদার্থের ভাষায় অথবা 'ইন্দ্রিয়োপাত্তের ভাষায় প্রত্যক্ষের প্রকাশ করিতে পারি। সাধারণ ভাবে যেখানে 'ভ্রান্তজ্ঞান' 'আপাতঃজ্ঞান' ইত্যাদি বলা হয় সেখানে 'ইন্দ্রিয়োপাত্তবাদ' নূতন ভাবে ইহাকে প্রকাশ করে। বাচনিক ভঙ্গী হিসাবে বিচার করিলে ইহাকে আর স্বাভাবিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের সহিত যুক্ত করা চলে না; আর ইহা যথার্থ বা ভ্রান্ত এ কথাও বলা চলে না। অবশ্য ইহাকে শুধুমাত্র প্রকাশভঙ্গী হিসাবে ধরিলেও প্রশ্ন থাকে ইহা কতখানি গ্রহণযোগ্য। অনেকে ইহাকে শুধুমাত্র প্রকাশকঙ্গী বলিতে ইচ্ছুক নহেন—ইহা অভিজ্ঞতার নূতন ব্যাখ্যা এবং সে হিসাবে ইহা যুক্তিপূর্ণ কিনা তাহা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনার বিষয়। [The sense-datum theory is not simply an alternative notation to that of the language of appearing for describing a mental set of facts that obtain and can be known independently of the language employed. It employs an alternative ontology.' E. M. Adams—Mind]. বর্ত্তমানে আমাদের বক্তব্য এই যে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষে একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়োপাত্ত ও জড়পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। আর জড় পদার্থ হইতে পৃথক ইন্দ্রিয়োপাত্ত স্বীকারের প্রয়োজন নাই; ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতা বিরুদ্ধ এবং দার্শনিক যুক্তিসিদ্ধও নহে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল ভিত্তি

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য ন্যায়তর্কবেদান্ততীর্থ

বেদান্তদর্শন মানবজীবনের চরমলক্ষ্য বস্তুর নির্দ্ধারণ করিয়াছে—ইহা সুধী সমাজে অতি প্রসিদ্ধ। কিন্তু বেদান্তদর্শনের প্রকৃত বক্তব্য কি—সেই সম্বন্ধে প্রবল মত ভেদ বিদ্যমান। ঐ সমস্ত মতভেদের মধ্যে আচার্য্য শঙ্কর এবং ভক্তপ্রবর রামানুজাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমধিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে। যদিও বেদান্তশাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক মত ও পথের প্রবর্ত্তক আরও অনেক মহাপুরুষ আছেন, কিন্তু সেই সমস্ত মহাসাধক ও পণ্ডিতগণ আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজের ন্যায় এত মানুষের হৃদয় অধিকার করিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য্য রামানুজের পাণ্ডিত্য, সাধনা, হৃদয়বল ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্য বিশ্লেষণ প্রণালী এতই হৃদয়গ্রাহী যে তাহা অলৌকিক বলিয়াই মনে হয়। এই আচার্য্যদ্বয় যাহা উপদেশ দিয়াছেন এবং লিখিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেকে নিজের জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিয়া অনন্যসাধারণ আদর্শ দেখাইয়াছেন। ইহাদের নিজের জীবনে রূপায়িত স্বীয় মতবাদের প্রভাবে ইহাদের সমসাময়িক দেশ ও সমাজ নানারূপ দুর্নীতি ও পঙ্কিলতা পরিহার করিয়া একটা আধ্যাত্মিক ভাবের প্লাবনে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আজ সহস্রাধিক বৎসরের পরেও ও ইহাদের প্রচারিত অধ্যাত্ম সূক্ষ্মতত্ত্ব ও মতবাদ স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে।

উক্ত আচার্য্যদ্বয় অসামান্য শক্তিসম্পন্ন এবং শ্রুতিপ্রামাণ্যবাদী হইলেও পরস্পরের মতভেদ অতি প্রবল। আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, আর রামানুজাচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈত বাদী। একজন বলেন, একমাত্র নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মই সত্য, আর সব অনিত্য বা মিথ্যা। অপরে বলেন—জীব ও জগদ্ বিশিষ্ট ব্রহ্মই সত্য। জীব ও জগৎ অসত্য নহে। জ্ঞানমার্গের অনুশীলন পূর্ব্বক ধ্যান-ধারণা সমাধি দ্বারাই প্রকৃত তত্ত্ব লাভ সম্ভব—ইহাই অদ্বৈতবাদী শঙ্করের সিদ্ধান্ত। আবার রামানুজাচার্য্য বলেন—অশেষ কল্যাণ গুণনিলয় করুণাময়ের অসীম দয়ার কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল সিক্ত কর, তাহার সেবা করিয়া, তাহার দাসত্ব করিয়া নিজেকে ধন্য কর। একজন বলেন—অভিন্নভাবে ব্রহ্ম স্বরূপতা লাভই মুক্তি, অপরে বলেন—ভগবানের চির কৈঙ্কর্য্যই মুক্তি। জ্ঞানাবতার শঙ্কর শান্ত, গম্ভীর, উদাসীনস্বভাব। অথচ মহাজ্যোতির্ম্ময়তত্ত্ব সমাধির

অম্লান প্রভায় প্রসন্ন বদন। সংসারের সমস্ত কিছুকেই তুচ্ছ বোধে অপাংক্তেয় করিয়া আত্মসমাহিত। আবার যতিরাজ আচার্য্য রামানুজ ভক্তিগদ্‌গদচিত্ত, ভগবানের সেবার উদগ্রবাসনায় সর্ব্বদা ব্যাকুল, চিরসুন্দরের অপরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্যেরসে বিভোর হইয়া ভাব মুগ্ধনয়নে ভগবানের অনন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিতেই ব্যস্ত। দুইজন দুইটি বিভিন্ন ভাবের প্রতিমূর্ত্তি, দুইটি বিভিন্ন পথের প্রবর্ত্তক। পরস্পর বিরোধী এই দুইটি মতই বস্তুতঃ শ্রুতিকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেকেই স্বীয় মতের অনুকূলে যথেষ্ট যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া নিপুন বিশ্লেষণের সাহায্যে নিজ নিজ মতের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। তবে পার্থক্য এইটুকু যে আচার্য্য শঙ্কর কেবলমাত্র শ্রুতিকেই আশ্রয় করিয়া স্বীয় বিচার বুদ্ধির সাহায্যে অদ্বৈত মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সাম্প্রদায়ক্রমে তিনি যেই জ্ঞান ও দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, নিজের অসাধারণ প্রজ্ঞা ও অক্লান্ত চেষ্টার সাহায্যে তিনি সেই মতের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্য রামানুজের প্রবর্ত্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য—ইহাই প্রসিদ্ধ।

কথিত আছে—রামানুজাচার্য্যের গুরুস্থানীয় কাঞ্চীপূর্ণ (ক) রামানুজের প্রার্থনানুসারে একদিন গভীর রাত্রিতে শ্রীরঙ্গমস্থিত বরদরাজের মন্দিরে যাইয়া তালবৃন্ত-হস্তে শ্রীভগবানের সেবা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভক্তবৎসল ভগবান বরদরাজ কাঞ্চীপূর্ণকে বলিলেন—"বৎস! মনে হইতেছে তুমি আমাকে কিছু বলিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে, তোমার জিজ্ঞাস্য কি?'

কাঞ্চীপূর্ণ ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে বলিলেন—'ভগবন্! আপনি অন্তর্য্যামী, আপনি সবই জানেন। আমি আজ লক্ষ্মণের (খ) মানসিক কয়েকটী প্রশ্নের উত্তরের জন্য আপনার কৃপাভিক্ষা করিতেছি।'

(ক) কাঞ্চীনগরের নিকটবর্ত্তী পুণামেলিগ্রামে "কাঞ্চীপূর্ণ" নামে শূদ্রবংশীয় এক ভক্ত সাধক ছিলেন। রামানুজাচার্যের বাল্যকালেই তাহার সহিত রামানুজের সাক্ষাৎ হয় এবং রামানুজ তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হন। এমন কি রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণেরও অনেক প্রচেষ্টা করেন। কাঞ্চীপূর্ণ "বরদরাজ" সিদ্ধ ছিলেন। বরদরাজ তাহার সহিত কথোপকথন করিতেন। রামানুজাচার্য্যের অনুরোধে কাঞ্চীপূর্ণ বরদরাজের নিকট প্রার্থনা করায় বরদরাজ তাহাকে শ্লোক কয়টি বলিয়াছিলেন।

(খ) রামানুজাচার্য্যের সংসার জীবনের নাম। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াই ইনি রামানুজাচার্য্য নামে খ্যাত হন।

বরদরাজ বলিলেন—'বৎস! লক্ষ্মণের মানসিক প্রশ্ন আমি জানি, তুমি তাহাকে এই কথাগুলি বলিও, তাহা হইলেই তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।'

অহমেব পরং ব্রহ্ম, জগৎকারণকারণম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়ো র্ভেদঃ সিদ্ধ এব মহামতে॥
মোক্ষোপায়ো ন্যাস এব জনানাং মুক্তিমিচ্ছতাম্।
মদ্ভক্তানাং জনানাঞ্চ নান্তিমস্মৃতিরিষ্যতে॥
দেহাবসানে ভক্তানাং দদামি পরমং পদম্।
পূর্ণাচার্য্যং মহাত্মানং সমাশ্রয় গুণাশ্রয়ম্॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে—আমি (বরদরাজরূপী ভগবানই) জগতের কারণেরও কারণ। জীব ও ঈশ্বর চিরদিনই অত্যন্ত ভিন্ন। ভগবানের শ্রীচরণে দেহমন প্রভৃতি সর্ব্বস্ব সম্পূর্ণ সমর্পন করা বা একান্তভাবে শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়াই মুমূক্ষু মানবের মোক্ষের উপায়। যাহারা আমার ভক্ত, একান্তভাবে যাহারা আমাকে ভজনা করে তাহাদের 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যের অনুশীলন নিষ্প্রয়োজন। দেহাবসানের পর আমিই তাহাদিগকে মোক্ষরূপ অভয়ফল দান করি। আর লক্ষ্মণ যেন মহাত্মা মহাপূর্ণকে গুরুপদে বরণ করে।" উপরোক্ত বাক্যই ভক্তরাজ রামানুজচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল আকর। আচার্য্য রামানুজ অতি যত্ন সহকারে বেদান্তদর্শনের (ব্রহ্মসূত্রের) ভাষ্যকারও টীকাকার বোধায়ন ঋষি, দ্রমিড়াচার্য, টঙ্ক বা বাক্যকার, গুহদেব, ভারুচি, কপর্দ্দী ভর্ত্তৃহরি, শ্রীবৎসঙ্কামিশ্র, নাথমুনি এবং যমুনাচার্য্যের গ্রন্থাদি আলোচনা করিয়া তাহার প্রসিদ্ধ 'শ্রীভাষ্য' রচনা করেন।

আচার্য্য রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য আচার্য্যগণও বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবে ভাবিত হইয়া গ্রন্থাদি রচনা করেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত আচার্য্য শঙ্করের তীক্ষ্ণ-যুক্তিজালভেদ করিয়া অদ্বৈতমতের নিরাকরণ ও বিশিষ্টাদ্বৈতমতের স্থাপনের পক্ষে উহা পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় আচার্য্য রামানুজ নূতনভাবে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপনের প্রয়াসী হন এবং সারগর্ভ যুক্তিতর্কের সাহায্যে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনে অগ্রসর হন। বলা বাহুল্য যে সাধনা ও পাণ্ডিত্যের সংমিশ্রণে আচার্য্য রামানুজ যে সমস্ত যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া অদ্বৈতমতের খণ্ডন করিয়াছেন তাহার সারবত্তা অনস্বীকার্য্য। রামানুজকে কেন্দ্র করিয়া তৎকালীন ভারতে যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল আজ পর্য্যন্তও তাহার ধারা অক্ষুন্ন রহিয়াছে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল ভিত্তি ভগবান বরদরাজের শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী ইহা আমরা

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র শ্রুতির উপরই প্রতিষ্ঠিত—"বেদান্তো নাম উপনিষৎ প্রমাণম্," সুতরাং এই মতবাদের অনুকূলে শ্রুতি কতখানি সহায়ক তাহা আলোচনা প্রয়োজন। কিন্তু প্রথমে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্য কি তাহা বুঝিতে না পারিলে, শ্রুতির সাহায্যে উক্ত মতবাদের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর কি না তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে না। সুতরাং প্রথমতঃ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আচার্য্য রামানুজের বক্তব্যের সারমর্ম্ম সংক্ষেপে এইরূপ—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"—এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে। অদ্বিতীয় শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বা ভগবানের সমানজাতীয় অথবা বিজাতীয় কোনরূপ বস্তুই নাই। জীব ও জগৎ—যাহা কিছু আমরা অনুভব করি, ব্যবহার করি—তাহা সমস্তই বিশ্বরূপী ভগবানের অংশ বা শরীরস্থানীয়, প্রত্যেকটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলিত হইয়াই যেমন একটী শরীর হয়, তেমনই যাবতীয় বস্তুজগৎ শ্রীভগবানের সমষ্ট্যাত্মক শরীর গঠিত করিয়াছে, নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মিলিত হইয়াই ভগবানের শরীররূপে পরিণতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং জীব ও জগৎ—তাহার অংশ,—ইহা লইয়া তিনি পূর্ণ। পত্র, পুষ্প, ফল, শাখা, কাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ লইয়াই একটি বৃক্ষ, ঐ সকল প্রত্যেকটী অংশ যেমন স্বতন্ত্র ভাবে একক এবং বৃক্ষ হইতে ভিন্ন, আবার সমষ্টিগত রূপে উহা বৃক্ষ বলিয়া বৃক্ষ হইতে অভিন্নও হয়, সেইরূপ জীব ও জগৎ—প্রত্যেকটি পদার্থ ব্যষ্টিগত হিসাবে পরস্পর ভিন্ন, আবার সমষ্টিগত হিসাবে অভিন্ন। অতএব বিশ্বরূপী শ্রীভগবানের নিজের অংশের সহিত নিজের ভিতরের ভেদও রহিয়াছে, অথচ ঐ সমস্ত অংশকে লইয়াই তিনি এক বা অদ্বিতীয়। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে—চিৎ অর্থাৎ চেতন এবং অচিৎ অর্থাৎ জড় ;—প্রকৃতি কাল প্রভৃতি—এই উভয় রকম পদার্থবিশিষ্টই ঈশ্বর, এই ঈশ্বর চেতন জীবেরও চৈতন্য সম্পাদক—সুতরাং চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ থাকিলেও ইহারা ঈশ্বরের শরীর, আর শরীর বলিয়া ঈশ্বরের সহিত ইহাদের অভেদও আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে—ঈশ্বরের সহিত জীব ও জগতের ভেদ থাকিলে আর অভেদ থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে অভেদ থাকিলে ভেদ থাকিতে পারে না, কারণ একই বস্তু অপর বস্তুর সহিত ভিন্ন ও বটে, অভিন্ন ও বটে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ। যেহেতু ভেদ ও অভেদ পরস্পরবিরোধী। বিশেষতঃ যদি—ঈশ্বরের সহিত জগতের সম্পূর্ণ ভেদ আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে "ঈশ্বর বা ব্রহ্ম হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন

হইয়াছে”—এইরূপ শ্রুতি-সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। (ক) বিশেষতঃ রামানুজাচার্য্য ও ব্রহ্ম বা ভগবানকেই জগতের কারণ রূপে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু যাহা হইতে যাহা সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহা কখনও তাহার কারণ হইতে পারে না। বালুকা কখনও তৈলের কারণ হয় না, মানুষ কখনও পশুর জনক হয় না। অতএব ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলিয়া স্বীকার করিলে জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন বলা চলে না। আর যদি জীব জগতের সহিত ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ অভিন্ন বলা হয় তাহা হইলে জীব জগতের মত ব্রহ্মও অনিত্য এবং বিকারী হইয়া পড়েন। জীব ও জগতের অনিত্যতা এবং বিকারশীলতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং তাহার সহিত অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মও জগতের মতই অনিত্য ও বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অথচ আচার্য্য রামানুজ ভগবান বা ব্রহ্মকে কখনও ঐরূপ স্বীকার করেন না। অতএব জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্ম ভিন্ন ও অভিন্ন—এইরূপ অযৌক্তিক মতবাদ কেমন করিয়া সম্ভব হইল ?—

উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান করিতে যাইয়া আচার্য্য রামানুজ বিশাল যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সকল জটিল ও দুরূহ বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই বিষয়ের জন্য শ্রীনিবাসদাস বিরচিত “যতীন্দ্র মতদীপিকা” নামক গ্রন্থখানা আলোচনা করিলে পরিতৃপ্ত হইবেন। আমরা অতি সংক্ষেপে আচার্য্য রামানুজের বক্তব্য উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিব।—

আচার্য্য রামানুজ বলেন—“আমার শরীরকে আমরা “আমি” বলি। আমি ‘স্থূল’ আমি “কৃশ” এইরূপ ব্যবহার সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। এখানে স্থূলত্ব বা কৃশত্ব যে শরীরেরই ধর্ম্ম ইহা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়। সুতরাং আমি এবং ‘স্থূল’ বা ‘কৃশ’ একই বা অভিন্ন এইরূপ অর্থেই ‘আমি কৃশ’ এই প্রয়োগ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে “আমার শরীর” এই ব্যবহারও সকলেই করিয়া থাকেন। ‘আমার’ এই কথাটি ষষ্ঠী বিভক্তিতে নিষ্পন্ন, ‘শরীর’ এই কথাটি ‘আমার’ সম্বন্ধে যুক্ত বলিয়াই এখানে ষষ্ঠী হইয়াছে। ষষ্ঠী বিভক্তি সর্ব্বদাই ভেদ বুঝায়, অভেদে কখনও ষষ্ঠী হয় না। সুতরাং ‘আমার শরীর’ এই ব্যবহারের সাহায্যে অনায়াসেই বুঝা যায় যে আমি এবং শরীর ভিন্ন। অতএব বুঝা গেল ‘আমি’ বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহার সহিত শরীর ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে—প্রত্যেকটী সর্ব্বজনসিদ্ধ অনুভব বস্তুসত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(ক) “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্তি অভি সংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম” (তৈত্তীরিয়োপনিষৎ)

বস্তু নাই—অথচ অনুভব হইতেছে—ইহা কখনও হয় না, হইতে পারে না। আকাশ-কুসুমের অনুভব কখনও হয় না, কারণ উহা কোনও বস্তু নহে। অতএব পূর্ব্বোক্ত ভেদ ও অভেদ অনুভবের মূলে প্রকৃত পক্ষেই শরীরের সহিত আমার ভেদ এবং অভেদ রহিয়াছে—ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব বিশেষ বিশেষ অবস্থা গ্রহণ করিয়া একই বস্তুতে অপরের ভেদ ও অভেদ থাকিতে কোন বাধা নাই।

বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন যে—যখন আমরা শরীরকে আমি বলি তখন আমরা শরীরের সহিত আমাদের অভেদ ভ্রম করিয়াই বলিয়া থাকি, প্রকৃত ভেদ ভুলিয়া যাই বলিয়াই ঐরূপ ব্যবহার করি। আর যখন শরীরকে "আমার" বলি তখন যথার্থ ভেদ বুঝিয়াই বলি। যখন ভেদ জ্ঞান থাকে তখন আমরা শরীরকে আমি বলি না। প্রকৃত পক্ষে যাহাকে "আমার" বলিয়া উল্লেখ করা হয়, যেমন গৃহ, ধন প্রভৃতি। আমরা কখনও তাহাকে 'আমি' বলিয়া ব্যবহার করি না। কিন্তু সেখানে তো আমাদের কখনও ভ্রম হয় না। আবার অনেক সময় ভিন্ন বস্তুকেও যে আমরা অভিন্নের মত করিয়াই ভাষায় প্রয়োগ করি—তাহারও বহু দৃষ্টান্তই আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—তেজোবীর্য্যসম্পন্ন মানুষকে আমরা "পুরুষসিংহ" বলি। ঐস্থলে পুরুষ এবং সিংহ দুইটি ভিন্ন বস্তুকে আমরা অভিন্ন ভাবেই ভাষায় প্রয়োগ করি। কিন্তু ঐরূপ প্রয়োগ করি বলিয়াই যে পুরুষ এবং সিংহ যে ভিন্ন নহে—এইরূপ ধারণা আমাদের কখনও জন্মে না। বরং পুরুষ সিংহ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু এইরূপ বোধ পরিস্ফুট না থাকিলে আমরা ঐরূপ ব্যবহার করিতাম না। সুতরাং "আমি কৃশ" কেবল মাত্র এই অনুভবের জোরেই শরীর ও আমি যে অভিন্ন—ইহা প্রতিপাদন করা চলে না, বরং উহার বিপরীত ধারণারই উদ্রেক হইতে পারে। সুতরাং ভেদ ও অভেদ বাদ স্থাপনের মূল সূত্রটিই ভুল বলিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ইহার উত্তরে আচার্য্য রামানুজ বলেন—'ভ্রম' বা মিথ্যা বলিয়া কোন কিছুই জগতে নাই। যাহা দেখিতেছি—বুঝিতেছি—তাহা সমস্তই সত্য, সব কিছুই অনুভবের যোগ্য খাটি বস্তু। ভ্রম বা মিথ্যা বলিয়া যাহাকে প্রতিপাদন করা হয়, তাহাও একটি জ্ঞান। কোনও একটি বস্তুর স্বরূপটি যাহার সাহায্যে আমাদের মানসলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তাহাইতো জ্ঞান। এক কথায় বস্তুর স্বরূপাভিব্যক্তিই জ্ঞান। অতএব মূলে কোনও বস্তু না থাকিলে জ্ঞান কখনও আত্ম প্রকাশই করিতে পারে না। আরও একটি কথা এই যে—জ্ঞানের সাহায্যেই আমরা বস্তুকে বুঝি, জ্ঞানই বস্তু জানাইয়া দেয়।

জ্ঞানের মূলে যেই বস্তুটি রহিয়াছে বিবিধ প্রক্রিয়ার সাহায্যে সেই বস্তুর স্বরূপটি জ্ঞানের মাধ্যমেই তো প্রকাশিত হয়। এই অবস্থায় জ্ঞান যেই বস্তুকে জ্ঞাতার মনের দরবারে উপস্থিত করে—সেই বস্তুর স্বরূপটি জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় নাই ইহা মনে করিলে পৃথিবীতে কোন জ্ঞানের ওপরেই আমাদের আস্থা থাকিবে না। কোন জ্ঞানের উপরই যদি বিশ্বাস না রাখা যায় তাহা হইলে বিদ্যা, জ্ঞান প্রভৃতি জগৎ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে—সমস্ত জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান—এ আবার কেমন কথা? আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে আমরা অহরহই অনেক ভ্রম করিয়া থাকি। শুক্তিকে রজত জ্ঞান করা, রজ্জুকে সর্প বলিয়া বুঝা ইহা তো প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ ব্যাপার। অথচ উহা যে ভ্রম, যথার্থ জ্ঞান যে উহা নহে, ইহা তো স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ —ঐরূপ জ্ঞানের পরে যখন আবার ভাল করিয়া দেখি—তখনই বুঝিতে পারি যে প্রথম যাহা জানিয়া ছিলাম তাহা ঠিক নহে, উহা অযথার্থ বা মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। সুতরাং ভ্রম জ্ঞান নাই—ইহা কেমন করিয়া মানিব? ইহার উত্তরে আচার্য্য রামানুজ বলেন— শুক্তিকে রজত বলিয়া দেখাও মিথ্যা নহে। কারণ ঐ স্থলে যদি রজত বস্তুটি একেবারেই না থাকিত, উহা যদি একান্তই অসৎ বা অলীক হইত, তাহা হইলে কখনই উহার প্রত্যক্ষ হইতে পারিত না। কারণ যাহা অসৎ তাহা তো প্রত্যক্ষ করা চলে না। কেহ কখনও শশশৃঙ্গ বা বন্ধ্যাপুত্রকে প্রত্যক্ষ করে না, করিতে পারে না। সুতরাং রজতের প্রত্যক্ষ হয় ইহা যখন প্রতিবাদীও স্বীকার করেন তখন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত ঐ রজতকে তো একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না, উহা প্রকৃত পক্ষেই রহিয়াছে ইহা মানিতে হইবে। অতএব রজত জ্ঞান ভ্রম বা মিথ্যা নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, রজত যদি ঐ স্থলে প্রকৃতই থাকিয়া থাকে—তাহা হইলে শুক্তির সমীপবর্ত্তী হইয়া আর রজতকে দেখি না কেন এবং রজতকে পাই নাই বা কেন? যাহা প্রকৃতই সৎ বস্তু, তাহার জ্ঞান হইলে জ্ঞানের পরে পরিজ্ঞাত বস্তুর উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইলে ঐ বস্তু লাভ হয়—ইহা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান জ্ঞেয় বস্তুটীকে যেখানে যেমন ভাবে জানাইয়া দেয় জ্ঞানের পরে পরিজ্ঞাত বস্তুর উদ্দেশ্যে প্রবৃত্ত হইয়া যদি পরিদৃষ্ট দেশে জ্ঞান যে ভাবে বস্তুটীকে জানাইয়া দিয়াছে সেই ভাবেই আমাদের বস্তু লাভ হয় তাহা হইলে জ্ঞান যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং শুক্তিতে রজত জ্ঞান কোন রকমেই যথার্থ হইতে পারে না।

ইহার উত্তরে আচার্য্য রামানুজ বলেন—বস্তু মাত্রই পরম সত্য ভগবানের অংশ। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান পরম কল্যাণময় সত্যস্বরূপ ভগবান, সুতরাং একই ভগবানের অংশ বলিয়া সমস্ত বস্তুর ভিতরেই সমস্ত বস্তুর সত্তা আছে. "সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং বস্তু।"—কিন্তু প্রত্যক্ষ বস্তুর মধ্যে অনন্ত স্বরূপ ভগবানের সমস্ত স্বরূপ সমান ভাবে প্রকটিত নহে, বস্তু মূলতঃ সমগ্র স্বরূপ হইলেও লীলাময় ভগবানের অপার লীলারস আস্বাদনের জন্যই উহার গঠন ভঙ্গীর তারতম্য রহিয়াছে। একটি বস্তুকে যেই স্বরূপ সমধিক ভাবে প্রকটিত অপর বস্তুতে সেই স্বরূপ তেমন প্রকটিত নহে। সুতরাং প্রকাশ বা প্রকটনের হ্রাস ও আধিক্যই প্রকৃত পক্ষে বস্তু ভেদের মূল বীজ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—সসাগরা বনরাজিকুন্তলা গিরিকিরিটিনী এই পৃথিবীর মধ্যেও জল, তেজঃ, বায়ু প্রভৃতির অংশ রহিয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অংশই অধিক বলিয়া ইহার নাম পৃথিবী। তেমন—জল, তেজঃ প্রভৃতির মধ্যেও পার্থিব অংশ আছে—দার্শনিকগণ ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু পার্থিব অংশের অল্পতা থাকায় উহা আর পৃথিবী নামে অভিহিত হয় না। সুতরাং বুঝা গেল যে প্রত্যেকটী বস্তুর মধ্যেই যাবতীয় বস্তুর স্বরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহার অল্পতা ও অন্যান্য অংশের আধিক্যের ফলেই প্রত্যেকটী বস্তু একটি স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমর্থ। বস্তুতত্ত্বের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে শুক্তি এবং রজত এই দুইটি বস্তুর মধ্যেও পরস্পরের উপাদানভূত অংশ নিহিত আছে। কতকগুলি সাংগঠনিক অবস্থার তারতম্যেই একটী রজত ও অপরটি শুক্তি নামে অভিহিত হয়। সুতরাং দূরত্ব বা ঐরূপ কতকগুলি কারণে পুরোবর্ত্তী শুক্তি নামক বস্তুটির শুক্তি বলিয়া ব্যবহারের কারণ স্বরূপ প্রধান ভাবে লক্ষিত না হইয়া তাহার অভ্যন্তরস্থিত রজত নামক বস্তুটীর অংশ সমূহই ভাসমান হইয়া উঠে, সেই জন্যই "ইহা রজত" এইরূপ প্রত্যক্ষ জন্মে। অতএব শুক্তিকে রজত বলিয়া প্রত্যক্ষ করার ব্যাপারটী আসলে রজতেরই প্রত্যক্ষ, উহা শুক্তি নামক বস্তুতে কল্পিত রজতের প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং 'ভ্রম' বলিয়া যাহা বলা হয় উহার মূলে কোনই যুক্তি নাই, বরঞ্চ "ভ্রম"—বলিয়া ব্যবহার বা নির্দ্দেশ করাটাই ভুল। এইরূপ যুক্তি অনুসারে শরীরকে "আমি" বলাও ভ্রম নহে। তাহার কারণ—আত্মা যেমন অনাদি, শরীরের উপাদান সূক্ষ্ম ভূতবর্গও তেমনি অনাদি। এই জন্যই আত্মাও শরীরের নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। শরীর আছে—অথচ আত্মা নাই ইহা সম্ভব নহে। আত্মা নিত্য এবং ব্যাপক বা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া মৃত শরীরও আত্মা শূন্য নহে। কিন্তু যেরূপ গঠন শৈলীর ফলে শরীর সচেতন হয় মৃত স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীর চলিয়া যাওয়ায়

স্থূলশরীরের সচেতন ব্যবহারের উপযোগী সেই গঠনভঙ্গী বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার ফলেই মৃতশরীর অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকে। আত্মাভিন্ন শরীর নাই। সুতরাং শরীরকে আত্মা বলিলে কোন ভুল হয় না, কেবলমাত্র আত্মা ও শরীরের অভেদমাত্রই প্রতিভাত হয়। সুতরাং শরীর ও শরীরীর ভেদাভেদ সম্বন্ধে কোনই বাধা নাই।

আচার্য্য রামানুজ বলেন—জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ বাস্তব এবং চিরন্তন। জীব ও ব্রহ্ম এক বা অভিন্ন হইলে নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মস্বরূপ হওয়াই মুক্তি বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ হইলে মোক্ষলাভ করিয়া জীবের আর কি লাভ হইবে ? সুখের জন্যই তো যাবতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং সুখই জীবনের একমাত্র কাম্য। কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হইলে জীবের ভাগ্যে আর সুখ হইল কোথায় ? জীবের যাহা পরম কাম্য, সেই সুখই যদি না হইল তাহা হইলে মুক্তিলাভের সার্থকতা কোথায় ? স্নেহ, দয়া, মায়া, আনন্দ—সমস্ত কিছু কোমল হৃদয়বৃত্তি সমূলে উৎপাটিত করিয়া শুষ্ক প্রস্তরসদৃশ হওয়ার আশায় যুগযুগান্ত হইতে মহর্ষি ও ভক্তসমাজ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—ইহা তো বাতুলের কল্পনামাত্র। অশেষ কল্যাণগুণনিলয় পরমানন্দময় শ্রীভগবানের পদ-পঙ্কজের আরাধনায়, তাঁহার সেবায়, তাঁহার দাস্য-সখ্য প্রভৃতিতে যে দুঃখলেশবর্জ্জিত অনাবিল অফুরন্ত সুখ হয়—ইহা কেবলমাত্র মহা সৌভাগ্যবান্ ভুক্তভোগীরা জানেন। ঐরূপ বিমল আনন্দের মুক্তধারা যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই—সেই সমস্ত শুষ্কহৃদয় হতভাগ্যগণই শ্রীভগবানের সেবায় দুঃখ কল্পনা করে, তাহারা কোনদিনই ভগবানের শ্রীপদযুগলের সেবার অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই।

আরও একটি বিশেষ কথা আচার্য্য রামানুজ বলিয়াছেন, তাহা এই—অদ্বৈত বেদান্তীগণ নির্গুণ ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" প্রভৃতি সূত্রের ব্যাখ্যায় ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া আছে। নির্গুণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে এইরূপে কারণ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া ঐরূপ কল্পনার সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই অবিদ্যা স্বীকৃত হইয়াছে এবং অবিদ্যাকে "অনির্ব্বাচ্য" বলা হইয়াছে। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে 'অবিদ্যাকে' অনির্ব্বাচ্য রূপে নির্দ্ধারণ করা অদ্বৈতপন্থীদের সঙ্গত হয় নাই। কারণ অবিদ্যা যে "একটা কিছু" তাহাতো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং "একটা কিছু" বলিয়া যদি নির্ব্বচন করিতেই হয়—তাহা হইলে সে আর অনির্ব্বাচ্য হইল কেমন করিয়া ? বিশেষতঃ 'অবিদ্যা' এই শব্দ দ্বারাইতো অবিদ্যার নির্ব্বচন হইয়া যায়, অতএব উহা

অনির্ব্বাচ্য হইল কি? এবং যাহাকে "একটা কিছু" বলিয়া মানিতেই হইবে, চিরদিনই তাহার অত্যন্ত—অভাব সর্ব্বত্র রহিয়াছে—ইহাই বা কেমন কথা? বিশেষতঃ অবিদ্যা যদি অনাদি এবং ভাব পদার্থই হয় (ক) তাহা হইলে সেইরূপ অবিদ্যার বিনাশই বা হইবে কেন? যাহা অনাদি অথচ ভাব পদার্থ, তাহার কখনও বিনাশ হয় না। উভয় মত সিদ্ধ আত্মাই এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত। সুতরাং অদ্বৈত বৈদান্তিকগণের উদ্ভাবিত "অবিদ্যা" যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। অবিদ্যাই অদ্বৈতবাদ স্থাপনের মূল উপজীব্য। সুতরাং অবিদ্যা খণ্ডিত হওয়ার ফলে অদ্বৈত বাদের মূল ভিত্তিই বিনষ্ট হইয়া যায়। (ক)

উপরে আমরা আচার্য্য রামানুজের সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে বুঝিয়াছি। প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভগবান বরদরাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীই এই মতবাদের মূল। কিন্তু বেদান্ত মতবাদ সর্ব্বত্রই শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুকূলে শ্রুতির তাৎপর্য্য পাওয়া যায় কি না এবং কোন্ কোন্ শ্রুতি প্রধান ভাবে এই মতবাদের মূল তাহার আলোচনা করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের অনুকূলে প্রধানতঃ নিম্নোক্তশ্রুতি সমূহ উল্লেখযোগ্য ;—

(১) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হইয়াছে "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারং চ মত্বা"—(১।৬) অর্থাৎ আত্মা এবং প্রেরণকারীকে পৃথক বলিয়া জানিবে। ইহাতে জীব ও ঈশ্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন ইহাই সিদ্ধ হয়।

(২) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মুণ্ডক, ১।১।৯) যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ ইত্যাদি। ইহাদ্বারা ব্রহ্ম যে সগুণ—তাহাই সিদ্ধ হয়।

(৩) "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে (শ্বেতা ৬।৮) ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ বলিয়া জানা যায়। ইহাদ্বারা ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতিপাদিত হয়।

(৪) "এষ আত্মা সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" (ছাঃ ৮।১।৫) এই আত্মা সত্যকাম ও সত্য সঙ্কল্প, ইহাতে আত্মা সগুণ বলিয়া বুঝা যায়।

(৫) "তদৈক্ষত" (ছাঃ ৬।২।৩) তিনি ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প করিলেন, "সেয়ং দেবতা ঐক্ষত" (ছাঃ ৬।৩।২) এই সেই দেবতা ঈক্ষণ করিলেন।

(ক) অথ কেয়মবিদ্যা? অনাদিভাবত্বে সতি জ্ঞাননিবর্ত্ত্য।'—(অদ্বৈতসিদ্ধি ৫৫৪ পৃঃ) অনাদি ভাবরূপং যদ্ বিজ্ঞানেন বিলীয়তে তদজ্ঞানমিতি প্রজ্ঞা লক্ষণং সং প্রচক্ষতে॥ ১ম চিৎসুখী পরি ঃ

(৬) "স ঈক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি (ঐতঃ ১।১) তিনি চিন্তা করিলেন আমি লোক সমূহ সৃষ্টি করিব। উক্ত শ্রুতি সকলও আত্মার সগুণত্বের বোধক।

(৭) "নিত্যো নিত্যানাং চেতন শ্চেতনানাং" (কঠ ২।২।১৩, শ্বেতা ৬।১৩) যে নিত্য বস্তু সমূহের মধ্যে নিত্য স্বরূপ এবং চেতন পদার্থের চেতনা স্বরূপ। ইহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হয়।

(৮) "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশা নীশাবজা" (শ্বেতা ১।৯) জ্ঞ এবং অজ্ঞ-এই দুইটিই জন্মরহিত। ইহার মধ্যে একজন ঈশ্বর এবং অপর জন অনীশ্বর। ইহাতেও জীব এবং ঈশ্বর ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

(৯) "ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ" (তৈত্তিঃ ২।৮) "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (তৈত্তিঃ ২।৯) ইহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, সূর্য্য উদিত হয় এবং ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে ইত্যাদি। ব্রহ্মের সগুণত্বই এখানে উল্লিখিত হইয়াছে।

(১০) "সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রাহ্মণা বিপশ্চিতেতি" (তৈত্তিঃ ২।১) উপাসক বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সহিত সকল কামনা ভোগ করেন।

(১১) "সোহকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়" (তৈত্তিঃ ২।৬) আমি বহু হই এবং জন্ম গ্রহণ করি। এই সমস্ত শ্রুতিতেও ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রমাণিত হয়।

(১২) "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" (তৈত্তিঃ আর ৩।২৪) "যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী মন্তরে সঞ্চরন্ যং পৃথিবী ন বেদ" (সুবালোপঃ ৭।১)" তৎসৃষ্ট তদেবানু প্রাবিশৎ" (তৈত্তিঃ ২।৬।১) "সেয়ং দেবতা ঐক্ষত হন্তাহ মিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি" (ছাঃ ৬।৩।২) এই সমস্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে—ব্রহ্মা অভিলাষ করিলেন যে—আমি জীবরূপ আত্মার দ্বারা এই পৃথিবী, জল ও তেজোরূপী দেবতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিবিধ নাম ও রূপের সাহায্যে অভিব্যক্ত হইব। তিনিই পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট, সমস্ত বস্তুর অভ্যন্তরেই তিনি প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, তিনি সকলের নিয়ন্তা।—এই সমস্ত শ্রুতিতে পরিষ্কার ভাবই—স্রষ্টাও সৃষ্টির উল্লেখ থাকায়—জীব ও ব্রহ্মের ভিন্নতা এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব প্রতীয়মান হয়।

(ক) অদ্বৈত বেদান্তীগণ রামানুজাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত এই সমস্ত দোষের খণ্ডন করিবার জন্য প্রবল বিচার করিয়াছিন। এই সম্বন্ধে বহু গ্রন্থই আছে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা অসম্ভব।

১৩। ইহা ভিন্ন জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং ব্রহ্মের সগুণত্ব জগতের সত্যতা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্রুতি—সমূহ প্রমাণরূপে উল্লেখযোগ্য—

"যে আত্মনি তিষ্ঠন্ আত্মনোইন্তরো যমাত্ম ন বেদ, যস্ত আত্মাশরীরং য আত্মান্ অন্তরো যময়তি স ত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতঃ (বৃহদাঃ) "ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষয়ং হরঃ, ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ (শ্বতাঃ ১।১০)" (শ্বতাঃ ৩।১) "দ্বা সুপর্ণা সযুক্তা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে, তয়ো রন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি অনশ্নন্ অন্যোভিচাকাশীতি" (কঠ এবং শ্বেতাঃ) (ছাঃ ৮।১।৬) "এত মানন্দময়মাত্মনমুপসংক্রম্য ইমান্ লোকান্ কামান্ নীকামরূপ্যনুসঞ্চারন্ এতৎ সাম গায়ন্ আস্তে" (তৈত্তিঃ ৩।১০।৫) "তদা বিদ্বান্ পণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মুণ্ডঃ ৩।১।৩) "পরং জ্যোতিঃ উপসংপদ্য স্বেনরূপেন অভিনিষ্পদ্যতে"(ছাঃ ৮।৩।৪) "ন হি বিজ্ঞাতুঃ বিজ্ঞাতেঃ বিপরিলোপোবিদ্যতে" (বৃহঃ ৪।৩।৩০) "বিজ্ঞাতারমরেকেন বিজানীয়াৎ" (বৃহঃ ২।৪।১৪)।

এতদ্ভিন্ন শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতাতেও প্রকৃতি ও পুরুষকে অনাদি বলিয়া উল্লিখিত হওয়ায় জগৎ ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হয়।

"প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যানাদী উভাবপি।" (গীতা ১৩।১৯) ইহা ভিন্ন গীতার নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে।—"নত্বেবাহম্" (২।১২) "বহুনি মে ব্যতীতানি" ৪।৫) "মদ্ভাবমাগতাঃ" (৪।১০) "প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্" (৭।৫) "পুরুষঃ স পরঃ পার্থ" (৮।২২) "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ (৯।১০) "মমৈবাংশো জীবলোকো জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫।৭) "যথাৎ ক্ষরমতীতোঽহ মক্ষরাদপি চোত্তমঃ" (১৫।১৮) ইত্যাদি।

বেদান্ত দর্শনের নিম্নোক্ত সূত্রসমূহেও জীব এবং পরমাত্মাঃ ভেদ স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে—"নাত্মাশ্রুতে নির্ত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ" (২।৩।১৭) "জগদ্ ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণত্বা-দসন্নিহিত্বাচ্চ" (৪।৪।১৭) "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" (৪।৪।২১) "মুক্তোপসৃপ্য ব্যপদেশাৎ" (১।১।২ ("ন স্থাণতোঽপি পরস্য উভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" (৩।২।১১) ইত্যাদি।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে ভক্তপ্রবর যতিরাজ আচার্য্য রামানুজের অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রথমেই পরমকল্যাণময় অশেষগুণনিলয় শ্রীভগবানের উপর পতিত হইয়াছিল। সগুণ ব্রহ্মের উপর দৃষ্টি পড়ার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তাহার বিপরীত নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে মনের মধ্যে প্রশ্ন উদিত হয়। সুতরাং আচার্য্য রামানুজ নির্গুণ ব্রহ্মের অন্বেষণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া সাধনা ও পাণ্ডিত্যের সমন্বয়ে

যুক্তিবিশ্লেষণের সাহায্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সগুণত্বই অনুভব করিয়া তদনুসারে নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন। রামানুজের যুক্তিপ্রণালী বিশ্লেষণ করিলে ইহাও পরিস্ফুট হয় যে—আচার্য নিজ হৃদয়ে দৃঢ় প্রবিষ্ট সগুণ ব্রহ্মভাবের আলোকেই সমস্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন, এবং এই জন্যই নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ সগুণব্রহ্ম হইতে নিকৃষ্টরূপে জড়জগতের চিন্তা না করিয়া সগুণের মধ্যেই নির্গুণের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ নির্গুণ স্বরূপতঃ অনুভূত বা প্রকাশমান হইতে পারে না, সগুণের অভ্যন্তরেই সে নিজের স্বরূপ বিলীন করিয়া অবস্থিত। গুণের বা যে কোনও অবস্থার আশ্রয় না করিয়া কোন কিছুই প্রকাশিত হইতে পারে না, কারণ প্রত্যেকটি অনুভূতি বিশেষ একটি অবস্থারই প্রকাশ মাত্র। যাহার কোনও অবস্থা নাই তাহার অনুভবও হইতে পারে না। আর যাহা অনুভবের অগোচর—তাহা যে আছে—ইহা প্রমাণ করাও

অদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে জগত নশ্বর, সুতরাং মিথ্যা। কারণ একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্মকেই সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিলে আত্মাতিরিক্ত বস্তুকে মিথ্যা বলা ভিন্ন আর উপায় নাই। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম বা ভগবান্ একই পদার্থ।

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং তজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ (শ্রীমদ্‌ভাগবত)

ব্রহ্মকে দয়া প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণমণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিলে দ্বৈতভাব অবলম্বন না করিয়া উপায় নাই। জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্যই এই দ্বৈতভাবের উপজীব্য। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদী রামানুজাচার্য্য জীবজগত প্রভৃতি সমস্ত বস্তুকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জীব ও জগৎ অনিত্য হইলে ব্রহ্মের সগুণত্বই অসিদ্ধ হইবে। কারণ দয়া প্রভৃতি সমস্তগুণাবলী অনিত্য জগতের অন্তর্গত বলিয়া তাদৃশগুণশালী ভগবান ও অনিত্য হইয়া পড়েন। সুতরাং আচার্য্য রামানুজের মতে জীব জগত প্রভৃতি সমস্তই নিত্য।

জাতির জাত

অনাদি কুমার লাহিড়ী

'ভাবে'র (concept) মাধ্যমেই ধারণা বা চিন্তা সম্ভবপর হয়। অবশ্য এই উক্তির দ্বারা আমরা অচিন্তিতভাবে 'ভাব'কে চিন্তার অতি প্রাথমিক রূপ হিসাবে স্বীকৃতিদান করছি না। 'মনোবিজ্ঞানে'র বা 'তর্কবিজ্ঞানে'র যে চিন্তা—তাহাদের ভিত্তিরূপ কি, সেই বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে এক সুতীব্র মতভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু ইহা অনস্বীকার্য্য যে, 'ভাব'-সকল অন্ততঃপক্ষে বিধেয় আকারেও ভাবনা-সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়। ধারণা-গঠনের প্রক্রিয়াও ভাবনারাশি ব্যতীত অসম্ভব হইয়া পড়ে। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধারণা-গঠনের প্রক্রিয়া কিরূপ—সে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু নয়। ধারণার বিষয় বা 'ভাব' সম্পর্কেই এক গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। আমরা সচরাচর প্রশ্ন করিয়া থাকি: "ভাব কিসের দ্যোতক? আমরা যখন ধারণা পোষন করি, তখন সেই ধারণার দ্বারা কি বুঝিয়া থাকি?" 'ধারণা' বা 'সাধারণ নামে'র পারিভাষিক শব্দ হইল এ্যারিষ্টট্‌ল্‌ ব্যবহৃত 'ইউনিভার্সাল' বা 'জাতি'। এই 'জাতি'র স্বরূপ ও মর্য্যাদা সম্পর্কেই আমাদের প্রধান সমস্যা আত্মপ্রকাশ করে। দর্শনের ইতিহাসে এই সমস্যার নানাবিধ সমাধান লক্ষ্য করা যায়। সমাধানের বৈচিত্র্যের জন্যই আমাদের স্বকীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে 'জাতি'র প্রকৃতি সম্পর্কে এক নিরপেক্ষ বিচার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। এখন দেখা যাক্ যখন আমরা 'মনুষ্য' এই 'ভাব' বা প্রত্যয়টি ব্যবহার করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা কি বুঝি? বাচ্যার্থের দিক হইতে দেখিলে, এই পদটি 'সকল মানুষ' বা 'মনুষ্য জাতির কোন একজন'কেই সূচিত করে। আর লক্ষ্যার্থের কথা ধরিলে, এই পদের দ্বারা 'মনুষ্যত্ব' (অর্থাৎ প্রাণীধর্ম্ম+বিচারশীলতা)—এই ধর্ম্ম বুঝায়—অবশ্য বাস্তব চিন্তায় এই ধর্ম্ম, ব্যক্তি মানুষের বিশেষ কয়েকটি ধর্ম্মের সংযোগে অস্পষ্ট আকারে আবির্ভূত হয়। প্রত্যয়ের সাহায্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি-বিশেষকে যে বাস্তবভাবে এক এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহার দ্বারা ইহাই প্রায় প্রমাণিত হয় যে, ব্যক্তি সকলের দ্বারা সংগঠিত শ্রেণীর মধ্যে এক অদ্বয় কিছু উপস্থিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'মনুষ্য জাতি' অর্থে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল মানুষের মধ্যে উপস্থিত অদ্বয় কোন কিছুকেই বুঝায়। 'আদর্শ' বা 'অদ্বয় মনুষ্য'

বলিতে আমরা পরিমাণসূচক এরূপ কোন কিছু বুঝি না যাহা বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মাত্রায় ধারণ করে। কারণ পরিমাণসূচক কোন বস্তুর পক্ষে, অসংখ্য ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে একই কালে ও একই আকারে বর্ত্তমান থাকিয়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বস্বরূপাবস্থিত থাকার সার্ব্বিক জাতি-ধর্ম্মটি রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়। জাতি যেরূপ বিশেষ দেশ-সকল ও কাল-সকলের উর্দ্ধে স্বীয় সত্তা বজায় রাখে। সুসদৃশ পরিমাণবাচক কোন পদার্থের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নয়। কোন এক শ্রেণীগত যে নানা ব্যক্তি-বিশেষ একই নামে অভিহিত হয়—তাহা জাতির গুণগত প্রভেদের দ্বারাও ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ এই কল্পনা জাতির অদ্বয় স্বরূপের পক্ষে হানিকর। অর্থ অনুসারেই ইহা স্বীকার্য্য যে, 'জাতি' তাহার অভ্যন্তরে কোন পরিবর্ত্তন ধারণ করে না। শ্রেণীর অন্তর্গত সকল ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও জাতি তাহার স্বীয় ঐক্য ও স্বরূপ ক্ষুণ্ণ করে না। অতএব এই জাতি এরূপ এক পদার্থ যাহা —অনেকের মধ্যে সমবেত হইবার অনুপযোগী বিশুদ্ধ একও নহে আবার বিশুদ্ধ বহুও নয়—কিন্তু ইহা বহুর মধ্যে এক।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, জাতির স্বরূপ ও মর্য্যাদা সম্পর্কে দার্শনিকগণ একমত নহেন। স্ব-স্বরূপাবস্থিত জাতি সকলের সঠিক প্রকৃতি-সম্পর্কে বিভিন্ন মত বস্তুবাদ, নামবাদ ও ভাববাদ অভিহিত সুপ্রসিদ্ধ মতবাদ-গুলির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে বর্ত্তমান সম্পর্কের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তাশীলদের যে মতের পার্থক্য তাহা বিমূর্ত্ত জাতিবাদ ও সমূর্ত্ত জাতিবাদের মাধ্যমে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। উপরিউক্ত সকল মতবাদ, মত-পোষনকারী দার্শনিকগণের বিভিন্নতার জন্য, দর্শনের ইতিহাসে এক ভাবে আবির্ভূত হয় না। সেই কারনে, আমরা এই সকল মতবাদের নানাবিধ ভাষ্য দেখি। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, এ্যারিষ্টট্‌লের সমূর্ত্ত জাতিবাদ (যদি উহাকে ঐরূপ অভিহিত করা যায়) হেগেলীয় ও বিশেষভাবে বোসাঙ্কে-প্রমুখ নয়া হেগেলী-সমূর্ত্ত জাতিবাদ হইতে অনেকাংশে পৃথক। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা যায় যে, জাতিবাদের বিমূর্ত্ত বিভাগ, জাতির স্বরূপ-সম্পর্কীয় তিনটি মতবাদ (অর্থাৎ বস্তুবাদ, নামবাদও ভাববাদ) হইতে সুদূর নয়। মোটামুটিভাবে বলিলে, জাতির স্বরূপ সম্পর্কীয় বস্তুবাদও ভাববাদের বিভাগেই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। নামবাদকে কিন্তু সঠিকভাবে বিমূর্ত্ত জাতিবাদ বা সমূর্ত্ত জাতিবাদের কোনটিরই অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। উহা দুইটি বিভাগের মধ্যবর্ত্তী এক মতবাদ রূপে দেখা দেয়। আবার, সমূর্ত্ত জাতিবাদের মতবাদ উহার প্রাচীন অর্থের আরিস্ততলীয় মতবাদ অর্থাৎ বস্তুবাদ হইতে অনেক পৃথক। অবশ্য বস্তুবাদকে এক নূতন অর্থে অভিজ্ঞতা

বাদের উপর ভিত্তি করিলে, আধুনিক সমূর্ত্তজাতি বাদকে বস্তুবাদ বলা যাইতে পারে; যদিও প্রমাণ-শাস্ত্র অনুসারে ইহা ভাববাদেরই অঙ্গীভূত। যাই হউক, জাতিসম্পর্কীয় জটিল সমস্যার বিভিন্ন সমাধানের বিচার প্রসঙ্গে, আমরা প্রথমে বস্তুবাদ ও ভাববাদের বিভিন্ন মতের আলোচনা করিব। তাহার পর, বিমূর্ত্তজাতি-বাদের বিরোধী সমূর্ত্তজাতি-বাদের আলোচনা করিয়া পরিশেষে, জাতির প্রয়োগ, প্রয়োজনীয়তা ও আপেক্ষিক স্বরূপ সম্পর্কে কতকগুলি সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান বিচার করিতে হইবে।

জাতির স্বরূপ সম্পর্কীত বস্তুবাদের স্রষ্টা ও বলিষ্ঠ প্রচারকারী হিসেবে আমরা প্লেটোর নাম করিতে পারি। জাতির সাধারণ স্বীকৃত অর্থ যদি দাঁড়ায় 'বহুর মধ্যে এক' বা 'ভেদের মধ্যে ঐক্য,' তবে প্লেটো 'বহু' বা 'ভেদের' দিক উপেক্ষা করিয়া 'এক' বা 'ঐক্যে'র দিকের উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। 'ভাব' বা 'আকার' ('Eidos') নামধেয় জাতি, তাঁহার মতে, তদধীনস্থ সকল ব্যক্তি বিশেষের অতীতভাবে স্ব-সত্তা বজায় রাখে। কোন শ্রেণীর সকল সময়ের সকল ব্যক্তি বিশেষের সাধারণ, সার-সত্তা হিসাবে এই 'আকার' ('form') সর্ব্ব কালের ঊর্ধে, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, অমর এবং বাস্তব হিসাবে বিরাজমান থাকে। ব্যক্তি-মানুষ জন্মগ্রহণ করে ও মৃত্যুলাভ করে কিন্তু 'মনুষ্য' 'আকার' নিত্য বিরাজিত থাকে। প্লেটোর মতে অ-পরিণামী অমর ও সারবান আকার সমূহের জগৎই, তত্ত্বের বা সত্যের জগৎ। ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তু সকলের জগৎ—এই 'আকার'—সম্বলিত জগতেরই সত্তা **অনুকরণ** করিয়া বা তাহার **অংশীদার** হইয়া এক ছায়া-—সত্য বা অর্দ্ধসত্য লাভ করে। 'আকার' ও তদধীনস্থ 'ব্যক্তি—বিশেষের সম্পর্ক প্লেটোর দর্শনে দুই বিভিন্ন উপায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

(১) এক মতানুসারে, শ্রেণীগত ব্যক্তি-বিশেষগুলি শ্রেণীর 'আকার'কে **অনুকরণ** ('mimic') করে; (২) দ্বিতীয় মতানুসারে, শ্রেণীগত ব্যক্তি সকল শ্রেণী 'আকারের' **অংশীদার** হয়। প্রথম মত যেরূপ প্লেটোকে অতীন্দ্রিয়বাদের অভিমুখে লইয়া চলে; দ্বিতীয় মতটি সেইরূপ তাঁহাকে এ্যারিষ্টটলের নিকটবর্ত্তী করে। প্রথমটি 'আকার'গুলির সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়াতিরিক্ততার পক্ষ সমর্থন করে; কিন্তু দ্বিতীয়টি, ব্যক্তি-বিশেষগুলির মধ্যে 'আকারের' কিছু পরিমাণ অন্তর্ভুক্তি স্বীকার করে। প্লেটোনীয় অনুসন্ধিৎসু সম্প্রদায়ের এক তীব্র বিতর্কের বিষয় হইল যে, প্লেটোর 'ভাব' বা জাতি সকলের ইন্দ্রিয়াগম্যতার পক্ষপাতী ছিলেন না,-তাহাদের বিষয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্তি ও পরা-স্থিতি এতদুভয়েরই সমর্থনকারী ছিলেন। কয়েকজন সম্প্রদায়-ভুক্ত দার্শনিক প্লেটোনীয় জাতিবাদের মধ্যে

হেগেলীয় সুর লক্ষ্য করেন ; অপর কয়েকজন প্লেটোকে মরমী ও অতীন্দ্রিয়বাদীদের মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাঁহাকে নয়া-প্লেটোনীয়দের অগ্রণী হিসাবে তুলিয়া ধরেন। শেষোক্ত মতটিই, অবশ্য প্লেটোনীয় মতবাদের যুক্তিযুক্ত ভাষ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই ব্যাখ্যা প্লেটোর মতবাদকে এক বৈশিষ্ট্য দান করে বলিয়া আমরা ইহারই আলোকে প্লেটোর জাতিসম্পর্কীয় চিন্তাধারার আলোচনা করিব। পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যান-অনুসারে প্লেটোর মত স্বকীয়তা হারাইয়া নৈয়ায়িক মতেরই প্রতিধ্বনি-স্বরূপ হইয়া পড়ে ; আর সেই অবস্থায় ঐ মতের পৃথক্ বিবেচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়াই বোধ হয়।

সমালোচনা : প্লেটোর 'বস্তুবাদ' ('Universalia ante rem') দুইটি সমাধান-অযোগ্য গুরুতর সমস্যা উপস্থাপিত করে। সেই কারণে, এই মতবাদ গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে না।—সমস্যা দুইটি এই :—(১) প্লেটোনীয় বস্তুবাদে আকারগুলির প্রকৃত স্থান আমাদের নিকট বোধগম্য হয় না। ইন্দ্রিয়-গোচরীভূত বস্তুসকলের সহিত বিসদৃশ ও ব্যতিরিক্তভাবে 'আকার' বা জাতিগুলির যে অন্যত্র অবস্থানের মত প্লেটো পোষণ করেন—তাহা অতীন্দ্রিয়বাদের পর্যায়েই পড়ে। প্লেটোনীয় দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া কেহ জাতি-সকলের ঐরূপ অস্তিত্বের কথা বিশেষ বোধির সাহায্যে উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু সম্পূর্ণ বুদ্ধির আলোকে 'আকার' গুলির উপর নিরালম্ব সারবত্তা প্রযুক্ত করা ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। 'রিপাব্লিকে' প্রদর্শিত 'কন্দর—উপমা'টির দ্বারা 'আকার, গুলির রহস্যময় (ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তুসমূহের সহিত) সম্পর্কশূণ্যতা ও অতীন্দ্রিয় স্বাবলম্বন বিশেষভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

(২) প্লেটোর বস্তুবাদে 'আকার' সমূহ ও ব্যক্তি সকলের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক কী প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে তাহা বুদ্ধির অগম্য। এই বিষয়টি কেবলমাত্র প্লেটোর জাতিবাদের নহে—তাঁহার সমগ্র দার্শনিক মতবাদেরই এক দুর্ব্বলতা সূচিত করে। মহামতি এ্যারিষ্টটল্ দেখাইয়াছেন যে, প্লেটোর জাতিবাদের যে মত অনুসারে, কোন শ্রেণীগত ব্যক্তি-সকল শ্রেণী-আকারের **অনুকরণ** করে এবং তাহার দ্বারা অপর এক শ্রেণীর ইঙ্গিত করে—তাহাতে 'তৃতীয়-ব্যক্তি'র অসুবিধা আসিয়া পড়ে অসুবিধাটি এইভাবে আত্ম-প্রকাশ করে :—

'ব্যক্তি-বিশেষ' ও 'আকারের' মধ্যে বর্ত্তমান কোন সাদৃশ্য-হেতু, সকল ব্যক্তি-মানুষ (উদাহরণ-স্বরূপ) 'মনুষ্য'-আকারকে (ধরা যাক ইহা 'ম১') অনুকরণ করে। অতএব বলা যায় যে, দ্বিতীয় মনুষ্য 'আকারে' (ধরা যাক ইহা'ম২') উপস্থিতি বা অস্তিত্বের বলে,

প্রথমটি (অর্থাৎ $ম_১$,) অসংখ্য ব্যক্তি-মানুষের (ধরা যাক, $মা_১$, $মা_২$ $মা_৩$, ······$মা_ন$) দ্বারা অনুকরণযোগ্য হয়।

এইরূপে, তৃতীয় ব্যক্তি ($ম_২$)ব্যক্তি-মানুষ ও 'মনুষ্য' আকারের মধ্যে আসিয়া পড়ে কিন্তু অসুবিধার নিস্পত্তি এইখানে নয়। ব্যক্তি-মানুষ—ধরা যাক '$মা_১$ ' ও দ্বিতীয় মনুষ্য আকার, ধরা যাক' $ম_২$ ' —ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত উপায়ে তৃতীয় 'মনুষ্য' আকার, অর্থাৎ '$ম_৩$ ' আসিয়া পড়ে। এই প্রক্রিয়ায় অনবস্থা—দোষের প্রসক্তি হয়; এবং তাহার ফলে, 'ব্যক্তি' ও আকারের মেলক অনুকরণ-রূপ সম্পর্কের ধারণায় যে ত্রুটি অন্তর্নিহিত থাকে, তাহা সহজভাবে প্রকাশিত হয়।

যদিও আরিষ্টটলের মতে, 'জাতি' সকল ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যেই নিহিত থাকে এবং ব্যক্তি-সত্তাতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করেনা; তবুও তাঁহার জাতি-বাদকে বস্তু-বাদেরই এক ভিন্নরূপ বলা যায়। প্রমাদ বশতঃ তাঁহাকে প্লেটোর মত হইতে যত দূরে লইয়া যাওয়া হয়, প্রকৃতপক্ষে, তিনি তত দূরবর্ত্তী নহেন। তিনি 'জাতিকে' ব্যক্তি-বিশেষ হইতে বিশিষ্টভাবে এক অদ্বয় সারবত্তা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁহার 'জাতি' ও এক স্বীয়-সত্তা উপভোগ করে। যদিও এই সত্তা ব্যক্তি-বিশেষের সত্তার সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকে। প্লেটোনীয় 'আকারের' ন্যায় আরিস্ততলীয় 'জাতি' সর্ব্ব কাল ও দেশের অতীত নহে এবং সেই কারণে নিত্য ও নহে। শ্রেণীগত ব্যক্তি-সকল যদি কালের আওতায় নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবে শ্রেণীর জাতি ও অস্তিত্বহীন হইয়া পড়িবে। আরিষ্টটলের মতে 'আকার' ও বস্তু পরস্পর-সাপেক্ষ নহে। 'আকার' বস্তুর অন্তঃসার সূচিত করে। এইভাবে ব্যাখ্যাত হইলে, এ্যারিষ্টটলের জাতি-বাদ, প্লেটোর বস্তুবাদ ও লকের ধারণাবাদের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। আবার এই ভাষ্য অনুসারে, আরিষ্টটলের জাতি-বাদ প্লেটোনীয় মতবাদের বিরুদ্ধে আনীত দুইটি সমালোচনারই লক্ষ্য হইয়া পড়ে—যদিও, এই মতের বিশেষ উৎকর্ষের জন্য সমালোচনা দুইটী এই ক্ষেত্রে অনেকখানি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যদি সকল ব্যক্তি-বিশেষের অন্তর্নিহিত জাতি তাহার অদ্বয় সারবত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাহার পৃথক স্থিতি বজায় রাখে, তবে সেই জাতির প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণ বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় না। আবার, সেই জাতি ও ব্যক্তি-বিশেষের সম্পর্কটিও দোষযুক্ত না হইলেও ধারণাযোগ্য হয় না। অতএব, আরিস্ততলীয় জাতি-বাদ পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করা চলে না।

আধুনিককালে, বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল্ 'জাতি'-সম্পর্কীয় মতবাদ হিসাবে একপ্রকার বস্তু-বাদ উপস্থাপিত করিয়াছেন। যদিও দার্শনিক মতবাদ অনুযায়ী তিনি আদর্শবাদীর

বিরোধী বস্তুবাদী, তথাপি তিনি বিশেষ্য পদ ও কতকগুলি ব্যাপকাকার সম্পর্ক—(বিশেষতঃ পদার্থ-বাচক) সম্বলিত জাতিসমূহকে দেশ ও কালের অতীত, নিত্য-স্থিতি উপভোগকারী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। 'পূর্ব্ব,' 'পশ্চাৎ,' 'উত্তরদিকে'—প্রভৃতি সম্পর্ক-সকল ব্যক্তি-বিশেষের উপর প্রযোজ্য হইলেও, স্বীয় স্বরূপে তাহার পরিচ্ছিন্ন দেশ কালের অতীত অবস্থায় বিরাজ করে। কোন এক বিশেষ স্থান একই কালে কোন কিছুর 'উত্তরদিকে' অবস্থিত থাকিতে পারে আবার অপর কিছুর 'দক্ষিণদিকে'ও অবস্থিত থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার দ্বারা দেশীয় সম্পর্কগুলির অনাপেক্ষিক স্বীয় অর্থের বা সত্তার কোন পরিবর্ত্তন হয় না। স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে তাহারা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অর্থ বহন করে।

রাসেলীয় 'জাতি'বাদও সম্পূর্ণ স্বীকার্য্য নয়। চরম বস্তু-বাদী হিসাবে, রাসেল 'জাতি'-সমূহের আত্ম-মুখ অভিজ্ঞতা-পূর্ব্বিতা স্বীকার করিতে পারেন না। আবার, কতিপয় অভিজ্ঞতা-বাদীর এই মতও গ্রহণ করেন না যে, জাতিগুলি ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-রাশি হইতে বিমূর্ত্তন ও সামান্যী-করণের ফলে উদ্ভূত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ব্যক্তি—অভিজ্ঞতার অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্যই তিনি জাতিগুলিকে ভাবাবস্থিতির ('Subsistence') আকারে স্ব-নির্ভর রূপ দান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বাস্তব ঘটনাকে রহস্যময় ও 'বলিষ্ঠ বাস্তবতা'র পরিপন্থী করিয়া তুলে; অথচ যৌক্তিক বিশ্লেষণে এই বলিষ্ঠ বাস্তবতার একান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা রাসেল্ স্বয়ং 'গাণিতিক দর্শনের ভূমিকা' গ্রন্থে 'বর্ণনা'র অধ্যায়ে বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'জাতি'-সম্পর্কীয় সমস্যার আলোচনাকারী ভারতীয় চিন্ত-শীলগণের মধ্যে বস্তু-বাদের অধিবক্তা হিসাবে নৈয়ায়িকরাই সর্ব্ব-প্রধান। নৈয়ায়িক বস্তুবাদের সহিত প্লেটোনীয় বস্তুবাদের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষনীয়। এই সম্প্রদায়ের মতে জাতি হইল এমন এক জ্ঞেয় পদার্থ যাহা বহু ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বকীয় সত্তায় নিত্যভাবে অবস্থান করে ('নিত্যত্বে সতি অনেক-সমবেতত্বম্ সামান্যত্বম্')। জাতি-সকল ব্যক্তি-বিশেষ সমূহের এরূপ সার প্রকৃতি—যাহা ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজ অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে। উদাহরণ স্বরূপ, 'ঘটত্ব'-জাতি সকল ঘট-বিশেষে ওতপ্রোত-ভাবে বিজড়িত থাকে, অথচ স্বকীয় স্বাধীন সত্তাও বজায় রাখে। জাতি-সমূহের স্বকীয় সত্তা (পৃথক্‌সত্তা) আছে, কিন্তু তাহাদের 'সত্তা' জাতির সহিত সংযুক্ত ('সত্তা যোগেন') কোন সত্তা নাই। আবার, ব্যাপ্যতাধর্ম্মী শ্রেণী-বিন্যাস অনুসারে, ন্যায়-দর্শনে জাতি-সকলকে তিন স্তরে সাজানো হইয়াছে। 'ঘটত্ব,' পটত্বা'দি ক্ষুদ্রতম জাতি-সকল ('অপরা জাতি') সাময়িক বস্তু-সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে। মধ্যবর্ত্তী পর্য্যায়ে

পড়ে—'দ্রব্যত্ব,' 'গুণত্বা'দি জাতি সকল (পরাপরা জাতি); এইগুলি এক এক পদার্থের অন্তর্গত বস্তুর মধ্যে সমবেত থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত জাতিগুলি অপেক্ষা এইগুলি অধিকতর ব্যাপক ও সংগঠনকারী। সর্ব্ব-বৃহৎ বা সর্ব্ব-ব্যাপক জাতি (পরা জাতি) হইল সত্তাজাতি ('সত্তা বা 'ভাবত্ব') ;—ইহা সকল দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে। দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া—এই তিন পদার্থেরই কেবল জাতি সম্ভবপর। নৈয়ায়িকগণ দেখান যে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে কোন জাতির কল্পনা সম্ভব নয় :—

(১) 'আকাশে'র ন্যায় কোন 'জাতি' সম্ভব নয়; কারন 'আকাশ' সদৃশ আর আর কোন সর্ব্ব-ব্যাপক বস্তু নাই যাহার দ্বারা কোন 'জাতি'-কল্পনা সম্ভব হইতে পারে। এই অদ্বিতীয় ব্যক্তি স্বস্বরূপাবস্থিত এবং ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর কোন বিষয়ের অধীনস্থ হইতে পারে না। (২) কেবলমাত্র সাদৃশ্যও কোন জাতি ধারণ করিতে পারে না। (৩) আবার, একই বা সম পর্য্যায়ের বস্তু-সকলের মধ্যে একাধিক জাতি-কল্পনা করিলে 'সঙ্কর', দোষের প্রসক্তি হয়। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা লক্ষ্য করিতে পারি যে, ক্ষিতি, অপ্ (বা জল), তেজ ও মরুৎ (বা বায়ু)—এই চারিটি ভূত পদার্থ 'ভূতত্ব' ও মূর্ত্তত্ব—দুইই প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সেই কারণে তাহারা দুইটি জাতি ধারণ করিতে পারে না। কারণ তাহাদের দুইটি জাতি-কল্পনা করিলে মিশ্র-বিভাগ দোষের উপপত্তি হয়। আকাশে 'ভূতত্ব' আছে, 'মূর্ত্তত্ব' নাই—আর 'মনে' মূর্ত্তত্ব থাকিলেও 'ভূতত্ব' নাই। (৪) বিশেষ রূপে, পরমাণুতে জাতি কল্পনা করা যায় না। কারণ পরমাণুগুলির 'জাতি' কল্পনায় তাহাদের বৈশিষ্ট্য-ধর্ম্মী সার-ভাবের বিলোপ-সাধন করা হয় ('রূপহানি)। (৫) সমবায় সম্বন্ধ স্বয়ং নিত্য ও ব্যাপক বলিয়া তাহারও কোন জাতি থাকিতে পারে না ('সমবায়ত্বম্ নিত্য সম্বন্ধত্বম্) (৬) নঞর্থক 'অভাব' পদার্থেরও জাতি নাই। (৭) পরিশেষে, বলা যায় যে জাতি সকলের জাতি-কল্পনা কষ্ট-কল্পনা মাত্র। কারণ, 'জাতির জাতি' চিন্তায় অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি-দুইটিতে নব-সংযোজিত 'অভাব' পদার্থ ব্যতীত অবশিষ্ট জাতি-বাধকগুলি উল্লিখিত হইয়াছে—

"ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতি।
রূপহানিরসম্বন্ধোজাতে বাধক-সংগ্রহঃ॥" (কিরণাবলী)

নৈয়ায়িক জাতি-বাদের মধ্যে ন্যায়-দর্শনের যে মূলতত্ত্ব—অর্থাৎ অভিধেয়মাত্রেই জ্ঞেয় এবং জ্ঞেয় পদার্থসকল স্বীয় স্বরূপেই অস্তিত্বশীল—তাহা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। ব্যক্তি-বিশেষের সহিত সম্পর্কের প্রতি উদাসীন থাকিয়াও 'জাতি' নিত্য স্বস্বরূপাবস্থিতি উপভোগ করে। জাতির এইরূপ কল্পনায় আমরা এরূপ এক অতীন্দ্রিয়-বাদের পরিচয়

পাই যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বস্তু-সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বোধগম্য করা যায় না। নিত্য জাতি-সকল কিভাবে অনিত্য বিষয়-সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকে—এই প্রশ্নের উত্তরও সহজে পাওয়া যায়না। অতীন্দ্রিয়-বাদের যাঁহারা একান্ত বিরোধী-তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবেননা যে অসংখ্য, নিত্য জাতি-সকলের এক বিশেষ জগৎ আছে এবং জাতি-সকলের অন্তর্বর্ত্তী অচিন্ত্য সম্পর্ক-সকল বর্ত্তমান।

এখন আমাদের বিচার করিতে হইবে যে অতীন্দ্রিয় জাতি-বাদের সকল প্রকারেই 'তৃতীয় ব্যক্তির অসুবিধা' সংশ্লিষ্ট থাকে কিনা। পূর্বেই দেখা হইয়াছে যে, ব্যক্তি-সকল 'আকারে'র অনুকরণ করে—প্লেটোর এই যে বস্তুবাদ—তাহাতেই উক্ত অসুবিধাটি সুপ্রকট। নৈয়ায়িক জাতিবাদকে এক প্রকার 'অতীন্দ্রিয়-বাদ' বলা যাইলেও, তাহাতে ঐ অসুবিধা অনুপস্থিত। ন্যায়মতে, ব্যক্তিবিশেষগুলিতে সমবেত জাতির অস্তিত্ব ব্যতীত ব্যক্তি-সকল স্বীয় সত্তা বজায় রাখিতে পারে না। ইহার বিপরীত ব্যাপার, কিন্তু, সত্য নয়। 'সমবায়' সম্বন্ধটি এক অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ইহার বর্জ্জনে সম্পর্কের অন্ততঃ একটি পদ বিনষ্ট হয়। অতএব জাতি ও ব্যক্তির মধ্যবর্ত্তী সম্পর্ক বিষয়ে ন্যায়-মতানুসারে, উভয়ের মধ্যে কোন তৃতীয় পদের উপপত্তি সম্ভব নয়। কিন্তু, এইভাবে যদিও 'তৃতীয় ব্যক্তির অসুবিধা' নিরস্ত করা যায়, পূর্ব্বোক্ত অন্য অসুবিধা নৈয়ায়িক জাতি-বাদের সম্মুখীন হয়। কিভাবে কোন এক 'জাতি' নিত্যভাবে তুরীয়-সত্তা ভোগ করিয়া একই কালে ব্যক্তি-সকলে ব্যাপ্ত বা অধিষ্ঠিত থাকে—তাহা সহজগ্রাহ্য নয়।

এতএব ইহা লক্ষনীয় যে, জাতি-সম্পর্কীয় বস্তু-বাদের বিভিন্নরূপে যে সকল বিশেষ অসুবিধা অধিষ্ঠিত থাকুক না কেন, তাহাদের মধ্যে যে সাধারণ অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়, সেইগুলি নিম্নোদ্ধৃত দুইটি বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত করা যায়:—(১) জাতি-সকলের অতীন্দ্রিয় স্বরূপাবস্থিতি; (২) 'জাতি' ও 'ব্যক্তি'র মধ্যবর্ত্তী সম্পর্কের সঠিক প্রকৃতি। সকল প্রকার বস্তু-বাদে এই দুই অমীমাংসিত সমস্যা থাকার জন্যে, আমরা জাতির প্রকৃতি-সম্পর্কীয় বস্তু-বাদকে জাতিবাদের সঠিক ব্যাখ্যা হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি না। 'জাতি'-বাদ হিসাবে 'নাম'-বাদ—বস্তু-বাদের পরিপন্থী। এই 'নাম'-বাদের নানা ভাষ্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহার সাধারণ অর্থ এই যে, জাতি-সকল, অন্বয়-বস্তু-সত্তা-হীন নাম মাত্র; আর এই নামগুলির প্রাতি-সঙ্গিক পরস্পর পৃথক ব্যক্তি বিশেষ মাত্র জগতে বর্ত্তমান। তথা-কথিত জাতিগুলি কেবল সাধারণ পদমাত্র। উদাহরণ-স্বরূপ, 'মনুষ্য'-প্রত্যয়টি এক নামমাত্র—ইহার প্রতিসঙ্গ হিসাবে পাওয়া যায় অসংখ্য ব্যক্তি-মানুষ। 'মনুষ্য'-পদের দ্বারা বেশীপক্ষে 'সকল মানুষ' বুঝায়। নরম-পন্থী নাম-বাদ অনুসারে, বিষয়-মুখ হিসাবে

'জাতি' বলিতে বুঝা যায় এক অস্পষ্ট শ্রেণী-সংস্থান ;—আর শ্রেণী গঠন হয় কতকগুলি বিশিষ্ট চিহ্নের সাহায্যে যাহাদ্বারা কোন এক শ্রেণীকে অপরাপর শ্রেণী হইতে বিবিক্ত করা যায়। ব্যক্তি বিশেষের মধ্যস্থিত কোন সার-সত্তার অস্তিত্ব নাম-বাদ স্বীকার করে না। আধুনিক নাম-বাদী চিন্তাশীলদের অগ্রণী হোব্‌স্‌ জাতি-সকলকে সাধারণ নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়াছিলেন। বার্কলে প্রথমাবস্থায় মনাতিরিক্ত বিষয় সকলের অস্তিত্ব সম্পর্ক সন্দিহান হইয়া মন ও আত্মিক ভাব সকলের অস্তিত্বই স্বীকার করিয়াছিলেন ; সেই অবস্থায় তিনি জাতিগুলিকে আত্মিক ভাব-সমূহের সহিতই একীভূত করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী অবস্থায় ঈশ্বর-স্বীকারের মাধ্যমে—সকল বস্তু-সত্তাকে ঈশ্বর প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল করাইলে, বার্কলের নাম-বাদের স্বরূপ কিরূপ থাকে—তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয়। বার্কলের দর্শনের সঠিক সমালোচনা অনেকে করেন না। এই কারণে তাঁহার উপর আত্ম-মুখীনতা প্রভৃতি কতকগুলি অযৌক্তিক অভিযোগ চাপানো হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বার্কালের নাম-বাদ কখনই চরমপন্থী হইতে পারে না। তিনি ভাব ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করাইয়া কাল্পনিক বস্তু-বাদকে (Materialism অবৈধ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অতএব তাঁহার 'নাম-বাদ' প্রকৃতভাবে প্রতিচ্ছবি-বাদের প্রয়োজনীয়তা দেখায়। অবশ্য এই মতবাদও স্বীকার্য নহে। দর্শনেতিহাসে বার্কলের পর চরম-পন্থী নামবাদী হিউমের আবির্ভাব হয়। তাঁহার 'মনোবিজ্ঞানী পরমাণু বাদে'র মূল ধারণাই তাঁহাকে জাতি হিসাবে বিষয়-গত সাধারণ অস্তিত্বশীল সার পদার্থ স্বীকারে বাধা দেয়। 'অভিজ্ঞতা-মূল যুক্তি-বিজ্ঞানের মনো-বিজ্ঞানী ভিত্তি' হইল ভাবানুষঙ্গের নীতি ; এই নীতি-অনুসারে, ব্যক্তি-বিশেষ ও পরমাণু-প্রকৃতি-বিশিষ্ট মানসিক বিষয়-সকলের সম্মিলনেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়।' হিউম্‌ যেরূপ ইন্দ্রিয়-প্রভাব ও অস্পষ্ট ধারণা-সমূহকে ইন্দ্রিয়-পরিচালিত ও বিশিষ্ট হিসাবে গ্রহণ করেন, প্রত্যয়গুলিকে সেইরূপ তিনি অস্পষ্ট প্রতিরূপ হিসাবেই স্বীকার করেন। সকল সাধারণ নীতিকেই তিনি 'প্রথাসিদ্ধ-সংযোজন' হিসাবে এবং কার্য-কারণ সম্পর্ক ও সামান্যাদি বিষয়গুলিকে 'অনুষঙ্গনীতির' সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু যেহেতু যুক্তি ও অভিজ্ঞতা এতদুভয়ের ভিত্তিতেই জড় ভাবানুষঙ্গনীতি বিশেষ প্রমাদ-পূর্ণ ও অস্বীকার্য্য বলিয়া দেখা দিয়াছে—অতএব হিউমের যে নাম-বাদ পরিশেষে এই নীতির উপর ভিত্তি-মূল করা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বর্জন করা যায়। অভিজ্ঞতা-মূল অনুষঙ্গের নীতিকে সমালোচনা করিয়া ব্র্যাড্‌লে এই বিশেষ তথ্য পেশ করিয়াছেন যে 'সকল অনুষঙ্গই জাতি-সমূহের অনুষঙ্গ' (মেৎস্‌)। ব্র্যাড্‌লের 'ভাবনা-বাদ' হিউমের 'নাম-বাদকে' প্রায় বিনষ্ট করিয়াছে।

হ্যামিল্‌টন্‌ ও হিউমের প্রতিরূপ বাদ-ভাবনা-সমূহের ও তদন্তর্গত সাধারণ ভাব-রাশির যৌক্তিক স্বরূপ-গ্রহণের পথে অন্তরায়-স্বরূপ ছিল। ভাবনা-সম্পর্কীয় আধুনিক মত সেই বাধা অপসারিত করিয়াছে।

যুক্তি-বিজ্ঞানী কুক্‌ উইল্‌সন্‌ ও মনোবিজ্ঞানী স্টাউট্‌ এক চমকপ্রদ নূতন আকারে নাম-বাদের প্রচার করেন। কুক্‌ উইলসন্‌ ভাব-বাদীর সুরে আলোচনা আরম্ভ করিয়া বস্তু-বাদীর স্বীকৃতিতে তাহা সমাপ্ত করেন। তাঁহার মতে, ব্যক্তি বিশেষদ্বারা সংগঠিত নানা শ্রেণী আছে; কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তি-সকলের মধ্যে সুস্পষ্ট বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। স্টাউট্‌ ও উইল্‌সন—উভয়ের মতে ব্যক্তি-সকলের অন্তর্নিহিত তথা-কথিত অদ্বয় সার-বস্তু আর কিছুই নহে—ব্যক্তি-সকলের বিশিষ্ট ধর্ম্মমাত্র। বলা হয় যে দুইটি লোহিত গোলকের লালিমা বস্তুতঃ একই লালিমা নহে। অন্য কিছুর পার্থক্য না থাকিলেও অন্ততঃ দেশের পার্থক্য উভয় লালিমাকে এক লালিমা হিসাবে উপস্থাপিত করে না। এখন উইলসন্‌ 'জাতি-বলিতে ব্যক্তি-সকলের মধ্যে বর্ত্তমান এক সাধারণ সাদৃশ্যের ভিত্তিতে অস্পষ্টভাবে রূপায়িত এক শ্রেণীকে বুঝেন। কিন্তু স্টাউট্‌ যেহেতু সাদৃশ্য-সম্পর্ককে চরম, বিশ্লেষণাযোগ্য ও সরল বলিয়া মনে করেন না, সেইহেতু তিনি তাঁহার স্বীয় বিশ্লেষণে অধিকদূর অগ্রসর হন। তাঁহার মতে, 'ব্যক্তি-সমূহের বণ্টনমূলক ঐক্যের (যাহা সরল ও বিশ্লেষণ অযোগ্য) ভিত্তিতেই 'সাদৃশ্য' বোধগম্য হয়। জাতি বলিতে বুঝায় 'সকলের-মধ্যে-এক'। এই অর্থ সরলতর ও অধিকতর প্রাথমিক কোন অর্থে পর্য্যবসিত করা যায় না। অতএব 'মনুষ্য'-বলিতে বস্তুতঃ বুঝায়—'সকল মানুষের মধ্যে প্রত্যেক মনুষ্য।'

স্টাউটের 'জাতি' বাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভিযোগ এই যে, ইহা জাতির স্বরূপ ব্যাখ্যার নামে, প্রকৃত ব্যাখ্যা এড়াইয়া যায়। জাতি-সম্পর্কীত সমস্যার উদ্ভবই হয় ব্যক্তি সকলের শ্রেণীকরণ বা 'সকলের-মধ্যে-এক' হিসাবে ব্যক্তি-গ্রহণরূপ সমস্যার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে 'সকলের-মধ্যে-এক'—এই প্রত্যয় জাতি-সম্পর্কীত সমস্যার কোন মীমাংসাই নহে; বরং ইহার জাতি-প্রত্যয়-মূল এক অভিজ্ঞতা-ফল মাত্র। অতএব 'জাতি-সমস্যার এক ভুলদিকে ষ্টাউট্‌ আক্রমণ চালাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়।

'জাতি'-সম্পর্কীত সমস্যার সমাধান-কল্পে সাদৃশ্য-প্রত্যয়ের পরিবর্ত্তে 'সকলের মধ্যে-এক'-এর প্রত্যয় ব্যবহার করিয়া, মনে হয়, স্টাডট্‌ এক গুরুতর প্রমাদ করিয়াছেন। স্টউট্‌ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত প্রত্যয়টি আদৌভিত্তি-মূলক ও বিশ্লেষণাযোগ্য

নয়—বরং তাঁহার দ্বারা বিতাড়িত সাদৃশ্য-প্রত্যয়ের উপরই উহা ভিত্তিকৃত। সঙ্গতি—রক্ষাকামী নাম-বাদী হিসাবে ষ্টাউট্ বেশীপক্ষে ইহা বলিতে পারেন যে, ব্যক্তি-সকলের এক এক ধাঁচের মধ্যে সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকায় ব্যক্তি-সকল এক শ্রেণীতে সম্বদ্ধ হয়। 'মানুষ'-নামে অভিহিত সকল মানুষের মধ্যে সাধারণ সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকার জন্যই 'মানুষ'-বলিতে সকল মানুষের একজন' বুঝায়। অতএব ব্যক্তি সকলের শ্রেণী গঠন রূপ সমস্যার আন্তরিক মীমংসা করিতে হইলে নাম-বাদীকে অবশেষে 'সাদৃশ্য'-প্রত্যয়ের উপরই আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু স্টাউট্ জাতি-সম্পর্কীত সমস্যার সমাধানে স্বকীয় বিশ্লেষণে বিশেষ দূর অগ্রসর হইয়া এমন এক 'প্রত্যয়' পরিশেষে উদ্ভাবন করিয়াছেন-যাহা তাঁহার অক্ষমতারই প্রকাশ করে— সেইহেতু আমরা তাঁহার প্রদত্ত মীমাংসাটিকে প্রকৃত নাম-বাদের পর্যায়ে ফেলিতে সন্দিগ্ধ হই। তাঁহার মত-বাদ প্রকৃত-পক্ষে সদর্থক কোন সমাধান না দেখাইয়া ঐ বিষয়ে তাঁহার অজ্ঞতারই প্রকাশ করে।

নাম-বাদ দেখা যায়, যৌক্তিক দৃষ্টবাদ হইতেও স্বাভাবিকভাবে অনুসৃত হয়। এই দৃষ্টবাদ বা প্রত্যক্ষবাদ সকল অপ্রমানিত ও অপ্রমাণযোগ্য প্রত্যয় বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র প্রমাণিত ও প্রমাণ-যোগ্য বিশেষ অভিজ্ঞতা-সমূহের সত্যতা স্বীকার করে। কিন্তু যেহেতু, যে বিজ্ঞানের যাথার্থ্য প্রতিপাদনোদ্দেশে যুক্তি-দৃষ্ট-বাদীরা প্রচুর পরিশ্রম-স্বীকার করেন, সেই বিজ্ঞানেরই গ্রহণের পথে প্রামাণ্য-মতবাদ অন্তরায়-স্বরূপ হয়, সেজন্য এই মতবাদ 'জাতি'-সম্পর্কীয় বস্তু-বাদ ও ধারণা-বাদের কোন ক্ষতি-সাধণ করিতে পারেনা।

ভারতীয় চিন্তা-নায়কগণের মধ্যে বৌদ্ধগণ উল্লেখযোগ্যভাবে এবং রামানুজ-সম্প্রদায় এক প্রকারে নাম-বাদ প্রচার করে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে, জাতি এক মানস কল্পনা ও সত্যের বিকৃতি। এই দর্শনে, জগৎ-সত্যের রূপ হইল—অনুগমন কারী, স্বলক্ষণ, ক্ষণিক ব্যক্তি-বিশেষ বা বিজ্ঞানের এক অশেষ, অবিচ্ছিন্ন সন্তান বা ধারা। অতএব জাতির প্রতিষঙ্গী ভাবে কোন সাধারণ, অদ্বয়, স্থায়ী, সার-পদার্থ কিছু পাওয়া যায়না—পাওয়া যায় মাত্র পরিনামী ব্যক্তি-বিশেষ। বিজ্ঞান-সন্তানে অবস্থিত ব্যক্তি-সকলের সাদৃশ্য-ধর্ম্মের উপপত্তির সাহায্যে বিষয়ের উপর বুদ্ধি-আরোপিত ঐক্য ও অনবচ্ছেদ ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধ ক্ষণভঙ্গ-বাদ যুক্তি-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান উভয়ের দ্বারাই ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া প্রদর্শিত হয়, সেইকারণে ইহার উপর ভিত্তি-স্থাপিত বৌদ্ধ জাতি-বাদও অস্বীকার্য হইয়া পড়ে। মহামতি শঙ্করাচার্য্য সুতীব্র ভাবে

মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অভিজ্ঞতা-সমূহের ঐক্য ও অনবচ্ছেদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য বৌদ্ধ তর্কশাস্ত্রের অবশ্যই কোন অভেদ-সংবলিত সত্তার উপপত্তি করা প্রয়োজন। সাদৃশ্য-পর্য্যবেক্ষক অভিন্ন আত্মা ব্যতীত কেবলমাত্র সাদৃশ্য কিভাবে সদৃশ অভিজ্ঞতার অনবচ্ছিন্ন সন্তান গঠন করে—তাহাও স্পষ্ট নয়। সেই কারণে 'জাতি'-বিষয়ক বৌদ্ধমত আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

রামানুজ-প্রদত্ত 'জাতি'-বাদ এক নূতন ধরণের 'নাম',বাদ উপস্থাপিত করে। তাঁহার মতে, কোন এক জাতি যথা, 'গোত্ব' জাতি-নাম-অভিধেয় কোন ব্যক্তি-বিশেষের 'সংস্থান'কেই বুঝায়। রামানুজের দর্শনে, আমাদের সবিকল্পক যে প্রত্যক্ষ, তাহা কোন শ্রেণীর অন্তর্গত প্রথম-দৃষ্ট এক ব্যক্তি-বিশেষেই 'জাতি'র অস্তিত্ব ঘোষণা করে। আর, জাতির দ্বারা চিহ্নিত যত ব্যক্তি-বিশেষ আমরা প্রত্যক্ষ করিতে থাকি, আমাদের জাতির ধারণাও তত স্পষ্টতর ও নির্দ্দিষ্টতর হইতে থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ, অনেক গরুর প্রত্যক্ষের ফলে, 'গোত্ব'-জাতির ধারণা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপর ভিত্তি স্থাপিত রামানুজীয় 'নাম'বাদ বিশেষ ত্রুটিযুক্ত বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। তাঁহার জাতি-বাদে, তিনি তাঁহার সাধারণ বাস্তব-বাদের প্রবণতাদ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন; আবার, পরমেশ্বরের মধ্যে নানাত্ব ও পরিণাম ধর্ম্মিতা রক্ষার প্রচেষ্টা ও তাঁহার মতবাদের প্ররোচক। সম্ভবতঃ শাঙ্কর মতের সহিত তাঁহার মতের সুস্পষ্ট বিরোধিতা-বশতঃ রামানুজ ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে কোন সাধারণ অপরিণামী, অ-সংশ্লিষ্ট সার-সত্তার অস্তিত্ব স্বীকারে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা ইহা উল্লেখ করিতে পারি যে, কেবল সংস্থান-গত সাদৃশ্য 'জাতি'র স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। এই সাদৃশ্য, ব্যক্তি-সকল-অধিষ্ঠিত 'জাতি' পর্য্যবেক্ষণের পথে আমাদের নিকট মহামূল্য অপরিহার্য্য সহায় হইতে পারে; কিন্তু 'জাতি'-গঠনে বা জাতি পরিচিতিতে ইহা অল্পই সাহায্য করে। সংস্থানগত সাদৃশ্য কোন জাতির এক অচ্ছেদ্য আপতন হইতে পারে। রামানুজীয় মতানুসারে অভিজ্ঞতা-প্রাপ্ত ব্যক্তি বিশেষে জাতি আবিষ্কার—ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সমকালে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি কোন অভিজ্ঞতা-পূর্ব্ব প্রত্যয়ের প্রয়োগমাত্র হইতে পারে। কিন্তু এই প্রকল্প নিঃসন্দেহে রামানুজীয় বিশ্বাসের পরিপন্থী হইবে। তর্কের খাতিরে যদিও ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, 'গোত্ব' জাতি গরু বিশেষের সংস্থানমাত্র—তবুও 'মাতা', 'ঔষধ', 'ন্যায়' ইত্যাদি জাতি সম্পর্কে রামানুজ ব্যক্তি বিশেষের কোন বাহ্য সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করিবেন, —তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আবার, ব্যক্তি-বিশেষের ন্যায় জাতিও যদি পরিচ্ছিন্ন দেশ-

কালের দ্বারা সীমিত হয়, তবে জাতির সার্থকতাই প্রায় চলিয়া যায়। 'জাতি'-গঠনকারী সংস্থানের অভেদ বা সাদৃশ্য বলিতে রামানুজ কি বলিতে চাহেন, তাহাও অস্পষ্ট। ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে যদি প্রতি অবয়বাংশেই পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে, তবে কি ভাবে তিনি কোন অভেদাত্মক বা সদৃশ বাস্তব অংশ দেখাইতে পারেন—তাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। এইস্থলে আমরা ব্র্যাডে্লে প্রদর্শিত ডায়ালেক্‌টিকের সাহায্যে রামানুজের মতবাদ এইভাবে সমালোচনা করিতে পারি :—উভয়-সংকট : সাধারণ সংস্থানের মত এত পরিবর্ত্তনশীল এক পদার্থ কখন জাতি হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না ; আবার এই সাধারণ সংস্থানের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোন পদার্থ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী হইলেও তাহা সংস্থান হিসাবে গ্রহণ-যোগ্য হইতে পারে না। আমরা আরও বলিতে পারি যে, সংস্থানকে জাতি বলিতে, রামানুজ যদি অভিজ্ঞতা-পূর্ব্ব কোন ভাবাকারে রূপায়িত কোন সংস্থান বুঝেন, তবে তাহা—তাঁহার আধিবিদ্যক মতের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ প্রকৃত উদ্দেশ্যের বিরোধী হইবে। রামানুজের মত মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও ভ্রান্ত :—কোন শিশু বহু গরুর সংস্থান অবেক্ষণ করিয়াও গো জাতির প্রকৃত স্বরূপ ক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিতে পারে। গরুর সংস্থান সন্দর্শনে 'গো' পদ ব্যবহার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াও কোন শিশু গো-ত্বের প্রকৃত অর্থ না জানিতে পারে। অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে পূর্ব্বে পরীক্ষিত নামবাদের অন্যান্য রূপ হইতে রামানুজীয় 'নাম'-বাদ কোন অংশে উৎকৃষ্ট নয়।

আমরা ইতোপূর্ব্বে দেখিলাম যে, জাতি সম্পর্কীয় সমস্যার মীমাংসাকল্পে 'নাম'-বাদীরা 'সাদৃশ্য' প্রত্যয়ের উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। অতএব, নামবাদীদের ব্যবহৃত এই ভিত্তিমূলক প্রত্যয়টির স্বরূপ পরীক্ষার প্রয়োজন—বিশেষতঃ যখন এই এই প্রত্যয়ের প্রকৃতি-নির্ণয়ের মাধ্যমেই আমরা 'নাম'-বাদের চরম বিচার করিতে সমর্থ হইব।

'সাদৃশ্য' ধারণা সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা জাজ্জ্বল্যমান প্রশ্ন হইল—'সাদৃশ্য'কে কি সর্ব্বাপেক্ষা ভিত্তিমূলক, বিশ্লেষণাযোগ্য,—ব্যক্তি-সকলের নানা গোষ্ঠীতে বাস্তব-শ্রেণী-করণের ব্যাখ্যানীতি হিসাবে গ্রহণ করা যায় ?'—এই প্রশ্নের উত্তর সহজলভ্য নয়, তবুও আমরা এই উত্তর অন্বেষণ করিয়া দেখিব যে, ইহা নেতিবাচকই হইবে।

ধরা যাক্, 'মানুষ' নামে অভিহিত সকল ব্যক্তি-বিশেষ এরূপ কোন সাদৃশ্য বহন করে—যাহাদ্বারা তাহাদের 'মানুষ' নামে গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়। কিন্তু যেহেতু 'মানুষ'-নামে অভিহিত ব্যক্তি-বিশেষ সকল যে সাদৃশ্য ধারণ করে, তাহা এক বিশেষ ধরণের,—সেই কারণে, তাহার নাম দেওয়া যাক্ 'সা'১। এই যুক্তিতে, গো-গোষ্ঠীর নাম দেওয়া

যাইতে পারে 'সা২', পুস্তক-গোষ্ঠীর—'সা৩'—ইত্যাদি। এখন ইহা স্পষ্ট যে, 'সা১', 'সা২', 'সা৩' 'সা৪'—ইত্যাদি সাদৃশ্য-সকল অভেদাত্মক নয়; কারণ তাহা হইলে, বিভিন্ন গোষ্ঠী করণের কোন অর্থ হয় না। এই সা১, সা২, সা৩, -সা৪'—প্রভৃতি সাদৃশ্য-সকল, সাধারণ গোষ্ঠী সকলের মধ্যে বা (এক শ্রেণী-ধারার অন্তর্গত) নিজেদের মধ্যে কতকগুলি সাদৃশ্য প্রকাশ করে—তবে সেই সাদৃশ্যগুলি অবশ্যই সা১, সা২, সা৩,—প্রভৃতির অপেক্ষা ব্যাপকতর হইবে। এইভাবে যদি ক্রমশঃ ব্যাপকতর সাদৃশ্যাবলীর অন্বেষণ করা যায় তবে অবশেষে সকল চিন্তনীয় ও অবেক্ষণীয় ব্যক্তি-সমূহে অধিষ্ঠিত এক সর্ব্ব-সাধারণ সাদৃশ্য—'সা'-তে আমরা উপনীত হইব। এইভাবে এই 'সা'-স্বয়ং এক 'জাতি-'আকারে দেখা দেয়। ডাঃ ইয়ুইং এইমত সমর্থন করেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠে যে, এই 'সা' কি একমাত্র জাতি বা বিশ্লেষণাযোগ্য প্রত্যয়?—নিশ্চিতই তাহা হইতে পারে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সা১, সা২, সা৩,—প্রভৃতি অভেদাত্মক (বা সম-সত্ত্ব) হইতে পারেনা। উহাদের প্রত্যেকেই এক একটি বিশেষ ধর্ম্ম ধারণ করে—একের ধর্ম অপরাপর সাদৃশ্যে পাওয়া যায়না। এই কারণে সা১ হয় সা২, সা৩, বা সা,—নয়, সা২, সেইভাবে সা,১ বা সা৩,—নয়-ইত্যাদি। অতএব, সা১, কে ('ক' ও সাঅ), সা২, কে ('খ' ও সা অ) —এই ভাবে প্রত্যেকটি সাদৃশ্যকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যায়;—স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই সকল ক্ষেত্রে ১' 'অ' হইতে ব্যাপকতর,-'২' 'আ'হইতে ব্যাপকতর—ইত্যাদি। '১'২'—ইত্যাদি হইতে 'অ' আ'—ইত্যাদির—এবং ধরা যাক, বৃহত্তর 'অ', 'আ'—ইত্যাদির উল্লিখিত ক্ষুদ্রতর 'অ', 'আ',—ইত্যাদি হইতে যে যুক্তি প্রক্রিয়া—তাহা 'সা' বা সর্ব্ব-ব্যপক সার্ব্বিক ও বিশ্লেষণাযোগ্য সাদৃশ্য'-ঘটনার অভিমুখী যাত্রা বা তাহার বিশোধন। লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে, সাদৃশ্য' স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবে মনুষ্য, 'পুস্তক'—ইত্যাদি বিশেষ শ্রেণীগঠন করিতে পারেনা। পরিশেষে, এই সাদৃশ্য, 'ক', 'খ'—ইত্যাদির দ্বারা সূচিত অপর জাতি-সমূহের অতিরিক্তভাবে সর্ব্ব-ব্যাপক এক জাতি-আকারে আবির্ভূত হইতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্গত যে সাদৃশ্য, তাহা সেই সেই শ্রেণী বা 'জাতি-গত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশিষ্ট হইয়া যায়। অতএব বিভিন্ন 'জাতির'-স্বরূপ ব্যাখ্যা করার পরিবর্ত্তে 'সাদৃশ্য' স্বয়ং 'জাতি-সমূহের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়। অধ্যাপক উজ্‌লে 'সাদৃশ্য'-ঘটনার দ্বারা 'জাতি'-বিষয়ক সমস্যার সমাধান করিতে বিশেষ প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহেন যে 'সাদৃশ্য' এক অভিজ্ঞতা-প্রসূত ঘটনা এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা অবেক্ষিত ঘটনা-সমূহকে শ্রেণী-গত করি ও অতীত ঘটনা-সকলের আলোকে ভবিষ্যৎ বিষয়-সমূহের আবির্ভাব-আশা করি। কিন্তু

উজ্‌লের মত সম্পূর্ণ স্বীকার্য্য নহে কারণ তিনি 'সাদৃশ্য-প্রত্যয়ের যৌক্তিক ব্যাখ্যা বা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ না করিয়া স্বীয় মতের স্বপক্ষে 'অভিজ্ঞতা'র আশ্রয় লইয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, অভিজ্ঞতা শুধু ইহাই প্রমাণ করে যে, 'জাতি-নির্ণয়ে সাদৃশ্য' এক ভেদক বা পরিচায়ক বহিরঙ্গ ধর্ম্ম হিসাবে সাহায্যকারী হয়; জাতির বা 'শ্রেণীর' প্রকৃতি-অবধারণে বা গঠনে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী নহে।

এখন 'জাতি'-সম্পর্কীয় মতবাদ হিসাবে ধারণা-বাদ আলোচনা করা যাক্। এই মতবাদ অনুসারে, 'জাতি' হইল ব্যক্তি-সমূহের দ্বারা গঠিত কোন শ্রেণীর এক সার-ধর্ম, যাহা—'জাতি' সংবলিত ব্যক্তি-সকলের বিশিষ্ট রূপ হইতে বিমূর্ত্তনের দ্বারা বিশ্লিষ্ট ও স্থিরীকৃত করা হয়। ধারণা-বাদের পরিপোষক 'লকে'র মতে, সামান্য প্রত্যয় শ্রেণীগত ব্যক্তি-সকলের সামান্যীকরণের দ্বারা প্রাপ্ত এবং প্রত্যয় প্রতিষঙ্গী হিসাবে পাওয়া যায়—এক ধরণের ব্যক্তি-বিশেষ সমূহে অধিষ্ঠিত এক সাধারণ ধর্ম্ম।

ভারতীয় চিন্তাশীলদের মধ্যে, অদ্বৈত-বাদীরা এই ধারণা-বাদে আস্থাবান। তাঁহাদের মতে, 'জাতি' সকল—ব্যক্তি সমূহে সম্পূর্ণ ব্যাপ্ত বা অধিষ্ঠিত, ব্যক্তি সকলের সামান্য ধর্ম্ম। জাতি-সকল কিন্তু অনিত্য। যেহেতু মায়িক জগতের আর সকল পদার্থের ন্যায়, সত্য বা ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে তাঁহারা বিনষ্ট হইয়া যায়। অদ্বৈত-বাদী দার্শনিকগণ স্বীয় দৃষ্টিকোন হইতে নৈয়ায়িক 'জাতি'-বাদের সমালোচনা করেন। নিত্য পদার্থ-হিসাবে সমবায়-সম্বন্ধের বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য-পদার্থ-রূপ জাতি-সকলের অস্তিত্বও তাঁহারা অস্বীকার করেন। তাঁহারা ইহাও স্মরণ করাইয়া দেন যে, 'ঘটত্ব' 'পটত্বা'দি তুরীয় জাতি-সকলের স্বীকৃতি আমাদের এই সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিপন্থী হয় যে, জাতি-সকল—ব্যক্তি-সমূহে সম্পুর্ণ অধিষ্ঠিত, ব্যক্তি-সমূহের সাধারণ ধর্ম্ম হিসাবেই —আমাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ হয়।

সকল আধিবিদ্যক লক্ষণা (বিশেষ দর্শন-শাখায় অন্তর্ভূক্ত) বিযুক্ত করিয়া আমরা যদি প্রত্যয়-বাদীদের 'ধারণা-বাদ' বিবেচনা করি, আমরা দেখি যে, এই মত-বাদ গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বোধ হয়; যদিও ইহার পরিপূর্ণ স্বীকারের জন্য প্রয়োজন—ইহার এইরূপ সংস্কার ও নিরপেক্ষ উপস্থাপনা যাহাতে এই মত-বিষয়ক সকল মিথ্যা-প্রতীতি নিরস্ত করা যায়। যুক্তি-সঙ্গতভাবেই, 'জাতি'কে, ব্যক্তি-গোষ্ঠীর সাধারণ, অন্তরঙ্গ ধর্ম্ম হিসাবে গ্রহণ করা যায়। অভেদাত্মক ধর্ম্মের সহিত সম্পূর্ণ বাহ্য ও অসার-ধর্ম্মের সম্পর্ক কোন এক শ্রেণীর মধ্যে বর্ত্তমান হিসাবে—কি ভাবে ধারণা করা যায়—এই সমস্যার সমাধান কল্পে আমরা বলিতে পারি যে, এই সম্পর্ক বস্তু-গত হিসাবে, উল্লিখিত দুইটি অংশের

কোন অনড়, মেলনাযোগ্য পার্থক্যের সূচনা করে না। শ্রেণী-গঠনকারী ব্যক্তি-সমূহের অন্তর্গত 'সার' ও 'অসার'—'সাধারণ' ও 'বিশেষ' ধর্ম্ম-সকল বাস্তবপক্ষে অচ্ছেদ্যভাবে এক আঙ্গিক ঐক্যে পরস্পর-বিজড়িত। এই সংমিশ্রণ এত গভীর যে অসার ও বিশিষ্ট ধর্ম্মের বিনাশের ফলে (ও সমকালে) সার ও সাধারণ ধর্ম্মেরও বিনাশ ঘটে। ব্যক্তি-সকলের মূর্ত্ত উপাদান-সকল হইতে শ্রেণীর সাধারণ সার ধর্ম্ম কেবল চিন্তন বা বিমূর্ত্তনের সাহায্যেই পৃথক করা হয়। বাস্তবিকই এমন কতকগুলি পার্যন্তিক ক্ষেত্র দেখা দেয়, যাহাদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট 'জাতি'র দ্বারা সূচিত করা দুরূহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। উদাহরণ-স্বরূপ, ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হইতে পারে যে, কোন সরীসৃপ—সর্প, না, মঞ্জীলতা ? এইরূপ ক্ষেত্রে, প্রথমে দেখিতে হইবে যে, কোন্ জাতির গুণ বা গুণাবলী সেই ক্ষেত্রে, বিশেষ অবেক্ষণে ও পরীক্ষার দ্বারা লক্ষ্য করা যায়। যদি সেইরূপ নির্ণয় সম্ভব না হয়, তবে দুইটি বিকল্পের প্রস্তাবনা হইতে পারে :—(১) সমস্যার বিষয়ীভূত ক্ষেত্র সম্ভাব্য দুইটি জাতির একটিরই অন্তর্গত—যদিও সে 'জাতি'গত গুণ অস্পষ্ট ও অনির্দ্দেশ্য আকারে ধারণ করে ; (২) আলোচ্যমান ক্ষেত্রে মনোমত দুইটি জাতির কোন একটিরই অন্তর্গত না হইয়া তৃতীয় কোন এক জাতির অন্তর্গত। এই নূতন তৃতীয় 'জাতি' সম্ভব ও বাস্তব—দুই প্রকার ব্যক্তি-বিশেষ লইয়া গঠিত হইতে পারে। অতএব 'জাতি'-নির্ণয়ের বিচারে বস্তু-গত সার সত্তার (গুণ-গত, ক্রিয়া-গত বা দ্রব্য-গত বা মিশ্রিত) প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ধারণা-বাদের সম্মুখীন হিসাবে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। 'বিবর্ত্তন'-প্রত্যয়ের আবির্ভাবে কয়েকজন দার্শনিক চিন্তা করেন যে এই 'বিবর্ত্তনে'র সাহায্যে, ব্যক্তি-সমূহের স্বরূপের গতিশীল ক্রমবৃদ্ধির আলোকে জাতি-স্বরূপের ব্যাখ্যা করা যায় কি না। যদি ধরা যায় যে, জাতি স্বয়ং কালের মাধ্যমে বিবর্ত্তিত হইতেছে, তবে ধারণা-বাদীদের অচল ও স্থির স্বভাব জাতি সম্পর্কীয় পূর্ব্ব ধারণা অবাস্তব বলিয়া বর্জ্জন করিতে হয়। কিন্তু আমরা সহজেই লক্ষ্য করিতে পারি যে এই অস্বীকার্য্য উপপত্তির দ্বারা ধারণা-বাদ কোন ভাবেই ব্যাহত হয় না। বিরুদ্ধ-মত-বাদীর সহিত আমরা এই বিষয়ে একমত হইতে পারি যে, কতকগুলি ব্যক্তি বিশেষকে আমরা বর্দ্ধমান হিসাবে গ্রহণ করি। কিন্তু একথা স্বীকার করা যায় না যে, ব্যক্তি-সকলের সাধারণ ও সার-প্রকৃতিও জাতি-স্বরূপের অভেদ ক্ষুন্ন না করিয়া ক্রম-বর্দ্ধমান থাকে। ব্যক্তি-সমূহে অধিষ্ঠিত জাতি-সকলের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা যুক্তি-বিজ্ঞানী জনসনের মতানুসারে বলিতে পারি যে, পরিবর্ত্তনশীল বিশেষ ধর্ম্মের মধ্যে জাতির স্বরূপ সঞ্চরণশীল (continuant) হিসাবে অভেদাত্মক

থাকে। জাতির আন্তর স্বরূপে আমরা কোন পরিবর্তন স্বীকার করিতে পারি না। অতএব উদাহরণ-স্বরূপ, যদি 'মানুষ'-শ্রেণীই একদিন পরিবর্তনের মাধ্যমে 'দেবতা'-শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়, তবে আমাদের এই কথা বলাই বোধহয় সমীচীন হইবে যে, 'মনুষ্য'-জাতির ধ্বংসের পরে 'দেবতা'-জাতির উদয় হইয়াছে। চিন্তন প্রক্রিয়ায় বিমূর্ত্তনের দ্বারা জাতি স্থিরীকৃত হইয়া সামান্য প্রত্যয়ের সহিত একীভূত হইয়া যায় —এবং সেইরূপ স্থায়ী ও অভেদাত্মক স্বভাবের বশে, বচনের বিধেয়-রূপে ব্যবহার-যোগ্য হয়।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সকল জাতিই এক সাধারণ আকারের নয়। সাধারণ সার স্বরূপের বৈচিত্র্য অনুসারে জাতি-সমূহকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়। আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখি যে, (১) কতকগুলি জাতি, ব্যক্তি-সমূহের দ্রব্য-গত বা বস্তু-গত সামান্যধর্ম্ম প্রকাশ করে। 'লৌহ', 'কয়লা', ইত্যাদিকে এই শ্রেণীর উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যায়। (২) আবার কতকগুলি জাতি 'ক্রিয়া' বা 'ব্যবহারে' সাধর্ম্য প্রকাশ করে। এই শ্রেণীর জাতির উদাহরণ হিসাবে আমরা 'ঔষধ', 'গতি', ইত্যাদির নামোল্লেখ করিতে পারি। (৩) তৃতীয়তঃ এইরূপ কতকগুলি জাতির আমরা সন্ধান পাই—যেগুলিতে 'গুণ' বা 'ধর্ম্মের' সাধর্ম্যই প্রবল। সর্ব্ব পরিচিত ও সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই শ্রেণীর উদাহরণ হইল,— মনুষ্য,, 'গো', 'প্রাণী'—ইতাদি জাতি সকল। পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, কতকগুলি জাতির পরিচয়-লাভ করা যায়—যেগুলি উপরি-উক্ত তিন শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীতে সম্পূর্ণভাবে স্থানলাভ করে না। ঐ ভাগ অনুসারে তাহাদের মিশ্র শ্রেণীর 'জাতি' বলা যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, 'সেতু'-জাতিকে ব্যবহারাত্মক ও গুণাত্মক—এই উভয়াকারেই ব্যাখ্যা করা যায়। আবার, যদি 'পীত'-উড্-পেনসিল্-রূপ মিশ্র জাতির কথা ধরা যায়, তবে দেখা যায় যে, ইহাতে উপরি-উক্ত তিন প্রকারের জাতি-সাধর্ম্যই বর্ত্তমান আছে।

এখন, জাতির স্বরূপ সম্পর্কে প্রায়শঃ উত্থাপিত নিম্নোদ্ধৃত সমীকরণ-দুইটির যাথার্থ্য-বিষয়ে আমরা বিচার করিতে পারি ঃ

(১) 'জাতি' = 'ধর্ম' বা 'গুণ'; (২) 'জাতি' = অর্থ।

(১) 'ধর্ম' বলিতে আমরা যদি সার-ধর্মও বুঝি, তবে পূর্ব্বালোচিত জাতি-শ্রেণী অনুযায়ী, বলিতে পারি যে কেবলমাত্র কতকগুলি জাতিই ধর্মাত্মক। অতএব-'সকল জাতির' সহিত সমার্থক 'সকল ধর্ম'—বোধক এই যে, সমীকরণ, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 'জাতি' ও 'ধর্ম'—এই দুইটি পদ কখনই সমার্থক হইতে পারে না। ইহাও উল্লেখযোগ্য

যে 'ধর্মে'র ব্যাপক অর্থে যে কোন ধর্মই 'জাতি' গঠন করে না। ধর্ম-সকল নিজেরাই 'ধর্ম'-নামক জাতি সূচিত করে। কিন্তু আলোচ্য সমস্যার বিষয় অন্য। বিষয় এই যে, কোন ধর্ম কোন ব্যক্তি-বিশেষের নিতান্ত বহিরঙ্গ বলিয়া ব্যক্তি-প্রকাশক 'জাতি' হিসাবে পরিগণিত না হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সকল দৃষ্ট কাকের যে 'কৃষ্ণত্ব' তাহা স্বয়ং জাতি-হিসাবে 'কাক'-শ্রেণী বোধক জাতির অংশ হিসাবেও গৃহীত হইতে পারে না। কারণ এই 'কৃষ্ণ-ধর্মটি', বেশীপক্ষে এক 'অচ্ছেদ্য আপতন' হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। সেই কারণে বিবেচ্যমান সমীকরণটি আমরা অস্বীকার্য্য বলিয়া বর্জ্জন করি। সমীকরণটির গ্রহণযোগ্য রূপ হইতে পারে :

কতক জাতি = কতক ধর্ম।

(২) দ্বিতীয় সমীকরণটির যাথার্থ্য-বিচার প্রসঙ্গে, আমরা 'জাতি' ও 'অর্থের স্বরূপ এবং সম্পর্ক—বিষয়ে পূর্ব্বে বিবেচনা করিব। 'অর্থ'-পদটি ('Meaning') দ্ব্যর্থক। ইহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি :—(১) অর্থ-বোধের প্রক্রিয়া ; বা, (২) অর্থের বিষয় (meant)। আবার, 'অর্থ' বলিতে 'উল্লেখ' বা 'অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ' সাহায্যে ব্যক্তি বিশেষকে বুঝাইতে পারে, পদের লক্ষ্যার্থও বুঝাইতে পারে। এই দিক লক্ষ্য করিয়া রয়েস্ দুইরূপ অর্থের কথা বলেন—(ক) বাহ্যার্থে ; ও (খ) আন্তরার্থ। বিষয়মুখ 'জাতির' সহিত 'প্রক্রিয়া বোধক অর্থের' (যাহা আত্ম-মুখ) কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। অঙ্গুলি-নির্দ্দেশের দ্বারা ব্যক্তি-নির্ণায়ক 'অর্থে'র (যেমন, 'আমি তোমাকে বুঝ্‌ছি'—'I mean you') সহিতও 'জাতির' কোন সঠিক সম্পর্ক নাই—যেহেতু, অর্থ-অনুসারেই 'জাতি' ব্যক্তি-বাচক হইতে পারে না ! পদের অন্তরার্থের সহিতও জাতির তেমন ঘনিষ্ঠ যৌক্তিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। অর্থের বিষয় ('meant') রূপ সামান্য প্রত্যয়-সূচক যে অর্থ—তাহার সহিত 'জাতির' সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। মনোবিজ্ঞানে আলোচিত অর্থ হইতে পৃথক যুক্তি-বিজ্ঞান-সম্মত এই অর্থের সহিত 'জাতি' অভেদাত্মক। অতএব মনোবিজ্ঞানী 'টিচেনারে'র 'মানস প্রসঙ্গ' ('psychical context') রূপ যে 'অর্থ' তাহা সম্পূর্ণভাবে জাতি-স্বভাবের বহির্ভূত। এই সকল কারণে বলা যায় যে কেবল কতকগুলি বিশেষ অর্থ-ই 'জাতি'-রূপে গণ্য হইতে পারে। এই সমাধানের পরেও আমাদের এই বিষয় অবশ্যই লক্ষ্য করিতে হইবে যে, 'সকল' জাতিই কিন্তু স্বীকার্য্য-অর্থে, 'অর্থে'র সমার্থক বা সম-ব্যাপক নয়। কারণ, বিষয়-মুখ ও স্ব-স্বরূপাবস্থিত জাতি অর্থের অতিরিক্ত আকারে বর্ত্তমান থাকে। অতএব যুক্তি-সঙ্গতভাবে আমরা নিম্ন-লিখিত অ-প্রতিসম সম্পর্কটি গ্রহণ করিতে পারি :

কতকগুলি (নির্দ্দিষ্ট) 'অর্থ' = কতকগুলি জাতি। ইহা হইতে লক্ষ করা যায় যে, পূর্ব্বে-প্রদত্ত সমীকরণটি (অর্থাৎ—'জাতি = অর্থ') স্বীকার করা যায় না। যদি উপরি প্রদত্ত সমীকরণ দুইটি সত্য হইত, তবে তাহাদের যৌগিক ফল হিসাবে নিম্ন-লিখিত সমীকরণটিও সত্য হইত : 'অর্থ' = 'ধর্ম'। কিন্তু সমীকরণ-দ্বয়ের স্বরূপ আলোচনার পর আমরা সহজেই দেখি যে, শেষোক্ত লব্ধিটিও মিথ্যা বলিয়া, অনস্বীকার্য্য নয়। নিরপেক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা বেশীপক্ষে বলিতে পারি যে,—কতক 'অর্থ' = ধর্ম। অতএব ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে,—'জাতি', অর্থ ও 'ধর্মে'র সম্পর্ক—অভেদাত্মকও নয়, অপ্রতি-রোধনীয় লক্ষণাত্মকও নয় বা সঞ্চরমাণ সম্বন্ধাত্মক ('transitive relation')-ও নয়।

ইতোপূর্বে আলোচিত সকল 'জাতি'-বাদই (আরিস্ততলীয় মূর্ত্ত জাতিবাদ যাহা সহজে শ্রেণীকরণ যোগ্য নহে—সম্ভবতঃ সেইটি ব্যতীত) মোটামুটিভাবে বিমূর্ত্ত জাতিবাদের অন্তর্গত করা যায়। 'বস্তুবাদ' অনুসারে, জাতিসকল হইল—স্বাবলম্বী, ব্যক্তি-বিশেষাতি-রিক্তভাবে স্থিতিযোগ্য পদার্থ-সমূহ। যেহেতু এ্যারিষ্টটলের মতে, জাতি-সকল সম্পূর্ণ-ভাবে ব্যক্তি সকলে ব্যাপ্ত ও ব্যক্তি সকলের বিনাশের সমকালেই বিনাশশীল—সেইহেতু তাঁহার 'জাতি'-বাদকে এক প্রাচীন অর্থে 'সমূর্ত্ত জাতি-বাদের পর্য্যায়ভুক্তরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু বিমূর্ত্ত জাতিবাদের সহিতও তাঁহার মতের কিছু সাদৃশ্য আছে। প্লেটো ও অন্যান্য সকলেরই (প্রায়) বস্তু-বাদ—বিমূর্ত্ত-বাদেরই অঙ্গীভূত।

'নাম-বাদ'ও একপ্রকার বিমূর্ত জাতি-বাদ; কারণ এই মতে, নামই, জাতি এবং এই নামের প্রতিষঙ্গী হিসাবে বস্তু-জগতে বর্ত্তমান থাকে বিশিষ্ট, সদৃশ ব্যক্তি-সমূহ-মাত্র।

'ধারণা-বাদ'ও একপ্রকার বিমূর্ত্ত জাতি-বাদ; কারণ এই মতবাদে জাতি-সকল, বিমূর্ত্তনের সাহায্যে প্রত্যয়-হিসাবে চিন্তন যোগ্য, ব্যক্তিসকল-মধ্যবর্ত্তী সারবান্, অংশ-রূপী সাধর্ম্যবিশেষ।

কিন্তু আধুনিক কালে, দার্শনিক হেগেলের পথ অনুসরণ করিয়া নয়া-হেগেলীয় দার্শনিকগণ এবং তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্র্যাড্‌লে ও বোসাঙ্কে মূর্ত্তজাতি-নামক এক নূতন জাতি-বাদ প্রচার করিয়াছেন। এই মতবাদ অনুসারে, জাতি কোন ব্যক্তির মধ্য-স্থিত অংশ মাত্র নহে—বরং আঙ্গিক ঐকরূপী সম্পূর্ণ ব্যক্তিই এক জাতি। এই জাতি-বাদের পশ্চাতে বর্ত্তমান 'পূর্ণ-ভাববাদের' (বা 'আদর্শবাদের') মূল সুর—অর্থাৎ 'মূর্ত্ত-তন্ত্রেই সত্তার বা পরমতত্ত্বের প্রকাশ'—তাহা বিশেষভাবে লক্ষনীয়। 'ব্র্যাড্‌লের সত্য ও তত্ত্বের যে মতবাদ-তাহার সহগামী হইল তাঁহার 'জাতি-বাদ'। তাঁহার মতে, যে পরমতত্ত্ব

—পূর্ণ সত্য ও পূর্ণ সত্তা—তাহাই পূর্ণ 'ব্যক্তি বা 'জাতি'। বোসাঙ্কে বিমূর্ত জাতি-বাদের এই কঠোর সমালোচনা করেন যে, এই মতবাদ নিতান্ত ভ্রান্তভাবে বিভিন্ন, নানাভাবে বিসদৃশ ও বাহ্যসম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবিশেষগুলির মধ্যবর্ত্তী অংশ-মাত্রকে 'জাতি' বলিয়া অভিহিত করে। এইরূপ 'জাতি', তাঁহার মতে, কোন ব্যক্তির (Individual thing) পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ জ্ঞান দিতে সমর্থ হয় না। উদাহরণ স্বরূপ বিভিন্ন 'লাল বস্তুর যে 'লালিমা' তাহা বস্তু-বিশেষ সম্পর্কে কোন প্রয়োজনীয় অন্তরঙ্গ জ্ঞান দেয়না। ইহা নিতান্তই বাহ্য ও আংশিকরূপের পরিচয় দেয়। এই কারণে বোসাঙ্কে কেবলমাত্র মূর্ত্ত জাতির স্বীকৃতি-দান করেন ; এই মূর্ত্ত জাতি বলিতে বুঝায় মূর্ত্ত সম্পূর্ণরূপী আঙ্গিক বস্তু বা তন্ত্র যাহার মধ্যে অংশ অংশী পরস্পরকে পরিস্ফুট ও দ্যোতিত করে! উদাহরণ স্বরূপ 'ঘড়ি'-জাতি ঘড়ির 'অংশ' ও 'পূর্ণ-স্বরূপ' উভয়কেই ব্যাখ্যা করে। বোসাঙ্কে এই মূর্ত্ত জাতিসকলের এক ধারাবাহিক (ক্রম ব্যাপক) শ্রেণী স্বীকার করেন ; এই শ্রেণীর পরিণতি হয় 'সমগ্র বিশ্ব'—রূপী সর্ব্বব্যাপক মূর্ত্ত জাতিতে ;—এই চরম ও পূর্ণতম জাতির আঙ্গিক ঐক্য সর্ব্বাপেক্ষা জটিল কিন্তু সঙ্গতিপূর্ণ।

কিন্তু অতি সত্বর আমরা জাতি-স্বরূপ সম্পর্কীয় এই মূর্ত্ত জাতি-বাদকে অস্বীকার্য্য বলিয়া বর্জ্জন করি। কারণ 'জাতি'র যে বিশেষ স্বরূপ অর্থাৎ 'শ্রেণী-ধর্ম'—তাহাকে না লক্ষিত করিয়া এই 'জাতি-বাদ' 'জাতি'কে 'ব্যক্তি'র সহিত একীভূত করে। 'আঙ্গিক ঐক্য'—পরম সত্তার গ্রহণ যোগ্য ও যুক্তি সঙ্গত স্বরূপ চিহ্নিত করিতে পারে ; কিন্তু সেই কারণে ইহা 'জাতি'র সার-স্বরূপ বলিয়া বিবেচ্য হইতে পারে না। সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা যে ভাবে সার, সাধারণস্বরূপ অনুসারে ব্যক্তি-সমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করি—সেই প্রয়োজনীয় দিকটিই, এই মূর্ত্ত জাতি-বাদে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হইয়াছে! উদাহরণ-স্বরূপ 'মনুষ্য', 'পুস্তক' 'অশ্ব' 'রং'-ইত্যাদি শ্রেণীর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা এই মূর্ত্ত জাতি-বাদে আমরা হারাই। অতএব 'জাতি' সম্পর্কীয় মত বাদ হিসাবে আমরা এই মূর্ত্ত জাতি-বাদকে গ্রহণযোগ্য মনে করিনা ; এবং ইহা অপেক্ষা বিমূর্ত্ত জাতি-বাদকেই অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা পূর্ব্বে ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে, সকল বিমূর্ত্ত জাতি-বাদের মধ্যে 'ধারণা-বাদ'ই—উহার সংস্কৃত ও বর্দ্ধিত আকারে,—সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়।

জাতিসকলের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিয়া আমরা জাতি-সম্পর্কীয় চরম সমস্যার নিষ্পত্তি করিব। অধ্যাপক ব্ল্যাণ্ডশার্ডের সহিত একমত হইয়া আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের অভিজ্ঞতার সর্ব্ব-প্রথম অবস্থা হইতেই আমরা

জাতি সকল ব্যবহার করি। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই জাতিসকলের পূর্ণ জ্ঞান লইয়া আমরা জাতি-সকল ব্যবহার করি না। বিষয়-মুখ হিসাবে যদিও জাতি সমূহের অর্থ সকল সময়েই স্থির ও অবিচল থাকে, তবু জাতি-সমূহ সম্পর্কে আমাদের (আত্ম-মুখ) জ্ঞান শৈশব হইতে পরিণতা-অবস্থার লাভ পর্য্যন্ত অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সাথে সাথে স্ফুটতর হইতে থাকে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির এক বিশেষ অবস্থার পর আমাদের জাতি সম্পর্কীয় ধারণার আর পরিবর্ত্তন হয় না। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, 'জাতি'-প্রয়োগকারী ব্যক্তির দিক হইতে, জাতি-সকল অভিজ্ঞতা-পূর্ব্বও বটে, অভিজ্ঞতা-পরও বটে। বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির বলে একটিমাত্র ক্ষেত্রেও জাতির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অতএব, সামান্য লক্ষণ প্রত্যাসত্তির সাহায্যে ব্যক্তি-বিশেষই প্রত্যক্ষ-যোগ্য জাতি—সম্পর্কীয় যে নৈয়ায়িক মত—তাহা আমরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে পারি।

পুস্তক পরিচয়

সমসাময়িক মনোবিজ্ঞান—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌, এ, প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ডু জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৬৯। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৯, মূল্য চার টাকা।

এই পুস্তকখানি প্রধানতঃ খ্যাতনামা পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানী Woodworth এর প্রসিদ্ধ পুস্তক Contemporary Schools of Psychology অবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে, যদিও ইহা উক্ত পুস্তকের অনুবাদ-মাত্র নয়। আধুনিক কালের মনোবিজ্ঞানীরা কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লেখকগণ ঐ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই মন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে মনের প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে কয়েকটি বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। Woodworth এর পুস্তকে এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত মনোবিজ্ঞানীদের মতবাদগুলির ব্যাখ্যা আছে। ইহা পাঠ করিলে বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতে মন ও তাহার বিভিন্ন ক্রিয়ার প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তাধারা কত বিভিন্ন দিকে বহিতেছে সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারা যায়। "সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানের" লেখক বাঙ্গলাভাষায় এই মতবাদগুলির সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। Freud এর মনঃসমীক্ষণবাদ (Theory of Psycho-analysis), ইয়ুং (Jung) এর বিশ্লেষণী মনোবিজ্ঞান (Analytical Psychology), এ্যাড্‌লারের (Adler) ব্যক্তি-মনোবিজ্ঞান (Individual Psychology) উইলিয়ম ম্যাক্‌ডুগ্যালের (William McDougall) এষণাবাদ (Hormic Psychology), কফ্‌কা (Koffka) কোহলার (Kohler) প্রভৃতি কর্তৃক প্রবর্তিত সমগ্রতাবাদী মনোবিজ্ঞান (Gestalt Psychology), জে ওয়াট্‌সন (J. Watson) প্রবর্তিত আচরণবাদ (Behaviourism)—এই কয়টি চিন্তাধারার ব্যাখ্যাও আলোচনা এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া তুইটি অধ্যায়ে বুদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Intelligence) ও ব্যক্তিত্ব (Personality) সম্বন্ধে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মতের

আলোচনা করা হইয়াছে। বাঙ্গলাভাষায় মনোবিজ্ঞানের পুস্তকের সংখ্যা অতি কম। সম্প্রতি যে কয়েকখানি পুস্তক লেখা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে এইখানি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। যাঁহারা ইংরাজীভাষায় মনোবিজ্ঞানের মূল পুস্তকগুলি পড়েন নাই তাহারাও এই পুস্তকখানি পড়িয়া সমসাময়িক মনোবিজ্ঞানে আলোচিত বহু বিষয়ের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। লেখক সহজভাষায় মনোবিজ্ঞানঘটিত বহু জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য হইয়াছেন বলিয়াই আমাদের ধারণা। বি, এ অনার্স এবং এম্, এর মনোবিজ্ঞানের ছাত্রেরা এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন। প্রথমপ্রকাশের পর কয়েকবৎসরের মধ্যে যে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রয়োজন হইয়াছে; তাহাতেই বুঝা যায় যে ইহা পাঠকদের সমাদর লাভ করিয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

নীতিশাস্ত্র—শ্রীহরিদাস বন্দোপাধ্যায়, এম্ এ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র হাজরা, ২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। প্রাপ্তিস্থান: বাণী-নিকেতন, ২১৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ও বি, সরকার অ্যাণ্ড কোং ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। পৃষ্টা সংখ্যা ১৮৬+IV মূল্য ছয় টাকা।

এই পুস্তক খানি ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের দর্শনের ছাত্রদের জন্য লিখিত। লেখক এই পুস্তকে নীতিশাস্ত্র কাহাকে বলে, নীতিশাস্ত্রের সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক, নৈতিক কার্যের বিশ্লেষণ, নৈতিক মানদণ্ডের অর্থ, নৈতিক মানদণ্ডসম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ, কর্তব্য, সততা, চরিত্র, শাস্তি সম্বন্ধে বিবিধ মতবাদ প্রভৃতি নীতি শাস্ত্রের প্রধান বিষয় সমূহ আলোচনা করিয়াছেন। প্লেটো, জনষ্টুয়ার্ট মিল, বেন্থাম, হার্বার্ট স্পেন্সার, কাণ্ট, হেগেল, ব্র্যাডেলে, মার্টিনো প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ নৈতিক জীবন ও জীবনাদর্শ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন সেইগুলির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও সমালোচনা এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে। গীতার কর্ম্ম-যোগের আলোচনাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ইহা বি, এ পরীক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। তাহা ছাড়া সাধারণ পাঠকেরাও ইহা পড়িলে নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সকল দার্শনিক আলোচনা হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করিবেন।

দর্শনের বিভিন্ন শাখায় বাঙ্গলাভাষায় মৌলিকগ্রন্থ লিখিত হওয়া আবশ্যক। সুখের বিষয় আজকাল কয়েকজন অধ্যাপক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জন্য বাঙ্গলাভাষায়

দর্শনের পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইউরোপীয় দর্শনে ব্যবহৃত বহু পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। তাহাতে আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে ইংরাজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত দার্শনিক গ্রন্থসমমূহের সমকক্ষ মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ বাঙ্গলাভাষায় লিখিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

ভ্রমসংশোধন

'দর্শন' পত্রিকার ১৩৬৭ সালের মাঘ সংখ্যায় দর্শনপরিষদের সভ্য-তালিকায় অধ্যাপক শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ঠিকানা 'প্রেসিডেন্সী কলেজ, হাওড়া" ছাপা হইয়াছে, উহা 'প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা' হইবে। অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার ভট্টার্য্যের ঠিকানা 'টাকি কলেজ, টাকি' ছাপা হইয়াছে, উহা 'মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর হইবে। পৃঃ [চ]

'দর্শন' পত্রিকার কয়েকটি নিয়ম

১। 'দর্শন' পত্রিকার বৎসর বৈশাখ হইতে গণনা করা হইবে।

২। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সভ্যমাত্রই 'দর্শন' পত্রিকা বিনামূল্যে পাইবেন।

৩। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সাধারণ সভ্যদের চাঁদা —বার্ষিক ৫৲।

৪। 'দর্শন'এর বার্ষিক মূল্য (ডাকমাশুলসহ)—৫৲, প্রতি সংখ্যার মূল্য – ১'২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—'দর্শন' পত্রিকার জন্য প্রবন্ধাদি পত্রিকাসম্পাদক শ্রীকালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে পাঠাইতে হইবে। বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিতে হইবে। পরিষদের চাঁদা এবং 'দর্শন' পত্রিকার মূল্যও নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীকল্যাণচন্দ্র গুপ্ত

কর্মাধ্যক্ষ (সেক্রেটারী) এবং কোষাধ্যক্ষ (ট্রেজারার), বঙ্গীয় দর্শন পরিষদ,

২০।২, হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

Published by Sri K. C GUPTA. from 20-2, Halder Bagan Lane,
Calcutta-4 and Printed by Sri C. SEN, at P. B. PRESS
32E, Lansdowne Road, Calcttta—20

August—1962—200.

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৫শ বর্ষ, ২য় ও ৩য় সংখ্যা] শ্রাবণ ও কার্তিক [১৩৬৮ সাল

সূচীপত্র

'বর্ত্তমান ভারতীয় দর্শন'

।অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন উল্লেখযোগ্য অবদান করিয়াছে কিনা, এ বিষয়ে দুইটী মত প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, যে আমরা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে, "যে কোনও সভ্যদেশের তুলনায় দর্শনের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান কালের শিক্ষিত ভারতীয়দের দৈন্যই পরিলক্ষিত হইবে।" অন্যপক্ষে কেহ কেহ বলেন যে দার্শনিক শক্তি ভারতবাসীর প্রকৃতিগত প্রতিভা। সুতরাং এখনও সে-প্রতিভা বিলুপ্ত হয় নাই, কেবল তাহার পরিচিতি হইবার সুযোগ বহুদিন না হওয়াতে তাহা লুপ্তপ্রায় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে উদ্যম ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমরা পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করি, তাহার দশমাংশ মাত্র বর্ত্তমান ভারতীয় দর্শন বুঝিবার জন্য প্রয়োগ করিলে আমাদের দৈন্য নিশ্চিতভাবেই দূরীভূত হইতে পারে। অল্পদিনের অধ্যবসায়ে ভারতবাসী যে প্রকার কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে অচির ভবিষ্যতে আমাদের পূর্ব্বগৌরব ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তাহার পরিপন্থী অনেক আছে। এখনও ভারতের উচ্চ বিদ্যালয়গুলিতে অতি অল্প পরিমাণেই ভারতের দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিবার উৎসাহ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইহাতে মৌলিক চিন্তার বীজবপন সম্ভব নহে। বিদ্যার্থীগণ অনেকেই জানিতে পারেন না যে কত দুরূহ দর্শন সমস্যার সমাধান ভারতীয় দর্শনের আলোকে সুপ্রকাশ হইতে পারে। তত্ত্বচিন্তার গভীর স্তরে যে সকল মৌলিক তথ্য বর্ত্তমান, তাহা জানিবার অবকাশ না পাইয়া বিদ্যার্থীগণ পল্লবগ্রাহিতায় অভ্যস্ত হয়। ভারতবাসীর এখন যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা অবহেলা করিয়া কেবল আত্মগ্লানিকে প্রশ্রয় দিলে জাতীয় গৌরব উদ্বুদ্ধ হইতে পারেনা। ভিত্তিহীন আত্মপ্রসাদ যে বাঞ্ছনীয় নহে

তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু পর্ব্বত প্রমাণ বাধাবিঘ্ন সত্বেও ভারতীয় দর্শনিকগণ যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, তাহার যথোপযুক্ত প্রচার হয়না। এ কথাও অনস্বীকার্য্য। সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ভগবান দাস, হীরালাল হালদার প্রভৃতির মনীষীর চিন্তাসম্পদ যে কোনও সভ্যদেশের গৌরবের বিষয়, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহাদের দার্শনিক প্রতিভা শিক্ষিত সমাজে পরিচিত করিবার জন্য জাতির সংস্কৃতি রক্ষকগণ কি করিয়াছেন? এ বিষয়ে বেশী লেখা বাহুল্য।

সুপ্রাচীন কাল হইতে আত্মদর্শনকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া ভারতের চিন্তাশীল পণ্ডিতগণ মানিয়া লইয়াছেন। হয়তো স্মরণাতীত কাল হইতে আত্ম বিষয়ে সভ্য-জগতে নানাদিক হইতে গবেষণা হইয়াছে। ভারতের ঐতিহ্যে আত্মজ্ঞান জীবনের পরমার্থ বলিয়া গণ্য হওয়াতে তাহার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা চিরকালই হইয়াছে। কিন্তু ভারতের প্রাচীন চিন্তা ও পশ্চিমের নবীন চিন্তা মিলিত হইয়া যে অভিনব চিন্তা প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার স্পর্শে আত্মদর্শন যেন ভারতের মনীষীগণের মধ্যে এক নবজাগরণের আন্দোলন আনিয়াছে। এই আন্দোলন যে নিস্ফল হয় নাই তাহা গুণগ্রাহী পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তবে এ কথাও সত্য যে দার্শনিক তথ্য সকলের নিকট সহজবোধ্য হইতে পারেনা। দর্শন শাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের তত্বগুলি কেহই সহজবোধ্য নয়। সেই প্রকার নব জাগরণ যে ফলপ্রসূ হইয়াছে তাহা সহজবোধ্য না হইলেও অনেকের নিকট অকাট্য সত্য। আমরা সহজবুদ্ধির আলোকে বহু মিথ্যা প্রতীতিকে সত্য বলিয়া ভুল করিয়া থাকি। সেইজন্য বিজ্ঞান লব্ধ সত্য সহজ বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়না। এ ক্ষেত্রেও এ কথাগুলি স্মরণ করা জিজ্ঞাসুর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সাধারণতঃ এই ধারণাই পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয় যে রণাঙ্গনে যুদ্ধপ্রবৃত্ত সৈণ্যগনের মত দার্শনিকগণও তত্বজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে কেবল ঘাত প্রতিঘাত, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কৌশল প্রদর্শন ব্যতীত আর কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন নাই। সত্যের সন্ধান যেন চিরকালই মানব বুদ্ধির অগোচর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাঁহারা দর্শনচিন্তায় সুষ্ঠুভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন, তাহারা বুঝিতে পারেন যে এই ধারনা অতীব ভ্রমাত্মক। দার্শনিক চিন্তার মূলগত প্রয়োজন কি? সাধারণ জ্ঞানের আলোকে মানুষের সাধারণ জীবনের প্রয়োজনগুলি সুসম্পন্ন হইলেও তাহার জ্ঞান পিপাসার

পরিসমাপ্তি হয়না। তখন গভীরতর জ্ঞানের জন্য নূতন করিয়া অভিযান সুরু হয়। তাহার ফলে সহজ জ্ঞানের আকৃতি বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই পরিবর্ত্তিত জ্ঞান ও দৃষ্টি ভঙ্গীকে মর্য্যাদা দেওয়া সকলের পক্ষে সুসাধ্য নয়। তেমনি কোনও বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক সিদ্ধান্ত সহজবুদ্ধির অতীত হওয়াতে তাহার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সুকঠিন। এখানে আর একটি কথা লক্ষ করা উচিত। দার্শনিক দৃষ্টিতে যে তত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করে তাহা দার্শনিকের পক্ষে সমভাবে বোধগম্য হয়না। একজন অসামান্য প্রতিভাশালী দার্শনিকের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত অন্য একজন দার্শনিক বুঝিতে না পারিলে তিনি তাহার অপব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে ভূরিভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ অপব্যাখ্যা অনেক স্থলেই দার্শনিকগনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। এই কথাটি না বুঝিয়া যাহারা দর্শনচিন্তাকে নিস্ফল তর্কচাতুর্য্যের বিস্তৃত রণভূমি বলেন তাঁহারা সত্যের অপলাপ করেন।

"সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন" গ্রন্থে মনীষী সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বর্ত্তমান ভারতীয় দর্শনের দুরবস্থা এবং তাহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে বিচারকে অবহেলা করিয়া কেবল শ্রুতিকে প্রাধান্য দিলে দর্শন শাস্ত্রের যে ক্ষতি করা হয় তাহা নিতান্তই অন্তর্বিরোধ পূর্ণ। কারণ প্রত্যেক দার্শনিকই শ্রুতিকে নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে বিচার বা যুক্তি দ্বারা শ্রুতির অর্থ বুঝিতে হয় এবং বিচারই শ্রুতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ইহাই মানিতে হয়। সুরেন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি বর্ত্তমান দর্শনের একটি মহোপকারী পথ প্রদর্শক। বাস্তবিক পক্ষে ভারতীয় দর্শনের প্রতিভা কখনই একান্ত শ্রুতিনিষ্ঠ হইতে পারে নাই। প্রত্যেক ভাষ্যকার মূল দর্শনের অভিপ্রায় স্পষ্ট করিবার অজুহাতে অনেক স্থলেই নিরপেক্ষ বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ভারতীয় চিন্তাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পশ্চিমের মধ্যযুগের শাস্ত্রবদ্ধ চিন্তাপ্রণালীর সহিত তুলনা করিয়া একটি অপব্যাখ্যার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন মাত্র।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ কেহ কেহ 'নিরপেক্ষ বা স্বাধীন বিচারের মর্য্যদা ক্ষুন্ন করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে তর্কের দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়না। কারণ দেখা যায় একজন তার্কিক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন অন্য একজন বিচার কুশল তার্কিক তাহাকে খণ্ডন করিয়া বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগনের এই যুক্তি বর্ত্তমান ভারতীয় দার্শনিভুকগণ সহানুভূতির চক্ষে দেখেন

না। তাঁহারা বলেন যুক্তি বা বিচার সকল ক্ষেত্রে সন্দেহাত্মক বলিয়া ধরিলে কোনও সিদ্ধান্তকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়না। যেহেতু তর্কের অপ্রতিষ্ঠা একটি সিদ্ধান্ত, ইহাকে অসন্দিগ্ধ একটি সত্য বলিলে তর্কের সুপ্রতিষ্ঠাই অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিতে হয়। এই কথাটি কথঞ্চিত অন্যভাবেও প্রকাশ করা যাইতে পারে। যুক্তিশৃঙ্খলার মধ্যে কোনওস্থানে অকাট্য অসন্দিগ্ধ সত্য-প্রতিষ্ঠা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত ভাবে নিহিত না থাকিলে শৃঙ্খলা ছিন্ন হইয়া যায়। ইহা হইতে এই কথা সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে যে যুক্তি বা বিচারের নিরতিশয় অপ্রামাণ্য স্বীকার করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

কোন কোনও বর্ত্তমান পণ্ডিত পূর্ব্বাচার্য্য গনের পথ অবলম্বন করিয়া বলিয়া থাকেন যে লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তর্ক যদিও আবিষ্কারের পথ দেখাইতে সক্ষম হয় তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, অলৌকিক বস্তু গ্রহণ করিতে হইলে অপ্রাকৃত বা অসাধারণ অনুভূতি প্রয়োজনীয়। যুক্তি প্রনালীকে সীমাবদ্ধ করিয়া সীমার অতীত বস্তু প্রতিষ্ঠিত করা তাঁহাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্য। কিন্তু যুক্তিকে সীমাবদ্ধ করা যে নিতান্ত অসম্ভব তাহা বর্ত্তমান ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সীমার অতীত বস্তু চিন্তার অতীত হইলে তাহার সহিত সীমাবদ্ধ বস্তুর তুলনা হইতেই পারেনা। অর্থাৎ অচিন্ত্য বস্তু শূন্য হইলে কোনও তুলনাত্মক ভান সম্ভব হয়না। তেমনি যে বস্তু চিন্তার অতীত তাহার সহিত যে বস্তু চিন্তনীয় তাহার কোনও প্রকার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়না। এমন কি চিন্তনীয় ও অচিন্ত্য বস্তুর তুলনা করিতে গেলে ও অচিন্ত্য বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে চিন্তনীয় হইয়া পড়ে। এই তথ্যটি উপেক্ষা করিয়া বহু মনীষীব্যাক্তি বলিয়া থাকেন যে চিন্তার অতীত বস্তুটি দর্শন শাস্ত্রের পরম উপাদেয় বস্তু। সেটি যে বাক্য ও মনের অগোচর এ কথা সকল শাস্ত্রের বহু প্রচলিত ও সুপ্রাচীন শিক্ষা। তাঁহারা আরও বলেন যে যাহা চিন্তার অতীত তাহাকে অপ্রাকৃত বা অপরোক্ষ অনুভূতির দ্বারা জানা যায়। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক কাণ্ট চরম তত্ত্বের অজ্ঞেয়বাদ সমর্থন করিয়াছেন। আর ভারতীয় দর্শনে অচিন্ত্যকে সাধারণ চিন্তার অতীত অনুভূতি দ্বারা জ্ঞেয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতীয় দার্শনিকগণ এই দুইটি অভিমতই যে বিচার সহ নয় তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। চরমতত্ত্ব বিষয়ে কাণ্টের অভিমত যে অন্তর্বিরোধপূর্ণ তাহা ভাষ্যকারগণ স্বীকার করিয়াছেন। দ্বিতীয় অভিমতটিও যে যুক্তিসঙ্গত নয় তাহা কিন্তু ভারতের বহু সুক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতের কাছেও ধরা পড়ে নাই। একথাও অবশ্য সত্য যে "সমসাময়িক ভারতীয়

দর্শন" গ্রন্থের বহুস্থানে ঐ মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। তথাপি কেহ কেহ বহুবার বলিয়াছেন যে, যে সমস্যা যুক্তি বা বিচারের দ্বারা সমাধান করা যায় না তাহা অনুভূতির আলোকে সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য হয়। একথা সকলেই জানেন যে অনুভূতিবাদ পশ্চিমের দর্শন চিন্তার ইতিহাসেও পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে; আর ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে তো ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই মতের বিস্তৃত সমালোচনা বহুস্থানে হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতের দার্শনিকগণ যে ভাবে ইহার সমালোচনা করিয়াছেন তাহা এখানে বিবেচনাযোগ্য। বিচার বা যুক্তিকে অবহেলা করিয়া তত্ত্বপ্রকাশ করিতে গেলে বিচারের নিয়মগুলি অজ্ঞাতভাবে চিন্তাকে সংযত করে। যখন আমরা যুক্তিসিদ্ধ অনুমানকে ভ্রম বলিয়া বুঝি তখন যুক্তির নিয়ম একেবারে অবহেলা করিতে পারিনা। অর্থাৎ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়াই যুক্তির বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত পরিপোষণ করিতে হয়। সুতরাং যুক্তি এক অর্থে সত্য এবং অন্য অর্থে মিথ্যা বলিয়া ধরিতে হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। রামায়ণে মেঘনাদ আততায়ীর উপর শরবৃষ্টি করিয়া মেঘের আড়ালে আত্মগোপন করিতেন। কিন্তু মেঘনাদের কৌশল দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে না। ইহা হইতে এই কথাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে দর্শন চিন্তা সম্যক প্রকারে বিচারাশ্রয়ী। এবং বিচার বা তর্কের অতীত পথ বিচার বিরুদ্ধ হইলে তাহা দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় সম্ভব হয় না।

এইখানে আর একটি অভিনব প্রণালীর কথা বিবেচনা করার যোগ্য। বিচার বা তর্ক তত্ত্ব নির্ণয় করিতে অক্ষম। ইহা প্রমাণ করিবার যে প্রণালী বহুকাল হইতে ভারতীর দর্শনে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং যাহা সুপ্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকগণের সহিত সংশ্লিষ্ট সেই সম্বন্ধে দু'একটি কথা বিবেচনা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাঁহারা যুক্তিপ্রণালীকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে কার্য্য, কারণ প্রভৃতি কতকগুলি মূলীভূত প্রত্যয় বা বৌদ্ধিক মূল সূত্র তাহার মধ্যে নিহিত আছে। অথচ এই প্রত্যয়-গুলি অন্ত-বিরোধ পূর্ণ। মূল সূত্র যদি অসঙ্গতিপূর্ণ হয় তাহা হইলে বিচার পদ্ধতিও সেই প্রকার অসঙ্গতিপুর্ণ হইবে। ইহা হইতে তাঁহারা অনুমান করেন যে তর্ক বা বিচার পদ্ধতি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অক্ষম। বৌদ্ধদার্শনিকগণের এই যুক্তি-প্রণালী শ্রীহর্ষ প্রমুখ বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়া তর্কের অপ্রতিষ্ঠাবাদ প্রচার করিয়াছেন। আধুনিক যুগের ইংলণ্ডের মহামনীষী এফ, এইচ, ব্র্যাড্‌লে প্রভৃতি ঐ মতই সমর্থন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই অভিনব তর্কের অপ্রতিষ্ঠাবাদকে ভিত্তি করিয়া যে বিচার কুশলতা ভারতীয় দর্শনে প্রকটিত হইয়াছে তাহার সম্যক্

আলোচনা এই অল্প পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নহে। তবে এই কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে বৌদ্ধিক মূল সূত্রকে অন্তরবিরোধপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হইলেও ঐ মূলসূত্র-গুলির সাহায্য লইতে হয়। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে বৌদ্ধিক মূল-সূত্রগুলির অপ্রামাণ্য প্রমাণ করা অসম্ভব। আরও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে জানা যায় যে যাঁহারা মূলসূত্র অন্তর-বিরোধপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাঁহারা তাহাদিগকে মূলস্থান হইতে অপসৃত করিয়া তাহাদের মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছেন। যেমন এক মহাকাশকে নানাভাবে বিভক্ত করিয়া ঘটাকাশ, মঠাকাশ প্রভৃতি পরিচ্ছিন্ন পদার্থ মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিলে তখন মহাকাশ ও পরিচ্ছিন্ন আকাশ সম-পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না, তেমনি মূলসূত্রগুলিও জ্ঞেয় পদার্থের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত (co-ordinate) হইতেই পারে না। অর্থাৎ পুর্ব্বতোসিদ্ধ মহাকাশ না থাকিলে ঘটাকাশ থাকিতে পারে না—এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলে বুঝিতে পারা যায় যে জ্ঞানের মূলীভূত প্রত্যয়গুলি না থাকিলে কোনও প্রকার জ্ঞান সম্ভব হয় না। কারণ এই প্রত্যয়গুলির আকার ধারণ না করিয়া কোন বস্তুই জ্ঞানের বিষয় হয় না। টি, এইচ, গ্রীণ কান্টের বিজ্ঞান পরীক্ষা (Critique of Pure Reason) অনুসরণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে কতকগুলি শাশ্বত মূলীভূত প্রত্যয়কে অসন্দিগ্ধ সত্য বলিয়া মানিয়া না লইলে কোনও প্রকার সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হইতে পারে না।

যে তথ্য প্রমাণ পদ্ধতি ও অপ্রমান পদ্ধতি এই দুইটিকেই অজ্ঞাতসারে বা জ্ঞাতসারে অনুশাসিত করে তাহা শাশ্বত সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। মহামতি কান্ট এই কথাটি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "যে সকল প্রত্যয় থাকতে অনুভব (experience) সম্ভব তাহারা অনুভব হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না—এবং সেইজন্যই তাহারা সর্ব্বদা অবশ্য স্বীকার্য্য। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ যে একটি অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ তাহা তিনি যেভাবে প্রমাণ করিয়াছেন তাহা আমার বন্ধুবর ডাঃ রাসবিহারী দাস অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (কান্টের দর্শন ১০৬ পাতা)—"অনুভবে শুধু পূর্ব্বাপর ভাব পাওয়া যায়। বারংবার একই পৌর্ব্বা-পর্য্য দেখিয়া দেখিয়া অভ্যাসের বশে তাহাকে নিয়ত ও অনিবার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু ইহার জন্য কোনও প্রমাণ নাই।" উত্তরে কান্ট বলেন কার্য্য কারণ কল্পনা আমরা প্রাকৃত অনুভব হইতে আহরণ করি না। কার্য্য কারণ ভাব না থাকিলে প্রাকৃত অনুভবই অর্থহীন হইয়া যাইত। হিউমের বিচার প্রণালী হইতেই স্পষ্ট হয় যে তিনি কার্য্য কারণ সম্বন্ধকে একটি কাল্পনিক বন্ধন প্রমাণ করিতে গিয়া

অজ্ঞাতসারে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ সত্য বলিয়া মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। অর্থাৎ হিউম স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে পৃথক সত্তার মধ্যে সত্যই একটি কাল্পনিক বন্ধন সৃষ্ট হয়। এভাবে অজ্ঞাতসারে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মানিয়া লইয়াই তিনি তাহাকে অন্তঃকরণের ভ্রমাত্মক ধারণা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। সমসময়িক ভারতীয় দার্শনিকগণ তর্ক ও যুক্তির অবাধ প্রসার স্বীকার করিয়া যে নূতন প্রমাণ প্রণালী উজ্জীবীত করিয়াছেন তাহা এখানে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা অসম্ভব।

ভারতীয় দর্শনের আর একটি অভিনব ধারা উল্লেখযোগ্য।—চরম তত্ত্ব সনাতন ও শাশ্বত বস্তু হইলেও তাহার অনেকান্ত প্রকাশ হইয়া থাকে। এই অভিমতটির মৌলিকতা বর্ত্তমান দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। জৈন দর্শনের সুপরিচিত অনেকান্তবাদ ইহার প্রধান ভিত্তি। তথাকথিত আস্তিক দর্শনের পণ্ডিতগণ সমস্বরে অনেকান্তবাদের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্যদর্শনের কোনও কোনও সিদ্ধান্ত স্যাদ্‌বাদের অনুরূপ হওয়াতে ভারতীয় চিন্তাশীল দার্শনিকগণ ইহাকে সংশয়বাদের অন্তর্গত বলিয়া অবহেলা করে না। উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় হেগেলপন্থী হীরালাল হালদারের কথা স্মরণ করিলেই ইহা জানা যায়। তিনি জৈন দর্শনের স্যাদ্‌বাদকে লাইব্‌নিজের দর্শন শক্তির অপেক্ষা উচ্চতর স্তরে রাখিয়াছেন। ইঁহাদের মূল কথা এই যে বিভিন্ন দর্শন দার্শনিকের যোগ্যতা বা আধিকার অনুযায়ী একই তত্ত্বের অনেকান্ত প্রকাশ।

বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সাধন এই নূতন প্রণালীতে কতকটা সুসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহাদ্বারা বিরোধের অবসান হইতে পারেনা। যোগ্যতার মাপকাঠি প্রত্যেক দার্শনিকের নিকটেই স্বতন্ত্র। একজন নৈয়ায়িক কখনই স্বীকার করিবেন না যে তাঁহার বুদ্ধি বেদান্তির বুদ্ধি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সেই প্রকার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যখন অদ্বৈতবাদীর মতকে খণ্ডন করেন তখন তিনি নিজের বিচার শক্তির উপর একান্ত শ্রদ্ধা দেখাইতে বাধ্য। বর্ত্তমানকালের প্রাচীনপন্থীগণও মুক্তকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর ফনীভূষণ তর্কবাগীশ তাঁহার ন্যায়দর্শন গ্রন্থে বলিয়াছেন যে উদয়নাচার্য্য, বিজ্ঞানভিক্ষু, ভাস্কর রায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ "অধিকারীভেদকে আশ্রয় করিয়া সকল দর্শনের বিশদ সমন্বয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ সমন্বয়ের দ্বারা বিবাদের শান্তি হইতে পারেনা। কারণ প্রকৃত সিদ্ধান্ত বা চরম সিদ্ধান্ত কি, এ বিষয়ে সর্ব্বসম্মত কোনও উত্তর হইতে পারেনা। সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সিদ্ধান্তকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া অধিকারীভেদ আশ্রয় করিয়া অন্যান্য

সিদ্ধান্তের কোনওরূপ উদ্দেশ্য বর্ণন করিবেন। অপরের সিদ্ধান্তকে কেহই চরম সিদ্ধান্ত বা প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া কোনও দিনই স্বীকার করিবেন না।"

কান্টের দর্শন যে ভাবে তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ সুসম্বদ্ধ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে তাঁহারা ভারতের প্রচলিত অদ্বৈতবাদের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহারা পথভ্রান্ত হইয়াছেন। তাহার প্রধান কারণ এই যে তাঁহারা বুদ্ধির সাপেক্ষ বা সম্বন্ধবদ্ধ যুক্তি দিয়া নিরপেক্ষ সত্ত্বা গ্রহণ করিতে অক্ষম ইহা তাঁহারা এখনও ধরিতে পারেন নাই। গ্রীণ এই চরম তত্ত্বটির আভাষ দিয়াও হেগেলের সাপেক্ষ জ্ঞানের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। এইখানেই সমসাময়িক ভারতীয় দার্শনিকগণ পশ্চিমের দার্শনিকগণের পথ প্রদর্শক। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে বৌদ্ধিক মূলসূত্রগুলি যদিও সকল জ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ তথাপি তাহারা সম্বন্ধবদ্ধ জ্ঞানের মধ্যেই সুপ্রযোজ্য। কিন্তু তাহারা নিরপেক্ষ সত্ত্বা গ্রহণের অযোগ্য। এই নিরপেক্ষ সত্ত্বা জানিতে হইলে বুদ্ধির উপরে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে। অদ্বৈত দর্শনের অবচ্ছেদবাদ বুদ্ধির অতীত পদার্থ গ্রহণ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় দর্শনের এই অবদানটী স্পষ্টভাবে বুঝিয়া দর্শন চিন্তাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ করিবার সময় আসিয়াছে। ইহার বিস্তৃত সমালোচনা আমরা স্থানান্তরে করিয়াছি। আমরা সেখানে দেখাইয়াছি যে বুদ্ধির মূলসূত্র পরিত্যাগ না করিয়া তাহার পরিসমাপ্তি নিরপেক্ষ সত্ত্বাতে হওয়া সম্ভব।

স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডারের দর্শন চিন্তা

অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কোন একটি সামগ্রিক ধারণার ভিত্তিতে পরা তত্ত্বের (metaphysics) আলোচনা করার সার্থকতা কোন বাস্তববাদী দার্শনিকেরাই স্বীকার করেন না ; এবং তাঁদের দর্শনে সে রকম কোন আলোচনাও নেই। তাঁদের সকলেরই আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology)। কিন্তু বিখ্যাত বাস্তববাদী দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডারের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রমের সাক্ষাৎ আমরা পাই। যে সমস্ত ইংরেজ দার্শনিকেরা পরাতত্ত্বের আলোচনা করেছেন, আলেকজাণ্ডার তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য বাস্তববাদীরা যেখানে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনাকেই মুখ্য ব'লে গ্রহণ করেছেন, এবং পরাতত্ত্বের আলোচনাকে করেছেন গৌণ ; আলেকজাণ্ডার সেখানে পরাতত্ত্বের আলোচনাকেই করেছেন মুখ্য ; জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা তাঁর কাছে গৌণ। বিশেষ করে এই জন্যই বাস্তববাদের মধ্যে আলেকজাণ্ডারের-দর্শন আলোচনার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে।

আলেকজাণ্ডারের দর্শন বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে, তাঁর চিন্তা গ'ড়ে উঠেছে বিশেষ কতকগুলি প্রভাবের মধ্য দিয়ে। প্রথমতঃ তিনি ভাববাদী দার্শনিক টি, এইচ, গ্রীন ও এফ, এইচ, ব্রাডলের প্রভাবে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন। এদের কল্পনার বিরাটতা, ভাবের গাম্ভীর্য ও আদর্শের মহনীয়তায় আলেকজাণ্ডার বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট' হয়ে প'ড়েছিলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনে বাস্তব বাদের মধ্যে-ও এই প্রভাব কীভাবে কাজ করেছে তা' আমরা পরে দেখ্‌বো। দ্বিতীয়তঃ ভাববাদের সঙ্গে সঙ্গে একই সময়ে আর একটি জিনিষ তাকে প্রায় অভিভূত ক'রে ফেলেছিলো। সে হ'চ্ছে ডার্‌-উইনের ক্রমবিকাশ বাদ। এ বাদে আধুনিক গাণিতিক পদার্থবিদ্যা, ফরাসী দার্শনিক বার্গস'য়ের দর্শন ; এবং নব্য বাস্তববাদের জ্ঞানতত্ত্ব—এরাও আলেকজাণ্ডারের চিন্তায় প্রভাব বিস্তার কম করেনি। তবে সবচেয়ে যেটা বড়োকথা সে হ'চ্ছে এই যে, বহুদিন পরে ইংরেজ দর্শন একটা সুপরিকল্পিত রূপ নিয়ে দেখা দিলো এই প্রথম।

আলেকজাণ্ডারের দর্শন সম্পূর্ণ পরিনত অভিব্যক্তি পেতে বেশ কিছু সময় নিয়েছিলো ; এবং তাঁর দর্শনের মূলে রয়েছ দু'খণ্ডে বিভক্ত মাত্র একখানা বই

'দেশ, কাল ও দেবতা' (Space, Time and Deity.) এর আগে যে আর কোন বই তাঁর প্রকাশিত হয়নি তা নয়। তবে সে সব তার দর্শনের পক্ষে খুব বেশী প্রয়োজনীয় নয়। তার মধ্যে মাত্র একখানা বইয়ের-উল্লেখ করলেই আমাদের কাজ চলবে। সে হ'চ্ছে তাঁর 'নীতি পদ্ধতি ও প্রগতি, (Moral order and Progress 1889). আচরণ তত্ত্বকে আলেকজাণ্ডার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মানুষের আচরণ ও ভালোমন্দ বোধের বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। সমস্ত আচরণ, রীতিনীতি, ভালোমন্দের একটা সামাজিক ভিত্তি ও রূপ আছে। এবং যেহেতু সমাজ কোন স্থির বস্তু নয়, নিয়তপরিবর্ত্তনই তার ধর্ম, সেই জন্য কোন আচরণতত্ত্বই চিরস্থির চূড়ান্ত হ'তে পরেনা। তার মধ্যেও একটা প্রগতি আছে। আর আচরণ তত্ত্ব বা নীতি বোধের এই যে প্রগতি, এর পদ্ধতি হ'চ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতি (Principle of Natural Selection)। ডারউইন তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচন নীতির প্রয়োগ করেছিলেন বস্তুজগতের ক্ষেত্রে। এই পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের পর আদিম প্রাণী থেকে কী ভাবে অন্যান্য বিভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি হলো—তার ব্যাখ্যা করতে গিয়েই ডার-উইনের প্রয়োজন হ'য়েছিলো এই নীতির। কিন্তু ডার-উইনের বস্তু জগৎ থেকে নিয়ে সেই নীতিকেই আলেকজাণ্ডার প্রয়োগ করলেন আচরণ তত্ত্বের ক্ষেত্রে। বেচে থাকার জন্য জীবন সংগ্রাম, সেই সংগ্রামে সবলের জয় ও দুর্বলের পরাজয়; এবং সবলের ক্রমোন্নতি ও দুর্বলের ক্রম বিলুপ্তি—এই হ'চ্ছে ডার-উইনের মতে প্রানীজগতের ক্রমবিকাশের মূল কথা। আলেকজাণ্ডার বললেন যে, আমাদের আচরণ তত্ত্ব বা নীতিবোধও নিয়ন্ত্রিত হয় ঐ একই নিয়মে। আমাদের বিভিন্ন নীতি বোধ আছে। তাদের মধ্যে যেগুলি সবল, সবল প্রাণীর মতোই তারাই টিকে থাকে; এবং নির্বাচন নীতির ফলে দুর্বলগুলি লুপ্ত হ'য়ে যায়। সোজা কথায় যে নীতি বোধের আবেদন গভীর ও প্রবল, মানুষ তাকেই স্বীকার করে নেয়, এবং অন্যগুলিকে ত্যাগ করে। নীতি বোধের এই গভীরতা ও প্রবলতা নির্ভর করে মানুষের এক বিশেষ আদর্শের উপর। সে আদর্শ হ'চ্ছে সাম্যের আদর্শ (concept of equilibrium)। মানবজীবনের বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, ইত্যাদির মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রতিকূলতা দুর করে এক সামঞ্জস্য ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করাই হ'চ্ছে এই আদর্শের উদ্দেশ্য। যে নীতিবোধ তা করতে পারবে, তাকেই বলা যায় প্রবল, এবং তাকেই আমরা স্বীকার ক'রে নিই। ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা এই আদর্শের এক

দিক। কিন্তু মানুষ তো আর শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মানুষ নয়, বৃহত্তর সমাজেরই একজন সে। কাজেই এই আদর্শের একটা সামাজিক রূপও আছে। বিভিন্ন মানুষের চিন্তা ভাবনা, রুচির মধ্যে সর্বপ্রকার বিরোধিতা দূর করে তার পরিবর্তে এক সঙ্গতি ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় যে নীতি বোধ সাহায্য করতে পারবে, সেই নীতি বোধই কল্যানকর ও গ্রহণ যোগ্য।

তা'হলে দেখা যাচ্ছে যে, আচরণতত্ত্বের লক্ষ্য হচ্ছে সাম্য। আলেকজাণ্ডার মনে করেন যে, আচরণতত্ত্বের অন্যান্য যেসমস্ত মতবাদ আছে তাদের মধ্যে তাঁর এই মতবাদ সব চেয়ে ভালো। কেননা, অন্যান্য কোন মতবাদকে তুচ্ছ না করেই তাদের সকলের মধ্যে এক প্রকার সামঞ্জস্য এই মতবাদে খুঁজে পাওয়া যাবে। যখন কোন কাজকে আমরা অসৎ বলে অভিহিত করি, তখন তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সমাজের বর্তমান চিন্তা রুচি আদর্শ ও অবস্থার সঙ্গে সে খাপ খায় না, এবং সমাজজীবনের সাম্যভাবকে সে আঘাত করে। সমাজজীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদর্শের পরিবর্তন হ'তে থাকে। কিন্তু যখন কোন আদর্শ এই পরিবর্তিত আদর্শের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে না পারে তখনই সে তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে। সেই জায়গায় তখন দেখা দেয় নতুন আদর্শ, নীতি। এই ভাবে যুগে যুগে দেখা দেয় নীতি-বোধের প্রগতি। এই হচ্ছে আলেকজাণ্ডারের আচরণতত্ত্বের মূলকথা। এর পর প্রায় তিরিশ বছরের মধ্যে, অল্প কিছু লেখা প্রকাশিত হলেও, তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া যায় নি আলেকজাণ্ডারের কাছ থেকে তিরিশ বছর পর দেখা দিলো তার "দেশকাল ও দেবতা।" আলেকজাণ্ডারের যা কিছু বক্তব্য তার পূর্ণ ও বিস্তৃত অভিব্যক্তি হচ্ছে এই বই। আমাদের সুবিধার জন্য আমরা তাঁর জ্ঞানতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করবো।

আলেকজাণ্ডারের দর্শন আলোচনার প্রধান মুখ্য বিষয় হ'চ্ছে পরাতত্ত্ব। কাজেই জ্ঞানতত্ত্বকে অন্যান্য বাস্তববাদীরা যেভাবে একটা স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে আলোচনা করেছেন, আলেকজাণ্ডার তা করেননি। তাঁর কাছে জ্ঞানতত্ত্ব, পরাতত্ত্বের ব্যাপক ও গভীর আলো-চনার একটি ভূমিকা মাত্র; আর কিছু নয়। এই দিক থেকেই তিনি তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে জ্ঞান হ'চ্ছে দু'টি বস্তুর মধ্যে এক প্রকার সম্পর্ক বা সম্বন্ধ (relation)। এই সম্বন্ধ বা সম্পর্ক হ'চ্ছে সহ-উপস্থিতি (compresence, togetherness) বা সন্নিকর্ষ। সাধারণ যে কোন দু'টি বস্তু এক সঙ্গে এক জায়গায় উপস্থিত থাকলে তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ হয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-র ভিতর

সেই একই সম্বন্ধ। ঘরের মেঝে, ও তার উপর দণ্ডায়মান টেবিলটির মধ্যে যে সহ-উপস্থিতি-মূলক সম্বন্ধ, সেই একই সম্বন্ধ হবে ঐ টেবিল, ও ঐ টেবিলেরই জ্ঞাতা আমার মধ্যে। এ যদি ঠিক হয়, তবে টেবিলটি জ্ঞাতা এবং মেঝেটি জ্ঞেয়; অথবা মেঝেটি জ্ঞাতা ও টেবিলটি জ্ঞেয় হয় না কেন? এর উত্তরে আলেকজাণ্ডার বলেন যে, যখন কোন দুটো বস্তু একই সময় একই স্থানে উপস্থিত থাকে তখন তাদের যে-কোন একটির মধ্যে চেতনা নামে আর একটি পদার্থ উপস্থিত থাকলে তবেই সেখানে দেখা দেবে জ্ঞান; এবং যার মধ্যে সেই চেতনা দেখা যায় তাকেই বলা হয় জ্ঞাতা। কাজেই মর্যাদার দিক থেকে অন্য যে কোন পদার্থের চেয়ে জ্ঞাতার যে বিশেষ কোন মূল্য আছে, এ কথা বলা যায় না। ভাববাদী দার্শনিকেরা বলেছিলেন, জ্ঞাতা অর্থাৎ মন অন্য যে-কোন পদার্থের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক এবং মর্যাদার দিক থেকে মনের আসন উচুতে। আলেকজাণ্ডার কিন্তু মন ও বস্তুকে আলাদা বলে মনে করেন না। পৃথিবীর যাবতীয় অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞাতাও একটি অস্তিত্ব। কাজেই বাস্তব পদার্থের অস্তিত্ব যে জ্ঞাতার উপর নির্ভর করে একথাও বলা চলে না। জ্ঞেয় বস্তু জ্ঞাতা নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। জানা ও না জানাতে জ্ঞেয় বিষয় বস্তুর কোন তারতম্য হয় না। বরং বলা যেতে পারে যে মনই নির্ভর করে জ্ঞেয় বস্তুর উপর। যে-কোন বস্তুর একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থ বা অস্তিত্ব আছে। যেমন 'গাছ'। 'গাছ' শব্দটি উচ্চারণ করতেই তার একটা অর্থ আমরা বুঝি। কিন্তু চেতনা (conciousness) বলতেই প্রশ্ন আসে কিসের চেতনা (conciousness of)? অর্থাৎ 'চেতনা' সব সময়েই কোন না কোন বস্তুর চেতনা। এই জন্যই আলেকজাণ্ডার বললেন যে, চেতনা বা জ্ঞাতা নির্ভর করে জ্ঞেয় বস্তুর উপর। শুধু মাত্র বস্তুই যে জ্ঞাতার বাইরে তা নয়; আলেকজাণ্ডার বলেন যে অনুভূতি কনিকা (percepta, sensa) ও মন বহির্ভূত। বস্তুবাদী দার্শনিকেরা বস্তুকে বলেছেন মন নিরপেক্ষ; কিন্তু জ্ঞানের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা অনুভূতি কনিকাকে বর্ণনা করেছেন মানসিক বলে। এ বিষয়ে আলেকজাণ্ডার তাঁদের থেকে আর এক ধাপ এগিয়ে গেলেন ও বললেন যে, অনুভূতি কনিকারাও মনের বাইরের বাস্তব অস্তিত্ব। এরা জ্ঞেয় পদার্থেরই অংশ অথবা এরা নিজেরাই জ্ঞেয় পদার্থ। কাজেই অন্যান্য দার্শনিকেরা জ্ঞেয় বস্তু ও মনের মধ্যে সেই বস্তুর প্রতিচ্ছবি এই দু'টিকে পৃথক বলে যে কল্পনা করেছেন,—সে ভুল। জ্ঞেয় বস্তু ও তার মানসিক প্রতিচ্ছবি প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন। মনের মধ্যে জ্ঞেয় বস্তুর যে প্রতিচ্ছবি আমরা পাই আসলে সে হচ্ছে আমাদের বস্তুজ্ঞানেরই বিভিন্ন দৃষ্টি প্রনালী বা দৃষ্টিকোন (prespective)। আমাদের যে বস্তুজ্ঞান হয়, তা এরই সাহায্যে। কোন একটি বস্তুজ্ঞানের সময়ে আমার

যে দৃষ্টি কোন থেকে সেই জ্ঞান আসবে তার প্রকৃতি নির্ভর করে আমার অবস্থানের উপর —অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু থেকে কোন্ দিকে, কতো দূর থেকে, কোন সময়ে আমার জ্ঞান হ'চ্ছে তার উপর। এ দিক থেকে বিচার করলে যে কোন বস্তুর দৃষ্টি কোন অসংখ্য হ'তে পারে, একথা মানতে হবে। আর যেহেতু মানসিক প্রতিচ্ছবি বা দৃষ্টিকোন ও জ্ঞেয় বস্তু এক ও অভিন্ন, সেই জন্যই আলেকজাণ্ডার বললেন যে, অসংখ্য দৃষ্টিকোনের সমষ্টিই হচ্ছে যে কোন এক একটি বস্তু। আমাদের নিজেদের অবস্থান অনুসারে এই অসংখ্য দৃষ্টিকোন থেকে কতকগুলি আমরা নির্বাচন করে নিই। তাকেই আমরা বলি বস্তু জ্ঞান। দৃষ্টি কোনগুলি তাহলে মিথ্যা নয়। তাদের একমাত্র ত্রুটি হচ্ছে এই যে, সম্পূর্ণ বস্তুটির তারা শুধুমাত্র একটি অংশ। কিন্তু অস্তিত্বের দিক থেতে তারা যে কোন বাস্তব পদার্থেরই মতো বাস্তব। এই ভাবে আলেকজাণ্ডার বাস্তববাদকে তার চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন; এবং যে কথা তিনি বললেন তা হ'য়ে দাঁড়ালো ভাববাদী দার্শনিক বার্কলের ঠিক উল্টো। বার্কলে বলেছিলেন যে, যে কোন বস্তুপদার্থ মানেই মনের চিন্তারূপ (idea); আর আলেকজাণ্ডার বললেন যে, যে কোন চিন্তা মানেই বস্তুপদার্থ। বস্তু পদার্থের স্বকীয় অস্তিত্ব অস্বীকার করে বার্কলে সব কিছুকেই বলেছিলেন মনের চিন্তারূপ; তেমনি আলেকজাণ্ডার বললেন যে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সময় যে-কোন জিনিষ মনের সামনে আসুক না কেন, সবই মনের বাইরে বস্তু পদার্থ। এ কথা যে শুধু মাত্র চিন্তারূপের ক্ষেত্রেই সত্য তা নয়। স্মৃতি, কল্পনা, ভ্রান্ত জ্ঞান, এমনকি সার্বিক গানিতিক প্রতীক ইত্যাদিতেও এ সত্য। যেমন, স্মৃতির সময়ে আমরা যে মনের মধ্যে অতীতের একটি ছাপ দেখি, এবং তার সাহায্যে আমরা অতীতের ধারণা করি, তা' নয়। বরং আসল সত্য হ'চ্ছে এই যে, অতীতকে আমরা সামনাসামনিই প্রত্যক্ষ করি। আবার ভ্রান্ত জ্ঞানও সম্পূর্ণ মিথ্যা বা মানসিক নয়; তারাও বস্তুজগতেরই দৃষ্টিকোন। কেবল, সেই সব দৃষ্টিকোনকে যে বস্তুর অংশ বলে আমরা মনে করি, আসলে তারা সে বস্তুর অংশ নয়। আমাদের মনের মধ্যে তারা স্থানচ্যুত হ'য়ে পড়েছে। এখানেও মন নতুন কিছু সৃষ্টি করছে না। শুধুমাত্র বাস্তব জগতেরই কতকগুলি উপাদান নিয়ে এমন ভাবে সাজিয়েছে, যার ফলে যথার্থ বস্তুর জ্ঞান আমাদের এখানে হ'তে পারছে না।

জ্ঞানতত্ত্বের প্রসঙ্গে আলেকজাণ্ডার আর একটা কথা বলেছেন। আমরা বস্তু জগতের জ্ঞান যেমন পাই, তেমনই পাই মানসিক ক্রিয়া ও মনোজগতের জ্ঞান। তবে একটু পার্থক্য এদের মধ্যে আছে। বস্তুজগতের জ্ঞান প্রত্যয় জ্ঞান; অর্থাৎ সে জ্ঞান আসে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির মধ্য দিয়ে। আর মনোজগতের জ্ঞান উপলব্ধি জ্ঞান; অর্থাৎ

মনের বিভিন্ন বৃত্তি—সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদির যে জ্ঞান আমরা পাই তা আমরা পাই এক প্রকার অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির দ্বারা। যে কোন জ্ঞেয় বস্তুর মনের বাইরে একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে। জ্ঞান মানেই সেই বস্তু ও মনের সন্নিকর্ষ। কিন্তু মনকে তো আর দ্বিখণ্ডিত করে, এক অংশকে বাইরের জগতে প্রক্ষেপ করে পুনরায় তাকে অন্য অংশের সামনা সামনি আনা যায় না। অথচ মনোজগতের জ্ঞান আমাদের হয়। তাই বস্তু জগতের জ্ঞান সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হ'য়েছিলো তার থেকে একটা আলাদা ব্যাখ্যা আবশ্যক হ'য়ে পড়লো। সেই জন্যই আলেকজাণ্ডার জ্ঞানের মধ্যে দু'টো ভাগ করলেন। কিন্তু সব চেয়ে যেটা বড় কথা সে হচ্ছে এই যে, এই দু'ধরণের জ্ঞান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্বন্ধহীন নয়। যে-কোন বস্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞাতা মন একই সঙ্গে দু'টি কাজ করে—বস্তুচিন্তা (contemplation of its objects), ও আত্মোপভোগ (enjoying itself)। যখন কোন বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন সেই প্রত্যক্ষটিই হ'চ্ছে বস্তু চিন্তা আর সেই প্রত্যক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে আমার যে চেতনা সেই হচ্ছে আত্মোপভোগ। যে কোন জ্ঞানের সময়ে এ দু'টি জিনিষই উপস্থিত থাকে; এদের মধ্যে সংযোগের সূত্র হ'চ্ছে এই সহ-উপস্থিতি।

এই হচ্ছে আলেকজাণ্ডারের জ্ঞানতত্ত্বের মূল কথা। আমরা আগেই বলেছি যে, আলেকজাণ্ডারের উৎসাহ ও অনুরাগ প্রধানতঃই পরাতত্ত্ব সম্বন্ধে। জ্ঞানতত্ত্ব হ'চ্ছে তার ভূমিকা মাত্র। সুতরাং এখন আমরা তাঁর পরাতত্ত্বের আলোচনা করবো। আলেক-জাণ্ডারের পরাতত্ত্বের মূল সূত্র হ'চ্ছে তাঁর 'দেশকাল'-বাদ (doctrine of Space-Time). ভাববাদী দর্শনে পরম ব্রহ্ম যেমন সমস্ত সৃষ্টির উৎস; আলেকজাণ্ডারের দর্শনে 'দেশ-কাল' তেমনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস। তবে ভাববাদে, বিশেষতঃ হেগেলীয় ভাববাদে পরম ব্রহ্মের কল্পনা করা হ'য়েছে সৃষ্টি প্রগতির চরম পরিণতি হিসেবে; আর আলেকজাণ্ডারের দর্শনে দেশ-কালের কল্পনা করা হ'য়েছে সৃষ্টি প্রগতির আদিতম অবস্থা হিসেবে। 'দেশ-কাল' হ'চ্চে বস্তুজগতের আদিম উপাদান। এই হ'চ্ছে সমগ্র জগতের মূল।

দেশ ও কালকে দু'টো আলাদা পদার্থ হিসেবে না দেখে তাদের মধ্যে একটা জোড় মিলিয়ে তারই থেকে জগতের ব্যাখ্যা করার এই যে প্রচেষ্টা—স্পষ্টতঃই এটা আধুনিক যুগের গানিতিক পদার্থবিদ্যার কথা। বিশেষতঃ আইনষ্টাইন ও তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গেই এর যোগ। আলেকজাণ্ডার দেখলেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের এই অভিনব আবিষ্কারটি শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক ধারণাই নয়; সুদূর প্রসারী ও অতিগুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক তাৎপর্যও এর র'য়েছে। তাই দেশকালের বিশুদ্ধ গানিতিক অংশটিকে বাদ দিয়ে তার

মূল সিদ্ধান্তটিকে তিনি প্রয়োগ করলেও দর্শনের ক্ষেত্রে। বাস্তব জগতে 'দেশ' ও 'কাল' অবিচ্ছেদ্য এক ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। যে কোন একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করে নেওয়া মানেই সেই মিলিত ঐক্য থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে আনা। কিন্তু এই বিচ্ছেদ সম্ভব শুধুমাত্র আমাদের চিন্তার মধ্যে ; বাস্তব জগতে তা' অসম্ভব। বাস্তব জগতে এমন কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না যেখানে শুধুমাত্র দেশ আছে, কাল নেই ; অথবা শুধুমাত্র কাল আছে, দেশ নেই। প্রত্যেকটি বস্তুই এই দু'য়ের সম্মেলনে গঠিত। এটা আমাদের অতি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা। মোটের ওপর, দেশ ও কাল পরস্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত, এবং একটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি থাকতে পারে না, এবং একটি অন্যটির পরিপূরক। 'কাল'-কে যদি দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিছক কালগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করা যায়, তাহলে সেখানে শুধুমাত্র পারম্পর্য (successiveness) ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যাবে না। কতকগুলি মুহূর্তের পরপর আবির্ভাব ও অন্তর্ধান নিয়ে এই পারম্পর্য। মুহূর্তগুলির' কতকগুলি দেখা যায় অন্যগুলির চেয়ে আগে, আর অন্য কতকগুলি দেখা যায় পরে। এই সব মুহূর্তের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কোন কিছুই পাওয়া যাবেনা। এমন কি, অতীতের কোন মুহূর্ত বর্তমানের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়েছে এমন কথাও আমরা বলতে পারিনা। কেননা, প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হ'য়ে যাচ্ছে। পারম্পর্যের দিক থেকে তাহলে কালের মধ্যে 'বর্তমান' ভিন্ন আর কিছু থাকতে পারে না। কারণ, বর্তমানের বাইরে আর কিছু থাকতে হ'লে বর্তমানের সঙ্গে তার যোগ থাকা আবশ্যক। তা' নাহলে তো তাকে আমরা বুঝতেই পারবো না। অথচ কাল-কে যদি তার নিছক কালগত বৈশিষ্টের দিক থেকে দেখা যায় তাহলে তার মধ্যে সেই ধরাবাহিক যোগসূত্র পাওয়া যাবে না। কাজেই আলেকজাণ্ডার বললেন যে, শুধুমাত্র তার নিজের দিক থেকে বিচার করে যে-কালের পরিচয় আমরা পাই, সেটা কালের প্রকৃত রূপ নয়। সে অসম্পুর্ণ। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে আগে ও পরের মধ্যে, এক ধারাবাহিক প্রবাহের জন্য, তাহলে, অন্য আর একটা কিছু আবশ্যক। সেই আবশ্যকীয় অন্য আর একটা কিছু হলো 'দেশ'। কালের বিচ্ছিন্ন মুহূর্তগুলির যে ধারাবাহিকতা বা গতিশীল স্থায়ী যোগসূত্র (Duration) আমরা পাই, তা এই দেশেরই অবদান। কাজেই যেহেতু শুধু পারম্পর্য নয়, ধারাবাহিকতাই কালের প্রধান লক্ষণ, আর যেহেতু এই ধরাবাহিকতা আসে দেশ থেকে, সেই জন্যই কালের একটা দেশগত দিকও আছে। আর এই দেশাগত দিকটিকে নিয়েই কালের

প্রকৃত রূপ, যার নাম গতি প্রবাহ (Duration)

ঠিক এই একই ভাবে বিচার করে দেখা যাবে যে, 'দেশ'-ও কাল-কে বাদ দিয়ে থাকতে পারে না। কালের ক্ষেত্রে যেমন বিচ্ছিন্ন কতকগুলি মূহুর্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য প্রয়োজন দেশের ; তেমনি দেশের ক্ষেত্রে অখণ্ড এক ব্যপ্তির মধ্যে বহুত্বও বৈচিত্র্যের জন্য প্রয়োজন কালের। দেশকে যদি শুধু তার নিজের দিক থেকে বিচার করা যায় তা'হলে শুধু মাত্র এক অখণ্ড ব্যাপ্তি ভিন্ন আর কিছুই আমরা সেখানে পাবো না! সে যেন এক বিরাট শূন্যতা। বস্তু জগতের যে বহুলতা ও বৈচিত্র্য আমরা দেখতে পাচ্ছি তা' এই বিরাট শূন্যতার মধ্যে অবলুপ্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু এই অখণ্ড ঐক্যই দেশের একমাত্র লক্ষণ নয়। এমন কি, বোধ হয় ঐটা দেশের প্রকৃত স্বরূপই নয়। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বহুলতা ও বৈচিত্র্য নিয়েই দেশের অস্তিত্ব। এবং বিশুদ্ধ দেশগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার ক'রে দেশের যে অখণ্ড ব্যাপ্তি, তার থেকে এই বহুলতা ও বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। কাজেই এই বৈশিষ্ট্যের জন্য যেতে হবে দেশের বাইরে এমন আর কোন অস্তিত্বের কাছে যা নিজে দেশগত নয়, অথচ দেশের অখণ্ড ব্যাপ্তির মধ্যে বহুলতা ও বৈচিত্র্য আনতে সমর্থ। সেই অস্তিত্ব হ'চ্ছে কাল ; যা না থাকলে বহুলতা ও বৈচিত্র্যহীন হ'য়ে 'দেশ' শুধু মাত্র এক অখণ্ড ব্যাপ্তিময় শূন্যতায় পর্যবসিত হ'য়ে যায়, এবং যা থাকলে তা হয় না সেই জিনিষটিই আমরা পাই কালের কাছ থেকে। দেশকে বাদ দিয়ে তাহলে কালগত ঐক্য সম্ভব নয়, আবার 'কাল' বাদ দিয়ে সম্ভব নয় বহুলতা ও বৈচিত্র্য। অর্থাৎ যেকোন দেশকে বিশেষ কোন কালাংশ অধিকার করে থাকতেই হবে, এবং যে কোন কালও বিশেষ কোন দেশকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ অর্থহীন। এবং শুধুমাত্র মূহুর্ত্ত বা বিন্দু (point) বলে কিছু নেই। যা আছে, সে হচ্ছে কালের ক্ষুদ্রতম অংশ মূহুর্ত, ও দেশের ক্ষুদ্রতম অংশ বিন্দু—অর্থাৎ 'বিন্দু-মুহুত' আলেকজাণ্ডার এরই নাম দিলেন বিশুদ্ধ ঘটনা (pure event)।

দেশ ও কালের জোড় মিলিয়ে 'দেশ-কাল' সম্পর্কে যে আলোচনা আলেকজাণ্ডার করেছেন তার কিছু পরিচয় আমরা পেলাম। আমরা অগেই উল্লেখ করেছি যে আলেকজাণ্ডারের দর্শনে 'দেশ-কাল'ই হ'চ্ছে সমগ্র সৃষ্টির মূল ও আদি উপাদান (Primal stuff) এরই থেকে সৃষ্টি হয়েছে সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ। এই দিক থেকে জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের মূল ঐক্য সূত্র হ'চ্ছে এই দেশকাল। আবার আদি উপাদান থেকে উদ্ভূত হ'য়ে যখন দেখা দিলো বৈচিত্র্যময় জগৎ-প্রকৃতি তখনও সেই বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত স্বরূপও হ'চ্ছে এই দেশকাল। অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চ দেশকাল থেকেই উদ্ভূত ও দেশকালেই

বিধৃত। এই দিক থেকে একে ঈশ্বরও বলা যেতে পারে। কেননা দেশকালের বাইরে অন্য কোন কিছু কল্পনা করা অসম্ভব; এবং ঈশ্বরকেও থাকতে হবে এরই মধ্যে।

দেশকালকে সমগ্র সৃষ্টির আদি উপাদান ব'লে এই যে কল্পনা, এ প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। উপাদান বলতে সাধারণতঃই আমেরা বুঝি বস্তু, যেমন ইট্, পাথর কাঠ ইত্যাদি। কিন্তু সৃষ্টির আদি উপাদান হিসেবে দেশকাল এরকম কোন বস্তু (matter) নয়; যাবতীয় বস্তু পদার্থেরাই (material objects) এই আদি উপাদান 'দেশকাল' থেকে উদ্ভুত। অথচ সেই উপাদান মনও নয়। কাজেই সেই সে হচ্ছে সর্ব-অস্তিত্বপূর্ব (a priori) সত্য। এই সর্ব অস্তিত্বপূর্ব আদি উপাদান দেশকালের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সে হচ্ছে তার গতি (movement)। দেশকাল স্বভাবতঃই নির্গুন (qualityless)। কিন্তু গতিই বোধহয় তার একমাত্র গুন। গতি বলতে আমরা বুঝি কোন পদার্থের বা বস্তুর গতি। বিশেষ কোন একটি বস্তুকে বাদ দিয়ে আমরা গতির ধারণা করতে পারিনা। কিন্তু আলেকজাণ্ডার যখন দেশকালের গতির কথা বলছেন্ তখন সমস্ত বস্তুকে বাদ দিয়ে গতির নিজস্ব বিশুদ্ধ রূপের কথাই তিনি বলেছেন। তার একটা কারণও আছে। সে হচ্ছে এই যে, 'দেশকাল' সমস্ত বস্তুর আদি উপাদান। কিন্তু বস্তুপদার্থ তার মধ্যে দেখা দেয়নি। কাজেই গতি যদি সেখানে থাকে তাহলে বস্তুকে বাদ দিয়ে তার বিশুদ্ধ রূপেই সেখানে থাকতে হবে। অতএব এই বিশুদ্ধ গতি, সমস্ত বহুলতা বৈচিত্র্য ইত্যাদির পূর্বজ। এবং দেশকালেরই ন্যায় আদি উপাদান। কেননা, আদি উপাদান বা উৎস 'দেশকাল' থেকে উদ্ভুত হ'য়ে কোন বস্তুই যেমন তার বাইরে যেতে পারে না, তেমনি দেশকালের সঙ্গে সঙ্গে সেই আদি গতি স্রোত থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে কোন বস্তুই সেই গতির উত্তেজনা অতিক্রম করতে পারেনা। সমস্ত বস্তুই তাই গতিশীল। কোন কিছুই স্থির নয়। একটি পদার্থও যদি স্থির হতো, তাহলে সমস্ত গতিপ্রবাহই স্তব্ধ হ'য়ে যেতো। এবং দেশকালও অর্থহীন হয়ে পড়তো। যাকে আমরা বলছি স্থির, সে-ও প্রকৃতপক্ষে অস্থির। সমগ্র সৃষ্টিটাই একটা গতি প্রবাহ।

এই দেশকালকে তার বিশুদ্ধ স্বরূপে আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই নে। বিস্তৃত ও স্থায়িত্বের (extansion & duration) মধ্য দিয়ে তাকে আমরা জানি। কোন একটা বস্তু কিছু পরিমাণ স্থান অধিকার করে আছে। এবং কিছু সময় পর্যন্ত বর্তমান আছে! এই রকম বিস্তৃতি ও সাময়িক বস্তুর জ্ঞানের মধ্যে বিশুদ্ধ দেশকালকে

আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারিনে। অর্থাৎ দেশ ও কাল আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর নয়। ইন্দ্রিয় গোচর হ'চ্ছে বস্তু ; এবং প্রতি বস্তু-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্বের মধ্য দিয়ে দেশ-কালের যে-চেতনা আমাদের হ'চ্ছে তার নাম বোধি (intuition)। চিন্তা থেকে এর প্রকৃতি আলাদা। কিন্তু চিন্তা ও ইন্দ্রিয় প্রত্যয়—এ দুই-ই হচ্ছে এই বোধি থেকে উদ্ভূত (out growth)। দেশ ও কালের এই বোধি যে শুধুমাত্র বস্তু জ্ঞানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। যখন আমরা কোন গুণ (quality) প্রত্যক্ষ করি তখনও আমরা দেশ কালের বোধ পাই। যেমন কোন রং। কোন রং-য়ের জ্ঞান যখন আমরা পাই, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে যে পরিমাণ স্থান ও কাল অধিকার ক'রে সেই রংটি বিস্তৃত হয়ে আছে তার বোধ-ও আমাদের হয়। নির্দিষ্ট কোন একটি দেশ ও কাল বাদ দিয়ে কোন রং-ই থাকতে পারেনা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এইপ্রকার দেশকালের জ্ঞান সসীম ও সান্ত (finite)। সর্বব্যাপী, অসীম ও অনন্ত দেশকালের এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশমাত্র। কেননা, নির্দিষ্ট একটি সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে যাবার ক্ষমতা ইন্দ্রিয় জ্ঞানের নেই। তাই অখণ্ড দেশকালের জ্ঞান-ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়না। যে জ্ঞান পাওয়া যায় আমাদের চিন্তার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের সাহায্যে যে খণ্ড খণ্ড দেশকালের বোধ, চিন্তা দ্বারা তাদেরই ব্যাপক ও সম্মিলিত ফল হ'চ্ছে অখণ্ড দেশ কালের জ্ঞান। এ জ্ঞান তাই ধারণাগত (conceptual)। কিন্তু 'ধারণাগত' কথার দ্বারা যদি কেউ মনে করি যে যেহেতু দেশকাল একটা ধারণাগত বিষয়, সেই সে নেহাৎ-ই এক মানসিক কল্পনা মাত্র, এবং অবাস্তব, তাহলে মস্ত ভুল করা হবে। কেননা বাস্তবতা ও সত্যের এক চেটিয়া অধিকার যে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় জ্ঞানেরই আছে এমন কথা বলা চলে না। পরম সত্তা ও সত্যে উপনীত হবার আরও উপায় বা পথ আছে। আর তা বাদেও দেখা যাবে যে,ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের মধ্য দিয়ে যে খণ্ড খণ্ড দেশ-কালের বোধ হয় তারাও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। কেননা তারা প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে এক অখণ্ড দেশ কালের আভাস বহন করে।

এ পর্যন্ত আমাদের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যে-কোন বস্তুর অস্তিত্ব মানেই নির্দিষ্ট এক 'দেশ-কাল' অধিকার করে থাকা। যে-কোন বস্তুর অস্তিত্বের পক্ষে এই 'দেশ-কাল' ধর্ম সব চেয়ে গোড়ার কথা। কিন্তু এই মৌলিক ধর্ম বাদে, বস্তুর জীবনে আরও কতকগুলি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে দু'টি শ্রেণী প্রধান। প্রথম কতকগুলি ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য আছে যারা সাধারণ, অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর মধ্যেই বর্তমান। এইগুলির নাম সার্বিক ধর্ম (categories)। আর দ্বিতীয় কতকগুলি ধর্ম

আছে যারা বস্তু ভেদে বিভিন্ন প্রকার। এদের নাম গুণ-ধর্ম (qualities) গুন ধর্মগুলি আমাদের ব্যবহারিক বস্তু জগতের জিনিষ। ব্যবহারিক বস্তু জগতের উপরই নির্ভর করে তাদের অস্তিত্ব। কিন্তু সার্বিক ধর্মগুলি সেরকম নয়। তারা ব্যবহারিক বস্তু-জগৎ-নিরপেক্ষ। বরং ব্যবহারিক বস্তু জগতই নির্ভর করে তাদের উপর। এই দিক থেকে তারা সর্ব-আস্তত্ব-পূর্ব (a priori)। এবং যেহেতু আমাদের সমস্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর করে তাদেরই উপর, সেই জন্য তারা অপরিহার্য (categorical)। তারাই হ'লো বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল কাঠামো। আলেকজাণ্ডার দেখিয়েছেন যে, এই অপরিহার্য, সর্ব-অস্তিত্বপূর্ব সার্বিক ধর্মগুলি আট প্রকার : (১) তাদাত্ম (identity) বৈচিত্র্য (diversity) ও অস্তিত্ব (existence); (২) সার্বিক (universal), বিশেষ (particular), ও একত্ব (individual); (৩) সম্বন্ধ (relation); (৪) ক্রম বা বিন্যাস (order); (৫) পদার্থতা (substance), কার্যকারণতা ও পরস্পারিকতা (receprocity); (৬) পরিমান ও গভীরতা (intensity); (৭) সমগ্র ও অংশ ও সংখ্যা; (৮) গতি। ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের যে কোন অভিজ্ঞতা হোক না কেন, তার মধ্যে এই সার্বিক ধর্মগুলি থাকবেই।

কোন বস্তুর অস্তিত্ব মানে নির্দ্দিষ্ট এক দেশ কাল অধিকার করে থাকা। আর যে কোন নির্দ্দিষ্ট দেশকালে ঠিক সেই একটি বস্তু ভিন্ন আর কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। বস্তু অস্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্যই হ'চ্ছে তাদাত্ম। যেমন ঠিক যে মুহূর্তে ও যে যায়গায় এই লাল বিন্দুটি দেখা যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে ও সেই জায়গার অন্য কিছুই থাকতে পারে না। অর্থাৎ, বস্তুর তাদাত্ম নির্ভর করে দেশকালের নির্দ্দিষ্ট এক সংকীর্ণ অংশের উপর। কিন্তু দেশ কালের সংকীর্ণ অংশ বহু। কাজেই তাদাত্মও বহু। সেই জন্যই বলা হয় হয় যে তাদাত্ম ও বৈচিত্র্য সহচর। তেমনি, দেশকাল যতোক্ষন বিশুদ্ধ ততোক্ষণ নির্বিশেষ সার্বিক। তার মধ্যে তখন একত্ব, বিশেষ ইত্যাদির কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু যেই সে বস্তুরূপ নিলো তখনই দেখা দিলো একত্ব ও বিশেষতা। নির্বিশেষ সার্বিকের যে বিশিষ্ট রূপ তাহাই একত্ব। এমনি করে আলেকজাণ্ডার সমস্ত সার্বিক ধর্মগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের মধ্যে কার্য কারনিকতাটি সমগ্র দার্শনিক আলোচনার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এবং দার্শনিক প্রবর হিউমের অবদানই বোধ হয় এই প্রসঙ্গে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকারণ সম্বন্ধে নানাপ্রকার সংস্কার ও অস্পষ্টতা দূর ক'রে যে কথা তিনি বলেছিলেন তার মর্ম হ'চ্ছে এই যে, কার্য ও কারণের মধ্যে তাদের নিজস্ব কোন অবিচ্ছেদ্য যোগ নেই। তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র দুটি অস্তিত্ব কিন্তু কেন যে তারা সব সময়ে এক সঙ্গে দেখা দেয় সে সম্বন্ধে হিউম বিশেষ

কিছু বলতে পারেননি। 'খ' কার্যটির কারণ হচ্ছে 'ক'; অর্থাৎ কয়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় 'খ'-য়ের আবির্ভাব। কিন্তু কোন রকম যোগসূত্র যদি তাদের মধ্যে নাই থাকে এবং যদি তারা হয় সম্পূর্খ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র, তাহ'লে তাদের মধ্যে এই অনিবার্য অনুগামিতা সম্ভব হয় কি করে? এর একটি অত্যন্ত সহজ ব্যাখ্যা দিলেন আলেকজাণ্ডার তাঁর 'গতিবাদ' (concept of movement) দ্বারা। 'দেশ-কাল' জিনিষটি কোন স্থির বস্তু নয়। নিজেরই একটা গতিপ্রবাহ তার আছে। কাজেই বস্তু জগতের সমস্ত গতি সেই গতি-প্রবাহের অন্তর্গত। এবং দেশকালের সেই একক গতি প্রবাহের অংশ হিসেবে বস্তু জগতের যে কোন গতি অন্য যে-কোন গতির সঙ্গে সংযুক্ত। আর এই দেশকালের অন্তর্গত একটি গতির সঙ্গে আর একটি গতির এই যে সংযুক্ত প্রবাহ এরই নাম কার্যকারনিকতা (causality)। এ হ'চ্ছে বিভিন্ন গতির মধ্যে একপ্রকার সংযোগ যার মূল কথা হ'লো সংক্রমন (transition)। অর্থাৎ কারণটি কার্যের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে যায় না; অথবা কারণটি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলো এবং তার জায়গায় দেখা দিলো কার্য—তা-ও নয়। আসল কথা হ'চ্ছে বিভিন্ন গতির মধ্যে এক প্রকার সংযোগ।

দেশ-কাল সমগ্র সৃষ্টির আদি উৎস, আর সার্বিক-ধর্ম তার পরবর্তী স্তর। এই সার্বিক-ধর্ম-আশ্রিত দেশকাল থেকে অভিব্যক্ত হ'চ্ছে বস্তু জগৎ। কিন্তু সার্বিক-ধর্ম থেকে আসছে শুধু মাত্র বস্তুর কাঠামো। বস্তু এখনো রূপায়িত হ'য়ে ওঠেনি। সেটা সম্পূর্ণ হ'চ্ছে গুণধর্মের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বস্তু জগতের রূপায়ন বা অভিব্যক্তি এখানেই থেমে রইলো না। ধাপে ধাপে এগিয়ে চললো নব নব সৃষ্টির মাঝদিয়ে। প্রতিটি স্তরের আবির্ভাব হ'চ্ছে ঠিক তার পূর্ববতা স্তর থেকে। কিন্তু প্রতিটি স্তরের মধ্যেই দেখা দিচ্ছে এমন একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা তার পূর্ববর্তী স্তরের মধ্যে নেই। এই অভিনব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটির নাম 'নবোদ্ভূত গুণ' (emergent quality)। এই জিনিষটি আলেকজাণ্ডার পেয়েছিলেন লয়েড মর্গানের (Lloyd Morgan) কাছ থেকে। লয়েড মর্গানের চিন্তার সঙ্গে অবশ্য আলেকজাণ্ডারের কোন মিলই ছিলো না। তবু এই নবোদ্ভূত গুণের ধারণাটি আলেকজাণ্ডার লয়েড মর্গানের কাছ থেকে নিতে দ্বিধা করেন নি। কারণ, ভাববাদ ও যান্ত্রিকতাবাদের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধিতা ও একদেশদর্শিতা তার একটা সহজ সমাধান আলেকজাণ্ডার এর মধ্যে খুঁজে পেলেন। এক মাত্র মনই সত্য বস্তুজগৎ কিছু নয়, ভাববাদের এই চরম মতবাদ যেমন স্বীকার করা যায় না; তেমনি আবার মানুষের মন ও চেতনার স্বকীয়তা অস্বীকরে ক'রে তার যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা—তা-ও সন্তোষজনক নয়। সুতরাং আলেকজাণ্ডার এমন একটা উপায় খুঁজছিলেন যার দ্বারা

নিছক যান্ত্রিকতার বাইরে মন বা চেতনার স্বকীয়তাও রক্ষা করা যায়, অথচ বস্তু জগত-ও অস্বীকৃত না হয়। নবোদ্ভূত গুণের ধারনাটি তাকে সেই উপায় দেখিয়ে দিলো। মন বা চেতনা—এক কথায় মানুষ—ক্রমবিকাশের একটা স্বাভাবিক স্তর। যে-কোন জড় বস্তুর মতো মানুষ ও প্রকৃতির অন্তর্গত একটি সৃষ্টি। কিন্তু তবু নিছক যান্ত্রিক জড় পদার্থ সে নয়। নিজস্ব এক অভিনব বৈশিষ্ট্য-ও তার আছে। এই ভাবে আলেকজাণ্ডার সমগ্র সৃষ্টি প্রবাহের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যদিও তিনি দেশ ও কাল-কে এক অবিচ্ছেদ্য ঐক্য বন্ধনে মিলিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে সেই মিলিত দেশ-কালই সমগ্র সৃষ্টির মূল উৎস, তবু তাঁর মতে সেই সৃষ্টির ধারা প্রবর্তন ও নিয়ন্ত্রন করে প্রধানতঃই কাল, দেশ নয়। দেশ ও কালের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু সেই সম্বন্ধটি কি রকম সম্বন্ধ? আলেকজাণ্ডার বললেন যে, সে হ'চ্ছে দেহ ও মনের যে সম্বন্ধ তাই। দেহ ও মন অবিচ্ছেদ্য, কিন্তু মনই যেমন দৈহিক ক্রিয়ার নায়ক ও পরিচালক, কাল-ও তেমনি দেশের সঙ্গে যুক্ত থেকেও তার নায়ক ও পরিচালক। "কাল হ'চ্ছে দেশের মন"। তাই যখন আলেকজাণ্ডার বলছেন যে মিলিত দেশ-কালই সমগ্র সৃষ্টির মূল উৎস, তখন তার অর্থ এই যে, দেশের উপর কালের প্রভাব থেকেই আরম্ভ হ'চ্ছে সৃষ্টি! সৃষ্টির পূর্বে শুধুমাত্র আছে এক অখণ্ড দেশকালের অনন্ত বিস্তৃত এক স্পন্দন (motion) সেই স্পন্দনের উপর পড়ছে কালের প্রভাব। ফলে সেইঅ নন্ত-বিস্তৃতির মধ্যে দেখা দিলো বিচ্ছেদ ও খণ্ড খণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গতি। এই হ'লো সৃষ্টির সব প্রথম স্তর। তারপর সেই খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন গতির মধ্যে দেখা দিলো গতিপুঞ্জ (constellation of motion)। অর্থাৎ, কতকগুলি গতি একসঙ্গে পুনরায় মিলিত হ'লো। এই পুনর্মিলিত বিভিন্ন গতিপুঞ্জই হ'চ্ছে জড়বস্তু। জড়বস্তুর যে সব বৈশিষ্ট্য, যেমন আকৃতি, গঠন সংখ্যা ইত্যাদি সবই গতি বা দেশকালের অভিব্যক্তি। এই স্তরে যে গতিপুঞ্জ তার মধ্যে জটিলতা খুব বেশী নেই। কিন্তু এর মধ্যে আর একটু জটিলতা যেই দেখা দিলো সেই এলো রং, গন্ধ, তাপ ইত্যাদি তারপর এইসব গুণবিশিষ্ট জড় বস্তুর মধ্যে আবির্ভূত হয় 'জীবন'। এ কথার মানে অবশ্য এ নয় যে, জড়বস্তু থেকেই জীবনের উৎপত্তি। আসল কথা হ'চ্ছে এই যে জড়বস্তুরস্তরে মূল 'দেশ-কাল' এতো বেশী বিশ্লিষ্ট ও জটিল হ'য়ে পড়েছে যে তাকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য জীবনের প্রয়োজন। কাজেই এই স্তরের জটিলতা যেখানেই আছে সেখানেই জড়বস্তুর সেই জটিলতার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে রয়েছে জীবন। সৃষ্টিতে জড়বস্তুর নিয়ন্ত্রনকারী সেই; বাইরের কোন কিছু নয়। কিন্তু সৃষ্টি প্রবাহ সেখানেই থেমে রইলো না। পরবর্তী স্তরে তার মধ্যে দেখা দিলো 'মন'।

এখনও পর্যন্ত এইটেই সব চেয়ে শেষ আবির্ভাব। এই 'মন' সম্বন্ধে আমাদের সাধারণতঃ একটা অদ্ভুত ধারণা আছে। আসলে কিন্তু ক্রমবিকাশের মধ্যে বিশেষ কোন স্বতন্ত্র মর্যাদা তার নেই। জড়বস্তুর মধ্যে দেখা দিলো প্রাণ, তারপর সেই প্রাণময় অস্তিত্বের মধ্যে আবির্ভূত হলো মন বা চেতনা। যেন প্রকৃতি নিজেই কতকগুলি দেহ-যন্ত্রীয় উপাদান থেকে এই নতুন জিনিষটি সৃষ্টি করেছেন। এ জিনিষটি নিজে কিন্তু দেহযন্ত্রীয় নয়; কিন্তু তার অস্তিত্ব কার্য সবই নির্ভর করে দেহ যন্ত্রের উপর। অর্থাৎ দেহ-কে বাদ দিয়ে মন অসম্ভব। এ দু'য়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। কিন্তু উৎপত্তি তার যাই হোক এবং দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ তার যাই হোক, নিজস্ব রূপটি তার কি রকম? আলেকজাণ্ডার বললেন যে, দেশকালের অংশ ছাড়া আর কিছু সে নয়। মানসিক ঘটনাবলী যে শুধু একটা নির্দিষ্ট কাল অধিকার ক'রে থাকে, তাই নয়, নির্দিষ্ট একটি স্থানও তাকে অধিকার ক'রে থাকতে হয়। কেননা যে কোন বস্তুর মতো, দেশকালের বাইরে যাবার ক্ষমতা তার নেই। তাই যে-কোন অভিজ্ঞতা অনুভূতি-ও কোন একটা দেশাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই দেশাংশ মানসিক (mental space) মানসিক দেশের যে অংশে অভিজ্ঞতা অনুভূতি ইত্যাদি থাকে, সে যে সব সময়ে একই হবে তা নয়; সে-ও পরিবর্তনশীল। আবার সামনে উপস্থিত কোন ঘটনার জ্ঞান আমার মনের যে দেশে হবে, অনুপস্থিত কোন অতীত অথবা ভবিষ্যতের জ্ঞান সে-দেশে হবেনা। এবং যেহেতু আমাদের জ্ঞানেরই অবস্থিতি বদলে যেতে পারে – যেমন কোন বর্তমান ঘটনা অতীত হ'য়ে গেলো, অথবা ভবিষ্যত বর্তমান হলো—সেই জন্য বলা যেতে পারে যে, আমাদের জ্ঞান-গোচর দেশ-ও জ্ঞান গোচর কালের দ্বারা অধ্যুষিত।

মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতা যতোদূর যেতে পারে, তাতে মনই ক্রমবিকাশের উচ্চতম স্তর। কিন্তু তাই বলে এই টেই যে সর্বশেষ স্তর, তা নয়। নিছক মানসিক স্তর থেকে বিকশিত হয় আর একটা জিনিষ যার নাম দেওয়া যেতে পারে আদর্শ স্তর (Realm of Values). এই স্তরে আছে তিনটি জিনিষ (tertiaay qualities) —সত্য শিব ও সুন্দর (true, good, and the beautiful). বস্তুর আলোচনার সময়ে আমরা দেখেছি যে, বস্তুর যে কোন গুন, যেমন রং আকৃতি সবই আলেক-জাণ্ডারের মতে মনের বাইরের জিনিস, কোন মনের দ্বারা জ্ঞাত হ'লো কি না হ'ল তা'তে তাদের অস্তিত্বের পক্ষে কিছুই আসে যায়না। মন-নিরপেক্ষ বস্তু জগতের জিনিষ তারা। কিন্তু আদর্শ স্তরের এই তিনটে জিনিষ সম্পর্কে সে কথা খাটেনা। আদর্শটিকে উপলব্ধি করার জন্য মনের এক অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে। 'গোলাপ ফুল লাল'—এ একটা তথ্য (fact)। আমি অথবা অন্য কেউই যদি ফুলটিকে নাও দেখি তবু সে লালই থাকবে। এটা তার বাস্তব তথ্য বা বাস্তবতা (reality)।

কিন্তু এই তথ্যটিকে যখন আমরা ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে বলি "গোলাপ ফুলটি লাল" তখনই দেখা দেয় সন্দেহের অবকাশ। আর তখনই দেখা দেয় সত্য মিথ্যার প্রশ্ন। নিছক গোলাপ ফুলটি সত্য অথবা মিথ্যা হয় না; হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য। অর্থাৎ যতোক্ষণ পর্যন্ত কোন একটি বিধেয় পদের মধ্য দিয়ে কোন একটি বিশেষ গুণের আরোপ করা না হ'চ্ছে ততোক্ষণ পর্যন্ত সত্য মিথ্যার প্রশ্ন ওঠে না। আর যেহেতু এই গুণের আরোপ সম্ভব হয় মনের দ্বারা সেই জন্য বলা যেতে পারে যে, 'সত্য' (truth) ও 'বাস্তবতা' (reality) এক হ'তে পারে না। এবং আদর্শবোধও valnes) সেই জন্য বস্তু জগতের অস্তিত্ব নয় মনের সৃষ্টি। কিন্তু তাই বলে তারা সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনাও নয়। অস্তিত্বের দিক থেকে মানসিক হ'লেও বস্তুকে সম্পূর্ণ অস্বীকার তারা করতে পারে না। কেননা, তাদের অভিব্যক্তি হয় মনের সঙ্গে যখন বস্তুর সংযোগ হয় তখনই। রং জিনিষটা বস্তুর ধর্ম, কিন্তু তার সৌন্দর্যটা একান্তই আমাদের অনুভূতির জিনিষ। বস্তুর সঙ্গে যখন মনের সংযোগ হয় তখনই সেই অনুভূত সৌন্দর্য আমরা আরোপ করি বস্তুর উপর। যেন এটা তার একটা নতুন ধর্ম। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই অনুভূত সৌন্দর্য বা আদর্শ-বোধ শুধু মাত্র ব্যক্তি বিশেষের মনের উপর নির্ভর করে না। তা যদি হতো তাহ'লে ভাববাদের সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের কোন পার্থক্য থাকতো না। তাই তিনি বলেন যে, সেই সৌন্দর্যানুভূতি বা আদর্শ-বোধ হ'চ্ছে সমষ্টিগত মানব চেতনার জিনিষ। সে মনের নির্ভরশীল ঠিকই, কিন্তু সে মন ব্যক্তি বিশেষের মন নয়, সমষ্টিগত মন। সেই সমষ্টিগত মন বা গোষ্ঠি মনের অংগ হিসেবে ব্যক্তিগত মনও তার অনুভূতির অংশ গ্রহন করে। যে-কোন আদর্শ বা মূল্য-বোধের সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। মন সাপেক্ষ হ'য়েও তারা তাই নৈর্ব্যক্তিক।

আমরা দেখেছি যে, আলেকজাণ্ডারের মতে আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের মধ্যে মনই হ'চ্ছে ক্রমবিকাশের উচ্চতম স্তর। কিন্তু ক্রমবিকাশ যদি মানতেই হয় তাহ'লে এইখানে এসেই যে সে থেমে যাবে তার কি কথা আছে। আলেকজাণ্ডার বললেন যে মনের পর ক্রমবিকাশের অধিকতর উন্নত আর একটা স্তর আসতে বাধ্য। সেই স্তরে যে অভিনব ধর্ম অভিব্যক্ত হবে তার নাম দেবত্ব বা দেব-ধর্ম (Deity) আর এই দেবত্ব বা দেবধর্মের অধিকারিই হ'চ্ছে ঈশ্বর। কিন্তু আলেকজাণ্ডারের এ ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নয়। বরং নিজেই তিনি এই জগতের একটি সৃষ্টি। সুতরাং সমগ্র জগৎ-প্রকৃতির সঙ্গে এক তো নয়ই, বরং জগতের এক অংশ মাত্র তিনি। প্রকৃত স্রষ্টা হ'চ্ছে 'দেশ-কাল'; এবং অন্যান্য সৃষ্ট পদার্থের মতো ঈশ্বর-ও সেই দেশকালের থেকে উদ্ভূত। কাজেই তিনি কালাতীত নন, এবং অনন্তও নন।

কর্ম্ম-নীতি ও ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র

আনাদি কুমার লাহিড়ী

জগতের সকল বস্তুর বিবর্ত্তন ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে কারণ ও শৃঙ্খলা নির্ণয়কারী নানা ভারতীয় মতবাদ আমরা লক্ষ্য করি—তাদের এক প্রধান ভিত্তি হ'ল 'কর্ম্ম'নীতি। সমগ্র ভারতীয় দর্শনে এই মতবাদের গুরুত্ব অসীম। কর্ম্ম-বাদরূপ মূল নীতিকে বাদ দিলে, ভারতীয় দর্শনের বহু সমস্যাই অব্যাখ্যাত থেকে যায়। ইহা উল্লেখ-যোগ্য যে, যদিও চার্ব্বাক-দর্শন ব্যতীত ভারতীয় প্রায় সকল দর্শন-সম্প্রদায়ই 'কর্ম্ম-বাদ'কে স্বীকার ক'রে, তবু বেশ কিছু সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব-স্বীকার না ক'রেও চলে। এই 'কর্ম্ম-বাদ' জটিল-সমস্যার অনেক দার্শনিক সমাধানের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। 'কর্ম্ম-বাদে'র যে পরিণত ধারণা দর্শন-সম্প্রদায়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা' 'ঋত'-নামক অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক নীতি হ'তে উৎসারিত। সর্ব্বপ্রথম, 'ঋত'-নীতিকে দৃশ্যমান বস্তু-জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যাখ্যাকারী নীতি হিসেবেই গ্রহণ করা হ'য়েছিল। এ'র কিছু পরে, এই নীতিকে নৈতিক জগতেরও ব্যাখ্যাকারী নীতি হিসাবে মর্য্যাদা দান করা হয়। আরও অনেক পরে,—দর্শন সম্প্রদায়ের যুগে, 'ঋত-বাদ' 'কর্ম্ম-বাদে' রূপান্তরিত হয়ে, মানুষের পূর্ব্ব-জন্মকৃত নৈতিক কার্য্যাবলীর ফল-স্বরূপ সমগ্র জগৎ-উপাদানের আবির্ভাবের ও তিরোভাবের ব্যাখ্যাকারী নীতি হিসাবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মর্য্যাদা ও গুরুত্ব লাভ করে। জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য ও মীমাংসা নামক নাস্তিক দর্শনগুলিতে (সঙ্কীর্ণ অর্থে) কর্ম্ম-বাদ গুরুত্ব-পূর্ণ প্রধান স্থান দখল করে। আস্তিক (=ঈশ্বর-বিশ্বাসী) ন্যায়-দর্শনেও কর্ম্ম-নীতিকে এক প্রায়-স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দেওয়া হ'য়েছে। কারণ ন্যায়-মতে, কর্ম্ম-নীতি-জগতের আবির্ভাব ও বিলয় ব্যাপারে ঈশ্বরকে প্রধানভাবে সাহায্য করে। পূর্ব্ব-স্থিত উপাদান-রাশি হ'তে ঈশ্বর-সৃষ্টত্বাধীনে অদৃষ্ট ইজগতের সৃষ্টি ও প্রলয় নির্দ্ধারিত করে। কর্ম্ম-নীতি কিন্তু কেবলমাত্র নৈতিক জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় (যদিও' কর্ম্ম'-কথাটি প্রধানতঃ মনুষ্য-কার্য্যেরই সূচক),—এই নীতি সমগ্র জগতেরই ব্যাখ্যাকারী নীতি। একথা অবশ্য স্মরণ-যোগ্য যে, জাগতিক কার্য্যাবলী মনুষ্য কার্য্যাবলীর উপরই ভিত্তি স্থাপন ক'রে আত্ম প্রকাশ করে বর্ত্তমান থাকে (ভারতীয় দর্শন মতে)। অতএব লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, 'ঋত-নীতি' যেমন বস্তু-পদার্থ-জগৎ থেকে

নৈতিক জগতে প্রসার লাভ ক'রেছে,—'কর্ম্ম-নীতি' কিন্তু তা'র বিপরীত ভাবে নৈতিক জগৎ থেকে বস্তুজগতে প্রসারলাভ ক'রেছে।

'কর্ম্ম'-পদটি অনেকার্থক। এত বিভিন্ন অর্থে এই পদটিকে ব্যবহার করা হ'য়েছে যে, পদ প্রয়োগের বিশেষ ভূমিকা জানা না থাক্‌লে, কর্ম্ম-কথার অর্থ গ্রহণ প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। ডক্টর নলিনী কান্ত ব্রহ্ম মহাশয়ের উক্তিটি এই বিষয়ে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য : "The meaing of the term 'Karma' is perplexing to scholars. In the Vedic texts, the term 'karma' is often synoymously used with 'yajna' or 'sarcrifice'. The Minianisa school of philosophy, founded by Jaimini, uses the term mainly in that sense. The Puranas and smrtis use the term to mean such actions as daily worship (sandhya etc.), fixed religious observances, fastings, etc., and divide all such karmas into three groups, viz.., Nitya··· naimittika,··· and Kamya······. The Bhagavad Gita generally uses the term in a very wide sense, and means by it all actions,—any thing that is done by the body, the sense-organs, the mind ('manas') and the intellect ('buddhi) (V,॥ ,)."—Philosophy of Hindu Sadhana P. 117-Ch VII-Kegan Paul.)—এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, ন্যায়-বৈশেষিক সমান-তন্ত্রে 'কর্ম' ব'লতে এক আধিবিদ্যক 'পদার্থ' বোঝায় : আর তার অর্থ ধরা হয় সকল প্রকারের 'ক্রিয়া'। এই ক্রিয়া প্রধান পাঁচ প্রকারের—আকুঞ্চন, প্রসারণ উৎক্ষেপন, অবক্ষেপন ও গমন।

এখানে সর্ব্ব-প্রথম আমরা মীমাংসা-দর্শন আলোচিত 'কর্ম্ম-নীতি' বা অপূর্ব্ব তত্ত্বের' আলোচনা করব। এর কারণ প্রধাণত দু'টি :—১। মীমাংসা-দর্শনই 'কর্ম্ম'-নীতিকে প্রধান গুরুত্ব ও মর্য্যাদাদান করে; (২) মীমাংসা-দর্শন বা কর্ম্ম-মীমাংসা আলোচিত কর্ম্মের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে বেদানুসারী, কারণ পূর্ব্ব 'মীমাংসা'র উদ্দেশ্য হ'লো—বেদের কর্ম্মকাণ্ডের যথাযথ ব্যাখ্যা ও সমর্থন করা। ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য সম্প্রদায়ে কিন্তু 'কর্ম্ম'-কথাটির বৈদিক অর্থ অনেকাংশে পরিত্যাজ্য হ'য়েছে। ডক্টর ব্রহ্ম কথিত 'কর্ম্ম'-পদের যে বৈদিক অর্থ অর্থাৎ 'প্রায়োগিক ক্রিয়াবাদ'-রূপ অর্থ (pragmatic ritualism') তার থেকে অনেক বিস্তারিত অর্থ অন্যান্য দর্শনে

সম্প্রদায়ে সমাদৃত হ'য়েছে দেখা যায়।

'কর্ম্ম-নীতির' সাধারণ অর্থ গ্রহণ-ব্যাপারে মীমাংসা-দর্শন অন্যান্য-দর্শন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশেষ সঙ্গতি-পূর্ণ। ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়গুলি সাধারণ ভাবে স্বীকার করে যে,—'কর্ম্ম' দুই-প্রকারের হ'তে পারে:—(১) 'প্রারব্ধ কর্ম্ম'-অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফল আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে; (২) 'অনারব্ধ কর্ম্ম'-অর্থাৎ যে কর্ম্মের ফল এখনও আরম্ভ হয়নি। প্রথম প্রকারের কর্ম্মের ফল 'দেহ-মন' আকারে সঞ্চিত আবির্ভূত হয়। দ্বিতীয় প্রকারের 'কর্ম্ম' আবার দু' ধরণের হয়:—(ক) 'সঞ্চিত কর্ম্ম' অর্থাৎ যে কর্ম্ম পূর্ব্ব-জন্মেই সাধিত হয়েছে আর তা'র ফল সঞ্চিত আছে; (খ) 'সঞ্চীয়মান কর্ম্ম' অর্থাৎ যে কর্ম্ম বর্ত্তমান জন্মে ফল সঞ্চয় ক'রে চ'লেছে! কর্ম্মকর্ত্তার দৃষ্টি ভঙ্গী বিশ্লেষণ ক'রে, আমরা দু'রকমের কর্ম্মের কথা উল্লেখ করতে পারি—(অ) 'সকাম কর্ম্ম, অর্থাৎ যে কর্ম্ম, কর্ত্তা কর্ম্ম ফলের বাসনা নিয়ে নিষ্পন্ন করে ও ভাল বা মন্দ কর্ম্মফল—সুখ বা দুঃখের আকারে দেখা দেয়; (আ) 'নিষ্কাম-কর্ম্ম, অর্থাৎ যে কর্ম্ম, কর্ত্তা কোন প্রকার ফলের বাসনা না নিয়ে নিষ্পন্ন করে ও সুখ ও দুঃখ—কোন প্রকার ফলই যার দ্বারা উৎপন্ন হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নিষ্কাম কর্ম্ম, ব'লতে 'নিষ্ফল কর্ম্ম, বোঝায় না। 'নিষ্কাম কর্ম' বোঝায় এমন বাসনাহীন, নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্ম যার' সাহায্যে পূর্ব্ব জন্মের সকল কর্ম্মফল ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন করা যায়।

ভাল বা মন্দ বাসনাযুক্ত কর্ম্ম যেমন তার ফলের সাহায্যে জীবকে ভাল বা মন্দ রকমের জীবন যাপনে বাধ্য করে, ফলাসক্তিশূণ্য কর্ম্ম তেমন বদ্ধ জীবকে মুক্তিলাভের পথে অগ্রসর করায়। নিষ্কাম কর্ম্ম শুধু যে বদ্ধদশা ঘটায় না, তা নয়,—অপরপক্ষে, বদ্ধদশার বর্ত্তমান কারণগুলিকে উৎপাটিত করে। প্রায় সকল সম্প্রদায়ই সাধারণ ভাবে একথা বিশ্বাস করে যে, মানুষ যে স্বাভাবিক কর্ম্মসকল করে, সেগুলি কারণাকারে তা'র ভবিষ্যৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন—এমন কি, ভোগ্যবস্তু সকল ও গঠন করে।—এই ভাবে কর্ম্মনীতির বলে জীব তার পূর্বকৃত কর্ম্মের ফল বর্ত্তমান অবস্থায় ভোগ করে বা ভোগ ক'রতে বাধ্য হয়।

মীমাংসা-দর্শনে, 'কর্ম্ম-নীতি'-(বা 'অপূর্ব্ব-নীতি) বহু স্বতন্ত্র পদার্থ থেকে দৃশ্যমান জগৎ গঠন করে। আরও কয়েকটি দর্শন সম্প্রদায়ও ঐ মত পোষণ করে। বদ্ধদশার কারণভূত যে দেহ ও আত্মার মিলন অনুভবসিদ্ধ হয়—তার কারণ হিসেবে নির্দ্দেশ করা হয় উক্ত কর্ম্ম-নীতিকে। কিন্তু অপরাপর সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন ভাবে

মীমাংসা-সম্প্রদায় 'কর্ম্ম' ব'লতে প্রধানতঃ 'যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম' বোঝায়। 'যাগ-যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম-বিষয়ে বৈদিক অনুশাসনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করাই হ'ল মীমাংসা-দর্শনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য। কতকগুলি কর্ম্মকে 'নিত্যকর্ম্ম হিসবে অবশ্য পালনীয় কর্ম্ম ব'লে মনে করা হয়। সেগুলির বিহিত অনুষ্ঠান-অভাবে 'প্রত্যবায়' হয়। আরও কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যেগুলি নির্দ্দিষ্ট সময়ে করণীয়; তাদের বলা হয় 'নৈমিত্তিক কর্ম্ম'। ঐ বিশেষ কর্ম্ম ছাড়া বাসনাযুক্ত যে সকল সাধারণ কর্ম্ম আছে, সেগুলি হ'ল 'কাম্য কর্ম্ম'। স্বর্গ-লাভই হ'ল প্রধান বাসনা—আর তার কার্য্যকরী সাধন হয় যাগ যজ্ঞাদি পুণ্য-কর্ম্ম-সম্পাদন। প্রাচীন মীমাংসকগণ স্বর্গ-লাভকেই মানুষের পরম পুরুষার্থ ব'লে মনে ক'রতেন। কিন্তু স্বর্গ বাসের মেয়াদ অনিত্য ও সীমিত কর্ম্মের ফল হিসেবে স্বয়ং সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। নব্য মীমাংসকগণ প্রাচীন আচার্য্যদের ত্রুটি উপলব্ধি ক'রে মোক্ষ-লাভকেই পরম পুরুষার্থ ব'লে স্বীকার করেন। মোক্ষের ধারণা কিন্তু মীমাংসমেতে ন্যায়-মতেরই সমতুল্য। মোক্ষ ব'লতে বোঝায় শেষ দৈহিক মৃত্যুর পর অচেতন আত্মার সুখ-দুঃখহীন, নিরপেক্ষ স্ব-স্বরূপাবগাহন। নাস্তক (ঈশ্বর-অবিশ্বাসী'—অর্থে) মীমাংসা দর্শন, কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথাবিহিত বা যথাযথ সম্পাদনকেই প্রধান গুরুত্ব দান করে। কর্ত্তব্য হিসেবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করার নীতিটি (Duty for duty's sake') বৈদক নীতি। মীমাংসা-মতে এই নীতিই হ'ল সর্ব্বোচ্য নীতি। অপৌরুষেয় ও অভ্রান্ত বৈদিক অনুশাসনাবলী মানুষের যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধান করে—সেগুলি মীমাংসা-মতে মানুষের অবশ্য করণীয়। বৈদিক বিধান পালনের ব্যাপারে এক সুপ্ত বিশ্বাস হল এই যে তার সাহায্যে অনন্ত সুখের আলয় স্বর্গ ভোগ অনায়াস-সিদ্ধ ব্যাপার হবে। অতএব লক্ষ্য করা যায় যে, মীমাংসা-দর্শন,— নৈতিক আদেশাকারে উপলব্ধি-গোচর বৈদিক অনুশাসনাবলীতে আস্থা স্থাপন করে, কিন্তু কোন নিত্য-সিদ্ধ তত্ত্বে আস্থা-স্থাপন করেনা।

এখন দেখা যাক্, অপরাপর সম্প্রদায়গুলিতে 'কর্ম্ম-নীতি'র কী ধরণের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে :—নাস্তিক (বেদ-প্রামাণ্য-অবিশ্বাসী) জৈন-দর্শনের মতে, জীবের কার্য্যানুযায়ী জগতের গঠন ও জীবের বদ্ধদশা ব্যাখ্যাকারী নীতি হিসেবে 'কর্ম্ম-নীতিকে এক উচ্চ মর্য্যাদা দান করা হ'য়েছে। জৈন-দর্শনে আমরা 'কর্ম্ম'-সম্পর্কে এক বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ অভিনব মত লক্ষ্য করি। 'কর্ম্ম'কে শুধুমাত্র দেহ-মনও আত্মার সংযোগ-ব্যাখ্যাকারী নীতি হিসেবেই উল্লেখ করা হয়নি,—সূক্ষ্ম পদার্থাকারে দেহ ইন্দ্রিয়-মনের গঠন কারী বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অতএব আমাদের

দেহ-মনই যে কর্ম্ম-স্বরূপ এবং 'কষায়'-নামধেয় মানুষের ক্রোধ, লোভ, মান, মোহই যে পদার্থাকারে আবির্ভূত হয়—এই মত জৈন দার্শনিকগণ পরিপোষণ করেন। বদ্ধদশার যে 'জন্ম গ্রহণের আর্তি'-রূপ অব্যবহিত কারণ তা'র নাম হ'ল 'সংবর'—আর 'বদ্ধনোচ্ছেদের আর্তি-রূপ যে মুক্তির কারণ—তা'র নাম দেওয়া হ'য়েছে 'নির্জর'। 'সত্য জ্ঞান,' 'সত্য আচরণ' ও সত্য বিশ্বাস'—এই তিনটিকে জীব মুক্তির অপরিহার্য্য কারণ হিসেবে নির্দ্দেশ করা হ'য়েছে আর জীবের মুক্তাত্মার স্বরূপটি 'অনন্ত জ্ঞানী', অনন্ত শক্তিমান ও 'অপার আনন্দময়'-হিসেবে বর্ণণা করা হয়েছে। জাগতিক পদার্থ-সমূহের (সাধারণভাবে, জীব ও অজীবের) স্বরূপ-বিষয়ক অজ্ঞান থেকেই 'কর্ম্মের' উৎপত্তি হয়। সদাচরণ (অর্থাৎ 'ব্রত'-পালন) ও 'সত্য-বিশ্বাস'-সমভিব্যাহারে যে জ্ঞান দেখা দেয়—তা' 'অজ্ঞান'-দূরীকরণে সমর্থ হয়।

বৌদ্ধ দর্শনের মতে, 'কর্ম্ম-নীতি' অবিচ্ছিন্ন, ক্ষণিক বিজ্ঞান সন্তানের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে। 'কর্ম্ম-নীতি' প্রকৃত পক্ষে (বৌদ্ধ মতে) সার্ব্বিক কার্য্য-কারণ নীতির সঙ্গে অভিন্ন। 'ধর্ম্ম' বা 'প্রতীত্য সমুৎপাদ'—যা'র সাহায্যে জীবের জন্ম-ব্যাপার সুব্যাখ্যাত হয়—তা' নৈতিক নীতি হিসেবে ব্যাপক 'কার্য্য-কারণ নীতি'র এক সঙ্কীর্ণ প্রয়োগরূপ। বাসনা-কামনা থেকেই 'কর্ম্মে'র উৎপত্তি স্বীকার করা হয়; এই বাসনা-কামনায় উৎপত্তিস্থল হ'ল 'অজ্ঞান'। সুগত—আদিষ্ট 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ ক'রে তত্ত্বজ্ঞান—লাভের বলে অজ্ঞান উৎপাটিত ক'রে 'মুক্তি' বা 'নির্ব্বাণ' লাভ করা যায়।

ন্যায়-দর্শনে, জগতের পর্য্যায়-ক্রমিক সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়ামক কারণ হিসেবে 'কর্ম্ম-নীতি' বা 'অদৃষ্ট-নীতি'র উল্লেখ করা হয়। জীবের পূর্ব্ব-জন্মকৃত (বা প্রাক্তন) শুভ ও অশুভ কর্ম্ম-ফলের সাহায্যে 'অদৃষ্ট-নীতি' জগৎ-কার্য্য পরিচালনা করে। বদ্ধ-দশার কারণ যে দেহ-আত্মা সংযোগ, আর প্রত্যেক সৃষ্টিকালে জগতের যে নির্দ্দিষ্ট গঠন-ব্যবস্থা—এই দুই ব্যাপারই,-'অদৃষ্ট-নীতি' নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু ন্যায়মতে অদৃষ্ট-নীতি' অচেতন হওয়ায় জগৎ-পরিচালনার জন্য সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অপেক্ষা করে। তা' না হ'লে নিত্য পদার্থরাশি থেকে উদ্দেশ্যব্যঞ্জক বিশেষ বিশেষ জগৎ-সৃষ্টি ও জগৎ-ধ্বংস ব্যাখ্যা করা যায় না।

বৈশেষিক দর্শন কিন্তু ঈশ্বর অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করে না। আর সেই কারণে এই দর্শন সম্প্রদায় 'অদৃষ্ট নীতি'-কেই জগৎ কর্ত্তৃত্বে পূর্ণভার অর্পন করে। এই নীতি—বস্তু জগৎ ও নৈতিক জগৎ—এই উভয় জগতেই পূর্ণমাত্রায় স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করে।

সাংখ্য-যোগ-সমানতন্ত্রে, 'কর্ম্ম-নীতি' কোন চরম আধিবিষ্যক স্থানে ও গুরুত্ব ভোগ করে না। জীবের কর্ম্মানুসারে নানা জগতের সৃষ্টি ও তত্ত্ব-জ্ঞানের অভাব অনুসৃত দেহ-আত্মার সংযোগ বা জীবের বন্ধন—'কর্ম্ম-নীতি'র ফলেই উদ্ভূত হয় বটে, কিন্তু 'পুরুষ-প্রকৃতি'—রূপ পরম দ্বৈত সত্তায় 'কর্ম্ম-নীতি'র কোন স্থান নেই। 'বিবেক-জ্ঞানে'র সাহায্যেই পুরুষ প্রকৃতি-সম্পর্কিত 'অজ্ঞান' দূরীকৃত হয় আর কর্ম্মেরও উচ্ছেদ সিদ্ধ হয়। যোগ-প্রদর্শিত মনোবিজ্ঞানী, নৈতিক ও ধর্ম্মীয় নানা প্রকার সাধন-সম্বলিত যে অষ্টাঙ্গিক সাধন-মার্গের ব্যবস্থা আছে, তারই সাহায্যে তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভ সুসিদ্ধ হয়।

বেদান্ত-দর্শনে—অপরাপর দর্শন-সম্প্রদায়ের মতই কর্ম্মনীতিকে এক সাধারণ স্বীকৃতিদান করা হ'য়েছে। কিন্তু এখানে কর্ম্ম-নীতির উপর এক ভিন্ন প্রকারের গুরুত্ব আরোপ করা হ'য়েছে। 'কর্ম্ম-নীতি'কে, লীলা-বাদেরই অনুষঙ্গীক এক বিশেষ পর্য্যায় হিসেবে বেদান্ত-দর্শনে গণ্য করা হয়। ব্রহ্মের লীলা হিসেবে জগৎ ব্রহ্মেরই এক বিবর্ত্তিত রূপ ('পরিণাম' বা 'বিবর্ত্ত')। কিন্তু যেহেতু ব্রহ্ম কোন খাম-খেয়ালী পুরুষ নন—সেহেতু স্বীকার করা হয় যে ব্রহ্ম, জীবেরই কর্ম্ম-অনুসারে জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের মতে, জগতের সৃষ্টি ও ধ্বংস যেমন মিথ্যা বা 'বিবর্ত্ত'—রামানুজাচার্য্যের মতে, সেগুলি ব্রহ্মেরই সত্য পরিণাম।

'মুক্তি'র সঙ্গে সম্পর্কিত হিসেবে ক্রিয়া (যাগযজ্ঞাদি)—অর্থে কর্ম্মের সার্থকতা-বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজ ভিন্নমত পোষণ করেন। শঙ্করের মতে, মোক্ষের সাধক হিসেবে 'কর্ম্মে'র কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই। একমাত্র 'জ্ঞান'-ই হ'ল মুক্তি-সাধক। কিন্তু রামানুজের মতে, 'কায়-শুদ্ধি' ও 'চিত্ত-শুদ্ধি'র জন্য 'কর্ম্মে'র একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে ;—আর শুদ্ধ দেহ-মন নিয়েই সাধক 'জ্ঞান' ও 'ভক্তি'র সহায়তায় মোক্ষলাভ করতে সমর্থ হয়। অতএব রামানুজ মতে, কর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান-ভক্তি-সমুচ্চয় মুক্তি-সাধক হয়। শঙ্করের মত রামানুজ বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম্মের অনিত্যতা স্বীকার করলেও পূর্ব্বোক্তের মত তাদের সম্পূর্ণ নিস্ফলতা স্বীকার করেন না। নেতিবাচকভাবে বিচার করলে লক্ষ্য করা যাবে যে, একমাত্র চার্ব্বক-সম্প্রদায় 'কর্ম্ম-নীতি' স্বীকারের পরিবর্ত্তে 'যদৃচ্ছা-বাদ' (Theory of fortuitous Combinations) ও 'স্বভাব-বাদ' অঙ্গীকার করে।

'কর্ম্ম-নীতি' সম্পর্কে আলোচনার সাধারণ পর্ব্বের সমাপ্তিকালে আমরা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রস্তাবনা করতে পারি। এই সমস্যা দেখা দেয়—উক্ত 'নীতি' বা 'মতবাদের'র যথার্থ অর্থ বা ব্যাঞ্জনা সম্পর্কে। সমলোচকেরা প্রশ্ন তোলেন :—'কর্ম্ম-

নীতি' কি ব্যক্তি-সকলের ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করে কঠোর নিয়ন্ত্রণ-বাদে'র রূপ পরিগ্রহ করে?—আর এই আপত্তির উত্তর যদি সদর্থক হয়, তবে কি 'কর্ম্ম-নীতি'র উপর আশ্রিত ভারতীয় দর্শন অদৃষ্টবাদী ও নীতি-বিগর্হিত হয়ে দাঁড়ায়—উক্ত সমস্যার যথার্থ সমাধান পেতে হলে 'কর্ম্ম-নীতি'র প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে হয়;—আর এই সম্যক অর্থের সুস্পষ্ট প্রকাশ,—আমরা পাই শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার 'কর্ম্মযোগে'। ইতিপূর্ব্বেই আমরা লক্ষ্য করেছি যে, 'কর্ম্ম-নীতি' এই তত্ত্ব প্রকাশ করে যে, সৃষ্ট জীবগণ তাদের স্বীয় কর্ম্মের গুণ ও পরিমাণের দ্বারাই জগতে আবদ্ধ হয়—স্বাতিরিক্ত অন্য কোন শক্তি, তা' খেয়ালী ঈশ্বরেরই হো'ক্ বা কোন দুষ্ট আত্মারই হোক্,—তাদের জগতে বদ্ধ করে না। বর্ত্তমান জন্মের স্বরূপ—এমন কি অভিজ্ঞতা লব্ধ জগতেরও প্রকৃতি, জীব সকলের প্রাক্তন কর্ম্ম-সমূহের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। 'কর্ম্ম-নীতি'—এ তত্ত্বও প্রকাশ করে যে, কষ্টকর নিষ্কাম কর্ম্মে'র অভ্যাস করলে আমরা শুধু ভবিষ্যৎ কর্ম্মফলই (শুভ বা অশুভ) নিরোধ করি না, অতীত কর্ম্ম-বীজ সকলও সমুৎপটিত ক'রতে সক্ষম হই। 'নিষ্কাম কর্ম্মে'র ধারণাটি কিন্তু সহজ-বোধ্য ও সহজ-গ্রাহ্য নয়। সাধারণ লোকে বুঝে উঠতে পারে না যে, কী ভাবে কোন মনুষ্য-কর্ম্ম সম্পূর্ণ নিষ্কাম বা বাসনা-শূন্য হ'তে পারে।

মনোবিজ্ঞান ও নীতি-বিজ্ঞান দেখায় যে, প্রত্যেক মনুষ্য-কার্য্যই অভাব-অনুভূতি—দ্যোতক কোন কর্ম্ম-প্ররোচনা (spring of action) থেকে উদ্ভূত হতে বাধ্য। অভাবের যে বেদনানুভূতি, তার সঙ্গে ঈপ্সিত সুখের অনুভূতি বিজড়িত থাকে। 'নিষ্কাম কর্ম্মে'র ধারণা স্ব-বিরোধী ধারণা ব'লে প্রতিভাত হয়। মিল্ ও বেইন্-প্রমুখ কতিপয় পাশ্চাত্য দার্শনিক 'প্রাথমিক আহ' বা 'কর্ম্ম-প্ররোচনা'কেই 'কর্ম্ম-প্রবৃত্তি' বলে আখ্যাত করেন। কিন্তু সমালোচনা-পূর্ণ বিশ্লেষণের সাহায্যে যেমন দেখা যায় যে, বেদনাত্মন কর্ম্ম-প্ররোচনা প্রকৃতপক্ষে নীতি-ব্যাপার-বহির্ভূত, আর উপলব্ধি হয় যে, প্রকৃত 'কর্ম্ম-প্রবৃত্তি'কে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধারণা না করে, উদ্দেশ্যানুসারী হিসেবেই ধারণা করতে হয়—সেই কারণে আমরা বলতে পারি যে- 'নিষ্কাম কর্ম্ম' প্রকৃতপক্ষে এমন এক মহৎ উদ্দেশ্য অনুসারী কর্ম্ম,—যে উদ্দেশ্য ব্যাপক ও সর্ব্বাত্মক হিসেবে সকল সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও বাসনার ঊর্দ্ধে। এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষ্যণীয় যে, মুক্তি-সাধক যে 'নিষ্কাম কর্ম্ম'—তা' সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য বা অনুশীলন-যোগ্য হ'তে পারে না। 'নিষ্কাম কর্ম্মে'র ধারণাটি ভগবদগীতা ও ভারতীয় দর্শন-সম্প্রদায়-সকল প্রচারিত 'তত্ত্ব জ্ঞানে'র সঙ্গে বিশ্লেষণাত্মক ভাবে সম্পর্কিত।

'নিষ্কাম কর্ম্ম'-রূপ ধারণাটির সঙ্গে 'নৈষ্কর্ম্য'-রূপ ধারণা মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়।

দু'টি ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক।—প্রথম যখন সর্ব্বোত্তম, বিশুদ্ধ 'কর্ম্ম-প্রবৃত্তি' বা শক্তি-কেন্দ্রের কথা ঘোষণা করে,—দ্বিতীয়টি, তখন অজ্ঞানাচ্ছাদিত-কর্ম্ম-প্রবৃত্তি-যুক্ত সম্পূর্ণ জাড্য বা কর্ম্মহীনতার কথা ব্যক্ত করে। কয়েকক্ষেত্রে কিন্তু—যেমন অদ্বৈত-দর্শনে,—'নৈষ্কর্ম্য' বলতে এক তুরীয় অবস্থার বিষয় উল্লেখ করা হয়; এই অবস্থায়, কতকগুলি ব্যাপকারের, অনির্দ্দেশ্য প্রবৃত্তি-যুক্ত, সম্ভাব্য কর্ম্ম-সমূহ বিরাজমান থাকে। যাই হোক্, গীতা-উক্তির প্রতিধ্বনি ক'রে আমরা বলতে পারি যে, কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ কর্ম্মহীন ভাবে থাক্‌তে পারে না। মানুষ বাহ্যভাবে নিশ্চেষ্ট থাক্‌লেও (মনোবিজ্ঞানী বলেন)—তার দেহাভ্যন্তরস্থ মনুষ্য-পরিচালনা-বহির্ভূত নানা কর্ম্ম-তন্ত্র নিয়ত, কর্ম্ম-নিরত থাকে। পূর্ণ 'নৈষ্কর্ম্য' বলতে একমাত্র জীবের মৃত্যুই বোঝায়। গীতায় শ্রীভগবান স্পষ্টভাবে বলেন যে, কর্ম্মেই ব্যক্তির অধিকার নিহিত আছে, কিন্তু কর্ম্মফলে কোন অধিকার নেই; অতএব কোন ব্যক্তি যেন কর্ম্মফলের হেতু না হয়, আর কর্ম্মহীনতায়ও যেন তার কোন প্রকার আসক্তি না থাকে। গীতার এই উপদেশ—সম্পূর্ণ আধিবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত গীতার কর্ম্মযোগের মূল তত্ত্ব প্রকাশ করে। কর্ত্তব্যের খাতিরেই কর্ত্তব্য করা উচিত, কিন্তু গীতোক্ত এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের ব্যাপার কান্ট্-প্রদর্শিত উদ্দেশ্যহীন ও ব্যক্তিগত পন্থায় অনুষ্ঠিত হ'লে চ'লবে না। গীতার মতানুসারে, 'লোক'-সংগ্রহ ও পরিণামে ঈশ্বর-প্রাপ্তির জন্যই নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে হয়। গীতা-মতে, প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম কেবলমাত্র পূর্ণ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ—যাঁরা দুঃখ-সুখে—লাভ-ক্ষতিতে,—জয়-পরাজয়ে—অর্থাৎ, সকল প্রকার দ্বৈত অভিজ্ঞতার ব্যাপারে উদাসীন ও স্থির-চিত্ত থাকেন—এমন ব্যক্তিগণই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন। সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগ করে স্থিতধী সাধুগণ ধ্যানসিদ্ধভাবে কর্ম্ম করেন। যে সকল ব্যক্তি কর্ম্ম-সম্পাদনের কৌশল করায়ত্ত করেছেন—তাঁরা কখনই স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হন না। অসহায় ও দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের স্মরণা গতি লাভ করে ঈশ্বরের কৃপায় কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করতে সমর্থ হন। সমাজস্থ ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য হ'ল, নিজ নিজ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুযায়ী স্বকার্য্য সম্পাদন করা। গীতা-উল্লিখিত এই উপদেশ—ব্র্যাড্‌লে কথিত 'আমার সমাজস্থ স্থান ও তদনুসারী আমার কর্ত্তব্য'—('My station and its duty')—নামক বিশেষ নৈতিক উপদেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গীতার বাণী অনুসারে, সকল মনুষ্য-কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য হ'ল, সকল প্রাণীর সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা ও তাঁর প্রীতি উৎপাদন করা। 'নিষ্কাম কর্ম্মের মাধ্যমে কর্ম্ম-কর্ত্তা নিজের আত্মা ব্যাপক ও উদার করে তোলে; তখন সে জগৎ-শৃঙ্খলার সঙ্গে সাম্য বজায়

রেখে কাজ করতে পারে। অতএব গীতা এমন এক নৈতিক আদর্শ তুলে ধরেন—যাকে 'কল্যাণ-বাদ' (Eudaemonism) ও 'মূল্যবাদে'র (Value as standard) যৌগিক রূপ বলা যেতে পারে। মানুষী প্রয়াসের চরম লক্ষ্য হ'ল ঈশ্বর-প্রাপ্তি বা ঈশ্বরের সান্নিকট্য লাভ। জীবনের পরম-পুরুষার্থ-লাভের কার্য্যকরী উপায় হিসেবে গীতা কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-ক্রম-সমুচ্চয়ের উল্লেখ করেন। 'কর্ম্ম-নীতি'র উপরি-প্রদত্ত আলোচনা থেকে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে, নৈতিক জগতে প্রযুক্ত এই নীতি, 'স্ব-নিয়ন্ত্রণে'র নীতিতে পর্য্যবসিত হয়। এই নীতি অনুসারে,কর্ম্মকর্ত্তা স্বীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা নিজের বর্ত্তমান স্বরূপ ও ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করে। নিজ কর্ম্মের শুভত্ব বা অশুভত্বের বলে ব্যক্তি নিজেরই ভবিষ্যৎ সুগঠিত বা বিপদ্-সঙ্কুল করে গড়ে তোলে। অতএব 'কর্ম্ম-নীতি'কে 'পূর্ব্ব-নিয়ন্ত্রণ-নীতি' (Law of Determination) বলে মনে করা সমীচীন নয়। এই নীতি প্রকৃত বিশ্লেষণে—নৈতিক দায়িত্ববোধের অপরিহার্য্য সর্ত্তরূপে বিবেচ্য হয়। জগতে আমরা যে বৈচিত্র্য ও নিয়ম-শৃঙ্খলা লক্ষ্য করি—এই দুইই কর্ম্ম-নীতির দ্বারা সুব্যাখ্যাত হয়। 'কর্ম্মনীতি'—কর্ম্মকর্ত্তাকে যথোচিত কর্ম্ম স্বাধীনতাদানে অলঙ্কৃত করে। এইরূপ ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্য—কোন কঠোর সর্ব্বেশ্বরবাদে (rigid pantheism) যেমন লক্ষ্য করা যায় না, তেমন পূর্ণ অনিয়ন্ত্রণবাদেও আবিষ্কার করা যেতে পারে না। কর্ম্মনীতি যেমন সাধারণাকারে জীবের বন্ধন ব্যাপার ব্যাখ্যা করে, তেমনই নানা ব্যক্তির বিভিন্ন অদৃষ্ট ব্যাপারেরও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নির্দ্দেশ করে। জগতে কীভাবে সৎ ব্যক্তি ও মন্দ ব্যক্তি একত্র সহাবস্থান করতে পারে—কর্ম্মনীতি শুধু তাহাই ব্যাখ্যা করে না—কীভাবে বদ্ধজীব ও জীবন্মুক্ত পুরুষ একই কালে বর্ত্তমান থাক্‌তে পারে,—এই নীতি সে ব্যাপারও যুক্তি-সিদ্ধ বলে প্রমাণ করে। জীবিত ব্যক্তিগণের ভাগ্য-বৈচিত্র্যের ব্যাপার যদি তাদের বর্ত্তমান কর্ম্মসমূহের আলোকে সুষ্ঠুভাবে (বা আদৌ) ব্যাখ্যা করা না যায়, তবে অদৃষ্ট, প্রাক্তন কর্ম্ম সকলের সাহায্যে সহজেই সেই সকল বৈষম্যের কারণ নির্দ্দেশ করা যায়। মীমাংসা-দর্শন স্পষ্টভাবেই 'অপূর্ব্বে'র কথা বলে ; এই 'অপূর্ব্ব' কোন কার্য্যের অন্তর্নিহিত, সূক্ষ্ম শক্তি—যা' ভবিষ্যৎ কালে পূর্ব্ব-কার্য্যানুসারী বিশেষ কর্ম্মফল উৎপাদন করতে পারে। অতএব দেখা যায় যে, 'সর্ব্বাধিক কার্য্য-কারণ-নীতি'র সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় রেখে, 'কর্ম্ম-নীতি, এই তথ্য প্রকাশ করে যে, কোন কার্য্যই তার যথোপযুক্ত ফলদানে বিরত থাকে না—তা' সে শীঘ্রই হোক্ বা দীর্ঘকাল পরেই হোক্—সরাসরিভাবেই হোক্ বা পরোক্ষভাবেই হোক্। 'কর্ম্মনীতির দ্বারা এই তথ্যও উদ্‌ঘাটিত হয় যে, নৈতিক কার্য্যের ও তার কর্ম্মফলের (অর্থাৎ পুরস্কার

ও শান্তিলাভের) সুচারু ব্যাখ্যার জন্য কোনরূপ ঈশ্বর-ব্যাপারের অবতারণা একান্ত প্রয়োজনীয় নয়।

এখন কর্ম্মনীতি-সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাক্, নীতিশাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে 'ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যে'র স্বীকার্য্য সত্য কী গুরুত্ব ও যাথার্থ্য বহন করে। অনেক নিয়ন্ত্রণবাদী দার্শনিক আছেন, যাঁরা 'ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যে'র ব্যাপার অস্বীকার করেন এবং এই অভিমত দেন যে, মানুষের ইচ্ছা পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ত্তসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত। 'কার্য্য-কারণে'র তর্কশাস্ত্র-সম্মত নীতি, শক্তি-সংস্থানের বিজ্ঞান-সম্মত নীতি, মনোবিজ্ঞান-সম্মত, চেতন ও অচেতন নিয়ন্ত্রণের নীতি এবং আধিবিদ্যা-বিষয়ক বস্তুবাদ ও সর্ব্বেশ্বরবাদের নজীর দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণবাদীরা তাঁদের মতের জোরালো সমর্থন যোগান। এই মতানুসারে, আমাদের সকল ইচ্ছা-প্রযত্নই-পরিপূর্ণভাবে পুরোবর্ত্তী কারণ-সকলের (যাদের অধিকাংশই হ'ল 'যান্ত্রিক') দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নিয়ন্ত্রণবাদীদের এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে অনিয়ন্ত্রণবাদীরা এই মতবাদ প্রচার করেন যে ব্যক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত ও অনির্দ্দিষ্ট। নিরপক্ষেভাবে বিচার করলে আমরা সহজেই দেখতে পাই যে এই দুই বিরোধী মতবাদের উভয়ই ভ্রান্ত—আর কতকগুলি লক্ষ্যার্থের ব্যাপারে এই দুই মতবাদই একগোষ্ঠীভুক্ত হয়। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের ইচ্ছা-প্রকৃতপক্ষে—সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিতও নয়, আবার সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিতও নয় ;—অপরপক্ষে, আমাদের ইচ্ছা হ'ল স্ব-নিয়ন্ত্রিত ও স্ব-ব্যাপারসিদ্ধ। কার্য্য-কারণ-নীতি ও শক্তি-সংস্থান-নীতির প্রকৃত অর্থ-সকল অন্বেষণ করলে দেখা যায় যে, 'কারণ' বলতে গুণবৈচিত্র্যহীন, যান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্ট কোন ঘটনাকে নির্দেশ করবার কোন বিশেষ যৌক্তিকতা নেই। আধিবিদ্যার ভূমিতে, আমরা এই উত্তর দিতে পারি যে, বস্তুবাদ ও সর্ব্বেশ্বরবাদ কখনই অভ্রান্ত ও সর্ব্বতোগ্রাহ্য বলে দার্শনিকগণের দ্বারা স্বীকৃত হয়নি। বস্তুতঃ আমাদের ইচ্ছা মনোবিজ্ঞানী নীতিসকলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারে ; কিন্তু মনোবিজ্ঞান সম্মত নীতি-সকল আবার ব্যক্তিগণের স্বাতন্ত্র্যের দ্বারাই সুনিয়ন্ত্রিত হয়। মানসিক নিয়মসকল আমাদেরই নিয়ম ;—তারা কোন অজ্ঞাত, বহিঃশক্তির দ্বারা বহিরারোপিত ব্যাপার নয়। এই সত্যকে নির্দেশ করে অধ্যাপক মুইর্‌হেড্, তাঁর 'The elements of Ethics' গ্রন্থে বলেন :—"ইচ্ছা হয় জীবাত্মা" ("Will is the self")। যে 'নৈতিক দায়িত্ব-বোধ' আমরা অন্তরঙ্গভাবে অনুভব করি—তা' কেবলমাত্র 'স্বাতন্ত্র্য নীতি বা 'ইচ্ছা-স্বাধীনতা' নীতি-রূপ স্বীকার্য্য সত্যের সাহায্যেই সুব্যাখ্যেয় হয়—অন্য কোন প্রকারে হয় না। উইলিয়ম লিলি তাঁর নীতিশাস্ত্রীয় গ্রন্থে এই একই সত্য প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, ভাল চরিত্র ও মন্দ চরিত্র পৃথকীকরণের ব্যাপারে যদিও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নীতি আদৌ প্রয়োজনীয় বলে গণ্য হয় না—তবু নৈতিক দায়িত্ববোধের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

এই নীতি অবশ্য স্বীকার্য্য বলে বিবেচিত হয়। অতএব দেখা যায় যে, 'ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যে'র স্বীকার্য্য সত্যটি এক নীতি-শাস্ত্র-সম্মত সত্য। ধর্ম্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকৃত বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায় যে, ঈশ্বর-উপাসনারূপ অপরিহার্য্যরূপ ধর্ম্মীয় অঙ্গের ব্যাখ্যার জন্য 'ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যে'র নীতি স্বীকার করতে হয়। 'ঈশ্বর-বাদ' ও 'অধ্যাত্মবাদ'—এই নীতি গ্রহণের যথেষ্ট কারণ নির্দেশ করে। কাণ্ট্ ও মার্টিন্যু—নীতিশাস্ত্রীয় ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ভিত্তিতে 'ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যে'র বাস্তবতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। কাণ্টের মতে, তোমার করা উচিৎ, অতএব তুমি পার কাণ্ট্-প্রদর্শিত সর্ব্বোচ্চ নৈতিক আদর্শের 'সর্ত্তহীন আদেশ'-রূপ যে স্বরূপ—তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নৈতিক কর্ত্তার পূর্ণ ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্য বা আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে। কাণ্ট্ 'সদিচ্ছা'-কে স্বয়ংপ্রভ মণির সঙ্গে তুলনা করেন। যতক্ষণ না 'সদিচ্ছা' (Good Will) মহতী ইচ্ছায় (Holy Will) রূপান্তরিত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নৈতিক কর্ত্তাকে জড় আবেগের (Bassions) সঙ্গে যুদ্ধ করে যেতে হয়। স্বাধীন বুদ্ধিমান কর্ত্তা অনন্ত জীবন ধরে 'সর্ব্বোত্তম কল্যাণ' (The Highest Good) বা 'ধর্মে'র (Virtue) দিকে অগ্রসর হয়। মার্টিন্যুর মতে, মানুষের 'বিবেক-বাণী' প্রকৃতপক্ষে 'ঈশ্বরের বাণী' ; এর সাহায্যে আমরা নৈতিক দায়িত্ববোধ গ্রহণ করে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করবার সনদ পাই। সেথ্ ও রাশ্ডল্ দেখান যে, জগতের উচ্চস্তরের বস্তুতান্ত্রিক মূল্য সকলের অনুসরণের জন্য কর্ম্মকর্ত্তাকে অবশ্য স্বাধীন ইচ্ছার মালিক হিসেবে বিবেচনা করতে হয়।

পরিশেষে, আমরা প্রাচ্য কর্মনীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য স্বীকার্য্য সত্য ইচ্ছা-স্বাতন্ত্র্যের নীতির এক তুলনামূলক ও সমালোচনামূলক বিচার প্রস্তাবনা করি :—'নৈতিক বিচারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত নৈতিক দায়িত্ববোধের ব্যাপারটি উভয় নীতিই সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে। উভয় নীতিই আবার ব্যক্তি সকলের 'কর্মবৈচিত্র্য' ও 'ভাগ্যবৈচিত্র্য' সুচারুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। এই দুইটি নীতিই তাদের অর্থ ব্যঞ্জনার দ্বারা জীবাত্মাগণের পরম মুক্তি ব্যাপার সমর্থন করতে পারে। দুই নীতির মধ্যে নানা মিল থাকলেও তাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই যে, 'কর্মনীতি' শুধুমাত্র নৈতিক জগতের ব্যাখ্যাই করে না—সমগ্র জগতেরই গঠন ও ধ্বংস ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে পারে ; কিন্তু 'ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যের বা আত্মনিয়ন্ত্রতার স্বীকার্য্য সত্যটি প্রথম নীতির তুলনায় অনেক বেশী সঙ্কীর্ণ ও ব্যক্তিনির্ভর। দ্বিতীয় নীতির তুলনায় প্রথম নীতি অনেক বেশী সুসমঞ্জস্য ও আদেশ ব্যঞ্জক। কিন্তু স্বপরিসরের মধ্যে দুই নীতিই এই অভিন্ন সত্য স্বীকার করে যে মানুষের সুখ দুঃখের কারণ সম্পূর্ণভাবে তারই কৃতকর্ম্মের উপর নির্ভর করে—আর কর্ম্ম সম্পাদন ব্যাপারে ব্যক্তি মানুষ যেমন স্বতন্ত্র—স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী ফললাভে সে তেমনই বাধ্য।

বেদান্ত-দর্শন

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

জগতের অনন্ত বৈচিত্র্য আমাদের মনে গভীর বিস্ময় সৃষ্টি করে এবং আমাদের বিস্ময়াভিভূত মনে প্রশ্ন জাগে, জগৎ কি? কি উপাদানে ইহা গঠিত? কিরূপে এবং কি উদ্দেশ্যে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে? আবার আমাদের জীবনেও এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যখন মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে, জীবন কি? ইহার উদ্দেশ্য কি? যে পর্যন্ত না মানুষ এই সকল প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর প্রদান করিতে পারে, সে তাহার জীবনের কর্মপন্থ নির্দেশ করিতে পারে না। যে-জগতে মানুষ বাস করে সে-জগৎ এবং তাহার নিজের জীবন ও ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে তাহার পক্ষে জীবন পরিচালনা করা সম্ভব নহে। কাজেই অতি প্রাচীন কাল হইতে মানুষ এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। তাহার এই প্রচেষ্টা হইতে দর্শনের উৎপত্তি। এই দর্শন হইতে মানুষ জগৎ ও জীবনের স্বরূপ এবং চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। দর্শনই ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি।

ভারতে বেদের ঋষিগণ প্রথমে দর্শনের এই প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ বেদে নিবদ্ধ রহিয়াছে। বেদে নানা মত-বাদের বীজ দেখিতে পাওয়া গেলেও একেশ্বরবাদ যে ইহার চরম দার্শনিক মতবাদ, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বেদের একেশ্বরবাদ উপনিষদে সুস্পষ্ট ও সুসংবদ্ধ আকার ধারণ করিয়াছে। এই জন্য ইহাকে বেদান্তও বলা হয়। কিন্তু উপনিষদ্ একখানি নহে, বিভিন্ন উপনিষদ্ বিভিন্ন সময়ে প্রবর্তিত হইয়াছে। কাজেই, উপনিষদে মূল একেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যায় সকলে একমত নহেন। যদিও উপনিষদের ব্যাখ্যায় ব্রহ্ম, জীব ও জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা সম্প্রদায় নানামত পোষণ করিয়া থাকেন, তথাপি ইহা সকলের স্বীকার্য যে, ব্রহ্মবাদই উপনিষদের মূল দার্শনিক মতবাদ।

উপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠায় একদিকে বেদের, অপরদিকে তাঁহাদের অনুভূতির উপর নির্ভর করিয়াছেন। উপনিষদে বিচার থাকিলেও ইহাতে অনুভূতিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বিচারের সাহায্যে উপনিষদের ব্রাহ্মবাদ প্রতিষ্ঠার মানসে ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। ইহা একখানি সম্পূর্ণরূপে বিচার-প্রধান দার্শনিক

গ্রন্থ। অপরদিকে উপনিষদের মূল ব্রহ্মবাদ জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য করিবার মানসে তিনি মহাভারতের অংশরূপে তিনি গীতা রচনা করিয়াছেন। গীতা উপনিষদ্ সমূহের সারসংকলন। যথার্থই উক্ত হইয়া থাকে,—সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ সমস্ত উপনিষদ্ ধেনুস্বরূপ। গোপাল-নন্দন শ্রীকৃষ্ণ দোহন কর্তা। পার্থ বৎস ; সুধীগণ ভোক্তা এবং গীতা অমৃত-রূপদুগ্ধ। গীতা একাধারে তত্ত্বশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র। বর্তমানে ধর্মগ্রন্থরূপে গীতাখানি হিন্দুগণ পাঠ করিতেছেন এবং ইহাতেই তাঁহাদের ধর্মজিজ্ঞাসার উত্তর মিলিতেছে।

দুঃখের বিষয়, বেদোপনিষদের ন্যায় ব্রহ্মসূত্র ও গীতা ব্যাখ্যায় সকল আচার্য একমত নহেন,—নানা মুনির নানামত। যাহা হউক, আমরা বেদোপনিষদ্ গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের উপর নির্ভর করিয়া এখানে বেদান্ত দর্শনের বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারন।

জগতে কারণ ব্যতিতে কোন বস্তুর উৎপত্তি হয় না। প্রত্যেক বস্তুর কারণ রহিয়াছে। নিমিত্ত কারণের প্রচেষ্টার ফলে কার্যের উৎপত্তি এবং উপাদান কারণ লইয়া কার্য্য গঠিত। ধ্বংসকালে উপাদান কারণে ইহা বিলীন হয়। একটি ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার, কেননা কুম্ভকারের প্রচেষ্টার ফলে ইহা সৃষ্টি হয় এবং মৃত্তিকা উপাদান কারণ, কেননা মৃত্তিকা দ্বারা ইহা গঠিত। ঘটটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে মৃত্তিকাতে বিলীন হয়। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুর নিমিত্ত ও উপাদান কারণ রহিয়াছে। জগতেরও অবশ্য নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ থাকিবে। জগতের এই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ কি ?

জড়বাদিগণ মনে করেন, অসংখ্য নিত্য পরমাণু জগতের উপাদান কারণ অন্ধ জড়শক্তির ক্রিয়ার ফলে অসংখ্য জড়াণুর সংমিশ্রণ ঘটে এবং জগৎ অসংখ্য জড়াণুর সমষ্টি। কতিপয় বিশেষ শ্রেণীর জড়াণুর সংমিশ্রনে দেহ গঠিত হয় এবং এই জড়দেহ হইতে প্রাণশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রাণিদেহ এক বিশিষ্ট প্রকারের জটিলাকার ধারণ করিলে উহা হইতেই আবার চিৎশক্তির আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু জগবাদ গ্রহনীয় নহে। আমাদের মনে জগৎ সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উঠে, সেই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর ইহা প্রদান করিতে পারে না। প্রাণিদেহের গঠন পদ্ধতি ও

ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিলে, জগতের শাশ্বত নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেনা স্বীকার করিবে যে, জগৎ কর্তা অনন্তধীশক্তিসম্পন্ন? অধিকন্তু, চিৎশক্তি ও প্রাণশক্তি, জড়শক্তি হইতে স্বতন্ত্র। ইহারা ইহাদের বিরুদ্ধধর্মী জড়শক্তি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। জড়বাদ আমাদের ধর্ম ও নৈতিক চেতনাও ব্যাখ্যা করিতে পারে না। বেদান্ত-দর্শন জড়বাদ সমর্থন করে না। ব্রহ্মসূত্র নানা যুক্তির সাহায্যে জড়বাদ খণ্ডন করিয়াছে। বেদান্তদর্শন ব্রহ্মকেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ইহা পরম সত্তাকে ব্রহ্মনামে অভিহিত করিয়াছে। ব্রহ্মের শব্দগত অর্থ হইল বিরাট।

'ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।' ঋগ্বেদ্ ১০।১২৯।৭ যে ব্রহ্ম হইতে বিচিত্র জগতের আবির্ভাব তিনি কি ইহাকে ধারণ করেন না? অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগতের আবির্ভাব এবং তিনিই ইহার ধারক। এখানে ব্রহ্মকে জগতের উপদান কারণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। 'যো অগ্নৌ রুদ্রো যো অপ্‌স্বন্তর্থ ওষধী—র্বীরুধ আবিবেশ। য ইমা বিশ্বা ভুবনানি চাক্‌লৃপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বগ্নয়ে। অথর্ববেদ ৭৮৭।১। যে পরমাত্মা অগ্নিতে, জলে, বৃক্ষলতায় ব্যাপক রহিয়াছেন, যিনি এই নিখিল ভুবনকে রচনা করিয়াছেন, সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মাকে নমস্কার।' যেহেতু ব্রহ্ম জগতের রচনাকারী, সেইহেতু তিনি জগতের নিমিত্ত কারণ।

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি—সংবিশন্তি। তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি।' তৈত্তিরীয় ৩।১, যাঁহা হইতে ভূত সকল আসিয়াছে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ভূতবর্গের সত্তা এবং যাহাতে বিনাশকালে ভূতনিচয় বিলীন হয়, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর। তিনি ব্রহ্ম। 'যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহবিশ্বম-মুণ্ডক ১।১।৭ 'যথা সুদীপ্তাৎ পাবকদ্বি স্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাঽক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপিয়ন্তি—মুণ্ডক ১।১, পৃথিবী হইতে যেমন ওষধি বৃক্ষ সকল, সজীব দেহ হইতে যেমন কেশ লোমাদি এবং সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন বিবিধ স্ফুলিঙ্গ আবির্ভূত হয়, সেইরূপ একব্রহ্ম হইতে সকল ভাব-পদার্থ আবির্ভূত এবং তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইতেছে। এখানে উপনিষদের মন্ত্রগুলি ব্রহ্মকেই উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা'। শ্বেতঃ ৪।১৭। এই ব্রহ্ম বিশ্বকর্মা পরমাত্মা। 'স বিশ্বকৃদ্বিশ্ব—বিদাত্মযোনি র্জ্ঞত কালকারো গুণী সর্ববিদ্ যঃ'—শ্বেতঃ ৬।১৬। ব্রহ্ম বিশ্ব স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, আত্মযোনি, কালস্থষ্টিকারী ও অনন্তগুণসম্পন্ন।

এখানে ব্রহ্মই যে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ইহতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

'অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। —গীতা ১০।৮ আমি (ভগবান) নিখিল জগতের উৎপত্তিস্থল। আমা হইতে ভূত সকল আবির্ভূত হইতেছে। ভগবানই জগতের উপাদান কারণ। কিন্তু তিনি আবার নিমিত্তকারণ, কেননা গীতায় উক্ত আছে—'ভূতভর্ত্তৃচ....গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ—গীতা ১৩।১৬, 'গর্ভং দধাম্যহম্।' 'অহং বীজপ্রদঃ পিতা।' —গীতা ১৪।৩, ৪।

'জন্মাদ্যস্য যতঃ ব্রহ্মসূত্র ১।১।২। সমগ্র বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও নাশ যাঁহা হইতে হয়, তিনি ব্রহ্ম। 'যোনিশ্চ হি গীয়তে—ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৭। বেদে ব্রহ্ম ভূতযোনিরূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি বলিয়া ব্রহ্ম ইহার উপাদান কারণ। 'ঈক্ষতে—র্নাশব্দঃ'—ব্রঃ সূঃ ১।৪।৫। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' —ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৩। 'অভিধ্যোপদেশাচ্চ' —ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৪, 'আত্মকৃতে পরিনামাৎ —ব্রঃ সূঃ ১।৪।২৬ প্রভৃতি সূত্র দ্বারা শ্রুতি অনুসারে ব্যাসদেব ব্রহ্ম সূত্রে ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু ব্রহ্ম নিজেই নিজ হইতে সমগ্র জগতের আবির্ভাব ঘটান, সেইহেতু বেদান্ত দর্শন একদিকে যেমন সৎকার্যবাদ, অপরদিকে তেমন পরিণামবাদ সমর্থন করেন। ইহার মতে ব্রহ্ম পরিণামী। সমগ্রজগৎ প্রথমে ব্রহ্মে অব্যক্ত ও অব্যাকৃত অবস্থায় ছিল। তিনিই ইহাকে ব্যক্ত করিতেছেন।

ব্রহ্মের সত্তা প্রমান সিদ্ধ

ব্রহ্ম জগতের মূল কারণ। জগতের পদার্থনিচয় কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ। এই কার্যকারণ-পরম্পরা বোধগম্য হয় না, যদি না ইহার একটি মূল বা আদি কারণ স্বীকার করা হয়। উৎসস্থানবিহীন কোন প্রবাহের কল্পনা কি আমরা করিতে পারি। উৎসস্থান আছে বলিয়াই প্রবাহ চলিতে পারে। জগতের এই মূল কারণ বা উৎরের সত্তা না থাকিলে কার্য-কারণ-পরম্পরার সত্তা থাকিতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, জগতের বস্তুনিচয় পরস্পরের সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ, জগৎ বস্তুনিচয়ের এক সুসংবদ্ধ ও সুসংহত সমষ্টি। কিন্তু জগতের সুসংবদ্ধতা সম্ভব হয় না, যদি বস্তুনিচয়ের মধ্যে একই মূলসূত্র নিহিত না থাকে, যদি সকল বস্তু একই সূত্র হইতে উদ্ভূত ও উহার দ্বারা ধৃত না হয়। ব্রহ্মই জগতের এই মূলসূত্র বা উৎস সুতরাং ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত, বাক্য

ও মনের অতীত হইলেও ইহার সত্তা অনস্বীকার্য। 'যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনো মতম্। যচ্চক্ষুষানেপশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।········যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোতমিদং শ্রুতম্। যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বংবিদ্ধিনেদং যদ্দিমুপাসতে॥' কেন ১।৬।৭।৮।৯ 'ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নে মা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি। কঠো ২।২।১৫ ইন্দ্রিয় সকল ও মন যাহাকে পায় না অথচ যিনি না থাকিলে ইন্দ্রিয় সকল, মন ও প্রাণ কাজ করিতে পারে না, যাঁহাকে চন্দ্র, সূর্য, তারকা, বিদ্যুত প্রভৃতি প্রকাশ করিতে পারে না অথচ যিনি আছেন বলিয়া সমগ্র জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার সত্তা আমরা কিরূপে অস্বীকার করিতে পারি ?

অসন্নেব স ভবতি। অসৎ ব্রহ্মেতি বেদচেৎ। তৈঃ ২।৬ ব্রহ্মকে যে অসৎ বলিয়া মনে করে, সে নিজেই অসৎ হইয়া থাকে। জগৎ ও জীবের সত্তা স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সত্তাও স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মের সত্তা না থাকিলে জগৎ ও জীব সত্তাহীন হইয়া থাকে। নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ—গীতা ২।১৬ নাসতোঽ—দৃষ্টত্বাৎ···ব্রঃ সূঃ ২।২।২৬ অসৎ হইতে সতের এবং সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি কখনও দেখা যায় না।

বেদবেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মের সত্তা যে কেবল মাত্র অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহা নহে। দিব্য দৃষ্টি সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষও ইহার সত্তা প্রমাণ করিয়া থাকে। 'যেনস্তৎ পশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীডম' যজুঃ ৩২।৮। 'বেদাহম্ পুরুষং মহান্তং,' 'ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরম,' 'যো বেদ নিতিহং গুহায়াং' প্রভৃতি বেদোপনিষদের মন্ত্রগুলি ব্রহ্ম যে যোগিগণের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ তাহাই প্রমাণ করিতেছে। 'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চময়ি পশ্যতি' গীতা ৬।৩০ গীতার এইরূপ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, গীতাও ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকে। পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণ ৩।৪।১ সূত্রে ব্যাসদেব শ্রুতি অনুসরণ করিয়া বলেন যে, আত্মজ্ঞানই কৈবল্য বা মোক্ষ, ব্রহ্মের সাক্ষাৎজ্ঞান সম্ভব বলিয়াই মুমুক্ষু ইহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। এইজন্য ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রেই হইল—'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' !

ব্রহ্মই পরমাত্মা, পরমপুরুষ বা পরমেশ্বর

ব্রহ্ম বিশ্ব রচয়িতা এবং বিশ্বের অধিষ্ঠান ও ধারক। যেহেতু আমরা কেবলমাত্র

আত্মাতেই শক্তির সন্ধান লাভ করি এবং আত্মাকেই বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ঐক্য সূত্ররূপে দেখিতে পাই সেইহেতু বেদান্ত দর্শনে বিশ্বকর্মা ও বিশ্বযোনি ব্রহ্মই পরমাত্মা। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রে আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। ঐত ১।১ 'সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মস্বরূপেই বর্ত্তমান ছিল; নিমেষাদি ক্রিয়াশীল অন্য কিছু ছিল না।' তৎসর্বংপর আত্মনি সম্প্রতিষ্ঠতে। প্রশ্নঃ—৪।৭ সকল পদার্থ পরমাত্মারূপী ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্বম্-ছাঃ ৭।২৫।২ আত্মাই নিম্নে, আত্মা ঊর্ধে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে, আত্মাই সমস্ত। আত্মত এবেদং সর্বমিতি—ছাঃ ৭।২৬।১ আত্মা হইতেই সবকিছু আবির্ভূত হইয়া থাকে। ব্রহ্মই পরমাত্মা। আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োঃ নির্বহিতা তে যদন্তরা তদ্ ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা। —ছাঃ ৮।১৪।১ যিনি আকাশ নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই নাম ও রূপ ব্যাকৃত করেন। উক্ত নাম ও রূপ যাঁহার মধ্যে তিনিই ব্রহ্ম তিনিই অমৃত, তিনিই আত্মা। উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ—গীতা ১৫।১৭ জীব ও প্রকৃতি ব্যতীত অন্য এক উত্তম পুরুষ রহিয়াছে, তিনি পরমাত্মা নামে পরিচিত। তিনি লোকাত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন। অধিকন্তুভেদনির্দ্দেশাৎ —ব্রঃ সূঃ ২।১।২১ ব্রহ্মসূত্র জীবাত্মা ও পরমত্মার মধ্যে ভেদ স্বীকার করিয়া থাকে, কেননা নানা শ্রুতি এই ভেদ স্বীকার করিয়াছে। জীবাত্মা অল্পশক্তি এবং ব্রহ্ম অনন্তশক্তি। ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারন—জীবাত্মা নহে। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চহি—ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৮ পরমাত্মাতে সর্বপ্রকার বিচিত্র শক্তি রহিয়াছে। ব্রহ্ম চৈতন্য—ধর্মবিশিষ্ট পরমাত্মা। তিনি অনন্তধীশক্তি সম্পন্ন। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ব-শক্তিমান।

বেদবেদান্তদর্শনে ব্রহ্ম পুরুষ ও ঈশ্বররূপে গৃহীত হইয়া থাকেন। যিনি সচেতন ও যাঁহার স্বনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে তাঁহাকে আমরা পুরুষ বলিয়া থাকি। ব্রহ্ম অনন্ত শক্তি বিশিষ্ট। তিনি সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন। তিনি অনন্ত-গুণবিশিষ্ট। অনন্ত তাঁহার ঐশ্বর্য। তাঁহার অনন্ত শক্তি গুণ বা ঐশ্বর্য তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে জগতের মাঝে প্রকাশ করিতেছেন। কাজেই তিনি পুরুষোত্তম। যিনি দেহের অভ্যন্তরে, জগতের অভ্যন্তরে শয়ান রহিয়াছেন অর্থাৎ যিনি জগতের পরম অধিষ্ঠান, আশ্রয়স্থল ও পরম নির্বান তাঁহাকেও পুরুষ বলা হয়। ব্রহ্ম এই দুই অর্থেই পুরুষোত্তম। কাজেই বেদ, উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্ম সূত্রে ব্রহ্ম পুরুষরূপে অভিহিত হইয়াছেন।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। যজুঃ ৩১ ১ পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতম্ যচ্চ ভাব্যম॥ —যজুঃ ৩১।২। যাঁহার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য নেত্র ও অসংখ্য পদ সেই পুরুষই পরমাত্মা ব্রহ্ম। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব কিছুতেই সেই পরম পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। উপনিষদেও এই দুইটি বেদের মন্ত্র রহিয়াছে। নানা উপনিষদেই পরমাত্মা ব্রহ্মকে পুরুষরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। মহতঃ পরমব্যক্তম ব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ কঠো ১।৩।১১। "হিরণ্য— গর্ভ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ, অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। পুরুষই সকলের পরাকাষ্ঠা। তিনিই পরমগতি।" বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ শ্বেতাশ্বেতঃ ৩৮। তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্।" শ্বেতঃ ৩।১ অন্ধকারের ওপারে আমি সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে জানি। তাঁহার দ্বারা সব কিছুই পূর্ণ। তমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। পরমাত্মা বা ব্রহ্মই আদিদেব সনাতন পুরুষ। গীতা ১১।৩৮ তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে। যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ গীতা ১৫।৪ উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ গীতা ১৫।১৭ যে আদি পুরুষ হইতে চিরকাল সংসার আবির্ভূত হইতেছে তাঁহার শরণ লই। উত্তম পুরুষকেই পরমাত্মা বলা হয়। শব্দাদিভ্যোহন্তঃ প্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট পদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনম্ ধীয়তে॥ ব্রঃ সূঃ ১।২।২৬। বৈশ্বানর শব্দে ব্রহ্ম তাৎপর্য হন। পরমাত্মা পুরুষকে ঐ শব্দ দ্বারা উপাসনা করা হয়।

ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা সচেতন। চৈতন্য আত্মার ধর্ম। যো অস্যাধ্যক্ষ··· সো অংগ বেদ যদিবানবেদ—ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৭ যিনি এই বিশ্বের অধিষ্ঠাতা তিনি ইহাকে কি জানেন না? 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্রআসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ, বৃহঃ ১।৪।১০ —প্রথমে ব্রহ্মই ছিলেন, তিনি নিজকে ব্রহ্মরূপে জানিলেন। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষ বিধঃ সোহনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোহপশ্যৎ। বৃহঃ ১।৪।. তিনি আলোচনা করিয়া আপনা হইতে ভিন্ন অপর কিছুই দেখিলেন না। 'সোহকাময়ত' 'স ঈক্ষাংচক্রে' 'ঈক্ষত'। উপনিষদের এই সকল উক্তি ব্রহ্ম যে সচেতন তাহা নিঃসন্দেহে প্রমান করে। গীতায় ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম যে সচেতন তাহা পরিস্কাররূপেই স্বীকার করা হইয়াছে। স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম। ১০।১৫ হে পুরুষোত্তম, তুমি আপনা দ্বারাই আপনাকে জান। ব্রহ্মসূত্রের 'ঈক্ষতের্নাশবদং' ১।৫ সূত্রের ব্রহ্মের যে চিৎশক্তি রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতেছে।

জগৎ রচয়িতা ব্রহ্মকেই বেদ, উপনিষদ্ ও গীতাতে ঈশ বা ঈশ্বর বলা হইয়াছে।

জগৎ রচনা করিতেছেন এবং ইহাকে পালন করিতেছেন। তিনিই আবার ইহার বিনাশ বা ধ্বংস করিতেছেন। ঈশাবাস্যং ইদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—যজুর্ব্বেদ ৪০।১ ঈশ্বরের দ্বারাই সমগ্র জগৎ ধৃত। এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষোহন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য—প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্॥ মাণ্ডুক্য ৬ "ইনিই সর্বেশ্বর, ইনিই সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী। ইনি সকলের উপাদান কারণ। অতএব ইনিই ভূতবর্গের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান।" মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। শ্বেত ৪।৯ প্রকৃতিকে মায়া এবং পরমেশ্বরকে মায়াবী বলিয়া জানিবে। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বর গীতা ১৫।১৭ যিনি লোকত্রয়ের অভ্যন্তরে থাকিয়া ইহাকে পালন করেন তিনিই অব্যয় ঈশ্বর। যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তিলোক মহেশ্বরম্। অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমূচ্যতে॥ গীতা ১০।৩ যিনি আমাকে জন্মরহিত অনাদি ও সর্বলোকের মহান্ ঈশ্বররূপে জানেন তিনি সর্ববিধ মোহমুক্ত হইয়া সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়

জগতে যাহা কিছু ঘটে, নিয়মানুসারে ঘটে। সর্বত্র নিয়ম ও শৃঙ্খলা। জগতের বিচিত্র নিয়ম শৃঙ্খলা ইহার মূল কারণের অনন্ত প্রজ্ঞাশক্তির পরিচায়ক, কেননা নিয়ম শৃঙ্খলার সহিত কাজ করা একমাত্র বুদ্ধির ধর্ম। নিয়ম থাকলে ধীশক্তি সম্পন্ন সচেতন নিয়ামকের প্রয়োজন। কাজেই বেদবেদান্ত-দর্শনমতে জগতের মূলকারণ ঈশ্বর ইহার সচেতন নিয়ামক। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তাঁহার অনন্তশক্তি। অনন্ত তাঁহার ঐশ্বর্য। তিনি সগুণ ও সক্রিয়।

'বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। বিজ্ঞানেন জাতানি জীবন্তি। বিজ্ঞানং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' তৈত্তিরীয় ৩।৫। 'সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' ঐতঃ ৩।১।৩ বিজ্ঞান হইতে জগতের সৃষ্টি। বিজ্ঞানে ইহার স্থিতি ও লয়। প্রজ্ঞা জগতের আশ্রয়। সর্বত্র বিকাশ, প্রজ্ঞা বা বিজ্ঞান ব্রহ্ম। ব্রহ্ম অনন্তপ্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানের আধার।

'স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদ্……গুণী সর্ববিদ্ যঃ'—শ্বেত ৬।১৬ ঈশ্বর বিশ্বকর্তা, সর্বজ্ঞ ও অশেষগুণসম্পন্ন। 'স তন্ময়োহ্যমৃত ঈশসংস্থো জ্ঞঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা॥

য ঈশেহস্য জগতো নিত্যমেব নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়'—শ্বেত: ৬।১৭ ব্রহ্ম বিশ্ব স্রষ্টা সর্বজ্ঞ, ব্রহ্ম সর্বদাই জগৎ শাসন করেন। তিনি অমর, জগতের শাসক, স্বীয় ঐশ্বর্যে সুপ্রতিষ্ঠিত, চৈতন্য স্বরূপ ও এই ভুবনের পালক। জগৎ শাসনার্থে তদ্ভিন্ন অন্য কোন কারন নাই।

'মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসংকল্প আকাশাত্মা সর্বকর্মা সর্বকাম:' ছাঃ ৩।১৪।২। ব্রহ্ম মনোময় অর্থাৎ তাঁহার চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভব করার শক্তি রহিয়াছে। প্রাণই তাঁহার দেহ, চৈতন্য দীপ্তি তাঁহার রূপ। তিনি সত্যসংকল্প। অসীম ও সর্বকর্মা, তিনি সর্বকাম। তিনি সমগ্র বিশ্বব্যাপিয়া রহিয়াছেন।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ॥ শ্বেত: ৬.৮। ব্রহ্ম দেহ-রহিত হইলেও তাঁহার অনন্তজ্ঞান ও অনন্তশক্তি। অনন্ত বিশ্ব তাঁহার অনন্তজ্ঞান ও শক্তিরই পরিচয় প্রদান করিতেছে। য্ একঃ···সর্বাল্লোকাণীশত ঈশনীভিঃ। শ্বেত ৩।১ ব্রহ্ম একাকী সমগ্র বিশ্বকে বিধি অনুসারে শাসন করিতেছেন। উপনিষদে ব্রহ্মকে যে অনন্তগুণ ও শক্তিসম্পন্ন পুরুষরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। উপনিষদের এই মত সমর্থন করিয়া গীতা বলিতেছে 'পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ গতির্ভার্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥ তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎ সৃজামি চ। অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন॥ গীতা—৯।১৭।১৮।১৯।

গীতাতেও দেখিতে পাওয়া যায় ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ। তিনি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থল। তিনিই জগৎ রচনা ও পালন করেন। তিনি অনন্তগুণ ও শক্তিসম্পন্ন। 'অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং'—গীতা ১১।৪০ ব্রহ্ম অনন্তবীর্য ও অমিতবিক্রম। "কবিং পুরাণমনুশাসিতারমনোরনীয়াং—সমনুস্মরেদ্ যঃ সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরাস্তাৎ....স পুরুষমুপৈতিদিব্যম্—গীতা ৮।৯।১০ পুরুষোত্তম সর্বজ্ঞ, অনাদি সর্বনিয়ন্তা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, ব্রহ্মাণ্ডপালক ও স্বপ্রকাশক। প্রয়ানকালে তাঁহাকে যিনি স্মরণ করেন তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মের অনন্তগুণ ও ঐশ্চর্য। 'পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশোহথ সহস্রশঃ। নানা বিধানি দিব্যানি নানা বর্ণাকৃতীনিচ॥ গীতা ১১।৫। ব্রহ্ম সর্বগন্ধ, সর্বরস, সর্ববর্ণ। অনন্ত তাঁহার রূপ ও বিভূতি॥ আত্মানি চৈবং, বিচিত্রাশ্চহি, ২।১।২৮, সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ, ২।১।৩ কর্তাশাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ' ২।৩।৩৪ প্রভৃতি সূত্রদ্বারা ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মকে অনন্তশক্তির

আধাররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদ, উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। যেহেতু ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ, সেইহেতু তিনি সগুণ ও সক্রিয়। ব্রহ্ম যে সগুণ ও সক্রিয় ইহা আমরা বহু মন্ত্র, শ্লোক ও সূত্রের সাহায্যে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয় বলিয়া তাঁহাকে সচেতন আত্মা, পুরুষ বা ঈশ্বররূপে বেদবেদান্ত দর্শনে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় ও নিরাকার

যেহেতু অনাদিকাল হইতে জগতে একই রকমের নিয়ম শৃঙ্খলা চলিয়া আসিতেছে, যেহেতু সমগ্র বিশ্ব বস্তুনিচয়ের একই সুসংহত সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে, সেইহেতু বিশ্বকৃৎ ব্রহ্মও এক। বিশ্বের কর্তা বিভিন্ন হইলে বিশ্বও বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইত এবং বিশ্বেও বিভিন্ন কর্তার বিভিন্ন নিয়মকানুন থাকিত। যেহেতু ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সত্তা নাই, এবং যেহেতু সীমহীন বিশ্বের রচনা অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেছে এবং ব্রহ্মই এই বিশ্বের ধারক, সেইহেতু ব্রহ্ম অনন্ত, স্বাধীন। তিনি স্বয়ম্ভু। তিনি সনাতন, তাঁহার কোন জনক বা অধিপ নাই। সনাতন ব্রহ্মের কোন আকার নাই কেননা যাহাই আকার বিশিষ্ট তাহা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ। ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপ অনন্ত ও সমগ্রবিশ্বের ধারক। তিনিই নাম ও রূপের আবির্ভাব কর্তা বলিয়া তাঁহার কোন আকার বা মূর্তি নাই। কাজেই বেদবেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মকে এক, অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভু ও নিরাকার বা অমূর্তরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ, ঋগ্বেদ্ ১।১৬৪।৪৬ তদেবাগ্নিস্তবাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ যজুঃ ৩২।১ নদ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে। ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে। নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে। য এতং দেবমেকবৃতং বেদ ॥ অথর্ব ১৩।৪।২ স পর্য্যগাচ্ছক্রমকায়ম ব্রণম স্নাবিরং শুদ্ধমপাপাবিদ্ধম। যজুঃ ৪০।৮ ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ। যজুঃ ৩২।৩ উপরিউক্ত মন্ত্রগুলিতে ব্রহ্ম যে এক ও অদ্বিতীয় তাহাই বলা হইয়াছে। এক ব্রহ্মকেই বিপ্রগণ নানা নামে অভিহিত করেন। তাঁহার এই বিভিন্ন নাম তাঁহার বিভিন্ন গুণও শক্তির পরিচায়ক। একব্রহ্ম ব্যতীত কোন দ্বিতীয়

বা তৃতীয় ব্রহ্ম নাই। ব্রহ্ম অকায় অর্থাৎ অশরীরী। ব্রহ্মের অনন্ত কীর্তি বলিয়া তাঁহার কোন প্রতিমূর্ত্তি সম্ভব নহে অথবা তাঁহার সহিত কোন কিছুরই তুলনা চলে না।

'স দেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'। ছাঃ ৬।২।১ 'আত্মা বা ইদমকে একাগ্র আসীৎ'—ঐতঃ ১।১ একো দেবং সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা—শ্বেতঃ ৬।১১ য একো জালবাণীশত ঈশনীভিঃ—শ্বেত ৩।১ একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ। শ্বেতঃ ৩।২ যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ যস্মান্নানীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। শ্বেতঃ ৩।৮ ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব তস্য লিঙ্গম...... ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ—শ্বেতঃ ৬।৯ 'অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে'। শ্বেতঃ ৫।১৩ এষ ব্রহ্মা, এষ ইন্দ্রঃ, এষ প্রজাপতিঃ—ঐতঃ ৩।১।৩ দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ—মুণ্ড ১।১ 'অপানিপাদো.........পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ' অশব্দমস্পর্শমরূপম্ যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি, যচ্ছ্রোত্রেণ ন শৃণোতিঃ,' উপনিষদের উপরিউক্ত মন্ত্রগুলি ব্রহ্মকে এক, অদ্বিতীয় অনন্ত ও স্বয়ম্ভুরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ব্রহ্মই ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রজাপতি, ইহার কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্ত্তি নাই। গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রও উপনিষদ অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মকে এক, অদ্বিতীয় সনাতন ও অমূর্তরূপে গ্রহণ করিয়াছে। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম ॥ আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্ণারদস্তথা। গীতা ১০।১২।১৩ ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ...... বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ। গীতা ১১।৩৮।৩৯। ব্রহ্মসূত্রও এক দিব্য ব্রহ্মকে যে নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহা পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

ব্রহ্ম কি স্রষ্টা?

বৈদিক দর্শনে আমার যে জটিল একটি সমস্যার সম্মুখীন হই, সে সমস্যাটি এখানে এখন উপস্থাপিত করা হইতেছে। বৈদিক দর্শনে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা যে একমাত্র পরমতত্ত্ব এবং এই ব্রহ্মই যে জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন হইল, আবির্ভাবের পূর্বে জগৎ ব্রহ্মে কিভাবে ছিল এবং কিভাবেই বা ইহার আবির্ভাব ঘটিতেছে? জগৎ কি ব্রহ্মের সৃষ্টি?

যাহা পূর্বে ছিল না, তাহার আবির্ভাব ঘটনা সৃষ্টি বাদানুসারে জগৎ পূর্বে ছিল

না। প্রথমে কেবলমাত্র সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান সচেতন ঈশ্বর ছিলেন। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাই সৃষ্টি। শূন্য হইতে ভগবান জগৎসৃষ্টি করিলেন। উপনিষদের দুই একটি মন্ত্র যে এইরূপ সৃষ্টিবাদকে সমর্থন করে না, তাহা নহে। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোহসৃজত। ছাঃ ৬।২।২।৩ সৃষ্টির পূর্বে কেবলমাত্র এক অদ্বিতীয় সত্তা বিরাজ করিতেন। তিনি আলোচনা করিতেন, আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব। তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঐক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি॥ ঐতঃ ১।১।১ স ইমাঁল্লোকানসৃজত অম্ভোমরীচীর্মরমাপঃ। অদোহম্ভঃ পরেণ দিবং, দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা। অন্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরঃ যা অধস্তাত্তা আপঃ। ঐতঃ ১।১।২ স ঈক্ষতে মে নু লোকা. লোকপালান্ নু সৃজা ইতি। সোহদ্ভ্য এব পুরুষং সমুদ্ধৃত্যা মূর্ছয়ৎ। ঐতঃ ১।১।৩ প্রথমে কেবল মাত্র পরমাত্মা ছিলেন ক্রিয়াশীল অন্য কিছুই ছিল না। সেই আত্মা এইরূপ ঈক্ষণ করিলেন, আমি লোক সমূহ সৃজন করিব। তিনি এই সকল লোক সৃজন করিলেন—অম্ভোলোক মরীচি—লোকসমূহ, মরলোক ও আপলোক, দ্যুলোকের উর্ধ্বে যাহা অবস্থিত তাহাই অম্ভলোক, দ্যুলোক তাহার আশ্রয়। অন্তরিক্ষই মরীচিলোক সমূহ। পৃথিবী মরলোক। যে সকল লোক পৃথিবীর অধোভাগে তাহারাই আপলোক। সেই ঈশ্বর ঈক্ষণ করিলেন, এই সকল লোক ত সৃষ্টি হইল, এখন লোকপাল সমূহকে সৃষ্টি করি। তিনি পঞ্চভূত হইতেই পুরুষাকার। পিণ্ডকে গ্রহণ করিয়া তাহাতে অবয়ব সংযুক্ত করিলেন।

এই জগৎ সৃষ্টিরাক্রম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টির ক্রমের কথা ছাড়িয়া দিলেও পাশ্চাত্ত্য সৃষ্টিবাদের সহিত উপনিষদে যে সৃষ্টিবাদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেই সৃষ্টিবাদের একটি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য সৃষ্টিবাদে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগতের অভ্যন্তরে থাকেন না, তিনি থাকেন জগতের বাহিরে কিন্তু উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া উহার অভ্যন্তরে থাকিয়া উহাকে ধারণকরেন এবং পরিচালনা করেন। সোহকাময়ত—বহুস্যাংপ্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা। ইদম্ সর্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ, তৎ সৃষ্ট্বা, তদেবানুপ্রাবিশৎ। তৈঃ ২।৬ সেই পরমাত্মা এই কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব। তিনি সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করিয়া এই যাহা কিছু সব সৃষ্টি করিলেন এবং উহাতে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মাই জগতের অধিষ্ঠান।

শূন্য বা অভাব হইতে কোন সৎ পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে না বলিয়া বেদান্ত দর্শন নিরপেক্ষ সৃষ্টিবাদ সমর্থন করে না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, বেদান্ত দর্শনের মূল বক্তব্য হইল এই যে, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। দ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ ব্যতীত সকলে ব্রহ্মকে এই ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য ব্রহ্ম সূত্রের 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' সূত্র ব্যাখ্যায় বলেন, 'উপাদান-কারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপেগন্তব্যং নিমিত্ত কারণঞ্চ।' তাহার মতে যেহেতু শূন্য বা অভাব হইতে জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না এবং যেহেতু শ্রুতিতে রহিয়াছে উপাদান কারণ মৃত্তিকা জানিলে যেমন মৃন্ময় বস্তু সকল জানা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মকে জানিলেই যখন সকল জানা হয়, তখন ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। অধিকন্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয় তাহাই উপাদান কারণ। তিনি সাক্ষাচ্চোভয়াম্নোনাৎ ১।৪।২৫ ব্রঃ সূঃ ব্যাখ্যায় বলেন "প্রকৃতির্ব্রহ্ম, যৎ কারণং সাক্ষাৎ ব্রহ্মৈব কারণমুপাদায়োভৌ প্রলয়—প্রভবাম্নায়েতে। সর্বানি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎ পদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি ইতি। যদ্ধি যস্মাৎ প্রভবতি যস্মিংশ্চ প্রলীয়তে, তৎ তস্যোপাদানং প্রসিদ্ধং, যথা ব্রীহি—যবাদীনাং পৃথিবী।"

কিন্তু শঙ্করের মতে ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি অব্যয়, নির্গুন, নিষ্ক্রয়, তিনিই একমাত্র নিত্য সত্তা। তিনি নির্বিকার ও নির্বিশেষ। তিনি সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত। তিনি 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্ অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবাননম্। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন সত্তা নাই। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত বা উপাদান কারণ নহে। তাঁহার কথায় স বা এষ মহানজ, আত্মাঽ-জরোঽ মরোঽভয়ো ব্রহ্ম, স এষ নেতি নেত্যাত্মা অস্থূলমনণুঃ ইত্যাদ্যাভ্যঃ, সর্বক্রিয়া—প্রতিষেধ শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। জগতের কোন সত্তাই নাই। শঙ্করের নিজের কথায় 'ন চ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদজং সম্ভবতি, যদেব সোম্যেদমগ্র আসীদক-মেবাদ্বিতীয়ম্ ইত্যবধারণাৎ। একবিজ্ঞনেন চ সর্ব্বজ্ঞান প্রতিজ্ঞানাৎ। ন চ ব্রহ্ম বাতিরিক্তং বস্তুস্থিত্বমবকল্পতে। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। তিনি তাঁহার এই মত প্রতিষ্ঠায় কতিপয় উপনিষদের মন্ত্রের উল্লেখ করেন। তাঁহার নিজের কথায় "স এবা ধস্তাদহমেবাধস্তাদাত্মৈবা—ধস্তাৎ (ছাঃ ৭।২৫।১) ব্রহ্মৈ বেদং সর্ব্বমাত্মৈবেদং সর্ব্বম্ (ছাঃ ৭।২৫।২ নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ ৪।৪।১৯) যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ (শ্বেতঃ ৩।৯) তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমন পরমনন্তরম্-বাহ্যম্ (বৃ ২।৫।১৯) ইত্যেবমাদিবাক্যানি স্বপ্রকরণ স্থান্যন্যার্থত্বেন

পরিপেতুম-শক্যানি ব্রহ্ম ব্যতিরিক্তং বস্ত্বন্তরং বারয়ন্তি। সর্ব্বান্তরং-শ্রুতেশ্চ ন পরমাত্মনোঽন্তরোঽন্য আত্মাস্তীত্যবগম্যতে।

শঙ্কর বিভিন্ন নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ ও জীবের নানাত্বের পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করিলেও তিনি ইহাদের ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করেন। কাজেই জগতের কারণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন অবান্তর নহে। তিনি ব্যবহারিক জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে সর্বজ্ঞ ও অনন্ত শক্তি ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছেন। সর্বজ্ঞ ও অনন্তশক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বরই সগুণ ও সক্রিয় ব্রহ্ম। শঙ্করের মতে উপনিষদে দুই প্রকার ব্রহ্মের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যথা, নির্গুন ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম এবং সগুণ ও সক্রিয় ব্রহ্ম। নির্গুণ ব্রহ্ম সর্ব উপাধি বর্জিত এবং সগুণ ব্রহ্ম উপাধি—বিশিষ্ট। তাঁহার নিজের কথায়, দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নামরূপ বিকার ভেদোপাধি বিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্।" সগুণ ব্রহ্মই ঈশ্বর, ইনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। শঙ্করের কথায় "নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেরীশ্বরা—জ্জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়াঃ নাচেতনাৎ প্রধানদন্যস্মা-দ্বেত্যেযোর্থে প্রতিজ্ঞাতো জন্মাদস্য যতঃ ইতি।' 'জন্মাদ্যস্যযতঃ—সূত্রে একমাত্র বক্তব্য হইল এই যে নিত্যবুদ্ধ-মুক্ত সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, অচেতন প্রকৃতি বা অন্য কোন অচেতন পদার্থ হইতে নহে।

এখানে প্রশ্ন উঠিয়া থাকে এক নির্গুণ ব্রহ্মই যদি সত্তা হইয়া থাকে, তবে সগুণ ও সক্রিয় ব্রহ্মের আবির্ভাব কিরূপে ঘটে? সংখ্যাকারের ন্যায় শঙ্করাচার্য ও বিভিন্ন নামরূপ বিশিষ্ট জগন্তের প্রাগবস্থা বা অবক্তাবস্থা স্বীকার করেন। তবে পার্থক্য হইল এই যে, সংখ্যাকারের মতে পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতিই এই অব্যক্তাবস্থা। কিন্তু শঙ্করাচার্যের মতে অব্যক্ত অবস্থা ঈশ্বরাধীন। পরমেশ্বরাধীনা ত্বিয়মস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতোঽভুপে-গম্যতে ন স্বতন্ত্রা।

নহি তয়াবিনা পরমেশ্চরস্য স্রষ্টৃত্বং সিধ্যাতি, শক্তি রহিতস্য তস্য প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেঃ।' শঙ্করের মতে মায়া বা অবিদ্যাই সংসার বীজশক্তি। 'অবিদ্যাত্মিকা হি সা বীজশক্তিরব্যক্ত-শব্দ নির্দেশ্যা। পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহা সুযুক্তিঃ, যস্যাং স্বরূপ-প্রতিবোধ-রহিতাঃ শেরতে সংসারি-নো জীবাঃ।' অবিদ্যাই অব্যক্তাবস্থা ইহা পরমেশ্বরাধীনা ও পরমেশ্বরাশ্রিতা। এই অবিদ্যা সংসার বীজশক্তি, ইহাই মহা সুষুপ্তি বা প্রলয়। ইহাতেই সংসারী জীব স্বরূপ—জ্ঞানহীন হইয়া প্রলয়কালে লীন বা শয়ান থাকে। এই অবিদ্যা যে কি তাহা নিরূপণ করা যায় না। অব্যক্তা, হিসা মায়া, তত্ত্বান্যত্ব—নিরূপণস্যাশক্যত্বাৎ। মায়াশক্তি অনির্ব্বচনীয়। ইহার অস্তিত্ব আছে ইহাও বলা চলে না, আবার ইহার অস্তিত্ব যে নাই, তাহাও বলা চলে না, কারণ জ্ঞানের উদয়ে ইহার লোপ হইয়া থাকে। শঙ্করের মতবাদ সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে

হইলে এইরূপ ভাবে করিতে হয় যে, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বিশুদ্ধ চৈতন্যই একমাত্র সত্তা। ইহাকে আশ্রয় করিয়া অনাদি অথচ সান্ত মায়া বা অবিদ্যা রহিয়াছে। মায়ার প্রথম সৃষ্টি মহৎ বা বুদ্ধি। ব্রহ্ম ভ্রমক্রমে যখন এই মায়াকে নিজ শক্তি বলিয়া মনে করেন অর্থাৎ মায়া সৃষ্ট বুদ্ধিকে নিজের বলিয়া মনে করেন, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্ম হইয়া থাকেন। এখন ঈশ্বর জীব যাহাতে কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করিতে পারে সেইরূপভাবে মায়াশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া জগৎ রচনা করিতেছেন। মায়া সৃষ্ট বিভিন্ন অন্তঃকরণে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই বিভিন্ন জীবরূপে প্রতিভাত হন। মায়া বিনষ্ট হইলে জীবের নানাত্ব, জগৎ প্রপঞ্চ ও ইহার কর্তা ঈশ্বরও থাকেন না। থাকেন কেবলমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম। শঙ্করের কথায় 'ননুকূটস্থ ব্রহ্মবাদিন একত্বৈকান্ত্যাৎ ঈশিত্রীশি-তব্যাভাবে ঈশ্বর কারণ প্রতিজ্ঞা বিরোধ ইতিচেৎ, ন, অবিদ্যাত্মক নামরূপবীজ ব্যাকরণা-পেক্ষত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বস্য। ...সর্ব্বজ্ঞ—স্যেশ্বরস্যাত্মভূতে ইবাবিদ্যাকল্পিতে নামরূপে তত্ত্বান্যত্বাভ্যামনির্ব্বচনীয়ে সংসার প্রপঞ্চ বীজভূতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য মায়াশক্তি প্রকৃতিরিতি এবমবিদ্যাকৃত—নামরূপোপাধ্যনুরোধীশ্বরো—ভবতিব্যোমেব ঘটকরকাদ্যুপাধ্যানুরোধি। ...তদেবমবিদ্যাত্মকোপাধি পরিচ্ছেদাপেক্ষামেবেশ্বরস্যেশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বশক্তিত্বঞ্চ ন পারমার্থতো বিদ্যয়াপাস্ত সর্ব্বোপাধিস্বরূপে আত্মণীশিত্রীশিতব্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিব্যবহার উপপদ্যতে।

শঙ্করের দর্শন আলোচনা করিলে ইহা স্বতঃই মনে হয়, তিনি উপনিষদের যে সকল মন্ত্র ব্রহ্মকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়রূপে এবং যে সকল মন্ত্র ব্রহ্মকে সগুণ ও সক্রিয়রূপে গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল মন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া এক সুসংহত দার্শনিক মতবাদ গঠন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার এই প্রচেষ্টা হইতে মায়াবাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, তাঁহার মায়াবাদ এক রহস্যবাদ মাত্র। ইহা বিচার গ্রাহ্য নহে। প্রকৃতপক্ষে শঙ্করের মতে যেহেতু ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় সেই হেতু অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া বা অবিদ্যাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। নিষ্ক্রিয় অধিষ্ঠানকে উপাদান কারণ রূপে গ্রহণ করিলে অবশ্য জগতের অধিষ্ঠান ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলা চলে। তাঁহার মায়াবাদের বিরুদ্ধে রামানুজ যে সকল আপত্তি তুলিয়াছেন সেই সকল আপত্তি শঙ্কর সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকগণ খণ্ডন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না। রামানুজ বলেন, পদার্থ মাত্র সৎ বা অসৎ হইবে, সদসৎ অনির্বচনীয়রূপে কোন পদার্থের সত্তা নাই। কাজেই সদসদ্বিলক্ষণা মায়ারূপে কোন পদার্থের সত্তা স্বীকার্য্য

নহে। অধিকন্তু মায়াশক্তিরূপে কোন শক্তির সত্তা স্বীকার করিলে অদ্বৈতহানি ঘটিয়া থাকে। মায়া জীবকেও আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না, কেননা জীব মায়ার সৃষ্টি, আবার ইহা ব্রহ্মকেও আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না, কেন না ব্রহ্মে কখনও অজ্ঞানতা সম্ভব নহে। ইহা চির প্রকাশমান ব্রহ্মকে আবৃতও করিতে পারে না। মায়া দ্বারা জগৎ সৃষ্টিও কখন সম্ভব হয় না, যেহেতু মায়া বা অবিদ্যা জ্ঞানের অভাবরূপে স্বীকৃত হয়। অভাব পদার্থের কোন ক্রিয়া থাকা সম্ভব নহে। আবার ইহা ভাব পদার্থ হইলে ইহার বিনাশও অসম্ভব।

শঙ্করের মতবাদ বিশ্লেষণ কবিলে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার মতে অবিদ্যাই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মরূপ পটে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ চিত্রিত করিতেছে। চিত্রিত জগৎ দ্বারা উহার অধিষ্ঠানরূপ পট আবৃত হওয়ায় চিত্রিত জগৎই সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত, পরিণাম নহে। ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়ে চিত্রিত জগৎ সমেত অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্বরূপে প্রকাশমান থাকেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্বশক্তিমত্তা অবিদ্যা কল্পিত। যেহেতু অবিদ্যা প্রভাবে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জীবরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, সেহেতু জীবাশ্রিত অবিদ্যা প্রভাবে ব্রহ্ম সগুণ ও সক্রিয়রূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ইহা মনে করা সমীচীন নহে। ব্রহ্ম ভ্রমক্রমে অবিদ্যার ক্রিয়াকে নিজের ক্রিয়া বলিয়া মনে করেন এবং নিজকে জগতের কারণরূপে মনে করিয়া থাকেন, ইহা মনে করাই সঙ্গত। কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় হওয়ায় ব্রহ্মের পক্ষে এইরূপ ভ্রম করাও সম্ভব হয় না, কেন না ভ্রম করাও এক প্রকারের শক্তি। শঙ্কর মায়াবাদের সাহায্যে নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম মতবাদদ্বয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। যেহেতু তিনি মনে করেন, অবিদ্যার পক্ষে জীবের কর্ম বিচার করিয়া নিয়মশৃঙ্খলার সহিত জগৎ রচনা সম্ভব নহে, সেইহেতু তিনি নিমিত্ত কারণরূপে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান সগুণ ব্রহ্মের প্রয়োজন বোধ করেন। কিন্তু ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হওয়ায় তাহার পক্ষেও সগুণ ও সক্রিয় হওয়া সম্ভব নহে। শঙ্করের এই সকল জটিল সমস্যার উদ্ভব হয় না যদি তিনি অবিদ্যা শক্তি (irrational will) এবং উহা দমন করিবার জন্য বিদ্যাশক্তি—এই উভয় শক্তির সম্ভাবনা ব্রহ্মে স্বীকার করেন। কিন্তু বেদান্তদর্শনে ব্রহ্মে অবিদ্যা শক্তির সম্ভাবনা কখনও স্বীকৃত হয় নাই।

অপরদিকে শঙ্করের জীব সম্বন্ধীয় মতবাদও জটিল সমস্যা সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহাও বোধগম্য নহে। জীব স্বরূপতঃ নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম হইলে তাহার বন্ধন ও

মুক্তির প্রশ্ন উঠে না। মায়াই অবিদ্যাশক্তিরূপে জীবের বন্ধন ঘটায়, আবার মায়াই বিদ্যাশক্তিরূপে জীবের মুক্তি ঘটায়। ইহার চেয়ে জীবের অসহায়তার দর্শন আর কি হইতে পারে? শুভ বা অশুভ সকল কর্মেরই জনক মায়া। জগৎ অবিদ্যার বিলাস। এইরূপ দার্শনিক মতবাদ আমাদের নৈতিক ও ধর্মচেতনা ব্যাখ্যা করিতে পারেনা। এইরূপ মতবাদে আত্মা যথার্থই পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্ক্রিয় হইলে ইহার পক্ষে মায়া সৃষ্ট অন্তঃকরণের ক্রিয়াকে ভ্রমক্রমে নিজের ক্রিয়া মনে করিয়া জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা হওয়া যে সম্ভব নহে, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

রামানুজ বেদান্ত দর্শন ব্যাখ্যার মাধ্যমে একটি সুস্পষ্ট মতবাদ গঠন করিয়াছেন। তাঁহার এই মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদ অনুসারে ব্রহ্মই যে একমাত্র সত্তা ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই, তবে তিনি সগুণ ও সক্রিয়। তাঁহার মতে ব্রহ্মের অনন্ত সদ্‌গুণ রহিয়াছে বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে নির্গুণ রূপে অভিহিত করিয়াছেন। ব্রহ্ম আপ্তকাম। তাঁহার কোন অভাব নাই বলিয়া তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়। ব্রহ্ম এক পরম সনাতন দ্রব্য (substance), চৈতন্য ইঁহার স্বাভাবিক ধর্ম। ব্রহ্মের চিৎ ও অচিৎ (জড়) শক্তি নামে দুই শাশ্বত শক্তি রহিয়াছে। ব্রহ্মের চিৎশক্তি হইতে জগতের আবির্ভাব। জীব যাহাতে কর্মানুসারে ফলভোগ করিতে পারে সেজন্য ব্রহ্ম তাহার অচিৎশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া জগৎ রচনা করিতেছেন। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। রামানুজের মতবাদের উপর যোগশাস্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট। যোগশাস্ত্রের ঈশ্বরের ন্যায় রামানুজের ব্রহ্ম ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া জগৎ রচনা করিতেছেন। তবে এই মতবাদদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হইল এই যে, যোগশাস্ত্র মতে প্রকৃতির স্বতন্ত্র সনাতন সত্তা রহিয়াছে; আর রামানুজের প্রকৃতি ব্রহ্মেরই অংশ। ইহা ব্রহ্মেরই অচিৎশক্তি। ইহার সনাতন সত্তা থাকিলেও ইহা ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। রামানুজের মতে ব্রহ্মের দুই লীলা—একটি অন্তঃ বা অব্যক্ত এবং অপরটি বহিঃ বা ব্যক্ত, জগতের মাঝে তাঁহার ব্যক্তলীলা চলিতেছে। অধিকন্তু তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ ভিন্নাভিন্ন, জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন এবং কার্যতঃ ভিন্ন।

দেখা যাইতেছে রামানুজের মতে সাংখ্যের অচেতনা প্রকৃতি ব্রহ্মের অংশ বা অবয়ব; ইহা ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে এবং ব্রহ্ম ইহাকেই উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়া জগৎ রচনা করিতেছে। কিন্তু এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হইল এই যে অচেতনা জড়া প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের কিরূপে অংশ হইতে পারে? জড় ও অজড় পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মী হওয়ায় উহাদের মধ্যে কোনরূপে সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব

হয় না। অথচ রামানুজ শুধু ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি জড়কে অজড়ের অংশরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। যদিও অনেকেই মনে করেন রামানুজের বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যাই উহার প্রকৃত ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা উপরিউক্ত কারণের জন্য রামানুজের দর্শনকে প্রকৃত বেদান্ত দর্শনরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

বেদান্তদর্শন ব্যাখ্যায় মধ্বাচার্য যে মতবাদ গঠন করিয়াছেন তাহা দ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। তাঁহার মতে ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় ও অনন্ত। তিনি অনন্তগুণবিশিষ্ট ও ও সর্বশক্তি সমন্বিত এক বিরাট পুরুষ। কিন্তু তাঁহার মতে জীব ও জগত অথবা চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের অংশরূপে সনাতন নহে। ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে। তবে তাঁহার মতে জীব ও জগতের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিলেও ইহারা ব্রহ্মাধীন। ব্রহ্ম অচিৎ সত্তা নিয়ন্ত্রণ করিয়া জগৎ রচনা করিতেছেন। মধ্বাচার্যের মতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ এবং প্রকৃতি উপাদান কারণ।

মধ্বাচার্যের মতবাদ এক পূর্ণাঙ্গ দ্বৈতবাদ। জড় ও অজড়, চেতন ও অচেতনের মধ্যে সম্বন্ধের সম্ভাবনার স্বীকৃতির উপর এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দুই বস্তুর মধ্যে তাদাত্ম্য ভাব না থাকিলে কোন সম্বন্ধ সম্ভব হয় না—ইহা তর্কশাস্ত্রের একটি স্বতঃসিদ্ধ নীতি। কাজেই দ্বৈতবাদ বিচার গ্রাহ্য মতবাদ নহে। যদি দ্বৈতবাদের সমর্থনে ২।১টি শ্রুতি বাক্যকে যে ব্যাখ্যা করা না যায়, তাহা নহে, তাহা হইলেও বেদান্তদর্শন স্পষ্টতঃ যে অদ্বৈতবাদী দর্শন ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

উপরিউক্ত আচার্যগণ বেদান্তদর্শনের যে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন তাহা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে বেদ, উপনিষদ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রে একমাত্র ব্রহ্মকেই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মই বিশ্বযোনি ও বিশ্বকৃৎ। ব্রহ্ম সচেতন পুরুষ, পরমাত্মা ও ঈশ্বর। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি সমন্বিত। তিনি সগুণ ও সক্রিয়। বেদ বেদান্ত দর্শনের বহু স্থলেই ব্রহ্মকে এইরূপভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। দুই এক স্থলে ব্রহ্মকে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অকর্তারূপে যে গ্রহণ করা হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু সেই সব স্থলের 'নির্গুণ', ও 'নিষ্ক্রিয়' ও 'অকর্তা' শব্দগুলিকে রামানুজের পন্থা অনুসরণ করিয়া ব্যাখ্যা করিলে কোন সমস্যাই দেখা দেয় না। ব্রহ্মের অনন্তগুণ। তাঁহার গুণের কোন সীমা নাই। তাহার কোন অসৎ গুণ নাই, এই জন্য তাঁহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। অভাব হইতে কর্মের উৎপত্তি ঘটে, কিন্তু যেহেতু ব্রহ্ম আপ্তকাম, সেহেতু তাঁহার কোন অভাব নাই, সেইহেতু তাহাকে অকর্তা বা নিষ্ক্রিয় বলা হইয়া থাকে। নিজের অভাব পূরণ করিবার জন্য তাঁহার কোন কর্ম

নাই। তিনি যাহা কিছু করেন, এমনকি তাহার এই জগৎ সৃষ্টিও জীবের মঙ্গলের জন্য। তাহার সকল ক্রিয়াই আনন্দ ও করুণার লীলা। নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও অকর্তা ব্রহ্মকে এইরূপ ভাবে গ্রহণ করিলে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের যে সমস্যা শঙ্করাচার্যের হাতে দুর্লঙ্ঘ্যরূপে দেখা দিয়াছিল সেই সমস্যাই থাকে না। কাজেই ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণরূপে গ্রহণ করিতে আমাদের কোন বাধাই থাকিতে পারে না।

দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণ ব্যতীত সকল ভাষ্যকারই ব্রহ্মকে নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান সমস্যা হইল ব্রহ্ম কিরূপে উপাদান কারণ হইতে পারে? অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণের দর্শনের উপর সাংখ্যের প্রভাব প্রবল। শঙ্করাচার্য প্রকৃতির স্থলে অবিদ্যা আনয়ন করিয়াছেন এবং ইহাকে ব্রহ্মাশ্রিত করিয়াছেন। রামানুজ ইহাকে ব্রহ্মের অংশ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হওয়ায় তিনি ইহাকে নিমিত্ত কারণ রূপে গ্রহণ করিতেও সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। তিনি অবিদ্যার সাহায্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে চেষ্টা করিতে গিয়া অবিদ্যাকেই প্রকৃতপক্ষে নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা লইয়া কার্যগঠিত এবং কার্য ধ্বংশকালে যাহাতে লীন হয় তাহাই উপাদান কারণ। নৈয়ায়িকগণ ইহাকে সমবায়ি কারণ বলিয়া থাকেন। এইরূপ অর্থেই সাংখ্যকার প্রকৃতিকে উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

সাংখ্যকারের মতে প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা এবং প্রকৃতি হইতে জাত জগতের সকল পদার্থই ত্রিগুণাত্মক। কাজেই প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ। যেহেতু উপাদানের দিক হইতে কারণ ও কার্য একই, সেইহেতু সাংখ্যকার সৎকার্যবাদ অর্থাৎ কার্যোৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে এই মতবাদ সমর্থন করেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ অসৎ কার্যবাদী। তাঁহারা বলেন যে কারণ ও কার্যের উপাদান এক হইলেও কারণ ও কার্যের আকার প্রকার এক নহে। উহারা ভিন্ন পদার্থ। কার্য এক নূতন সৃষ্টি। এইজন্যই নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন। কাজেই দেখা যায়, যোগশাস্ত্র, ন্যায়-বৈশেষিক, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী বেদান্ত প্রভৃতি সকল দর্শন প্রকৃতপক্ষে সাপেক্ষসৃষ্টিবাদের সমর্থক। সাপেক্ষ সৃষ্টিবাদানুসারে নিমিত্ত কারণের প্রচেষ্টার ফলে উপাদান কারণ হইতে কার্যরূপে এক নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তবে রামানুজের মতে উপাদান কারণ অচিৎশক্তি বা প্রকৃতি নিমিত্ত কারণ ব্রহ্মের এক অংশ বিশেষ। অপরদিকে সাংখ্যকারের মতে প্রকৃতিই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। জগতের উপাদান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ক্রিয়াশীল হওয়ায় তাহাদের ক্রিয়ার তারতম্যানুসারেই

জগতের বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু যোগশাস্ত্রকার ও রামানুজ জড়া প্রকৃতির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ পরমাণুবাদী। তাঁহাদের মতে পরমাণুগুলি নিষ্ক্রিয় এবং ইহারাই জগতের উপাদান কারণ। তাঁহারাও নিমিত্ত কারণরূপে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন। কেবলাদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে এই জগৎ অবিদ্যার সৃষ্টি। অবিদ্যা অঘটন ঘটন পটীয়সী। অবিদ্যা জগৎ সৃষ্টি ব্যাপারে নিরপেক্ষ হইলেও ইহা নিজেই ব্রহ্মাশ্রিত বলিয়া ব্রহ্মই অবিদ্যা সৃষ্ট কার্য সমুহের অধিষ্ঠান। এখানে যে অর্থে প্রকৃতি বা পরমাণুপুঞ্জ জগতের উপাদান কারণ সেই অর্থে ব্রহ্মকে উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করা যায় না।

বেদবেদান্ত গীতা ও ব্রহ্মসূত্রে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি। এখন প্রশ্ন হইল জগতের আবির্ভাবের পূর্বে জগৎ ব্রহ্মে কিরূপ ভাবে ছিল এবং ব্রহ্ম ইহাকে কিরূপ ভাবেই বা প্রকাশ করিতেছেন ? আমরা দেখিয়াছি, শঙ্করের মতে ব্রহ্ম অপরিণামী এবং তাঁহার বিবর্তবাদ এক প্রকারের নিরপেক্ষ সৃষ্টিবাদ। অপর-দিকে সৎকার্য ও পরিণামবাদী আচার্যগণ কার্যোৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে কিরূপ ভাবে বিদ্যমান থাকে তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পরিণামবাদ প্রকৃতপক্ষে সাপেক্ষ সৃষ্টিবাদ। বেদ-বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বমনা, সত্যসংকল্পরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম নিজেকেই নিজে সৃজন করিতেছেন, 'স আত্মানং অসৃজত। যদি ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এবং স্বগত ভেদ রহিত হইয়া থাকেন তবে ব্রহ্ম হইতে নানাবস্তু সমম্বিত জগতের আবির্ভাবের কোনরূপ সম্ভাবনা থাকিতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ, সর্বমনা ও সত্যসংকল্প বলারও কোন অর্থ হয় না। গীতায় উক্ত রহিয়াছে, যচ্চাপি সর্বভূতানং বীজংতদহমর্জ্জুন। পরমেশ্বরের অনন্ত বিভূতি অনন্ত ঐশ্বর্য এবং তিনি এই অনন্ত বিভূতিই জগতের মাঝে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি সর্বভূতের বীজ। উপনিষদে ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প বলা হইয়াছে। এই সত্য বা সর্ব কি ? কাজেই, ব্রহ্ম স্বগত ভেদযুক্ত এবং আমাদের প্লেটোর ন্যায় বলিতে হয়, জগতের প্রতিটি অভিধেয় বা জ্ঞেয় বস্তুর ধারণা পরমেশ্বরের মনে রহিয়াছে। এই ধারণাই ভূতের বীজ। জগতে নানা শ্রেণীর বস্তু রহিয়াছে ; প্রতিটি শ্রেণীর ধারণা ভগবানের চেতনাতে রহিয়াছে। বিভিন্ন ধারণা বিভিন্ন বস্তু শ্রেণীর আদর্শ। এই ধারণা নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। ভগবান এই আদর্শ বা ধারণা সমূহের সুংসহত সমষ্টি। তিনি এই ধারণা সমূহের মধ্যস্থিত ঐক্য সূত্র।

বিভিন্ন মুক্তা একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া যেমন মালার সৃষ্টি করে, সেইরূপ বিভিন্ন ধারণা ব্রহ্মরূপ সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি মালার ন্যায় শোভা পাইতে থাকে। ব্রহ্ম এই মালার ধারক এবং এই মালা সম্বন্ধে সচেতন, কাজেই তিনি সর্বজ্ঞ। ধারণাগুলিই তাঁহার ঐশ্বর্য। এই ধারণার জগৎই আদর্শ জগৎ, সত্যলোক। ইহাই আনন্দ ধাম। ভগবান তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য দর্শন করেন ও অনন্ত আনন্দ উপভোগ করেন। এইজন্য তিনি আনন্দময়, রসময়। এইজন্যই উপনিষদে বলা হইয়াছে—রস বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। কো হ্যে বান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ। এষহ্যেবানন্দয়াতি" তৈ:—২।৭। জগতে এই আনন্দলোকের প্রকাশ চলিতেছে বলিয়া জীবন এত সুন্দর ও মধুময়। জগতের মাঝে যদি এই আনন্দময় সত্তার প্রকাশ না ঘটিত, তবে কে প্রাণ ধারণ করিতে পারিত ? সুতরাং উপনিষদে বলা হইয়াছে আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি সং বিশন্তি।—আনন্দই ব্রহ্ম এবং আনন্দ হইতে জগতের উৎপত্তি এবং আনন্দে জগতের স্থিতি ও লয়।

আদর্শ জগতের ধারক ব্রহ্ম, তিনিই আদর্শজগৎ। তিনি এক একটি আদর্শকে এক একশ্রেণীর বস্তুর মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন। এইজন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে ;— আমি (ভগবান) বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে অশ্বত্থ, আমি অশ্বশ্রেণীর মধ্যে উচ্চৈঃ শ্রবা, আমি হস্তিশ্রেণীর মধ্যে ঐরাবত ইত্যাদি। ভগবান্ আদর্শ জগৎকে দেশ ও কালের মাধ্যমে প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'স আত্মানং অসৃজত।' ভগবান নিজকেই সৃজন করিতেছেন। ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে, আত্মকৃতেপরিনামাৎ। আত্মা-নিজকেই প্রকাশ করিতেছেন। বেদোপনিষদে বলা হইয়াছে পুরুষএবেদংসর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্' যাহা ঘটিবে তাহাও ব্রহ্ম। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা কেবল ব্রহ্মে ধারণারূপে থাকিতে পারে।

যেহেতু আদর্শ জগৎ নিত্য, কালাতীত, ইহা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় এবং বাস্তবজগতের বস্তু সকল দেশ ও কাল সম্বন্ধযুক্ত, বাস্তব জগতের প্রতিটি বস্তু দেশে অবস্থিত এবং ইহা দেশের আকার এবং প্রকার (modification)। প্রতিটি বস্তু কালে সীমাবদ্ধ, সেইহেতু এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে। দেশ ও কাল কোথা হইতে কিভাবে আসিতে পারে ?

প্লেটো স্পষ্টতঃ দ্বৈতবাদী। তিনি আদর্শ জগতের বাহিরে দেশ বা নির্বিশেষ জড়ের সত্তা স্বীকার করেন। তাঁহার মতে ভগবান দেশের বা জড়ের মাধ্যমে আদর্শ

জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু বেদান্ত দর্শন স্পষ্টতঃ অদ্বৈতবাদী। ইহা ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন পদার্থের সত্তা স্বীকার করে না। বেদান্ত দর্শন মতে অনন্ত ব্রহ্মের প্রথম সৃষ্টি অনন্ত নির্বিশেষ, আকাশ বা দেশ। ইহা ভগবানের নিরপেক্ষ সৃষ্টি। আকাশাকারে ব্রহ্মের প্রথম আবির্ভাব। আকাশই ব্রহ্ম। কিন্তু ব্রহ্ম এই দেশের মাধ্যমে তাঁহার আদর্শ জগৎকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ করিতেছেন। এইজন্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, আকাশ হইতে নামরূপের উৎপত্তি এবং ইহাতে লয়। আদর্শ জগতের ক্রেমিক প্রকাশই কাল। ব্রহ্ম কালকর, কারণ তিনি কালের স্রষ্টা, তিনিই গতি। যেহেতু বাস্তব জগতে আদর্শ জগতের প্রকাশ এবং ব্রহ্মই প্রকাশ ঘটাইতেছেন, সেইহেতু ব্রহ্মই একদিকে যেমন 'বিশ্বকৃৎ', 'বিশ্বকর্মা', অপরদিকে 'বিশ্বযোনি' 'ভূতযোনি'। তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কেবলমাত্র এইভাবে বেদান্ত দর্শন গ্রহণ করিলে উহার সৎকার্যবাদ ও পরিণামবাদের প্রকৃত তাৎপর্যের সন্ধান লাভ করিয়া থাকি। উপনিষদে পরিষ্কার ভাবে রহিয়াছে—দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্তঞ্চৈবামূর্তঞ্চ মর্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ। বৃহঃ ২।৩।১ 'ব্রহ্মের দুইটি মাত্র' রূপ আছে, মূর্ত ও অমূর্ত, মর ও অমর, পরিছিন্ন ও অপরিছিন্ন, স্থিতিশীল ও গতিশীল, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। আদর্শ জগতের দিক হইতে ব্রহ্ম অমূর্ত, সনাতন ও অতীন্দ্রিয় এবং জগতের দিক হইতে তিনিই মূর্ত, গতিশীল ও প্রত্যক্ষযোগ্য। অমূর্ত ব্রহ্মই নিজকে নিজে দেশ ও কালের মাধ্যমে মূর্ত করিতেছেন।

দেহাত্মবোধ

শ্রীকল্যান চন্দ্র গুপ্ত

জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, দেহই আত্মা, প্রত্যেক ব্যক্তি 'আমি' বলিয়া যাহাকে নির্দেশ করিয়া থাকে তাহা তাহার দেহ ভিন্ন আর কিছুই নয়। দেহ ভিন্ন অন্য কোনও আত্মার অস্তিত্ব যে নাই ইহা দেহাত্মবাদীরা নানাভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, যথা—কোনও দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনও আত্মার অর্থাৎ অহং-বোধের সহিত কাহারও পরিচয় নাই, সেখানেই স্নায়ুমণ্ডলী এবং মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মনুষ্যদেহ আছে কেবলমাত্র সেখানেই অহং-বোধ সমন্বিত চৈতন্যের অস্তিত্ব। অবশ্য, যেখানেই মনুষ্যদেহ আছে সেখানেই অহং-বোধ সমন্বিত চৈতন্য আছে ইহা সত্য নয়—মৃত মনুষ্যদেহ নিজেকে আমি বলিয়া অনুভব করে না—কিন্তু এইরূপ চৈতন্য থাকিতে হইলে দেহের কতকগুলি ক্রিয়া যথাযথভাবে ঘটিতে থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ অহং-বোধ সমন্বিত চৈতন্য দেহেরই গুণ বটে কিন্তু দেহের কেবলমাত্র এক বিশেষ অবস্থায় এই গুণের স্ফুরণ হইয়া থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় যখন দেহের অধিকাংশ ক্রিয়াই স্তব্ধ হইয়া থাকে তখন অহং-বোধ কিছুক্ষণের জন্য লুপ্ত হইয়া যায় এবং মস্তিষ্কের স্থল-বিশেষে গুরু আঘাত লাগিলে উহা চিরকালের জন্যই লুপ্ত হইয়া যায়। আবার, যে দেহে এই অহং-বোধের আবির্ভাব হয় তাহার উৎপত্তির পূর্বেও যে সেই অহং-বোধের অস্তিত্ব ছিল তাহার কোনও প্রমাণ নাই। মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রূণের অহং-বোধ নাই এবং নব-জাত শিশুর হাস্য, ক্রন্দন ও অন্যান্য সহজাত কর্মপ্রবৃত্তিসমূহ যে পূর্ব-পুরুষদের দেহ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা সংক্রমিত তাহা বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে। আত্মা যে দেহই তাহা এই যুক্তি গুলি প্রমাণ করিলেও ইহার সপক্ষে প্রবলতম যুক্তি হইতেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ দেহকে আত্মা অর্থাৎ 'আমি' বলিয়া সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিয়া থাকে। আত্মা ও দেহ যে একই ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অন্য কোনও যুক্তি না থাকিলেও কেবলমাত্র দেহাত্মবোধের ভিত্তিতেই দেহ এবং আত্মা যে এক ইহা প্রমাণিত হয় এইরূপ বলা যাইতে পারে। দেহ ও আত্মার অভিন্নতা সাক্ষাৎ অনুভবসিদ্ধ হইলে সেই অনুভবের মাধ্যমে যাহা ব্যক্ত হইতেছে তাহাকে অস্বীকার করা অসম্ভব।

দেহাত্মবাদের সপক্ষে দেহাত্ম-বোধ যে সাক্ষ্য দিয়া থাকে তাহা কতদূর নির্ভরযোগ্য অথবা আদৌ নির্ভরযোগ্য কি না তাহাই এক্ষণে আমাদের বিচার্য। জড়বাদীরা অবশ্যই বলিবেন যে আত্মা ও দেহের অভিন্নতার অনুভব সত্যই হইয়া থাকে এবং এই অনুভব যথার্থ অনুভব, অর্থাৎ আত্মা ও দেহ বাস্তবিকই অভিন্ন। এই অনুভব যখন হইতেছে তখন ইহার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ অমূলক এবং অপ্রাসঙ্গিক। এই অনুভবের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করাও নিরর্থক, কারণ অনুভবের যাথার্থ্যকে স্বীকার করিয়াই সকল প্রকার যুক্তি, তর্ক, ব্যবহার ইত্যাদি হইয়া থাকে। কোনও যুক্তিই এই অনুভবের বিরুদ্ধে টিকিতে পারে না। অধ্যাত্মবাদীরা কিন্তু দেহাত্মবাদীদের এই মত গ্রহণ করিতে মোটেই সম্মত নহেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমরা যে দেহকে আত্মারূপে অনুভব করিয়া থাকি ইহা স্বীকার করিয়াও বলিয়া থাকেন যে এই অনুভব অযথার্থ, আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আরও অগ্রসর হইয়া বলিয়া থাকেন যে এইরূপ অনুভব হয় না এবং হওয়া সম্ভবপরও নহে, অর্থাৎ তাঁহারা এইরূপ অনুভবের যে কেবল যাথার্থ্যই অস্বীকার করেন তাহা নহে, উহার সম্ভাব্যতাই অস্বীকার করেন।

যাঁহাদের মতে দেহ ও আত্মার অভিন্নতা অনুভব করাই অসম্ভব তাঁহাদের বক্তব্য লইয়াই আলোচনা আরম্ভ করা যাক্। যাঁহারা এইরূপ মত পোষণ করেন তাঁহাদিগকে পূর্বপক্ষরূপে স্থাপন করিয়া আচার্য শঙ্কর তাঁহার শারীরক ভাষ্য আরম্ভ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ আত্মাই একমাত্র সত্য এবং তাহা ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা। আত্মা ও অনাত্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং কখনই এক হইতে পারে না, কিন্তু তাহা হইলেও আমরা আত্মা ও দেহরূপী অনাত্মাকে এক বলিয়া অনুভব করি এবং এইরূপ অনুভব করি বলিয়াই 'আমি স্থূল' আমি কৃশ' এইরূপ বলিয়া থাকি। ইহা কিন্তু ভ্রমমাত্র। আত্মা ও অনাত্মা (দেহ) একান্ত বিভিন্ন হইলেও তাহাদিগকে এক বলিয়া অনুভব করা অজ্ঞানের ফল। ইহাই অধ্যাস। আমরা অনাত্মাতে আত্মাকে এবং আত্মায় অনাত্মাকে অধ্যস্ত করিয়া থাকি। দেহ, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আমি বা আমার বলিয়া যে লোক প্রসিদ্ধ জ্ঞান তাহাই অধ্যাস। এই অধ্যাস আছে বলিয়াই আমরা নিজেকে সংসারী জীব মনে করিয়া নানারূপ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকি। আমি দেহ, অন্তঃকরণ বা ইন্দ্রিয় নহি, কিন্তু অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই আমি এই জ্ঞানের উদয় হইলে এই অধ্যাসের নিবৃত্তি হয় এবং অধ্যাসের নিবৃত্তি হইলে সকল দুঃখের অবসান হইয়া থাকে। এই মত গ্রহণ করিবার পূর্বে অদ্বৈতবাদীদিগকে যে আপত্তির উত্তর দিতে হইবে তাহা এই—

বিষয়ী এবং বিষয় আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাব হওয়ায় 'তোমরা এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য যে বিষয় (অনাত্ম জড়বস্তু) এবং আমরা এই শব্দজন্য জ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য যে বিষয়ী (প্রত্যগাত্মরূপ চিদ্‌বস্তু) তাহারা কখনও অভিন্ন হইতে পারে না এবং তাহাদের ধর্মসকলও কখনও অভিন্ন হইতে পারে না। সেই হেতু চিদাত্মরূপ বিষয়ীতে বিষয় পদার্থের (দেহ প্রভৃতির) এবং তাহার ধর্মসকলের যে অধ্যাস এবং তাহার বিপরীত ক্রমে বিষয়ীর ও তাহার ধর্মসকলের বিষয়ে (দেহাদি অনাদিবস্তুতে) যে অধ্যাস তাহা মিথ্যা হওয়াই উচিত (অর্থাৎ এইরূপ অধ্যাসের কোনও সম্ভাব্যতা নাই)১। অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস এবং আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস হইয়া থাকে ইহার অর্থ এই যে আমরা অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকি এবং এই ভ্রম কোনও সদোষ যুক্তি হইতে উৎপন্ন হয় না, ইহার মূলে আছে অনুভব। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে এইরূপ ভ্রম আদৌ হইতে পারে কি না। আমরা যে বহুস্থলে এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকি এমন কি অনুভবও করিয়া থাকি তাহা আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম প্রভৃতি এই প্রকার ভ্রমের প্রসিদ্ধ উদাহরণ। এই সকল স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে রজ্জু এবং সর্প শুক্তি এবং রজত এই বস্তুগুলি সকলেই আমাদের বিষয় জগতের অন্তর্গত এবং রজ্জু ও সর্প এবং শুক্তি ও রজতের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য রহিয়াছে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে একটিকে অপরটি বলিয়া ভ্রম করা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু আত্মা এবং দেহরূপী অনাত্মা সম্বন্ধে ইহা বলিতে পারা যায় না। আত্মা শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ, দেহ অচেতন জড়বস্তু, জ্ঞাতা বিষয়ী, দেহ বিষয়। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আত্মাকে আমি বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে কিন্তু অনাত্মাকে তুমি (উহা বা ইহা) বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে। সুতরাং আত্মা এবং দেহ যে কেবল পরস্পর বিসদৃশ ইহা নহে, আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় তাহারা পরস্পরবিরোধী। সুতরাং অন্ধকারকে আলোক বলিয়া অথবা আলোককে অন্ধকার বলিয়া ভ্রম করা যেমন কাহারও পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব সেইরূপ দেহকে আত্মা বলিয়া অথবা আত্মাকে দেহ বলিয়া ভ্রম করা সেরূইপ অসম্ভব, এমন কি অধিকতর

১। যুষ্মদস্মৎ প্রত্যয়গোচরয়োঃ বিষয় বিষয়িণোঃ তমঃ প্রকাশবদ্ বিরুদ্ধস্বভাবয়োঃ ইতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্মাণাম্ অপি সুতরাং ইতরেতরভাবানুপপত্তিঃ। ইত্যতঃ অস্মৎ প্রত্যয়গোচরে বিষয়িনি চিদাত্মকে যুষ্মৎপ্রত্যয়গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ ধর্মানাং চ অধ্যাসঃ তদ্‌বিপর্যয়েন বিষয়িনঃ তদ্ধর্মানাং চ বিষয়ে অধ্যাসঃ মিথ্যা ভবিতুং যুক্তম্। —শারীরক ভাষ্য

অসম্ভব। কারণ অন্ধকার এবং আলোক বিরুদ্ধধর্মী হইলেও উভয়েই জ্ঞানের বিষয়, কিন্তু দেহ বিষয় হইলেও আত্মা বিষয়ী এবং বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে যে আত্যন্তিক প্রভেদ তাহা আর কোনও পদার্থদ্বয়ের মধ্যে থাকিতে পারে না। সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তীরা আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে অধ্যাস হইয়া থাকে ইহা স্বীকার করিয়া এইরূপ ভ্রম হইতে মুক্তি পাইবার উপায় হিসাবে যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপকারিতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহার কোনও প্রয়োজন দেখিতে পাওয়া যায় না।

অধ্যাসের অসম্ভাব্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পূর্বপক্ষিগণ যে যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন তাহার সম্বন্ধে অদ্বৈতবেদান্তিগণের বক্তব্য এই যে, এই যুক্তিদ্বারা অদ্বৈতবেদান্তসম্মত যে সিদ্ধান্ত তাহার কোনও হানি হয় না। আত্মা ও অনাত্মার ক্ষেত্রে পরস্পরের অধ্যাস যে তত্ত্বত যুক্তিসিদ্ধ নহে ইহা বেদান্তিগণের স্বীকার করিতে কোনও আপত্তি নাই। অধ্যাস মায়া বা অবিদ্যাপ্রসূত, সুতরাং ইহা মায়িক-অনির্বচনীয়। যাহা যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হয় না অথচ অনুভবসিদ্ধ বলিয়া যাহা অস্বীকার করা যায় না তাহাই অনির্বচনীয়। অন্তঃকরণ, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি জড়বস্তুতে শুদ্ধচৈতন্যরূপ আত্মার অভেদবুদ্ধিরূপ যে অধ্যাস তাহার সম্ভাব্যতা যুক্তিসিদ্ধ না হইলেও এইরূপ অধ্যাস যে সকলেরই অনুভবসিদ্ধ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ১। লোকব্যবহারে দেখা যায় যে প্রত্যেক ব্যক্তিই 'আমি দেহ' এইরূপ বুঝিয়া থাকে ও বলিয়া থাকে। আবার 'আমি দেহ' ইহার ন্যায় 'আমার দেহ' এইপ্রকার জ্ঞান ও ব্যবহারও সর্বদাই হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ ভ্রম হইতে মুক্তি পাইতে হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব অনুশীলন করিবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেহ কেহ বলিতেছেন বিচার করিলে বুঝা যায় যে দেহ ও আত্মার পরস্পরের অধ্যাস যুক্তি বিরুদ্ধ, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে কেহ আপনাকে নিজদেহের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিতে পারে না, আর অদ্বৈতবেদান্তী এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া লইয়াই বলিতেছেন যে সাধারণতঃ প্রত্যেকেই আপন আত্মাকে দেহের সহিত অভিন্ন বলিয়াই অনুভব করে, অর্থাৎ 'দেহটাই আমি' এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে। অনুভবের সহিত যুক্তির যেখানে এরূপ বিরোধ সেখানে আমরা চরম মীমাংসা কি করিব ইহা এক কঠিন সমস্যা।

১। তথাপি অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যাত্মকতাম্ অন্যোন্যধর্মাংশ্চ অধ্যস্য ইতরেতরাবিবেকেন অত্যন্ত বিবিক্তয়োঃ ধর্মধর্মিণোঃ মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য, "অহম্ ইদম্" "মম ইদম্" ইতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ। —শারীরক ভাষ্য

অদ্বৈতবেদান্তীর মতে অবশ্য এখানে কোনও প্রকৃত সমস্যা নাই। তিনি বলিতে চাহেন যে আত্মা ও অনাত্মায় পরস্পরের অধ্যাস হইতে পারে না ইহা যুক্তিসিদ্ধ হইলেও অজ্ঞানের বশীভূত হইয়াই আমরা এইরূপ অধ্যাস করিয়া থাকি। অজ্ঞানবশতঃ আমরা কতই না ভ্রম করিয়া থাকি, দেহাত্মবোধ ও এইরূপ একটা ভ্রম। অজ্ঞান দূর হইলেই এই ভ্রম ও আর থাকিবে না। অদ্বৈতবাদী যখন এই কথা বলেন তখন তিনি পূর্বপক্ষীর বক্তব্যের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়াই মনে হয়। পূর্বপক্ষী যাহা বলিতেছেন তাহার যথার্থ মর্ম এই যে কাহারও পক্ষে ভুলকরিয়াও দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করিবার সম্ভাবনা নাই। অজ্ঞানবশতঃ অনেকে বহুরূপ ভ্রম করিয়া থাকে ইহা সত্য বটে, কিন্তু এমন কতকগুলি ভ্রমেরও কল্পনা করা যায় যাহা মূর্খ বা জ্ঞানহীনের পক্ষেও করা অসম্ভব। কোনও মূর্খ বা জ্ঞানহীন ব্যক্তি ভুল করিয়াও আমি নাই এরূপ মনে করিতে পারে না। আত্মা ও দেহরূপী অনাত্মার অভিন্নতার যে ভ্রমাত্মক অনুভবের কথা বলা হয় তাহা এই শ্রেণীর ভ্রম, অর্থাৎ কোনওরূপ অজ্ঞান বা মোহেরই বশীভূত হইয়া এরূপ ভ্রম করা সম্ভব নয়, এবং প্রকৃতপক্ষে কেহই এইরূপ ভ্রম করে না। সুতরাং অদ্বৈত-বেদান্তী এইরূপ ভ্রমকে অনির্বচনীয় বলিয়া নিস্তার পাইবেন না। সুতরাং দেহাত্মবোধের সহিত যুক্তির বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার যথার্থ সমাধান অন্য পথে খুঁজিতে হইবে।

অনুভবের সহিত যুক্তির বিরোধ প্রায়ই ঘটিতে দেখা যায়। এইরূপ বিরোধের কতকগুলি দৃষ্টান্তের সহিত আমরা অতি পরিচিত। সূর্য ও চন্দ্রের যে আকার আমরা নিঃসন্দেহে দেখিয়া থাকি বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত তাহার বিরোধী। জলের মধ্যে হেলায়িত অবস্থায় অর্ধনিমগ্ন যষ্টিকে বক্রাকার রূপে দেখি, কিন্তু উহার কাছে গিয়া উহাকে স্পর্শ করিয়া এবং জল হইতে তুলিয়া উহাকে দেখিয়া যুক্তিদ্বারা উহার আকার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করি তাহার সহিত পূর্বোক্ত অনুভবের বিরোধ আছে। এই সকল ক্ষেত্রে আমরা কি করিয়া থাকি অথবা কি করা উচিত? আমরা সাক্ষাৎ অনুভব এবং উহার বিরোধী যুক্তি এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রবলতর ইহা স্থির করিবার চেষ্টা করিয়া থাকি এবং তাহার ফলে অনুভবের সাক্ষ্য এবং যুক্তিদ্বারা নির্নীত তত্ত্বের একটিকে বর্জন করিয়া অপরটিকে গ্রহণ করিয়া থাকি, অথবা উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যস্থাপন করিয়া একটি উচ্চতর তত্ত্বে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকি এবং ইহাই করা উচিত। কারণ, আমাদের অনুভব এবং বিচারবুদ্ধিদ্বারা সমর্থিত যুক্তি এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা গেলে তাহাদের দুইটিই যথার্থ হইতে পারে না, অর্থাৎ

ইহাদের মধ্যে চূড়ান্তভাবে বিরোধ থাকিতে পারে না এই নিয়মকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়াই আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। অনুভব বিশেষের সহিত কোনও যুক্তির বিরোধ উপস্থিত হইলে চারটি বিকল্প সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। এই সম্ভাবনাগুলির আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ যে যুক্তির সহিত কোনও অনুভবের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তাহা যদি নির্দোষ এবং যথেষ্ট প্রবল হয় তাহা হইলে তাহার বিরোধী বলিয়াই সেই অনুভবের আবেদন যে গ্রহণযোগ্য নয় তাহা প্রতিভাত হইতে পারে। অনুভবের আবেদন প্রত্যাখান করার দুইটি অর্থ হইতে পারে, একটি হইতেছে কোন বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে ঐ অনুভব যে সাক্ষ্য দিতেছে তাহা প্রত্যাখ্যান করা এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে এইরূপ অনুভব যে আদৌ ঘটিয়াছে তাহা অস্বীকার করা। জলমধ্যে হেলায়িত অবস্থায় অর্ধনিমজ্জিত সরলাকার যষ্টিকে যখন আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বক্রাকার বলিয়া ঘোষণা করে তখন প্রবল যুক্তির সংস্পর্শে আসিলে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের সেই ঘোষণা মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। আবার দূর হইতে কোনও রঙ্গিন বস্তুবিশেষকে দেখিয়া যখন বলি একটা ফুল দেখিলাম তখন বিরোধী যুক্তির তাড়নায় হয়ত বলিতে বাধ্য হইতে পারি যে আমি ফুল দেখি নাই, একটা বিশেষ রংএর বস্তু দেখিয়াছিলাম মাত্র। যাহাকে ফুল বলিয়া বুঝি এমন কোনও বস্তুর অনুভবই আমার হয় নাই। পূর্ব্বের দৃষ্টান্তে বক্রাকার যষ্টির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ যে হইয়া থাকে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আমরা যতই সতর্কতার সহিত দেখি না কেন সেই বক্রাকার যষ্টি আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় থাকিযাহ যাইবে, কেবলমাত্র সেই আকারটি যষ্টির প্রকৃত আকার কিনা সেই সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে বিরোধী যুক্তির সম্মুখীন হইবার পর সেই ফুলটি যে আমার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের (অনুভবের) বিষয় হইয়াছিল বা হইয়া থাকে সেই বিশ্বাসটিকেই আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই। প্রবল যুক্তির সম্মুখে অনুভবের এই যে দুর্বলতা ইহার প্রধান কারণ এই যে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা শুদ্ধ অমিশ্র অনুভব অতি অল্পস্থলেই পাইয়া থাকি, অধিকাংশ স্থলেই আমাদের অনুভবের সহিত অবধারণ, অনুমান প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া থাকে। বর্তমান কালে যাহা আছে বা ঘটিতেছে এরূপ কোনও বস্তু বা ঘটনাবিশেষের সহিত মনের সাক্ষাৎ সংস্পর্শের ফলে যে জ্ঞানের উদয় হয় তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে অনুভব বা সাক্ষাৎজ্ঞান বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোনও বস্তু বা ঘটনার এইভাবে অনুভব হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেই বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে কিছু অবধারণ করিয়া ফেলি এইভাবে অনুভব হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেই বস্তু বা ঘটনা

অথবা যুক্তি দ্বারা কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই। অনুভব ও অন্যান্য মানসক্রিয়ার মধ্যে সীমারেখা প্রায়ই লুপ্ত হইয়া গেলেও সতর্ক বিশ্লেষণের ফলে উহা প্রকট হইতে পারে, এবং তখন আমাদের জ্ঞানের কোন অংশ বিশুদ্ধ অনুভব এবং কোন অংশ অবধারণ অথবা অনুমান তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এইক্ষণে আমার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত কেবলমাত্র তাহাই যখন আমার জ্ঞানে ভাসমনে হয় তখন যেই জ্ঞানে ভ্রমের কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন আমি সাক্ষাৎভাবে অনুভূত সেই বিষয় অতিক্রম করিয়া অন্য কোনও বিষয়কে অবধারণ ক্রিয়া দ্বারা তাহার সহিত সংযুক্ত করি অথবা যুক্তি বা অনুমান দ্বারা তাহার সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত করি তখনই ভ্রমের সম্ভবনা আসিয়া পড়ে এবং এইভাবে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তই অন্য অনুমান বা যুক্তির বিরোধী হইতে পারে। এবং এই অনুমান বা যুক্তি প্রবল হইলে ঐরূপ সিদ্ধান্তযুক্ত অনুভব ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে। সম্মুখে উপস্থিত রজ্জুখণ্ডকে দেখিয়া যখন উহাকে সর্প বলিয়া বুঝি এবং ভয়ে পলায়ন করি তখন আমার সর্প জ্ঞানের একটি অংশ বিশুদ্ধ অনুভব এবং অপর একটি অংশ অনুমানলব্ধ সিদ্ধান্ত। একটি দীর্ঘ ঈষৎ পীতাভ বস্তুরূপে রজ্জুর জ্ঞান বিশুদ্ধ অনুভব (অবশ্য এই জ্ঞানে 'বস্তু' 'পীতাভ' প্রভৃতি ধারণা বর্তমান থাকে না, কিন্তু ইহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে এইগুলি আসিয়া পড়ে), আর 'এই বস্তুটি দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে দংশন করিবে' এই জ্ঞানটি অনুমানলব্ধ সিদ্ধান্ত। অন্যান্য অনুমান বা যুক্তির সহিত সর্পজ্ঞানের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে বলিলে বুঝিতে হইবে যে এই সিদ্ধান্ত-যুক্ত অনুভবের সহিতই বিরোধ ঘটিয়াছে। এইরূপ স্থলে বিরোধী যুক্তি যদি যথেষ্ট প্রবল থাকে তাহা হইলে অনুভবের যাথার্থ্য আমরা অস্বীকার করিতে পারি।

দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি এইরূপ। যে অনুভবের সহিত যুক্তির বিরোধ ঘটিতেছে সেই অনুভব এত দৃঢ় ও সন্দেহাতীত হইতে পারে যে কোনও যুক্তিই তাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না, এমন কি যে কোনও বিরোধী যুক্তিই যে ভ্রমপূর্ণ হইবে তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা না করিয়াই বলিতে পারা যায়। "আমি আছি" "আমি জানিতেছি" এই প্রকারের অনুভব ('আমি'র অর্থ যাহাই হউক না কেন)। ইহাদের বিরোধী কোন যুক্তি কেহ উপস্থাপিত করিলে ইহাদের বিরোধী বলিয়াই সেইগুলিকে আমরা বর্জন করিতে পারি। আমাদের যাবতীয় যুক্তি ও অনুমান এইজাতীয় কতকগুলি অনুভবের অপেক্ষা রাখে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। যে সকল যুক্তি বা অনুমান কোনও স্বয়ং-সিদ্ধ অনুভবের অপেক্ষা রাখেনা তাহারা নিরাশ্রয় কল্পনা বিলাস মাত্র, তাহারা কোনও

সত্যতার দাবী করিতে পারে না। কিন্তু কোন কোন অনুভবের নিঃসন্দিগ্ধতার দাবী গ্রহণযোগ্য তাহা নির্ণয় করাও সকল ক্ষেত্রে সহজ নহে।

তৃতীয়তঃ কোনও অনুভব এবং তাহার বিরোধী যুক্তি তুল্যবল হইতে পারে। অর্থাৎ ইহাও সম্ভবপর যে কোনও একটি জ্ঞান বিশুদ্ধ অনুভবমূলক এবং সেই জন্য অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছে, কিন্তু ইহার বিরোধী যুক্তির ভিতরেও কোনও দোষের সন্ধান মিলিতেছে না। এই অবস্থায় আমরা কোনও সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারি না, আমাদের বিচারবুদ্ধি নিশ্চল হইয়া পড়ে। গতির অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রীক দার্শনিক জেনো (Zeno) যে সকল যুক্তি দিয়াছিলেন সেগুলিকে এখনও অনেকে অখণ্ডনীয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমরা যে প্রতিমুহূর্তেই বহু বস্তুকে চলিতে দেখিতেছি তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। আবার আমরা যখন কোনও কাজ করি তখনই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি আছে বলিয়া আমরা স্পষ্ট অনুভব করি, কিন্তু যে সকল যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয় যে আমাদের প্রত্যেক কার্য এমন কি প্রত্যেক ইচ্ছাই পর নিয়ন্ত্রিত সেগুলিকেও নির্ভুল বলিয়া মনে হয়। এই সকল ক্ষেত্রে অনুভবের সাক্ষ্য এবং তাহার বিরোধী যুক্তি ইহাদের কোন্‌টিকে স্বীকার করিব তাহা নির্ণয় করা আমাদের শক্তির বহির্ভূত বলিয়াই মনে হয়।

চতুর্থতঃ যখন কোনও অনুভবের সহিত কোনও যুক্তির বিরোধ উপস্থিত হয় এবং যদি সেই অনুভবটি যে ঘটিয়াছে এসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ না থাকে অথচ তাহার বিরোধী যুক্তিকেও নির্দোষ বলিয়া মনে হয়, তখন আমরা এমন একটি উচ্চতর সুসমঞ্জস সিদ্ধান্তে পৌঁছাইবার চেষ্টা করিতে পারি যাহাতে এইঅনুভবের সাক্ষ্যের মর্য্যাদা এবং ঐ যুক্তির সারবত্তা দুইটি রক্ষিত হইবে এবং তাহাদের বিরোধেরও একটা সুসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। পরমতত্ত্বে ঐকান্তিক বিরোধের কোনও স্থান নাই এই বিশ্বাস আমাদের না থাকিলে আমাদের চিন্তা পদ্ধতি পঙ্গু হইয়া পড়িবে এইরূপ যাঁহদের ধারণা তাঁহারা এই পথেই এইরূপ সমস্যার সমাধান করিতে চাহিবেন।

এখন দেখিতে হইবে যে দেহাত্মবোধের ব্যাপারে আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হইতেছি তাহার সমাধান কি ভাবে হইতে পারে। প্রথমেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে এই সমস্যা সমাধানের যে একটি সহজ উপায় ছিল শঙ্কর তাহা গ্রহণ করেন নাই। আমাদের দেহই যে আত্মা এই রূপ যে আমরা অনুভব করি, 'আমি স্থূল' 'আমি কৃশ' এই ধরণের কথায় যাহার স্বীকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, ইহা যদি অবিসংবাদিত সত্য

হয়, তাহা হইলে সেই অনুভবের সাক্ষ্য মানিয়া লইয়া আমরাও সহজেই বলিতে পারি যে দেহ ও আত্মা প্রকৃত পক্ষে একই বস্তু এবং যে যুক্তি বলিতেছে যে কেহই ভ্রম করিয়াও নিজেকে দেহের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারে না সেই যুক্তিই অসিদ্ধ। আত্মা ও দেহের ঐক্য যদি অনুভব করাই যায় তাহা হইলে তাহারা আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় একান্ত বিরুদ্ধস্বভাব হইতে পারে না, তাহাদের পার্থক্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে কোনও না কোনও রূপ সাদৃশ্য অথবা একাত্মতা থাকিবেই। সুতরাং ইহারা একান্তই বিরুদ্ধস্বভাব ইহা অঙ্গীকার করিয়াই যে যুক্তি অগ্রসর হয় তাহাকে আমরা অনায়াসেই অসার মনে করিয়া গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি। শঙ্কর কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, কারণ সম্ভবতঃ তিনি মনে করেন যে ইহা গ্রহণ করিলে দেহাত্মবাদী হইতে হয় এবং চার্বাক্‌সম্মত জড়বাদকে সমর্থন করিতে হয়। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শঙ্কর আত্মা ও দেহের পার্থক্য ঐকান্তিক নয় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলেও ইহার সপক্ষেও যে কিছু বলিবার আছে ইহা একবারে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। "অবিষয় প্রত্যগাত্মাতে দেহেন্দ্রিয়াদি অনাত্মবস্তু রূপ বিষয় ও তাহার ধর্মসকলের অধ্যাস কি প্রকারে হয়?"—পূর্বপক্ষীর এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন যে এই প্রত্যগাত্মা একবারে অবিষয় হন না[১] "আমি" এই শব্দ জন্য জ্ঞানের বিষয় হন[২]। অর্থ. আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য বা ঐক্যভাব না থাকিলে এককে অন্য বলিয়া ভ্রম করা সম্ভব নয়। এই ইঙ্গিতকে বিশদ করিয়া বলা যাইতে পারিত যে আত্মা ও দেহের মধ্যে যে বিভেদ আছে বলিয়া মনে হয় তাহা প্রকৃত পক্ষে ঐকান্তিক নয়, প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি একই তত্ত্বের দুই বিভিন্ন প্রকার মাত্র।[৩] কিন্তু শঙ্কর তাহা বলেন নাই। কিন্তু তিনি পূর্বপক্ষীর যে আপত্তি তাহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন ইহা আমরা বলিতে পারি না।

শঙ্কর প্রভৃতি বহু দার্শনিকই বলিয়াছেন যে আমরা দেহকে আত্মা বলিয়া অনুভব করি এবং আমাদের বচনভঙ্গী হইতেই এই উক্তির সত্যতা স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু ইহা বলিবার পূর্বে আমরা কোন দেহের সহিত আমাদের অভেদ অনুভব করিতেছি তাহা বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। আমার দেহের অস্তিত্ব আমি দুইভাবে অনুভব করিয়া থাকি—বাহির হইতে এবং ভিতর হইতে। আমার দেহকে আমি

১। 'ন তাবদয়মেকান্তেন অবিষয়।"— শারীরক-ভাষ্য

২। 'অস্মৎ প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ"—ঐ

৩। যেমন স্পিনোজা বলিয়াছিলেন।

বাহির হইতে দর্শন, স্পর্শ ইত্যাদি করিয়া থাকি। এইভাবে যখন আমি আমার দেহকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি তখন আমার দেহ সাধারণ ভাবে আমার জ্ঞানের বিষয় মাত্র। অন্য পাঁচজনের দেহ এমন কি বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি জড়বস্তু ও যেভাবে আমার প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে আমার নিজের দেহও ঠিক এইভাবেই আমার জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ যে আমার ইন্দ্রিয়গুলি হইতে আমার নিজ দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলির দূরত্ব একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে না, কিন্তু অন্যান্য বস্তুর দূরত্বের কোনও সীমা নিদিষ্ট নাই। এইভাবে যখন আমার বহিরিন্দ্রিয়গুলির সহিত আমার দেহের সংস্পর্শ হইয়া থাকে তখন ঐ দেহের বহির্ভাগের অংশমাত্র আমার জ্ঞানগোচর হয়। ইহার আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া বা শক্তি আমার প্রত্যক্ষগোচর হয় না। অস্ত্রোপচারের ফলে দেহের ভিতরের কোনও অংশ উন্মুক্ত হইলে অথবা অদৃশ্য রশ্মির সাহায্যে দেহের ভিতরের যাহা কিছু দেখা যায় তাহাও প্রকৃতপক্ষে দেহের বহির্ভাগ মাত্র, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা দেহের সজীবতা ও তাহার সক্রিয় প্রাণশক্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, একটি বৃক্ষ বা প্রস্তর-খণ্ডের সহিত আমি যেমন আমার অভেদ উপলব্ধি করিতে পারি না, ঠিক্ তেমনই আমার দেহের কোনও অংগের যে রূপ আমার কোনও বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে তাহার সহিত আমি আমার অভেদ উপলব্ধি করি না বা করিতে পারি না। আমার দেহের যে সকল অংশকে কখনও ভিতর হইতে অনুভব করিতে পারি না—যেমন কেশ, নখ ইত্যাদি—তাহাদের সহিত আমি কখনও আমার অভেদ অনুভব করিতে পারি না। আমার কেশ বা নখের প্রতি আমার মমত্ববোধই থাকিতে পারে, কিন্তু "আমার কেশ আমি' 'আমার নখ আমি' ইত্যাকার অনুভব হয় না। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যে দেহকে আমি ভিতর হইতে অনুভব করিয়া থাকি কেবলমাত্র তাহাকেই 'আমি' বলিয়া অনুভব করিতে পারি। আমার দেহের সহিত আমার যে সম্বন্ধ তাহা কেবলমাত্র আমার বহিরিন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে স্থাপিত হয় না। যে সকল স্নায়ু আমার দেহের বিভিন্ন অংশের সহিত আমার মস্তিষ্কের যোগসাধন করিতেছে সেইগুলি প্রতিমুহূর্তেই মস্তিষ্কের কেন্দ্র সমূহে ক্রিয়া করিয়া নানা রূপ সংবেদন উৎপন্ন করিতেছে। এই সংবেদনসমূহই আমার দেহাত্মবোধের মূল ভিত্তি। অর্থাৎ এই সংবেদনপুঞ্জ আছে বলিয়াই আমার 'আমি দেহ' 'আমার দেহ' ইত্যাকার অনুভব হইয়া থাকে যেগুলি পূর্বোক্ত সংবেদনপুঞ্জের সহিত যুক্ত হইয়া অহং ভাবকে পুষ্ট করিয়া থাকে।

আমাদের দেহাত্ম বোধকে এইভাবে বিশ্লেষণ করিয়া আমরা এখন বলিতে পারি যে, স্বদেহকে বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় মাত্র বলিয়া বিবেচনা করিলে বিষয়ী বা জ্ঞাতা আমি তাহার সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া কখনও মনে করি না। কোনও বৃক্ষ বা প্রস্তর খণ্ডের সহিত কেহ নিজেকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করে না। যে বস্তু বা ব্যক্তি কাহারও অত্যন্ত প্রিয়, যেমন নিজ গৃহ অথবা পুত্র, তাহার সহিতও কেহ নিজেকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করে না। আমার গৃহ বা পুত্রের কোনও ক্ষতি হইলে আমার মনে দুঃখ উৎপন্ন হয়, কিন্তু এই দুঃখের কারণ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হইতে ভিন্ন, অন্য কোনও প্রকারের সম্বন্ধ। আমি যদি আমার গৃহ বা পুত্রের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিতাম তাহা হইলে আমার দৃষ্টির বাহিরে থাকার সময়ে সেই গৃহ বা পুত্রের কোনও ক্ষতি হইলেও তাহা আমার অনুভবগোচর হইত। কিন্তু তাহা হয় না। অপরপক্ষে আমার দেহের কোনও অঙ্গ আমার দৃষ্টি বা স্পর্শের বাহিরে থাকিবার কালেও যদি তাহাতে কোনও ক্ষতি হয় তাহা হইলে উহা আমার অনুভব গোচর হইয়া থাকে। আবার সেই অঙ্গ যে সকল স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কের সহিত যুক্ত হইতেছে সেই সকল স্নায়ু নিষ্ক্রিয় হইলে এই অঙ্গে কোনও ক্ষতি হইলেও তাহা আমার অনুভবগোচর হয় না। সুতরাং বিষয়ী আত্মা এবং বিষয় দেহ পরস্পর আলোক এবং অন্ধকারের মত বিরুদ্ধ স্বভাব বলিয়া তাহাদের একাত্মবোধ যে উৎপন্ন হয় না এই যে যুক্তি, সেই যুক্তির সহিত প্রকৃত অনুভবের কোনও বিরোধ নাই। আমি দেহরূপ বিষয়ের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া অনুভব করিতে পারি না এবং প্রকৃত পক্ষে করিও না। ঠিক্ কোন্ বস্তুর সহিত আত্মার তাদাত্ম্যবোধের কথা হইতেছে তাহা বুঝিতে পারিলে কোনও রূপ ভ্রমের সম্ভাবনা নাই।

এইবার দেহাভ্যন্তর হইতে উদ্ভূত সংবেদনপুঞ্জের কথা বিবেচনা করা যাক্। দেহাত্মবোধ বলিতে প্রকৃতপক্ষে এই সংবেদন পুঞ্জের সহিত আত্মার অভেদ বোধই বুঝা উচিত। এই অভেদ বোধ যে বাস্তবিকই ঘটিয়া থাকে তাহা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। বিষয়ী আত্মা এবং এই সংবেদনপুঞ্জ আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ স্বভাব নয়। সুতরাং এই দুইয়ের অভেদ বোধ যে অসম্ভব তাহা বলা চলে না। আত্মা যেমন বিষয়ী হইয়াও বিষয় (একান্তভাবে অবিষয় নয়), এই সংবেদনপুঞ্জ চৈতন্যময় হওয়াতে বিষয় হইয়াও বিষয়ী। বিষয়ী-বিষয় হওয়াই যদি আত্মার স্বভাব হয় এবং বিষয়-বিষয়ী হওয়াই যদি ঐ সংবেদনপুঞ্জের স্বভাব হয় তাহা হইলে আত্মা যে একটি বিশেষ সংবেদনপুঞ্জের সহিত নিজেকে এক বলিয়া অনুভব করিবে তাহাতে অসম্ভাব্যতা

কিছুই নাই। সুতরাং দেহে আত্মার অধ্যাস হইতে পারে না এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে পূর্বপক্ষী যে সাধারণ নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার যৌক্তিকতা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াও আমরা বলিতে পারি যে আত্মা ও দেহের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নহে। এস্থলে যুক্তি ও অনুভবের মধ্যে বাস্তবিক কোনও বিরোধ নাই। অদ্বৈত বেদান্তী অবশ্য বলিবেন যে প্রকৃতপক্ষে আত্মা বিষয়ী এবং বিষয় উভয়ই হইতে পারে না, এবং ঠিক্ সেইরূপ সংবেদনপুঞ্জও বিষয় এবং বিষয়ী উভয়ই হইতে পারে না. কারণ, একই বস্তু জ্ঞানক্রিয়ার কর্তাও হইবে এবং কর্মও হইবে ইহা কখনই সম্ভবপর হয় না। (কর্তৃ-কর্ম-বিরোধ)। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে জ্ঞাতা যদি জ্ঞানের বিষয় না হয় তাহা হইলে জ্ঞাতা আছে ইহা জানা গেল কিরূপে? আত্মা স্বয়ং প্রকাশ এই বলিয়া এই প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ জ্ঞাতা (শুদ্ধচৈতন্য) প্রকাশিত হইতেছে অথচ কাহারও নিকট (অন্যের নিকটই হউক্ বা নিজেয় নিকটই হউক) প্রকাশিত হইতেছে না (অর্থাৎ জ্ঞাত হইতেছে না) এরূপ বলার কোনও অর্থ হয় না।

পূর্বপক্ষী বলিলেন যে, যেহেতু আত্মা এবং দেহরূপ অনাত্মা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ স্বভাব সেই হেতু আত্মা ও দেহ যে এক এইরূপ অনুভব হইতে পারে না, সুতরাং অনাত্মা দেহতে আত্মার অধ্যাস হইতে পারে না। অদ্বৈতবেদান্তী বলিতেছেন, যেহেতু আত্মা ও দেহের ঐক্যের অনুভব সর্বলোকসিদ্ধ সেই হেতু এই অনুভব যে বাস্তবিক হইয়া থাকে ইহা অবশ্যস্বীকার্য; কিন্তু ইহা অযথার্থ, অর্থাৎ ইহা বস্তু-স্থিতির যাহা স্বরূপ তাহা প্রকাশ করেনা। ইহা মিথ্যা। সেই জন্যই ইহাকে অধ্যাস বলা হইয়া থাকে। আমরা বলিব যে আত্মা যে দেহের সহিত নিজেকে অনুভব করিবে তাহাতে অসম্ভাব্যতা কিছুই নাই, এবং এই অনুভব কোনও যুক্তির বিরোধীও নয়। কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মকও নয়। কি অর্থে দেহ আত্মার সহিত অভিন্ন তাহা আমরা দেখাইয়াছি। আত্মা ও দেহের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে যুক্তি ও অনুভবের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে উভয়ের মধ্যে এইভাবেই সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাইতে পারে। দেহাত্মবোধ যে ভ্রমাত্মক তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অদ্বৈতবেদান্তী যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন সেগুলি গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। আত্মা ও দেহের অভেদের অনুভব যথার্থ ইহা স্বীকার করিলে জড়বাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হও এ আশঙ্কাও অমূলক। কারণ, জড়বাদীর সিদ্ধান্ত হইতেছে আত্মা দেহ ভিন্ন আর কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত হইতেছে যে দেহ অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তর হইতে উদ্‌ভূত সংবেদনপুঞ্জ আত্মার একটা অংশ মাত্র। আত্মা এই সংবেদনপুঞ্জের

মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে বটে কিন্তু ইহার মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। বুদ্ধি প্রজ্ঞা, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতিও আত্মার অঙ্গ। আমি দেহ বটে কিন্তু দেহমাত্র নই, ইহা ব্যতীত আরও অনেক কিছু। আমি যদি দেহমাত্র হইতাম তাহা হইলে 'আমি দেহ' ইহাও বলিতে পারিতাম না, কারণ, 'আমি দেহ' এই উক্তির ভিতরেই আমার এবং দেহের ভেদের স্বীকৃতি রহিয়াছে। আমার বিভিন্ন সংবেদন, অনুভূতি, প্রত্যয়, চিন্তা, বিচার প্রভৃতি বিভিন্ন মানসক্রিয়ার মধ্যে যে অহং বোধ অনুস্যূত রহিয়াছে তাহা আমি, আবার এই সকল বিভিন্ন মানসক্রিয়াও আমি। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জড়বাদী আংশিক সত্যের পরিচয় পাইয়াছেন সমগ্র সত্যের পরিচয় পান নাই। সেইজন্যই তাঁহার মত অগ্রাহ্য।

দর্শন

বঙ্গীয় দর্শন পরিষদের মুখপত্র

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা)

১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা] মাঘ [১৩৬৮ সাল

সূচীপত্র

'সত্যের মাত্রা'—না-মিথ্যার স্তর ?

শ্রীঅনাদিকুমার লাহিড়ী

মহামতি শঙ্কর-কথিত 'মায়া'—অদ্বৈত ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত হ'য়ে নাম-রূপ-সম্বলিত জগতের ব্যাখ্যাকারী নীতি হিসেবে আত্ম-প্রকাশ করে। এই 'মায়া—সত্যের ও সত্তার মাত্রা-ভেদের কথা না ব'লে মিথ্যার নানা স্তরের ইঙ্গিত করে। এখানেই আমরা শঙ্কর ও ব্র্যাড্‌লের মতবিরোধ লক্ষ্য করি। শঙ্কর ও ব্র্যাড্‌লের দু'জনেই পরম-সত্তা-বাদী (absolutists) ; আর উভয়েরই প্রচেষ্টা হ'ল সমগ্র জগৎ ব্যাপারের পরম তত্ত্বে পর্য্যবসিত করা। কিন্তু স্বীয় দার্শনিক দৃষ্টি-ভঙ্গী অনুসারে পরিবর্ত্তনশীল অভিজ্ঞতা-স্তরের মর্য্যাদা ও গুরুত্বপ্রদান ব্যাপারে দুই মণীষির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। অদ্বৈত বেদান্তে 'মায়া' বা 'অধ্যাস' এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। পরম সত্তা হিসেবে ব্রহ্মকে অনির্ব্বাচ্য, বিভেদ রহিত, বিশুদ্ধ একের রূপদান করা হ'য়েছে। ব্রহ্ম হ'লেন অযৌগিক, অবিমিশ্র এক পদার্থ—তিনি হ'লেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এখন প্রশ্ন উঠে যে, ব্রহ্ম যদি অখণ্ড, অপরিবর্ত্তনীয় শুদ্ধ সত্তাই হন—তবে 'নাম-রূপ'—সম্বলিত অভিজ্ঞতা-নির্ভর জগৎ কীভাবে ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত হিসেবে স্বীয় উৎপত্তি ও স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা ক'রতে পারে ? উপনিষদ্ জগৎ বিবর্ত্তন ও জগৎ প্রলয়ের কথা বলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে যে জগৎ-সৃষ্টি ও জগৎ প্রলয়ের কথা উপনিষদে পাওয়া যায়—সেগুলির দার্শনিক অভিপ্রেত-ব্যাখ্যার ব্যাপারে শঙ্করাচার্য্য মহতী বাধার সম্মুখীন হন। রামানুজ যেমন জগৎ-সৃষ্টির ব্যাপার সত্য ব'লে স্বীকার করেন আর ঐ ব্যাপারকে প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মের আকারগত পরিণাম, হিসেবে গ্রহণ করেন—শঙ্করাচার্য্য কিন্তু সত্তার কোন পরিবর্ত্তনকেই সত্য ব'লে মেনে নিতে পারেন না ;—আর সেই কারণে সৃষ্টি-ব্যাপারও তাঁর কাছে বাস্তব ব'লে প্রতীয়মান হয় না। 'মায়া—

নীতির সহায়তায় শঙ্কর অদ্বৈত ব্রহ্মে সৃষ্টি-রূপ ধাঁধার নিষ্পত্তি ক'রতে সচেষ্ট হন। তাঁর মতে, জগৎ হ'ল 'মায়া'-প্রসূত ব্রহ্মের এক আভাস মাত্র। যদিও প্রকৃত সত্তা বা ব্রহ্মের —আকারগত বা বস্তুগত কোন রকম পরিবর্ত্তনই সম্ভব নয়—তবুও পরম সত্তা নাম রূপে ব্যাকৃত প্রত্যক্ষগোচর জগদাকারে আভাসিত হ'তে পারেন। স্বর্ণ নির্ম্মিত সকল বস্তুরই যেমন এক অদ্বিতীয় সত্তা বিদ্যমান—জগতের সকল জীব ও জড়পদার্থেরও সেরূপ ব্রহ্ম অধিষ্ঠিত এক অদ্বয় সত্তা বর্ত্তমান। জগৎপ্রপঞ্চ তবে কীরূপে ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত হিসেবে আত্ম প্রকাশ করে?—এই প্রশ্নের উত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, 'মায়া'র দ্বিবিধ কার্য্যের ফলে ঐ আত্ম প্রকাশ সম্ভব হয়। কার্য্য দুইটি হ'ল :—(১) প্রকৃত অধিষ্ঠানের 'আবরণ'; (২) নানাত্ব ব্যঞ্জকে জগৎ প্রপঞ্চের ব্রহ্ম অধিষ্ঠানে অধ্যাস বা 'বিক্ষেপ'। এখন প্রশ্ন উঠে;—উক্ত 'মায়া'—সত্য না মিথ্যা? প্রথম পক্ষে, 'মায়া' বা 'প্রকৃতি' সত্য ব'লে—জগৎ প্রপঞ্চের আবির্ভাবও সত্য হ'য়ে পড়ে; আর সেক্ষেত্রে, ব্রহ্মকে শুদ্ধ, বিভেদ রহিত সত্তা হিসাবে বর্ণনা করা চলে না। অপরপক্ষে, 'মায়া' যদি মিথ্যা হয়—তবে অভিজ্ঞতা লব্ধ জগতের জ্ঞানার্জ্জনের বা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুনিচয়ের সহিত ব্যবহারের কোন সুসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অতএব শঙ্কর ব'লতে বাধ্য হন যে, 'মায়া'শক্তি সত্যও নয় আবার কাল্পনিকও নয়—তা হ'ল 'সদসৎ অনির্ব্বচনীয়' এক ভাব-পদার্থ। একথাও শঙ্কর জোরালো ভাষায় বলেন যে, 'ব্রহ্ম' বা পরম সত্তা, 'মায়া' রূপ মিথ্যা সৃষ্টি শক্তি হ'তে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত। ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ লক্ষণে অনির্ব্বাচ্য, অনির্দ্দেশ্য এক অদ্বয় শুদ্ধসত্তা মাত্র। কেবল ভ্রান্ত, মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকটই ব্রহ্ম 'মায়া'-শক্তি—বিশিষ্ট, জগৎ সৃষ্টিকারী, সগুণ ঈশ্বর রূপে প্রতিভাত হন। 'স্রষ্টা-পালনকর্ত্তা ধ্বংসকর্ত্তা' হিসেবে ব্রহ্মের যে রূপ ব্যাখ্যা করা হয়—তা' ব্রহ্মের 'তটস্থ লক্ষণের'ই পরিচায়ক। অতএব আমরা সহজেই লক্ষ্য ক'রতে পারি যে, জগৎ প্রপঞ্চের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই কেবল 'মায়া নীতির অবতারণা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। মায়া নীতি, জগৎ অধ্যাস নীতি হিসেবেই বিশেষ খ্যাত। এই নীতি'-কে 'মূলাবিদ্যা' রূপেও বর্ণিত করা হয়। বিশিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট যে 'সাধারণ অজ্ঞান,—তা'র নাম হ'ল 'তূলাবিদ্যা। এই 'তূলাবিদ্যা'র ফলেই ব্যক্তি বিশেষের অভিজ্ঞতালব্ধ নির্দ্দিষ্ট বিষয় সকল মনুষ্য-পর্য্যবেক্ষণের আওতায় আবির্ভূত হয়। 'চৈতন্য'কে 'অজ্ঞানে'র মূল অধিষ্ঠান রূপে স্বীকার করা হয়। 'অজ্ঞান'-অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের নাম দেওয়া হয় 'জীব'; আর 'অজ্ঞান' উপহিত 'চৈতন্য'-কে জীব সাক্ষী হিসেবে সমাদৃত করা হয়। অদ্বৈত বেদান্ত মতে, 'মন' সংবলিত সকল বস্তুকেই

অজ্ঞানোপকরণের দ্বারা সৃষ্ট ব'লে বর্ণনা করা হয়। চরম সত্তা রূপী শুদ্ধ চৈতন্য হ'ল ভাব-রূপী 'অজ্ঞানে'র বিরোধী পদার্থ। 'দৃক্ মাত্র' এই চৈতন্য—'দ্রষ্টা' ও 'দৃশ্য' বিবিক্ত, অতীন্দ্রিয় এক সত্তা। কূটস্থ চৈতন্য রূপী বিশুদ্ধ জ্ঞান হ'ল ব্রহ্মের সার স্বরূপ।

শঙ্করাচার্য্যের মতে, অধ্যাসের যেমন নানা মাত্রা আছে, তদনুযায়ী অস্তিত্বেরও নানা স্তর (গৌন অর্থে) স্বীকার করা যায়। শুদ্ধ, অনির্ব্বাচ্য, ব্রহ্মরূপী চরম সত্তা যেমন সকল অজ্ঞান মুক্ত পারমার্থিক সত্তা ভোগ করে—ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা নির্ভর নানা পদার্থ কিন্তু অধ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে নানা স্তরের সত্তা উপভোগ করে। অজ্ঞান যত অল্প হয় মিথ্যা ও ভ্রমের মাত্রাও তেমন অল্প হয়। অপরপক্ষে, অজ্ঞানের তীব্রতা যত অধিক হয়— মিথ্যা ও ভ্রমের মাত্রাও তদনুযায়ী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পূর্ণ সত্যের সহিত অভিন্নাকারে পরম সত্তা যেমন এক নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা উপভোগ করে—অপর অভিজ্ঞতা-সকল সেরূপ ভ্রম ও মিথ্যার সহিত একীভূত ভাবে অধ্যস্ত সত্তার নানা বৈচিত্র ধারণ করে। অতএব, একথা স্পষ্ট যে, অদ্বৈত বেদান্তে 'সত্য' ও 'মিথ্যা,—কেবল মাত্র তর্কশাস্ত্রীয় বা প্রমাণশাস্ত্রীয় ব্যাপার নয়, পরন্তু, বস্তু সত্তা ও বস্তু মিথ্যাত্বেরও ব্যাখ্যাকারী নীতি বা নিয়ামক উপাদান। সাধারণ অভিজ্ঞতার যে ব্যবহারিক জগৎ—যে জগতের এক আন্তর্ব্যক্তিক বিষয়মুখ সত্তা আছে ব'লে মনে হয়—এই জগতের ব্যবহারিক সত্তা অঙ্গীকৃত হয়। স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুসকলের যে ক্ষণস্থায়ী জগৎ—তা'র 'প্রাতিভাসিক সত্তা' অঙ্গীকার করা হয়। আর অলস কল্পনাজাত বস্তু-সকলের (যথা, 'আকাশ-কুসুম') ও স্ব-বিরোধী চিন্তা প্রসূত বস্তুসকলের 'তুচ্ছ সত্তা' স্বীকার করা হয়। 'স্থায়িত্ব' ও 'অ-বাধিত্ব'—উচ্চ স্তরের সত্তা-প্রকৃতি সূচিত করে। কিন্তু পূর্ণ অ-বাধিত্ব ও নিত্যস্থিতি—একমাত্র ব্রহ্মেরই উপভোগ্য। ডক্টর ধীরেন্দ্র মোহন দত্ত মহাশয়—তাঁর 'Six ways of knowing' গ্রন্থে অবাধিত্ব নামক বেদান্তোক্ত সত্য নিয়ামকের সারবত্তা প্রতিপন্ন ক'রতে সচেষ্ট হ'য়েছেন। দেখানো হয়েছে যে, প্রতিষঙ্গ (correspondence') ধারণাটি পরিণামে 'সামঞ্জস্য' ('coherence') ধারণার ইঙ্গিত দেয় (এ বিষয়ে জোয়াকিম্ সাহেবের মত সমর্থন আছে ;) 'সামঞ্জস্য' ধারণা আবার তার ভিত্তিস্বরূপ 'অ-বাধিত' ধারণার সূচনা করে। ঈশ্বরের ধারণাও সম্পূর্ণ নির্বাধ নয়—কারন 'ঈশ্বর' প্রত্যয় কতকগুলি 'ভেদ' ধারন করে—বিশেষতঃ 'উপাসক' ও 'উপাস্যে'র ভেদ 'ঈশ্বর' ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। শঙ্করের মতে, আমাদের প্রকৃত সত্তা—ব্রহ্ম সত্তা থেকে অভিন্ন। নিজ নিজ সত্তাকে শুদ্ধ ব্রহ্ম ব'লে জানলাভ করলে, আমরা সকল ভেদ ও অধ্যাসের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রতে পারি—আর

পূর্ণসত্যের অবধারণে 'অজ্ঞান' মূলোৎপাটিত ক'রতে সমর্থ হই। 'অধ্যাসে'র কারণীভূত ('বিবরণ'-সম্প্রদায়ের মতে) বা 'অধ্যাসে'র আত্ম স্বরূপ ('ভামতী'-সম্প্রদায়ের মতে) যে 'অজ্ঞান'—তা' কেবলমাত্র তত্ত্ব-জ্ঞানের স্ফুরণেই দূরীকৃত হয়। 'সর্প-রজ্জু-ভ্রম' বা 'শুক্তি-রজত-ভ্রান্তি' রূপ যে সকল সাধারণ ভ্রম বা অধ্যাস আত্ম-প্রকাশ করে—সেগুলি যে সকল অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত থেকে অনির্ব্বাচ্য, সৃষ্ট পদার্থের রূপ নেয়—তাদের সম্যক জ্ঞানের ফলে বিদূরিত হয়। অধ্যাসের তিরোভাবের সমকালেই অধ্যস্ত মিথ্যা বস্তু-সকল সর্ব্বকালের জন্য নিষিদ্ধ হয় ('ত্রৈকালিক নিষেধ')। কিন্তু অধ্যস্ত পদার্থ সকল 'প্রাতিভাসিক সত্তা' উপভোগ ক'রে ব'লে, সম্পূর্ণ শূণ্য ব'লে তাদের উড়িয়ে দেওয়া হয় না। ব্র্যাড্‌লে—তাঁর 'Appearance and Reality'-গ্রন্থে 'পরম সত্তা' ও অভিজ্ঞতার পর জগতের মধ্যে বর্ত্তমান এক সম্পর্কের ধারণা দেন আর আভাস-সকলের ('appearances') বিশেষ মর্য্যাদার কথা ও আমাদের অবহিত করেন। এখন আমরা উপরি-প্রদত্ত, শঙ্কর-কথিত মত সমূহের সঙ্গে ব্র্যাড্‌লের উক্ত মতবাদের এক তুলনামূলক আলোচনা ক'রতে পারি। তার পূর্ব্বে, ব্র্যাড্‌লের দর্শন-মতের মূলভাব লক্ষ্য করা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে :—

ব্র্যাড্‌লের মতে, কোন বিশ্লিষ্ট একক অভিজ্ঞতা স্ব-বিরোধ পোষণ ক'রতে বাধ্য। এক বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা অপরাপর নানা অভিজ্ঞতার সহায়তা অপেক্ষা করে—সেগুলি বাদে অসম্পূর্ণতা ও দুর্জ্ঞেয়তা কাটানো সম্ভব হয় না। বিশ্লিষ্ট আকারে সকল প্রতিভাসই নানা সম্পর্ক ও বিভেদ অন্তর্ভুক্ত করে।

যখন আমরা ঐ সকল সম্পর্ক ও বিভেদ—আমাদের বুদ্ধির সহায়তায় ধারণা রাশির মাধ্যমে উপলব্ধি ক'রতে সচেষ্ট হই, তখন নানা স্ব-বিরোধী ভাব ও সমস্যা আত্ম প্রকাশ করে। এইভাবে আমরা দেখি যে প্রতিভাস সকল পরিশেষে স্ব-বিরোধ ও দুর্জ্ঞেয়তার কবলে জর্জ্জরিত হ'য়ে পড়ে। মনুষ্য-জ্ঞানার্জনের সাধারণ মাধ্যম হ'ল 'চিন্তা' ;—আর 'চিন্তা' স্বস্বরূপেই সম্পর্ক জালে কণ্টকিত। চিন্তার অভিব্যক্তরূপ হিসেবে 'বচন' (judgment) সম্পর্কের আকারেই স্বকার্য্যসাধন করে। এক মিশ্র পূর্ণতাকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় আকারে বিশ্লিষ্ট ক'রে 'বচন' পুনরায় সংশ্লেষের সাহায্যে প্রাথমিক, আদিম পূর্ণতাকে ফিরে পেতে চায়। তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত ক'রবার এই প্রচেষ্টায় বচন নিদারুণভাবেই ব্যর্থকাম হয়। প্রত্যেক বচনই কতকগুলি সর্ত্ত ও নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থ হ'য়ে কাজ করে। কেবল আর সকল বচন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযোগ-সাধন ক'রেই, 'বচন' তার স্বীয় সর্ত্ত ও নিয়ন্ত্রণ অতিক্রম ক'রতে সমর্থ হয়। কিন্তু

অপরোক্ষভাব ('immediacy) চিহ্নিত অখণ্ড অভিজ্ঞতায় ঐরূপ আত্মোৎক্রমণের পথে বচন-সমূহ আত্ম-স্বরূপের বিনাশ ঘটায়। যে কোন সাধারণ জ্ঞানের রূপ বচন-রাশির মাধ্যমে আত্ম প্রকাশ করে ব'লে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদ পোষণ ক'রতে বাধ্য হয়, আর সেই কারনে 'চিন্তা'র অপরিহার্য্য অঙ্গ 'আত্ম-ব্যতিরিক্ততা'র ভাব ('the sense of other') অন্তর্ভুক্ত ক'রতেও সুনিয়ন্ত্রিত হয়। অতএব লক্ষ্য করা যেতে পারে যে,—দেহ, আত্মা, সম্পর্ক, চিন্তা, ঈশ্বর—প্রভৃতি সকল 'প্রতিভাসই—উচ্চতর' অপরোক্ষ সত্তা'য় সমাহিত না হ'লে—শেষ পর্যন্ত কেবল প্রতিভাসের আকারেই থেকে যায়।

ব্র্যাড্‌লে তিনটি অভিজ্ঞতা-স্তরের কথা চিন্তা করেন ('নিম্নতর অপরোক্ষানুভূতি') ('lower immediacy') চিহ্নিত অভিজ্ঞতার প্রাথমিক স্তরে, 'সত্তা,' সম্পর্ক-পদাবনত ('infra relational'), বিষম অভিজ্ঞতার আকারে আত্ম-প্রকাশ করে। অভিজ্ঞতার এই স্তরে, অনুভূতি ও সংবেদন সকল জ্ঞানার্জ্জনকারী জীবের কাছে নিম্নতর অপরোক্ষ অনুভূতি চিহ্নিত অস্পষ্ট সামগ্রিকতার আকারে দেখা দেয় আর উচ্চতর সম্পর্ক স্তরে সর্ব্বদাই অতিক্রম ক'রতে উন্মুখ থাকে। অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় স্তর হ'ল মাধ্যমিক, সম্পর্ক-পূর্ণ ও বাচনিক। এই স্তরে 'চিন্তা' অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতা সমূহ বিশ্লিষ্ট করে আর বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলির উপর লক্ষ্যপাত করে—যা'র ফলে 'সমগ্রে'র জ্ঞানলাভ সুসিদ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু অভিজ্ঞতার এই সম্পর্ক কণ্টকিত স্তরে কেবল স্ব-বিরোধী ভাব ও অপূর্ণতাই লাভ করা যায়। সম্পর্ক অতিক্রমণকারী, অভিজ্ঞতার সর্ব্বোচ্চ, তৃতীয় স্তর বোধি-রূপ উচ্চতর, অপরোক্ষানুভূতির দ্বারা সুচিহ্নিত। এই সর্ব্বোচ্চ অভিজ্ঞতা-স্তরে, নানাবিধ ও নানাভিমুখী অভিজ্ঞতা—এক সুসমঞ্জস, সর্ব্বাত্মক, পরমতত্ত্বের অভিজ্ঞতায় সমাহিত হয়। পরম স্তরের অভিজ্ঞতায়—সম্পর্কাবগাহী ও স্ববিরোধী প্রতিভাস সকল ধ্বংস-প্রাপ্ত হয় না ;—তাদের একটিও দূরীকৃত হয় না। কিন্তু তারা সকলেই পরিবর্ত্তিত, সুসমঞ্জস আকারে পূর্ণতত্ত্বে স্থান-প্রাপ্ত হয়। এই কারণে ব্র্যাড্‌লে যুক্তি-যুক্তভাবেই বলেন যে, পরম সত্তা তার প্রতিভাস-সকলের মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশ করে। ব্র্যাড্‌লের মতে, সকল প্রকার অভিজ্ঞতাই কিছু-না-কিছু সত্য পোষণ করে। অভিজ্ঞতা সামঞ্জস্যের মাত্রা যত অধিক হয়—অভিজ্ঞতা ধৃত সত্যের পরিমণও তত অধিক হয়। সত্য ও সত্তার মাত্রাভেদ সম্ভব—কিন্তু ভ্রম ও মিথ্যার মাত্রা-তারতম্য আদৌ সম্ভব নয়। ব্র্যাড্‌লের ধারণানুযায়ী, ঈশ্বর যদিও এক উচ্চ-স্তরের সুসমঞ্জস অভিজ্ঞতা-সামগ্রী—তবু তা' কিছু বিরোধ পোষণ করে,—যে বিরোধ একমাত্র পরমসত্তায় বিলীন হ'য়ে যায়। তাঁর আধিবিদ্যক তর্কশাস্ত্রেও ব্র্যাড্‌লে সেই একই মত প্রচার

করেন যে, সকল আংশিকে বচনই অংশতঃ সত্য ও অংশতঃ মিথ্যা ;—আর পূর্ণ সত্য বরণের জন্য তা' মহত্তর সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি কামনা করে।

এখন, আমরা শঙ্করের ও ব্র্যাড্‌লের মত-বাদের তুলনামূলক বিচার ক'রে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে এক স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি।

পরমতত্ত্বের প্রকৃতি ও অভিজ্ঞতা-গোচর জগতের সঠিক মর্য্যাদা সম্পর্কে শঙ্কর ও ব্র্যাড্‌লের মধ্যে মত-বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। মহামতি শঙ্কর পরম তত্ত্বের যে রূপ-ব্যাখ্যান ক'রেছেন—তা'কে 'বিমূর্ত্ত অদ্বৈত-বাদ' ('Abstract Monism') আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ব্র্যাড্‌লে কিন্তু 'সমূর্ত্ত অদ্বৈতবাদেরই ('Concrete Monism') প্রচার করেন। প্রথমোক্তের কাছে, পরম তত্ত্ব রূপে ব্রহ্ম হ'লেন শুদ্ধ, অসঙ্গ, বিভেদ-রহিত এক সত্তা ; দ্বিতীয়োক্তের কাছে, পরম অভিজ্ঞতা হিসেবে প্রকাশিত যে পরম তত্ত্ব —তা' হ'ল সুসদৃশ অভিজ্ঞতা। অতএব শাঙ্কর মতে, দৃশ্যমান জগৎ বা প্রতিভাস—পরমতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন (বা 'বিসদৃশ'), ত্রিকাল-নিষিদ্ধ এক অনির্ব্বাচনীয় ভাব-পদার্থ। কিন্তু ব্র্যাড্‌লের মতে প্রতিভাস-সকলের যে জগৎ—তা' সম্পর্ক কণ্টকিত ও স্ববিরোধী হ'লেও, অংশতঃ সত্য ও তত্ত্বের উপাদান-স্বরূপ। অতএব, শঙ্কর যখন 'মিথ্যাত্বের স্তর' অঙ্গীকার করেন—ব্র্যাড্‌লে তখন 'সত্য ও তত্ত্বের মাত্রা' স্বীকার করেন। সংক্ষেপে ব'লতে গেলে, অভিজ্ঞতা গোচর জগৎকে শঙ্কর মিথ্যা ও অনির্ব্বাচ্য ব'লে মনে করেন—ব্র্যাড্‌লে কিন্তু প্রতিভাসের জগৎকে পরম তত্ত্বের আংশিক ও ভ্রান্ত রূপায়ণ হিসেবে গ্রহণ করেন; তাঁর মতে, প্রতিভাসের জগৎ উচ্চপর্য্যায়ের অপরোক্ষানুভূতি'চিহ্নিত সুসমঞ্জস পরমতত্ত্বে বিলীন হ'বার অপেক্ষা করে।, ব্র্যাড্‌লে—পরমতত্ত্ব-প্রতিপাদক, উচ্চ পর্য্যায়ের বোধি-মূলক অভিজ্ঞতাকে 'জ্ঞানে'র উপর স্থান প্রদান করেন। বোধির সাহায্যে যে তত্ত্বের স্ফুরণ হয়—তা' হ'ল সম্পর্ক অতিক্রমণকারী এক সামগ্রীক, সুসমঞ্জস তত্ত্ব। শঙ্কর, ব্রহ্মাবগতির একমাত্র করণ হিসেবে 'জ্ঞান'কে গুরুত্ব-পূর্ণ মর্য্যাদাদান ক'রলেও আর ব্রহ্মকে 'জ্ঞান-স্বরূপ' হিসেবে রূপদান ক'রলেও, একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, শঙ্কর-কথিত 'জ্ঞান'—ব্র্যাড্‌লে নির্দ্দিষ্ট 'সম্পর্কাত্মক জ্ঞান' নয় ; তা' হ'ল—ব্র্যাড্‌লে সমাদৃত—উচ্চপর্য্যায়ের অপরোক্ষানুভূতি চিহ্নিত, বোধিমূলক অভিজ্ঞতার সমগোত্রীয়। এখন যদি আমরা প্রত্যক্ষ গোচরীভূত প্রতিভাস-সংবলিত জগতের শঙ্কর ও ব্র্যাড্‌লে প্রদত্ত মর্য্যাদর কথা বিচার করি—তবে আমরা কতকগুলি বিশেষ সঙ্কট ও সমস্যার সম্মুখীন হই। শঙ্করাচার্য্যের মত পাই তাঁর সুললিত 'শারীরক ভাষ্যে' আর ব্র্যাড্‌লের মত পাই—তাঁর 'Appearance and

Reality'-নামক বিখ্যাত গ্রন্থে। শাঙ্কর বেদান্তে, 'মায়া'-র প্রকৃত অধিষ্ঠান সম্পর্কে কতকগুলি সমাধান-অযোগ্য সমস্তার উদ্ভব হয়। এই সমস্তা বিশেষভাবে দেখা দেয়—ব্রহ্মে 'মায়া'র অবস্থান সম্পর্কে আর 'মায়া'-র—সদসৎ অনির্ব্বাচনীয় স্বরূপের যথাযথ, যুক্তিসঙ্গত অবধারণ বিষয়ে। যদিও অদ্বৈতবাদীরা রামানুজ প্রদর্শিত, ব্রহ্মে 'মায়া'র অধিষ্ঠান সম্পর্কিত সকল প্রকার সমালোচনার প্রতিবাদ জানাতে সচেষ্ট হন—তবু ব্রহ্মের কূটস্থ স্বরূপে না থেকেও 'মায়া' কীভাবে আত্ম-প্রকাশ করে আর দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি ঘটায়—তা' এক দুর্বোধ্য বিষয়। দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা অভিজ্ঞতা রাশির মাত্রা সম্পর্কে যে অদ্বৈতবাদী ধারণা আছে—তার প্রত্যুত্তরে একথা বলা যায় যে, কৈবল্য-বাসনাকারী সাধক যদিও সাধনার উচ্চতর স্তরে নিম্নপর্য্যায়ের অভিজ্ঞতা আপেক্ষিকভাবে 'মূল্যহীন' ('less valuable') ব'লে মনে ক'রতে পারেন—কিন্তু তা'কে সম্পূর্ণ মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দিতে পারেন না। এমন কি, অধ্যস্ত সর্পও প্রতিভাস রূপে সত্য, যদিও উচ্চ-স্তরের, অর্থাৎ প্রকৃত, সর্প হিসাবে তা' সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অলীক। অতএব মনে করি, 'মূল্যায়ণের মাত্রা-ভেদ' সম্ভবতঃ 'মিথ্যাত্বের মাত্রা-ভেদ'—এর স্থান দখল ক'রতে পারে।

যা'হোক, একথা বলা যেতে পারে যে, 'মায়া' বা 'অধ্যাস-রূপী দৃশ্যমান জগৎকে 'ভাসমান' ও 'অনাদি, অনির্ব্বাচ্য প্রতিভাস বলায় ব্যবহারিক জগতের উৎপত্তি ও মর্য্যাদা বিষয়ে কোন সমাধান দেওয়া হয় না। ব্র্যাড্‌লের স্বীয় মতবাদেও কতকগুলি নূতন ধরণের সমস্তা আত্ম-প্রকাশ করে। আমরা জানি যে, কতকগুলি সাধারণ অভিজ্ঞতা—বিশ্লিষ্টভাবে ও পরম সত্যই বহন করে—কেবল মাত্র আংশিক ও আপেক্ষিক সত্য পোষণ করে না। একথাও স্পষ্ট নয় যে। সকল অভিজ্ঞতা ঠিক কীভাবে পরমতত্ত্বে আত্ম-সমাহিত হয়।

ফ্রয়েডীয় ধর্মমতের ব্যাখ্যা ও খণ্ডন

শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য্য

"ধর্ম" কথাটির প্রকৃত অর্থ যাহাই হউক না কেন, বর্তমান প্রবন্ধে ইহা অনেকটা ইংরাজী "রিলিজিয়ন" কথাটির সমার্থক রূপে ব্যবহার করা হইল। জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধকে কেন্দ্র করিয়া মনের যাবতীয় বৃত্তি, অভিজ্ঞতা বা চেষ্টিতই বর্তমানে আলোচিত "ধর্ম" কথাটির লক্ষ্য। এমন হইতে পারে যে ধর্মের আসল তাৎপর্য্যে জীব-ঈশ্বর সম্বন্ধের কোন অপরিহার্য্যতা নাই। এমনও হইতে পারে যে ঈশ্বর-বিহীন ধর্ম সম্ভব। এই সকল সম্ভাবনা বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। ধরিয়া লওয়া যাউক যে ঈশ্বরের সহিত আদান প্রদান বা ভাব বিনিময় করিয়া জীবত্বকে শিবত্বে উন্নীত করিবার অথবা সসীম হইয়াও অসীমত্বের রসাস্বাদন করিবার প্রেরণা বা ইচ্ছা মানুষের পক্ষে একটি বাস্তব ঘটনা অথবা মনোবৈজ্ঞানিক সত্য। এই বাস্তব ঘটনাটি মানুষের অনুভূতিগম্য বা উপলব্ধ চেতনারূপে অনস্বীকার্য। আরও ধরিয়া লওয়া যাউক যে ধর্মের বহু বহিরঙ্গ লক্ষণ বা প্রকাশ থাকা সত্বেও মনোবিদ্যার দিক হইতে উহা গৌণ এবং এই দিক হইতে মুখ্য হইল ইহার অন্তরঙ্গ বা অনুভবগম্য লক্ষণগুলি।

"ধর্ম" অথবা "রিলিজিয়ন" কাহাকে বলে তাহা লইয়া মতবিরোধের অবধি নাই। মনোবিদ্যার দিক হইতে এই মতবিরোধের নিষ্পত্তিও অবান্তর। "ধর্ম" বলিতে যে মানুষের কোন মানস প্রতিক্রিয়া বা অভিজ্ঞতার সমষ্টি বুঝায় অথবা ইহা যে ব্যক্তির সমগ্র সত্তার প্রতিবেদন বুঝায় এই বিষয়ে হয়ত মতানৈক্য নাও থাকিতে পারে। এই বিষয়ে মতানৈক্য থাকুক বা না থাকুক বর্তমান আলোচনায় "ধর্ম" কথাটিতে এইরূপই বুঝানো হইয়াছে। "ধর্ম" কথাটিতে যে প্রতিক্রিয়া বা অভিজ্ঞতা বুঝায় তাহার লক্ষ্য হইল কোন অতিপ্রাকৃত বা বিশ্বাতীগ সত্তা যাহা লাভ করিবার জন্য মানুষ উন্মুখ। এই সত্তাকে লাভ করিবার চেষ্টা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। "নাল্পে সুখমস্তি, যদ্ বৈ ভূমা তদেব সুখম্" এই শাস্ত্রবাক্য শুধু ভূমার পারমার্থিক সত্যতাই ব্যক্ত করে নাই, কিন্তু ভূমার প্রতি আকর্ষণকে একটি বাস্তব অথা মনোবৈজ্ঞানিক ঘটনা রূপেও বিবৃত করিয়াছে।

বিশ্বাতীগ এবং অতিপ্রাকৃত সত্তাকে লাভ করিবার প্রচেষ্টায়ই ব্রহ্মের নানা রূপ কল্পনা হইয়াছে। ইহাই নানা বিধি-নিষেধ, আচার-বিচার, রীতি-নীতি, আচমন—প্রাণায়াম—প্রার্থনা—উপাসনা, পূজা, ভোগনৈবেদ্য, আরতি, আবাহন-বিসর্জন, ধ্যান-

ধারণা-সমাধি প্রভৃতি বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ কার্যপ্রণালীতে আত্মপ্রকাশ করে। ঈশ্বর আছেন কি নাই, তাঁহার স্বরূপ কি, তাঁহার সহিত জীবের অথবা বিশ্বের সম্বন্ধ কি—এই সকল তর্ককণ্টকিত প্রশ্ন মনোবিদ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। পক্ষান্তরে ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মন বাস্তব বা কল্পিত ঈশ্বরের প্রতি কোনো মনোভাব পোষণ করে এবং এই মনোভাবকে কেন্দ্র করিয়া তাহার বিচিত্র হর্ষ-দুঃখ, পুলক-রোমাঞ্চ, স্বেদ-কম্পন ইত্যাদি বহুবিধ মানস-প্রতিক্রিয়া ঘটে, ততক্ষণ 'ধর্ম' এবং 'ঈশ্বর' মনোবিদ্যার পক্ষে একটি বাস্তব ঘটনা এবং জানিবার অথবা প্রণিধান করিবার বিষয়।

উপরের কথাগুলি মনে না রাখিলে এই প্রবন্ধ পাঠে ধর্মীয় মনোবিদ্যার সহিত ধর্মীয় দর্শনের বুদ্ধিভ্রম ঘটিতে পারে।

ধার্মিক অথবা ধর্মপিপাসু ব্যক্তি প্রথমেই এইরূপ আলোচনার বিরোধিতা করিবেন। তিনি বলিবেন যে ধর্ম জীবনের একটি অতি নিবিড় এবং জীবন্ত সত্য। মনোবৈজ্ঞানিক অঙ্গব্যবচ্ছেদে ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই, কারণ ইহার ফলে ধর্ম কতকগুলি মৃত উপাদানে পরিণত হয়। সজীব ধর্মভাবের বিশ্লেষণলব্ধ নিষ্প্রাণ উপাদানগুলি মূল ধর্ম বা ঈশ্বরানুভূতির বিকৃতি মাত্র। উত্তরে এইটুকু বলাই হয়ত যথেষ্ট হইবে যে ধর্মের বিশ্লিষ্ট উপাদানগুলিই ধর্ম এইরূপ বক্তব্য বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তবু এই জাতীয় বিশ্লেষণ না করিয়া উপায় নাই, কারণ এইরূপ বিশ্লেষণই ধর্মভাব বুঝিবার বা বুঝাইবার যুক্তিযুক্ত পন্থা। ধর্মভাবকে ব্যক্তিগত অনুভূতির গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া বুঝিতে হইলে যুক্তিতর্কের সাহায্য অনিবার্য। কোনো ব্যক্তির ধর্মভাবকে ক্ষুণ্ণ করা, অথবা একটি ধর্মভাবের পরিবর্তে আর কোন ধর্মভাব সৃষ্টি করাও এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। ধর্মভাবকে একটি বাস্তব ঘটনারূপে ধরিয়া লইয়া উহার অন্তর্নিহিত কারণ জিজ্ঞাসাই এই প্রবন্ধের বিষয়।

ধর্মভাবের কারণ

প্রথমেই জিজ্ঞাস্য এই যে ধর্মভাব বা তৎসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতাগুলি কি অকারণ অথবা সকারণ? ইহারা কি শূন্য হইতে স্খলিত হইয়া অকস্মাৎ খসিয়া পড়িয়াছে, না কার্য্যকরণের পরম্পরাসূত্রে আবদ্ধ? বলা বাহুল্য, কিছুই যেমন অকারণে ঘটে না, ধর্মভাবও তেমন বিনা কারণে আবির্ভূত হয় নাই, অথবা মানুষের জন্মলগ্নে ঈশ্বর তাহার মনে ধর্ম-ভাব রোপণ করিয়া দেন নাই। অন্যান্য মানস অভিজ্ঞতার ন্যায় ধর্মভাবও সকারণ।

দ্বান্দ্বিক জড়বাদীর মত

জড়বাদ ধর্মভাবের কারণ অথবা উৎস মনের অন্তস্থলে অনুসন্ধান করে না। এই মতে ধর্মভাবের কারণ কতগুলি মৌলিক ভৌতিক উপাদান। এই মতবাদ বহু-নিন্দিত এবং বহু খণ্ডিত। নির্ঘাতীতকে পুনরাঘাত করা হইল না।

কিন্তু মার্ক্সবাদ অথবা আধুনিক দ্বান্দ্বিক জড়বাদ সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র নয়। এই মতবাদ অনুসারে মানুষের শ্রেয়, প্রেয়, ধর্ম, নীতি প্রভৃতি পুরুষার্থ বা মূল্যবোধগুলি চাহিদা ও উৎপাদনের হারের সহিত কার্য্যকারণসূত্রে সম্বন্ধ। কতগুলি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক শক্তিই মানুষের তথাকথিত পুরুষার্থগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

এই মতের গুণ

দ্বান্দ্বিক জড়বাদীয় ধর্মমতের সমালোচনার মুখবন্ধ হিসাবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সামাজিক,রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক শক্তি মানুষের ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতি পুরুষার্থ বোধের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নাই। ইতিহাসের পশ্চাদ্‌ ভূমিতে এই মূল্যবোধগুলির আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বৈষম্য অনুসারে ইহাদের তারতম্য ঘটিয়াছে।

ইহার দোষ

কিন্তু সেজন্য ইহারাই যে এই বোধগুলির একমাত্র নিয়ামক বা সংগঠক এমন দাবী করা অযৌক্তিক। এইগুলি ইহাদের নিয়তসহচর অবস্থা মাত্র হইতে পারে এবং এইগুলি ইহাদের কারণ নাও হইতে পারে। এক-কোষীয় জীব হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোচ্চ জীব মানুষের দেহ ও মন পরস্পরের সহিত সমান তাল রাখিয়া পরিণাম লাভ করিয়াছে এই পর্য্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্তই অযৌক্তিক যে দেহ মনের কারণ। অথবা দেহের উচ্চতা এবং হ্রস্বতা অনুসারে ছায়ার তারতম্য লক্ষ্য করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়না যে দেহই ছায়ার একমাত্র কারণ। এই জাতীয় যুক্তিগুলি প্রায় একই প্রকারের যুক্ত্যাভাস দ্বারা দুষ্ট। যাহাকে কারণ ও যাহাকে কার্য্য বলিয়া স্থির করা হইতেছে তাহা কারণ বা কার্য্য না হইয়া, একটি অপরটির 'নিয়ত সহচারী অবস্থা অথবা উভয়ই একটি মূল কারণের যুগ্ম কার্য্য হইতে পারে। দ্বান্দ্বিক জড়বাদ যে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে উচ্চতর মূল্যবোধের কারণ বলিয়া মনে করে তাহা হয় উহার নিয়ত-সহচর অবস্থা অথবা উহারা সমগোত্রীয়, অথবা প্রথমটি যে কারণপ্রসূত দ্বিতীয়টি সেই একই কারণপ্রসূত। তাহা

ছাড়া, দ্বান্দ্বিক জড়বাদ আর একটি গুরুতর দোষে দুষ্ট। যাহাকে বাদ দিলে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজনীতি অর্থহীন হইয়া পড়ে, অর্থাৎ যে বোধ বা চৈতন্য সকল মনুষ্য-চেষ্টিতের মূলাধার তাহাকেই ঐ ক্রিয়াগুলির কার্য্যে পরিণত করিয়া এই মতবাদ অসমর্থনীয় হইয়া দাঁড়ায়। যাহা প্রকৃতপক্ষে কারণ তাহাকে কার্য্য এবং যাহা বস্তুতঃ কার্য্য তাহাকে কারণরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা নিজ স্কন্ধে চড়িয়া নর্তন করিবার নামান্তর।

এই মতের ফ্রয়েডীয় সমালোচনা

যাহারা বঞ্চিত তাহদের অবদমিত ভোগেচ্ছাকে মুক্তির পথে ছাড়িয়া দিবার জন্যই মার্ক্সবাদের এমন অসামান্য প্রভাব। ইহার স্বপক্ষে এমন যুক্তি নাই যে অংশে ইহা অন্যান্য দর্শনমতের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করিতে পারে। মনোবিদ্যার দিক দিয়াও দ্বান্দ্বিক জড়বাদ গ্রহণীয় নয়। মনঃসমীক্ষণের জনক সিগ্‌মণ্ড ফ্রয়েড দ্বান্দ্বিক জড়বাদের মনকে বাদ দিয়া শুধু পারিপার্শ্বিক শক্তিদ্বারা মানুষকে বুঝাইবার চেষ্টার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক শক্তিগুলি মনকে বাদ দিয়া বুঝা যায়না। চাহিদা এবং উহার পূরণ মানসিক ব্যাপারও বটে।

ফ্রয়েড এর ধর্মমত

সুতরাং দ্বান্দ্বিক জড়বাদের ভাবাদর্শে ধর্মভাবের উৎপত্তি এবং স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা হইতে আমরা বিরত হইব। মনঃসমীক্ষণপ্রণেতা মহামতি ফ্রয়েড ধর্মভাবের উৎস উন্মোচন প্রসঙ্গে ইহার যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহাই আলোচিত এবং সমালোচিত হইবে। মন:সমীক্ষণ মার্ক্সবাদের উপরোক্ত সমালোচনাসূত্রের সহিত একমত। ধর্মভাবের উৎস অনুসন্ধান করিতে হইবে মানুষের মনে, কোনো বাহিরের শক্তিতে নয়। বাহিরের শক্তিগুলি মুখ্যভাবে ধর্মের জনক নয় কিন্তু গৌণতঃ বা অপরোক্ষভাবে অর্থাৎ ঐ শক্তিগুলি মানুষের দ্বারাই নিরূপিত হইয়াও মানুষের মনে কি প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে এবং সেই প্রতিক্রিয়া কিরূপে বাহিরের শক্তিগুলিকে অর্থপূর্ণ করিয়া তোলে সেইভাবে।

নির্জ্ঞান ইচ্ছাই ধর্মের উৎস

কিন্তু মানুষের মন অতি গভীর। সাধারণ অন্তর্দর্শন অথবা বহির্দর্শনে ইহার আপাতদৃষ্ট উপরিভাগটুকু জ্ঞানগোচর হয় মাত্র। ধর্মভাবের মূল কারণ শিকড় গাড়িয়াছে মনের গহন অন্তস্তলে অথবা নির্জ্ঞান মনে। ধর্মভাবের রহস্য নিহিত রহিয়াছে নির্জ্ঞান

মনে অবদমিত ভাবে অবস্থিত কতগুলি ইচ্ছার মধ্যে, ইহাদের আত্মপ্রকাশ লাভের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় এবং এই চেষ্টার নানাপ্রকার সাফল্যে বা ব্যর্থতায়। এই ইচ্ছাগুলির স্বরূপ কি, কেনই বা ইহারা অবদমিত হয়, কি কারণে, কিভাবে ইহারা আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টায় সাফল্য কতটুকু বা কিরূপ ?

শৈশবের গুরুত্ব

শৈশবেই সকল মৌলিক ও প্রবল ইচ্ছাগুলি আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রতিকূল শক্তি সমূহের সহিত সম্মুখযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অবদমিত হয়। সুতরাং শৈশবেই উত্তরজীবনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায় এবং মানুষের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে শৈশবের উপর। শিশুই উত্তরকালীন পরিণত মানুষের জনক। সুতরাং কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে বুঝিতে হইলে অনুসন্ধান করিতে হইবে তাহার শৈশব জীবন এবং এই শৈশব জীবনকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারিলে উত্তরকালে শিশুটি কিরূপ মানুষ হইবে তাহা বহুলাংশে জানিতে পারা যায়।

ধর্মভাব এবং অসহায়তা বোধ

ধর্মভাব মানুষের নিবিড় ও অন্তর্নিহিত স্বভাবের সহিত জড়িত। সেই স্বভাবটি কি ? সেটি মানুষের নিজ অক্ষমতা ও দুর্বলতার উপলব্ধি, নিজ ক্ষমতায় সেই দুর্বলতা অতিক্রম করিবার অপারগতা এবং অন্য কোনো শক্তি এই দুর্বলতা অতিক্রম করিবার সহায় হইবে মনে করিয়া সেই শক্তির উপর নির্ভরশীলতা। নিজ অসহায়তাকে আপন চেষ্টায় দূর করিতে বিরত হইয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ—ইহাই ধর্মভাবের অন্তর্নিহিত ইচ্ছা। এই ইচ্ছার মূলে আরও মৌলিক একটি ইচ্ছা রহিয়াছে সেটি হইল বাস্তবজীবনের কঠোর সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া শৈশবের সেই অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা, যে অবস্থায় জনক-জননী ছিলেন শিশুর চরম ও পরম আশ্রয়। তাই ভক্তের প্রার্থনা, "মা আমায় শিশুর মত সরল কর" এই ভাষায় অনাদিকাল হইতে ব্যক্ত হইয়াছে এবং তাই ঈশ্বর সর্বদেশে ও সর্বকালে প্রধানতঃ পিতা অথবা মাতা অথবা উভয় সম্বোধনে সম্ভাবিত এবং প্রার্থিত হইয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বর পিতামাতারই প্রতিভূ।

ধর্মভাবের মৌলিক ইচ্ছা

তাহা হইলে ধর্বভাবের মৌলিক ইচ্ছাটি কি ? এক কথায় বহুবাঞ্ছিত, কিন্তু অবশ্যম্ভাবি-রূপে হৃত অথবা ভ্রষ্ট পিতামাতার স্নেহময় ও নিরাপদ অঙ্কে ফিরিয়া যাইয়া সেই অঙ্ক

সিংহাসনটিকে পুনরধিকারের ইচ্ছা। শৈশব হইতেই জীবনটা ব্যর্থতায় বিড়ম্বিত, পরাজয়ে ক্লিষ্ট এবং নৈরাশ্যে জর্জরিত। "শৈশবের স্বর্গ" বলিয়া কবি যে আক্ষেপ করিয়াছেন তাহা নিতান্তই ইচ্ছাসুলভ কল্পনা এবং কবির অতৃপ্ত অবস্থায় হইতে শৈশবের শান্তি-নীড়ে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা। শিশুর সকল ইচ্ছার মধ্যে পিতামাতার আশ্রিত হইয়া থাকিবার ইচ্ছাই সর্বাপেক্ষা প্রবল। ভ্রূণস্থ শিশু হয়ত চাহিয়াছিল অনন্তকাল মায়ের দেহেই লীন হইয়া থাকিতে। বড় হইয়াও সেই তাহার কামনা মিটে নাই। তাই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিও শিশুর মত প্রত্যহ অন্ততঃ একবার নিদ্রারূপী মায়ের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

শিশুর ব্যর্থতাবোধ

কোন্ কুক্ষণে মাতৃগর্ভের নিরাপদ আশ্রয়দুর্গ হইতে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত শিশু পৃথিবীর বুকে নিক্ষিপ্ত হইল। যে জন্মক্রন্দনে তাহার জীবনসূর্য্য উদিত হইল সেই ক্রন্দনই তাহার চিরসাথী হইয়া থাকিল। শিশুর সীমাহীন আশা,অনন্ত আকাঙ্ক্ষা তাহার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বাস্তবের কঠিন নিগড়ে শৃঙ্খলিত এবং সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। যে প্রেমের অধিকারে শিশু তাহার পিতামাতাকে, নিজস্ব সম্পত্তি মনে করিয়াছিল সেই অধিকার নির্মমভাবে অগ্রাহ্য হইল যেদিন তাঁহারা তাহাকে তাঁহাদেব অঙ্কসিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিয়া তাহারই চক্ষুর সম্মুখে আর একটি নবজাত শিশুকে অঙ্কে ধারণ করিলেন।

শিশু-বেদনার উভয়বলত্ব-ভালবাসা ও ঘৃণার বিরোধ

শিশু ভাবিয়াছিল যে তাহার পিতামাতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অতুলনীয়, কি জ্ঞান, কি করুণা, কি শক্তি, সর্বতোভাবে তাঁহারা অনুপম। কিন্তু জীবনের এই রূঢ় আঘাতে শিশু তাহার কল্পনার স্বর্গ ছাড়িয়া বাস্তবের সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইল। সে তাহার প্রবঞ্চক পিতামাতাকে ক্ষমা করিতে পারিলনা, আবার তাঁহাদের স্নেহ ও আশ্রয়ের কথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধাবিগলিত না হইয়াও পারিলনা। "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহিপরমংতপঃ", "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী," ইত্যাদি মন্ত্রে সে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে শিখিল। কিন্তু পরক্ষণেই পিতামাতার অতীত বঞ্চনাময় ইতিহাস স্মরণ করিয়া রোষবহ্নিতে জ্বলিয়া উঠিল এবং যাঁহাদিগকে এইমাত্র উপাসনা করিয়াছে, তাঁহাদিগকে মহাধূমপাসে বিসর্জন করিল।১

১ ফ্রয়েড্ এর মতাবলম্বনে অঙ্কিত এই চিত্র হয়ত প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির নিকট সম্পূর্ণ বিকৃত বলিয়া মনে হইবে। সত্যই কি শিশু নিজকে এতটা অসহায় বোধ করে, অথবা প্রত্যেক পিতামাতাই কি সন্তানকে নির্বাসিত করেন? উত্তর এই যে শিশুর এই অসহায়তা

ইডিপাস-এষণা : সফক্লিস্ এর নাটকীয় উপাখ্যান

এই পরস্পরবিরোধী ভালবাসা এবং ঘৃণা, শ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা, আবাহন এবং বিসর্জন ইডিপাস্ গূঢ়ৈষাপ্রসূত। পিতামাতার প্রতি শিশুর মনোভাবটি যেমন এই দ্বন্দ্বমূলক ইচ্ছাদ্বয় দ্বারা গঠিত, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের মনোভাব ও তেমন এই দ্বন্দ্বমূলক ইচ্ছাদ্বয়রূপ অবয়ব দ্বারা গঠিত। ইডিপাস্ নামক রাজপুত্র ঘটনাচক্রে তাঁহার অজ্ঞাতসারে নিজ পিতাকে হত্যা করিয়া নিজ মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই ঘৃণিত কাজ করিয়াছেন ইহা পরে জানিতে পারিয়া অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপন চক্ষু উৎপাটন করিয়া অন্ধ হইয়াছিলেন। পুত্রসন্তানের পক্ষে মাতার প্রতি ভালবাসা ও পিতার প্রতি ঘৃণা, ইহাই মোটের উপর ইডিপাস্ ইচ্ছা অথবা গূঢ়ৈষা বলিয়া বর্ণিত হয়।

ফ্রয়েড্ সফক্লিস্ রচিত নাটকের এই ঘটনাকে বাস্তব জীবনের রূপক হিসাব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক পুত্র সন্তানেরই পিতাকে হত্যা করিয়া মাতাকে ভালবাসিবার এবং কন্যা সন্তানের পক্ষে মাতাকে হত্যা করিয়া পিতাকে ভালবাসিবার (ইলেক্ট্রা এষণা) ইচ্ছা মৌলিক এবং স্বাভাবিক।

ডারুইন বর্ণিত আদিম যৌথ জীবন

এই ইচ্ছা অথবা ইচ্ছাকূটের মূল সন্ধান করিতে গিয়া ফ্রয়েড্ কেবল মাত্র সফক্লিস্ এর নাটকীয় উপাখ্যানকে ইহার দৃঢ় ভিত্তি মনে করেন নাই। উপরন্তু তিনি ডারুইন্ বর্ণিত আদিম হোর্ড বা যৌথ জীবনের কাহিনীকেও অবলম্বন করিয়াছেন। এই আদিম যৌথ জীবনে একটি পুরুষ পিতার অধীনে অসংখ্য স্ত্রীকে বসবাস করিতে হইত। স্ত্রী-সন্তান স্ত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিত। পুরুষ-সন্তানেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রীদের বশীভূত করিতে পারে এই আশঙ্কায় পুরুষ পিতা কর্তৃক নিহত বা বিতাড়িত হইত। পরস্পর বিচ্ছিন্ন পুরুষ সন্তানেরা পিতার তুলনায় দুর্বল হইলেও প্রতিশোধ লইবার সুযোগ খুঁজিত। তারপর বিতাড়িত ভ্রাতৃগণ একদিন দলবদ্ধ হইয়া বৃদ্ধ পিতাকে অথবা বৃদ্ধ পিতার দলকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিত এবং স্ত্রীগণের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিত। কিন্তু তাই বলিয়া বিজয়ী ভ্রাতৃদল তাহাদের অধিকৃত স্ত্রীগণের সহিত যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করিতনা, উপরন্তু

বোধ মূলতঃ সত্য, যদিও শিশু বস্তুতঃ যে পরিমাণে অসহায়, কল্পনায় ইহার মাত্রা অত্যধিক বাড়াইয়া লয়। পিতামাতার দিকে শিশুর নির্বাসনও অল্পাধিক সত্য। কিন্তু শিশুর ইডিপাস এষণা দ্বারা সে ইহাকে বহুগুণ বর্দ্ধিত করিয়া লয়।

সমগোত্রে বিবাহকে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলে নিষিদ্ধ করিত। সমগোত্রীয় স্ত্রীগণের বিবাহ সম্বন্ধাদি স্থাপিত হইত ঐ যূথগণ্ডীর বাহিরে। সমগোত্রীয় মাতৃশ্রেণীর স্ত্রীগণের সম্বন্ধে যৌন সম্পর্কের নিয়মটি ইডিপাস-গূঢ়ৈষা-নিহিত দ্বন্দ্বমূলক ইচ্ছাদ্বয়জনিত। পিতার প্রতি ঘৃণা যেমন এই গূঢ়ৈষার উপাদান, তেমন তাঁহার প্রতি ভালবাসাও ইহার অপর উপাদান। ফলে পিতৃহত্যাজনিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভ্রাতৃগণ পিতার স্ত্রীগণের প্রতি যৌন-লিপ্সা সংযত করিয়া আত্মশাসন করিত।

টটেম্ ধর্ম

ফ্রয়েড দেখাইয়াছেন যে টটেম ধর্ম উপরোক্ত ইডিপাস্ ইচ্ছার পূরণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার মতে টটেম ধর্মই সকল ধর্মের মূল ভিত্তি এবং প্রতীক। ফ্রয়েড্ মনে করেন যে টটেম্ ধর্মের আদর্শে বা ভিত্তিতেই সকল ধর্মের ব্যাখ্যা করিতে হইবে। ডারুইন বর্ণিত যৌথ জীবনের এই স্বরূপনির্ণয়ের সহিত অন্যান্য বহু বিজ্ঞানী সারতঃ একমত। যেমন অ্যাটকিন্‌সন্ বলিয়াছেন যে পুত্রদলের এই বিদ্রোহ পিতৃশাসিত পরি-বারের অবসান ঘটাইয়া মাতৃশাসিত পরিবারের সূত্রপাত ঘটাইয়াছে। রবার্টসন্ স্মিথ বলিয়াছেন যে পিতৃশাসিত পরিবার এইরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবার পর টটেমীয় ভ্রাতৃগোষ্ঠীর উদ্ভব হইল এবং এই ভ্রাতৃগোষ্ঠী মাতৃশাসন মানিয়া লইল।

ইডিপাস্ ইচ্ছাপূরণই ধর্মভাবের মূল কারণ-শিশুর চিন্তার সর্বময়ত্ব

ফ্রয়েড্ মনে করেন যে ইডিপাস্ গূঢ়ৈষানিহিত শ্রদ্ধাঘৃণাত্মক উভয় ইচ্ছাপূরণই সকল ধর্মভাবের মূল কারণ। শিশু এই দ্বন্দ্বমূলক ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারে নাই। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ঘৃণা উভয়ই নিরুদ্ধ বা অবদমিত হইয়াছে। মাতাকে ভাল-বাসিবার ইচ্ছা অবদমিত হইয়াছে পিতার বাস্তব অথবা কল্পিত ভীতিপ্রদর্শনে। আবার পিতাকে হত্যা করিবার ইচ্ছাও পিতার রুদ্ধশাসনে নিরুদ্ধ হইয়াছে। তাহা ছাড়া পিতা-মাতাকে সকল জ্ঞান, শক্তি ও করুণার পরাকাষ্ঠা রূপে পাইবার শৈশব কামনাও পূর্ণ হয় নাই। শিশু যতই একটু একটু করিয়া সাবালক হইয়াছে, ততই সে দেখিতে শিখিয়াছে যে তাহার পিতামাতা জ্ঞান শক্তি করুণার পরাকাষ্ঠা নহেন, বরং তাঁহারা তাহার মতই সর্বতোভাবে দুর্বল ও অসহায়। এইরূপ সসীম পিতামাতাকে সে তাহার আস্পৃহা ও আকুতির লক্ষ্য হিসাবে আর মানিয়া লইতে পারেনা।

শিশুর ভুল ভাঙ্গিয়াছে সত্য। কিন্তু তাহার শৈশববাসনাগুলি অবদমিত হইয়া নির্জ্ঞান মনে দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া গিয়াছে। সুতরাং সে অজ্ঞাতসারে তাহার পরিত্যক্ত শৈশব

অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চায়। কিন্তু এখন, পরিণত বয়সে ঠিক শিশুর মত সে আর পিতামাতার উপর নির্ভর করিতে পারেনা। সে দেখিয়াছে যে তাঁহারা তাহারই মত সসীম, তাঁহাদের জ্ঞান-শক্তি-করুণার সীমা আছে। সুতরাং সর্বাবস্থায় আর তাঁহারা তাহার জ্ঞান, শক্তি ও করুণার ক্ষুধা মিটাইতে পারেননা। এইবার সে এমন একজনের আশ্রয় লইতে চায় যিনি তাহাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করিতে পারিবেন, অচ্যুত সারথির মত তাহার জীবনে-মরণে, শয়নে স্বপনে কাছে কাছে থাকিবেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, করুণাসাগর।

ঈশ্বর পিতামাতার প্রতিভূ : ঈশ্বরের প্রতি উভয়বলবেদনা

পিতামাতার প্রতিভূই ঈশ্বর। পিতামাতার মধ্যে শিশু যাহা পাইয়াছে এবং যাহা চাহিয়াছিল, কিন্তু পায় নাই, সবই সে বড় হইয়া পাইতে চায় ঈশ্বরের কাছে। পিতামাতার প্রতি পরস্পরবিরোধী ভালবাসা ও ঘৃণা মানুষের ঈশ্বরের প্রতি মনোভাবেও আছে। ভক্ত যে তাহার ভগবানকে শুধু স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা, পূজা ইত্যাদি দিয়াই পরিতুষ্ট করেন, তাহাই নয়, পক্ষান্তরে নানাপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ দ্বারাও ভগবানের সহিত ভাববিনিময় করিয়া থাকেন। ভক্ত তাঁহার উপাস্য দেবতাকে কটুভাষণ, এমন কি অবজ্ঞা বা ঘৃণা দ্বারাও রুষ্ট অথবা পরীক্ষা করেন। শিশুভাবের উপাসনায় দেবতার প্রতি মলমূত্রনিক্ষেপের কথাও শোনা যায়। ভক্ত কমলাকান্ত বলিতেছেন, "আয় মা, সাধনসমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।" এখানে ভক্ত প্রথমতঃ ভগবানকে মাতৃরূপে সম্বোধন করিতেছেন এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বানও করিতেছেন। ইহাও অনুধাবনীয় যে চণ্ডীর সাধনপদ্ধতিকে সাধন সংগ্রাম বলা যাইতে পারে। চণ্ডীতত্ত্ব ব্যাখ্যাতা সত্যদেব তাঁহার আশ্রমের নামকরণ করিয়াছেন "সাধন সমর আশ্রম" এবং তাঁহার চণ্ডীব্যাখ্যার নামও দিয়াছেন "সাধন সমর"। ভগবানকে সম্বোধন করিয়া কটুভাষা প্রয়োগের দৃষ্টান্ত ভক্ত রামপ্রসাদ অথবা রামকৃষ্ণদেবের সাধকজীবনে ভূরি ভূরি পাওয়া যাইতে পারে।

আবার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব সম্বন্ধে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে যে কোনো দেশের ও কালের ভক্তজীবনে এই ভাবটির সাক্ষ্য পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ বলিতেছেন, "সকলই তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি," অথবা "ওমা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী," ইত্যাদি।

ঈশ্বরের প্রতি দ্বন্দ্বমূলক ইচ্ছা

ভগবানের প্রতি ভক্তের এই দ্বন্দ্বমূলক ইচ্ছার দৃষ্টান্ত হিসাবে একই পূজায় আবাহন এবং বিসর্জন, এই দুইটি বিরুদ্ধভাবের সমন্বয় উল্লেখযোগ্য। যে দেবতাকে আসন, আচমন অর্ঘ্য, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, পত্রপুষ্পবারি প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করা হয়, আবার তাঁহাকে মহা-সমারোহে বিসর্জন দেওয়া হয়। শুধু বিসর্জনই দেওয়া হয়না, অনেকক্ষেত্রে অযথা ও অনাবশ্যকভাবে দেবমূর্তিকে পাদপেষণে দলিত ও চূর্ণ করা হয়। পূজিত দেবতার প্রতি পূজা বা শ্রদ্ধাভাব সংজ্ঞানরূপ ধারণ করিলেও তাঁহার প্রতি ঘৃণাভাব নির্জ্ঞান মনে অবস্থান করে এবং প্রথম ভাবটি সংজ্ঞানরূপ ত্যাগ করিয়া নির্জ্ঞান মনে নিমজ্জিত হইলেই দ্বিতীয় ভাবটি নির্জ্ঞান হইতে উত্থিত হইয়া সংজ্ঞানাকার ধারণ করে।

ফ্রয়েড এর আক্ষেপ

ফ্রয়েড আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, ধর্মের ভাষা কি পরিণত বা সাবালক মানুষের ভাষা, না অপরিণত শিশুর ভাষা? মানুষ কি চিরদিন শিশুই থাকিয়া যাইবে? জীবন সংগ্রামে পরাস্ত হইলেই কি মানুষ সুরথ অথবা রামচন্দ্রের মত শ্রীদুর্গার শরণাগত হইবে, না প্রতিপক্ষকে সম্মুখ সংগ্রামে আহ্বান করিয়া নিজ সামর্থ্যে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিবে? মানুষ কি তাহার সকল বিপদের মূল অজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ করিবে না? সে কি ধর্মের আশ্রয় লইয়া নিজের মধ্যে নিজে বন্দী হইয়া থাকিবে, না বিজ্ঞানের আলোকবর্তিকায় সকল বিপদ, সকল রহস্য উদঘাটিত করিয়া তাহার জয়যাত্রাপথকে সম্মুখে প্রসারিত করিবে?

ধর্মের ভ্রান্তিমূলকতা

মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে ফ্রয়েড এর এই আবেদন বৃথা যাইবেনা সন্দেহ নাই। জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানই বিজয়লাভের অপরাজেয় কৃপাণ। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি— জ্ঞানই মুক্তি, পরমপুরুষার্থ। কনফুসিয়াস্ বলিয়াছেন যে বুদ্ধি একটি, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস বা কুসংস্কারের অন্ত নাই। ধর্ম এই শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক জ্ঞানকে বর্জন করিয়া অজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া থাকে। কল্পনার মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া এবং এই মায়াকেই কায়া বলিয়া স্থির করিয়া ধর্ম মানুষকে পদে পদে বিভ্রান্ত করে। মানুষের বুদ্ধিকে স্বাধীন, অবাধ এবং স্বচ্ছন্দ গতিপথ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভ্রমের আবর্তে মানুষকে আবর্তিত করে ধর্ম। বাস্তবকে বিকৃত করিয়া এবং সেই বিকৃতরূপকেই প্রকৃত বলিয়া প্রতিষ্ঠা

করিয়া মনুষ্যমনকে সত্যভ্রষ্ট এবং বিপথগামী করে ধর্ম। যাহা ধর্মভাব বলিয়া কথিত হয় তাহা পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-মিশ্রিত ঘৃণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। যাহাকে শ্রেষ্ঠ কামনার ধন বলিয়া মনে করা হয় তাহা বহুকাল পূর্বে পরিত্যক্ত শৈশবের জীর্ণ ও অসহায় অবস্থায় ভ্রষ্ট পিতামাতার আশ্রয় ছাড়া আর কিছুই নয়। ধর্মানুশীলনকে প্রগতিপথগামী বলা ভুল, কারণ ইহা শৈশবের খেলাঘরে ফিরিয়া যাইবারই চেষ্টা।

ধর্ম অ-বৈজ্ঞানিক

সুতরাং ধার্মিক লোক বীরধর্মী নয়, সে কাপুরুষ ও ভীরু। কঠোর জীবনসংগ্রামে ভগ্নমনোরথ হইয়া সে চাহে ফিরিয়া যাইতে তাহার শৈশবের পরিত্যক্ত আশ্রয় দুর্গে। ধর্ম প্রগতির প্রধান অন্তরায়। কঠোর বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে নিত্য-নূতন সত্য আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে ইহা বাধা দেয়। ইহা অগ্রগতি নয় কিন্তু জীবন সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া পশ্চাদপসরণের নামান্তর। তাহা ছাড়া ধর্ম জগতের বহু অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ধর্ম পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের বুদ্ধিকে মোহগ্রস্ত করিয়াছে, মানুষে মানুষে ঐক্য স্থাপনের পরিবর্তে ভেদপ্রাচীর সৃষ্টি করিয়া পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রেও বিশ্বে অশান্তি এবং অবিশ্বাস বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং ধর্ম সকল অনর্থের মূল। রাষ্ট্র নীতি বিজ্ঞান, শিক্ষা ও চরিত্র-এক কথায় মানুষের সমগ্র জীবন ধর্মের প্রভাবে পঙ্গু হইতে বসিয়াছে। ফ্রয়েড বিজ্ঞানের পক্ষ লইয়া ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষকে পুনঃ পুনঃ সতর্ক হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধর্ম মানসিক রোগ বিশেষ

ধর্মভাব একটি মানসিক রোগ বিশেষ অথবা ঐ রোগের বিকৃত প্রকাশ। উন্মাদ রোগীর ন্যায় ধার্মিক লোকও ধর্মের ছদ্মবেশে শৈশবের কতগুলি অতৃপ্ত ও অবদমিত বাসনার পরিতৃপ্তি সন্ধান করে। প্রকৃত লক্ষ্যবস্তু পিতামাতাকে হারাইয়া সেই অভাব পূর্ণ করিতে চায় তাঁহাদের শূন্য আসনে কল্পিত ঈশ্বরকে বসাইয়া এবং তাঁহাদের প্রতি পরস্পর বিরোধী ইচ্ছাগুলি মিটাইতে চায় ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া। মূলতঃ শৈশবের যৌন-বাসনাই ধর্মভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। শুধু তাহাই নয়। ভক্ত তাহার এই অলীক ও কল্পিত ঈশ্বর এবং তাঁহার প্রতি মনোভাব বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করে অথবা এইরূপ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং ধর্ম আবেশিক বায়ুরোগের অনুরূপ।

ধর্মের উপরোক্ত স্বরূপ বিশ্লেষণ শুধু যে ব্যষ্টি সম্বন্ধে সত্য তাহা নয়, উপরন্তু সমষ্টি সম্বন্ধেও সমান সত্য। ইহা একটি সমষ্টিগত ভ্রম বা সত্যাভাস। অবশ্য একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে এই ভ্রম মানুষের কিছু উপকারও করে। ধর্ম ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছাগুলিকে চরিতার্থ করিয়া বহুলোককে উন্মাদরোগের হাত হইতে রক্ষা করে। কিন্তু ধর্ম সমষ্টি জীবনের উপর যে অসীম অপ-প্রভাব বিস্তার করে অথবা উহার ক্ষতি সাধন করে তাহার তুলনায় ব্যক্তিগত জীবনের এই উপকার নিতান্তই তুচ্ছ।

সুতরাং ধর্মসম্বন্ধে ফ্রয়েড এর সংক্ষিপ্ত প্রতিপাদ্য এই :—

ধর্মের মূল উৎস ইডিপাস্ গূঢ়ৈষা। ফ্রয়েড এর নিজস্ব ভাষার বঙ্গানুবাদ অনুসারে "ইডিপাস্ গূঢ়ৈষাই ধর্ম, নীতিবিদ্যা, সমাজ ও কলা'র আরম্ভ ও মিলনক্ষেত্র।" এই মন্তব্যের প্রথম ভিত্তি হইল তাঁহার মনঃসমীক্ষণলব্ধ গবেষণার ফল, দ্বিতীয় ভিত্তিটি সফক্লিস্ প্রণীত ইডিপাস্ উপাখ্যান এবং তৃতীয় ভিত্তিটি হইল ডারুইন্ বর্ণিত আদিম যৌথগোষ্ঠির জীবনপ্রণালী ও বংশপরম্পরাক্রমে উত্তরাধিকার সূত্র অনুসারে উহা সংক্রামিত হওয়া।

আবার ধর্মভাবের মূলে রহিয়াছে দ্বন্দ্বমূলক ইচ্ছা—শ্রদ্ধা ও ঘৃণা। এই শ্রদ্ধা ও ঘৃণার ঘাত-প্রতিঘাত হইতে উৎপন্ন হয় অপরাধবোধ বা সেন্স অফ্ গিল্ট। অপরাধবোধের মুখ্য কারণ হইল পিতৃহত্যা এবং মাতৃগমন অথবা এই দুইকার্য্যের প্রতি ইচ্ছা। অপরাধবোধ হইতে ত্রাণ পাইবার উপায়স্বরূপই ঘটে ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতি অথবা আত্মসমর্পণ।

তৃতীয়তঃ, টটেম্ ধর্মই সকল ধর্মের প্রতীক ও মূল আদর্শ। আদিম যৌথজীবন কেন্দ্রীভূত হইত ঐ সম্প্রদায়ের প্রতীক রূপে গৃহীত কোনো পশু অথবা বৃক্ষাদিতে। ঐ প্রতীক অবধ্য এবং ঐ প্রতীকের উপাসক সম্প্রদায়ভুক্ত যে কোনো স্ত্রী অগম্যা। অবশ্য "টটেম্ উৎসবে" ঐ প্রতীককে হত্যা করিয়া আহার করাও টটেম্ ধর্মের একটি মুখ্য অঙ্গ। টটেম্ ধর্মের মূলেও রহিয়াছে ইডিপাস্-মূলক পরস্পর বিরোধী শ্রদ্ধাঘৃণাত্মক ইচ্ছাদ্বয়। ফ্রয়েড এর মতে সকল ধর্মকেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে টটেম্ ধর্মের মূল সূত্র ও আদর্শ অনুসারে।

ঈশ্বর পিতামাতার প্রতিভূ বা প্রতিনিধি, অথবা ফ্রয়েড এর ভাষায় 'প্যারেন্ট সারোগেট'। তিনি মহিমান্বিত পিতামাতা ভিন্ন অপর কেহ নহেন। পিতামাতার প্রতি শরণাগতির বাসনাই সকল ধর্মভাবের বীজ। সুতরাং যে কোনো ধর্ম অনুষ্ঠানকে বুঝিতে হইবে সন্তান ও পিতামাতার সম্বন্ধকে ভিত্তি করিয়া।

ঈশ্বর ও ভক্তের অথবা উপাস্ত-উপাসকের সম্বন্ধ পিতামাতা ও সন্তানের সম্বন্ধের প্রতিকল্প বা সাব্ষ্টিটিউট্। পিতামাতার প্রতি সন্তানের শরণাগতি বা আত্মসমর্পণের কারণ হইল সন্তানের অসহায়তাবোধ। ধর্মভাবের মূলেও রহিয়াছে মানুষের একান্ত অসহায়তাবোধ।

ধর্মভাব শৈশবে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবার প্রয়াস মাত্র। সুতরাং ধর্মভাব উন্নতির পরিবর্তে অবনতির সূচনা করে। ধর্মভাব পিতামাতার প্রতি শিশু-মনোভাবের পুনরাবর্তন। ইহা সাবালক বা পরিণত মনুষ্যত্বলাভে অক্ষমতার পরিচায়ক। পরিণত মনুষ্যত্বের দায়িত্ব এড়াইবার আকাঙ্ক্ষাই ধর্মভাবের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। ধর্মের আশ্রয় লওয়ার আসল অর্থ হইল জীবনসংগ্রামে পরাজয় স্বীকার। সুতরাং আরও বলা যায় যে ধর্মভাব মানুষের অতীতকেন্দ্রিকতাজ্ঞাপক। রূঢ় বাস্তবের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারেনা বলিয়াই মানুষ চায় তাহার দীর্ঘপরিত্যক্ত অতীত শৈশব অবস্থায় স্থাণুবৎ থাকিয়া যাইতে। অথবা এই অবস্থায় কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকার ফলেই মানুষ ধর্মভাবের আশ্রয় গ্রহণ করে। নিয়ত পরিণাম ও প্রগতিশীল পৃথিবীতে ধর্ম মানুষকে কতগুলি স্থির ও সনাতন বিশ্বাসে সীমাবদ্ধ করিয়া আত্মসন্তুষ্ট অবস্থায় রাখে। ধর্ম উন্নতির অন্তরায়।

ধর্মভাব পুরাপুরিভাবে মানসিক রোগ না হইলেও উহার বিকারবিশেষ। ইহা আবেশিক বায়ু অথবা অব্সেশন্যাল্ সাইকোনিউরসিস এর অনুরূপ। এই রোগের অভিক্ষেপ বা প্রোজেকশন্ই ধর্মের মূল অবলম্বন। ধর্মভাবের সহিত আবেশিক বায়ুর লক্ষণগুলির বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে। উহারা উভয়েই দ্বন্দ্ব-ইচ্ছামূলক, উভয়েই নির্জ্ঞান মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, উভয়েই 'ইচ্ছা অথবা চিন্তার সর্বময়ত্ব' অথবা 'ওম্নিপোটেন্স অফ্ থট্' আছে, উভয়েরই উৎপত্তি শৈশবের ধারণারাশি হইতে, উভয়েই শৈশবের এই ধারণা এবং ইচ্ছাগুলি অবদমিত ও বিস্মৃত হয় এবং উভয়েই কামধর্ম বা সেক্স্যুয়্যালিটি ও তাহার অন্তর্গত পীড়নধর্মযুক্ত হইয়া থাকে।

ধর্ম একজাতীয় অধ্যাস, ভ্রম বা ইলিউসন্। এই ভ্রম শুধু ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহা সমষ্টিগত ভ্রম বা মাস্ ডিলিউসন্ ও বটে। শুধু যে ব্যক্তিই ধর্মের মিথ্যা বিশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া জীবন কাটাইয়া দেয় তাহা নহে। পরিবার, সমাজ, জাতি এমন কি রাষ্ট্রও ধর্মের মিথ্যা আশ্রয় দুর্গে সীমাবদ্ধ থাকে।

ধর্ম ভ্রম, কারণ ইহা পিতামাতার কল্পিতরূপকেই বা 'ফাদার-ইম্যাগো'কে বাস্তব

ঈশ্বর বলিয়া ভ্রম করে এবং পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ঘৃণা মিশ্রিত মনোভাবকেই ঈশ্বরীয় ভাব অথবা ধর্মভাব বলিয়া ভ্রম করে।'

ধর্মভাবকল্পিত ঈশ্বরকেই মানুষ আঁকড়াইয়া ধরে সংসার-সমরাঙ্গনের একটি আশ্রয়দুর্গ হিসাবে। বাস্তব জীবনসংগ্রামে পরাজয়ের দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইয়া পরম সুখ লাভ করিবার জন্য মানুষ এমন একটি আশ্রয় চায় যাহা হইতে সে কখনও স্থানচ্যুত হইবে না। কিন্তু তাহার এই আশাও আত্মপ্রবঞ্চনারই নামান্তর।

কিন্তু ধর্মভাবের উপরোক্ত দোষগুলি প্রায় সবই নিষেধমুখী। ধর্ম কোনো নিশ্চিত বা পজিটিভ্ অনিষ্ট করে কি?

ধর্ম কোনো সদর্থক বা নিশ্চিত অনিষ্ট করে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে ধর্ম অবশ্যই এইরূপ অনিষ্ট করিয়া থাকে। ধর্ম মানুষকে বাস্তববিমুখ করিয়া তোলে। ধর্মের আশ্রয় লইয়া মানুষ কল্পনাকেন্দ্রিক হইয়া ওঠে। এইরূপে ধর্ম বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত করে। নিজ সীমাবদ্ধ কেন্দ্রের বাহিরে যে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড পড়িয়া আছে ধর্ম মানুষকে উহার প্রতি অন্ধ ও অজ্ঞান করিয়া রাখে।

তাহা হইলে কি ধর্মভাব একটি অবিমিশ্র অভিশাপ বিশেষ? ইহার স্বপক্ষে কি কিছুই বলিবার নাই?

এই প্রশ্নের উত্তরে ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন ধর্মভাব অবিমিশ্র অভিশাপ নয়। ইহার একটু আশীর্বাদ বা কল্যাণও রহিয়াছে। ধর্ম সমষ্টিগতভাবে বহু লোকের অনিষ্ট সাধন করে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম অনেক লোককে পুরাপুরি উদ্বায়ুরোগ বা নিউরোসিস্ হইতে রক্ষা করে। অনেক লোক ধর্মভাবের আশ্রয় লইয়া এই রোগের পূর্ণ আক্রমণ হইতে নিস্তার পায়। ইহাদের ধর্মভাব কাড়িয়া লইলে ইহাদিগকে হয়ত উন্মাদ আশ্রম বা মানসরোগের আরোগ্যশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

ফ্রয়েডীয় ধর্মমতের সমালোচনা

এইবার ফ্রয়েডীয় ধর্মমতের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করা যাউক।

প্রথমেই সপ্রশংসভাবে স্বীকার করতে হয় যে ফ্রয়েড্ এর বলিষ্ঠ এবং সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি মানুষের অন্ধবিশ্বাসের কাছে সঙ্কীর্ণ মনে হইলেও যে কোনো বুদ্ধিজীবীর পক্ষে অনুকরণীয়। ফ্রয়েড্ অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বিচারবুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ ফ্রয়েড প্রদর্শিত সকল ত্রুটিগুলিই যে অধিকাংশ লোকের ধর্মভাবে রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্মকে দুর্বলতার আবরণরূপে অবলম্বন করিবার মত লোকের অভাব নাই। নিতান্ত অধার্মিক ও হীনচরিত্র ব্যক্তিও ধর্মের ভাণ করিয়া নিজ দুর্বলতাকে ঢাকিয়া রাখে। অনেক তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিই বাধ্য হইয়া অথবা অবস্থাচক্রে ধার্মিক সাজিয়া চলে। ধর্ম তাহাদের কপটতার ছদ্মবেশ মাত্র। বহু ধার্মিকই বস্তুতঃ বকধার্মিক। অনেক ধার্মিক ব্যক্তির ধর্মানুশীলন বা ধর্ম উন্মাদনা স্নায়বিক দৌর্বল্য বা উন্মায়ুপ্রসূত। লেখক স্বয়ং বহু উন্মায়ুরোগীর আচার-ব্যবহারে এমন ধর্মভাব লক্ষ্য করিয়াছেন যাহা দেখিয়া ধর্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রই তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবিষ্ট হইতে পারেন।

সুতরাং যাহারা ধর্মের নামে কতগুলি দুর্বলতা ঢাকিয়া রাখে সেই ছদ্মবেশিগণের কপটতা প্রকট করিয়াছেন ফ্রয়েড্।

কিন্তু উপরোক্ত সপ্রশংস স্বীকার সত্ত্বেও ফ্রয়েড্ যে ধর্মভাবের প্রতি অবিচার করিয়াছেন তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই অবিচারের বিচারচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ইডিপাস্ গূঢ়ৈষাকে ধর্মের ভিত্তি মনে করা অসঙ্গত

ইডিপাস্-গূঢ়ৈষাই ধর্মভাবের মূল উৎস এই ফ্রয়েডীয় উক্তির সংক্ষিপ্ত বিচার করা

ফ্রয়েড্ সফক্লিস্ এর ইডিপাস্ উপাখ্যানটি অবলম্বন করিয়াছেন। এই উপাখ্যান সুবিদিত। সুতরাং ইহার পুনরবতারণা নিষ্প্রয়োজন। ফ্রয়েড ইডিপাস্ কাহিনীর সারমর্মকে সম্পূর্ণভাবে শিশুর বাস্তব মনোভাবের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন অথবা শিশুর মনোভাবের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন এই কাহিনীটিকে। তাঁহার এইরূপ প্রয়োগ বা ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কিনা অথবা হইলে কতটুকু হইয়াছে তাহা বিচার্য্য।

ফ্রয়েড অবশ্য বলিতে পারেন যে তাঁহার ইডিপাস্-গূঢ়ৈষা তাঁহার নিজস্ব গবেষণার ফল। এই গবেষণা তাঁহার উদ্ভাবিত অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতি বা "ফ্রী অ্যাসোসিয়েশন্ মেথড্" এর উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই পদ্ধতি শিশুর উপর প্রয়োগ করা অসম্ভব, অথচ ইডিপাস্ গূঢ়ৈষার মূল নিহিত থাকে প্রথম শৈশব অবস্থায়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরাই অবাধ ভাবানুষঙ্গ পদ্ধতির নিয়ম অনুসারে মনঃসমীক্ষকের সহিত সহযোগিতা করিতে

পারে। সুতরাং ইহারাই ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি অনুযায়ী মনঃসমীক্ষিত হইবার উপযুক্ত পাত্র।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ইডিপাস্ গূঢ়ৈষার বীজ প্রাথমিক শৈশব জীবনে নিহিত থাকিলেও ঐ জীবনের প্রত্যক্ষ মনঃসমীক্ষণ হইতে ইহা জানা যায় নাই। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির অবাধ-ভাবানুষঙ্গে'র উপাদান হইতেই শিশুর ইডিপাস্ গূঢ়ৈষার অনুমান করা হইয়া থাকে। তারপর শিশুর আচরণ লক্ষ্য করিয়া এই অনুমিত গূঢ়ৈষার সহিত সামঞ্জস্য আবিষ্কৃত হয় এবং এইরূপে ইহা পরীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, এই গূঢ়ৈষাটিকে স্বীকার করিয়া লইলে মানস রোগ বোধগম্য এবং সহজচিকিৎস্য হইয়া থাকে। কিন্তু ফল দেখিয়া কারণের অনুমান যে অনেক সময় ভ্রান্ত হইতে পারে সেই সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। কারণটি একেবারেই অমূলক অথবা অংশতঃ অযথার্থ হইতে পারে।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অবাধ ভাবানুষঙ্গের ভিত্তিতে শৈশবকালীন ইডিপাস্ গূঢ়ৈষা অনুমান করিবার আরও দোষ রহিয়াছে। এই ব্যক্তির শৈশবস্মৃতি কল্পনাদুষ্ট হওয়া সম্ভব। সুতরাং শৈশবস্মৃতির ভিত্তিতে ইডিপাস্ গূঢ়ৈষার অনুমান নির্ভুল নাও হইতে পারে। ফ্রয়েড অবশ্য বলিতে পারেন যে অবাধ-ভাবানুষঙ্গ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সুতরাং ইহাতে কল্পনার অবকাশ নাই। ভাবনা প্রবাহে মনকে শিথিলভাবে ছাড়িয়া দিলে অতীত জীবনের সকল স্মৃতিগুলি বাস্তব পৌর্বাপর্য্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মনে ভাসিয়া ওঠে। এইরূপে ভাবনার প্রবাহ শেষ হয় শৈশবের প্রথম সজ্ঞান মুহূর্তে।

সে যাহা হউক, ফ্রয়েড্ প্রদর্শিত উপরোক্ত যুক্তিগুলি যদি অভ্রান্ত হইয়া থাকে তাহা হইলেই সফক্লিস্ এর উপাখ্যান অনুসারে এই গূঢ়ৈষার নামকরণ যুক্তিযুক্ত, নতুবা অযৌক্তিক। তিনি বলেন যে শিশুর ইডিপাস্ গূঢ়ৈষা প্রমাণিত হয় উহার পীড়নধর্মী স্বভাব হইতে। শিশু পীড়নধর্মী সন্দেহ নাই। কিন্তু এই পীড়নধর্মটি যে পিতামাতার প্রতিই শুধু প্রযুক্ত হইবে এমন কথা নাই। ইহা যে কোনো বস্তু শিশুকে পীড়া দেয় তাহার প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ফ্রয়েড তাঁহার ইডিপাস্ গূঢ়ৈষা মতবাদের স্বপক্ষে সফক্লিস্ এর উপাখ্যানটিকে পর্য্যাপ্ত প্রমাণ বলিয়া মনে করেন নাই। সুতরাং ইহার সমর্থনে তাঁহাকে এতদ্-তিরিক্ত প্রমাণ উত্থাপিত করিতে হইয়াছে। ইডিপাস্ এর - সূত্র টানিয়া ফ্রয়েড উহাকে লইয়া গিয়াছেন ডারুইনীয় আদিম যৌথ জীবনের মতবাদে। ডারুইন্ এর এই মতবাদ একটি মতবাদ হিসাবে যে নিতান্তই কাল্পনিক তাহা তাঁহার এই যৌথ জীবনের বিবরণ

হইতেই প্রতীয়মান হইবে। এই আদিম যৌথ গোষ্ঠীর পিতা দেখিলেন যে তাঁহার পুত্রেরা সাবালক হইয়া স্ত্রীদের প্রতি আসক্ত হইতে পারে। এই আশঙ্কায় পরিণত পুত্রদের প্রতি ঈর্ষান্বিত পিতা উহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া দল হইতে বিতাড়িত করিলেন। ফ্রয়েড এর ভাষায়, "একদিন বিতাড়িত ভ্রাতৃগণ দলবদ্ধ হইয়া পিতাকে হত্যা এবং ভক্ষণ করিল এবং এইরূপে পিতৃ-গোষ্ঠীকে নির্মূল করিল।" ফ্রয়েড্ আরও বলিতেছেন, যে ভ্রাতৃদল শুধু যে পিতাকে ঘৃণাই করিত তাহা নয়, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত এবং শ্রদ্ধাও করিত। সুতরাং, ফ্রয়েড্ এর ভাষায়, তাঁহাকে অপসৃত করিয়া এবং তাঁহার সহিত একাত্ম হইবার বাসনা পূর্ণ করিয়াই তাহাদের কোমল বৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করিল।" এইরূপে ইডিপাস্ গূঢ়ৈষা উভয় বল বা অ্যাম্বিভ্যালেণ্ট্ ঘৃণা ও শ্রদ্ধা প্রধান সাংস্কৃতিক গঠনের-যেমন কাব্য; সাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতির মূল ভিত্তি হইয়া দাঁড়ায়।

ডারুইন্ এর আদিম যৌথগোষ্ঠীর কল্পনা তাঁহার যান্ত্রিক পরিণামবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই যান্ত্রিক মতবাদ যে সর্বাংশেই যুক্তিযুক্ত তাহা স্বীকার করা যায় না। তাহা ছাড়া, যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাকে অথবা অতীতকে ঘটনা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইলেও, সেই অতীতের আদর্শেই সে বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎকে বুঝিতে হইবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। ফ্রয়েড এই যান্ত্রিক কার্য্যকারণবাদকেই গ্রহণ করিয়া উহার দোষগুলিকেও মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন।

উপরন্তু ফ্রয়েড এর মতে ডারুইনীয় আদিমযৌথজীবনলব্ধ ইডিপাস্ গূঢ়ৈষাটি যে উহাতেই সীমাবদ্ধ তাহা নয়। ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে ঐ আদিম ইডিপাস্ গূঢ়ৈষা একটি অভিজ্ঞতালব্ধ ইচ্ছা হইলেও, উহা উত্তরাধিকার সূত্রে পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এইরূপ একটি অভিজ্ঞতালব্ধ ইচ্ছা কিরূপে উত্তরাধিকারসূত্র অনুসারে পরবর্তী পুরুষে সংক্রামিত হইল তাহা দুর্বোধ্য। অথচ এই মূল কথাটি স্বীকার না করিলে সমগ্র ফ্রয়েডীয় মতটি অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ফ্রয়েড ইহাকে বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইয়াছেন। আবার ফ্রয়েড মতাবলম্বী মনঃসমীক্ষকগণও এই বিষয়ে ফ্রয়েড এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। যেমন, প্রসিদ্ধ ভারতীয় মনঃসমীক্ষক ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ও কুণ্ঠাহীনভাবে এই মত স্বীকার করিয়াছেন।

কিন্তু অভিজ্ঞতালব্ধ এই ইডিপাস্ গূঢ়ৈষাটি হ্বাইস্‌ম্যান্ সমর্থিত জার্মপ্লাজম্ মতবাদ অনুসারে কিছুতেই উত্তরাধিকারসূত্রে পুরুষানুক্রমিকভাবে সংক্রামিত হইতে পারেনা। আধুনিক বিজ্ঞানী মহলে হ্বাইস্‌ম্যান্ এর মতই অধিক গ্রাহ্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। মোটের উপর দেখা যাইতেছে যে ফ্রয়েডীয় ইডিপাস্ গূঢ়ৈষার ভিত্তি দৃঢ় নয়, কিন্তু দুর্বল।

এইরূপ দুর্বল ভিত্তির উপর ধর্মভাব এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক গঠনকে প্রতিষ্ঠিত করা অসঙ্গত। ধর্মভাব এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির যাথার্থ্য যাহাই হউক না কেন, ইহারা যে বাস্তব ঘটনা তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই বাস্তব ঘটনাকে কাল্পনিক ইডিপাস্ গূঢ়ৈষার উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না।

টটেম্ ধর্ম সকল ধর্মের মূল নয়

ফ্রয়েড টটেম্ ধর্মকেই সকল ধর্মের মূল ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু টটেম্ ধর্মকে আদিম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। সকল ধর্মের ভিত্তি হিসাবে টটেম্ ধর্মকে স্বীকার করা যায় না। টটেম্ ধর্ম ধর্মবিকাশের সার্বভৌমস্তর হইলে টটেম ধর্মীয় স্তরকে অতিক্রম না করিয়া কোনো ধর্মই বিকাশ লাভ করিত না। অথচ রবার্টসন্ স্মিথ, এফ. বি. জেভন্স, ই-ডার্কহাইম প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের দ্বারা ব্যাখ্যাত এবং ফ্রয়েড সমর্থিত এই মতটি মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই মতের উগ্র সমর্থক ডার্কহাইম এর বিরুদ্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে কোনো কোনো ধর্ম টটেম স্তরকে অতিক্রম না করিয়াই বিকাশ লাভ করিয়াছে। জেভন্স স্বয়ং একটি প্রাক্-টটেম স্তরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং এইটিকেও ধর্ম বলা যায় কিনা সেই বিষয়ে তিনি সন্দেহ পোষণ করেন। অবশ্য টটেম স্তরটি যে মানুষের "আদিম সামাজিক গঠন" এই বিষয়ে তাঁহার কোনো সন্দেহ নাই।

আবার, আদিম ধর্ম হিসাবে স্পিরিটিজম্ এবং অ্যানিমিজম এর স্থানও উড়াইয়া দেওয়া যায়না। সুতরাং আদিম ধর্ম হিসাবে টটেমিজম্ এর দাবী যে সুপ্রতিষ্ঠিত নয় তাহা সুনিশ্চিত। অ্যানিমিজম্ বা সর্ব-প্রাণ-বাদ অথবা তৎপূর্ববর্তী কোনো প্রাক্-সর্ব প্রাণবাদী স্তর বা প্রি-অ্যানিমিষ্টিক ষ্টেজ অনেকের মতেই টটেম ধর্মের তুলনায় অধিকতর আদিম। কেহ কেহ বা টটেমিজম্ এবং অ্যানিমিজম্ এই উভয়ের কোনোটিকেই আদিমতম স্থান না দিয়া স্পিরিটিজম বা সর্বাত্মবাদকেই আদিমতম স্থান দিয়া থাকেন। মোটের উপর ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে আদিম ধর্ম হিসাবে টটেম ধর্মের স্থান বিশেষভাবে সন্দিগ্ধ। সুতরাং টটেম ধর্মকে সকল ধর্মের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ ফ্রয়েডের পক্ষে খুবই অসমীচীন হইয়াছে সন্দেহ নাই।

ঈশ্বর পিতা-মাতার প্রতিভূ নহেন

ঈশ্বর পিতামাতার প্রতিভূ বা "ফাদার-সারোগেট", ফ্রয়েড এর এই মতও সম্পূর্ণ-ভাবে স্বীকার করা যায় না। পিতামাতা শিশুর অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও করুণা

প্রাপ্তির ক্ষুধা মিটাইতে পারেন না। তাহার সর্বান্তর্ভাবী ভূমাস্পৃহাকে মিটাইবার জন্যই শিশু ঈশ্বর কল্পনা করে এই ফ্রয়েডীয় উক্তি মানিয়া লইলেও ইহা স্বীকার করা যায় না যে ঈশ্বর সর্বতোভাবে পিতামাতার প্রতিভূ। পিতামাতার প্রতিভূই যদি ঈশ্বর হইবেন তবে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান এবং সর্বকরুণাধার ঈশ্বরের কল্পনা অযৌক্তিক হইয়া দাঁড়াইত। এমন হইতে পারে যে যে অভাব পিতামাতা মিটাইতে পারেন নাই সেই অভাব মিটাইবার জন্যই ঈশ্বর কল্পনা। এইরূপ ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে পিতামাতার প্রতিভূ বলা যে অসঙ্গত তাহা স্পষ্ট।

পিতামাতার নিকট অভীপ্সীত ইচ্ছাগুলি অপূর্ণ থাকিয়া যাইবার জন্যই ঈশ্বর কল্পিত হন এই মত স্বীকার করিতে হইলে এইভাবে স্বীকার করিতে হইবে। শিশুর ঈশ্বরপ্রয়োজন প্রথম স্তরে অনুভূত হইয়াছিল পিতামাতাকে অবলম্বন করিয়া, কারণ পিতামাতাই শৈশব অবস্থার সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। কিন্তু কালক্রমে শিশু যখন বুঝিতে পারিল সে তাহার সর্বময় ইচ্ছা বা ওমনিপোটেন্স অফ্ থট্ পিতামাতার দ্বারা পূর্ণ হইবার নয় তখন সে পিতামাতার অবলম্বন ছাড়িয়া গ্রহণ করিতে চাহিল এইরূপ একটি অবলম্বন যাহা বাস্তবিকই সর্বময় এবং যাহাই একমাত্র তাহার সর্বান্তর্ভাবী ইচ্ছাকে পূর্ণ করিতে পারে।

অর্থাৎ শিশুর চিন্তার সর্বময়তা প্রমাণ করে যে তাহার মধ্যে একটি সহজাত ভূমা-বোধ রহিয়াছে। শিশুর মনোবিকাশের প্রথম স্তরে এই ভূমাবোধ সার্থক হইতে চায় তাহার একান্ত নির্ভরস্থল পিতামাতাকে অবলম্বন করিয়া। কিন্তু তাহার মনোবিকাশের উন্নততর স্তরে সে বুঝিতে পারে যে পিতামাতা তাহার ভূমাবোধকে পরিতৃপ্ত করিবার যোগ্য স্থল নহেন। এই ব্যর্থতাবোধের ফলেই তাহার ভূমাবোধ পরিচালিত হয় ঈশ্বরের প্রতি। সুতরাং পিতামাতার প্রতি শিশুর নির্ভর-ভাবটি ঈশ্বরলক্ষ্যে পৌঁছিবার সেতু এবং মধ্যবর্তী অবস্থা।

লেখকের এইরূপ দুঃসাহসিক ফ্রয়েড-সমালোচনা যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা বিচার করিবার ভার রহিল ধীমান পাঠকের উপর।

শিশু পিতামাতা এবং ভক্ত ঈশ্বর সম্বন্ধ

সুতরাং ভক্ত ও ঈশ্বরের সম্বন্ধটিও শিশু-পিতামাতা সম্বন্ধের প্রতিকল্প নহে, যদিও এতদুভয়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। যদি ভক্ত-ঈশ্বর সম্বন্ধটি শিশু-পিতামাতা সম্বন্ধের প্রতিকল্প বা সাব্‌স্টিটিউট্ই হইত তাহা হইলে প্রথমটি দ্বিতীয়টির তুলনায় দিব্য ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিত না। ভক্ত যেমন ঈশ্বরের সম্পর্কে নিজ অসহায়তা বোধ

করেন তেমন নিজকে শক্তিমান বলিয়াও অনুভব করিয়া থাকেন। অসহায়তা বোধ চিরতরে দূর করিয়া স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ হওয়াই ধর্মভাবের মুখ্য লক্ষ্য। ভক্ত-ঈশ্বর সম্বন্ধ যদি শিশু-পিতামাতা সম্বন্ধের প্রতিকল্প হইত, তাহা হইলে দ্বিতীয়টির মত প্রথমটিও বিচ্ছিন্ন হইত। কিন্তু ইহা যখন বিচ্ছিন্ন হয় না তখন বুঝিতে হইবে যে এই দুই সম্বন্ধ কিয়দংশে সদৃশ হইলেও অনেকাংশে বিসদৃশও বটে।

ভক্ত-ঈশ্বর সম্বন্ধ মূল শিশু-পিতামাতা সম্বন্ধের উদ্গতি হইতে পারে। অথবা ভক্ত-ঈশ্বর সম্বন্ধ যে ভূমাস্পৃহার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা শিশুর অপরিণত অবস্থানুযায়ী পিতামাতাতে সীমাবদ্ধ থাকিয়া তাহার পরিণতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে অসীম লক্ষ্যে প্রসারিত হয়।

ধর্মভাব শৈশবে প্রত্যাবর্ত্তন মাত্র নয়

আবার ধর্মভাবকে শৈশবে প্রত্যাবর্তন বা রিগ্রেশন্ বলা চলে না। মানুষের সমগ্র সত্তা প্রগতির নিয়ম অনুসারে নিয়ত পরিণামশীল, অথচ কতগুলি নির্জ্ঞান ইচ্ছা স্থাণুবৎ অচল অবস্থায় অবস্থান করিতেছে এমন হইতে পারেনা। অথচ ফ্রয়েড্ যেন মনে করেন যে শৈশবের অবদমিত ও নির্জ্ঞান ইচ্ছা অবিকৃতভাবে অথবা বহুবহু একই প্রকারে থাকিয়া যায় এবং ধর্ম প্রভৃতি মনোভাবের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পরিণামবাদ অথবা থিওরি অফ্ এভল্যুশন্ যদি সত্য হয় তাহা হইলে মনের নিত্যচঞ্চল রূপটি এইরূপ অচঞ্চল বা স্থিররূপে থাকিতে পারে কিনা সন্দেহ। এমন কি, শৈশবের নির্জ্ঞান ইচ্ছাও অবশ্যই পরিবর্তিত হইতেছে। এমন হইতে পারে যে এই পরিবর্তন সংজ্ঞান মনের পরিবর্তনের মত সহজবোধ্য নয়।

ফ্রয়েড্ও স্বীকার করিয়াছেন সে নির্জ্ঞান ইচ্ছা নিষ্ক্রিয় নয়, কিন্তু সর্বদা কর্মতৎপর। উহারা, তাঁহার মতে নিয়তই আত্মপ্রকাশে সচেষ্ট থাকে। কিন্তু স্থাণুবৎ অবস্থানশীল ইচ্ছার কর্মতৎপরতা অর্থহীন। সুতরাং মনে হয় যে শৈশবের নির্জ্ঞান ইচ্ছাগুলি স্থির ও অচলভাবে অবস্থান করেনা, কিন্তু উহারাও পরিবর্তিত হয়। কাজে কাজেই, ধর্মভাব শৈশব অবস্থায় প্রত্যাবর্তন ছাড়া কিছু নয়, যুক্তির খাতিরে এমন মত মানিয়া লইলেও, ইহাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে শৈশব অবস্থাটি পূর্ববৎ অজড় ও অনড় হইয়া বসিয়া থাকে না। সুতরাং যে শৈশব অবস্থায় প্রত্যাবর্তনকে ফ্রয়েড ধর্মভাবের একটি প্রধাণ লক্ষণ বলিয়াছেন, তাহা অতীতে পরিত্যক্ত শৈশব অবস্থামাত্র নয়, কিন্তু শিশুর সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন বা পরিণামের সহিত পরিবর্তিত অন্যরূপ অবস্থা।

অর্থাৎ, ধার্মিক ব্যক্তি শৈশব অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহিলেও এই আকাঙ্ক্ষা, পূর্ণভাবে পূরণীয় হইতে পারে না।

ধর্মভাব শুধু অতীতকেন্দ্রিক নয়

অতএব ধর্মভাবকে অতীতকেন্দ্রিক এবং বর্তমানবিমুখও বলা যাইতে পারেনা। প্রথমতঃ অতীতে ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব, যেহেতু অতীত চুপ করিয়া বসিয়া নাই। অতীতের তথাকথিত স্থির সত্তার মধ্যে নিয়ত পরিবর্তন চলিতেছে। দ্বিতীয়তঃ ধর্মবোধের মত একটি পুরুষার্থ বা মূল্যবোধকে শুধু অতীতের মানদণ্ডে বিচার করা অসঙ্গত। ধর্মভাব অতীতের সহিত সম্বদ্ধ সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার আসল মর্ম নিহিত থাকে ভবিষ্যতে। ধর্মভাবের লক্ষ্যস্থল হইল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। ইহার এই উদ্দেশ্যাভিমুখিনতা অঙ্গুলি নির্দেশ করে ভবিষ্যতের দিকে। অর্থাৎ ধর্মভাবকে বুঝিতে হইলে অতীত শৈশব অবস্থাকে যেমন উহার অন্যতম কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তেমনই যে উদ্দেশ্য বর্তমান দুরবস্থা অতিক্রম করিরা ভবিষ্যতে সার্থক হইতে সচেষ্ট তাহাকেও উহার অন্যতম কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

ধর্ম আবেশিক বায়ুর ব্যঙ্গচিত্র নয়

ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন যে ধর্ম অবসেশন্যাল্ সাইকো-নিউরসিস্ অথবা আবেশিক বায়ুর একপ্রকার ব্যঙ্গচিত্র বা কেরিকেচার। অবশ্য ধর্ম এবং আবেশিক বায়ু একই বস্তু এইরূপ কোনো বক্তব্য ফ্রয়েড্ এর অভিপ্রেত নয়। ফ্রয়েড্ এমন বলেন নাই যে ধর্ম একটি আবেশিক বায়ুবিশেষ। এই দুইটিকে এক বা অভিন্ন বলিয়া মনে না করিলেও ফ্রয়েড্ উহাদিগকে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি 'জু' ধর্মের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করিয়া ঐ ধর্মের উৎপত্তির সহিত আবেশিক বায়ুর উৎপত্তির দুইটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রথমত, উভয়েরই সূত্রপাত হয় বাল্য শৈশব অবস্থার কতগুলি সংস্কার হইতে। দ্বিতীয়তঃ 'জু' ধর্ম এবং আবেশিক বায়ু এই উভয়ের মূলেই রহিয়াছে ঘাতমূলক অভিজ্ঞতা বা ট্রম্যাটিক এক্সপিয়েরিয়েন্স্। ফ্রয়েড্ তাঁহার পাঠকগণকে আরও স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে শৈশবের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যে সংঘটিত ঘটনা, ঐ ঘটনার বিস্মৃতি, উহার যৌনতা এবং যৌনতার সহিত সংশ্লিষ্ট ধর্ষকামিতা বা স্যাডিজ্ম্ আবেশিক বায়ু এবং ধর্মবিকাশের মৌলিক ভিত্তি।

কিন্তু ধর্মের উপরোক্ত ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ গ্রহণ করিবার পূর্বে প্রশ্ন এই যে ফ্রয়েড্ ধর্ম বলিতে কি বুঝিয়াছেন। ফ্রয়েড্ যে ধর্ম বলিতে শুধু কতগুলি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান, ভ্রান্তবিশ্বাস, ভ্রান্তদর্শণ, ভ্রান্তশ্রবণ ইত্যাদি বুঝিয়াছেন এইরূপ মনে হয়। ধর্মের এই বহিরঙ্গ দিকের সঙ্গে সঙ্গে উহার অন্তরঙ্গ দিক তিনি দেখিয়াছেন কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে।

তাহা ছাড়া, ফ্রয়েড্ ধর্মভাবের লক্ষণনিরূপণ করিয়াছেন মনোরোগিগণের বিশ্লেষণ সূত্রে। তিনি দেখিয়াছেন যে হিষ্টিরিয়া, অব্সেশন্যাল্ সাইকো-নিউরোসিস্, প্যারানয়য়া প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কতগুলি ধর্মীয় লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ধর্মভাব এবং উহার সহিত অনুষক্ত মানস রোগগুলির মূল কারণ অভিন্ন। কোনো যুক্তির সাহায্যেই এইরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যাইতে পারে না। সুস্থ, বলিষ্ঠ অথবা নীরোগ ব্যক্তিগণের ধর্মভাব অনুসন্ধান করিবার মত সুযোগ বা ইচ্ছা ফ্রয়েড্ এর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। অস্বভাবী ব্যক্তির বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ফ্রয়েডীয় ধর্মমত নির্ভরযোগ্য কিনা তাহা বুদ্ধিমান পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন।

আবেশিক বায়ু এবং ধর্মভাবের উৎপত্তিকেও অভিন্ন বলা যায়না। আবেশিক বায়ুরোগ উৎপন্ন হয় বাস্তবের সহিত অসামঞ্জস্য এবং তজ্জনিত শৈশবের কোনো অতীত অবস্থায় ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা হইতে। কিন্তু ধর্মভাবকে শৈশবে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা মাত্র বলা যায় না। এই বিষয়ের আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। বাস্তবের সহিত সামঞ্জস্য বিধানে অক্ষমতাকেও ধর্মের কারণ বলা যায় না। কারণ ধার্মিক ব্যক্তি সকল প্রকার বাস্তব অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম। তাহা ছাড়া, অর্থাৎ আবেশিক বায়ু এবং ধর্মের উৎসের অভিন্নতা স্বীকার করিলেও উহাদের মৌলিক পার্থক্য নিরূপিত হয় উহাদের সম্পূর্ণ পৃথক ফলের দ্বারা। আবেশিক বায়ুরোগীকে আরোগ্য-শালায় আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় রাষ্ট্র সমাজ ও পরিবারের কল্যাণের জন্য। কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। হয়ত তাঁহারই কল্যাণ প্রচেষ্টায় ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় আরোগ্যশালা। আবেশিক বায়ু এবং ধর্মভাবের আরও পার্থক্য এই যে প্রথমটি অবদমিত ইচ্ছার প্রতিক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ বা বিপথগামী পূরণ, কিন্তু প্রকৃত ধর্মভাব অবদমিত ইচ্ছার সাবলিমেশন্ অথবা উদগতি। সুতরাং ধর্মকে আবেশিক বায়ুর ব্যঙ্গচিত্র বলাও অসঙ্গত হইয়াছে।

ধর্ম শুধু ভ্রম নয়

ফ্রয়েড ধর্মকে ভ্রমপ্রত্যক্ষ, কল্পনা বা অধ্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ধর্মকে এইরূপ উড়াইয়া দিয়া ফ্রয়েড উহার প্রতি সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ধর্ম যদি ভ্রম, কল্পনা বা অধ্যাস হইত তাহা হইলে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের ধর্মভাবের মধ্যে মূলগত সাদৃশ্য থাকিত না। বলা যাইতে পারে যে ভ্রম শুধু ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে এমন নয়, কারণ জলমগ্ন সোজা লাঠির বক্রতা প্রত্যক্ষের মত সার্বজনীনও হইতে পারে এবং এইরূপ ভ্রমে দৈশিক ও কালিক একরূপতা বর্তমান থাকে। এইরূপ যুক্তি সমর্থনের উত্তরে দেখানো যাইতে পারে যে জগৎই একপ্রকার ভ্রম, সুতরাং একটি জাগতিক ব্যাপার হিসাবে ধর্ম যে ভ্রম হইবে তাহাতে বৈচিত্র্য কি। জগৎকে কল্পনা বা ভ্রম বলিয়া মনে করিলে ধর্মকে ঐরূপ মনে না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ফ্রয়েড বাস্তববাদী। জগৎকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করাই হয়ত তাঁহার ধর্ম সমালোচনার একটি উদ্দেশ্য।

সে যাহা হউক, ধর্মকে শুধু কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায়না। কল্পনার ফল একরূপ, কিন্তু ধর্মভাবের ফল অন্যরূপ। একটিতে সত্য আচ্ছন্ন হয়, অপরটিতে সত্য প্রকটিত হয়। ধর্ম যদি কল্পনাই হয়, তবে সেই কল্পনা সার্বভৌম অথবা বিশ্বজনীন। যে স্বপ্ন সকলেই দেখে, সেই স্বপ্ন কাহার? সেই স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া বিচার করিবে কে?

তাহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক হিসাবে ফ্রয়েড এর এইরূপ ধর্ম-সমালোচনা অসঙ্গত হইয়াছে। বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকিলেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুণ্ণ থাকিত। ধর্মের মূল্য বিচার অথবা উহার সত্যাসত্য নিরূপণ দার্শনিকের কাজ, মনোবিজ্ঞানীর নয়।

নিষ্কাম ধর্মানুশীলন সম্ভব

এই কথা সত্য যে মানুষ পরমশান্তি লাভ করিবার জন্যই ধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরে। কিন্তু নিষ্কাম ধর্মানুশীলনও যে সম্ভব তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অল্পে সুখ নাই। সুতরাং মানুষ ভূমালাভে সচেষ্ট হয়। মানুষের ভূমাবাসনা যে নিতান্তই কাল্পনিক ব্যাপার এইরূপ ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত। মানুষ অশান্ত ও দুর্বল। ইহা স্বীকার কারতে ফ্রয়েড্‌এর এমন প্রবল আপত্তি কেন? জীবন সংগ্রামে আঁটিয়া উঠিবার পক্ষে কি মানুষ বাস্তবিকই দুর্বল নয়? আর এই দুর্বলতা দূর করিবার একমাত্র উপায় বিজ্ঞান এইরূপ সংকীর্ণ দৃষ্টিও সমর্থনীয় হইতে পারে না। বিজ্ঞানের শক্তি সীমাবদ্ধ। আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানী কি একটি জিনিষও সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, না কোনোদিন পারিবেন?

বিজ্ঞানের অহঙ্কার মহা অনর্থের মূল। একটি বিশ্বজনীন অনুভূতি অথবা আইনষ্টাইন্এর ভাষায় কস্‌মিক ফীলিং, সকল বৈজ্ঞানিক কীর্তির মূল উৎস। প্রকৃতির নিকট হইতে প্রশ্নের উত্তর আদায় করা বা ইনটারোগেশন্ অফ্ নেচার যেমন বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য তেমনই অতিপ্রাকৃতের প্রতি শ্রদ্ধাও বিজ্ঞানের মনোভাব হওয়া উচিত। এইরূপ না হইলে বিশ্ব শক্তির পরীক্ষাক্ষেত্রে পরিণত হইয়া ধ্বংশের মুখে অগ্রসর হইবে।

ধর্ম বুদ্ধিকে পঙ্গু নাও করিতে পারে

ধর্ম মানুষের বুদ্ধিকে পঙ্গু করে, এই ফ্রয়েডীয় আপত্তিও স্বীকার্য্য নয়। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তির মন সংস্কারযুক্ত হইয়া বুদ্ধির গতিকে অপ্রতিহত করিতেও পারে। অবশ্য ধর্ম বলিতে যদি শুধু আনুষ্ঠানিক বা গতানুগতিক আচারনিষ্ঠাই বুঝায় তাহা হইলে ইহা যে বুদ্ধিকে ব্যাহত করিতে পারে তাহা সত্য। কিন্তু ধর্ম কথাটিকে এই সংকীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ করিবার কোনো কারণ নাই। যদি ধর্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধিকে ব্যাহত করিবার এই অভিযোগ সত্যও হয়, তাহা হইলেও এমন হইতে পারে যে এই দোষ ধর্মের নয়, কিন্তু ধর্মানুশীলনের। আবার বিজ্ঞানের বিরুদ্ধেও দোষ দেখানো যাইতে পারে যে ইহাতে বিজ্ঞানীর বুদ্ধি দর্শন বা ধর্মের প্রতি ব্যাহত হয়।

ধর্ম সমষ্টিগতভাবেও উপকার করিতে পারে

ফ্রয়েড্ বলিয়াছেন যে ধর্ম সমষ্টিগতভাবে বহু অনর্থের সূত্রপাত করিলেও বহুলোক ধর্মকে আশ্রয় করিয়া উদ্বায়ু হইতে রক্ষা পায়। এই সম্বন্ধ ফ্রয়েড এর এই অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তিকে মানিয়া লইয়া ইহাই বলিতে হয় যে ধর্ম যেমন ব্যক্তিগতভাবে মানুষের উপকার সাধন করিতে পারে, সমষ্টিগতভাবেও ইহা তেমনই উপকারপ্রসূ হইতে পারে। ধর্ম জাতিতে জাতিতে বিবাদ বিসংবাদ ঘটাইতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে ধর্মবুদ্ধি জাতিকে শান্তিপ্রিয় এবং আদর্শবাদী করিয়াও তুলিতে পারে, যাহার ফলে যুদ্ধ ও বিবাদ-বিসংবাদ কমিয়া যায়। আবার বিপরীত ভাবে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে বলা যাইতে পারে যে বিজ্ঞানও সমষ্টিগতভাবে মানুষের কম ক্ষতি করে নাই। বিজ্ঞান মানুষের সৌকুমার্য্য নষ্ট করিয়াছে, মানুষকে কলের পুতুল বানাইয়া তাহার জীবনের সৌন্দর্য্য ও সাবলীলতা ব্যাহত করিয়াছে।

মোটের উপর এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ধর্মের বিরুদ্ধে ফ্রয়েড্ এর সমালোচনাগুলি অতিরঞ্জিত।

পঠনায়

ফ্রয়েড্	—	টটেম্ অ্যাণ্ড ট্যাবু
		সাইকোপ্যাথলজি অফ্ এভ্রিডে লাইফ্
		দি ফিউচার্ অফ্ অ্যান্ ইলিউসন্
		দি এগো অ্যাণ্ড্ দি ইদ্
		সিভিলাইজেশন্ অ্যাণ্ড্ ইট্স্ ডিস্কনটেণ্ট্স্
		মোজেজ্ অ্যাণ্ড্ মনোথিজম্
		নিউ ইনট্রোডাক্টারি লেক্চারস্ অন্ সাইকো-থ্যানালিসিস্
জ্যালবিয়ে	—	সাইকো-অ্যানালিটিক্যাল মেথড্ অ্যাণ্ড দি ডক্ট্রিন্ অফ্ ফ্রয়েড্ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড
হিউজ্	—	সাইকলজি অ্যাণ্ড্ রিলিজিয়াস্ ট্রুথ্
পি. এন্. ভট্টাচার্য্য	—	ফ্রয়েড্স্ থিওরি অফ্ রিলিজিয়ন্ —মডার্ণ রিভ্যু-আগষ্ট, ১৯৪৪
” ” ”	—	এ রিসেণ্ট্ অ্যাট্যাক্ অন্ রিলিজিয়ন্ —কারেণ্ট থট্-ষষ্ঠ খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা ১৯৪৪
” ” ”	—	এ জেনেটিক্ ষ্টাডি অফ্ রিলিজিয়ন্ —ইণ্ডিয়ান্ কালচার-পৃঃ ১৭৪—২০৭

গীতার দর্শন

অধ্যাপক—শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মহিষাদল রাজকলেজ

মহাকাব্য মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশরূপে আমরা গীতাখানি পাইয়া থাকি। ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিয়াছেন, কাজেই তিনি যে গীতার প্রণেতা ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তবে ব্যাস প্রণীত মূল মহাভারত পরবর্তীকালে অন্যান্য মনীষীদের হাতে যেরূপ বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে সেরূপ গীতাও প্রথমে মাত্র কয়েকটি শ্লোক লইয়া রচিত হইয়াছিল, পরবর্তীকালে অন্য কোন মনীষীর হাতে ইহা বর্তমান আকার লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ করিবার জন্য যখন অর্জুন কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া মোহ ও অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহার রথের সারথী শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মোহ-জনিত ক্লৈব্য দূর করিবার জন্য যে অমূল্য উপদেশসমূহ দিয়াছিলেন সেই উপদেশসমূহের সমষ্টিই গীতা। সাধারণতঃ মহাভারত বা গীতার রচনাকাল ধরা হয় খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চমশতক।

গীতা একাধারে তত্ত্বশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র। গীতার উপর সাংখ্যযোগ ও অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। যেরূপ উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যায় আচার্যগণ একমত নহেন, সেইরূপ গীতা ব্যাখ্যায়ও আচার্যগণ একমত নহেন। ইহার কারণ গীতা উপনিষদ-সমূহের সার-সংকলন। সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥—গীতা-মাহাত্ম্য।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধেনুরূপ সকল উপনিষদ হইতে দুগ্ধ সদৃশ গীতামৃত দোহন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য গীতাভাষ্য উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্ত-বেদার্থ-সার-সংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞেয়ার্থম্। গীতা সমস্ত বেদার্থ-সার-সংগ্রহ। ইহা সহজ বোধ্য নহে।

উপনিষদে বিভিন্ন মতবাদের উৎসরূপে বিভিন্নরকমের মন্ত্র রহিয়াছে। কোন কোন মন্ত্র অদ্বৈতবাদ সূচক, আবার কোন কোন মন্ত্র দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সূচক। ঠিক সেইরূপ গীতাতেও বিভিন্ন মতবাদসূচক বিভিন্ন প্রকারের শ্লোক রহিয়াছে। "জ্ঞেয়ং যত্তং প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে। অঃ ১৩।১২; অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ। শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে॥ অঃ ১৩।৩১।৩২; তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ। পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স

পশ্যতি তুম তিঃ ॥ অঃ ১৮।১৬ যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং, পর্যুপাসতে। সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ১২।৩ সকল শ্লোক কেবলাদ্বৈতবাদকেই সমর্থন করে। আবার মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত। সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ অঃ ১৪।৩।৪ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ভূত গ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ অঃ ৯।৮ প্রভৃতি শ্লোক দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থনে উল্লেখযোগ্য। দেখা যাইতেছে উপনিষদ সমূহে যেরূপ সগুণ ব্রহ্ম নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদ, কেবলাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি মতবাদের বীজ রহিয়াছে সেইরূপ গীতাতেও রহিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন, গীতাকার সকল মতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া একবিশিষ্ট মতবাদ যুক্তিতর্কের সাহায্যে স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের মত সমর্থনযোগ্য নহে। গীতা মূলতঃ কাব্যগ্রন্থ। ইহাতে এক সুসংহত দার্শনিক মতবাদ আশাকরাও সমীচীন নহে।

গীতার উপর শুধু সেশ্বর সাংখ্য বা যোগশাস্ত্রের নহে, নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রভাবও অতি সুস্পষ্ট। প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি। বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি-সম্ভবান্॥ অঃ ১৩।১৯। প্রকৃত্যৈব চ কর্মানি ক্রিয়মানানি সর্বশঃ। যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি॥ অঃ ১৩।২৯। নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥ অঃ ১৪।১৯ ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। হেতুমানেন কৌন্তেয় জগৎ বিপরিবর্ততে॥ ৯।১০ প্রভৃতি শ্লোক নিরীশ্বর সাংখ্য সমর্থন করে। তবে প্রকৃতিকে যেখানে ঈশ্বরের অধীনা করা হইয়াছে সেখানে যোগশাস্ত্র বা সেশ্বর সাংখ্যের প্রভাব যে রহিয়াছে ইহা অনস্বীকার্য।

যাহা হউক উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতাতে সগুণ ও সক্রিয় এবং নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মবাদ, কেবলাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির বীজ দেখিতে পাওয়া গেলেও যে কোন পাঠকের নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে ঐ সকল গ্রন্থে সগুণ ও সক্রিয় ব্রহ্মবাদ বা বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদই মূলমতবাদ। ঐ সকল গ্রন্থে কেবলমাত্র দুইএক স্থলেই নিগুর্ণ ও নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মবাদের উল্লেখ দেখা যায়। যে দুই একটি মন্ত্র, সূত্র বা শ্লোক নির্গুণ ব্রহ্ম বা নিষ্ক্রিয় আত্মবাদ সূচক রহিয়াছে, রামানুজের মত অনুসরণ করিয়া তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে। তবে সক্রিয় ব্রহ্মবাদ স্বীকার করিলেও গীতা সম্বন্ধে আর একটি জটিল সমস্যা উঠিয়া থাকে। গীতায় যে প্রকৃতিকে জগতের

উপাদান কারণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে সেই প্রকৃতি ব্রহ্মাধীনা হইলেও ইহার কি পৃথক নিত্য সত্তা রহিয়াছে না ব্রহ্মের অংশরূপ নিত্য সত্তা রহিয়াছে? গীতাতে প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ॥ অঃ ৯।৮ মমযোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। ১৪।৩ 'মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা' ৭।৪ প্রভৃতি শ্লোকে 'মম যোনি, মে প্রকৃতিঃ, স্বাং প্রকৃতিম্' প্রভৃতি উক্তি দুইভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে। প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অংশরূপে আবার ঈশ্বরের অধীনা পৃথক সত্তারূপেও গ্রহণ করা চলে। প্রকৃতিকে পৃথক সত্তারূপে গ্রহণ করিলে দ্বৈতবাদ ও অংশরূপে গ্রহণ করিলে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে হয়। যেহেতু 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' ১৫।৭ শ্লোকে জীবকে ঈশ্বরের অংশরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম। মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যৎ দ্রষ্টুমিচ্ছসি॥ ১১।৭ শ্লোকে সমস্ত জগৎ যে ঈশ্বরের দেহে অবস্থিত এইরূপ উল্লিখিত রহিয়াছে। সেইহেতু রামানুজের বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদ অনুসরণ করিয়া প্রকৃতিকে ঈশ্বরের অংশরূপে গ্রহণ করা আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। কাজেই এখানে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অনুসরণ করিয়া গীতার একটি সুসংহত দার্শনিক মতবাদ সংগঠন করিতে চেষ্টা করিব।

উপসংহারে হিন্দু-ধর্মজীবন সম্বন্ধে মনের একটি ধারণা প্রকাশ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ ধর্মশাস্ত্ররূপে পঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রত্যেক ধর্মশাস্ত্রেরই একটি দার্শনিক ভিত্তি থাকে। কিন্তু দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে এই সকল গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী উক্তি রহিয়াছে। এবং ইহাদের ব্যাখ্যায় আচার্যগণ এতই পরস্পর বিরোধী মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন যাহার ফলে হিন্দু ধর্মজীবনে এক বিড়ম্বনার সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিড়ম্বনার ফলে হিন্দু ধর্মজীবনে সংশয়াকুলতা, অস্পষ্টতা, অর্দ্ধবিশ্বাস ও ধর্ম সম্বন্ধে কেবল জিজ্ঞাসা ও সংশয় দেখিতে পাওয়া যায়। আমার এই উক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে বেশীদূর যাইতে হইবে না। যে কোন শিক্ষিত দশজন হিন্দুর নিকট হিন্দু ধর্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে দেখা যাইবে, দশজন দশরকমের উত্তর প্রদান করিতেছেন এবং এই উত্তরগুলি প্রায়ই পরস্পর বিরোধী ও ও অস্পষ্ট। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

গীতার তাত্ত্বিকদিক
(Metaphysic of the Gita)

গীতাকার, অদ্বৈতবাদী, কেননা তাঁহার মতে পুরুষোত্তম একমাত্র পরম তত্ত্ব। পুরুষ কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। যিনি সমগ্র বিশ্বের অপরিবর্তনীয়

ভিত্তি ও ঐক্য সূত্রের ন্যায় রহিয়াছেন, যিনি জগদাশ্রয়, জগদাধার ও জগন্নিবাস তাঁহাকেও পুরুষ বলা হয়, আবার যিনি সচেতন, স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত তাঁহাকেও পুরুষ বলা হয়। পুরুষোত্তম একদিকে জগদাশ্রয়, জগতের ভিত্তি, অপরদিকে তিনি বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মুক্ত পুরুষ। তিনি স্বাধীন; তিনি সক্রিয়; তিনিই এই বিশ্ব রচনা করিতেছেন। পুরুষোত্তম এই দুই অর্থেই পুরুষ।

আমরা কেবল আত্মচেতনাতে আত্মাকেই পুরুষরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। আত্মা একদিকে নানা মানসিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঐক্য সূত্রের কাজ করিতেছে, আবার ইহা সচেতন ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট, ইহা এক স্বাধীন কর্তা। কাজেই গীতাকারের মতে পুরুষোত্তম পরমাত্মা। গীতাতে পরমাত্মা পরম পুরুষ ও ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছে। ঈশ্বর বা পরম পুরুষ সগুণ ও সক্রিয়। তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি। অনন্ত তাঁহার ঐশ্বর্য। তিনিই বিশ্ব রচনা করিতেছেন, আবার তিনিই বিশ্বের ধারক, উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ অঃ ১৫।১৭।১৮। প্রভৃতি শ্লোকে গীতাকার পরমাত্মাকেই পুরুষোত্তম ও ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছেন।

পুরুষোত্তম হইতে অন্য কোন মহত্তর সত্তা নাই। মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি। ৭।৭ পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্। ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো, লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিম প্রভাব॥ ১১।৪৩ পুরুষোত্তম সনাতন অসীম, অনাদি ও অনন্ত। তিনি অজ ও আদিদেব। ত্বমাদিদেব পুরুষঃ পুরাণ স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। ১১।৩৮ যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোক মহেশ্বরম। অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ১০।৩

পরমাত্মা সচেতন পুরুষ। স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম ১০।১৫ তিনি নিজের দ্বারাই নিজকে জানেন। অনন্ত তাহার গুণ ও ঐশ্বর্য। নান্তোঽস্তিমম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ। ১০।৪০ পশ্য মে পার্থ রূপানি শতশোঽথ সহস্রশঃ। ১১।৫ পুরুযোত্তমের বিভূতির অন্ত নাই। অনন্ত তাঁহার শক্তি কেননা একদিকে যেমন তিনি জগতের উপাদান কারণ অপরদিকে তিনিই জগতের নিমিত্তকারণ। জগতের নিমিত্ত-কারণরূপে তাঁহার যে অনন্তশক্তি রহিয়াছে ইহাতে সন্দেহের কি কোন অবকাশ থাকিতে পারে? অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্তম্। ১১।৪০॥ ভগবান অনন্তবীর্য ও অমিতবিক্রম। ঈশ্বরের দুই বিভাব বা রূপ রহিয়াছে, একটি চিৎরূপ, অপরটি অচিৎরূপ অর্থাৎ জড়া প্রকৃতিরূপ। ঈশ্বর অচিৎরূপে জগতের উপাদান কারণ এবং চিৎরূপে ইহার নিমিত্ত

কারণ। অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ত্তে। ১০.৮ অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৭।৬ চিৎরূপে ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ। ঈশ্বর নিজ জড়া প্রকৃতিকে উপাদান কারণরূপে গ্রহণ করিয়া উহার মাধ্যমে এই সমগ্র জগৎ রচনা করিতেছেন।

গীতাকারের মতে দুইটি জগৎ রহিয়াছে—একটি আদর্শ বা ভাব জগৎ, অপরটি বাস্তব বা জড় জগৎ। ঈশ্বরই এই দুই জগতের পরম আধার, আশ্রয় বা নিধান। তিনিই এই দুই জগতের ধারক। তিনি নিজ জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে অবিরত আদর্শ জগৎকে প্রকাশ করিতেছেন। বাস্তব জগতে যে সকল বস্তু রহিয়াছে সেই সকল বস্তুর আদর্শ বা সামান্য ধারণা লইয়া আদর্শ জগৎ গঠিত। এই আদর্শ জগৎকেই দিব্যধাম বা ব্রহ্মধাম বলা হইয়া থাকে। সামান্য ধারণা সমূহের মধ্যে পরমাত্মা ঈশ্বরই ঐক্য সূত্রের কাজ করিতেছেন। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণা ইব। ৭।৭। ঈশ্বররূপ সূত্রে সমস্ত সাধারণ ধারণা মণি সমূহের ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বর এই আদর্শ জগতের উর্ধ্বে নহেন। তিনি এই আদর্শ জগতের ধারকরূপে নিজ সম্বন্ধে সচেতন। তিনি সর্ববিদ্। তিনি এই আদর্শ জগৎ নিয়ত অনুভব করেন বলিয়া চির আনন্দময়, রসময় ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাবয়স্য চ।.... সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ১৪।২৭ আদর্শ জগতের প্রত্যেকটি সামান্য ধারণা বা আদর্শ গীতায় বীজ নামে অভিহিত হইয়াছে। যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন। ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ১০।৩৯ ঈশ্বরের জড়া প্রকৃতি অব্যক্তা, নির্বিশেষা, অব্যক্তাদীনি ভূতানি। ২।২৮ অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ। ৮।১৮ ভূত সমূহ আদিতে অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। এই অব্যক্ত অবস্থা প্রকৃতি। জগতের উপাদান কারণ প্রকৃতি ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া নিত্য বর্তমান, ইহার বিনাশ নাই। প্লেটোর ন্যায় গীতাকার প্রকৃতির পৃথক সত্তা স্বীকার করেন নাই। অব্যক্তা প্রকৃতি ঈশ্বরের এক অংশ। ইহাই জগতের আদি অবস্থা। অনন্তশক্তি সম্পন্ন পরমেশ্বর এই অব্যক্ত প্রকৃতিতে বীজ বপন করিতেছেন অর্থাৎ প্রকৃতির মাধ্যমে তিনি আদর্শ জগৎ ব্যক্ত করিতেছেন। ব্যক্ত মধ্যানি ভারত। ২।২৮ মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবতি যাঃ। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ১৪।৩।৪ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ। ৯।৮

আদর্শ জগৎ নিত্য, শাশ্বত ও সনাতন। ইহা কালাতীত ও অপরিবর্তনীয়। সামান্য ধারণা বা আদর্শ কাল ও দেশে সীমাবদ্ধ নহে। আদর্শ জগতের ধারকরূপে

ঈশ্বরও অব্যয়, নিষ্ক্রিয় বা অকর্তা। তিনি কূটস্থ,অচল ধ্রুব ও অপরিবর্তনীয়। তিনি আপ্তকাম। তাঁহার কোন অভাব নাই। তিনি তাঁহার কোন অভাব পূরণ করিবার জন্য কাজ করেন না। কিন্তু এই ঈশ্বরই আবার সক্রিয়, তিনিই আবার জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে সদা আদর্শ জগৎকে ব্যক্ত করিতেছেন। এইজন্য তিনি সর্বকর্মা। তিনি কাল বা কালকর —কালোহস্মি ১১।৩২ তিনি গতি ৯।১৮। জড়াপ্রকৃতির মাধ্যমে আদর্শ জগৎকে প্রকাশ করিবার জন্য ঈশ্বরের চেষ্টায় বিরাম নাই। এইজন্য স্টয়িকগণ যেরূপ জগদাত্মা ঈশ্বরকে সদা গতিশীল, সদা ক্রিয়াশীল অগ্নিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, সেরূপ গীতাকারও ঈশ্বরকে বৈশ্বানররূপে বর্ণনা করিয়াছেন—অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাম দেহমাশ্রিতঃ। ১৫।১৪।

পরমেশ্বর এক একটি আদর্শকে নির্বিশেষ জড়াপ্রকৃতির মাধ্যমে রূপ প্রদান করিতেছেন। জগতের প্রত্যেকটি বস্তু আদর্শের বাস্তব রূপায়ন। ভগবান যে সকল বস্তুর মধ্যে একই আদর্শের রূপ দিতেছেন সেই সকল বস্তু লইয়া একটি শ্রেণী গঠিত হইয়াছে। যাহার মধ্যে আদর্শটি প্রকৃষ্টরূপ লাভ করিয়াছে সেই শ্রেণীর আদর্শ। ভগবান আদর্শ জগৎকে প্রকৃতির মধ্যে রূপায়িত করিতেছেন বলিয়া গীতায় উক্ত রহিয়াছে—অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাম্ দেবর্ষীনাঞ্চ নারদঃ। গন্ধর্বনাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাম্ কপিলোমুনিঃ। উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্। ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্॥ ১০।২৬।২৭ জগতে যে বস্তুর মধ্যে আদর্শ যে পরিমাণে রূপ লাভ করিয়াছে, সেই বস্তু সেই পরিমানে সুন্দর, আনন্দদায়ক ও উৎকৃষ্ট। এই জগৎ মিথ্যা নহে। ইহা ভগবানের লীলাধাম। জগতের মাঝেই ভগবানের পরমানন্দময়, পরম সুন্দর ও পরমকল্যাণময় রূপ সদা ব্যক্ত হইতেছে।

যদিও জড়া প্রকৃতির মাধ্যমে আদর্শ জগৎকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে ঈশ্বরের চেষ্টার বিরাম নাই, যদিও জড় জগৎকে আদর্শ জগতে পরিণত করাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না, তখন তিনি মাঝে মাঝে জগৎ ধ্বংস করিয়া আবার নূতন ভাবে জগৎ রচনা করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই ধ্বংসকেই প্রলয় বলা হইয়া থাকে। প্রলয়কালে দৃশ্যমান জড় জগৎ আবার অব্যক্ত প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। ঈশ্বর এইরূপভাবে পুনঃপুনঃ জগৎ রচনা করিতেছেন। সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং। কল্পক্ষয়ে পুনঃ স্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ। ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ॥ ৯।৭।৮ অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব

চস্থিতম্। ভূতভর্ত্তৃচ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৩।১৬ গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃদ্। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্। তপাম্যহম্ বর্ষং নিগৃহ্লাম্যুৎ—সৃজামি চ। অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন॥ ৯।১৮।১৯ এখানেও ষ্টয়িক দর্শনের সহিত গীতার দর্শনের অপূর্ব্ব মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমেশ্বর জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়স্থল। তিনিই জগৎ রচনা করিতেছেন এবং ধ্বংস করিতেছেন। তিনি জগৎ রচনা করিয়া উহাকে ধারণ করিতেছেন। তিনি জগদাত্মা, জগদাশ্রয়। তিনি সকল বস্তুরই অন্তরে রহিয়াছেন। সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্। বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ১৩।২৭

ভগবানই জগৎ পরিচালনা করিতেছেন। জগতে যাহা কিছু ঘটে তাঁহার ইচ্ছাই ঘটিতেছে বা তিনিই ঘটাইতেছেনে; যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ॥ ১৫।১২।১৩ ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১ ভগবানই জগৎ রচনা করিতেছেন, ধারণ করিতেছেন, পালন বা শাসন করিতেছেন। পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। ৯।১৭ যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ। ১৫।১৭

ভগবানের অনন্তশক্তি, অনন্ত তাঁহার ঐশ্বর্য। জগতে তাঁহার অনন্ত শক্তি ও ঐশ্বর্যের কেবল এক অংশই প্রকাশ পাইতেছে। কাজেই তিনি একদিকে যেমন জগতের অভ্যন্তরে অপরদিকে তিনি তেমন জগতের বাহিরেও রহিয়াছেন। জগতের মাঝেই তাঁহার অনন্তশক্তি নিঃশেষিত হয় নাই। যদ্ যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা। তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংশ সম্ভবম্॥ অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ১০।৪১।৪২॥

নীতিশাস্ত্ররূপে গীতা

Ethics of the Gita

জীব ভগবানের চিৎশক্তির এক অংশ। ইহা অজ, নিত্য ও অবিনাশী। মমৈব অংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ১৫।৭ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এমনজমব্যয়ম। কথং স পুরুষঃ পার্থকং ঘাতয়তি হন্তিকম্॥ ২।২০।২১ জীবের জন্ম ও নাই মৃত্যুও নাই। ন জায়তে ম্রিয়তে

২।২॥ জীব ভগবানের অংশরূপে চিৎশক্তিসম্পন্ন সর্বজ্ঞ, ইহাও আনন্দ ও কল্যাণস্বরূপ। কিন্তু ভগবানের ন্যায় ইহা অনন্তশক্তি নহে। ইহার. শক্তি সীমাবদ্ধ। জগৎ রচনায় ইহার কোন কর্তৃত্ব নাই। কাজেই ভগবানের সহিত জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। জীব ঈশ্বরে, প্রথম সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ইহা নিজ স্বরূপ ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। শুধু তাহাই নহে, ইহা ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধেও সচেতন থাকে না যাহাতে জীব নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভগবানের অনন্ত কল্যাণ ও পরম সুন্দররূপ উপলব্ধি করিতে পারে তজ্জন্য পরম দয়ালু, করুনাময় ভগবান এই জগৎ রচনা করিয়া জীবকে এখানে প্রেরণ করিতেছেন,' জীবের অবিদ্যাজনিত কর্মফল শাস্তি ভোগের জন্য ভগবানের এই জগৎ রচনা নহে। এই জগৎ বন্দিশালা নহে। জীবের কল্যাণের জন্যই এই জগৎ। জীব যাহাতে সাধনা বলে আত্মচেতনা লাভ করিয়া ভগবানের 'অপারলীলা উপভোগ করিতে পারে, যাহাতে সচেতন ভাবে জীব ভগবানের সহিত মিলিত হইতে পারে, তজ্জন্য প্রেমময় ভগবান এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। জগৎ রচনার মূলে রহিয়াছে পরম পিতা ভগবানের জীবের প্রতি অনন্তপ্রেম ও অনন্ত করুণা।

জগতের পরিণামক্রম লক্ষ্য করিলে ভগবানের প্রেমময় রূপটির পরিচয় লাভ করা যায়। জীব যাহাতে আবির্ভূত হইতে পারে তজ্জন্য ভগবান কত যত্নেই না এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। প্রকৃতির মাধ্যমে জীবের আবির্ভাব। কাজেই জীবের একদিকে যেমন দৈহিক বৃত্তি ও মানসিক বৃত্তি, অপর দিকে স্বরূপশক্তি বুদ্ধি-বৃত্তিও রহিয়াছে। দৈহিক বৃত্তি ও মানসিক বৃত্তি উদ্দেশ্য-বিহীন নহে। যখন মানুষ ইহাদের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া ইহাদের অধীন হয়, ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন মানুষ অবস্থা ও প্রবৃত্তির দাস। কিন্তু মানুষের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি রহিয়াছে। বিচারবুদ্ধির সহায্যে ইহাদের উদ্দেশ্য বুঝিয়া ইহাদিগকে যখন মানুষ পরিচালিত করে এবং কল্যাণের পথে অগ্রসর হয় তখন মানুষ স্বাধীন। গীতায় আত্মার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। আত্মৈবহ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনাজিতঃ। অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬।৫।৬

যে কোন গীতা পাঠকের নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে গীতা ভোগবাদ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-সুখবাদ সমর্থন করে না। আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সহিত জাগতিক বস্তুনিচয়ের সংযোগ হইলে আমাদের মনে সুখানুভূতি বা দুঃখানুভূতি সৃষ্টি হয়। স্বভাবতঃ আমাদের মনে সুখপ্রদ বস্তুর প্রতি অনুরাগ ও দুঃখপ্রদবস্তুর প্রতি বিদ্বেষ জন্মে। ভোগাদিগণের মতে

সুখ আমাদের জীবনের একমাত্র কাম্য। যাহা সুখ প্রদান করে তাহা লাভ করা, যে কর্ম সুখরূপ ফলদান করে তাহা সম্পাদন করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সুখকে পরম সুখ মনে করিয়া বৈষয়িক সুখভোগের স্রোতে গা ভাসাইয়া থাকেন। গীতা নিম্নলিখিত যুক্তির সাহায্যে ভোগবাদ খণ্ডন করে। (ক) ইন্দ্রিয় সুখ আপাতমধুর বা প্রথমে অমৃততুল্য হইলেও পরিণামে বিষতুল্য হইয়া থাকে। ইহা পরিণামে দুঃখই প্রদান করে, ৫।২২ ॥ ১৮।৩২ ॥ (খ) ইন্দ্রিয় সুখ অনিত্য, ইহা অল্পস্থায়ী। অনিত্য বিষয় হইতে কখনও নিত্য সুখলাভ সম্ভব হয় না। ২।১৪ ॥ (গ) সুখলালসার ফলে মানুষ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ছুটাছুটি করে। সে মনের ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলে। ইহার ফলে সে কখনও শান্তিলাভ করিতে পারে না। ২।৬৭ ॥ (ঘ) যাহার বিষয় লালসা রহিয়াছে, সে বারবার সংসারে জন্মগ্রহণ করে, সে কখনও অমৃতপদ লাভ করিতে পারে না। ২।৪৩ ॥ ৯।৩ ॥ (ঙ) সুখলালসার ফলে মানুষ বিচারশক্তি হারাইয়া পরিণামে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২।৬২।৬৩ ॥ (চ) সুখলালসা মানুষকে স্বার্থপর করে, ফলে সমাজজীবন বিপর্যস্ত হয়। যে স্বার্থপর, সে মহাপাপী। ৩।১৩ ॥

গীতা ভোগবাদের তীব্র নিন্দা করিলেও সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্রতাবাদীদের ন্যায় বৃত্তি-সমূহ উচ্ছেদ করিতে বলে নাই। গীতার মতে বৃত্তিসমূহের উচ্ছেদ মৃত্যুর নামান্তর। বৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইলে শরীরযাত্রাও চলে না। ৩।৮ ॥ পূর্ণতাবাদিগণের ন্যায় গীতা মানুষের নানাবিধ শক্তির মধ্যে বুদ্ধি-শক্তিকেই প্রাধান্য প্রদান করিয়াছে। গীতার মতেও ঈশ্বরপ্রদত্ত কোন প্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয় উদ্দেশ্যবিহীন নহে। প্রবৃত্তি সমূহের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে সাধন করিবার জন্য মানুষের কর্তব্য হইল ইন্দ্রিয়দিগকে, প্রবৃত্তিগুলিকে বুদ্ধির বশে আনয়ন করা। অর্থাৎ মানুষের কর্তব্য হইল ইহাদিগকে বুদ্ধির সাহায্যে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া পরিচালনা করা। ২।৬১।৬৪ ॥ ৩।৭,৭।৫, যাঁহারা বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে বৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করেন, কেবলমাত্র তাঁহারা বিমল, লালসাহীন সাত্ত্বিকসুখ অনুভব করেন। এইভাবে গীতাকার সুখবাদ ও বিচারবাদের মধ্যে এক অপূর্ব সমন্বয়সাধন করিয়াছেন।

পূর্ণতাবাদিগণের ন্যায় গীতা আত্মকেন্দ্রিকতা (egoism) ও পরার্থপরতার (altruism) মধ্যেও এক সমন্বয় ঘটাইয়াছে। বৃত্তির রাজ্যে মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হইলেও গীতার একটি সুস্পষ্ট উক্তি হইল এই যে, যে ব্যক্তি শুধু নিজের জন্য কাজ করে সে মহাপাপী এবং সে অনন্ত নরক ভোগ করে। ৩।১৩ ॥ অপরদিকে যে

সর্বভূতে নির্বৈর অর্থাৎ যে শুধু মনুষ্যসমাজের মঙ্গল সাধন করে না, সর্বভূতের হিতসাধন করে সেই অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। ১১।৫৫॥১২।৪॥ গীতার মতে জনসাধারণের অর্থাৎ সমাজের মঙ্গল (লোকসংগ্রহ) সাধনের প্রচেষ্টা নৈতিক সাধনার, ধর্মসাধনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

কান্টের স্থায় গীতাও বিশ্বাস করে যে, মানুষের কর্মের নৈতিক মূল্য কর্মফলের উপর নির্ভর করে না। কর্মের ন্যায়ান্যায় উহার ফলের দ্বারা বিচার্য নহে। ফল সুখদায়ক হইলে কর্ম সৎ এবং ফল দুঃখদায়ক হইলে ইহা অসৎ—সুখবাদিগণের এই উক্তি গীতা সমর্থন করে না। কান্টের স্থায় গীতা বলে যে, মানুষের অন্তর বিচার করিয়া তাহার কর্মের বিচার করা উচিত। কর্মফলের উপর মানুষের কোন হাত নাই। কেবল কর্মে মানুষের অধিকার আছে। কিন্তু ফলের উপর তাহার কোন অধিকার নাই। ২।৪৭॥ কর্ম করা বা না করা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু কর্মফল তাহার ইচ্ছাধীন নহে। কাজেই কর্মের নৈতিক মূল্য ফলের দ্বারা বিচার্য নহে। গীতার মতেও উদ্দেশ্য সৎ হইলেই কর্ম সৎ বলিয়া বিবেচিত হইবে। কর্তা যে কর্ম শুভ ইচ্ছাশক্তি অনুসারে করে সে কর্ম সৎকর্ম এবং যে কর্ম অশুভ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা বা অসৎ উদ্দেশ্যে করা হয় সে কর্ম অসৎ।

মানুষ বুদ্ধিমান জীব। সে বিচার করিয়া কর্ম সম্পাদন করে বলিয়া কেবলমাত্র তাহার কর্মই নৈতিক বিচারের বিষয়। কান্ট ও গীতার মতে যে বুদ্ধি, যে ইচ্ছাশক্তি নৈতিকবিধি অনুসরণ করে সে বুদ্ধি, সে ইচ্ছাশক্তিই শুভ। যে কর্ম নৈতিক বিধি অনুসারে করা হয় সে কর্ম সৎ। যে কর্ম নৈতিক বিধির স্থলে অন্য বিধি অর্থাৎ নিষিদ্ধ বিধি অনুসরণ করিয়া করা হয়, সে কর্ম গর্হিত বা নিষিদ্ধ কর্ম। কান্ট ও গীতার মতে নৈতিকবিধি বলিয়া নৈতিকবিধি পালনীয়, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সাধনীয়। কান্ট ও গীতাকার উভয়ই নিষ্কাম কর্মবাদের সমর্থক। সর্ববিধ প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, দয়া, মায়া প্রভৃতি সমুদয় হৃদয়াবেগের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া, লাভালাভ, জয়পরাজয়, সুখদুঃখ ও নিন্দাস্তুতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া অর্থাৎ সর্ববিধ ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যিনি নৈতিকবিধির জন্যই নৈতিকবিধি পালন করেন, কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন করেন, তিনিই নিষ্কাম কর্মী। নিষ্কাম কর্মই সৎকর্ম। 'কার্যমিত্যেব যৎকর্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জুন। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব সত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ।' ১৮।৯। যে কর্ম

ফলাকাঙ্ক্ষা বা বিষয়াসক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সে কর্ম সকাম কর্ম, সকাম কর্ম মাত্র বন্ধনের কারণ।

কাণ্ট ও গীতাকারের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও কয়েকটি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে। কাণ্টের মতে স্বাধীনতাই মঙ্গল, ইহাই নৈতিক আদর্শ। ব্যবহারিক বুদ্ধি বা ইচ্ছাশক্তি যে নৈতিকবিধি অনুসরণ করিয়া চলে সে বিধি স্বকৃতবিধি। ইহা বিশুদ্ধ ব্যবহারিক বুদ্ধির নির্দেশ, ইহা বিবেকের নির্দেশ এবং এই নির্দেশ অভ্রান্ত। গীতাকারের মতে আত্মোপলব্ধি, ভগবদ্-প্রাপ্তি, ভগবদ্দর্শন, পরমশান্তি—ইহাই জীবের নৈতিক আদর্শ। নীতিশাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রের এক অংশ বিশেষ। জগৎ ও জীবের স্বরূপ জ্ঞান ব্যতীত, ঈশ্বরের সহিত জগৎ ও জীবের সম্বন্ধের জ্ঞান ব্যতীত কি কর্ম জীবের করণীয় তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর হয় না। তাত্ত্বিক বুদ্ধির নির্দেশ নৈতিক বিধি। নৈতিকবিধি ভগবদ্‌বিধি। বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক বুদ্ধির মাধ্যমে ভগবদ্‌বিধি প্রকাশিত হয়। আমাদের শাস্ত্র তত্ত্বজ্ঞানীদের বাণী লইয়া গঠিত। সুতরাং শাস্ত্রবিধিই নৈতিকবিধি। 'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যা-কার্য ব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্র-বিধানোক্তং কর্ম কর্তু-মিহার্হসি ॥' ১৬।২৪ ॥ কাজেই যে কর্ম শাস্ত্রবিধি অনুসারে করা হয় সে কর্ম সৎ এবং যে কর্ম শাস্ত্রবিধিকে লঙ্ঘন করিয়া করা হয় সে কর্ম্ম অসৎ। অধিকন্তু, কাণ্টের নীতিশাস্ত্রে নৈতিক আবেগের স্থান নাই। গীতানুসারে নৈতিক সাধনায় আবেগ ও অনুভূতির স্থান রহিয়াছে। এখানে নৈতিক সাধকের এইরূপ বিশ্বাস থাকে যে একমাত্র ভগবান কর্মের বিচার কর্তা ও কর্মফলদাতা এবং ভগবদ্‌কৃপা ব্যতীত কেহ পরমমঙ্গল সাধন করিতে পারে না। কাজেই এখানে অন্য কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ভগবানে ভক্তি রাখিয়া কেবলমাত্র ভগবানের প্রীতির জন্য নৈতিক বিধি পালন করা হয়। ৯।২৭। ১৮।৫৭।৫৮ ॥

গীতার মতে ভগবান জগতের একমাত্র কর্তা। তিনি জগতের বিভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে তাঁহার বিভিন্ন গুণ বা ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতেছেন। তিনি জগতের বিভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে তাঁহার বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। যে বস্তুতে ভগবানের উদ্দেশ্য ভালভাবে সাধিত হইতেছে সেই বস্তুই ভাল (good), যেমন যে বীজ ফলপূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হইতেছে সেই বীজই ভাল এবং যে বীজ হইতে বৃক্ষ হইতেছে না, সে বীজ খারাপ। জীব (মানুষ) ভগবানের অংশ। ভগবান বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমেও তাঁহার বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধন করিতেছেন। কিন্তু মানুষের বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি রহিয়াছে। যে মানুষ তাহার বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধির সাহায্যে ভগবানের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নিখুঁত ভাবে সেই উদ্দেশ্যসাধন করিতে চেষ্টা করে সেই ভাল বা সৎ লোক। 'বিশুদ্ধ বুদ্ধির নির্দেশ

বা তত্ত্বজ্ঞান প্রসূতশাস্ত্রের নির্দেশই ভগবানের নির্দেশ। যাহার মাধ্যমে ভগবান যে উদ্দেশ্যসাধন করিতে চাহিতেছেন সে যদি সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে ভগবানকে সাহায্য করে, তবে সে পুণ্যবান ও ধার্মিক, আর যে বিশুদ্ধ বুদ্ধির নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে, সে অসৎ। ভগবান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতীয় মানুষের মাধ্যমে তাঁহার চারি শ্রেণীর উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেছেন। ৪।১৩।।

জীব সচেতন পুরুষ বলিয়া তাহার মনে ধর্ম ও নীতির প্রশ্ন উঠে। মানুষের কর্তব্য হইল তত্ত্বজ্ঞান লাভান্তে ভগবানকে পরমকর্তা মনে করিয়া যে উদ্দেশ্যসাধন করিবার জন্য তিনি তাহাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চেষ্টা করা, ভগবান তাহাকে যে যে সাধারণ ও বিশেষ শক্তি বা গুণ প্রদান করিয়াছেন সেই শক্তি বা গুণসমূহের পূর্ণ বিকাশ সাধন করা। মানুষের কর্তব্য হইল ভগবানের ইচ্ছায় সে যে জাতীয় গুণ ও কর্মশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই জাতীয় গুণ ও শক্তির উৎকর্ষ সাধন করা। যে ক্ষত্রিয়োচিত গুণ ও শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার কর্তব্য হইল আদর্শ ক্ষত্রিয় হওয়া। এইরূপভাবে যে ব্রাহ্মণোচিত গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার কর্তব্য হইল আদর্শ ব্রাহ্মণ, যাহার শূদ্রের গুণ রহিয়াছে তাহার কর্তব্য হইল আদর্শ শূদ্র, যাহার বৈশ্যের গুণ রহিয়াছে তাহার কর্তব্য হইল আদর্শ বৈশ্য হওয়া। গীতায় ইহাকে স্বধর্ম বলা হইয়াছে। স্বধর্ম বলিতে সাধারণ মনুষ্যোচিত ধর্মের সহিত বিশিষ্ট জাতীয় ধর্মকে বুঝায়।

গীতার মূল বক্তব্য হইল এই যে, ব্রাহ্মণই হউন বা শূদ্রই হউন যিনিই জ্ঞানের আলোতে বিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে অন্তর্নিহিত সমুদয় শক্তির যথাযথ ভাবে বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন করেন এবং অপরদিকে জগতের সকল বস্তুকে উহাদের উদ্দেশ্যসাধন করিতে সাহায্য করেন, তিনিই পরিণামে ভগবদ্ কৃপায় ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া পরমশান্তি ও অমৃতপদ লাভ করেন। পূর্ণতাই পরম মঙ্গল। পূর্ণতার অবস্থা পরম সুখ, শান্তি ও আনন্দের অবস্থা। যিনি ধার্মিক তিনি সকল অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকেন। তিনি নিরহঙ্কার ও নিরভিমান হইয়া থাকেন, কেননা তিনি জানেন, ভগবানই জগতের একমাত্র কর্তা এবং তিনি নিজে ভগবানের উদ্দেশ্যসাধনের একটি যন্ত্রবিশেষ। তিনি ভগবানের উপর অনন্যা ভক্তি রাখিয়া নিষ্ঠার সহিত ভগবদ্ নির্দিষ্ট ধর্ম পালন করেন।

পাশ্চাত্য পূর্ণতাবাদের সহিত গীতার কর্মবাদের নানা বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা গেলেও একটি বিষয়ে গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান। গীতাকারের মতে ব্যক্তির মুক্তি সমাজের

মুক্তির উপর নির্ভর করে না। তাঁহার মতে যিনি একনিষ্ঠভাবে নৈতিক সাধনা করেন, তিনি ভগবদ্ কৃপায় মুক্ত দিব্যজীবন লাভ করেন। তবে সমাজ-সেবা নৈতিক সাধনার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ভগবান কর্মফলদাতা, তিনি আমাদের অন্তর বিচার করিয়া কর্মফলের ব্যবস্থা করেন। নৈতিক সাধনাই ধর্ম। নৈতিককর্ম সম্পাদনই ভগবদ্‌পূজন। ভগবান শুধু দয়ালু নহেন, তিনি ন্যায়পরায়ণও। গীতায় জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় রহিয়াছে বলিয়া আজও ইহা এক উচ্চাঙ্গের ধর্মগ্রন্থরূপে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে।

গীতাকারও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাঁহার মতে আত্মার কখনও মৃত্যু নাই। ইহা সনাতন। দেহাবসানের সহিত আত্মার অবসান ঘটে না। যে পর্যন্ত জীব নৈতিক সাধনায় জয়যুক্ত হইয়া ভগবানের কৃপা লাভ না করে সে পর্যন্ত তাহার বার বার সংসারে আসিতে হয়। কর্মের উপর তাহার পুনর্জন্ম নির্ভর করে। নৈতিক সাধনা বলে ভগবানের কৃপা লাভ করিলেই জীব দিব্যধামের অধিবাসী হইয়া দিব্য সুখ ও শান্তি লাভ করে। তাহার আর সংসারে আসিতে হয় না।

ধর্মশাস্ত্ররূপে গীতা

গীতা ধর্মশাস্ত্ররূপে প্রতি হিন্দুর গৃহে বর্তমানে স্থানলাভ করিয়াছে। আমরা ইহাকেই এখন ধর্মশাস্ত্ররূপে পরম শ্রদ্ধাভরে প্রতিদিন পাঠ করিয়া থাকি। গীতাতে নানা দার্শনিক মতবাদ উঁকি ঝুঁকি মারিলেও ইহাতে বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদটি এইরূপ পরিস্ফুট যে, গীতাখানি পাঠ করিলে আমাদের মনে ধর্মভাবের উদ্রেক হয়। আমরা ধর্মসাধনায় উদ্বুদ্ধ হই। ধর্মসাধনায় একমাত্র গীতাখানি এখন ধর্মশাস্ত্ররূপে হিন্দু-জনগণকে প্রেরণা দান করিতেছে। বেদ ও উপনিষদ শ্রুতি বলিয়া গণ্য হইলেও অতি অল্পলোকেই ধর্মগ্রন্থরূপে ইহাদিগকে এখন পাঠ করিয়া থাকে। বেদোপনিষদের সার সংগ্রহ গীতাখানি শ্রুতিরূপে গণ্য না হইলেও ইহাই এখন হিন্দু ধর্মজীবনকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে।

গীতাকার স্পষ্টতঃ একেশ্বরবাদী। তাঁহার মতে এক পরমেশ্বর বা পুরুষোত্তম হইতে জগৎ আসিয়াছে। তিনিই জগৎ রচনা করিতেছেন। তিনি সমগ্রবিশ্বের ধারক। সর্বং সমোপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ। এই জন্য তাঁহাকে সর্ব বলা হইয়া থাকে। তিনি জগতের মাঝে তাঁহারই উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। তিনি জগতের সকল বস্তুর অন্তরে থাকিয়া জগৎ পরিচালনা করিতেছেন। তিনি জগতের নিয়ন্তা

স্রষ্টা ও ধাতা। তিনিই আবার প্রলয়ের ব্যবস্থা করেন। প্রলয়কালে সকল বস্তু ভগবানে লীন হইয়া থাকে।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ৭৭॥ ভগবানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। ভগবান এক অদ্বিতীয়। বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ। ১১।৩৯॥ ভগবান পরম পুরুষ। তাঁহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। তিনি সনাতন। তিনি অজ, অনাদি ও অনন্ত। ভগবান অতীন্দ্রিয়। তিনি অচিন্ত্যরূপ। তিনি দিব্য পরম পুরুষ। কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ। সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ ৮।৯॥ ভগবান জগদাত্মা, তিনি জীবেরও অন্তরাত্মা। ভগবানকে আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা না জানিলেও ভগবানকে আমরা সম্পূর্ণরূপে চিন্তা করিতে না পারিলেও তাঁহার সত্তা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আপ্তবাক্য ও অনুমানের দ্বারা তাঁহার সত্তা প্রমাণিত হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে ধার্মিকগণ তাঁহাদের অন্তরে ভগবানেরই কৃপায় তাঁহার সত্তা অনুভব করিয়া থাকেন। ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবং বিধোঽর্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪॥

জীব ভগবানের অংশ। মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে ভেদাভেদ সম্পর্ক বর্তমান। উপাসনাই ধর্ম। উপাস্য ও উপাসকের সম্পর্কের উপর ধর্ম নির্ভর করে। ইহাদের মধ্যে একটির অভাব হইলে ধর্ম থাকে না। উপাস্য ভগবান ও উপাসক জীব। যদিও ভগবান অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয়, তথাপি জীবের সহিত ভগবানের অভিন্নতার সম্পর্কও বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগবানের ন্যায় জীব সচেতন পুরুষ। জীব ও স্বরূপ-সর্বজ্ঞ, তবে জীব অল্পশক্তি ও ভগবান অনন্তশক্তি। ভগবানের জগৎ-কর্তৃত্ব রহিয়াছে কিন্তু জীবের জগতের উপর কোন কর্তৃত্ব নাই। ভগবান সদাপূর্ণ ও সচেতন সদা জাগ্রত কিন্তু জীবের সুপ্ত এবং জাগ্রত, অপূর্ণ ও অচেতন এবং পূর্ণ ও সচেতন এই দুই অবস্থা রহিয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, জীব ও ভগবান একদিকে যেমন ভিন্ন অপরদিকে তেমন অভিন্ন।

জীবের যে সকল সৎগুণ রহিয়াছে সেই সকল সৎগুণের পরাকাষ্ঠা ভগবান। জীব পরম সত্য, মঙ্গল ও সৌন্দর্যের যে আদর্শ স্বভাবতঃই অনুসরণ করে সেই আদর্শের বাস্তব রূপ একমাত্র ভগবানে বর্তমান। ভগবান পুরুষোত্তম। কাজেই জীব স্বভাবতঃই ভগবানের সহিত মিলিত হইতে চাহে। ভগবানের সহিত মিলিত হইবার প্রচেষ্টা ধর্ম। যাহা ভগবানের সহিত জীবের মিলন ঘটায় তাহাই ধর্ম। জীবের প্রতি ভগবানের

করুণার অন্ত নাই। জীব প্রথমে ভগবানে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। জীব যাহাতে আত্মচেতনা লাভ করে, জীব যাহাতে নিজের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারে, জীব যাহাতে ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া অনন্ত সৌন্দর্য উপভোগ ও পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে তজ্জন্য ভগবান এই জগৎ রচনা করিয়া জীবকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যথোপযোগী ব্যবস্থাও করিয়াছেন। যদিও জীবের প্রতি ভগবানের স্নেহ ও করুণার অন্ত নাই, যদিও ভগবান জীবকে ধর্মের পথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি জীবকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করেন, জীব স্বেচ্ছায় তাঁহার কার্যের নিমিত্ত বা সহায়ক হউক, নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্। ১১।৩৩ ॥ তিনি ইচ্ছা করেন জীব স্বেচ্ছায় তাঁহার দিকে আসুক এবং তাঁহাকেও নিজের স্বরূপকে জানুক। যিনি ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য সাধনা করিতেছেন, তিনি সাধনার পথে ভগবানের অপার করুণা অনুভব করেন এবং ভক্তিপ্লুতচিত্তে শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও আনন্দে গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হন। ভগবান ভক্তের সাধন পথকে সুগম করিয়া থাকেন। ভগবানের স্নেহ ও করুণার হস্ত ভক্তের দিকে সদাই প্রসারিত।

গীতার ধর্ম জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় ধর্ম। ভগবান ও আত্মার স্বরূপ জ্ঞান থাকিলেই ধর্ম হয় না, কেননা জ্ঞান থাকিলেও মানুষ অধার্মিক ও দুরাচার হইতে পারে, আবার শুধু ভক্তি ধর্মের এক বিকৃতরূপ। যদি জ্ঞান ও ভক্তি সাধনায় বা কর্মে রূপ লাভ না করে তবে ইহারা মূল্যহীন। জ্ঞানও ভক্তি ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও সাধনা ইহার প্রাণ। যাঁহার উপাসনা করিব, যাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব, যাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য সাধনা করিব তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে, জীবের পক্ষে উপাসনা বা সাধনা সম্ভব নহে। জীব অন্ধ নহে, সে ধীস্বরূপ। কাজেই জ্ঞান ব্যতীতও ধর্ম হয় না। সেজন্য যাঁহারা মনে করেন জ্ঞানই ধর্ম, জ্ঞানই কৈবল্য তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নহে, কেননা যখন আমি জানি যে আমার উপাস্য জগতের কর্তা, কর্মফলদাতা, সমস্ত সদ্‌গুণের পরকাষ্ঠা এবং আমার আদর্শের বাস্তবরূপ তখন আমার হৃদয়ে স্বভাবতঃই শ্রদ্ধা, ভক্তি ভয়, বিস্ময় প্রভৃতি আবেগ জাগরিত হয়। তাঁহার নিকট আমার নতি স্বীকার ও আত্মসমর্পণ করিতে হয়।

আবার শুধু ভক্তি ধর্ম নহে। যে ভক্তি জীবকে কর্মে বা সাধনায় উদ্বুদ্ধ না করে সে ভক্তি অসার নিরর্থক। যাহাতে জীব আত্মচেতনা লাভ বা নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে, যাহাতে জীব ভগবানের সহিত সচেতনভাবে মিলিত হইতে

পারে তজ্জন্য ভগবান জীবকে জগতে পাঠাইয়াছেন। ভগবানের সহিত মিলিত হওয়া তাহার জীবনের উদ্দেশ্য। বিনা সাধনায়, বিনা কর্মে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। এই সাধনায় ভগবান কেবলমাত্র সহায়ক। আবার শুধু কর্মও ধর্ম নহে। জীব অন্ধ আবেগের বশবর্তী হইয়া কাজ করে না। সে বুদ্ধিমান জীব। কোন না কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে কাজ করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহার মনে স্পষ্ট ধারণা বা জ্ঞান না থাকিলে সে কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। কাজেই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের সমন্বয় ধর্ম। যখনই জীব তাহার নিজের জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তাহারই আদর্শের বাস্তবরূপ জগৎ কর্তা ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তখনই তাহার মনে আদর্শের প্রতি প্রবল অনুরাগ ও আসক্তি, ভগবানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি প্রভৃতি হৃদয়াবেগের সৃষ্টি হয় এবং এই আবেগ তাহাকে আদর্শ সাধনের জন্য, ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য, কর্মে ও সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে। জ্ঞান ভক্তি সমন্বিত এই সাধনাই জীবের ধর্ম।

যদিও গীতাতে কোন শ্লোকে, জ্ঞানসাধনা (৮।৮), আবার কোন শ্লোকে ভক্তি (১১।৫৪), এবং কোন শ্লোকে কর্মসাধনাকে (৩।১১) ধর্ম বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে, তথাপি যে কোন গীতা পাঠকের নিকট ইহা সুস্পষ্ট যে গীতাকারের মতে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মসমন্বিত সাধনাই ধর্ম। মৎ কর্মকৃন্মৎপরমো মদ্‌ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ। নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১।৫৫ ॥ এই শ্লোকটিতে দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্ররূপে গীতার বক্তব্য অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে। যিনি ভগবানকেই পরম কর্তারূপে জানিয়া এবং ভগবানে অচলা ভক্তি রাখিয়া তিনি যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জীবকে জগতে পাঠাইয়াছেন সেই উদ্দেশ্য সর্বদা সাধন করেন এবং অপরকেও সাধন করিতে সাহায্য করেন তিনি ভগবানের কৃপায় পরমশান্তি ও সুখ লাভ করেন এবং মরণান্তে দিব্যধামের অধিবাসী হইয়া থাকেন। যিনি প্রকৃত ধার্মিক তিনি ভগবানে বিশ্বাস রাখিয়া যথার্থজ্ঞান অর্জন করেন এবং জ্ঞানের আলোতে নিজের অন্তর্নিহিত সমুদয় শক্তির পূর্ণ ও সুসংহত বিকাশ সাধন করেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি অপরকেও পূর্ণ বিকাশ সাধনে সহায়তা করেন। জীবের ধর্ম হইল মনুষ্যসমাজকে এমন এক নন্দনকাননে পরিণত করা যে কাননের প্রতিটি ফুলই পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার জন্য সাধনা করিতেছে। জীবের ধর্ম হইল, এমন এক মনুষ্যসমাজ গঠন করা যে সমাজের সকলেই পূর্ণ বিকাশের পথে পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে, অথচ কোন হিংসা বা দ্বেষ নাই, প্রত্যেকেই নিজের ও সমাজের মঙ্গলের জন্য স্বভাবতঃই কর্ম করে। যিনি এই ধর্ম একান্তভাবে পালন করেন

তিনি ভগবদ্‌ কৃপায় পরিণামে দিব্যধামের অধিবাসী হইয়া দিব্য ব্রহ্ম সংস্পর্শ সুখ অনুভব করেন। ৬।২৮॥ তিনি অনন্তদর্শন হইয়া পরম সুখ, শান্তি ও আনন্দ অনুভব করেন। গীতাকারের মতে সিদ্ধির অবস্থা সর্বজ্ঞতা ও অনন্ত সুখ ও শান্তির অবস্থা। দিব্যাবস্থায় জীবের কোন কর্ম থাকেনা। ৩.১৭॥

অবতারবাদ

কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়া গণ্য করা হয়। তিনিও অর্জুনের ন্যায় দেহ-বিশিষ্ট মানুষ। কিন্তু মানুষ হইলেও গীতাতে তিনি নিজকে পূর্ণ ভগবানরূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এবং অর্জুনও তাঁহার মধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া তিনি যে পূর্ণ ভগবান এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। সঞ্জয়ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাঁহার উক্তিকে ভগবদুক্তি-রূপেই বিবৃত করিয়াছেন। বর্তমানে বহুহিন্দু মনে করেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। কৃষ্ণ গীতাতে বলিয়াছেন, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে তখন তিনি নিজেকেই নিজে সৃজন করেন অর্থাৎ দেহীরূপে আবির্ভূত হন। ৪।৭॥ দুষ্কৃতকারীদের দমন করিয়া সাধুগণকে রক্ষা করা এবং ধর্মসংস্থাপন তাঁহার এই আবির্ভাবের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এইরূপ আবির্ভাব যুগে যুগে ঘটিয়া থাকে। ৪।৮॥

প্রশ্ন উঠিতে পারে, যখন ভগবান সনাতন সর্বব্যাপী জগদাত্মা, অতীন্দ্রিয়, অনন্ত শক্তি ও সর্বজ্ঞ তখন তিনি কিরূপে বিনাশশীল ও দেশকালে আবদ্ধ দেহ ধারণ করিতে পারেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর কৃষ্ণ নিজেই গীতাতে প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবা-ম্যাত্মমায়য়া॥ ৪।৬॥ অর্থাৎ আমি জন্মরহিত, অবিনাশী ও সর্বভূতের অধীশ্বর হইয়াও নিজ মায়াবলে নিজ প্রকৃতির সাহায্যে দেহ ধারণ করিয়া থাকি।

শঙ্করাচার্য গীতার অবতারতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেন, স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তি বলবীর্য তেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূল-প্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽ-ব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্নিবলক্ষ্যতে স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্মদ্বয়-মর্জুনায় শোকমোহ মহোদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ গুণাধিকৈঃ হি গৃহীতোঽনু—ষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। যদিও শঙ্করের এই উক্তিতে মনে হয় তিনি এখানে সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা রামানুজের অচিৎ শক্তিকেই বৈষ্ণবী মায়াশক্তিরূপে গ্রহণ

করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে অবিদ্যাই মায়া কেননা ভগবানের এই দেহ ধারণ পারমার্থিক নহে, ইহা প্রাতিভাসিক। শঙ্করাচার্যের মতে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বিশুদ্ধ চৈতন্য বা ব্রহ্ম একমাত্র সত্য। পুরুষোত্তম বা ঈশ্বর বা তাঁহার অবতার অবিদ্যাকল্পিত। জগৎ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী অবিদ্যার সৃষ্টি। তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায় তাঁহার মতে হয় ব্রহ্ম মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে জগৎ রচনা করিয়াছেন, না হয়, ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্যাই জগৎ রচনা করিয়াছে অথবা যেহেতু তিনি কখনও কখনও মায়াকে কুট বা ছলনা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন সেইহেতু জগৎ সৃষ্টি ব্রহ্মের একটি ছলনা মাত্র। শঙ্করাচার্য অবিদ্যা সম্বন্ধে নানা স্থানে নানামত প্রকাশ করিলেও পরম সত্তা যে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় চিৎমাত্র এ সম্বন্ধে তিনি সুস্পষ্ট ও দ্বিধাহীন। কাজেই সমস্ত জগৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সৃষ্টি, ইহাই যে তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ইহা মনে করা সমীচীন। যেহেতু তাঁহার মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, তাঁহার মায়াবাদ একপ্রকারের অনাত্মবাদ। শঙ্করাচার্য একজন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। মহাযান বৌদ্ধগণের চিৎমাত্রা ও বাসনা যথাক্রমে তাঁহার হাতে ব্রহ্ম ও অবিদ্যা আখ্যা লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধগণের মতবাদ বোধগম্য কিন্তু শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ দর্শনের ক্ষেত্রে চিন্তাশক্তির ব্যর্থতা ঘোষণা করিতেছে। শঙ্করাচার্য মায়াবাদের সাহায্যে প্রস্থানত্রয় ব্যাখ্যা করিয়া প্রকারান্তরে হিন্দু ধর্মজীবনে এক বিড়ম্বনার সৃষ্টি করিয়া নাস্তিকতার পথ সুগম করিয়াছেন।

পুরুষোত্তম বা অবতার সম্বন্ধে শঙ্করাচার্যের যে মত হউক না কেন, আমরা সকলে বিশ্বাস করি প্রতিভাবিকাশের জন্য সাধনার প্রয়োজন হইলেও ইহা ঈশ্বরপ্রদত্তশক্তি। প্রতিভাবান্ মহাপুরুষ ঈশ্বরানুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি। যদিও সকল জীবের মধ্যেই পুরুষোত্তমের কোন না কোন শক্তির প্রকাশ, সকল জীবই পুরুষোত্তমের অংশ, পুরুষোত্তম জীব সমাজের মঙ্গলের জন্য স্থান ও কাল বিবেচনা করিয়া কোন কোন জীবের মধ্যে তাঁহার কোন শক্তি অধিক পরিমাণে বিকাশ সাধন করেন। যাঁহার মধ্যে ভগবানের কোন এক শক্তি বেশী পরিমাণে বিকাশ লাভ করে সেই ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি মহাপুরুষ রূপে গণ্য হন। যে কালে যে মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তিনি সেই কালের মানব সমাজের পথিকৃৎ ও আদর্শস্থল। প্রত্যেক মহাপুরুষ এই অর্থে অবতার। তবে এখানে প্রশ্ন হইল, কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবানরূপে বা পূর্ণঅবতাররূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি? দেহ নির্দিষ্ট দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ ও বিনাশশীল কাজেই দেহরূপে কৃষ্ণ যে সনাতন, সর্বব্যাপী, বিশ্বাত্মাও অতীন্দ্রিয় পুরুষোত্তম হইতে পারেন না এ সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। জীবাত্মা সনাতন, ইহা পরমাত্মার অংশ। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদাভেদ সম্পর্ক।

কাজেই পরমাত্মা ও জীবাত্মা, অংশ ও অংশী কখনও সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন হইতে পারে না। যদিও দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে ও চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে কৃষ্ণ অর্জুনের ন্যায় জীবরূপে নিজের উল্লেখ করিয়াছেন এবং জীবের ন্যায় জগতে জীবন যাপন করিয়াছেন, গীতার প্রায় সকল স্থানে তাঁহাকে ভগবানরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহাকে জীবাত্মারূপে গ্রহণকরাও সঙ্গত নহে।

আত্মা সনাতন। ইহার সম্বন্ধে দেশ ও কালের কোন প্রশ্ন উঠে না। পরমাত্মার জীবের প্রতি স্বাভাবিক করুণা ও স্নেহ রহিয়াছে। কাজেই করুণাবশে (আত্মমায়য়া) পরমাত্মা কোন বিশেষ দেহ গঠন করিয়া উহার মাধ্যমে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য যে সাধন করিতে সমর্থ—ইহা স্বীকার করা অযৌক্তিক নহে। মনোবিজ্ঞান একই জীবের মধ্যে দ্বৈতব্যক্তিত্বের প্রকাশের সম্ভাবনা অস্বীকার করে না। কৃষ্ণের আত্মা একদিকে যেমন পরমাত্মা, অপরদিকে ইহা জীবরূপে জীবের মঙ্গলের জন্য এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন এইরূপ মতবাদ গঠন অযৌক্তিক নহে। যে ভগবান জীবের মঙ্গলের জন্য এই জগৎ রচনা করিয়াছেন এবং জীবের আত্মচেতনা লাভের জন্য যথোপযোগী ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই ভগবান তাঁহার প্রিয় সন্তান জীবকে ধর্মের পথ প্রদর্শন করিবার জন্য যে নিজেই জীবদেহ ধারণ করিয়া গীতামৃত দান করিবেন—ইহাতে অবিশ্বাসের কি কারণ থাকিতে পারে? অপূর্ব ও অমূল্য গীতামৃত যাঁহার দান তিনি সর্বমানবের চির নমস্য।

পরমতত্ত্ব ও তার প্রকাশ বা অবভাস*

জিতেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার

আমরা এতক্ষণে বুঝতে পেরে থাকব যে শিব ও সত্য দুটোই পরমার্থের এক-দেশমাত্র। দুটো দিকের নিজ ধর্মই এমন যে সেগুলোকে পরম বাস্তব ব'লে গ্রহণ করা যায় না। পরম বাস্তব বলে গ্রহণ করতে গেলে সেগুলোর অতীতে যেতে হয়। সেগুলোর মধ্যে যে অসংগতি আছে, তার নিরসন করতে হ'লে উচ্চতর ও সর্বময় বস্তুসত্তার দিকে এগিয়ে যেতে হয়। এইবার এই অদ্বিতীয় বস্তুসত্তার প্রকৃতি কি তার পূর্ণতর ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় হয়েছে। বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশ বা অবভাসের প্রতি আমরা এ পর্যন্ত সুবিচার করবার চেষ্টা ক'রে উঠতে পারি নি। আমরা সত্য ও শুভের সম্বন্ধে একটা সরল ধারণা দিতে সমর্থ হয়েছি। জড় প্রকৃতি ও আত্মার সম্বন্ধেও একটা শূন্য রূপরেখা আঁকতে পেরেছি মাত্র। কিন্তু এর বেশী আর কিছু করা আমার পক্ষে এই পুস্তকে সম্ভব নয়। এই পুস্তকে আমার উদ্দেশ্য পরম বস্তুর সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দেওয়া, এবং আমার দেওয়া ধারণার বিরুদ্ধে যে-সব স্পষ্ট ও প্রধান আপত্তি আছে সেগুলোকে খণ্ডন করা। আমার মত প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হ'লে একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বশাস্ত্র রচনা করে সর্ববিধ অবভাসের ব্যাখ্যা দিতে হয়। যে কোনও তত্ত্ববিদ্যার অন্তর্নিহিত মূলসূত্র-গুলো প্রমাণ করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে সেগুলোর দ্বারা জীব, জগৎ ও অন্যান্য অবভাসের সম্যক্ ও শৃংখলাপূর্ণ ব্যাখ্যা। এই পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবার সামর্থ্য আমার নেই। তবুও পরমতত্ত্বের সম্বন্ধে আমার সাধারণ মত যে সত্য তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা আমি করব।

পরমবস্তু এক ও অদ্বিতীয়। পরমবস্তু চিৎস্বরূপ। এই সর্বময় তত্ত্বের মধ্যে সমস্ত অবভাসিত তথ্যের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সম্মিলন ঘটে। মিলনের কালে এই সব তথ্যের নিজ নিজ ধর্মের লোপ হয় বিভিন্ন মাত্রায়। যেসব তথ্যের ভাব ও অস্তিত্বের দিকের মধ্যে সংগতির অভাব সেই সব তথ্যকে অবভাসিত বা প্রতীয়মান তথ্য, বা সোজা কথায় অবভাস বলা হয়। আমরা তাকেই তত্ত্ব বা বস্তুসত্তা বলি যার মধ্যে ভাব

* খ্যাতনামা ইংরাজ দার্শনিক ব্র্যাড্‌লের "Appearance and Reality" গ্রন্থের ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ।

ও অস্তিত্বের সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য এবং পূর্ণসংযোগ আছে। শেষ পর্যন্ত, একমাত্র অদ্বিতীয় পরমবস্তু ছাড়া অন্য কোনও তত্ত্বের মধ্যেই ভাব ও অস্তিত্বের এই পূর্ণ সামঞ্জস্য ও সংযোগ নেই। সুতরাং পরমবস্তুই একমাত্র বস্তুসত্তা। অন্য যে কোনও জিনিসকে বিশ্লেষণ করলেই তার ভাবগতরূপ ও অস্তিত্বগতরূপের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং পরমবস্তু ব্যতীত অন্যান্য সব তথ্য প্রতীয়মান তথ্য কিংবা অবভাসমাত্র। প্রতীয়মান সত্তার তথাকথিত বাস্তবতার মধ্যে ফাটল আছে। এই সব তথ্যের 'তৎ'১-এর দিক্ ও 'কিম্'২-এর দিক সমান নয় এবং প্রত্যেক অস্তবান্ তথ্যের অন্তর্নিহিত এই অসামঞ্জস্যের জন্য সেই তথ্য অত্যন্ত ভঙ্গুর। অবভাস কিংবা অ-পারমার্থিক সত্তার লক্ষণ এই যে এই সত্তাকে জানবার সময় যে চিত্তবৃত্তি চৈতন্য অধিকার ক'রে থাকে তার ঘটনারূপ এবং তাৎপর্য্যরূপের মধ্যে স্পষ্ট প্রভেদ। যেখানেই অস্তিত্ব ও তার তাৎপর্য্যের মধ্যে অসংগতি সেখানেই আমরা অবভাসের চতুঃসীমার মধ্যে আছি, এই মনে করতে হবে। মানবজীবনের প্রত্যেক অংশে ও ক্ষেত্রে দুই দিকের অন্তর্গত এই অসংগতি দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সসীম সত্তার স্বরূপ সেই সত্তার বহিঃস্থ অন্যান্য সত্তার উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য যেখানেই কোনও এক তথাকথিত তথ্যকে বাস্তব ব'লে স্বীকার করতে গিয়েছি সেখানেই আমরা সেই সত্তার বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছি। বস্তুনিচয়ের এই আত্মবিরোধ, এই অস্থিরতা, এই ভাবপ্রবণতাই৩ সেগুলোর অ-পারমার্থিকতার স্পষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু অপরপক্ষে, কোনও অবভাসই সম্পূর্ণ মিথ্যা হ'তে পারে না। সর্বময়ের ঐক্যদৃষ্টিতে প্রত্যেক প্রতীয়মান সত্তার স্থান আছে ও স্থান থাকা প্রয়োজন। সেইজন্য আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিশ্বের যে কোনও এক দিককে অবশিষ্ট দিকগুলোর অর্থ বা সাধ্যরূপে গ্রহণ করা যায়। কোনও একদিক থেকে বঞ্চিত হ'লে পরমার্থকে অপদার্থ বা মূল্যহীন বলা চলে। বিশ্বের কোনও এক মূল্যবান অংশ সম্বন্ধে বিচার করতে গেলেই বিশ্বের অন্যান্য অংশ যেন ঐ মূল্য সৃষ্টি ও রক্ষার জন্যই আছে, এই রকম মনে হয়। কিন্তু এও নিশ্চিত যে এইরকম মনে হওয়া একটা ভ্রান্তি ও একপ্রকার এক দেশদর্শিতা এবং বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। অন্যান্য অংশগুলোকে বাহ্য উপায় বা নিমিত্ত ব'লে কল্পনা করা যায় না। বুঝতে পারা যায় সেগুলো প্রথমোক্ত অংশের মধ্যে অন্তর্নিহিত। সুতরাং পূর্ববর্তী ধারণাকে শেষ পর্য্যন্ত অসত্য বিচার করে বর্জন করতে হয়। এই পরিণতি থেকে আমরা একটা সত্য উপলব্ধি করি। পরমার্থে বা

---

১ তৎ — That ২ কিম্ — What ৩ ভাবপ্রবণতা — Ideality

পরম বস্তুতে এমন কিছু নেই যা কেবল আনুষঙ্গিক কিংবা আগন্তুক মাত্র। বিশ্বের প্রত্যেক উপাদানই এক একটি আপেক্ষিক সামগ্রের[১] অংশবিশেষ, এই সামগ্রের মধ্যে সেই উপাদানের নিজ ধর্ম পুষ্ট ও রক্ষিত হয়। এই রকম আপেক্ষিক সামগ্রগুলোই বিশ্বের প্রধান প্রধান দিক। এই সামগ্রের কোনও একটাকে অপর একটা সামগ্রে পরিণত করা যায় না। এই কারণে এই সব প্রধান দিকের সম্বন্ধে আমরা এরকম উক্তি করতে পারি না যে কোনও এক দিক অন্য দিকের চেয়ে উন্নততর কিংবা প্রকৃষ্টতর। তবে এই বিভিন্ন প্রধান অংশগুলোকে একেবারে স্বতন্ত্র বলাও যায় না কারণ প্রত্যেকটারই মধ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার অভাব। সম্পূর্ণতালাভ করতে হ'লে প্রত্যেক অংশকেই অপর অংশের সঙ্গে সংযুক্ত হ'তে হয়। তাছাড়া যে পরম পূর্ণতার মধ্যে এই অংশগুলো সার্থকতা লাভ করে তার সর্বময় প্রভাবে প্রত্যেক আপেক্ষিক সামগ্রেরই নিজরূপে থাকার দাবি অগ্রাহ্য হয়। কিন্তু এই নিম্নতর প্রকাশগুলোর কোনও একটাকে অপরটার তুলনায় হীনতর বলা যায় না। এবং সেগুলোর প্রত্যেকটাই পরমার্থের পরিপূর্ণতার জন্য নিতান্ত আবশ্যক ও প্রয়োজনীয়।

এই অধ্যায়ে চিৎস্বরূপ পরমতত্ত্বের প্রধান প্রধান অংশ বা প্রকাশ কি তাই দেখবার চেষ্টা করব। চৈতন্যের কোনও এক দিককে প্রধান এবং অন্যান্য দিক্‌কে অপ্রধান বলা যায় না। চৈতন্যের এমন কোনও অংশ নাই যাকে সারাংশ এবং যার তুলনায় অন্যান্য অংশকে সেই সারাংশের বিভিন্ন গুণ বলা যায়। অর্থাৎ চৈতন্যের মধ্যে এমন কোনও উপাদান নেই যাতে অন্যান্য সর্ববিধ উপাদানকে পরিণত করা সম্ভব। তবে পরমার্থে এই বিভিন্ন অংশের সমন্বয় কি ক'রে ঘটে তা বুদ্ধির অগোচর। পরবর্তী অধ্যায়ে পরম ঐক্যের সদর্থক রূপটির সম্বন্ধে আলোচনা করব। এখানে অন্য আর একটা বিষয়ের উপর জোর দিতে চাই। যতরকম বিশেষ বিশেষ অবভাস আছে তার প্রত্যেকটারই মধ্যে পরমার্থ আছে এবং এও এক অর্থে বলা চলে যে পরমার্থের স্বরূপ এই সব অবভাসের প্রত্যেকটারই মত। তবে এই সব প্রকাশের মধ্যে পরমার্থের বাস্তবতার ও সার্থকতার তারতম্য আছে। এই অধ্যায়ে প্রকৃতি সম্পর্কিত কয়েকটা অমীমাংসিত প্রশ্নের অতিরিক্ত আলোচনা করব এবং পরজন্ম ও প্রগতি সম্বন্ধেও একটা হ্রস্ব আলোচনা ক'রে অধ্যায়ের শেষ করব।

সব কিছুই চৈতন্য ; এবং চৈতন্য বা সত্তা অখণ্ড ও অদ্বিতীয়। পরবর্তী অধ্যায়ে আমি আবার আলোচনা করব যে এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যায় কি না। বর্তমান

১ সামগ্র — Whole

অধ্যায়ে এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হ'য়েছে ধ'রে নেব। চৈতন্যের প্রধান প্রধান অংশ বা দিক্ কি? চৈতন্যের দুটো প্রধান দিক আছে সাধারণরূপে আমরা এটা বলতে পারি। একদিকে ভাবনা বা চিন্তন এবং প্রতীতি বা প্রত্যক্ষ-বোধ অপর দিকে বাসনা এবং ইচ্ছা। এছাড়া আর এক দিক্ আছে যেটাকে ঠিক এই দুই দিকের কোনও একটির অন্তর্গত করা যায় না। রসোপভোগ বা সৌন্দর্যোপভোগের দিক। আবার সুখ ও দুঃখের বা বেদনার দিক আছে যেটা আর একটা দিক। সর্বশেষে অনুভবের একটা দিক্ আছে। অনুভব দ্বিবিধ (১) নির্বিকল্প অনুভব এবং (২) অন্যবিধ অখণ্ডতার অনুভব। জীবের চৈতন্য যখন ইহার উপরিবর্ণিত বিশেষ বিশেষ দিকে বা প্রকারে বিকল্পিত হয় নি তখনকার সমগ্র ও অখণ্ড ও নির্বিশেষ অনুভব নির্বিকল্প অনুভব। দ্বিতীয় প্রকারের অনুভূতি হচ্ছে জীবের মনের সেই সব অবস্থা-বিশেষ যেগুলোর একটা আভ্যন্তরিক ও নির্বিশেষ অখণ্ডতা আছে। চৈতন্যের এই বিভিন্ন প্রকাশের কোনও একটিকে অন্যটিতে পরিণত করা যায় না। প্রত্যেকটিরই নিজস্ব ধর্ম আছে। সর্বময়ের ঐক্য এই দিক্‌গুলোর কোনও একটা অংশমাত্রকে নিয়ে নয়। প্রত্যেক দিকই অসম্পূর্ণ এবং প্রত্যেক দিকেরই সম্পূর্ণতালাভের জন্য অন্যান্য দিকের সাহায্য দরকার। পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো দিয়ে এই জিনিসটা আমরা অনেকটা বুঝতে পেরেছি। আমি পুনরায় সমস্ত পূর্ববর্তী আলোচনার সারাংশের একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবো এবং কিছু অতিরিক্ত প্রমাণের অবতারণা করব। আমি পরমতত্ত্বের অবভাসমালাকে মুখ্যতঃ সেগুলোর মানসিক দিক থেকে এখন দেখব। কিন্তু এই ব্যপদেশে কোনও পূর্ণাঙ্গ মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নয়। যে সব পাঠকের মত আমার মতের থেকে পৃথক, তাঁদের মত যদি আমার প্রধান সিদ্ধান্তের বিরোধী না হয় তাঁরা যেন তাঁদের মতকে বর্তমান আলোচনার সময় উপেক্ষা করেন, এই আমার অনুরোধ।

(১) প্রথমে সুখ ও দুঃখের কথা দেখা যাক। সুখ ও দুঃখকে পরম বস্তুর সারাংশ বলা যায় না, এ অতি স্পষ্ট। কারণ অন্যান্য উপাদানকে সুখ ও দুঃখের ফল বা গুণ কল্পনা করা অসম্ভব; কিংবা অন্যান্য উপাদানকে সুখ ও দুঃখে পরিণতও করা যায় না। সুখ ও দুঃখই একমাত্র বাস্তব জিনিষ নয়। কিন্তু অন্যান্য অবশিষ্ট উপাদানের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিশ্লিষ্টভাবে সুখ এবং দুঃখকেই কি বাস্তব বলা চলে? আমরা সুখ ও দুঃখের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার করতে বাধ্য। কারণ সুখ ও দুঃখ অন্যোন্য বিরোধী, এবং পরমার্থে সুখ ও দুঃখের সমাগমের পর যে সুখাতিরেকের

উদ্ভব হয় তাকে কি আমরা শুদ্ধ সুখ বলতে পারি? এ ছাড়া সুখ ও দুঃখকে বাস্তব বলবার বিরুদ্ধে আরও প্রবল আপত্তি আছে। সুখকর এবং দুঃখকর কিংবা আনন্দদায়ক এবং বেদনাদায়ক অন্য কিছু থেকে সুখ ও দুঃখকে আমরা কল্পনা দ্বারা বিশ্লিষ্ট ক'রে দেখি। সুতরাং সুখ ও দুঃখকে যে সব বৃত্তি বা অবস্থার সঙ্গে সর্বদা সংযুক্তরূপে আমরা পাই সেগুলোর সঙ্গে সুখ ও দুঃখের নিত্য সম্বন্ধ, এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নয়। প্রকৃতপক্ষে সুখ ও দুঃখকে পৃথক্ জিনিসরূপে কল্পনা করতে হ'লে তাদের জ্ঞাত ধর্মের বিরুদ্ধতা করতে হয়। এবং তাই যদি সত্য হয়, তাহ'লে সুখ ও দুঃখের সারাংশ ও বস্তুসত্তা অন্যান্য জিনিসের উপর নির্ভরশীল। সুখ ও দুঃখকে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসৎ জিনিস বলা চলে না। বিশ্বের এক দিক সুখ এবং দুঃখ। সাকল্যের মধ্যে লীন হওয়ার পর সুখ ও দুঃখ বাস্তব। সুতরাং সুখ এবং দুঃখ অবভাসমাত্র।

(২) এবার অনুভবের বিষয় আলোচনা করা যাক। অনুভব বলতে সসীম চৈতন্য-কেন্দ্র বিশেষের অখণ্ডতার সাক্ষাৎ অনুভবের কথা মনে করছি। এই অনুভব দ্বিবিধ। প্রথমতঃ চৈতন্যের সেই নির্বিকল্প অবস্থাকে অনুভব বলি, যে অবস্থায় কোনও রকম সম্বন্ধের বোধ জাগে নি এবং বিষয় ও বিষয়ীর কল্পনাও উদিত হয় নি। দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যের যে কোনও স্তরে যা কিছু উদিত হ'ক না কেন তার উপস্থিতি ও শুদ্ধ অস্তিত্বের বোধটুকুকে অনুভব বলি। এই দ্বিতীয় অর্থে যা কিছু প্রকৃতপক্ষে বাস্তব তাই অনুভূত হ'তে বাধ্য। সাধারণতঃ এই প্রকৃত বাস্তবতার বোধকে আমরা অনুভব আখ্যা দিই না—কারণ কেবল অস্তিত্বের বোধ খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে। এখন প্রশ্ন ওঠে অনুভবের এই দুই অর্থের কোনও এক অর্থে অনুভবকে বাস্তব কিংবা পরমবস্তুর স্বরূপ বলতে পারা যায় কি না? উত্তরে না বলতে হয়।

প্রত্যেক অনুভবের প্রকারভেদ আছে। অনুভবের এই প্রকারের মধ্যে স্ব-সংগতি না থাকার ফলে অনুভবের অখণ্ডতা নষ্ট হয়ে যায়। যে কোনও অনুভবের প্রকার সান্ত, এবং সান্ত হওয়ার জন্য তার ধর্মের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ অস্তিত্বের সামঞ্জস্য থাকতে পারে না। প্রত্যেক অনুভবের সান্তপ্রকার বাহ্য প্রভাবের ওপর অবশ্য নির্ভরশীল; এবং বাহ্য সম্বন্ধের প্রভাবের জন্য ঐ প্রকারের অর্থ বা ধর্ম তার অনুভবরূপী অস্তিত্বের সঙ্গে সমান নয়। অথাৎ অনুভবের 'তৎ' এর দিকের সঙ্গে তার 'কিম্'এর দিক সব সময়েই সংঘর্ষশীল। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে সসীম জীবের অনুভব অবভাস মাত্র। অনুভবের পরিবর্তনশীলতা এক রূঢ় তথ্য।

এই তথ্যের দ্বারাই অনুভবের অসত্যতা ও ক্ষণস্থায়িত্ব প্রতিপন্ন হয়। এবং আরও লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে ভিতর এবং বাইরে দুই দিক থেকেই অনুভব চৈতন্য, সম্বন্ধাশ্রয়ী চৈতন্য পরিণত হ'তে বাধ্য হয়। অনুভবের ওপরই পরে আরও অনেক কিছু প্রতিষ্ঠিত করা হয়, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় অনুভবের নিত্য আত্মস্খলনের দ্বারা। সুতরাং পরবর্তী সৃষ্টিগুলোকে বা কল্পনাগুলোকে অনুভবের সৃষ্টি বা গুণ ব'লতে পারি না। কারণ পরবর্তী সৃষ্টিগুলোর অস্তিত্ব নির্ভরশীল অনুভবের অখণ্ডতার বিচ্ছেদের ওপর। পূর্ণ অখণ্ডতা একমাত্র পরমতত্ত্বে সিদ্ধ।

(৩) এবার ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ কিংবা চৈতন্যের জ্ঞানমাত্রিক দিক এবং ইচ্ছা বা চৈতন্যের কর্মমাত্রিক দিকের বিষয় দেখা যাক্। সুখ, দুঃখ এবং অনুভবের থেকে এই দুই দিক ভিন্ন। ভিন্ন এই জন্য যে জ্ঞানমাত্রিক ও কর্মমাত্রিক চৈতন্যের জন্য বিষয় ও বিষয়ীর পার্থক্যের প্রয়োজন। প্রত্যক্ষজ্ঞানের দিকের অস্তিত্ব প্রথম থেকেই পৃথক নয়। কর্মময় বা ব্যবহারিক দিকের সঙ্গে প্রথমে প্রত্যক্ষজ্ঞান জড়িত থাকে। পরে ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষজ্ঞানের দিক পৃথক হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এখানে আমরা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের স্বরূপ কি তাই দেখতে চেষ্টা করব। বিশৃংখল রাশি অনুভবের মধ্যে থেকে এক বা একাধিক বিষয়কে অবশিষ্ট রাশি থেকে পৃথককৃত রূপে জানাই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিষয়টি কেবল যেন স্বতন্ত্ররূপে আছে এই মনে হয়। অপর পক্ষে এমন যদি মনে হয় যেন বিষয়টি অনুভব রাশিকে প্রভাবিত করার ফলে রাশিটি বিষয়ের ওপর ক্রিয়াশীল হ'চ্ছে ও বিষয়টির পরিবর্ত্তন সাধন করবে তাহ'লে চৈতন্য কর্মমুখী হয়েছে এই মনে করতে হবে। প্রত্যক্ষজ্ঞানে জ্ঞাতার সঙ্গে জ্ঞেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধটা যেন অবান্তর বা আকস্মিক এইরকম মনে হয়। আমরা মনে করি যে প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয়ের অস্তিত্বটা এই সম্বন্ধ থাকুক আর নাই থাকুক তার ওপর একেবারেই নির্ভর করে না। কারণ প্রত্যক্ষজ্ঞান কিংবা চিন্তনের বিষয়ীভূত বস্তু শুধু যেন আছে এই আমাদের বিশ্বাস। আমরা যতই কেন না এই বস্তুকে খুঁজে বেড়াই, খুঁজে পাই কিংবা যতই কেন না এর বিষয়ে ভাবি আমাদের এই সব মানসিক ক্রিয়া যেন বস্তুটির পক্ষে কিছুই নয়; বিষয়ীভূত বস্তুটি যেন ঐ বাইরে আছে। জ্ঞানলাভের জন্য এর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়। কিন্তু অস্তিত্বের জন্য আমাদের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয় না। এই যেন আমাদের ধারণা।

প্রত্যক্ষজ্ঞান ও চিন্তনের মধ্যে অসঙ্গতিটি এই। যে সম্বন্ধ স্থাপনের ওপর

প্রত্যক্ষজ্ঞান ও চিন্তনের অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেই সম্বন্ধকে এখানে উপেক্ষা করার চেষ্টা চলছে। এই অসঙ্গতিটি দুই দিক থেকে ধরা পড়ে। অনুভবের একটা অখণ্ড পটভূমিকার মধ্যে থেকে জ্ঞেয় বিষয়গুলোর উদ্ভব হয়। কিন্তু এই রকম কল্পনা করা হয় যেন জ্ঞেয় বিষয়গুলোর উদ্ভবের ব্যাপারে পেছনের অনুভব রাশির কোনও কৃতিত্ব নেই। কিন্তু সংবেদন এবং ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের স্তরেই এই উক্তি সত্য নয়। চিন্তন বা ভাবনার স্তরে এইরকম স্থিতি একেবারেই অসম্ভব। কারণ, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এবং জ্ঞেয়ের অস্তিত্বের সঙ্গে জ্ঞান ক্রিয়ার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। কিন্তু জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের পরম-সমন্বয় সাধিত হবার পর জ্ঞেয়ের বা বিষয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব আর থাকতে পারে না। এই অবস্থা প্রত্যক্ষবোধের এক অতীত অবস্থা। অন্যদিক থেকেও এই অসঙ্গতি ধরা পড়ে। যে বস্তু প্রত্যক্ষ ও চিন্তনের বিষয় সেটা শুধু আছে বললেই হয় না, তার একটা রূপও আছে। বস্তুর রূপ বলতে আমরা বুঝি তার সঙ্গে অন্যান্য উপাদানের সম্বন্ধ ; এবং বস্তুটির পৃথক রূপ অন্য সব উপাদান থেকে তাকে পৃথক করণের ওপর নির্ভর করে। সেইজন্য বস্তুটির রূপের মধ্যে অন্য সব উপাদানের প্রভাব স্বীকার করতে হয়। সুতরাং বস্তুটির ধর্ম তার অস্তিত্বকে ছাড়িয়ে যায়। তার 'কিম্'টি তার 'তৎ'এর সীমা অতিক্রম করে। এর থেকে বোঝা যায় যে চিন্তন বা প্রত্যক্ষের বিষয় কোনও অস্তিত্ববান বস্তুমাত্র নয়, চিন্তন বা প্রত্যক্ষের বিষয় এমন এক পরমবস্তু যা ভাবরূপে প্রকাশিত হ'য়েছে। বাস্তব ও তার ঈদৃশ প্রকাশ অভিন্ন নয়। সুতরাং এই প্রকাশকে সম্পূর্ণ সত্য বলা যায় না। সম্পূর্ণ সত্য হ'তে হ'লে এই প্রকাশের অন্তর্নিহিত ধর্মের বা ভাবের সংশোধন দরকার। এই সংশোধন প্রথমতঃ শুধু ভাবগত ব্যাপার হ'তে বাধ্য। যতক্ষণ এই সংশোধন ক্রিয়া চলে ততক্ষণ ধর্ম ও অস্তিত্বের মধ্যে বিশ্লেষটি থেকেই যায়। সুতরাং সত্য সম্পূর্ণতালাভ করবার পর সত্যরূপে আর থাকৃতে পারে না। কারণ সত্য এক প্রকার অবভাসমাত্র। দ্বিতীয়তঃ সত্য যতক্ষণ অবভাসের জগতের জিনিস থাকে ততক্ষণ তার পক্ষে সম্পূর্ণতা লাভ করা অসম্ভব। জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়বস্তু পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়ে সেই পরিণতি লাভ করলে সর্ববিধ প্রভেদ ও ভাবধর্মিতার অবসান হতে বাধ্য। কিন্তু এই পরিণতিলাভের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেরও নিবৃত্তি হয়। জ্ঞেয়ের মধ্যে যুগপৎ দুই বিপরীত প্রয়োজন লক্ষ্য করা যায়। জ্ঞেয়ের অস্তিত্বের জন্য সম্বন্ধ দরকার। এবং জ্ঞেয়ের অস্তিত্বের জন্য স্বাতন্ত্র্যও দরকার। এবং এই দুই বিপরীত দিকের সংঘর্ষ চলে গেলে কিংবা এই দুই দিকের সমন্বয় সাধিত হ'লে

জ্ঞেয়ের নিজ বৈশিষ্ট্যও লোপ পায়। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও ভাবনা বা প্রত্যয় থেকে হয় অপরোক্ষ অনুভবের দিকে ফিরে আসতে হয় নতুবা প্রত্যয় ও প্রত্যক্ষের একদেশ-দর্শিতা ও অসত্যতা স্বীকার ক'রে প্রত্যক্ষ ও ভাবনার অতীত এক পরিপূরক ও বৃহত্তর বস্তু-সত্তার দিকে সম্পূর্ণতালাভের জন্য অগ্রসর হ'তে হয়।

(৪) এইবার চৈতন্যের কর্মমূলক বা ব্যবহারিক দিকের বিষয় আলোচনা করব। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও চিন্তনের ক্ষেত্রে যেমন, এইক্ষেত্রেও তেমন কেন্দ্রস্থিত অনুভবরাশির থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র একটি বিষয়ের দরকার। কিন্তু এখানে বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধটাই প্রধান ও সার জিনিষ। এবং এই সম্বন্ধটা বাধার সম্বন্ধরূপে উপলব্ধ হয়। কর্মসম্পাদনের জন্য দরকার উপস্থিত বিষয়ের পরিবর্তনের কল্পনা, কল্পনার প্রতি কেন্দ্রস্থ অনুভবরাশির অবিরোধিতা, কল্পিত পরিবর্তন সাধনের নিমিত্ত নিজের মধ্যে ক্রিয়া এবং সর্বশেষে কল্পনার বাস্তবরূপ গ্রহণ। এই বিশ্লেষণটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে ব্যবহারিক ভঙ্গি বা দৃষ্টিও অসম্পূর্ণ একদেশদৃষ্টি মাত্র। কারণ কর্মদ্বারা ভাব ও অস্তিত্বের মধ্যস্থিত যে ব্যবধান বা বিচ্ছেদকে অপসারণ করা হয়, সেই বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা কর্ম-প্রবৃত্তির নেই। এবং এই বিচ্ছেদ রাহিত্যের পর কর্মপ্রবৃত্তির ও অস্তিত্ব থাকে না। এটা নিশ্চিত যে ইচ্ছার প্রয়োগদ্বারা আমরা ভাবমাত্রের সৃষ্টি করি না ইচ্ছার প্রয়োগে আমরা একবিধ সত্তার সৃষ্টি করি। কিন্তু ইচ্ছার কার্য্য আরম্ভের জন্য প্রথমে শুদ্ধ অবভাস বা ভাবপ্রবণতার প্রয়োজন। এবং ইহা দ্বারা আমরা যে সামঞ্জস্য বিধান করি তা সর্বদা সীমাবদ্ধ এবং সেই জন্য অসম্পূর্ণ এবং অস্থায়ী। অথচ তাই না হ'য়ে ভাব বা কল্পনা ও বাস্তবতার মধ্যে সম্পূর্ণ একীকরণ যদি সম্ভব হ'ত তা'হলে ইচ্ছাবৃত্তিরই লোপ পেত। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কর্মদ্বারাও পরমার্থ লাভ করা যায় না; কর্ম বা ব্যবহারও একবিধ অবভাস মাত্র। ইচ্ছার সম্বন্ধে আরও কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার বিষয়ে পরে বিচার করব। এখন বিচারে এগোন যাক। প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয় বা ভাবের মধ্যে যে প্রভেদগুলো স্বীকৃত হয়, ইচ্ছার ক্রিয়ার জন্য সেগুলোকে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞান বা চিন্তনের চেয়ে ইচ্ছার মধ্যে বাস্তবতা বেশী আছে কি না এ প্রশ্ন উত্থাপন করাই চলে না।

(৫) এবার দেখা যাক রসিকের দৃষ্টিতে পরমবস্তুকে লাভ করা যায় কি না। প্রথমে মনে হয় কান্তরসের অনুভূতির মধ্যে আমরা শেষ পর্যন্ত ভাব ও অস্তিত্বের বিরোধের মীমাংসা যেন পেলাম, এখানে আমরা যেন সম্বন্ধাশ্রয়ী চৈতন্যের ঊর্দ্ধে চলে এসেছি। কারণ রসোপভোগের মধ্যে সাক্ষাৎ অনুভবের গুণটি আছে। যে বিষয় রসের উদ্রেক

করে, তার শুধু গুণ আছে তাই নয় সেটা যেন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা এই রকম মনে হয়। বিশ্বের রসানুভূতির মধ্যে আমরা যে তৃপ্তি পাই জ্ঞান বা কর্মের মধ্যে সেই তৃপ্তি অপ্রাপ্য। এবং রসিকের দৃষ্টিভঙ্গি জ্ঞানীর বা কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। কিন্তু ভোক্তার দৃষ্টিভঙ্গিতেও গলদ আছে। এই গলদ ধরা পড়ে। দেখা যায় যে রসভোগের মধ্যে আমাদের প্রশ্নের উত্তর নেই। কারণ এই রীতিতে আমরা পরমবস্তুকে পাই না. এমন কি আমরা যা চাই তাও পাই না। কাস্ত রসকে আবেগের স্বয়ং-সম্পূর্ণ সত্তা, এই সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। সর্ববিধ রসকে সুন্দর ও অসুন্দর মাত্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা সুকঠিন। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনার জন্য আমি অবশ্য ধ'রে নেব তা যেন সম্ভব এবং পরমতত্ত্বের মধ্যে অসত্য ও অনর্থের মতো অসুন্দরও শেষ পর্যন্ত পরাভূত হ'য়ে লোপ পেতে বাধ্য। সেইজন্য আমি শুধু সুন্দরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করব।

আনন্দের স্বয়ং-সত্তার নাম সৌন্দর্য্য। সুন্দর আনন্দের স্বয়ং-সম্পূর্ণ রূপ। আত্মসুখভোগী স্বয়ং-সৎ বস্তুই সুন্দর এমন অর্থ এই অভিধার নয়। কারণ যতদূর আমরা জানি সেরকম বস্তু সুন্দর নাও হ'তে পারে। সুন্দরের স্বয়ং-সত্তা দরকার এবং তার সত্তার স্বতন্ত্রতা থাকা দরকার। সুতরাং শুধু ভাবরূপে থাকলে সুন্দরের চলে না; সুন্দরের স্বকীয় প্রকাশ বা ব্যক্তিতা থাকা চাই। ভাবরাশি কিংবা ভাবনার প্রক্রিয়াগুলোই সুন্দর হ'তে পারে। এইগুলো যখন স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং খানিকটা যেন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ এইরূপে উদ্‌ভাসিত হয়, তখন এগুলোকে সুন্দর মনে হয়। কিন্তু সুন্দরও কোনও না কোনও চৈতন্যের বিষয় হবেই হবে। মানুষের মনের সঙ্গে এর একটা সম্বন্ধ থাকবেই এবং সুন্দরের মধ্যেই একটা বিশিষ্ট ভাবগত উপাদান নিশ্চয়ই আছে। কেবলমাত্র অনুভূতিকে সুন্দর বলা চলে না। তবে এ হ'তে পারে যে একটা মিশ্র অভিজ্ঞতার সামগ্রের মধ্যে সৌন্দর্যরস এবং অনুভবের অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে। এছাড়া সুন্দরের ধর্মই হ'চ্ছে প্রত্যক্ষ-আনন্দ দান করা। কিন্তু তাই যদি হয়, তা হ'লে সুন্দরের সৌন্দর্য্যের জন্য এমন কেউ না কেউ দরকার যে সেই সৌন্দর্য্যভোগ ক'রে আনন্দিত হ'চ্ছে।

সুন্দরের মধ্যে যেমন উপাদানের সঙ্গম দরকার সেগুলোর মধ্যে বিরোধ আছে এবং সুন্দরের অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি ধরতে বেশী সময় লাগে না। সুন্দর থেকে তার মনোহারিত্ব এবং আমার সঙ্গে সুন্দরের সম্বন্ধ এই দুটো উপাদানকে বাদ দিয়ে সুন্দরের অবশিষ্ট অংশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যাক। এই বিশিষ্ট অংশের মধ্যে অসঙ্গতি

আছে। কারণ সুন্দরের অন্তর্নিহিত ভাব ও অস্তিত্বের সমতা দরকার, কিন্তু সৌন্দর্য্যের বিষয়টি সসীম, সুতরাং তার মধ্যে ভাব ও অস্তিত্বের উভয়মুখী সম্বন্ধ অসম্ভব। এবং এইজন্য সত্য ও শিবের ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপ্তি ও সঙ্গতির মধ্যে আংশিক ব্যবধান লক্ষ্য করেছি, সুন্দরের ক্ষেত্রেও তেমনি অমিল থাকতে বাধ্য। হয় প্রকাশটি অসম্পূর্ণ নতুবা প্রকাশ্য বিষয়টি সঙ্কীর্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই শেষ পর্য্যন্ত পরম সমন্বয়ের অভাব ও আভ্যন্তরিক অসঙ্গতির জন্য বস্তুসত্তার লাঘব থেকে যায়। কারণ উপলব্ধির অর্থটি সান্ত ও সেইজন্য অসমঞ্জস এবং সেটি শুধু ভাবগত বা কাল্পনিক হ'তে পারে; এই ক্ষেত্রে অর্থটির সঙ্গে তার বাস্তবপ্রকাশের মিল নাও থাকতে পারে। অপর পক্ষে প্রকাশটির মধ্যেও বিভিন্ন মাত্রায় বাস্তবতার কমতি থাকতে বাধ্য। কারণ যত যাই হ'ক যা'কে সুন্দর বলি তা একটা সসীম তথ্য। এই তথ্যের উপর বাহ্যশক্তি প্রভাব বিস্তার করে, সুতরাং এর অভ্যন্তরে অসঙ্গতি সুনিশ্চিত। সুতরাং সম্বন্ধহীন ও বিশ্লিষ্টরূপে দেখতে গেলেই সুন্দরকে পরম বাস্তব বলা যায় না।

কিন্তু সুন্দরকে বিশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধরহিতরূপে কল্পনা করাই অসম্ভব। কারণ আহ্লাদ বা আনন্দই সুন্দরের সার অংশ। এবং আনন্দ বা কোনও আবেগ কিরূপে জীব-চৈতন্যের বাইরে থাকতে পারে তা আমাদের কল্পনারও অতীত। সুতরাং সুন্দর জীবের অভ্যন্তরস্থ গুণবিশেষের ক্রিয়ার ফল আর যাই কিছু হ'ক সব সময়েই প্রত্যক্ষের বিষয় সুন্দর। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য যে সম্বন্ধ প্রয়োজন সুন্দরের অস্তিত্বের জন্যও সেই সম্বন্ধ একান্ত স্বীকার্য্য। সুতরাং মনের বিকার রূপেই হ'ক কিংবা প্রত্যক্ষের বিষয়রূপেই হ'ক সুন্দরের সত্তা বাহ্য উপাদানের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং সুন্দর প্রতীয়মান সত্তা। অপর পক্ষে, বাহ্য উপাধিগুলো সুন্দরের আভ্যন্তরিক উপাদান হ'য়ে উঠতে চায় কিন্তু জ্ঞাতা বা ভোক্তা চৈতন্যের গ্রাসের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধের নাশ হয়। এবং সেইজন্য সৌন্দর্য্যের স্বরূপ ও অন্তর্হিত হয়।

রসাত্মক বিষয়ের বিভিন্ন দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। সৌন্দর্য্যের অন্তর্নিহিত সাক্ষাৎ অনুভব, স্বাতন্ত্র্য এবং সমন্বয় এই তিন দিকের কোনও দিকই পূর্ণ নয়। পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য, পরম সমন্বয় এবং সর্বময় প্রত্যক্ষ পরমতত্ত্বেই সম্ভব। এই পূর্ণতালাভের অর্থ সুন্দরের বিলয়। সুতরাং চৈতন্যের অন্যান্য বৃত্তির মতো রসও দৃশ্যমান জগতের জিনিস এই মাত্র।

অনুভব বা চৈতন্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ ক'রে আমরা দেখতে পেয়েছি প্রত্যেক অংশেই সম্পূর্ণতার অভাব। আমরা নিশ্চয়ই এমন উক্তি করতে পারি না

যে এইসব অংশের কোনও এক বিশেষ অংশের মধ্যে পরমতত্ত্ব বিরাজমান। অপর পক্ষে যে কোনও এক অংশ অপর অংশগুলোর সদৃশ ও সমান নয় ব'লেই প্রত্যেক অংশকে অসম্পূর্ণ ও অসমঞ্জস মনে হয়। তথ্যতঃ প্রত্যেক অংশই অন্য অংশগুলোর সঙ্গে খানিকটা জড়িত। এবং পরমবাস্তবতা লাভের জন্য সমস্ত অংশের একত্র সম্মিলন অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং এইসব বিভিন্ন দিকের সমষ্টিগত সত্তাই পরমসত্তা, এবং বিভিন্ন দিক পরমসত্তার বিভিন্ন ও আংশিক প্রকাশমাত্র। আবার এই অংশ গুলোকে একবার দ্রুত নিরীক্ষণ করা যাক।

আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে সুখ ও দুঃখ দুটোই গুণ বা বিশেষণ মাত্র। আমরা সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে যা জানি তার ওপর দাঁড়িয়ে বলতে পারি না যে সুখ ও দুঃখকে জানলেই বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত দিক সম্বন্ধে জানা হ'য়ে যায়। আমাদের এইটুকু জেনেই তৃপ্ত থাকতে হয় যে সুখ ও দুঃখ চৈতন্যের অন্যান্য প্রত্যেক বৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত একপ্রকার অনুভূতি বা বিশেষণ। সুখ ও দুঃখের উৎপত্তির পূর্ণরহস্য উদঘাটন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তবে এই রহস্য ভেদ যদিও সম্ভব হয়, তাহ'লে আমরা দেখতে পাব যে বিশ্বের সমস্ত অংশই সুখ ও দুঃখের কারক উপাধিগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুখ ও দুঃখের থেকে অনুভূতির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। সেখানে বিরোধ ও তজ্জনিত বিকাশের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। অনুভূতির মধ্যে প্রথম থেকেই অর্থ ও অস্তিত্ব এই দুই দিক ভিন্ন হ'য়ে উঠতে চায়। সেই জন্য বাহ্য আক্রমণ ও অন্তর্বিবাদের ফলে অনুভূতির মধ্যে পরিবর্তন উপস্থিত হয়। তাত্ত্বিক বা জ্ঞানী, সাধক বা কর্মী এবং রসিক বা ভোক্তার দৃষ্টি অবলম্বন করে আমরা বিশ্বের ভাবরূপী ও সত্তারূপী দুই অংশের মধ্যে অ-সামঞ্জস্যটি দূর করতে চেষ্টা করি। তাত্ত্বিক, কার্মিক ও রসিক এই ত্রিবিধ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিরই উদ্ভব অনুভূতি থেকে এবং প্রত্যেকটি ভঙ্গিই একদেশী দৃষ্টিভঙ্গি। চৈতন্যের এই ত্রিবিধ বৃত্তির মধ্যে একরকম একতা রক্ষা করে অনুভূতিই পশ্চাতে থেকে। কিন্তু জ্ঞান, কর্ম বা রসোপভোগ কোনটারই মধ্যে অনুভূতির অখণ্ডতা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় না। রসিক ভাবের অন্তর্নিহিত দোষটি কি তা সহজেই ধরা যায়। সুন্দরের মধ্যে আমরা বাস্তবকে সাক্ষাৎ রূপে পেতে চাই। কিন্তু পাই না। কারণ জ্ঞাতাকে বাদ দিয়ে সৌন্দর্য্যের অস্তিত্ব সম্ভবপর স্বীকার করলেও সৌন্দর্য্যের মধ্যে অসামঞ্জস্য থেকে যায়; সম্পূর্ণতা ও সমন্বয় এই দুই চাহিদার মধ্যে মিল বা সামঞ্জস্য করা অসম্ভব। সৌন্দর্য্যের প্রকাশ তখনই সম্পূর্ণ, যখন তার অর্থ সংকীর্ণ। অপরপক্ষে অর্থ যখন বৃহৎ বা মহৎ, প্রকাশ তখন অসম্পূর্ণ। সেইজন্য সুন্দরতম বা সম্পূর্ণ সুন্দর তাই যা শিবতম বা সম্পূর্ণ

শুভ এবং পরিপূর্ণ সত্য। তার ভাব বা প্রত্যয়কে হ'তে হয় স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং সর্বগামী এবং তার অস্তিত্বকে ভাবের সমান স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হ'তে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় সত্য শিব ও সুন্দরের পার্থক্য তিরোহিত হ'য়ে যায়। বিশ্বের তাত্ত্বিক বা জ্ঞানিক রূপের মধ্যে এই একই পরিণতি লুক্কায়িত আছে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমা যদি সম্পূর্ণ সত্য হয় তাহ'লে সেগুলো কল্যাণের রূপ ধারণ করে। কারণ এখানে তত্ত্বকে এমন ভাবে পাওয়া যাচ্ছে যে তার সঙ্গে প্রত্যয়ের বা ভাবের কোনও ভেদই নেই, এবং প্রত্যয় ও অস্তিত্বের সম্পূর্ণ সমানতাই তো প্রকর্ষ। আবার ভাব ও অস্তিত্বের এই পরিপূর্ণ ব্যক্তিতা সুন্দর না হ'য়েই পারে না। অপর পক্ষে বিভেদগুলি জীর্ণ হওয়ার ফলে সত্য, শিব ও সুন্দরের পৃথক্ পৃথক্ ও নিজ অস্তিত্ব আর থাকতে পারে না। কর্মের দিক থেকেও এই একই পরিণতি। প্রসার ও সংহতির পরিপূর্ণ সার্থকতাই আমাদের ইচ্ছার অন্তিম কাম্য। পরমসার্থকতায় আমরা এমন বস্তু লাভ করি যার সম্পর্কে অলভ্য আর কোনও ভাব বা প্রত্যয় থাকতে পারে না। কল্পনা বা ভাবের পরিপূর্ণ ও পরম পরিণতিই পরম কল্যাণ, এই পরম প্রকাশই আবার পূর্ণ ও পরম সত্য। এবং ভাব ও অস্তিত্বের এই অদ্বিতীয় সমন্বয়কে পরমসুন্দর ও বলতে হয়। কিন্তু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য চ'লে যা'ওয়াতে আমরা এখানেও সৌন্দর্য্য, শিব ও সত্যের অতীতে চলে আসি।

আমরা দেখেছি যে চৈতন্যের বিভিন্ন দিক বা অংশ পরস্পরাপেক্ষী। এগুলো এমন এক অখণ্ড তত্ত্বের নির্দেশ দেয় যেটা সেগুলোর অধিষ্ঠান ও নিধান। এই অখণ্ডসত্তার মধ্যে সেগুলো পরাকাষ্ঠা লাভ করে। আমি অবশ্য বলতে বাধ্য যে এই অন্বয়ী ও অখণ্ড বস্তুসত্তার সম্বন্ধে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। আমরা এইটুকু নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে এই অদ্বৈত পরমবস্তু চৈতন্যস্বরূপ। কিন্তু এই পরম চৈতন্যের সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎ কোনও জ্ঞান নেই। আমরা এমন কোনও চেতন দশার কথা জানি না যার মধ্যে চৈতন্যের সর্ববিধ বৃত্তির পূর্ণৈক্য আছে। এই জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য যে চৈতন্যের বহুধা প্রকাশ এক অনির্বচনীয় ব্যাপার। এই প্রকাশ-বৈচিত্র্যের কারণ নির্দেশ করা আমাদের বুদ্ধির অসাধ্য। যথার্থ হেতু নির্দেশ করতে হ'লে এক কি ক'রে বহু হয় তাই বুঝতে হয়। কিন্তু সর্বত্রই এইরকম হেতুজ্ঞান শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ক্ষমতার বাইরে। চৈতন্যের কোনও এক অংশকে হেতু কল্পনা করে অন্যান্য অংশগুলোকে তার ফল কল্পনা করা যায় না। আর যদি ধ'রেও নেওয়া যায় যে এক অংশ থেকে অন্য অংশগুলো উদ্ভূত হয়েছে, তবুও অন্য অংশগুলোকে তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য সহ প্রথম অংশের বিধেয় রূপে প্রয়োগ করা যায় না। এ'মত অবস্থায় সমগ্র

বৈচিত্র্যকে এক অনবগত অদ্বৈত তত্ত্বের বিধেয় রূপে প্রয়োগ করতে হয়। সুতরাং বিশ্বের কোনও এক অংশকে অন্য অন্য অংশের হেতু কল্পনা করা বোধ হয় যায় না। তাছাড়া কোনও পৃথক অংশবিশেষই স্বতঃবোধ্য নয়। কারণ প্রত্যেক অংশের মধ্যেই অসঙ্গতি এবং প্রত্যেক অংশকে বুঝতে হ'লেই অপর অংশগুলোকে স্বীকার করতে হয়। সুতরাং একমাত্র সমগ্রকে সমগ্রভাবে জানতে পারলেই হেতু-নির্দ্ধারণ সম্ভবপর হ'তে পারে। কিন্তু এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ এবং বিশদজ্ঞান সম্ভবপর নয় আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি।

(ক্রমশঃ)

Statement about ownership and other particulars about the newspaper **Darsan** to be published in the first Issue every year after the last day of February.

FORM IV

(See Rule 8)

1. Place of publication	Calcutta
2. Periodicity of its publication	Quarterly.
3 Printer's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
Nationality	Indian
Address	20/2. Halder Bagan Lane, Cal.-4
4, Publisher's Name	Sri Kalyan Chandra Gupta
Nationality	Indian
Address	20/2, Halder Bagan Lane,
5. Editor's Name	Sri Kali Krishna Banerjee
Nationality	Indian
Address	Flat No. 16, Block K. C- I. T. Buildings, Cristopher Rd, Cal. 14
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent. of the total capital.	Bangiya Darsan Parishad 20/2. Halder Bagan Lane, Calcutta-4

I, Kalyan Chandra Gupta, hereby declare that the particular given above are true to the best of my knowledge and behalf.

K. C. Gupta

Dated 16th April, 1963

Signature of Publisher